ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্র

ষাণ্মাসিক সূচী

৪র্থ বর্ষ—১ম খণ্ড

মে ১৯৬৪—অক্টোবর ১৯৬৪

বৈশাখ ১৩৭১—আশ্বিন ১৩৭১

সম্পাদক

লীলা মজুমদার

সত্যজিৎ রায়

কেউ খায় কপকপ,
কেউ শুধু চাখে।
কেউ গেলে গপগপ,
কেউ শোঁকে নাকে।
কেউ চাটে চপচপ,
কেউ চেয়ে থাকে!

৪র্থ বর্ষ। ১ম সংখ্যা। মে ১৯৬৪। বৈশাখ ১৩৭০

পুনরাগমন

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

চিরদিনের আনন্দ হে—হে পুণ্যদর্শন,
আকাঙ্ক্ষিত, তোমার যে তাই পুনরাগমন।
শুনলে বুঝি সুখময়ী নব ঊষার ডাক
এসো লয়ে চম্পক এবং নাগেশ্বরের ঝাঁক।
বোধন কর আবার তুমি নূতন প্রতিভার,
সুন্দর শিব শুচি যাহা স্নিগ্ধ সুকুমার।
স্বাধীন দেশে এসে এবার শান্তি তুমি পাও,
পাবনী ও সঞ্জীবনী শক্তি তোমার দাও।
ছোট যারা ছিল, দেখ, এখন বড় বেশ—
বিলাও তাদের আবার এসে অমৃত সন্দেশ।
জানি শুভাকাঙ্ক্ষী তুমি—সুদূর পিয়াসী—
সুনির্মল ও শুভ্র হাসি আমরা ভালবাসি।
বিভীষিকার ঘুরছে ছায়া—হিংসা ও ভয়ের,
কিশোর বুকে আসন পাত আনন্দময়ের।
প্রীত কর সবায় কর প্রীতিতে বন্ধন—
আনন্দলোক সৃষ্টি কর—লও অভিনন্দন।

"পঁচিশে বৈশাখ"

আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন তাঁর ১০৩ বছর বয়স হোত, এ কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তার কারণ ছোটদের দলের এমন পাণ্ডা কমই দেখা গেছে। যখন তাঁর খুব কাছে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন তাঁর ৭০ বছর বয়স, কিন্তু সর্বাঙ্গ থেকে তারুণ্য যেন ফেটে পড়ছে। চুল দাড়ি পেকে গেছে, চলবার সময় সামনের দিকে সামান্য একটু নুয়ে পড়েছেন, গানের গলা ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু সমস্ত দেহ মনের নবীনতা তবু অম্লান।

ছোটবেলা থেকে শুনতাম রবিঠাকুর ইস্কুল পালাতে ওস্তাদ, ম্যাট্রিক পরীক্ষাও পাশ করেন নি, কিন্তু বোলপুরের কাছে খোলা মাঠের মধ্যে এক দল দুরন্ত ছেলে নিয়ে একটা নতুন ধরণের বিদ্যালয় গড়েছেন। সেখানে পড়াশুনো কিছু হোক না হোক, কেউ পায়ে জুতো দেয় না, গাছতলায় মাটিতে বসে ক্লাশ করে, খাওয়া দাওয়া খুব মন্দ, দারুণ কষ্ট সইতে হয় কি শীতে কি গরমে—আর এ সবের ফলে দুষ্টু ছেলেরাও দুদিনে সায়েস্তা হয়ে যায়। কিন্তু যারা একবার সেখানকার কাঁকর মেশানো ভাত আর আলু-পোস্তো খেয়েছে তারা আর সেখান থেকে নড়তে চায় না। যেমনি গুরু তার তেমনি চ্যালা!

গিয়ে দেখলাম গুরু তখন ইস্কুল চালাবার ভার অনেকখানি অন্যদের হাতে তুলে দিয়েছেন। নিজে খানিকটা তদারক করেন বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সময় কাটান দেশে বিদেশে ঘুরে, কিম্বা ছবি এঁকে, কিম্বা বই লিখে। তবু সেখানকার আকাশে বাতাসে তাঁর প্রভাব সর্বদা ছড়িয়ে থাকে।

জায়গাটারি মধ্যে একটি জাদু আছে, যে যায় তারি গায়ে তাঁর ছোঁয়া লেগে যায়। রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যাবার আগে একথা অনুভব করেন। অনেকদিন পরে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' নামের ছোট্ট বইখানিতে কবি বলছেন,

'আজ শান্তিনিকেতনে যে অতি প্রাচীন যুগল ছাতিম গাছ মালতীলতায় আচ্ছন্ন, এককালে মস্ত মাঠের মধ্যে ঐ দুটি ছাড়া আর গাছ ছিল না। ঐ গাছতলা ছিল ডাকাতের আড্ডা।...আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবন সিংহের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌঁছেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন করে, এবং রুক্ষ রিক্ত ভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ করে, সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন।'

রবীন্দ্রনাথ যখন খুব ছেলেমানুষ তখন বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিলেন, এসেই তাঁর মনেও সেই ছোঁয়া লেগে গিয়েছিল। পরে তিনি বলছেন,

'সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম—এখানকার

অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তালশ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদ-রূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।'

রবীন্দ্রনাথের নিজের ইস্কুলে যাবার গল্প বেশ ভালো। খুব যখন ছোট, আসলে ইস্কুলে যাবার ঠিক বয়স হয় নি, তখন কেঁদেকেটে ওরিয়েন্টেল সেমিনারিতে গিয়ে ভর্তি হলেন। কারণ ছোড়দা সোমেন্দ্রনাথ আর ভাগ্নে সত্য বয়সে সামান্য বড় হয়েও গাড়ি চেপে ইস্কুলে যাবেন আর উনি বাড়িতে পড়ে থাকবেন, এটা তাঁর সহ্য হোল না। বাড়িতে কারো এ বিষয় উৎসাহ ছিল না, তবু জেদ করে ভর্তি হলেন। বাড়ির মাষ্টারমশাই টেনে এক চড় কসিয়ে বলেছিলেন, এখন যাবার জন্যে যেমন কাঁদছ, এর পরে পালাবার জন্যে তেমনি কাঁদবে!

হলও ঠিক তাই। ছোটবেলায় যতগুলো ইস্কুলে গিয়েছিলেন, প্রত্যেকটিকে অসহ্য মনে হয়েছিল। নানান অছিলায় কামাই করতেন। এমনকি মাঝে মাঝে বাড়ির একজন কর্মচারীকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকতেন। শেষটা গুরুজনরা এবং নিজেও, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

বাড়িতে সারাদিন নানান উপায় বই জোগাড় করে পড়তেন। পড়ার বিরুদ্ধে তাঁর নালিশ ছিল না, তাঁর আপত্তি তখনকার ইস্কুলে পড়ানোর নিয়মটাতে। চারটে দেয়ালের মধ্যে ছেলেকে বন্দী করাতে; কয়েকটা নির্দিষ্ট বই থেকে পাখি-পড়ানোতে; সবাইকে এক ছাঁচে ঢালাই করাতে। অনেক দিন পরে ইস্কুলের বিষয় লিখেছেন, 'ইহা খোপওয়ালা একটা বড় বাক্স। কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রং নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালো মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে, বিদ্যালয় হইতে সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত।...... শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।...অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময় তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।'

এই জন্যে সেকালের পড়ানোর নিয়মের সঙ্গে ছিল তাঁর ঝগড়া। এবং এই জন্যেই ১৯০১ সালে তাঁর বাবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁর নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, অনেকটা পুরাকালের গুরুদের আশ্রমের কথা মনে করে। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী' সেই মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তাদের ছেড়ে না দিলে তাদের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। আরো বিশ্বাস করতেন, গুরুদেরো যোগ্যতা থাকা চাই, শুধু পাশ করলেই হোল না। 'গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, তাহলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। যিনি জাত-শিক্ষক, ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে।'

এমনি করে কয়েকজন দুরন্ত ছেলে আর দেবতুল্য মাষ্টারমশাই নিয়ে কবি তাঁর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। মনে তাঁর কত আশা।

'আমি যে বিদ্যানিকেতনের কল্পনা করেছি, পড়ামুখস্থর কড়া পাহারা ঠেলেঠুলে, তার মধ্যে

পরস্পরের সেবা এবং পরিবেশ রচনার কাজকে প্রধান স্থান দিয়েছি।...ছাত্রদের কর্তৃত্বের অবকাশ দিয়ে অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করব।'

'শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে, এক সুরে।'

'আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারো বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব।'

ঐ আদর্শ সামনে রেখে কবি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর বহু আশা ও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। সত্তর বছর বয়সে লিখছেন,

'প্রণাম করে যাই তাঁকে যিনি সুদীর্ঘ কঠোর দুর্গম পথে আমাকে এতকাল চালনা করে নিয়ে এসেছেন। এই এতকালে সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে। এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসে অদৃশ্য অক্ষরে।'

এক

তোমরা যারা আমার এই লেখা পড়ছ, তারা দেখতে শুনতে, এমন কি কাপড়চোপড়েও আমার মতো হলেও, তাদের সঙ্গে আমার আকাশ পাতাল তফাৎ, কারণ আমি অন্য গ্রহের মানুষ। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, আপাততঃ আমি যেখান থেকেই আসি না কেন, আমার পূর্বপুরুষরা তোমাদের এই পৃথিবীতেই থাকতেন।

গল্পটা গোড়া থেকে না বললে তোমাদের বুঝবার অসুবিধা হবে। আমার নাম প্রশান্তকুমার, আমার বয়েস কুড়ি, আমি ইতিহাসের ছাত্র। আমি ইতিহাসের ছাত্র বটে, তবে ভাবতেও হাসি পায় যে যেখানে আমার জন্ম, সেখানকার লিখিত ইতিহাস মাত্র দুশো বছরের, আর তারই আমি ছাত্র এর আগে এ জগতে মানুষই ছিল না। মানুষরা সেই সুদূর পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর কাটাবার পর, যখন অনিবার্য কারণে পৃথিবীটা একেবারে প্রলয়ের মুখে পড়েছিল, তখন কোনোরকমে প্রাণ বাঁচাবার আশায় পৃথিবী ছেড়ে একটা নতুন গ্রহের দিকে রওনা হয়েছিল। সেই নতুন গ্রহ আমার জন্মস্থান। তার নাম ইরস্।

সবাই মিলে হঠাৎ একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে নি। ঐ যাত্রার আগে কয়েকজন দুঃসাহসী লোক খানকতক ছোট ছোট ব্যোমযানে করে দূর দূরান্তরে মানুষের বসবাসের উপযোগী অন্য সৌর জগতের সন্ধান করে আমার জন্মভূমিকে আবিষ্কার করেন। তাঁদেরই কথার উপর নির্ভর করে, কয়েক লক্ষ লোক তাদের বহু যুগের চেনা পৃথিবীকে ছেড়ে মহাশূন্যে যাত্রা শুরু করেন। তাঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ; নানান্ জাতের, নানান্ ভাষাভাষী, নানান্ মতের লোক ছিলেন তাঁরা; অথচ আমরা মিলে মিশে বেশ আছি।

মহাশূন্যে যাত্রা যে কত বিশ্বাস ও সাহসের কাজ সে আর কি বলব। পথে কত বিপদ, কত বাধা। দলের কয়েকজন বে-পথে পড়ে অন্যদিকে চলে গেলেন, আজ পর্যন্ত তাঁদের কি হল জানা

যায় নি। আমাদের কাছে তাঁরা হারিয়েই গেছেন। আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও যে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল সে তো বোঝাই যাচ্ছে। নতুন জগতে এসে সমস্ত কাজ একেবারে নতুন করে শুরু করতে হয়েছিল; চাষ আবাদ থেকে গ্রাম, সহর, পথঘাট ও ক্রমে ক্রমে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বড় বড় কারখানা, এইসব তৈরী করতেই অনেক বছর কেটে গিয়েছিল। তবে পুরোনো পৃথিবীকে যে সব বিদ্যা শিখতে হাজার হাজার বছর লেগেছিল, আমাদের সে সব জানা ছিল বলে এই দুশো বছরেই সেখানকার সমান হয়ে উঠতে পেরেছি।

তোমাদের পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের খানিকটা বই-পড়া বিদ্যা ছাড়া আর কিছু ছিল না। বইতে পড়েছি যে পুরোনো পৃথিবীটা ইরসের চেয়ে কিছুটা ছোট, তবে অনেক সাদৃশ্যও আছে। আমাদের ইরসের মতো সেটাও একটি সৌরজগতের অন্তর্গত একটা গ্রহ। আমাদের সৌরজগতের পনেরোটি গ্রহের অষ্টমটিতে আমরা থাকি আর তোমরা থাক তোমাদের সৌরজগতের নয়টি গ্রহের মধ্যে তৃতীয়টিতে। আয়তনে আমাদের গ্রহ পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ; তোমাদের জলভাগ স্থলভাগের প্রায় তিনগুণ, আমাদের দ্বিগুণের একটু বেশী।

দুই জায়গার অভিকর্ষ, অর্থাৎ গ্র্যাভিটির জোর প্রায় সমান হওয়াতে এখানে এসে হাঁটা-চলা বা কাজকর্ম করতে কারো কোনো অসুবিধা হয় নি। এখানেও রাত্রের বেগুনি আকাশ তারায় ভরা থাকে, তার মধ্যে একটা ছোট্ট লাল তারা দেখা যায়, সেই হল তোমাদের সাবেক সূর্য। আমাদেরটার চেয়ে সে অনেক ছোট, তবে আমাদের বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে তোমাদের প্রলয়ের আগে তোমাদের সূর্য অনেক বেশী উজ্জ্বল ছিল। আমাদের গ্রহেরও উত্তরদক্ষিণ মেরু অঞ্চল বরফে ঢাকা আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর বিষুবরেখার আশেপাশের অঞ্চলগুলো বেজায় গরম। এখানেও পাহাড় নদী সমুদ্র আছে, পৃথিবীর নানান্ জায়গায় পাহাড় নদী সমুদ্রের নাম অনুসারে তাদের অধিকাংশের নাম রাখা হয়েছে। প্রথম যাঁরা পৃথিবী ছেড়ে এসেছিলেন, তাঁদের নিশ্চয় মন কেমন করত।

এখানেও শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আছে, মঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়, কখনো কখনো ভূমিকম্পও হয়। এখানে সবুজ ঘাস পাতা দেখা যায়, তবে সাবেক পৃথিবীর মতো সবুজের ছড়াছড়ি নেই। এখানকার সবুজে একটু হলদে আর তামাটে রঙের আভাস সব সময় দেখা যায়। বড় তফাতের মধ্যে হল আমাদের রাতের আকাশে দুটি চাঁদ, প্রায় সমান আয়তনের, কিন্তু একটা অন্যটার দ্বিগুণ বেগে চলে। তার ফলে বছরে চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ অনেকবার হয়। সাবেক পৃথিবীর লোকরা অর্থাৎ তোমরা যারা এ গল্প পড়ছ, আমাদের সূর্যকে বল অলটেয়ার (altair) বা aquile।

এবার নিজের কথায় আসা যাক। বলেছি তো আমি ইতিহাসের ছাত্র। এই কলেজে পড়ছি আমরা প্রায় হাজার পাঁচেক ছাত্র। পাঁচ বছরের পড়া, সকলকেই এই পাঁচটি বছর বাড়ি ছেড়ে ছাত্রাবাসে থাকতে হয়। বছরে একবার মাস দেড়েকের ছুটি থাকে, তখন যে যার বাড়ি যেতে পারে। এইরকম আবাসিক কলেজ এখানে আরো কুড়ি বাইশটা আছে, দূরে দূরে নানান্ জায়গায় ছড়ানো, যাতে ছাত্রদের বাড়ি ছেড়ে খুব বেশি দূরে যেতে না হয়। তাছাড়া আরো ছোটখাটো ছুটিও আছে।

তবে সে সময় কেউ বাড়ি যায় না, কখনো কখনো এই সময় নিজেদের নিজেদের পাঠ্য বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানের ছাত্ররা ও আমরা আলোচনা করে থাকি। এমন কি মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে বড় বড় কারখানা ঘুরে সেখানকার কাজ শুরু থেকে শেষ অবধি দেখি।

নানা রকমের ছাত্রাবাস, কোনটা বিজ্ঞানের ছাত্রদের, কোনটা সাহিত্য বা কলাবিভাগের আবার কোথাও হয়তো সবাই মিলেমিশে থাকে। আমি নিজে এই রকম একটা হোস্টেলে থাকি। মেয়েরাও তাদের নিজেদের ছাত্রাবাসে থাকে, পড়াশুনা এক সঙ্গেই হয়।

একটা ঘরে আমরা দুজন থাকি, আমি আর একজন পদার্থবিদ্যার ছাত্র, আমার বিশেষ বন্ধু মরিশ। পাশের ঘরেই আমাদের আর দুজন বন্ধু থাকে, চিয়েন, আর ফিসার। ফিসার রসায়নের ছাত্র, চিয়েন নামেই সাহিত্যের ছাত্র, আসলে সে ছেড়ে আসা পৃথিবীর কয়েকটা ভাষার খুব অনুরক্ত, সেগুলো নিয়েই সে অল্প-বিস্তর চর্চা করে। ছোটখাটো ছুটিতে যখন দল বেঁধে বেরোনো হয়, আমরা চারজন একসঙ্গে থাকি। আমাদের নামগুলো শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ পৃথিবীর কোন জায়গায় আমাদের পূর্ব-পুরুষরা বাস করতেন।

চিয়েন সত্যিই পৃথিবীর বেশ কয়েকটা ভাষা শিখেছে, ওর পাল্লায় পড়ে আমিও গোটা দুই শিখে ফেলেছি।

এইখানে বলে রাখা দরকার যে যদিও আমাদের এখানে পৃথিবীর অনেকগুলো ভাষার চল আছে, তবু গোড়ার দিকে সবাই খুব ঘনিষ্ঠভাবে থাকত বলে এই দু'শো বছরে ভাষাগুলোর অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। লেখা অক্ষর এখানে সব ভাষার এক। তোমাদের পৃথিবীর মতো প্রত্যেক ভাষার আলাদা অক্ষরমালা নেই। কাজেই সকলে সকলের ভাষা পড়তে তো পারেই, এমন কি চলনসই গোছের বুঝতে ও বলতেও পারে।

আমরা চার বন্ধুই খেলাধুলোয় মজবুত। মরিশ কলেজ টিমের সেরা গোলকিপার, প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া চেহারা আর সেই রকম গায়ের জোর। তাছাড়া ও হল আমাদের কলেজের কুস্তির চ্যাম্পিয়ন। চিয়েন চমৎকার দৌড়য়, লম্বা দৌড় ও এক রকম একচেটিয়া করে ফেলেছে। ফিসার আর আমি লং জাম্পে ভালো, ফিসার খাসা হাই জাম্পও দেয়, কলেজে ওর ধারে কাছে কেউ নেই। আমাদের সকলের বয়স কুড়ি বাইশের মধ্যে। এই আমাদের কলেজ জীবনের শেষ বছর, তার পর ছাড়াছাড়ি হয়ে কে কোথায় চলে যাব তার ঠিক নেই। কারো বাড়ি খুব কাছাকাছি নয়, অন্যদের তুলনায় চিয়েন আর আমিই যা কাছে থাকি; আমার বাড়ি তাকালক সহরে, ও থাকে ওচাংহোতে, আমাদের বাড়ি থেকে ১৫০০ মাইল পুবে। তবে আমাদের এখানে চমৎকার যানবাহনের ব্যবস্থা থাকাতে পাঁচ ছয় ঘণ্টায় আমি ওর বাড়িতে পৌঁছতে পারি।

আমরা দুজনে গরম দেশের লোক, আমার দেশটা বিষুবরেখার একটু দক্ষিণে, মরিশ আর ফিসারের বাড়ি তার অনেকখানি উত্তরে। মরিশ থাকে ইয়র্ক শহরে, আমার বাড়ি থেকে প্রায় ৫৫০০ মাইল উত্তরপশ্চিমে। ফিসারের বাড়ি বাডেনে, ইয়র্কের উত্তরপূর্ব দিকে প্রায় ৭৫০০

মাইল দূরে, ওচাংহোর ৯০০০ মাইল উত্তরে। ওদের দেশ ঠাণ্ডা, ফিসারের দেশে তো রীতিমতো শীত।

কলেজের পরে কে কি করব তাই নিয়ে আমাদের অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়। চিয়েনের আর আমার ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছা। তাই নিয়ে মরিশ আর ফিসার ঠাট্টা করে বলে, দু'শো বছরের ইতিহাস, তাই নিয়ে আবার গবেষণা! তবে ওরা জানে আমরা আসলে কি বলতে চাই।

আমাদের লাইব্রেরির বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে গোটা দুই পুরোনো বই পেয়েছিলাম, কেন যে সেগুলোকে কেউ ভালো করে পড়েনি তা ভেবে পেলাম না। একটা বইয়ে ছেড়ে-আসা পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে, সেখানকার ভূগোল, মানচিত্র, অধিবাসীদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে নানান খবর। অন্য বইটা আরো চমৎকার—দুশো বছর আগেকার পৃথিবীতে সেই প্রলয়ের কথা, সেখান থেকে চলে এখানে এসে প্রথম বসতি করার কথা। সাধারণ ভাবে এ সমস্তই আমাদের সকলের জানা থাকলেও, বইখানা হল শূন্য-যাত্রীদের একজনের রোজ-নামচার টুকরো, কাজেই খুবই চিত্তাকর্ষক। এই বই দুটো নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হত।

আমাদের নিজেদের বাড়িতেও তখনকার বিষয় কিছু খবর জানা ছিল। প্রলয়ের সময় পৃথিবী ছেড়ে চলে আসবার জন্যে যখন লোক বাছাই হচ্ছিল, তখন তাঁদের সকলেই চলে আসেন নি। আমার একজন পূর্বপুরুষ, আরো কয়েকজন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছা করেই সেখানে থেকে যান। অথচ একরকম বলতে গেলে তিনিই সবার আগে আসন্ন প্রলয়ের কথা জানতে পেরে সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এমন কি, যাঁরা চলে আসবেন তাঁদের দলপতি হিসাবে তাঁকেই নির্বাচিত করা হয়েছিল। তবু তিনি আসেন নি এবং সে জন্যে মনে মনে আমার বেশ খানিকটা গর্ব ছিল আর ব্যাপারটা নিয়ে দুচারজনের কাছে যে বড়াই করি নি, তাও নয়।

দুই

মরিশের দাদা হ্যারিশ আমাদের থেকে একটু বড়। আমরা যে বছর কলেজে ঢুকলাম, সেই বছর সে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করল। এতদিনে সে বেশ নাম করেছে, এখানকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সোমোরেণের সঙ্গে কি একটা নিয়ে গবেষণা করছে। মরিশ একদিন হঠাৎ বলে বসল, "দাদার চিঠিতে জানলাম যে প্রফেসার আর তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে সেও চলেছে উত্তর পুব অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অভিযানে।"

ঐ উত্তরপুব অঞ্চলটি ভারি চিত্তাকর্ষক। ঐখানেই সাবেক পৃথিবী থেকে আগত প্রথম কয়েক দল লোক তাঁদের অদ্ভুত আকারের আকাশ-যান থেকে এখানকার মাটিতে নেমেছিলেন।

অবিশ্যি শুধু এক জায়গাতেই নয়, নানান্ জায়গায় তাঁরা নেমেছিলেন। শোনা যায় এখানে নামবার আগে আমাদের এই সৌরজগতেরই অন্যান্য কয়েকটা গ্রহে নেমে সেগুলিকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য মনে হওয়াতে, শেষ পর্যন্ত এটাকেই পরীক্ষা করতে আসেন।

প্রথমে হাজার পাঁচেক লোক ছোট ছোট যানে করে নামলেন, দলের বাকি সকলে তখনো বড় বড় যানগুলোতে করে চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। মাসখানেক ঘোরাঘুরির পর এঁদের কাছ থেকে সঙ্কেত পেয়ে তবে তাঁরা সকলে নেমে আসেন। আজ পর্যন্ত ঐ সব অঞ্চলে তাঁদের অনেকগুলো আকাশযান পড়ে আছে, কিছু নষ্ট হয়েছে বলেও মনে হয় না, তবে সেগুলো আর মহাশূন্যে যাতায়াত করে না।

তার প্রধান কারণ হল যে ইন্ধনের সাহায্যে ওগুলো চলত, এখানে তার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় নি। পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল আসার পরেও যেটুকু ইন্ধন বেঁচেছিল, তার কিছুটা নিয়ে অতি দরকারী কয়েকটি যন্ত্র চালানো হচ্ছে আর বাদবাকি মজুৎ রাখা হয়েছে।

গোড়ায় এখানে পথঘাট কিছুই ছিল না, তখন দেশটিকে ভালো করে জরীপ করার জন্যে, কয়েকটি যান ব্যবহার করতে হয়েছিল, তাতেও বেশ খানিকটা ইন্ধন খরচ হয়ে গিয়েছিল। পরে এখানে ভালো করে বসবাস শুরু হলে, কয়েকটা যানকে এখানকার ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরী করে নেওয়া হয়েছিল। এখনো আমরা তার দুটি যান করে এই সৌরজগতের অন্যান্য দু একটা গ্রহে গিয়ে দরকারী জিনিষপত্র নিয়ে আসি।

পরে অবিশ্যি এখানকার যুগ্যি অনেক ছোটো ছোটো যান তৈরী হয়েছে, সেগুলোকে জলেই বল আর আকাশে বা মাটিতে বল, যখন যেমন দরকার সেইভাবে চালানো যায়। এগুলো কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়, দরকার মতো এখানকার যৌথ-কারবার থেকে ব্যবস্থা করা যায়।

এক সহর থেকে অন্য সহরে যাবার বাঁধা বন্দোবস্ত আছে, ইচ্ছা হলে একলা কিম্বা দল বেঁধে এদিক ওদিক ঘোরা যায়। এত রকম কাজে ব্যস্ত থাকাতে পুরোনো যানগুলির কতক কতক আজও নানান জায়গায় পড়ে আছে, সেগুলোকে সারিয়ে নিয়ে আবার মহাশূন্যে পাড়ি দেবার চেষ্টা করার সময় বা ইচ্ছা কারো তেমন হয় নি। তবে বছর কুড়ি ধরে কোনো বৈজ্ঞানিক এগুলো নিয়ে একটু আধটু চর্চা করছেন, তাও এক রকম সখের চর্চাও বলা চলে।

বছর পাঁচেক আগে এনরিক নামে একজন অল্পবয়সী ইঞ্জিনিয়ারি এই রকম একটা আকাশযানে ঢুকে সম্ভবত: এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সেটাকে চালিয়ে দেন। কেউ কিছু টের পাবার আগেই যানটি ভীষণ বেগে আকাশে উঠে যায়, আবার একটু বাদেই ওটাকে তেমনি প্রচণ্ড বেগে একেবারে সমুদ্রের মাঝখানে পড়তে দেখা যায়। তীর থেকে অমনি আরেকটি যানে কয়েকজন লোক ছুটে যায়, যানটি তখন ডুবুডুবু, কোনো মতে অজ্ঞান এনরিককে টেনে বের করতে না করতে গেলও ডুবে।

রক্ষাকারীরাও অনেক কষ্টে বেঁচে এসে, এনরিককে হাসপাতালে নিয়ে গেল, নিদারুণভাবে আহত। অনেক দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল সে, প্রায় শেষ মুহূর্তে একটু জ্ঞান হয়েছিল, বার দুই বলল—

'লাল হাতল, সাবধান।' একবার বলল—'তিন নম্বর'। ব্যস্, সব শেষ। এই তো গেল আগেকার কথা।

চিঠি পাবার কিছু দিন বাদে মরিশের কাছে শুনলাম প্রফেসর সোমোরেণরা হ্যারিশকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন। আমাদেরও কলেজ জীবন শেষ হয়ে এসেছে, পরীক্ষার আর মাস তিনেক বাকি। এমনি সময় চিয়েন হঠাৎ মরিশকে বলল—'একটা কাজ কর দিকিনি, তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠাও, পরীক্ষার পর আমরা চারজন যদি কিছু দিনের মতো ওদের ওখানে যাই, প্রফেসারের কি আপত্তি হবে ? আমরা ওঁদের কথা মতো চলব এটা বলা বাহুল্য। এক সঙ্গে বেড়াতে যাবার এমন সুযোগ আমাদের চারজনের আর হয়তো হবে না।'

পরীক্ষা শেষ হবার দিন দশেক আগে চিঠির উত্তর এল, প্রফেসারের কোনোই আপত্তি নেই। সেই সঙ্গে হ্যারিশ তাদের দরকারী নিজিষপত্রের লম্বা এক ফর্দ পাঠিয়েছে, সে সব আমাদের নিয়ে যেতে হবে। তখন আমাদের ফুর্তি দেখে কে! ইতিমধ্যে যে যার বাড়িতে চিঠি লিখে ক্যাম্পে যাবার আর প্রফেসার রাজী হলে তাঁদের অভিযানে যোগ দেবার অনুমতি আনিয়ে রেখেছিলাম।

তারপর একদিন পরীক্ষাও শেষ হল, জিনিষপত্র কেনাকাটা হল। কলেজের অধ্যাপকরা ব্যাপার শুনে খুব উৎসাহ দিলেন, অনেকে এই বলে আক্ষেপও করলেন যে বয়স গেছে তাই সঙ্গে যেতে পারছেন না। একজন অবিশ্যি একটু ঠাট্টার ছলে একথাও বললেন—'এইবার আর কি চাই, চারজন জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়! প্রশান্ত চিয়েন তো পুরোনো পৃথিবীর অনেক ভাষাই শিখেছ, এবার সে বিদ্যেটা কাজে লাগাও।' হোস্টেল বন্ধ হবার পর দিন জিনিষপত্রের পাহাড় নিয়ে আমরা সত্যি সত্যি রওনা হয়ে পড়লাম। [ক্রমশ

নতুন ও পুরনো ছড়া

সব দেশে সব কালেই ছোট্টদের কাছে ছড়ার আদর আছে ; পুরনো রূপকথায়ও দেখা যায় গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ছড়া ! আমাদের দেশেও কত রকমের ছড়া যে আছে তার লেখাযোখা নেই। কে সে সব ছড়া লিখেছিল, কবে ও কোথায় লিখেছিল লোকে সে কথা ভুলে গেছে, তবু মুখে মুখে ছড়াগুলি চলে এসেছে ; তাদের কেউ ভুলতে পারে নি।

সেই রকম একটি পুরোনো ছড়া এবার ছাপা হল। সেই সঙ্গে কয়েকটি নতুন ছড়াও দিলাম।

স—স।

পুরোনো ছড়া

সংকলক : শ্রীঅরুণকুমার চৌধুরী

বকুল ফুল কুড়োতে গেলাম পেয়ে এলাম মালা,
কি সুন্দর দেখে এলাম তুলোরামের খেলা।
নাচোরে তুলোরাম ক্যাঁকাল বেঁকিয়ে
চালভাজা খেতে দিব চাল মড়মড়িয়ে,
চালভাজা খেতে খেতে গলা হল কাঠ,
কোন পুকুরের জল খাবো চিৎপুরের মাঠ।

মধুমতীর পাড়েরে উড়োলিয়া কোতোরই

চিৎপুরের মাঠ নালো পাক্কা দোমনা,
তিনটে ছোঁড়া গরু তাড়ায় গামছা মুড়ি দিয়া।
তার মাকে নিয়ে গেল খুড্ডুম বাজিয়ে,
মাসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন উত্তরে বসিয়ে।
রাম শালিকের মা কাঁদেন শিঙায় বসিয়ে।
শিঙায় বলে রাম রাম ডম্বুরে বলে হরি,
আরনা যাবনা মোরা খুকুমণির বাড়ি।
খুকুমণির বাড়িরে, দুই গাছি তার,
তার বেয়ে যাবো মোরা, পদ্মাবতীর পাড়।
পদ্মাবতীর পাড়েরে, ঝাঁকে ঝাঁকে পুঁটি,
শতাশতি টাকা থলে দর করে উঠি।
ঘোড়া তুই ধান খাবি না চাল খাবি না
খাবি ভাঙের লাড়ু,
দুই হাত ভরিয়া দিব, সুবর্ণের খাড়ু।
সুবর্ণের খাড়ু নালো বনগাছি তার,
অমনে অমনে যাবো মোরা মধুমতীর পাড়।
মধুমতীর পাড়েরে উড়োলিয়া কোতোরই,
ধরে ধরে রাখেরে খোপের ভিতরই।

খুড্ডুম—মাটির সরার উপর ব্যাঙের চামড়া ঢাকা এক প্রকার বাজনা বিশেষ।
খাড়ু—পূর্ববঙ্গে একপ্রকার রূপার অলঙ্কার পায়ে ব্যবহৃত হইত, যাহা খাড়ু বলিয়া পরিচিত।
কোতোরই—পূর্ববঙ্গে পায়রাকে কোতোরই নামে অভিহিত করা হয়।
উড়োলিয়া কোতোরই—যে পায়রা উড়িয়া যায়।

বক বন্দি

অজয় গুপ্ত

চিংড়ী মাছের কালিয়া
কাঁসার থালায় ঢালিয়া,
খাচ্ছিল এক বকের জামাই আরাম করে খুব।
তাই না দেখে পানকৌড়ির তিন দিনের এক ছানা—
শুনলো না তো মানা,
ঝাপুস্ ঝুপুস্ দশটা দিল ডুব।

সর্দিতে নাক বন্ধ,
পায়না কোনো গন্ধ—
কাঁপন দিয়ে জ্বর এসে যায় একশত ছয় ডিগ্রী,
ব্যাঙের বদ্যি খবর পেয়ে থার্মোমিটার দিয়ে,
টেম্পারেচার নিয়ে—
চেঁচিয়ে বলে, 'বরফ খান শিগ্‌গ্রী!'
খাওয়ার পরে খোশ্‌মেজাজ্‌
জামাই বলে, 'আসছি আজ।'
চল্‌তে গিয়ে হট্টগোলে পথে পড়ল থেমে।
সব শুনে সে ব্যাঙের থেকে থার্মোমিটার নিয়ে,
একটা ঝাড়ন দিয়ে—
বললে, 'দেখ জ্বর গিয়েছে নেমে!'
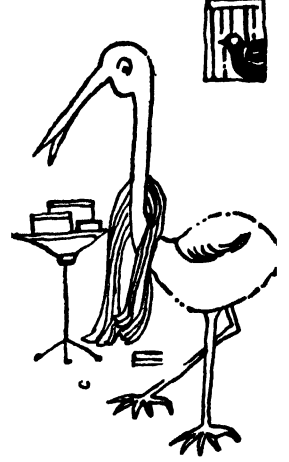
খাচ্ছিল এক বকের জামাই·

খাল-পোলে পাজি বুড়ো

শচীন মিত্র

বিদ্‌কুটে পাজি বুড়ো খোঁজে ছুতো
কেউ একা পথে গেলে ভোঁদা, ভুতো
খপ্‌ক'রে তা'কে ধ'রে দেবে গুঁতো
দুইকানে বেঁধে টানে ফালি-সুতো॥

খরখরে দাড়ি দিয়ে ঘসে ঘাড়ে
ফুঁ-দিয়ে মাথাটাকে নাড়ে-চাড়ে
ভেল্কি' যে খেলে বুড়ো রোগা-হাড়ে
মার-প্যাঁচে কাবু ক'রে তবে ছাড়ে॥

খাল-পোলে বসে বুড়ো দুপুরেতে
অল্পেতে টেকো মাথা ওঠে তেতে
কাণ্ড যে ক'রে ফ্যালে কত এতে
তাই যেতে মানা করি ওখানেতে॥

বিদ্‌কুটে পাজী বুড়ো···

হাঁসের ছানা

গোবিন্দ প্রসাদ বসু

হাঁসের ছানা, হাঁসের ছানা
তাল পুকুরের জলে
তর্‌তরিয়ে সাঁতার কাটিস্
বল্‌না কী কৌশলে ?

ডিগ্‌বাজি খাস্, লাফাস্-ঝাঁপাস্
কায়দা দেখাস্ নানা ;
গুগ্‌লি-ঝিনুক তুলিস্ ডুবে,
শুক্‌নো তবু ডানা !
পুকুর-দিঘি-ডোবায় এতো
করিস্ নাচা-নাচি—
একটি দিনের তরেও কি তোর
হয়না কাসি-হাঁচি ?

পুকুর ধারে যাওয়া আমার
একেবারে মানা !
আমায় যদি একটু শেখাস্
সাঁতার হাঁসের ছানা ॥

একটি দিনের তরেও কি তোর
হয়না কাসি-হাঁচি ?

ছড়া

আশানন্দন চট্টরাজ

হাতীর ঘরে কাকের বাসা
তাতেও আবার ময়দা ঠাসা
ময়দাগুলো ময়দানে
মই দিয়েছে কার ধানে ?
ধান কে বলে ? সোনার ফুল।
মায়ের কানে দোদুল দুল।
দুলের উপর পঙ্গোপাল
তেরে খেটে ধ্যাক্ দিচ্ছে তাল।
তাল্, তাল্, তাল্, তালিম্‌পুর
পিসির ঘরে আখের গুড়
গুড়ের ভেতর চাম্‌চিকে,
মাইনে যে তার পাঁচসিকে।

পিসীর ঘরে আখের গুড়
গুড়ের ভিতর চামচিকে

•গায়ে তোমার নেইক কেন চাদর

ছড়া

অমিতাভ গুপ্ত

বাঘ বাঘ বাঘ
খাঁচায় বসে মিছিমিছি দেখাও কেন রাগ ?
উট উট উট
লম্বা লম্বা পায়ে অত লাগাও কেন ছুট ?
বাঁদর বাঁদর বাঁদর
এত শীতেও গায়ে তোমার নেইকো কেন চাদর ?
গাধা গাধা গাধা
বোকা হলেও কি হবে গো, মনটি তোমার সাদা।
হাতী হাতী হাতী
আমি নাতি আমার দাতুর, তুমি কাহার নাতি ?

ছড়া

আশানন্দন চট্টরাজ

শালের বনে, তালের খুঁটি,
বস্‌লো তাতে মোরগ দু'টি।
মোরগ দু'টি নূপুর পায়,
কেবল নাচে গাছের-ছায়।
গাছের ছায়া, আকাশ-তল
ময়নামতী নদীর জল,
নদীর জলে বোয়াল মাছ
চশমা চোখে কুড়ায় কাঁচ।
কাঁচের বাটি, •জলের জগ
উটের পিঠে টিনের মগ।
টিনের মগে, সবুজ রঙ্‌
রঙ্‌ মেখে চ কালিম্‌পঙ্‌
কালিম্‌-পঙে শুধুই হিম্‌,
বিড়াল বলে, ঘোড়ার ডিম্‌।

…বসল তাতে মোরগ দুটি

রাজা-রাণী-চাকর সংবাদ

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছিল রাজা।

রাজা বলেন বাবাজীবন

খাজা খেলাম সারা জীবন

ছুটি বাদাম ভাজা দিয়ে এখন

প্রাণটা আমার বাঁচা

রাজা বলেন বাবাজীবন·

এ যে ছিল রাণী।

রাণী বলেন এই চেহারায়

জল খেয়ে কি প্রাণ রাখা যায়?

শুধু পানির কথা তুলে আমার

কোরো না মানহানি।

এক যে ছিল চাকর।

চাকর বলেন রথের মেলায়

পাঁপর খেয়ে যাই কলেরায়

রাজা ফাঁপর দেখে বসিয়ে দিলেন

বাদশাহী এক চাপড়

সগর রাজার কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়

ইক্ষ্বাকু বংশে সগর নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায় বীরত্বে, তাঁহার সমান আর সেকালে কোন রাজাই ছিলেন না। সকল বিষয়েই তিনি সুখী ছিলেন, কেবল এক বিষয়ে তাঁহার বড়ই দুঃখ ছিল ; তাঁহার পুত্র ছিল না। পুত্র লাভের জন্য তিনি তাঁহার বৈদর্ভী এবং শৈব্যা নাম্নী দুই রাণীকে লইয়া কৈলাস পর্বতে গিয়া কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে, শিব রাজার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি কী চাহ।'

রাজা ভক্তিভরে শিবকে প্রণাম করিয়া, যোড়হাতে বলিলেন, 'ভগবান্, আমার পুত্র নাই। আমার মৃত্যুর পর আমার বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিবার লোক থাকিবে না ; আমার বংশ লোপ হইয়া যাইবে। সুতরাং, যদি আমার প্রতি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া, যাহাতে আমার পুত্র হয়, এমন বর দি'ন।

শিব কহিলেন, 'মহারাজ, তোমার এক রাণীর ষাট হাজার পুত্র হইবে, কিন্তু তাহারা সকলেই এক সঙ্গে মরিয়া যাইবে। আর এক রাণীর একটি পুত্র হইবে, সেই তোমার বংশ রক্ষা করিবে।'

এই বলিয়া শিব আকাশে মিলাইয়া গেলেন, রাজাও আনন্দের সহিত রাণীদিগকে লইয়া দেশে ফিরিলেন।

কিছুদিন পরে বৈদর্ভীর ষাট হাজারটি আর শৈব্যার একটি পুত্র হইল। বৈদর্ভীর ষাট হাজার পুত্র জন্মিবার সময় বড়ই আশ্চর্য ঘটনা হয়। ছেলেগুলি একটা লাউয়ের ভিতরে ছিল। লাউ দেখিয়া রাজা তাহা ফেলিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এমন সময় আকাশ হইতে কে যেন অতি গভীর স্বরে বলিল, 'মহারাজ, ওটাকে ফেলিয়া দিও না, উহার ভিতরেই তোমার ষাট হাজার পুত্র আছে। উহার ষাট হাজারটি বীচিকে ঘৃতের কলসির ভিতরে রাখিয়া দাও, দেখিবে, তোমার ষাট হাজার পুত্র হইবে।'

সুতরাং রাজা আর লাউটি ফেলিয়া না দিয়া উহার বীচিগুলি ঘীয়ের ভিতরে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে অনেকদিন পরে, সেই বীচির ভিতর হইতে ষাট হাজারটি সুন্দর খোকা বাহির হইল। সেই খোকাগুলি বড় হইয়া ষাট হাজারটা অসুরের মতন গোঁয়ার গুণ্ডা হইল। তাহাদের জ্বালায় মানুষের কথা আর কি বলিব,—দেবতা গন্ধর্ব পর্যন্ত সুস্থির হইয়া বসিতে পাইত না।

শেষে সকলে ইহাদের দৌরাত্মে জ্বালাতন হইয়া, ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিল, 'ভগবান্, আর তো পারি না। ইহাদের দৌরাত্ম নিবারণের একটা উপায় করুন!'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'তোমাদের কোন চিন্তা নাই আর অতি অল্পদিনের ভিতরেই ইহারা নিজের স্বভাব দোষে নষ্ট হইবে।'

এ কথায় সকলে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, ব্রহ্মাকে প্রণাম পূর্বক যে যাহার ঘরে ফিরিল।

তারপর একবার সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের ঘোড়ার রক্ষক হইল ঐ ষাট হাজার রাজপুত্র। তাহারা দিনকতক তাহাকে দেশে দেশে তাড়াইয়া ফিরিলে সে শুক্‌নো সাগরের বালির উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ কোথায় যে চলিয়া গেল, রাজপুত্রেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন তাহারা দেশে ফিরিয়া তাহাদের পিতাকে বলিল যে, 'বাবা, সর্বনাশ তো হইয়াছে; ঘোড়া হারাইয়া গিয়াছে!'

এ কথা শুনিয়া সগর বলিলেন, 'তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে খুব ভাল করিয়া খোঁজ।'

তখন রাজপুত্রেরা আবার ঘোড়া খুঁজিতে বাহির হইল, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। সুতরাং তাহারা আবার তাহাদের পিতার নিকট আসিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, 'বাবা, আমরা সহর, বাজার, পাহাড়, পর্বত, বন, বাদাড়, কিছুই বাকি রাখি নাই। কিন্তু ঘোড়া তো কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না!'

এ কথায় সগর রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, 'দূর হ তোরা এখান হইতে! ঘোড়া না লইয়া তোরা আর দেশে মুখ দেখাইতে পারিবি না।'

সুতরাং আবার ষাট হাজার ভাই ঘোড়ার সন্ধানে বাহির হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা আবার সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তাহার এক জায়গায় একটা গভীর গর্ত রহিয়াছে। তখন ষাট হাজার ভাই, ষাট হাজার কোদাল লইয়া, সেই গর্তের চারিধার খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অনেক খুঁড়িয়াও তাহারা সেই সর্বনেশে গর্তের তলা পাইল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর চলিয়া গেল, তথাপি সেই গর্তের ভিতরে উঁকি মারিলে, যেমন অন্ধকার ছিল, তেমনই অন্ধকার দেখা যায়।

ইহাতে তাহারা রাগের ভরে আরো বেশী করিয়া খুঁড়িতে লাগিল। গর্ত যতই অন্ধকার দেখা যায়, তাহারা ততই খালি বলে, 'খোঁড়্, খোঁড়্, খোঁড়্, খোঁড়্!' এমনি করিয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহারা একেবারে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইল! পাতালে গিয়াই তাহারা দেখিল যে, সেখানে কপিল মুনি বসিয়া আছেন, আর ঘোড়াটি তাঁহার কাছেই ঘাস খাইতেছে। ঘোড়া দেখিয়া আর কি তাহারা স্থির থাকিতে পারে? তখন কপিল যে সেখানে বসিয়া আছেন তাহা যেন তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। কপিলকে অগ্রাহ্য করিয়াই তাহারা ঘোড়া ধরিতে ছুটিয়া চলিল।

ইহাতে কপিল রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দুই চক্ষু লাল করিয়া, ভীষণ ভ্রূকুটির সহিত উহাদিগের পানে তাকাইবামাত্র, সেই ষাট হাজার রাজপুত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

যখন এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়, তখন নারদমুনি সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। তিনিই রাজপুত্রগণের মৃত্যুর সংবাদ সগরকে শুনান। পুত্রদিগের মৃত্যুর কথা শুনিয়া, সগর দুঃখে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর নিজের নাতি অংশুমানকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন যে, 'এখন তুমি ঘোড়া না আনিতে পারিলে তো আর উপায় দেখি না।'

শৈব্যার যে একটি পুত্র হয়, তাহার নাম ছিল অসমঞ্জা। অসমঞ্জা এমনই দুষ্ট ছিল যে, সে ছোট

ছোট ছেলে পিলের গলায় ধরিয়া তাহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিত। তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া সকলে সগরের নিকট নালিশ করাতে, তিনি তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অংশুমান সেই অসমঞ্জার পুত্র।

সগরের কথায় অংশুমান সেই গর্তের ভিতর দিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন। কপিল তখনও সেখানে বসিয়াছিলেন, আর ঘোড়াটাও তাহার কাছে ছিল। অংশুমান মুনিকে দেখিবামাত্র ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করাতে, মুনি তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিগেন, 'বাঃ বেশ তো ছেলেটি। তুমি কি চাও বৎস?'

অংশুমান যোড়হাতে বলিলেন, 'ভগবান, আপনি দয়া করিয়া ঘোড়াটি আমাকে দিলে আমাদের যজ্ঞ শেষ হইতে পারে।'

মুনি বলিলেন, 'বটে? তোমাদের যজ্ঞের ঘোড়া? এখনি তুমি ওটাকে নিয়া যাও। তোমার আর কিছু চাই?'

অংশুমান যোড়হাতে বলিলেন, 'ভগবান্ দয়া করিয়া যদি আমার খুড়া মহাশয়দিগকে উদ্ধার করিয়া দেন, তবে বড় ভাল হয়।'

মুনি বলিলেন, 'তুমি যখন চাহিতেছ, তখন তাহাও হইবে। কিন্তু সে এখন নহে, আর তাহা এত সহজে হইবে না। তোমার যে নাতি হইবে, সে মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া, তাঁহার সাহায্যে, গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে লইয়া আসিবে। সেই স্বর্গের নদী গঙ্গার জল লাগিলে তোমার খুড়োগণ উদ্ধার পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন শীঘ্র ঘোড়া লইয়া দেশে গিয়া, যজ্ঞ শেষ কর। তোমার মঙ্গল হউক।'

এইরূপে অংশুমান ঘোড়া লইয়া দেশে ফিরিলে, সগরের অশ্বমেধ শেষ হইল।

অংশুমানের পুত্র দিলীপ, গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। তারপর তাহার পুত্র পরম ধার্মিক এবং সত্যবাদী মহারাজ ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিলেন।

ফুলমালাকে—

বাণী রায়

(চিড়িয়াখানার হাতি ফুলমালার ক্ষেপে ওঠার সময়ে)

হাতি ! তুমি ক্ষেপলে কেন, বল ফুলমালা ?
জু-গার্ডেনের মনমোহিনী,
পড়ছে তোমায় মনে,
পয়সা দিয়ে আসন কিনি
হতাম রাজবালা।
কুলোর মত কান—
হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা হ'ত প্রাণ।
হঠাৎ তুমি ঘটাও পরমাদ
শুঁড়ের ঘায়ে মাহুত মেরে'
এলে তুমি তেড়ে,
বল, একি জ্বালা !
ক্ষেপলে কেন, বল ফুলমালা ?
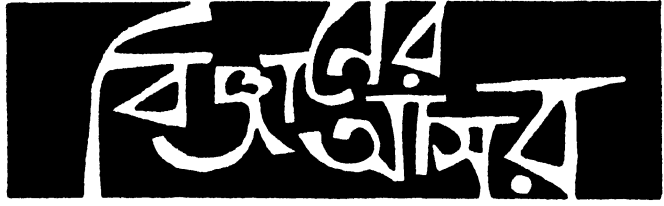
কয়লার কথা

—মানস কুমার নস্কর

আমরা সকলেই কয়লা ব্যবহার করি। রান্নার উনানে, রেলগাড়ির ইঞ্জিনে, নদী ও সমুদ্রে স্টীমার আর জাহাজ চালাতে এবং অসংখ্য কলকারখানায় এই কয়লার ব্যবহার হয়। বলতে গেলে কয়লাই জাতির মেরুদণ্ড।

এই কয়লার জন্ম গাছপালা থেকে। প্রাচীনকালে গণ্ডোয়ানা যুগে প্রায় ২০০ হতে ৩০০ কোটি বছর আগে, জঙ্গলগুলি নদীগর্ভে ডুবে যায়। তারপর বন্যার জল বা নদীর জলের স্রোতের সঙ্গে এইসব গাছপালা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভেসে যেতে যেতে যেখানে নিচু জায়গা পায় সেখানে জমা হয়, আবার ঐ জলের টানে বালি আর পলিমাটিও এসে সেখানে পড়তে থাকে।

কয়েক লক্ষ বছর পর গাছপালাগুমি প্রথমে পীট (Peat), পীট থেকে লিগনাইট (Lignite) এবং লিগনাইট থেকে আস্তে আস্তে কয়লায় পরিণত হয়। গণ্ডোয়ানা যুগে কয়লার সৃষ্টি হবার সাথে সাথে ভূগর্ভে চ্যুতি ঘটে। ফলে স্তরগুলি ক্রমাগত নিচে নেমে যায়।

প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে এই গণ্ডোয়ানা যুগেই ডাইনোসর নামে বিরাট আকারের একপ্রকার প্রাণী বাস করতো। শরীরের তুলনায় মস্তকটি অনেকাংশে ক্ষুদ্র হওয়ায় ও প্রচণ্ড শৈত্যের ফলে এরা মেসোজোয়িক যুগের শেষভাগে—এখন থেকে প্রায় ২০০ কোটি বছর আগে, বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কয়লা তোলা হয় খনি থেকে কিংবা যদি স্তরটি অগভীর হয় পৃথিবীর উপরের আচ্ছাদন ভেদ করে। সাধারণতঃ কয়লা মাটির অনেক নিচে থাকে। এজন্য কর্মীদের যাতায়াত ও কয়লা তোলার জন্য মাটির নিচে অনেক দূর পর্য্যন্ত খোঁড়ার দরকার হয়। পায়ে হেঁটে এত নিচে যাতায়াত করা এবং সেখান থেকে কয়লা তুলে নিয়ে আসা বেশ কষ্টকর। এজন্য শ্যাফট্ (Shaft) বা গোলাকৃতি গভীর কূয়া খুঁড়তে হয়। কয়লাখনির কাছে গেলেই দেখা যায় কতকগুলি লোহার তৈরী উঁচু উঁচু মিনারের মত জিনিষ। তার উপর চাকা ঘুরতে দেখা যায়। মাটির নিচে যেখানে কয়লা পাওয়া যায় সে পর্যন্ত বিরাট আকারের কূয়া খোঁড়া হয়। কয়লার স্তরের চারিপাশ কেটে কয়লা বের করা হয়। অবশ্য মধ্যে মধ্যে বিরাট আকারের থাম রাখতে হয়, নয়তো ফাঁকা জায়গায় উপরের স্তর ধ্বসে পড়তে পারে। এর ফলে কেবল যে খনিরই ক্ষতি হয় তাই নয়, বহু শ্রমিকও চাপা পড়ে মারা যেতে পারে। যেখানে কূয়া খোঁড়া আছে সেই কূয়ার মধ্য দিয়ে 'লিফ্ট' (Lift) করে লোকজন খনিতে ওঠানামা করে; আবার কয়লাও

তোলা হয়। প্রথমে কয়লার স্তরকে সামান্য পরিমাণে বিস্ফোরকের সাহায্যে ফাটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর শ্রমিকেরা গাঁইতির সাহায্যে কয়লা কেটে ট্রলি বা চাকাওয়ালা ছোট মালগাড়ীতে তুলে দেয়। ছোট লাইনের (Rail) উপর দিয়ে এই ট্রলি কূয়ার ঠিক নিচে এলে কয়লাভর্তি ট্রলি 'লিফটে' করে ওপরে চলে আসে। ট্রলি থেকে কয়লা নামিয়ে নিয়ে আবার খালি ট্রলি 'লিফটে' করেই নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
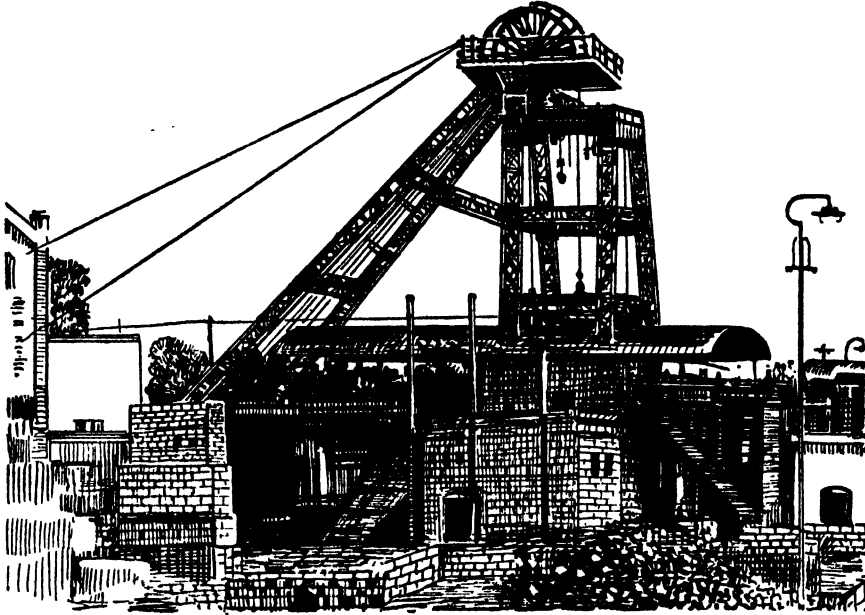
আবার যেখানে মাটির অল্প নিচেই কয়লা পাওয়া যায় সেখানে উপরের মাটি পাথর ইত্যাদি যন্ত্রচালিত বেলচা (Shovel) দিয়ে পুকুরের মত কেটে কয়লা তোলা হয়। এ ধরণের কয়লার খনি বোকারো ও করণপুরা অঞ্চলে দেখা যায়।

ভারতে সবচেয়ে ভাল কয়লা পাওয়া যায় বিহারের ঝরিয়া অঞ্চলে। তারপরেই পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জের কয়লাখনির স্থান। আর এই কয়লাই পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় খনিজ সম্পদ। রাণীগঞ্জ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়াতে এবং দার্জিলিং হিমালয়ের পাদদেশে সামান্য পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়।

সারা ভারতে প্রতি বৎসরে যে কয়লা তোলা হয় একমাত্র রাণীগঞ্জ থেকেই তার শতকরা ৩৩ ভাগ আসে। এই রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের আয়তন ৬০০ শত বর্গমাইল।

কয়লা এতই মূল্যবান সম্পদ যে কেহ কেহ একে কাল রংয়ের হীরা বলেন। আর মজার ব্যাপার এই যে রাসায়নিক দিক থেকে কয়লা এবং হীরা কার্বন (carbon) পদার্থের তৈরী।

কয়লার ব্যবহারও নানারকম। জ্বালানী হিসাবে উনানে কয়লার ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। কিন্তু

খনি থেকে যে কয়লা তোলা হয় সেটাই সোজাসুজি উনানে ব্যবহার করা হয় না। এগুলি জড়ো করে তাতে আগুন জ্বালান হয়। কিছুক্ষণ জ্বলবার পর আগুন জল দিয়ে নেভানো হয়। এর ফলে হয় 'কোক' (coke) কয়লার সৃষ্টি। এই 'কোক'ই উনানে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রেলের ইঞ্জিন, স্টীমার, জাহাজ, কলকারখানার 'বয়লারে' কয়লা ব্যবহার হয়। কিন্তু লোহা আর ইস্পাত শিল্পে এক বিশেষ ধরণের 'কোক' প্রয়োজন। 'কোক ওভেন' নামে এক বিশেষ ধরণের চুল্লীতে এই কোক তৈরী হয়। বাংলাদেশের দুর্গাপুরে এই ধরণের চুল্লী আছে। এতে পাশাপাশি অনেকগুলি ছোট কামরা থাকে। প্রত্যেকটায় একটা লোহার দরজা থাকে। খোপগুলি কয়লা দিয়ে বোঝাই করে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি খোপের উপর ও নিচ একটি নল জুড়ে দেওয়া থাকে। নিচের নল দিয়ে অত্যন্ত গরম হাওয়া পাঠান হয়। এর ফলে কয়লা জ্বলতে শুরু করে। কয়লা জ্বলতে শুরু করলে প্রথমেই 'কোল গ্যাস' (coal gas) নামে এক ধরণের গ্যাস বের হয়, আর সেই গ্যাস চুল্লীর উপরে নলের ভিতর দিয়ে ট্যাঙ্কে জমা হয়। এই গ্যাস দিয়ে আলো জ্বলে আবার জ্বালানী হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। কলকাতায় গ্যাসের আলো তোমরা সবাই দেখেছো। দুর্গাপুর থেকে নলের সাহায্যে এই 'কোল গ্যাস' কলকাতায় এখন পাঠানো হয়। আবার কয়লা থেকে তরল আলকাতরা বেরিয়ে আসে। কয়লা থেকে রাসায়নিক উপায়ে বেঞ্জিন নেপ্‌থলিন ইত্যাদি অনেকগুলি জিনিষ পাওয়া যায়। তারও পর যে জিনিষ পড়ে থাকে তাই হ'ল পীচ। এই পীচ পাকা রাস্তাতে ব্যবহার হয়। আর ওদিকে কয়লা ওই চুল্লীর মধ্যে কিছু সময় জ্বলবার পর জল ঢেলে আগুন নেভান হয়। এইভাবে 'কোক' পাওয়া যায়। লোহা ও ইস্পাত শিল্পে কোকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

সব কয়লাই কিন্তু এক নয়। কয়লাকে সাধারণতঃ চারভাগে ভাগ করা হয়। সচরাচর আমরা যে কয়লা দেখি এবং ব্যবহার করি তাকে 'বিটুমিনাস' (Bituminous) কয়লা বলে। গাছপালা কয়লাতে পরিণত হওয়ার সময় প্রথমে 'পীটে' (Peat) পরিবর্তিত হয়। এই পীটের মধ্যে গাছপালার ডালপালা ইত্যাদি সবই দেখা যায়। কলকাতার মাটির নিচে, বিশেষ করে বেলেঘাটা ও লেক অঞ্চলে অনেক জায়গায় কুড়ি ফুট নিচেই এই পীট পাওয়া গেছে। এছাড়া দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি অঞ্চলেও পীট পাওয়া গিয়েছে।

পীটের পরের অবস্থা হল 'লিগনাইট' (Lignite)। এই লিগনাইট বাদামী রংয়ের কয়লা, আর এতেও গাছপালার চিহ্ন দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজে নেইভেলী, রাজস্থান ও কাশ্মীর অঞ্চলে এই লিগনাইট পাওয়া যায়। এতেও আগুনের তত তেজ হয় না। তাই নেইভেলীর লিগনাইট থেকে গ্যাস তৈরী করে সেই গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এর পরে আরও স্তরের চাপে ও অনেক বছরের পর লিগনাইট থেকে সৃষ্টি হয় 'বিটুমিনাস' কয়লা। এই কয়লাই প্রায় সব শিল্পে ও উনানে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। ভারতে ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জে এই ধরণের কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও উত্তর প্রদেশেও এই কয়লা পাওয়া যায়।

সর্বার শেষে 'এনথ্রেসাইট (Anthracite) কয়লা। দার্জিলিং এবং কাশ্মীরে এই ধরণের কিছু কিছু কয়লা পাওয়া যায়। এদেশে এই প্রকার কয়লার বিশেষ কোন ব্যবহার নাই।

এছাড়া আসামে-টারশিয়ারী (Tertiary) যুগের—এখন হতে প্রায় ৭ কোটি বছর আগের, কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু এই কয়লার মধ্যে অনেক গন্ধক আছে। চুল্লাতে এই কয়লা ব্যবহার করলে গন্ধকের গ্যাস জলের সাথে মিশে 'সালফিউরিক এসিড' তৈরী হয় ও তাতে লোহার বয়লার ক্ষয়ে যায়। কাজেই কোন 'বয়লারে' এই গন্ধকযুক্ত কয়লা ব্যবহার করা যায় না।

ভারতের নানাস্থানে কয়লা পাওয়া গিয়েছে। নতুন কলকারখানা হওয়ার সাথে সাথে যেমন কয়লার চাহিদা বাড়ছে, তেমনি নতুন নতুন জায়গায় আবার কয়লার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

লঙ্কা-দহন

লীলা মজুমদার

প্রথম দৃশ্য

পাত্র পাত্রী

ঘোষক

হনুমান

লঙ্কাদেবী

প্রহরী

স্থান-লঙ্কানগরের মেন গেট।

লঙ্কা-দহন

জুড়ির গান

রামায়ণের বাহাদুর রামচন্দ্র নয়,
বদন তুলে কহ সবে হনুমানের জয় ॥
কর হনু গুণ গান,
হনু্‌মান কথা শোন,
সোটালেম্লেড্‌ সমান ॥
তাঁবাপানা পোড়া মুখ
দেখে ভুঞ্জি স্বর্গ সুখ,
গাহ হনু্‌মানের জয় ॥
উটকপালের দু'পাশেতে
হের বাঁধাকপি কান,
কর হনু গুণ গান ॥
লালচে রং নাকের ফুটো,
বাবা ! দেখে লাগে ভয়,
গাহ হনু্‌মানের জয় ॥

ঘোষক-বাঁদরের প্রবেশ ও ঢোলক বাজিয়ে বাঁদুরে অঙ্গভঙ্গি সহকারে প্রস্তাবনা ।

প্রস্তাবনা

মহেন্দ্র পর্বতে চড়ি বীর হনুমান
লঙ্কাদ্বীপ অভিমুখে করে লম্ফ দান ॥
পায়ের দাপটে শীলা হয় চূরমার,
ফোকর ফাটল দিয়া বহে জলধার ॥
জীবজন্তু ভয় পেয়ে করে হুহুঙ্কার,
যত যক্ষ মজা দেখে ছাড়ি পানাহার ॥
গাছ পালা উপাড়িয়া আকাশেতে ওড়ে,
বাসা ছাড়ি কাগ চিল মহাশূন্যে ঘোরে ॥
নীলাভ মেঘের মতো হনু শূন্যে ধায়,
সাগর লঙ্ঘন করি যদি সীতা পায় ॥
মৈনাক পাহাড় কহে তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
না থামি, তারে ছুঁয়ে হনু দেয় ফাল ॥

সুরসা সাপিনী এবে চাহে গিলিবারে,
তিল সম তনু ধরি, ফাঁকি দেয় তারে ॥
সিংহিকা রাক্ষসী সে জল তলে রয়,
ছায়া ধরি হনুমানে মুখে টানি লয় ॥
চাতুরি করিয়া হনু বাঁচাইলা পরাণ,
সুরাসুর সবে তার করে গুণ গান ॥
এমতে উতরি শেষে লম্ব শৈল পরে,
বাঁদুরে প্রথাতে হনু নাচ গান করে ॥

বুকে চপেটাঘাত করতঃ ঘোষকের ল্যাজ দুলিয়ে সরে দাঁড়ান এবং হনুমানের লাফ দিয়ে প্রবেশ।

হনু—উঃফ্! আরেকটু হলেই পৈতৃক ল্যাজটা গেছিল গো! কি বাঁচান বেঁচেছি, বাপ্! একটা নীল রঙের মেঘের মতো নাক মুখ সিঁটকে সমুদ্দুরের ওপর দিয়ে চলেছি তো চলেইছি। কেরামতি দেখে দেবতাদের দাঁত কেলিয়ে গেছে, তাঁরা সব ধন্য ধন্য করছেন। যক্ষযক্ষিনীরা পুষ্পবৃষ্টি করছেন। সমুদ্দুরের ঢেউ-খেলানো জলের ওপর দশগুণ হয়ে আমার ছায়াটা পড়েছে, ল্যাজটা কেমন সুন্দর এলিয়ে রয়েছে। এমনি সময় কোথাকার তুই কেরে, লেজ ধরে টেনে নামিয়ে আমাকে জলখাবার করতে চাস্? এঁ্যা? তেমনি সাজাটাও পেলি কিনা বল্? এতটুকু বড়িটার মতো হয়ে তোর মুখে সেঁদিয়ে, এই বিশাল বিকট রূপ ধরে তোকে চীরে কুটিকুটি করে কেমন বেরিয়ে এলাম। বাবা! প্রাণটা বড় ভালো জিনিষ তোর।

হনুর নৃত্য ও গান

উঃফ্! বড্ড বাঁচা বেঁচেছিস্ রে প্রাণ!
ছায়া ধরে ক্যায়সা জোরে লাগিয়েছিল টান!
চন্দ্রবিন্দু পড়ে যেত নামের আগায়,
ঘুচে যেত কলা খাওয়া, মরি হায় হায়!
বাঁদুরে বুদ্ধির খুরে শত শত গড়,
চাচা আপ্‌না বাঁচা বলে পেঁপে গাছে চড়!

ঘোমটা দিয়ে লঙ্কাদেবীর প্রবেশ

আ সব্বনাশ! তোর সাহস তো কম নয়! বেড়াল হয়ে আমার পেয়ারের পেঁপে গাছে চাপছিস্, এঁ্যা? যদি নখের খিমচি লেগে যায়? ভাগ্, বলছি! আ মল যা, তবু যায় না! জানিস, আমি লঙ্কা দেবী, রোজ নাক্কসরা আমার পুজো দেয়, হঁ্যা, হাঁড়ি হাঁড়ি মোষের মাংস, টক দই—ইকি! দেখেছ, বেড়ালটা কি খারাপ, আমাকে ল্যাজ দেখাচ্ছে! এই, খবরদার! নইলে এমনি দাঁত চিরকুটি করব যে ভয়ে পেলিয়ে যাবি! ওকি, এগিয়ে আসছে যে, ও বাবা! কামড়াবে টামড়াবে না তো? ওরে রাগিসূনে, তোকে দুধ ভাত খেতে দোব, আ, আ, আ, পুস্, পুস্, পুস্!

হনু—ছিচরণে পেন্নাম করে বলি মা ঠাকরুণ, চক্ষুর কি মাথা খেয়েছ? কাকে বেড়াল বলে, কাকে বাঁদর বলে তাও জান না? আমি একজন বাঁদর, তোমাদের দেশ দেখতে এইচি!

লঙ্কা—ওঃ তাহলে বেড়াল নয়? আঃ, বাঁচা গেল! এই চোপ্, বেড়ালেতে বাঁদরেতে তফাৎটা কি হল শুনি? বলি, কি চাস্ তুই?

হনু—শুনেছি লঙ্কাসহরের পথঘাট সোনা দিয়ে বাঁধানো, তাই দেখতে এসেছি, তা কি এমন অন্যায়টা করিচি শুনি? কিচ্ছু নিচ্ছি না, ভাঙ্গছি না, চিবুচ্ছি না, শুধু একটু তাকিয়ে দেখব, তাতে অত রাগের কি হল, ঠাকরুণ? ছ্যাখো, মেয়েরা থাকবে রান্নাঘরে, কুটবে কাটবে, রাঁধবে বাড়বে, তাদের মুখে অত গলাবাজি কি শোভা পায়?

লঙ্কা—নাঃ, আজ আমার হাতে তোর নির্ঘাত মরণ দেখতে পাচ্ছি। পই পই করে বলছি এখান থেকে পালা, তা কানে তোলে না। লঙ্কানগর রক্ষা করা আমার কাজ। তোকে আমি ঢুকতে দোব না, পালা বলছি—

হনু—ঐ যাঃ! মা ঠাকরুণ, তোমার খোঁপা খুলে গেছে!

লঙ্কা—ও! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! একটা চড় না খেলে মন উঠবে না দেখছি!

(ছুটে গিয়ে হনুর গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত।)

হনু—উঃ! গিছি, গিছি, গিছি! কিঁ যেঁ কঁর! আঁমার লাঁগে না বুঁঝি? নেহাৎ মেয়ে মানুষের সঁঙ্গে আঁমি যুঁদ্ধ কঁরি না, নইলে তোমায় আঁজ আঁমি মেরে মাহুর বাঁনিয়ে দিতাম না, হ্যাঁ!

লঙ্কা– ইল্লি? তাই দিতিস্ নাকিরে? তবে দিচ্ছিস না কেন?

হনু—এই যে দিচ্ছি; এবার আমার বাঁ হাতের আস্তে একটা কীল খেয়ে ছাখ দিকিনি কেমন মজা!

(বাম হস্তে কীল মারল)

লঙ্কা—(কেঁদে উঠে) আরি বাবারে, মারে, ও পিসিমা গো! গেলুম গো! শেষটা একটা বাঁদরের হাতে পিটুনি খেয়ে অক্কা পেলাম নাকি! নাঃ, আর আমি তোকে কিচ্ছু বলব না, যা, দেখে আয়গে। লঙ্কারো দিন ঘনিয়ে এসেছে। হা হতোস্মি।

(পতন ও মূর্চ্ছা)

হনু—ন্যাকা! একটু ছুঁয়েছি কি না ছুঁয়েছি, অমনি উনি মুচ্ছো গেলেন। যাই নগরটা দেখেই আসি, সীতা মাকে খুঁজে বের করতে হবে তো। ওটা থাক্ গে পড়ে, ছাগলে খেয়ে যাক্।

(হনুর প্রস্থান ও লঙ্কাদেবীর মিটি মিটি চাওন)

লঙ্কা—(উঠে বসে) শুনলে, হতভাগাটার কথা শুনলে! আচ্ছা, এক মাঘে শীত যায় না! যাও না বাছাধন লঙ্কানগরে, নাক্কসরা কেউ ছেড়ে কথা কইবে না! আমি এখানে বসে বসে ততক্ষণ জিরিয়ে নিই।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী—অ্যা, ডিউটির মাঝখানে শুয়ে আছ যে বড় দিদি? এবার তোমাকে বকুনি খাওয়ানোর মজা বের কচ্ছি, দাঁড়াও, আমি জম্বুমালীকে বলে দিচ্ছি! (প্রস্থানোদ্যত)

লঙ্কা—ওরে থাম, থাম! যাস্ নি বলছি, তাহলে তোকে একটা জিনিষ দোব।

প্রহরী—ঠিক দেবে তো দিদি? সেবারের মতো করবে না তো?

লঙ্কা—আরে না, না, ঠিক দোব। সেবার—সেবার—ওরে সেবার যে আমার পেটব্যাথা করেছিল।

প্রহরী—আচ্ছা, তা হলে না হয় জম্বুমালীকে বলব না, কিন্তু প্রহস্ত—ওরে বাবা, ওটা কি আসছে রে! না দিদি, আমি চলি, আমার আবার ওদিকটাও পাহারা দিতে হবে। (বেগে প্রস্থান)

(ঝড়ের মতো হনুমানের পুনঃ প্রবেশ ও হতাশভাবে বসে পড়ে কপালের ঘাম মুছন)

লঙ্কা—কি? কি হল? রাবণের কিছু হয় নি তো? তার কাছে আমার অনেক পয়সাকড়ি গচ্ছা আছে যে! আহা, বসে বসে মুণ্ডু নাড়ছে কেন? কি দেখে এলে বল।

হনু—আরি বাপ্, সে যে কি না দেখলাম সে আর কি বলব। সোনার দেয়াল, হীরের ঝাড় লণ্ঠন, স্ফটিকের বাসন, তাতে এই বড় বড় বড়া, মাছের কালিয়া, ক্ষীরের সমুদ্র, ই—ই—স্! (জিভ চাটন্)

লঙ্কা—খুব সাঁটিয়ে এলি বুঝি?

হনু—(জিভ কেটে) ছ্যা ছ্যা, কি যে বল ঠাকরুণ, আমি—আমি আহ্নিক না করে জলস্পর্শ করি না যে! কিন্তু তার কি সুবাস গো! তারপর দেখলাম একটা হাতির দাঁতের পালঙ্ক বানিয়েছে তার ওপর মাণিকের তৈরী তেলের প্রদীপ জ্বলছে, তার সুগন্ধে চারদিক ভুরভুর করছে আর বাতির নিচে কালো মেঘের মতো কে একটা শুয়ে রয়েছে, সারা গায়ে রক্তচন্দন মাখা, গয়নাগাঁটি পরে এই বিরাট হাঁ করে নাক ডাকাচ্ছে আর চারদিকে সব্বাই ঘুমুচ্ছে। একজনকে সীতামা ভেবে খুব খানিকটা তাল ঠুকে নেচে নিলাম, কিন্তু রামচন্দ্রের কাছে তাঁর গয়নার লিষ্টি মুখস্থ করেছিলাম। সে গয়না মিলল না, কাজেই উনি সীতা নন্।

লঙ্কা—ওমা, সেকি! তুমি গয়না দিয়ে মানুষ চেনো নাকি?

হনু—তা নয়তো কি! মানুষদের মেয়েদের নাক চোখ মুখ বুঝি আবার আলাদা আলাদা হয়? আর হলেও, পদ্মরেণু মেখে তাম্বুল চিবিয়ে, কাজল পরে সব একরকম দেখতে হয়ে যায়। চিনতে হয় গয়না দিয়ে। যাই, উঠি এখন। এদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, তিনি নেই। ঐ যে দূরে বনবাদাড় দেখছি, যাই ওখানেই যাই, যদি পাই। (প্রস্থান)

লঙ্কা—এই রে! ঐখানেই তো সে আছে! এইবার নিশ্চয় মজা শুরু হবে। যাই, আমিও যাই, মজা দেখে আসি তো। (প্রস্থান)

ঘোষক—(বেরিয়ে এসে) উঃ বাবা। এতক্ষণে প্রাণটা হাতে করে পালাবার সুযোগ পেলাম। ঈস্। একটা বাঁদর, একটা রাক্ষসী! ভয়ে আমার হাত পা পেটে সেঁদিয়েছিল! বাবা। (প্রস্থান)

(প্রথম দৃশ্য শেষ)

জীবনে সেই যা আমার পুরস্কার লাভ—সেই প্রথম আর সেই শেষ। কিন্তু এ রকমটা যেন তোমাদের কারো কখনো না ঘটে···

ক্লাস টেন-এ প্রমোশন পেয়েই মামাকে গিয়ে জানালাম।

'টেন-এ উঠেচিস! বলিস কিরে!' মামা তো হতবাক। 'টেনে উঠলি? বাঃ!'

'এখনই বাঃ কি মামা? আসছে বছরে এনটেন্‌স পরীক্ষা দেব, তা জানো?'

'বলিস কিরে! আমাদের বংশে কেউ যে কখনো এনটেন্‌সের চৌকাঠ মাড়ায়নি! সাত জন্মে না। সাত পুরুষে নয়।'

সাতপুরুষের খবর রাখি না, তবে তিন পুরুষের জানি। আমার মামা বাংলা পাঠশালার পড়ুয়া, ছাত্রবৃত্তি পাশ। তার পর তিনি আর এগোন নি। নিজের ব্যবসা নিয়েই রয়েছেন।

আর আমার দাদামশাই ছিলেন টোলের পণ্ডিত। ইংরিজির ধার ধারতেন না। সংস্কৃত নিয়ে থাকতেন, টোল ছিল তাঁর। তাঁর ধাক্কায় টোলে পড়তে পড়তে খুব আমি টাল সামলেছিলাম।

আর তাঁর বাবার আমলে এনটেন্‌সের পাটই ছিল না। তিনি জানতেন শুধু ফার্সি। মৌলভিদের মক্তবে পড়েছিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলার লেখা কী একটা ফার্সি চিঠি পড়ে দিয়ে কোন এক সাহেবের কাছ থেকে একটা সোনার ঘড়ি নাকি বখ্‌সিস পেয়েছিলেন তিনি।

সেই সনাতন বংশে প্রথম এ-বি-সি-ডি নিয়ে এলাম আমি। কেবল নিয়ে আসা নয়, এনটেন্‌স পাশ করে সেই এ-বি-সি-ডির ছেরাদ্দ করে ছাড়বো। বি এল্ এ ব্লে থেকে সুরু করে এতদূর যখন টেনে হিঁচড়ে নিজেকে আনতে পেরেছি, তখন বাকীটুকুও কোনরকমে ঠেলেঠুলে উৎরে যেতে পারব আশা করি।

মেজমামার আনন্দ ধরে না।—'কী পুরস্কার চাস বল্‌।'

'কী দেবে দাও।' আমি তো লাফিয়ে উঠি।

'এই সোনার ঘড়িটা নে।' বলে মামা জেব থেকে চেন লাগানো ঘড়িটা বার করলেন : দেখেছিস ? 'মোকবের' সোনার ঘড়ি। পাঁচশো টাকা দাম। আমার ঠাকুরদাকে দিয়েছিল এক সাহেব। বেঞ্জামিন সাহেব। ভেবেছিলাম তুই এন্‌ট্রেন্‌স এগজামিন পাশ করার পর বেঞ্জামিনের ঘড়িটা তোকে দেব। তা আগেই নে তুই। ক্লাস টেন-এ তো উঠেচিস। যাঁহা বাঁহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।'

'ঘড়ি নিয়ে কী করবো মামা ? ধুয়ে ধুয়ে খাব ?' আমি বললাম : 'ঘড়ি তোমার থাক।'

'তাহলে কী চাস তুই ?'

'টাকা দাও বরং আমায়। ঐ ঘড়ির দামের টাকাটা দিয়ে দাও।'

'পাঁচশো টাকা ! পাঁচশো টাকা নিয়ে কি করবি রে তুই ?

'খাবো।'

'খাবো ! পাঁচশো টাকার কী খাবি ? এমন কী খাবার আছে ?'

'কেন, রসগোল্লা সন্দেশ জিবে গজা জিলিপি চানাচুর চকোলেট চীনে বাদাম…'

'পাঁচশো টাকার চীনে বাদাম। তা খেলে আর বাঁচতে হয় না। আর যদি বাঁচিসও, তোর চেহারা চীনেদের মতন হয়ে যাবে। কিম্বা একটা বাদাম হয়েও দাঁড়াতে পারিস।'

'তাহলে রেখে দেব।'

'রাখবি কোথায় ? তোর কি বাকসো পেটরা আছে ? টাকা রাখতে হয় সিন্ধুকে।'

'কেন আমার পকেটে রাখব।' সিন্ধুকে আমি বিন্দু জ্ঞান করি। বিন্দুমাত্র আমল দিই না— 'আমার এই বুক পকেটে।'

'পকেটে ! পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবি যেখানে সেখানে ?'

'বেড়াবই তো। দেখিয়ে বেড়াবো সবাইকে। বা রে ! বন্ধুদের দেখাতে হবে না ? তা না হলে আবার কিসের টাকা !'

'তবেই হয়েছে ! চারদিকে যা পিকপকেট ! কলকাতায় কি পা বাড়াবার যো আছে রে কোথাও ! পকেটমাররাই টাকাটা মেরে দেবে তোর।'

'তা আর মারতে হয় না। আমার পকেটে হাত দেবে এমন মানুষ এখনো জন্মায় নি মামা।'

'চার ধারেই তো ঠক্‌ জোচ্চোর। ঠক বাছতে গাঁ উজোড় এই কলকাতায়।'

'দিয়েই ছ্যাখো না আমায়।'

'নে তাহলে।' আয়রণ-সেফ খুলে পাঁচখানা একশো টাকার নোট আমার হাতে তুলে দেন।— দেখিস যেন'বেহাত না হয় কখনো।'

'আমার টাকা আর হাত সাফাই করতে হয় না কাউকে। অতবড়ো ম্যাজিসিয়ান এদেশে নেই।'

'টাকাটা পকেটে নিয়ে ঘুরবি বলছিস। বাড়ি ফিরে রোজ রোজ দেখাবি আমায় কিন্তু। পাঁচখানা নোট গুণে গুণে দেখব আমি।'

'দেখাবো দেখাবো' বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম—বন্ধুদের দেখাবার জন্য। তাদের কারো পাঁচটাকার বেশি মুরোদ নেই, পাঁচশো টাকায় কেমন তাদের তাক লেগে যায় সেটা দেখতে হবে।

পাড়ার হদ্দা পার হয়ে একটা পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় এক ভদ্রলোক ডাকলেন—

'খোকা, তোমার আদ্দির পাঞ্জাবির ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে সব।'

'অ্যাঁ?' চম্‌কে গিয়ে আমি থমকে দাঁড়াই।

'নোটগুলো সব দেখা যাচ্ছে যে।' আমার ঘাড়ে হাত রেখে তিনি বললেন—'অমন করে টাকা রাখতে নেই ভাই। পকেটমারের নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই। মনিব্যাগের মধ্যে রাখবে টাকা।'

ঘাড়কে হস্তচ্যুত করে আমি হটে যাই। 'কিনব ব্যাগ।' জানিয়ে দিই সংক্ষেপে।

'নোটের নম্বরগুলো তোমার টোকা আছে তো সব?' তিনি শুধোন।

'নোটের নম্বর?' অবাক হতে হয়।

'হ্যাঁ, নোটের কোনার দিকে নম্বর থাকে, বড় বড় নোটের নম্বর টুকে রাখতে হয় আলাদা কাগজে। ধরো, বলা তো যায় না, টাকাটা তোমার খোয়া গেল। তখন তুমি থানায় গিয়ে পুলিসকে জানাতে পারবে নোটের নম্বর দিয়ে। পুলিস তখন খবরটা জানিয়ে দেবে সবাইকে। কেউ ঐ নম্বরের নোট বাজারে চালাতে গেলে ধরা পড়ে যাবে হাতে হাতে। টাকাটা তোমার উদ্ধার হবে তখন।'

লোকটা ভালো কথা বলছে বলে আমার মনে হোলো।—'কিন্তু আমার কাছে এখন কাগজ কলম কিছুই নেই তো।' Manika

'এই নাও কাগজ কলম। আমি দিচ্ছি।' বলে তিনি তাঁর ডায়েরি বইয়ের থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে দিলেন।

'এই নাও আমার কলম। নোটগুলো আমার হাতে দাও, আমি নম্বর বলে বলে যাই আর তুমি টুকে টুকে নাও।'

বললেই টাকাগুলো ওর হাতে অমনি তুলে দিলাম কিনা! তেমন বোকা আমি নই। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে আমি তাকাই। তেমন যেন সুবিধের নয় লোকটা।

'আচ্ছা আচ্ছা। তুমিই নম্বরগুলো বলো, আমি তোমায় টুকে দিচ্ছি না হয়।'

আমি বলে বলে গেলাম, নম্বরগুলো তিনি টুকে নিলেন।

'এইবার আমার এই মনিব্যাগটা তুমি রাখো। ব্যাগের মধ্যে টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই, খালি ব্যাগ। ব্যাগটা আমি তোমায় উপহার দিলাম। এর ভেতরে তোমার নোটগুলো সাজিয়ে রাখো। তাহলে কারো নজরে পড়বে না।'

'আপনার ব্যাগ আমি নিতে যাবো কেন?' আমি আপত্তি করি: 'আমার ব্যাগ আমি কিনে নেব। আমার কি টাকা নেই?'

'আহা রাগ করছো কেন? আমি কি তাই বলেছি। আমার চেয়ে তোমার এখন বেশি টাকা। আমি কি তোমাকে একেবারে দিচ্ছি ব্যাগটা? জন্মের মত নিতে বলছি কি? তোমার ব্যাগ কেনার পর আমাকে এটা তুমি ফিরিয়ে দিয়ো নাহয়। ব্যাগের মধ্যে আমার নামের কার্ড রয়েছে। নরহরি সামন্ত, বৈঠকখানা রোড। ঐ ঠিকানায় তুমি দিয়ে এসো আমাকে।'

তবুও আমার দোনামোনা যায় না।

'ঐ ছাখো, একটা পুলিসের লোক আসছে। ছেলেপিলেদের হাতে টাকা থাকা ওরা ভারী অপছন্দ করে, ভীষণ সন্দেহের চোখে ছাখে। ভাববে তুমি হয়ত বাড়ির ক্যাশ ভেঙে পালিয়েছো। পাকড়ে নিয়ে যাবে থানায়। নাও, চট্‌করে পুরে ফ্যালো টাকাটা।'

পুলিস দেখে ব্যগ্র হয়ে আমি টাকাগুলো ব্যাগস্থ করি।

তারপরই যেন কী ঘটে গেল!

'আমার ব্যাগ! আমার মনিব্যাগ! কোথায় গেল আমার মনিব্যাগ!' লোকটা চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ: 'অনেক টাকা ছিল যে আমার ব্যাগে। কে পকেট মারল আমার!'

পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার থম্‌কে দাঁড়ালেন আমাদের কাছে এসে—'কী হয়েছে মশাই? কী হয়েছে?'

'আমার মনিব্যাগ! পকেট থেকে কে তুলে নিয়েছে দেখুন!' আর্তনাদে ফেটে পড়ল লোকটা: 'পাঁচশো টাকা ছিল আমার তাতে। সব খোয়া গেল আমার।'

ইনস্‌পেক্‌টার খপ্‌ করে এসে হাত চেপে ধরলেন আমায়—'এই ব্যাগ কি আপনার? দেখুন ত?'

'হ্যাঁ, এই ত সেই ব্যাগ। দেখুন দেখুন, ওর ভেতর আমার নোটগুলো সব আছে কিনা দেখুন। একশো টাকার পাঁচখানা নোট—এই এই নম্বর—' পকেট থেকে কাগজখানা বার করে নম্বরগুলো তিনি আউড়ে গেলেন: 'আমার নামের কার্ডও রয়েছে ব্যাগের ভেতর। নরহরি সামন্ত, বৈঠকখানা রোড।'

'হ্যাঁ, রয়েছে! সবই মিলে যাচ্ছে। এই নিন, আপনার মনিব্যাগ। আমি ছেলেটাকে অ্যারেস্‌ট করছি, এবার থানায় চলুন আমার সঙ্গে। আপনার অভিযোগ ডায়েরি করবেন।'

'আমার অভিযোগ? আমার কিসের অভিযোগ? পেয়ে ত গেলাম। তাছাড়া, অভিযোগ করবার আমি কে? আমি কি বিচার করবার মালিক? মানুষ কি মানুষের বিচার করতে পারে? এ সংসারে অপরাধী কে নয়? কেউ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে সে কথা?'

'আপনি কী বলছেন মশাই?' ইন্‌সপেক্টর তো অবাক।

'ঠিকই বলছি।" ছেলেরা সব দেবতুল্য। কেউই তাদের খারাপ হয়ে জন্মায় না। সঙ্গ দোষে, শিক্ষার ত্রুটিতে খারাপ হয়ে যায়। এর জন্য দায়ী সমাজ, সংসার, পরিবেশ। রাষ্ট্র দায়ী এর এই অপরাধের জন্য। এ নয়, দায়ী হচ্ছে ওর বাবা কাকা পিসে মেসো মামা। এই আমার অভিমত।'

'কিন্তু আইন মাফিক—'বলতে যান ইনস্‌পেক্টার।

'আমি যদি ছোঁড়াটাকে জেলের মুখে ঠেলে দিই, সেখানে ও ওস্তাদ বদ্‌মায়েসদের পাল্লায় পড়ে

তাদের হাতে শিক্ষালাভ করে পাকা চোর হয়ে বেরুবে জেল থেকে। তখন পকেটমার থেকে চোর হবে, চোর থেকে ডাকাত হবে, ডাকাত থেকে খুনে হবে, তারপর খুনের থেকে—'

'ফাঁসি হবে। তাছাড়া আর কিছুই হবে না।'

'আমি ছেলেটাকে ফাঁসিয়ে যেতে চাই না। আপনি দয়া করে ওকে ছেড়ে দিন।' বলে তিনি আমায় মার্জনা করে চলে যান।

আমি ইন্‌স্‌পেক্টারেরও মার্জনা লাভ করি।

এখন মামা মার্জনা করলে হয় আমায়!

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকাদেশে, অধিবাসিগণের মধ্যেই দুই দলে একটি সাংঘাতিক যুদ্ধ হইয়াছিল—যাহা "ওয়ার অব্ সেসেসন্" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ঐ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে, এক দলের সেনাপতি, জেনারেল গ্রাণ্ট্ রিচ্‌মণ্ড সহর অবরোধ করিলেন। রিচ্‌মণ্ড ভার্জিনিয়ার রাজধানী—শত্রুর রাজ্য; জেনারেল গ্রাণ্ট্ সহরটিকে অবরোধ করিলেন বটে, কিন্তু উহা দখল করিতে পারিলেন না, অধিকন্তু, তাঁহার কয়েকজন নামজাদা সৈনিক কর্মচারী শত্রুর হস্তে বন্দী হইলেন। ইহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন ক্যাপ্‌টেন্ সাইরাস্ হার্ডিং। তিনি খুব বড় এনজিনিয়ার ছিলেন, তাঁহার বাড়ী ছিল মাসাচুসেটস্ সহরে। যুদ্ধের সময় রেলওয়ের তত্ত্বাবধান-কার্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। হার্ডিংএর বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর। চেহারা হৃষ্টপুষ্ট না হইলেও শরীরের গঠন ছিল বলিষ্ঠ, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, মাথাটি বড়—দেখিলেই মনে হইত উহা বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। ঠোঁটের উপরে বেশ মোটা এক জোড়া গোঁফ—মুখখানি দেখিলেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি সৈনিক পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সাইরাস্ হার্ডিংএর মনের জোর ছিল অদ্ভুত, তিনি যেমন বুদ্ধিমান এবং অসাধারণ সাহসী ছিলেন, কার্যক্ষমও ছিলেন তেমনি। সাইরাস হার্ডিং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া শত্রু কর্তৃক রিচমণ্ড শহরে বন্দী হইলেন। ঠিক সেই সময়ে, "নিউইয়র্ক হেরাল্ড" নামক পত্রিকার সংবাদদাতা গিডিয়ন্ স্পিলেটও রিচ্‌মণ্ড সহরে বন্দী হন। এই যুদ্ধে সংবাদদাতারূপে তিনি নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় গোলাগুলি অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি কাগজ পেনসিল হাতে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া যুদ্ধের সংবাদ লিখিতেন—বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। সাইরাস্ হার্ডিং এবং গিডিয়ন্ স্পিলেট পরস্পরের নাম মাত্র জানিতেন, কিন্তু উভয়ে পরিচিত ছিলেন না। হার্ডিংএর ক্ষত শীঘ্রই আরোগ্য হইল, এই সময়ে গিডিয়ন্ স্পিলেটের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়, অল্পকালের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা হইল। তখন হইতে উভয়ের মনে একই চিন্তা—কিরূপে মুক্তিলাভ করিবেন। তাঁহারা সাধারণ কয়েদীর

মত আবদ্ধ ছিলেন না, স্বাধীনভাবে সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতেন, কিন্তু সহরের চারিদিকে সর্বদা সশস্ত্র প্রহরী থাকিত, ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার উপায় ছিল না।

এই সময়ে একদিন ক্যাপ্‌টেন হার্ডিংএর পুরাতন ভৃত্যটি আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইল। ভৃত্যটি ছিল নিগ্রো, হার্ডিংএর জমিদারিতেই তাহার মাতা পিতা বাস করিত। সাইরাস্ হার্ডিং পূর্বেই তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু চাকর তাঁহাকে এমনই ভালবাসিত, যে মুক্তির পরেও সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। চাকরের নাম ছিল "নেবুক্যাড্‌নেজার" কিন্তু তাহাকে ডাকা হইত নেব্‌ বলিয়া। নেবের বয়স ছিল প্রায় ৩০ বৎসর—এমন বলিষ্ঠ, কার্যক্ষম, চতুর ও শান্তশিষ্ট লোক কম দেখা যায়—আবশ্যক হইলে, সাইরাস হার্ডিংএর জন্য সে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

সাইরাস্ হার্ডিং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া রিচমণ্ড সহরে আবদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়াই, নেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই নানা রকম চালাকি খেলিয়া, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া সে সহরের ভিতর ঢুকিতে পারিয়াছে। প্রভু-ভৃত্যে সাক্ষাৎ হইলে পর, উভয়ের মনে কিরূপ আনন্দ হইল তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। তখন হইতে সাইরাস্ হার্ডিং গিডিয়ন্ স্পিলেট্ ও নেব্‌ তিনজনে মিলিয়া পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবরুদ্ধদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সহর হইতে বাহির হইয়া গিয়া, তাহাদিগের সেনাপতি জেনারেল "লির" দলের সঙ্গে মিশিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন "জোনাথন্ ফরস্টার"। তিনি একদিন সহরের শাসনকর্তার নিকট প্রস্তাব করিলেন, যে, একটা বেলুনে চড়িয়া গিয়া জেনারেল লি কে সমস্ত সংবাদ জানাইয়া আসিবেন। অবরুদ্ধ হওয়া অবধি, শাসনকর্তা জেনারেল লি-র কোন সংবাদ পান নাই। রিচ্‌-মণ্ডের বিপদে সাহায্য চাহিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইতে পারেন নাই। এদিকে, বাহিরের সাহায্য বিনা সহরটিকে আর বেশী দিন রাখিতে পারা যাইবে না—বাধ্য হইয়া শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায়, জোনাথনের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি তখনই সম্মতি দিলেন।

বেলুন প্রস্তুত হইল। ফরস্টার পাঁচ জন সঙ্গী লইয়া বেলুনে যাত্রা করিবেন। বেলুনে খাদ্যসামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি সমস্তই রাখা হইল। স্থির হইল ১৮ই মার্চ যাত্রা করিতে হইবে। রাত্রে, উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে যখন বাতাস বহিবে তখনই যাত্রার সময়। ১৮ই মার্চ প্রাতঃকালে দেখা গেল—উত্তর-পশ্চিমে হাওয়ার গতি ভাল নয়, ক্রমেই যেন হাওয়ার বেগ বাড়িয়াই চলিল। দেখিতে দেখিতে দারুণ ঝড়ই আরম্ভ হইল—এরূপ ঝড়ে বেলুনে যাত্রা করা সাক্ষাৎ মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই নয়। রিচমণ্ড সহরের প্রকাণ্ড মাঠে বেলুন বিশাল দেহ ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে—ঝড়ের বেগ কমিলেই সে আরোহীসহ যাত্রা করিবে। কিন্তু ১৮ই গেল, ১৯ তারিখও পার হইল—ঝড়ের বেগ একটুও কমিল না। বেলুনটাকে মাটিতে খোঁটা পুঁতিয়া, খুব মজবুত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। ভয় হইতে লাগিল—দারুণ ঝড়ের ঝাপ্‌টায় পাছে বা বেলুনের বাঁধন-দড়ি ছিঁড়িয়া যায়। ১৯এ মার্চ রাত্রিটাও পার হইল। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, ঝড়ের বেগ দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় বেলুনের যাত্রা স্থগিত না রাখিয়া আর উপায় কি!

সেই দিন এন্‌জিনিয়ার হার্ডিং সহরের পথে বাহির হইয়াছিলেন, এমন সময় একজন লোক তাঁহাকে ডাকিল। লোকটি সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি সেলার (নাবিক), তাহার নাম পেন্‌ক্রফ্‌ট্। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স, বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, রৌদ্রে পোড়া মুখের রং—চক্ষুদুটি উজ্জ্বল, যেন ঝল্‌মল্ করিতেছে। পেন্‌ক্রফটও আমেরিকান—সমুদ্র-পথে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। পেন্‌ক্রফ্‌ট অসমসাহসী, বিপদকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেয়—এমন কিছু অদ্ভুত বিষয় হইতে পারে না, যাহা দেখিলে সে বিস্মিত হয়। পেন্‌ক্রফ্‌ট কার্য উপলক্ষ্যে রিচমণ্ড সহরে

আসিয়াছিল। সহরটি অবরুদ্ধ হইলে, সেও আট্‌কা পড়িয়া গিয়াছে। বিপদে পড়িয়া ঘাব্‌ড়াইবার পাত্র পেন্‌ক্রফ্‌ট নয়, সে স্থির করিয়াছিল—যেরূপে হউক সহর হইতে পলায়ন করিতেই হইবে। এন্‌জিনিয়ার হার্ডিং এর সুনাম পেন্‌ক্রফ্‌টও শুনিয়াছিল, আর এটাও বুঝিয়াছিল, যে, হার্ডিংএর মত একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী লোক অবরুদ্ধ অবস্থায় কিছুতেই বেশী দিন থাকিতে পারে না। এই সব ভাবিয়া, পেন্‌ক্রফ্‌ট আজ হার্ডিংকে পথে দেখিবামাত্র ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"ক্যাপ্‌টেন্‌! রিচমণ্ড সহরে আর কতকাল পড়ে থাক্‌বেন?"

হার্ডিং নিবিষ্টমনে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকাইলেন।

পেন্‌ক্রফ্‌ট অবার গলার স্বর নিচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ক্যাপটেন্‌ হার্ডিং! পলায়নের চেষ্টা করবেন কি?"

হার্ডিং শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? তোমাকে ত আমি চিনি না।"

তখন পেন্‌ক্রফ্‌ট নিজের পরিচয় দিল।

হার্ডিং বলিলেন—"বেশ, কিন্তু পালাবে কি করে?"—

"মাঠে ঐ যে বেলুনটা আছে সেই বেলুনটায় চ'ড়ে। আমার মনে হয়, যেন, ওটা আমাদের জন্যই অপেক্ষা"—

নাবিকের কথা শেষ করিবার আবশ্যক হইল না, হার্ডিং তৎক্ষণাৎ সব বু'ঝিতে পারিলেন। সজোরে পেন্‌ক্রফ্‌টের হাত চাপিয়া ধরিয়া, তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহার সমস্ত মতলব খুলিয়া বলিল—হার্ডিং সে বিষয়ে আরও পরামর্শ করিলেন। ব্যাপারটা নিতান্তই সহজ, ইহাতে শুধু তাঁহাদিগের প্রাণ যাইবার আশঙ্কা আছে, তাহা ভিন্ন আর ভাবনা কি? প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছে, সত্য, কিন্তু হার্ডিংএর মত চতুর কর্ণধার এই দারুণ ঝড়েও বেলুনটাকে অনায়াসে চালাইতে পারিবেন—সে বিষয়ে পেন্‌ক্রফ্‌টের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না।

হার্ডিং নীরবে নাবিকের কথাগুলি শুনিলেন, আনন্দে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন মাহেন্দ্র-সুযোগ ছাড়িবার পাত্র হার্ডিং নহেন। বিষয়টা তেমন কিছু গুরুতর নহে, তবে অবশ্য সাংঘাতিক যতদূর হইতে হয়। রাত্রির গভীর অন্ধকারে, প্রহরী থাকা সত্ত্বেও বেলুনের কাছে যাওয়া মুস্কিল হইবে না। তারপর বেলুনের গাড়ীতে চড়া আর দড়ি কাটিয়া দেওয়া ত মুহূর্তের কাজ।

আমাদের মৃত্যু হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ভগবানের কৃপায় বাঁচিতেও ত পারি? আর, এই ঝড় না থাকিলে বেলুনই বা পাওয়া যাইত কোথায়—ইতিপূর্বেই ত বেলুনটা যাত্রা করিত।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া হার্ডিং বলিলেন, 'পেন্‌ক্রফ্‌ট, আমি কিন্তু একা নই।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল, "কয়জন লোক সঙ্গে নিতে চান?"

"দুজন। আমার বন্ধু গিডিয়ন্‌ স্পিলেট্‌ আর আমার চাকর নেব।"

"তাহলে আপনারা হলেন তিন জন; আর হারবার্ট এবং আমি—মোট হলাম পাঁচজন। বেলুনে ছয় জনের জায়গা খুবই আছে।"

হার্ডিং খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন—"বাস্‌, তাহলে আজ রাত্রে আমরা রওনা হব।"

স্পিলেটের নিকট এই প্রস্তাব করা মাত্র তিনি রাজি হইলেন। এমন সহজ উপায়টা তাঁহার মাথায় পূর্বে খেয়াল হয় নাই ভাবিয়া, তাঁহার বিস্ময়ও হইল। নেবের সম্বন্ধে আর কথা কি—তাহার প্রভু যেখানে সে-ও সেইখানে।

তখন পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তাহলে আজই রাত্রে আমরা বেলুনের কাছে মিলব।"

সাইরাস্ হার্ডিং বলিলেন—"হাঁ, রাত ঠিক দশটার সময়। ভগবান্ করুন, আমাদের যাত্রার পূর্বে যেন ঝড়ের বেগ না কমে।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট তাঁহাদের নিকট বিদায় হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেল—সেখানে হারবার্ট তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। বালক হারবার্ট পেন্‌ক্রফ্‌টের ভূতপূর্ব মনিব এক জাহাজের ক্যাপটেনের পুত্র। বেচারা মাতৃ পিতৃহীন। পেন্‌ক্রফ্‌টের পলায়নের ব্যবস্থার কথা সে জানিত। পেন্‌ক্রফ্‌ট যে তাহার প্রস্তাব সাইরাস হার্ডিংকে বলিতে গিয়াছিল, তাহাও, সে জানিত এবং তাহার অপেক্ষায় উৎসুকচিত্তে বসিয়া ছিল। এইরূপে পাঁচজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক সাক্ষাৎ মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ঝড়ের বেগ কমিল না। এরূপ দারুণ দুর্যোগে বেলুনে যাত্রা ভীষণ মারাত্মক—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাইরাস্ হার্ডিং সে বিষয়টা গ্রাহ্যই করিলেন না। তাঁহার শুধু ভয় হইল—যাত্রার পূর্বে দারুণ ঝড়ের ঝাপ্‌টায় পাছে বেলুনটা চুরমার হইয়া যায়। মনে এই ভয় লইয়া, হার্ডিং বিকেলের দিকে বেলুনের কাছে গিয়া পায়চারি করিতে ছিলেন। ঝড়ের জন্য চারিদিক্ জনমানবশূন্য। ক্রমে সেখানে পেন্‌ক্রফ্‌টও আসিয়া উপস্থিত, নিতান্ত সময় কাটাইবার জন্য সে হার্ডিংএর সঙ্গে পায়চারিতে যোগ দিল।

তাহারও মনে ভয় হইল, পাছে বেলুন চুরমার হইয়া গিয়া সব পণ্ড করিয়া দেয়। ক্রমে রাত্রি হইল। দারুণ অন্ধকার, চারিদিক্ নীরব নিস্তব্ধ—এরূপ দুর্যোগে শাসনকর্তা বেলুনের কাছে প্রহরী রাখাও আবশ্যক মনে করিয়া ছিলেন না। বৃষ্টি পড়িতেছিল, বরফও পড়িতে লাগিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন হাড় চুরমার হইতে চায়। সমস্ত রিচ্‌মণ্ড সহরটার উপর যেন কুয়াশার একখানা চাদর বিছান। ভগবান্ যেন দয়া করিয়া পলায়নের ব্যবস্থাগুলি সমস্তই অনুকূল করিয়াছিলেন। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সকলেই যথাস্থানে আসিয়া মিলিত হইলেন। মাঠের আলোগুলি সবই ঝড়ে নিবিয়া গিয়াছে, একেবারে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। এত বড় যে বেলুনটা, ঝড়ের দাপটে মাটির উপরে প্রায় হই া পড়িয়াছে—সেটাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। হার্ডিং, স্পিলেট্, নেব্ ও হারবার্ট সকলেই বেলুনের গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন—কাহারও মুখে কথা নাই। বেলুনের চারিদিকের দড়িগুলি বালিপূর্ণ ব্যাগের সঙ্গে বাঁধা। হার্ডিংএর আদেশে পেন্‌ক্রফ্‌ট একে একে সব বাঁধন খুলিয়া, নিজেও বেলুনে চড়িল। তখন শুধু একটি তারের সঙ্গে বেলুনটি বাঁধা আছে—হার্ডিং হুকুম দিলেই হয়।

ওই সময় গভীর অন্ধকারের ভিতর হইতে, হঠাৎ একটি কুকুর লাফাইয়া বেলুনে চড়িল। হার্ডিংএর প্রিয় কুকুর "টপ্"—বেচারি শিকল ছিঁড়িয়া প্রভুর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতিরিক্ত বোঝা চাপান উচিত হইবে না ভাবিয়া, হার্ডিং টপকে তাড়াইতেছিলেন, এমন সময় পেন্‌ক্রফ্‌ট বাধা দিয়া বলিল—"ভারিত এটুকু বোঝা। থাক্ বেচারি আমাদের সঙ্গে।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দুইটি বালিপূর্ণ বস্তা মাটিতে ফেলিয়া দিল, দিবামাত্র বেলুনটা একটু হেলান ভাবে, কামানের গোলার মত উপরের দিকে ছুটিল।

এইবার যাত্রির দল সত্যই বুঝিতে পারিল, ঝড়ের তেজ কতখানি। সমস্ত রাত্রির মধ্যে হার্ডিং নামিবার চিন্তা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে নিচের দিকে চাহিয়া কিছুই দেখা গেল না—কুয়াশায় সমস্ত ঢাকিয়া রহিয়াছে। এইরূপে ক্রমাগত চারি দিন চলিয়া, পঞ্চম দিনে একটু পরিষ্কার হইলে দেখা গেল—যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই সমুদ্র, কেবলই সমুদ্র। ঝড়ের দাপটে পর্বতপ্রমাণ ঢেউগুলি সংহার-মূর্তি ধারণ করিয়া, উন্মত্তের মত গর্জন করিতেছে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

"আমরা কি উপরের দিকে উঠ্‌ছি?"

"না বরং তার উল্টো।"

"নিচে নাম্‌ছি।"

"তার চেয়েও সাংঘাতিক ক্যাপ্‌টেন্‌। আমরা পড়ে যাচ্ছি।"

"কি সর্বনাশ, তাহলে শীগ্‌গির বালির বস্তাগুলি ফেলে দাও।"

"এই নিন, শেষ বস্তাটিও ফেলে দিলাম।"

"এখন কি বেলুন উপরের দিকে উঠ্‌ছে?"

"না, এখনও উঠ্‌ছে না।"

"ঢেউ ভাঙ্গার মত শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি যে," "বেলুনের গাড়ীর নিচেই সমুদ্র—পাঁচশ ফুটের বেশী নিচে হবে না।"

"ভারি ভারি জিনিস সমস্ত ফেলে দাও—একেবারে সব।"

১৮৬৫ সালের ২৩এ মার্চ সন্ধ্যার কিছু পূর্বে, প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশির উপরে, শূন্যে উপরোক্ত কথোপকথন হইতেছিল। বেলুনটি ক্রমাগত নিচের দিকেই নামিতেছিল; আরোহিগণ বুঝিতে পারিয়াছিল, যে, সমুদ্রের জলে পড়িলে ঢেউএর আঘাতে বেলুনের অস্তিত্ব লোপ পাইবে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের বিনাশ অনিবার্য। যাহা হউক, বালির বস্তা, গুলিবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্য-সামগ্রী পর্যন্ত ফেলিয়া দেওয়ায়, বেলুন হাল্‌কা হইল এবং মুহূর্ত মধ্যে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট উপরে উঠিয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রিটা দারুণ ভয়ের মধ্যে দিয়াই কাটিয়া গেল। ২৪এ মার্চ প্রাতঃকালে দেখা গেল, যে, ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল—বেলুন আবার নিচের দিকে নামিতেছে, আর ঠিক মাতালের মত হেলিয়া দুলিয়া নামিতেছে। আগে ছিল বেলুনের আকৃতি গোল, ক্রমে সেটা লম্বাটে হইতে লাগিল—যেন ভিতরের গ্যাস্‌ একটু একটু করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, এবং সে জন্যই তাহার নিম্ন-গতি। এখন উপায়! দৃষ্টি যতদূর যায়, অসীম জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, মাটির চিহ্ন মাত্রও নাই; বেলুনের নোঙ্গর আট্‌কাইবে কিসে? সুতরাং, যেরূপেই হউক্‌, বেলুনের নিম্নগতি বন্ধ করিতেই হইবে। কিন্তু হায়! শত চেষ্টার পরেও বেলুন নিচের দিকে নামিতে লাগিল। অধিকন্তু, বেলুন কাৎ হইয়া পড়িয়া বাতাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে, উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চলিল।

হতভাগা আরোহীদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়। বেলুন এখন তাহাদিগের সমস্ত চেষ্টা অগ্রাহ্য করিয়া, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিয়াছে, আর ক্রমেই সেটা চুপ্‌সিয়া যাইতে লাগিল—গ্যাস্‌ ক্রমাগতই বাহির হইয়া যাইতেছে। বেলা দুই প্রহরের কিছু পরেই দেখা গেল, বেলুন জল হইতে মাত্র ছয়শত ফুট উপরে রহিয়াছে।

বেলুনের আবরণে বেশ বড় একটি ছিদ্র হইয়াছে, সেই পথেই গ্যাস্‌ বাহির হয়—তাহা বন্ধ করা অসম্ভব। জিনিষপত্র ফেলিয়া দিয়া গাড়ী হাল্কা করিয়া, আরোহীর দল কয়েক ঘণ্টা শূন্যে থাকিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু রাত্রির পূর্বে কোন আশ্রয়স্থল দেখিতে না পাইলে তাহাদিগের মৃত্যু যে নিশ্চিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। পাঁচজন যাত্রী, প্রত্যেকেই অসমসাহসী—মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল—যেরূপেই

হউক বেলুনটা শূন্যে রাখিতেই হইবে। বেলুনের গাড়ীটা উইলো গাছের শক্ত ডাল দিয়া তৈরি একটি বাস্কেট, সেটা জলে কিছুতেই ভাসিবে না।

এই ভাবে আরও দুটো ঘণ্টা কাটিল, বেলুন তখন জলের উপরে মাত্র চার শত ফুট। এমন সময় পুনরায় নির্ভীক উচ্চকণ্ঠে কথোপকথন আরম্ভ হইল :—

"সমস্ত জিনিস ফেলে দেওয়া হয়েছে কি?"

"না, চার হাজার ডলার পূর্ণ এই একটি থলে আছে।"—

সঙ্গে সঙ্গে একটি ভারি থলি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল।

"এখন কি বেলুন উঠ্ছে?"

"সামান্য উঠেছে, কিন্তু এখনি আবার নামতে আরম্ভ করবে।"

"ফেলে দেবার মত কিছু আছে কি?

"কিছুই নাই।"

"আছে বৈকি, বেলুনের গাড়ীটার দড়ি কেটে ওটাকে জলে ফেলে দাও—আমরা জালের আবরণ ধরে ঝুলে থাক্‌ব।"

দড়ি কাটিয়া গাড়ী জলে ফেলিবামাত্র, বেলুনটা এক লাফে প্রায় দুই হাজার ফুট উপরে উঠিয়া পড়িল। পাঁচটি যাত্রী জালের দড়ি আঁকড়াইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। বেলুন ক্ষণকাল উপরে ভাসিয়া, আবার নামিতে আরম্ভ করিল।

মানুষের যাহা সাধ্য যাত্রীদল সকলই করিয়াছে। এখন ভগবানের কৃপা ভিন্ন তাহাদিগের আর রক্ষা পাইবার উপায় নাই। অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় দেখা গেল, বেলুন জল হইতে পাঁচশত ফুট উপরে।

সাইরাস হার্ডিং তাঁহার প্রিয় কুকুর টপকে চাপিয়া ধরিয়া জালের দড়িতে ঝুলিয়া রহিয়াছেন। এমন সময়ে টপ্ হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

একজন আরোহী বলিল—"টপ নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়েছে।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একজন চেঁচাইয়া উঠিল—"ডাঙ্গা, ডাঙ্গা, ডাঙ্গা! দেখতে পাচ্ছি—ডাঙ্গা!" বেলুনটা প্রাতঃকাল হইতে বাতাসে শতশত মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চলিয়া আসিয়াছিল—সেই দিকে সত্য সত্যই ডাঙ্গা দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু সেই ডাঙ্গা তখনও ত্রিশ মাইল—ঘণ্টাখানেকের কমে সেখানে পৌঁছান যাইবে না, এবং তাহাও বাতাস অনুকূল থাকিলে। এ—এক ঘণ্টা! ততক্ষণে বেলুনের সমস্ত গ্যাসই যে বাহির হইয়া যাইবে।

এটা একটা দারুণ ভাবনার কথা! যাত্রীদল পরিস্কার দেখিতে পাইতেছে—ঐ দূরে সত্য সত্যই জমাট ভূমি রহিয়াছে, যেরূপে হউক সেখানে যাইতেই হইবে। দ্বীপ কি দেশ কিছুই জানা নাই, ঝড়ে তাহাদিগকে পৃথিবীর কোন্‌খানে আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাও জানে না। কিন্তু ঐস্থানে যাইতে হইবে—জনশূন্য হউক কিংবা বাসের অনুপযুক্ত হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না।

কিন্তু বেলুন যে আর শূন্যে থাকিতে পারিতেছে না? ইহারই মধ্যে কতবার জালের তলাটা ঢেউয়ের বাড়ি খাইয়া ভিজিয়া গিয়াছে। আধ ঘন্টা পরে দেখা গেল, সেই ডাঙ্গাটা প্রায় মাইলখানেক দূরে আছে। এদিকে গ্যাস বাহির হইয়া বেলুনটা প্রায় চুপ্‌সিয়া গিয়াছে, এখন আর সেটা যাত্রীদের ভারই বহিতে পারিতেছে না। মধ্যে মধ্যে জালের নীচটা অনেকখানি পর্যন্ত জলে ডুবিয়া গিয়া, যাত্রীরাও ঢেউএর মধ্যে ডুব খাইয়া উঠিতেছে। এই সময়ে হঠাৎ বাতাসের ভর পাইয়া বেলুনটা বেগে ছুটিয়া চলিল। এইবারে যদি ডাঙ্গায় গিয়া পৌঁছায়। যখন

বেলুনটা ডাঙ্গা হইতে প্রায় আধমাইল দূরে, তখন ঢেউয়ের আঘাত খাইয়া হঠাৎ ভীষণ একটা লাফ দিল। সেই মুহূর্তে, যেন হঠাৎ তাহার ওজনটা অনেকটা কমিয়া যাওয়ায়, সেটা আবার হাজার দেড়েক ফুট উপরে উঠিয়া, মিনিট দুই পরেই ঘুরপাক খাইতে খাইতে, একেবারে বালির ডাঙ্গায় গিয়া পড়িল।

যাত্রীদল পরস্পরের সাহায্যে জালের দড়ি ছাড়াইয়া মুক্ত হইল। এদিকে আরোহীশূন্য বেলুন বাতাসের ভরে কোথায় যে উড়িয়া গেল, আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

বেলুনে যাত্রী ছিল পাঁচজন এবং একটি কুকুর, কিন্তু ডাঙ্গায় নামিল শুধু চার জন।

নিরুদ্দেশ যাত্রীটি খুব সম্ভব ঢেউয়ের আঘাতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাই হঠাৎ হালকা হওয়ার দরুণ বেলুনটা ডাঙ্গায় পড়িবার পূর্বে একবার উপরে উঠিয়াছিল। যাত্রী চারিজন, হারান যাত্রীটির ভাবনায় একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"হয়ত তিনি সাঁতার কেটে তীরে উঠবার চেষ্টা করবেন—চল, তাঁকে গিয়ে বাঁচাই।"

(ক্রমশ)

হাত পাকাবার আসর

মন

অভিসার সেনগুপ্ত | ১১ বৎসর | গ্রাহক নং ২৬১৪॥

মনটা আমার যাচ্ছে উড়ে,
আজ সকালে অনেক দূরে,
যেথায় পাখি নানান সুরে
গান গেয়ে যায় বনে।
সেথায় সবুজ ঘাসের 'পরে,
সকালবেলা শিশির ঝরে,
মনটি আমার ওইখানেতে
খেলে নীরব কোনে।
গোলাপ টগর গাছের ডালে,
সেথায় কত রূপ ছড়ালে,
আঁধার ঘেরা তাল তমালে
মন গেছে মোর চলে।

একটি ভ্রমণ কাহিনী

সিদ্ধার্থ দত্ত | বয়স-দশ | গ্রাহক নং ২৬৮৫॥

একবার আমরা উত্তর বাংলায় লাটাগুড়ি নামে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমার মামা ফরেস্টে কাজ করতেন, তাই বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার খুব ভাল লেগেছিল ওই জায়গাটা। হাওয়া-বাতাস সেখানে অবিরাম। আমরা রোজ ভোরে উঠে বেড়াতে যেতাম মাইলের পর মাইল। তারপরে রোদ উঠলে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতাম।

আমাদের থাকবার জন্য বড় বড় তিনটে ঘর ছিল। আর ছিল দক্ষিণ পশ্চিমে দুটো বড়ো বড়ো খোলা বারান্দা। সেখানে বন্ধু বলতে একটি ছোট্ট কুলকুলে নদী আর মামার এ্যালসেশিয়ান টেরীদাদা। আর মামার চাকর সুধীর দাদা। নদীটার নাম নেওড়া।

আমরা দো-তলায় থাকতাম। নিচে থাকত মামার চাকর সুধীরদাদা। আমরা যে বাড়িতে থাকতাম, সেটা কাঠের বাড়ি। সেখানকার শালগাছ-ভরা বন আমি কখনও ভুলবো না।

আমরা একবার কাছেই একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। তার নাম গরুমারা। সেখানটা একটা দ্বীপের মত। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে। চেন টেনে দিলে যাওয়ার রাস্তা

হয়ে যায়, পাটা নেমে যায়, তখন লোকেরা আসা যাওয়া করে। আসা যাওয়া করা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন দারোয়ান আবার সেই চেন টেনে দেয় আর পাটা উঠে যায়। ওখানে একটা ঝোলা বারান্দা আছে। অনেক নিচে সমতল ভুমি। সেই সমতল ভুমিতে আছে বড় বড় ঘাস আর একটা খাল। সেই খালে জন্তু জানোয়ারেরা সব জল খেতে আসে। তাই দেখবার জন্যেই ঝোলাবারান্দাটা তৈরী। এখানে অনেক জন্তুজানোয়ারের উৎপাত হয়।

একবার আমরা একটা হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।

একবার একটা পাইথন মারা দেখেছিলাম। একবার দেখেছি একটা বাঘকে, একদল হাতিকে। আমাদের গণ্ডার দেখার কাহিনী এখন বলছি। আমরা দুর থেকে একটা গণ্ডার দেখেছিলাম। গণ্ডার তার দুটি বাচ্চা নিয়ে ঘাস খেতে বেরিয়েছিল। ওরা দেখতে শান্ত অথচ শুনেছি গণ্ডার খুব হিংস্র।

আমি ওই জায়গাটার কথা জীবনে কখনো ভুলবো না। আমার ওখানে আবার যেতে ইচ্ছে করে।

"আতঙ্ক"

অভিজিৎ দাশগুপ্ত | ১৪ বৎসর | গ্রাহক নং ৩২০॥

যাচ্ছিলাম মেদিনীপুর থেকে গোমোয়। লুপ লাইনে কেবল প্যাসেঞ্জার ট্রেনই চলে। ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে ট্রেন চলেছে। রাত তখন বারোটা। বাদামপাহাড়ে ট্রেন দিলে থামিয়ে—সামনে কোথায় মালগাড়ী উল্টে গেছে।

সাঁওতাল পরগণার ছোটো স্টেশন—চারিধারেই পাহাড়। সেই ছায়া-ঘেরা অন্ধকারে পাহাড়-গুলোকে মনে হ'চ্ছিল কোনো অজানা দৈত্য—আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয় উঁকি মারছিল—সেই বিষণ্ণ রাত্রিকে বিষণ্ণতর করে তুলেছিল। দুর দুরান্তরে হায়নার চীৎকারকে মনে হচ্ছিল যেন কোন অদৃশ্য প্রেতাত্মার অট্টহাসি, আমাদের বিদ্রূপ করছে।

একটা ছোটো কামরার মধ্যে আমি একা। এক একবার মনে হচ্ছিল ভেঙ্গে দিই চারপাশে যা আছে, ছিঁড়ে দিই যত আতঙ্কের জাল। কিন্তু পারিনি। সত্যি কথা বলতে কি সেই শীতের রাত্রেও আমার শরীরে ঘাম দেখা দিচ্ছিল।

ধীরে ধীরে ভোর হ'ল। দিবানাথ তাঁর সোনার আলোর কাঠি ছুঁইয়ে দিলেন সবার গায়ে। নিশাচর দৈত্যেরা কোন মন্ত্রবলে আবার প্রস্তরীভূত হল।

আমাদের ট্রেন আবার ছাড়ল। সেই পুরোনো গতিবেগে চলে দুপুরে গোমোয় পৌছিলাম। একটা আশ্চর্য যাত্রার ছেদ টেনে দিলাম এখানেই। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা মনে হ'লে এখনও শিউরে উঠি।

পোর্ট সেইডের ইম্পিরিয়াল হোটেলের ৫৬নং ঘরে বসে আমার ডায়রি লিখছি। এখন রাত সাড়ে এগারোটা। এখানে বোধহয় অনেক রাত অবধি লোকজন জেগে থাকে, রাস্তায় চলা ফেরা করে, হৈ হল্লা করে। আবার পূবদিকের খোলা জানালাটা দিয়ে শহরের গুঞ্জন ভেসে আসছে। দশটা অবধি একটা ভ্যাপসা গরম ছিল। তারপর থেকে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে সুরু করেছে সুয়েজ ক্যানালের দিক থেকে।

আমার ঈজিপ্টে আসা কতদূর সার্থক হবে জানি না, তবে আজ সারাদিনে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তাতে কিছুটা আশাপ্রদ বলেই মনে হচ্ছে। অনেকদিন থেকেই এদিকটায় একটা পাড়ি দেবার ইচ্ছে ছিল। আমার ত মনে হয় যে কোন দেশের যে কোন বৈজ্ঞানিকেরই ঈজিপ্টটা ঘুরে যাওয়া উচিত। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও এরা বিজ্ঞানে যে আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, তা ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে। এ নিয়ে অনেক কিছু গবেষণা করার আছে। এদের কেমিস্ট্রি, এদের গণিত বিজ্ঞান, এদের চিকিৎসাশাস্ত্র সব কিছুই সেই প্রাচীন যুগে এক অবিশ্বাস্য পরিণতি লাভ করেছিল।

সবচেয়ে অবাক লাগে এদের mummy-র ব্যাপারটা। মৃতদেহকে এমন এক আশ্চর্য রাসায়নিক উপায়ে ব্যাণ্ডেজবদ্ধ অবস্থায় কাঠের কফিনে শুইয়ে রেখে দিত যে পাঁচহাজার বছর পরেও সেই ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখা গেছে যে মৃতদেহ পচা ত দূরে থাকুক্, তার কোনরকম বিকারই ঘটেনি। এর রহস্য আজ অবধি কোন বৈজ্ঞানিক উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি।

ইংলণ্ডের প্রত্নতাত্ত্বিক ডক্টর জেম্‌স সামারটন যে বর্তমানে ঈজিপ্টের বুবাসটিস অঞ্চলে এক্সক্যাভেশন চালাচ্ছেন, সে খবর গিরিডিতে থাকতেই কাগজে পড়েছিলাম। এই প্রত্নতাত্ত্বিক দলটির সঙ্গে আলাপ করে নেওয়ার উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই ছিল। সামারটনের লেখা ঈজিপ্ট সম্বন্ধে বইগুলো সবই পড়ে গিয়েছিলাম। তিন বছর সাকারায় এক্সক্যাভেশনের ফলে চতুর্থ ডাইন্যাস্টির রাজা খেরোটেপের

সেই আশ্চর্য সমাধিকক্ষ সামারটনই আবিষ্কার করেছিল। এই সামারটনের সঙ্গে ঈজিপ্টে পদার্পণ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে এমন আশ্চর্যভাবে আলাপ হবে তা কে জানত ?

সকালে হোটেলে এসে আমার ঘরের ব্যবস্থা করেই গিয়েছিলাম ম্যানেজারের কাছে, সামারটনের খোঁজ নিতে।

ভদ্রলোক আমার প্রশ্ন শুনে খবরের কাগজ থেকে দৃষ্টি তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনিও কি একই ধান্দায় এসেছেন নাকি ?'

বলার ভঙ্গীটা আমার ভালো লাগল না। বললাম, 'কেন বলুন ত ?'

ম্যানেজার বললেন, 'তাই যদি হয়, তাহলে আপনাকে সাবধান করে দেওয়াটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। নইলে সামারটনের যা দশা হয়েছে, আপনারও ওই জাতীয় একটা কিছু হবে আর কি।'

'কী হয়েছে সামারটনের ?'

'উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে—আবার কী হবে ? মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সমাধিমন্দিরে অনধিকার প্রবেশের ফলভোগ করছেন তিনি। অবশ্য বেশিদিন কষ্ট পেতে হবে না বোধহয়। স্ক্যারাব পোকার কামড় খেয়ে কম মানুষই বাঁচে।'

স্ক্যারাব বীট্‌ল-এর কথা বই-এ পড়েছি। গুব্‌রে জাতীয় বিষাক্ত পোকা ; পুরাকালে ঈজিপ্সীয়রা দেবতা বলে মান্য করত।

আরো কিছু প্রশ্ন করে জানতে পারলাম গতকাল বুবাসটিস-এ এক্সক্যাভেশনের কাজ করতে করতে সামারটন হঠাৎ নাকি চীৎকার করে পড়ে যান। তার সাঙ্গপাঙ্গরা ছুটে এসে দেখে সামারটন তার ডান পায়ের গুলিটা আঁকড়ে ধরে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে পড়ে আছেন আর বলছেন 'ছ্যাট বীট্‌ল ! ছ্যাট বীট্‌ল !'

পোকাটাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যায় নি।

সামারটনকে তৎক্ষণাৎ পোর্ট সেইডের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার অবস্থা নাকি বেশ সঙ্গীন।

খবরটা পেয়ে আর বিলম্ব না করে হাসপাতালের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নিলাম আমার তৈরি ওষুধ—মিরাকিউরল্‌। দেশে কত যে করাইত-কেউটের ছোবল খাওয়া ও কাঁকড়াবিছের কামড় খাওয়া লোক এই ওষুধের এক ডোজ খেয়েই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই।

হাসপাতালে গিয়ে দেখি সাহেবের সত্যিই সংকটাপন্ন অবস্থা। কিন্তু আশ্চর্য মনের জোর ভদ্রলোকের। এই অবস্থাতেও শান্তভাবে খাটে শুয়ে আছেন। কেবল মাঝে মাঝে আচমকা ভ্রূকুঞ্চন ও মুখ বিকৃতিতে তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা প্রকাশ পাচ্ছে।

আমি নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর একজন অনুরাগী পাঠক হিসাবে তাঁর দর্শন পাবার জন্য ঘরে ঢুকেছিলুম, কিন্তু অবাক হয়ে গেলুম যে ভদ্রলোক আমায় নামে চিনতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়—

এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায় ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি আমাকে জানালেন যে আমার লেখা বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক বইই তাঁর পড়া—এবং ভূতপ্রেতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে আমার যে মৌলিক গবেষণামূলক একটি বই আছে—সেটা নাকি তাঁর একটি অতি প্রিয় বই।

আমার উপর এই আস্থার দরুণই বোধহয় আমার ওষুধটা খেতে তার কোন আপত্তি হ'ল না।

আমি যখন হোটেলে ফিরেছি তখন বেলা সাড়ে এগারটা। বিকেল তিনটের কিছু আগে খবর এলো সামারটন অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। জ্বর নেই, শরীরের নীল ভাবটা কেটে গেছে, যন্ত্রণাও অনেক কম। আগামীকাল সকালের মধ্যে যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন এ বিষয় আমার মনে অন্তত কোন সন্দেহই ছিল না। কাল সকালে সামারটনের সঙ্গে দেখা করে কয়েকদিনের জন্য তার সঙ্গ নেওয়ার প্রস্তাবটা করতে হবে।

৮ই সেপ্টেম্বর, রাত ১২টা

আজ ভোরে উঠেই হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সামারটন একেবারে সুস্থ। গুব্‌রের কামড়ের দাগটা পর্যন্ত আশ্চর্যভাবে একদিনেই মিলিয়ে গেছে। আমার ওষুধের গুণ দেখে আমি নিজেই অবাক। কী সব অদ্ভুত জিনিসের সংমিশ্রণে এ ওষুধ তৈরি হয়েছে সেটা আর সামারটনকে বললাম না। বিশেষত গলদা চিংড়ির গোঁফের কথাটা বললে হয়ত তিনি আমাকে পাগলই ঠাউরে বসতেন। যাই হোক্—আমার প্রতি সামারটনের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এক্সক্যাভেশনে সঙ্গ নেবার কথাটা আর আমাকে বলতে হ'ল না—উনি নিজেই বললেন। আমি অবশ্য তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম।

ইনিও দেখলাম মামির ব্যাপারে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু। শুধু তাই নয়—এই যে সব ভূগর্ভস্থ প্রাচীন সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করে তার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাটি করা হচ্ছে, এর ফলে যে কোন প্রাচীন অভিশাপ সামারটন বা তাঁর দলভুক্ত কাউকে স্পর্শ করে, তার অনিষ্ট করতে পারে, এ বিশ্বাসও যেন সামারটনের আছে। যে গুব্‌রে পোকাটি সামারটনকে কামড়েছে, সামারটনের ধারণা সেটি হল সেই স্ক্যারাব গুব্‌রে—যাকে নাকি ঈজিপ্সীয়রা পুজো করত। সামারটন যে-মন্দিরে কাজ করছেন তার দেয়ালে নাকি এই গুব্‌রের খোদাই করা প্রতিমূর্তি রয়েছে। ঈজিপ্সীয়রা যে জন্তু জানোয়ার মাছ পাখির অনেক কিছুকেই দেবতার অবতার বলে পুজো করত সে তথ্য আমার জানা ছিল। আমি সামারটনকে বললাম, কোন একটা জায়গায় নাকি এক্সক্যাভেশানের ফলে একটা বেড়ালের সমাধি মন্দির পাওয়া গেছে?'

সামারটন বললেন, 'আরে, সেত এই বুবাসটিসেই—আমি এখন যেখানে কাজ করছি, সেখানে। অবিশ্যি এটা অনেকদিনের আবিষ্কার। শত-খানেক বেড়ালের সমাধি রয়েছে সেই ঘরটায়। ঠিক মানুষকে যে-ভাবে mummify করে কফিনে বন্ধ করে রাখা হত, বেড়ালকেও ঠিক সেইভাবেই রাখা হয়েছে। বেড়াল ছিল নেফ্‌দেৎ দেবীর অবতার।'

আমি স্থির করলাম, সময় ও সুযোগ পেলে এই বিচিত্র সমাধিকক্ষ দেখে আসব। বেড়াল আমার

ভীষণ প্রিয় জিনিস। বাড়িতে আমার পোষা নিউটনকে রেখে এসেছি। তার কথা মনে হলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

সামারটনের সঙ্গে দেখা করে যখন হোটেলে ফিরছি তখন বেলা বেড়ে গিয়ে বেশ গনগনে রোদ উঠেছে। হোটেলের সামনে একটা স্থানীয় লোক আমায় দেখে আমার দিকে এগিয়ে এলো। লোকটা লম্বায় ছ'ফুটের ওপর, গায়ের রং পোড়া তামাটে, চুল ছোট করে ছাঁটা ও পাকানো, চোখ দুটো কোটরে বসা, চাহনি তীক্ষ্ণ ও নির্মম।

লোকটা এগিয়ে এসে তার ডান হাতটা অত্যন্ত উদ্ধতভাবে আমার কাঁধের উপর রাখল। তারপর আমার চোখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি রেখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'আপনাকে ত ভারতীয় বলে মনে হচ্ছে, তবে আপনি ওই শ্বেতাঙ্গ বর্বরদের দলে ভিড়ছেন কেন? আমাদের দেশের সব পবিত্র প্রাচীন জিনিস নিয়ে আপনাদের এত কী মাথা ব্যথা?'

আমি পালটা বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললাম, 'কেন, তাতে কী হয়? প্রাচীন জিনিস নিয়ে মাথা ঘামালেই কি তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়? আপনি জানেন আমি প্রাচীন ঈজিপ্সীয় সভ্যতার প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা নিয়ে এদেশে এসেছি?'

লোকটার চোখদুটো যেন জ্বল জ্বল করে উঠল। তার ডান হাতটা তখনো আমার কাঁধে। সেই হাত দিয়ে একটা চাপ দিয়ে সে বলল, 'শ্রদ্ধা এক জিনিস, আর শাবল লাগিয়ে মাটি খুঁড়ে পবিত্র সমাধি কক্ষে প্রবেশ করে মৃত ব্যক্তির আত্মার অবমাননা করা আরেক জিনিস। সামারটন সাহেব কোথায় কাজ করছেন তা জানেন?'

'জানি। বুবাসটিসে চতুর্থ ডাইনাস্টির রাজা থেফ্রেসের আমলের একটি সমাধি কক্ষে।'

'সেইখানে আমার পূর্বপুরুষের সমাধি আছে সেটা আপনি জানেন?'

আমি হো হো হো করে হেসে উঠে বললাম, 'আপনি দেখছি আপনার চৌদ্দশ' পুরুষ অবধি খবর রাখেন।'

লোকটা যেন আরো ক্ষেপে উঠল। তার ডান হাত দিয়ে আমার কাঁধে একটা ঝাকুনি দিয়ে বলল, 'রাখি কি না রাখি তা ওই সব মন্দিরে আরেকটু ঘোরাঘুরি করে দেখুন না। তাহলেই টের পাবেন।'

এই বলে লোকটা আমায় ছেড়ে হনহনিয়ে রাস্তার দিকে চলে গিয়ে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেলো। আমিও হাঁফ ছেড়ে আমার ঘরে চলে গেলাম।

সামারটন কালকেই ফিরে যাবে তার কাজের জায়গায়, এবং আমি যাবো তার সঙ্গে। জিনিস-পত্তর এই বেলা গোছগাছ করে রাখা ভালো। মনে মনে একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। সেবার

নীলগিরি অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের উদ্দেশে পাড়ি দেবার সময়ও ঠিক এইরকম হয়েছিল। বেড়ালের সমাধি! ভাবলেও হাসি পায়।......

কাল সামারটনকে ওই উদ্ধতস্বভাব আধপাগলা ঢ্যাঙা লোকটার কথা বলতে হবে। আমার মনে হয় ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—আসলে এইসব পুরোনো মন্দিরে অনেক সময়ই মূল্যবান পাথরবসানো সব গয়নাগাটি পাওয়া যায়। এই সব স্থানীয় লোকেরা তা ভালোভাবেই জানে, এবং এরা হয়ত মনে করে যে হুমকি দিয়ে, অভিশাপের ভয় দেখিয়ে, নিরীহ প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে এই সব পাথর বসানো জিনিষের কয়েকটা আদায় করে নিতে পারবে। তবে লোকটা যদি বেশি জ্বালাতন করে, আমি স্থির করছি ওকে হাঁচিয়ে মারব। আমার Snuff gun বা নস্যাস্ত্রটা সঙ্গে এনেছি। নাকে তাগ করে মারলে দুদিন ধরে অনর্গল হাঁচি চলবে। তারপর দেখব বাবাজী আর বিরক্ত করতে আসে কিনা।

১০ই সেপ্টেম্বর

আমরা কাল সকালে বুবাসটিসে এসে পৌঁছেছি। সামারটনের সঙ্গে কাল দুপুরে সভ্যখনিত চার-হাজার বছরের পুরোনো সমাধি কক্ষে নেমেছিলাম। এযে কী অদ্ভুত অনুভূতি তা লিখে বোঝানো দুষ্কর। একটা সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নেমে সংকীর্ণতর সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে ঘরটায় প্রবেশ করতে হয়। সামারটনের অনুমান এটা কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সমাধিকক্ষ। বেশ বড় একটি হলঘরের মাঝখানে কারুকার্য করা কাঠের কফিন। ঘরের চারপাশে আরো ছোট ছোট সারবাঁধা সব ঘর—তার প্রত্যেক্যটির মধ্যেই একটি করে কফিন। এতে নাকি এই গণ্যমান্য ব্যক্তির পরিষদবর্গের মৃতদেহ রয়েছে। ঈজিপ্সীয়রা বিশ্বাস করত মৃতব্যক্তির আত্মা নাকি মৃতদেহের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে, এবং জীবিত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যা কিছু প্রয়োজন হয়, এইসব মৃত আত্মারও নাকি সেই সবের প্রয়োজন হয়। তাই কফিনের পাশে দেখলাম খাবার পাত্রে খাদ্যদ্রব্য, মদের পিপেতে মদ, পোষাক-আষাক, প্রসাধনের জিনিস, খেলাধুলার সরঞ্জাম, সবই রাখা রয়েছে।

সামারটন একটা কফিনের ডালা খুলে তার ভিতরের মামিটা আমায় দেখিয়ে দিলেন। হাতদুটো বুকের ওপর জড়ো করা। মাথা থেকে পা অবধি ব্যাণ্ডেজে আবৃত। ডালা খুলতেই একটা উগ্র গন্ধ নাকে প্রবেশ করল। আমি অবাক বিস্ময়ে মৃতদেহটিকে দেখতে লাগলাম। কত পড়েছি বই-এ এই মামির কথা!

মামির বুকের উপর সেই চারহাজার বছরের পুরোনো প্যাপাইরাস কাগজে তৎকালীন ঈজিপ্সীয় হাইরোগ্লিফিক ভাষায় কী যেন লেখা রয়েছে। এ ভাষা আমার জানা নেই। সামারটন অবশ্যই জানেন। কিন্তু আধুনিক ভাষার মত এতো আর গড়গড় করে পড়া যায় না। এ ভাষা বুঝতে সময় লাগে। সামারটন বললেন, 'ওই প্যাপাইরাসে মৃতব্যক্তির পরিচয় রয়েছে। শুধু যে নামধাম তা নয়। কবে কী ভাবে এর মৃত্যু হয়েছে তাও লেখা রয়েছে।'

সারাদিন সমাধিকক্ষে ঘোরাঘুরির 'পর সন্ধ্যার দিকে তাঁবুতে ফেরার পথে সামারটন আমাকে

জিগ্যেস করলেন, 'তুমি ত মনে কর ভূত-প্রেত বা অলৌকিক সব কিছুরই একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, তাই না? অন্তত তোমার বই পড়ে ত তাই মনে হয়।'

আমি বললাম, 'সেটা ঠিকই। তবে আমি এটাও মানি, যে বিজ্ঞান যেমন অনেক দিকে এগোতে পেরেছে, তেমনি আবার অনেক কিছুরই হদিস এখনো পর্যন্ত পায় নি। এই যেমন স্বপ্ন কেন দেখে মানুষ, এই নিয়েই ত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে আমি বিশ্বাস করি যে পঁচিশ, কি পঞ্চাশ, কি অন্তত একশো বছরের মধ্যে জগতের সব রহস্যেরই কারণ বৈজ্ঞানিকরা জেনে ফেলবে।

সামারটন একটু ভেবে বল্‌লেন, 'এই যে সব প্রাচীন সমাধিকক্ষে আমরা প্রবেশ করছি, এখানকার অনেকের মতে তাতে নাকি এইসব মৃতব্যক্তির আত্মা অসন্তুষ্ট হচ্ছে। এমনকি তারা নাকি আমাদের উদ্দেশে অভিশাপ বর্ষণ করছে। হয়ত একদিন আমাদের এই পাপের ফল ভোগ করতে হবে।'

কথাটা শুনে আমি হেসে ফেল্লাম, কারণ সেদিনের সেই পাগলাটার কথা আমার মনে পড়ে গেল।

সামারটনকে লোকটার কথা বলতে তিনিও হেসে ফেললেন। বললেন, 'আরে, ওত প্রথম দিন থেকেই আমার পেছনে লেগেছে। আমাকেও হুম্‌কি দিয়েছিল এসে। ও আর কিচ্ছু না—কিছু বকশিস পেলেই ও আর জ্বালাতন করবে না।'

আমি বললাম্‌, 'তা দিয়ে দিলেই ত পারেন। আপদ বিদেয় হয়।'

সামারটন মাথা নেড়ে বললেন, 'এই সব ছ্যাচড়া লোকগুলোর পেছনে অর্থব্যয় করার ইচ্ছে নেই আমার। এতে ওদের লোভ আরো বেড়ে যায়। ভবিষ্যতে যারা এই সব কাজে এখানে আসবে তাদের কথাও ত ভাবতে হবে আমাদের। তার চেয়ে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করাই ভালো। কিছুদিন বিরক্ত করে লাভের আশা নাই দেখে আপনিই সরে পড়বে।'

তাঁবুতে ফিরে সরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে একটা ক্যানভাসের ডেক চেয়ার নিয়ে বাইরে গিয়ে বসলাম। পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখি অস্তগামী সূর্যের সামনে গির্জার পিরামিডটা গাঢ় ধূসর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই পিরামিড যে প্রাচীন যুগে কী ভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল, তা আজও ঠিক বোঝা সম্ভব হয় নি।

তাঁবুর উত্তর দিকে এক লাইন খেজুর গাছ। তার একটার মাথায় দেখলাম গোটা তিনেক শকুনি থুম্‌ হয়ে বসে আছে। শকুনিকেও নাকি পুরাকালে এরা দেবতার অবতার বলে মনে করত। আশ্চর্য জাত ছিল এই প্রাচীন ঈজিপ্সীয়রা!

<u>১২ সেপ্টেম্বর</u>

আজ সামারটন একটা প্রস্তাব করে আমাকে একেবারে হকচকিয়ে দিলেন, এবং প্রস্তাবটা শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে মৃত্যুর কবল থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য তিনি আমার প্রতি কী গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সারাদিন বুবাসটিসের বেড়ালের সমাধিকক্ষ দেখে সন্ধ্যার দিকে যখন তাঁবুতে ফিরছি তখন পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সামারটন হঠাৎ বললেন,' 'শ্যাঙ্কু, তুমি আমার জন্যে যা করেছ, তার

প্রতিদানে আমি কী করতে পারি সেই চিন্তাটা কদিন থেকে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আজ একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে, এখন সেটা তোমার মনঃপুত হয় কিনা সেটাই জানা দরকার।'

এই পর্যন্ত বলে সামারটন একটু দম নেবার জন্য থামলেন। গুবরের কামড় যে ভেতরে ভেতরে তাঁকে বেশ দুর্বল করে দিয়েছে সেটা বুঝতে পারা যায়। কিছুটা পথ চলার পর সামারটন বললেন, 'তোমার ত মামি নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে আছে। ধর যদি আমার আবিষ্কৃত মামিগুলোর মধ্যে একটা তোমাকে দেওয়া যায়—তুমি কি খুশি হবে, না অখুশি হবে?'

আমি প্রস্তাবটা শুনে এমন অবাক হয়ে গেলাম যে প্রথমে আমার মুখ দিয়ে কথাই সরল না। আমার এক্সপেরিমেন্টের জন্য একটা নিজস্ব মামি নিয়ে দেশে ফিরতে পারত, এ আমার স্বপ্নের অতাত। কোনমতে ঢোক গিলে বললাম, "একটা মামি নিয়ে যেতে পারলে আমার এ-অভিযান সম্পূর্ণ সার্থক হবে বলেই আমি মনে করি, এবং এ-ঘটনা যদি ঘটে তাহলে আমি তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

সামারটন মুচকি হেসে বলল, 'তুমি কি চাও? বেড়াল, না মানুষ?'

আমার গবেষণার জন্য অবিশ্যি বেড়াল আর মানুষে কোন তফাৎ হোত না, কিন্তু আমার প্রিয় নিরীহ নিউটনের কথা ভেবে কেন জানি বেড়ালের মামি সঙ্গে নিতে মন চাইল না। নিউটন সব সময়েই আমার ল্যাবরেটরির আশে পাশে ঘুর ঘুর করে। হঠাৎ একদিন চার হাজার বছরের পুরোনো বেড়ালের মৃতদেহ সেখানে দেখলে তার যে কী মনোভাব হতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন। আমি তাই বললাম, 'মানুষই প্রেফার করব।'

সামারটন বলল, 'বেশ ত—কিন্তু নেবে যখন একটা ভালো জিনিসই নাও। বুবাসটিসেই বেড়ালের কবরস্থানের কাছেই আরেকটা সমাধিকক্ষ আমি আবিষ্কার করেছি, যাতে প্রায় ত্রিশজন মানুষের মামি রয়েছে। এরা যে কী ধরণের লোক ছিল সেটা এখনো বুঝতে পারা যায় নি। আমার মনে হয় এদের মৃত্যুর ব্যাপারে কোন রহস্য জড়িত আছে। এদের কফিনে প্যাপাইরাস কাগজে যে হাইরোগ্লিফিক লেখা আছে, তার মধ্যেও একটা যেন বিশেষত্ব আছে—আমি এখনো পড়ে উঠতে পারি নি। তোমাকে এই ত্রিশটির মধ্যে একটি কফিন দিয়ে দেবো। কিন্তু তার ভেতর থেকে লেখাটা আমি বার করে নেবো। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে পাঠোদ্ধার করে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। তার মধ্যে তুমি যা গবেষণা চালাবার তা চালিয়ে যেও—এবং তোমার ফাইণ্ডিংস আমাকে জানিয়ে দিও। মামির রাসায়নিক রহস্য তুমি যদি উদ্ঘাটন করতে পার তাহলে হয়ত একদিন নোবেল প্রাইজও পেয়ে যেতে পার তুমি।'

আমার আর ঈজিপ্টে আবার কোন প্রয়োজন নেই। সামারটনের দেওয়া কফিনটি প্যাকিং কেসে ভরে ফেলে জাহাজে নিয়ে দেশে ফিরতে পারলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তারপর গবেষণার জন্য ত অফুরন্ত সময় পড়ে আছে। সত্যি, সামারটনের—বদান্যতার কোন তুলনা নেই। আসলে বৈজ্ঞানিকেরা ভিন্ন দেশবাসী হলেও তারা কেমন যেন পরস্পরের প্রতি একটা আত্মীয়তা

৭

অনুভব করে। সামারটনের সঙ্গে আমার তিনদিনের আলাপ, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সে আমার বহুকালের পরিচিত।

১৫ই সেপ্টেম্বর

আজ সকালে পোর্ট সেইডে ফিরেছি। এসেই এক বিদ্‌ঘুটে ঘটনা। আমার হোটেলের কাছেই একটা বড় দোকান থেকে একটা চামড়ার পোর্টফোলিও কিনে রাস্তায় বেরোতেই সেই পাগ্‌লাটে লম্বা লোকটির সঙ্গে একেবারে—চোখাচুখি। শুধু তাই নয়—সে এগিয়ে এসে আমার সার্টের কলারটা একেবারে চেপে ধরেছে। আমি ত রীতিমত ভ্যাবাচাকা। সত্যি বলতে কি, গত কদিনের আনন্দ উত্তেজনায় আমি লোকটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আর এ ধরণের কোন বিপদের আশঙ্কা করিনি বলেই বোধহয় আমার সঙ্গে কোন অস্ত্রশস্ত্রও ছিলনা।

লোকটা রক্তবর্ণ চোখ করে আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সেই ভাঙা ইংরিজিতে বলল, 'তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, তুমি আমার কথা শুনলে না। সেই আমারই পূর্বপুরুষের মৃতদেহ নিয়ে চলেছ তুমি নিজের দেশে। এর জন্যে কী শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে তা তুমি ধারণাও করতে পার না। এর প্রতিশোধ আমি নিজে নেবো। আমি নিজে স্বহস্তে এই অপরাধের শোধ তুলব।'

এই বলে লোকটা আমার কলারটাকে খামচিয়ে চাপ দিয়ে প্রায় আমার শ্বাসরোধ করার উপক্রম করছিল এমন সময় রাস্তারই একটা পুলিশ দৌড়ে এগিয়ে এসে গায়ের জোরে লোকটাকে ছাড়িয়ে দিল। পথচারী কয়েকজন লোকও আমার বিপদ দেখে এগিয়ে এসেছিল। তারা আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বলল, 'ও লোকটা ওইরকমই পাগল। অনেকবার হাজত গেছে—আবার ছাড়া পেলেই উৎপাত করে।'

পুলিশটাও বলল, যে আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। লোকটিকে উত্তমমধ্যম দিয়ে তাকে সায়েস্তা করার বন্দোবস্ত করা হবে।

আমার নিজেরও তেমন উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। দুদিন বাদেই ভারতগামী জাহাজে আমার প্যাসেজ বুক করা হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সামারটনের দেওয়া খৃষ্টপূর্ব দুহাজার বছরের একটি ঈজিপ্সীয়ের মৃতদেহ। দেশে গিয়ে তার ব্যাণ্ডেজ খুলে চলবে তার উপর গবেষণা। মামির রাসায়নিক রহস্য আমাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে।

১৭ই সেপ্টেম্বর

লোহিত সাগরের উপর দিয়ে আবার জাহাজ চলেছে। সমুদ্র রীতিমত রুক্ষ—কিন্তু তাতে আমার শরীরে কোন কষ্ট নেই—কেবল কলমটা সোজা চলে না বলে লিখতে যা একটু অসুবিধে। জাহাজের মালঘরে রয়েছে প্যাকিং কেসে বন্ধ কফিন। আমার মন পড়ে রয়েছে সেখানেই। সামারটন বন্দরে

এসেছিল আমাকে গুডবাই করতে। তাকে মনে করিয়ে দিলাম, কফিনের লেখাটা পড়া হলেই সেটা

যেন আমাকে জানিয়ে দেয়, আর তাকে এও বললাম যে অবসর পেলে সে যেন আমার অতিথি হয়ে গিরিডিতে এসে আমার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে যায়।

জাহাজ যখন ছাড়ছিল তখন ডাঙার দিকে চেয়ে ভীড়ের মধ্যে একটা উঁচু মাথা দেখতে পেলাম। দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে দেখি সেই পাগলাটা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার চোখে ও ঠোঁটের কোণে ক্রুর, হিংস্র হাসি আমি কোনদিনও ভুলব না। পুলিশ বাবাজী বোধহয় সায়েস্তা করতে পারেনি লোকটাকে।

লোহিত সাগরের উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। এবার লেখা বন্ধ করতে হল।

২৭শে সেপ্টেম্বর

আজ সকালে গিরিডি পৌঁছেছি। বুবাসটিসের মরুভূমিতে রোদে পুড়ে আমার রংটা যে বেশ কয়েক পোঁচ কালো হয়েছে সেটা আমার চাকর প্রহ্লাদের অবাক দৃষ্টিতেই প্রথম খেয়াল করলাম। আমার ঘরের আয়েনা অবশ্য সে অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করল।

নিউটন এগিয়ে এসে আমার পাৎলুনে তার পা ঘষতে আরম্ভ করল। আর মুখে সেই চিরপরিচিত স্নেহ সিক্ত মিউ মিউ শব্দ। ভাগ্যিস বেড়ালের মৃতদেহ অনিনি সঙ্গে করে। নিউটন কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারত না ওটা।

কফিনটা ল্যাবরেটরির অনেকখানি জায়গা দখল করে বসেছে। আমার আর তর সইছিল না, তাই দুপুরের মধ্যেই কফিনটা প্যাকিং কেস থেকে বার করিয়ে নিয়েছি।

আজই প্রথম কফিনটাকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। তার চারপাশে এবং ঢাকনার উপরটা সুন্দর কারুকার্য করা রয়েছে। ঈজিপ্সীয়রা কাঠ খোদাই এর কাজে যে কতদূর দক্ষতা অর্জন করেছিল তা এই কাজ থেকেই বোঝা যায়।

কফিনের ডালাটা খুলতে আরেকটা বাক্স বেরোল। সেটা আকারে একটা শোয়ানো মানুষের মত। অর্থাৎ ভিতরে যে মৃতদেহটি রয়েছে এটা তারই একটা সহজ প্রতিকৃতি। এর চোখ নাক মুখ সবই রয়েছে, আর সর্বাঙ্গে রয়েছে রঙীন তুলির নকশা।

এই দ্বিতীয় বাক্সের ঢাকনাটা খুলতেই সেই চেনা গন্ধটা পেলাম, আর ব্যাণ্ডেজ মোড়া মৃতদেহটি দেখতে পেলাম। অন্য সব মামির যেমন দেখছি, এরও তেমনি হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করা। আপদ মস্তক ব্যাণ্ডেজ মোড়া, তাই লোকটার চেহারা কেমন তার কোন আন্দাজ পেলাম না। তবে লোকটি যে লম্বা সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। আমার চেয়ে প্রায় এক হাত বেশি। অর্থাৎ ছফুটের বেশ উপরে।

ব্যাণ্ডেজ খোলার কাজটা আগামী কালের জন্য রেখে দিলাম। আজ বড় ক্লান্ত; তাছাড়া আবার গবেষণার সরঞ্জামও সব পরিষ্কার করে রাখতে হবে। উশ্রীর বালি কিছুটা এসে জমেছে তাদের মধ্যে।

আবার অবিনাশ বাবুকে কাল খবর দিয়ে ডেকে এনে এই বাক্সের ডালা খুলে দেখিয়ে দেবো।

আবার বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা তার একটা বাতিক। এটা দেখলে পর কিছু-দিনের জন্য বোধহয় মুখটা বন্ধ হবে। এই কিছুক্ষণ আগে দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে আমি ত অবিনাশবাবু মনে করেই প্রহ্লাদকে দেখতে পাঠিয়েছিলাম। সে ফিরে এসে বল্ল কেউ নেই। তাহলে বোধহয় ঝড়েই শব্দ হচ্ছিল। কদিন থেকেই নাকি এখানে ঝড় বৃষ্টি চলেছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর

কাল যা ঘটনা ঘটে গেছে তারপরে আর ডায়রি লেখার সামর্থ্য ছিল না। তাই আজ সকালে ঠাণ্ডা মাথায় কালকের ঘটনাটা লিখবার চেষ্টা করছি। পরশুর ডায়রিতে সন্ধ্যাবেলা দরজায় ধাক্কার কথা লিখেছি। তখন ভেবেছিলাম বুঝি ঝড়ে এইরকম শব্দ হচ্ছে। রাত এগারোটা নাগাৎ ঝড়টা থেমে যায়। আবার ঘুমও এসে যায় তার কিছুক্ষণ পরেই। কটার সময় ঠিক খেয়াল নেই, আবার সেই ধাক্কার শব্দে ঘুমটা ভেঙে যায়।

প্রহ্লাদ আমার ঘরের বাইরের বারান্দায় শোয়। ওর আর সবই ভালো, কেবল দোষের মধ্যে ঘুমটা অতিরিক্ত গাঢ়। এই ধাক্কার শব্দে ওর ঘুমের কোনই ব্যাঘাত ঘটেনি। অগত্যা আমি নিজেই আমার টর্চটা হাতে করে চললুম দেখতে কে এলো এত রাত্রে।

নিচে গিয়ে সদর দরজা খুলে কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। টর্চের আলো ফেলে চার-দিকটা দেখলাম। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ আমার হাতটা নিচে নামায় আলোটা দরজার চৌকাঠের ঠিক সামনে সিঁড়ির উপর পড়াতে দেখি সেখানে ভিজে পায়ের ছাপ। আর সেই পায়ের আয়তন দেখেই মনের ভেতরটা খচ্ খচ্ করে উঠল। গিরিডি শহরে এত বড় পায়ের ছাপ কার হতে পারে?

যারই হোক না কেন, তিনি উধাও হয়েছেন। এবং একবার এসে যখন ফিরে গেছেন, তখন আশা করা যায় যে এত রাত্রে হয়ত তার আর পুনরাগমন ঘটবে না।

আমি দরজা বন্ধ করে ফিরে গেলুম আমার শোবার ঘরে। যাবার পরে কী জানি খেয়াল হ'ল, ল্যাবরেটরির ভিতরটা একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিলাম। কোন পরিবর্তন বা অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করলাম না। কফিন যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ডালাটাও বন্ধই আছে।

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে দেখি নিউটন বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, তার লোমগুলো খাড়া, আর সর্বাঙ্গে কেমন যেন তটস্থ ভাব। হয়ত দরজা ধাক্কার শব্দতেই নিউটনের ঘুম ভেঙে গেছে, এবং এত রাত্রে আমার বাড়িতে এ ধরণের ঘটনা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলেই সে নিজেও অসোয়াস্তি বোধ করছে।

আমি নিউটনকে কোলে তুলে আমার শোবার ঘরে নিয়ে এলাম। তারপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিউটনকে খাটের পাশেই মেঝেতে কার্পেটে শুইয়ে দিয়ে নিজেও বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

পরদিন-অর্থাৎ গতকাল—সকাল সকাল উঠে কফি খেয়ে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে হাজির হলাম। ঘণ্টা দু এক ধরে আমার কাঁচের সরঞ্জামগুলো পরিষ্কার করলাম। টেস্ট টিউব, রিটর্ট, জার, বোতল, ফ্লাস্ক্-এ সব গুলোতেই ধুলো পড়েছিল।

তারপর প্রহ্লাদকে বললাম, আমি যতক্ষণ ল্যাবেরেটরিতে আছি ততক্ষণ যেন কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া না হয়, এবং সে নিজেও যেন ওয়ার্নিং না দিয়ে না ঢোকে।

তারপরে কফিনের পাশে সরঞ্জাম সমেত একটা টেবিল ও আমার নিজের বসার জন্য একটা চেয়ার এনে আমার কাজ সুরু করে দিলাম। মৃতদেহকে অবিকৃত অবস্থায় রাজার জন্য ঈজিপ্সীয়রা যে সব মশলা ব্যবহার করত তার মধ্যে ন্যাট্রন, কস্টিক সোডা, বিটুমেন, বলসাম ও মধুর কথা জানা যায়। কিন্তু এছাড়াও এমন কোন জিনিস ঈজিপ্সীয়রা ব্যবহার করত যার কোন হদিস পরীক্ষা করেও পাওয়া যায়নি। আমাকে এই অজ্ঞাত উপাদানগুলি গবেষণা করে বার করতে হবে।

বাক্সের ডালা ও কফিনের ডালা খুলে আমি আরেকবার ব্যাণ্ডেজ পরিবৃত মামিটার দিকে চেয়ে দেখলাম। মৃতদেহের কোন বিকার না ঘটলেও, হাজার হাজার বছরে ব্যাণ্ডেজগুলো কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। খুব সাবধানে চিমটে দিয়ে খুলতে হবে সেগুলোকে।

হাতে দস্তানা ও মুখে মাস্ক পরে আমার কাজ সুরু করে দিলাম।

মাথার উপর থেকে ব্যাণ্ডেজটা খুলতে সুরু করে প্রথম কপাল, এবং তারপরে মুখের বাকি অংশটা বেরোতে আরম্ভ করল। কপালটা বেশি চওড়া নয়। চোখ দুটো কোটরে ঢোকা। নাক বেশ উঁচু। ডানদিকের গালে ওটা কী? তিনটে গভীর ও লম্বা দাগ। কোন তীক্ষ্ণ জিনিস দিয়ে চেরা হয়েছে যেন গালের চামড়াটাকে। তলোয়ার যুদ্ধে এদাগ সম্ভব কী? কিন্তু তাহলে তিনটে হবে কেন? আর দাগগুলো সমান্তরাল ভাবেই বা যাবে কেন?

ঠোঁটের কাছটা পর্যন্ত যখন বেরিয়েছে তখনই যেন মুখটা কেমন চেনা চেনা বলে মনে হ'ল। এই চোয়াল, এই চোখ, এই নাক—কোথায় দেখেছি এ চেহারা? মনে পড়েছে! পোর্ট সেইডের সেই পাগলের সঙ্গে এ চেহারায় আশ্চর্য সাদৃশ্য।

কিন্তু সেটাত তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের বাঙালিদের পরস্পরের মধ্যে যেমন চেহারার পার্থক্য দেখা যায়—ঈজিপ্সীয়দের মধ্যে পার্থক্য তার চেয়ে অনেক কম। প্রাচীন ঈজিপ্সীয় মূর্তিগুলোর মধ্যে যেরকম চেহারা দেখা যায়, পোর্ট সেইডের রাস্তা ঘাটে আজকের দিনেও সেরকম চেহারা অনেক চোখে পড়ে। সুতরাং এতে অবাক হবার কিছুই নেই। ঈজিপ্সীয়দের মধ্যে ধরে নেওয়া যায় এটা একটা খুব টিপিক্যাল চেহারা।

মনে মনে ভাবলাম, সেই পাগল বলেছিল—আমার পূর্বপুরুষের মৃতদেহ নিয়ে চলেছ তুমি! বোধহয় তার কথায় আমলটা তখন একটু বেশিই দিয়েছিলাম, তাই এখন আদল দেখে মনে একটা অমূলক আশঙ্কা জাগছে।

পোর্ট সেইডের স্মৃতি অগ্রাহ্য করে আমি ব্যাণ্ডেজ খোলার কাজ এগিয়ে চললাম। গলার কাছ

থেকে ব্যাণ্ডেজটা সত্যিই পচা বলে মনে হতে লাগল। চিমটের প্রতি টানে সেটা টুক্‌রো টুকরো হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এ ব্যাপারে অধৈর্য হলে মুশকিল—তাই অত্যন্ত ধীর ও শান্তভাবে চালাতে লাগলাম হাত।

সময় যে কী ভাবে কেটে যাচ্ছে, সে বোধ কাজের সময়ে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। পাঁজরের নীচটা যখন পৌঁছেছি তখন খেয়াল হল যে অন্ধকার হয়ে এসেছে বাতিটা জ্বালানো দরকার। চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাব—এমন সময় জানালার দিকে চোখ পড়তেই সর্বাঙ্গে যেন একটা শিহরণ খেলে গেল।

জানালার কাঁচে মুখ লাগিয়ে ঘরের ভিতরে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে পোর্ট সেইডের সেই পাগল। তার চোখে মুখে আগের চেয়েও শতগুণ হিংস্র ও উন্মত্ত ভাব। সে একবার আমার দিকে ও একবার কফিনের দিকে চাইছে।

ঘরে আলো জ্বালালে হয়ত আতঙ্কের ভাবটা একটু কমবে এই মনে করে দেয়ালে সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েছি, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড ধাক্কায় জানালার ছিটকিনিটা ভেঙে উপড়ে ফেলে লোকটা একলাফে একেবারে আমার ল্যাবরেটরির মধ্যে এসে পড়ল। তারপর তার পৈশাচিক দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ করে হাত দুটোকে বাড়িয়ে আমার দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

তারপরের মুহূর্তটা ঠিক পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা আমার সাধ্য নেই। কারণ সমস্ত জিনিসটা ঘটে গেল একটা বৈদ্যুতিক মুহূর্তের মধ্যে। লোকটাও আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ফ্যাঁস শব্দ করে নিউটন কোত্থেকে জানি এসে সোজা লাফিয়ে পড়ল লোকটার মুখের উপর।

তারপর একেবারে রক্তাক্ত ব্যাপার। পাগলের ডান গালে একটা বীভৎস আঁচড় দিয়ে নিউটন তাকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলল। নিউটনের আক্রোশ আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল এই যে, লোকটা সেই যে রক্তাক্ত গাল নিয়ে মাটিতে পড়ল—সেই অবস্থা থেকে সে আর উঠতে পারল না। শক্‌ থেকে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ—এ ছাড়া তার এভাবে মৃত্যুর আমি কোন কারণ খুঁজে পেলাম না।

লোকটা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে নিউটন লেজ গুটিয়ে সুবোধ বালকটির মত ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে চলে গেল, আর আমি একটা অসহ্য দুর্গন্ধ পেয়ে কফিনের দিকে চেয়ে দেখি চার হাজার বছরের পুরনো মৃতদেহে বিকারের লক্ষণ দেখা গেছে। এই পাগলটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঈজিপ্সীয়ান যাদুর মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।

আমি আর দ্বিধা না করে কফিনের ডালাটা বন্ধ করে, ছত্রিশ রকম সুগন্ধ ফুলের নির্যাস মিশিয়ে আমার নিজের তৈরি এসেন্সের খানিকটা ল্যাবরেটরির চারিদিকে স্প্রে করে দিলাম।

মমির রহস্য রহস্যই রয়ে গেল এ-যাত্রা। প্রাচীন ঈজিপ্সীয় বৈজ্ঞানিক এই একটি ব্যাপারে এখনো ভারতের সেরা বৈজ্ঞানিকের এক ধাপ উপরে রয়ে গেলেন।

স্থানীয় পুলিশে খবর পাঠাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পড়ল। এখানকার ইনস্পেক্টর যতীন সমাদ্দার আমাকে খুবই সমীহ করেন। তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, 'ওই কাঠের বাক্সের মৃতদেহটির জন্য ত আর— আপনি দায়ী নন। কিন্তু ওই যে মাটিতে যিনি পড়ে আছেন, তাঁর মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে একটু ঝক্কি পোয়াতে হবে।'

আমি বললাম, 'সে হোক্। আপাতত আপনি এই প্রাচীন এবং নবীন লাশ দুটোকেই এখান থেকে সরাবার বন্দোবস্ত করুন ত!

৭ই অক্টোবর

আজ সামারটনের চিঠি পেয়েছি। লিখেছে, 'প্রিয় প্রোফেসর শঙ্কু, আশা করি নোবেল প্রাইজ পাবার পথে বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছ। তোমার কফিনের প্যাপাইরসটার পাঠোদ্ধার করেছি। তাতে মৃত ব্যক্তির পরিচয় দিয়ে বলা হচ্ছে—"ইনি জীবদ্দশায় বেড়ালমুখী মেফদেৎ দেবীর অবমাননা করেছিলেন বলে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু সেই দণ্ড ভোগ করার আগেই একটি বেড়ালের আঁচড় খেয়ে রহস্যজনক ভাবে তার মৃত্যু হয়।" অর্থাৎ দেবী তাঁর অবতারের রূপ ধরে তার অপমানের প্রতিশোধ নিজেই নিয়েছিলেন। আশ্চর্য নয় কি? এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী হতে পারে সেটাও একবার ভেবে দেখতে পার। তোমার কাজ কেমন চলছে জানিও। আমি ইংলণ্ডে ফিরে প্রাণপণে নীট্‌ল-মাহাত্ম্য প্রচার করছি। ইতি ভবদীয় জেম্‌স সামারটন।'

সামারটনের চিঠিটা পড়ে ভাঁজ করে খামের ভিতর রাখতে যাব এমন সময় আমার পাৎলুনে নিউটনের গা-ঘষা অনুভব করলাম। আমি সস্নেহে তাকে কোলে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হে মার্জার, তুমিও কি মেফদেৎ দেবীর অবতার নাকি?'

নিউটন বলল, 'ম্যাও!'

অরবিন্দ দাশগুপ্ত

ভারতীয় ক্রীড়া-কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী ভাষণে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত চাগ্‌লা অনেক সারগর্ভ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে শিক্ষার একটী অপরিহার্য গুণ হল খেলাধুলা এবং পড়াশুনার সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলা-ধুলাকেও উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। তিনি খেলার মাঠ ও দেশে স্টেডিয়ামের সংখ্যা স্বল্পতায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শ্রীযুক্ত চাগলার মতে আমাদের দেশীয় গ্রাম্য খেলাধুলাগুলিকে আবার চালু করা উচিৎ। শ্রীযুক্ত চাগলা আরও বলেছেন যে সরকারের বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার অভ্যন্তরীণ কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিৎ নয়। জাতীয় ক্রীড়া-কংগ্রেসে যে সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা খুবই সময়োপযোগী। দেশের ক্রীড়া-পরিচালকগণ ও ক্রীড়ামোদীরা এ বিষয়ে অবহিত ও সজাগ থাকিলে দেশের খেলার মান উন্নত হবার আশু সম্ভাবনা।

হকি :

হকি ভারতীয় জাতীয় খেলা এ কথা বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় হকির বুনিয়াদ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে। গত অলিম্পিক খেলায় পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হয়ে হকিতে ভারত বিশ্ব-নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পুরানো দিনের অজেয় খেলোয়াড় ধানচাঁদ, অপনিং কার, বনবির সিং ইত্যাদির স্থান পূর্ণ করবার মতন খেলোয়ার আজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাঙ্গালীর পক্ষে আরও দুঃখের কথা হকি খেলায় বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা ক্রমশই বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের তালিকা দেখলেই তা বোঝা যাবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালী তরুণেরা সচেষ্ট না হলে হকি খেলায় বাঙলাদেশ পেছিয়ে থাকবে।

কেনিয়া থেকে বাছাই হকি খেলোয়াড়ের একটী দল ভারত ভ্রমণে এসেছেন ও এরই মধ্যে হকিতে তাদের প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করেছেন। ভারতীয় বাছাই একাদশের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত তিনটী টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে। বোম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রথম খেলাটীতে উভয় পক্ষই দুটী করে গোল করেন। হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে কেনিয়া ৩-২ গোলে জয়লাভ করেন। মাদ্রাজে তৃতীয় খেলায় ভারত ১-০ গোলে জয়লাভ করেছে। ভারতীয় খেলার মানের নিম্নগতি এ থেকে প্রমাণিত হবে।

বোম্বেতে অনুষ্ঠিত এ বৎসরের গোল্ডকাপ প্রতিযোগিতায় ফাইনালে কাস্টমস্ কে ২-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান বিজয়ী হয়েছেন। মোহনবাগানই কলকাতার সর্বপ্রথম দল যারা এ প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার সম্মান লাভ করেছেন।

ক্রিকেট :

ভারতীয় ক্রিকেট খেলার মান উন্নত করবার জন্য ভারতীয় প্রদেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক যে খেলা প্রবর্তিত হয়েছিল তাকে রণজী ট্রফি প্রতিযোগিতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ বৎসরের রণজী ট্রফী প্রতিযোগিতায় বোম্বে ফাইনালে রাজস্থানকে পরাজিত করে আবার রণজীট্রফি বিজয়ী হয়েছে। এ বিজয়ে তারা আবার ভারতীয় ক্রিকেটে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রমাণ করেছে। উদীয়মান খেলোয়াড় হনুমন্ত সিং কৃতিত্বপূর্ণ ভাবে খেলে প্রমাণ করেছেন যে তিনি সত্যিই একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়।

ইডেন উদ্যানে অসময়ে অনুষ্ঠিত কমনওয়েল্‌থ একাদশ ও ভারতীয় একাদশের প্রদর্শনী খেলাটী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। এ খেলায় কমনওয়েল্‌থ দল ৭ উইকেটে জয়লাভ করেন। প্রদর্শনী খেলাটীর বিশেষত্ব ছিল উভয় দলই একটী মীমাংসার জন্য খেলেছিলেন। এ খেলায় উভয় ইনিংসেই শতাধিক রান করে কমনওয়েল্‌থ দলের নার্স সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখান।

টেনিস :

ইণ্টার-জোন ডেভিস কাপ খেলায় দক্ষিণ ভায়েটনামকে ৫-০ খেলায় হারিয়ে ভারত ইণ্টার জোন ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। ফাইনালে ফিলিপাইন্‌স্ ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। এ খেলা হবে ফিলিপাইনসের রাজধানী ম্যানিলায়।

গত মার্চ মাসে এক অভিজ্ঞ ও প্রবীণ যুগোশ্লাভ টেবিল টেনিস দল ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। ভারতীয় বাছাই খেলোয়াড়দের সঙ্গে মোট তিনটী প্রদর্শনী খেলার সবগুলিতেই তারা বিজয়ী হয়েছেন। অবশ্য এ ফলাফল অপ্রত্যাশিত নয়। তবুও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতের জয়ন্ত ভোরা ও খোদাইজী যুগোশ্লাভিয়ার ভিকো ও হারবুদার বিরুদ্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছিলেন।

বাচ-খেলা (Boat Race)

গত ২৮শে মার্চ কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাৎসরিক বোট রেস অন্যান্য বৎসরের

মতই তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে নিষ্পন্ন হয়। এ বৎসরের বোট রেসের ফলাফল অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে নৌকো পরিচালনা করে শক্তিশালী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে আফ্রিকার কেনিয়াস ক্লে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ফ্লোরিডার দক্ষিণ প্রান্তে মীয়ামীচেবি ভূতপূর্ব বিশ্ববিজয়ী সনি লিসৃটনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ৬ রাউণ্ডে লিসটনকে পরাজিত করেন। ১৯৩৫ সালের পর মুষ্টিযুদ্ধের আসরে এত বড় ওলট পালট আর হয়নি। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্বে লিসৃটনের শিক্ষক জোলুই বলেছিলেন যে ক্লে দু রাউণ্ডের বেশী টিকতে পারবে না। লক্ষ্যণীয় বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের আসরে আবার ‘কালো চামড়ার’ জয় পরাজয় শুরু হয়েছে।

ধাঁধা

(৩০শে জুনের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌছান চাই)

(১)

এক কামারের বাড়িতে ১ মণ ওজনের একটা পাথর ছিল ; তা দিয়ে সে লোহা ওজন করত। এক গোঁয়ারগোবিন্দ বন্ধু এসে হাতুড়ির বাড়িতে সেই পাথরটি ভেঙ্গে চার টুকরো করে ফেলল। কামার তো চটে লাল ! বন্ধু কিন্তু একটুও দুঃখিত হল না—টুকরোগুলি দেখে বলল "এতে আরো ভাল হল। আগে একমণ ছাড়া ওজন করতে পারতে না। এখন এই চারটি টুকরোর সাহায্যে ১ থেকে ৪০ সের পর্যন্ত প্রতি সের ওজন করা যাবে।"

বল দেখি টুকরোগুলি কি কি ওজনের ছিল ?

(২)

ছিল সে সাগর মাঝে, মাছ নয় কভু সে ;
আকাশে উড়িল বটে, পাখী নয় তবু সে।
মাঝে মাঝে দিনে রাতে শুনি তার হাঁক ডাক—
সহসা ডাঙায় নামে দলে বলে লাখ লাখ !

(৩)

বোবা হয়ে ছিনু জলে নীরব, নির্বাক ;
মরিয়া এখন তবে করি হাঁক ডাক।

চিঠিপত্র

ভাই সন্দেশের ছোট বন্ধুরা,

এবার আমরা আমাদের চতুর্থ বছরে পড়লাম। যতই দিন যায়, ততই বেশি করে তোমাদের সহযোগিতার দরকার বোধ করি। সন্দেশ আমাদের সকলের কাগজ, কাজেই সন্দেশে কি থাকবে না থাকবে সে বিষয়ে তোমাদের মতামত সর্বদা চাই।

তাছাড়া প্রত্যেক সংখ্যা সম্পর্কেও তোমাদের মন্তব্য চাই। এখন থেকে সব চিঠিপত্র লিখবে এই ঠিকানায় :—সন্দেশ সম্পাদক, ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলকাতা ২৯।

তোমাদের বার্ষিক চাঁদা, ঠিকানা বদলের নোটিস্‌, সবই এই ঠিকানায় পাঠাবে। কেউ যদি কোনো মাসে কাগজ না পাও, তার পরবর্তী সংখ্যাটি যেই পাবে অমনি সাতদিনের মধ্যে সম্পাদককে জানাবে। আমরাও তখুনি হারানো সংখ্যাটি তোমাদের পাঠিয়ে দেব। শুনে রেখো আমরা সর্বদা তোমাদের সাহায্যের আশায় থাকি। ইতি। স. স.

হাত পাকাবার আসর

নতুন বছর থেকে হাত পাকাবার আসরটিকে আরো ভালো করে তুলতে হবে। অবিশ্যি এই ভালো করে তোলাটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তোমাদের উপরে। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক বা যে কোনো রচনা পাঠাতে পারো। তবে মোটামুটি কয়েকটি নিয়ম মেনে চল। যথা :—

(১) লেখকের বয়স যেন সতোরোর নিচে হয়।

(২) রচনার সঙ্গে অভিভাবকের সই করা চিঠি যেন থাকে।

(৩) খাতার চার পাঁচ পৃষ্ঠার চেয়ে বড় লেখা না হলেই ভালো।

(৪) নিজের হাতে স্পষ্ট করে লিখো।

(৫) নিজের কাছে একটি কপি রেখে তবে লেখা পাঠিও, কারণ লেখা ফেরৎ দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই আমাদের।

(৬) কেবলমাত্র যাদের লেখা নির্বাচিত হবে তাদের লেখা ছাপা হবে।

(৭) অন্য কারো লেখা দেখে নকল কিম্বা একটু অদল বদল করে পাঠিও না। নিজের রচনা পাঠিও।

(৮) একটা লেখা না বেরুলে অমনি হতাশ হয়ে ছেড়ে দিও না, আবার নতুন লেখা পাঠিও। মনে রেখো, ভালো লেখা হলেই আমরা ছাপব, কিন্তু ততটা ভালো না হলে তো আর ছেপে কাগজের ক্ষতি করা যায় না। কাজেই লেখা না বেরুলে রাগ ক'র না, আরো ভালো লেখা পাঠিও।

নতুন প্রতিযোগিতা !

তোমরা তো হাত পাকাবার আসরে নানারকম কবিতা আর ছড়া পাঠাও। তাই কে কেমন পদ্য লিখতে পার তার একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হল। একটা চার লাইনের পদ্য লেখো "যার যে কোনও একটি লাইন হবে :—"নর্দমা-কর্দমে পড়ে গর্দভের ছানা।" পদ্যের একটা উপযুক্ত নামও ঠিক করে দিও। মনে রেখো :—

(১) ১৬ই আষাঢ়, মানে ৩০শে জুনের মধ্যে প্রতিযোগিতার উত্তর আমাদের হাতে এসে পৌঁছান চাই।

(২) খামের বাঁ দিকের কোনায় লিখবে "নতুন প্রতিযোগিতা"।

(৩) নিজের নাম, ঠিকানা, বয়স এবং গ্রাহক নং ভাল করে লিখবে।

(৪) পদ্যটি নিজের হাতে লিখে দেবে।

(৫) সন্দেশের নতুন কার্যালয়ের ঠিকানায় উত্তর পাঠাবে।

(৬) নতুন বছরের চাঁদা যদি না দিয়ে থাক তাহলে প্রতিযোগিতার উত্তর পাঠাবার আগে দিয়ে দিতে ভুলো না।

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় ১০৲ এবং তৃতীয় ৫৲ টাকা মূল্যের।

নিউস্ক্রিপ্টের কিশোর সাহিত্য

পুণ্যলতা চক্রবর্তী ছেলেবেলার দিনগুলি। ৩·০০॥

উচ্চ প্রশংসিত পুস্তক।

লেখিকার স্মৃতির পটে ছবির মত যা ফুটে উঠেছিল, গল্পচ্ছলে সে সব কাহিনী বিবৃত করেছেন। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ও অসংখ্য চিত্রে অলঙ্কৃত করেছেন সত্যজিৎ রায়।

শিবরাম চক্রবর্তী : কেরামতের কেরামতি। ২·০০॥

শিবরাম পারেন এক কৌটা একটি ছোটো গল্পে অতুল কৌতুকের পৃথিবী গড়ে তুলতে। কেরামতের কেরামতী শিব্রামীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় : পিরামিডের মাথার মানুষ। ২·৫০॥

এমন রহস্যজনক উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল। ভূগোলের স্যার হরেনবাবুর মুখে চোদ্দটা ভাষায় যে গান গায় তার খবর পেয়ে মথুরানাথ বিদ্যাপীঠের চৌকশ খেলোয়াড় শঙ্কর চলল মিশরে। এ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা যে কোনো পাঠকেরা চুম্বকের আকর্ষণের মত টেনে হাস্যরসে প্লাবিত করবে।

নলিনী দাশ : রা-কা-যে-টে-না-পা। ১·৭৫॥

ডিটেকটিভ-সঙ্ঘের নাম 'রামকানাই যেন টের না পায়' অথবা রা-কা-যে-টে-না-পা। এই সঙ্ঘের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী এই উপন্যাসে পাবে। এই লেখিকার 'পলাশ গড়ের রহস্য' যাদের ভালো লেগেছে, এই উপন্যাস পড়ে তারা আরও খুসী হবে।

শিবনাথ শাস্ত্রী : ছোটদের গল্প। ১·২৫॥

এই বিরল গল্প কয়েকটি ছোট্ট পড়ুয়ারা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলবে।

লীলা মজুমদার : উপেন্দ্রকিশোর। ৩·৫০॥

১৯৬৩ সালে ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক বাঙলা ভাষায় লিখিত কিশোর সাহিত্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানপ্রাপ্ত পুস্তক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সন্দেশের গ্রাহকগ্রাহিকা আমাদের নিকট থেকে যে কোনো বই কিছু সুবিধা দরে পাবেন। গ্রাহক গ্রাহিকার নাম ও গ্রাহক নং স্পষ্ট করে লিখতে হবে এবং অর্ডারের সঙ্গে অগ্রিম অন্ততঃ এক টাকা পাঠালে (পোস্টাল অর্ডার অথবা ডাকটিকিটে) বাকী টাকার জন্য ভি, পিতে বই পাঠান হবে।

নিউস্ক্রিপ্ট

১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ও

এ।১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

দিলীপ আর তার দলবল
সবাই চাঁদা চাইছে। আমরাই বা বাদ যাই কেন?
মুক্তহস্তে দান করুন
জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করুন
আজ থেকেই আমরা শুরু ক'রে দেব—যারা যারা রাজী আছে, হাত তোলো!
বা ভাই!
বেশ বেশ।
চল, যাওয়া যাক।
খুচরোগুলো আমাদের দিন
আমাদের দলবলের তহবিলে চাঁদা দিন।
দান করুন
কি কিনব আমরা?
লাট্টু কেনা যাক।
যা উঠেছে, তাতে 'এভারেডী' টর্চ কিনে ফেলা যায়।
টর্চ? টর্চ কী হবে?
'এভারেডী' টর্চ খুব জব্বর জিনিস। আমার বাবার একটা আছে—কাকারাও সব দেখেছি হাতে টর্চ নিয়ে নিয়ে বেরোয়। আমাদের দলটার যদি একটা টর্চ থাকে, অন্ধকারে সব জিনিসই আমরা তোফা মজায় দেখে বেড়াতে পারব। চল, এখনই কিনে আনা যাক।
কি ওটা?
পেঁচা ব'লেই মনে হচ্ছে।
পেঁচা আমি এর আগে দেখিনি।
দেখলে তো! বলেছিলাম—'এভারেডী' টর্চ থাকলে কত সব নতুন নতুন জিনিস চোখে পড়ে।
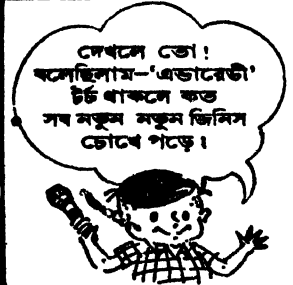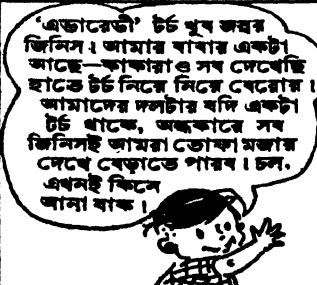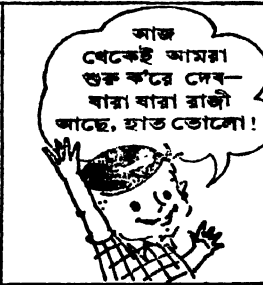
মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর :—

(প্রথম শব্দ থেকে সুরু করে, প্রতি দুইটি শব্দ বাদ দিয়ে, তৃতীয় শব্দটি ধরলেই চিঠির ভিতরের গোপন চিঠি বেরিয়ে পড়বে)

"যদি ভালো যাত্রা শুনতে ইচ্ছা থাকে, আজ রাত্রে গোঁসাইদের বাড়িতে নিশ্চয় উপস্থিত হবে। নিজে গোবিন্দ দাস গানের দল নিয়ে উপস্থিত শুনলাম। খুব ভিড় হবে, সুতরাং শীগগির আসতে পারলে ভালো।"

নির্ভুল উত্তর পাঠিয়েছে :—

৪২৪ অশোক ও অমিতাভ চ্যাটার্জি। ১৪৯২ সুজিত সরকার, সুজাতা সরকার। ২২৩৭ স্বাতী ভট্টাচার্য। ২৬৪৭ নীলাঞ্জন চৌধুরী। ২৭০৩ শুভঙ্কর ঘোষ ও বিশাখা ঘোষ।

একটি ভুল করেছে :—

১৩৪ মণিদীপা সেনগুপ্ত, প্রত্যুষা ও ভাস্কর দাশগুপ্ত। ৪৫৯ রুনু, ঝুনু ও ডলু সেনগুপ্ত। ২৭৭৩ মৌসুমী সেন।
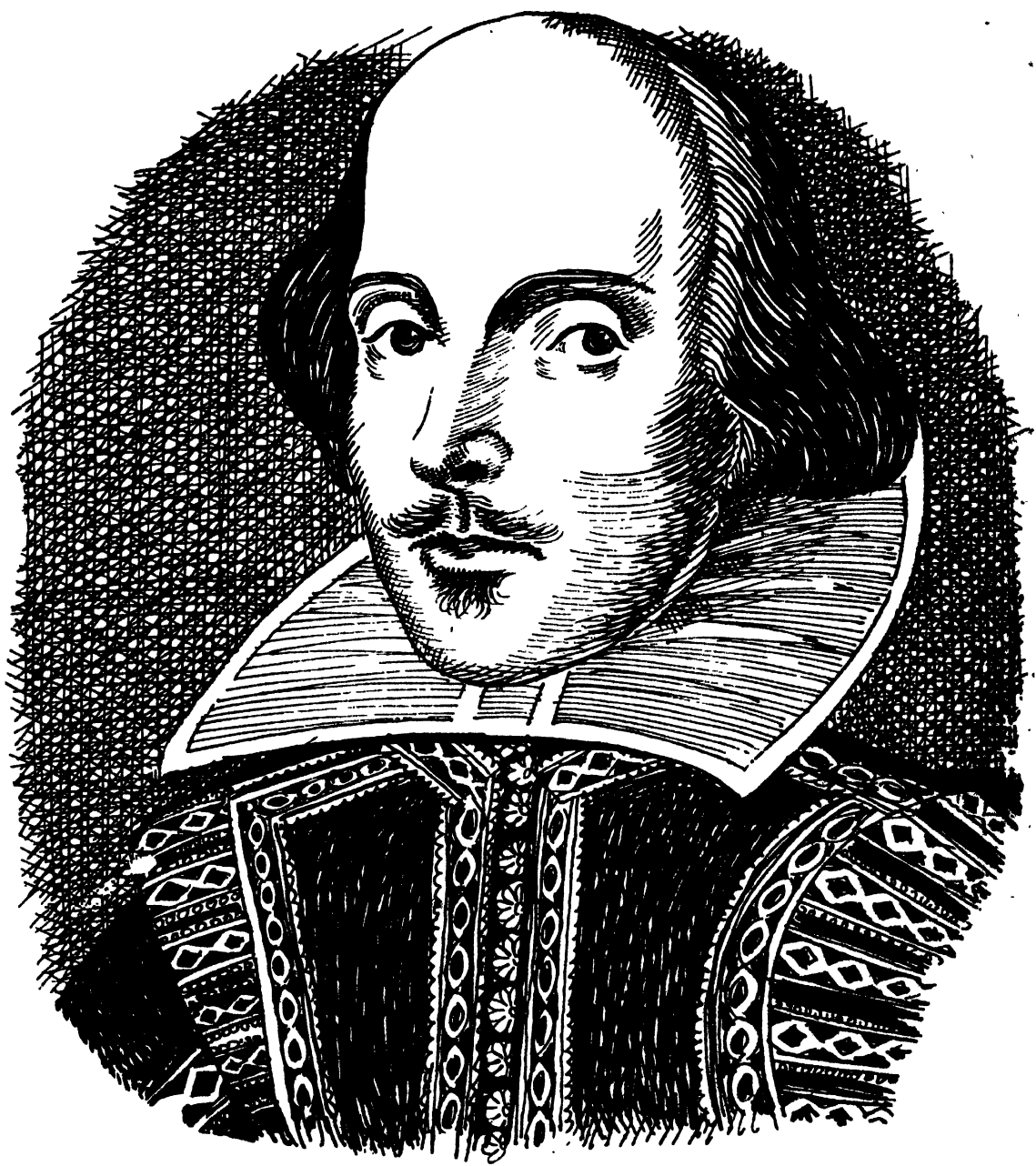
উইলিয়ম্ সেক্স্‌পীয়ার।

জন্ম ১৫৬৪—মৃত্যু ১৬১৬ খৃঃ।

৪র্থ বর্ষ । ২য় সংখ্যা জুন ১৯৬৪ । জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

বীর শিকারী

সুলতা সেনগুপ্ত

ঐ চলেছেন বাঘ শিকারে মহারাজার নাতি।
ভোর না হোতে রাজবাড়ীতে তাইতো মাতামাতি।
বন্দুক আর ঢাল শড়কি গাড়ী, জুড়ি হাতি
সব সাজিয়ে বাঘ শিকারে চলেন রাজার নাতি।

বাঘ বললে "হালুম"
তাই কি ছিল মালুম?
বাঘ শিকারী ছোটেন চোঁ-চোঁ ফেলে হাজার
আর—ব্যাঘ্র ভাবেন লজ্জা পেয়ে হবেন আত্মঘাতী।
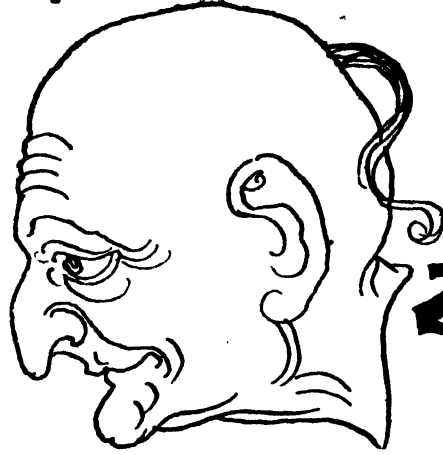
পণ্ডিতের কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সেই যে হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী ছিল, সেই হবুচন্দ্র রাজার একটা ভারী জবর পণ্ডিতও ছিল। তার এতই বুদ্ধি ছিল যে তার পেটে অত বুদ্ধি ধরত না; তাই তাকে দিন রাত নাকে কানে তুলোর টিপ্‌লী গুঁজে বসে থাকতে হত, নইলে বুদ্ধি বেরিয়ে যেত। তুলোর টিপ্‌লী গুঁজত বলে নাম হয়েছিল 'টিপাই' পণ্ডিত।

একদিন হয়েছে কি, হবুচন্দ্রের দেশের জেলেরা একটা এঁধো পুকুরে জাল ফেলতে গিয়েছে। সেই পুকুরে কোত্থেকে একটা শূয়র এসে ঝাঁঝি পাটার ভিতরে গা ঢাকা দিয়ে ছিল; জেলেরা জাল ফেলতেই সে গিয়েছে তার মধ্যে আটকে। তারপর জাল টেনে তুলে সেই শূয়র দেখতে পেয়েই ত জেলেরা ভারী আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে,—তাদের দেশে আর কেউ কখনো এমন জানোয়ার দেখেনি। তারা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারল না, এটা কি জানোয়ার। তারা জাল দিয়ে কত বড় বড় শাল, বোয়াল, কচ্ছপ ধরেছে, কিন্তু এমন জানোয়ারের কথা ত কখনো শোনে নি। যা হোক তারা ঠিক করল যে রাজা হবুচন্দ্রের সভায় নিয়ে এটাকে দেখাতে হবে। এই বলে, সেই শূয়রটাকে খুব করে জাল দিয়ে জড়িয়ে তারা রাজার সভায় নিয়ে এল। রাজা তার ছটফটি দেখে আর চ্যাঁচানি শুনে বল্লেন, "বাপরে। এটা আবার কি জন্তু?" সভার লোকেরা কেউ সে কথার উত্তর দিতে পারল না। যে সব পণ্ডিত সেখানে ছিল তারা দুদল হয়ে গেল। কয়েকজন বল্ল, 'গজকচ্ছপ', অর্থাৎ, হাতী ছোট হয়ে গিয়ে এমনি হয়েছে। কেউ বল্ল, "মূষা বৃদ্ধি", অর্থাৎ ইঁদুর বড় হয়ে এমনি হয়েছে। এখন এ কথার বিচার টিপাই ছাড়া আর কে করবে? কাজেই রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। টিপাই এসে অনেকক্ষণ ধরে সেই শূয়রটাকে দেখে বল্ল, "আরে তোমরা কেউ কিছু বোঝ না। এটাকে নিয়ে জলে ছেড়ে

দাও। যদি ডুবে যায়, তবে এটা মাছ, যদি উড়ে পালায়, তবে পানকৌড়ি; আর যদি সাঁতরে ডাঙ্গায় উঠে, তা হলে কচ্ছপ, না হয় কুমীর।" তখন সভার লোকেরা ভারী খুসী হয়ে বল্ল, "ভাগ্যি টিপাই মশাই ছিলেন, নইলে এমন কথা আর কে বলতে পারত?"

আমরা ছেলে বেলায় এই টিপাইয়ের গল্প শুনতাম। এইরূপ এক একটা পণ্ডিত বা পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধিমানের গল্প অনেক দেশেই আছে, তার দুএকটি নমুনা শোন।

টিপাইয়ের যে ছেলে, সেও বড় হয়ে তার বাপেরই মতন বড় পণ্ডিত হয়েছিল; তার গ্রামের লোকেরা একটা কিছু জানতে হলেই তার কাছে আসত। এর মধ্যে একদিন রাত্রে তাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে একটা হাতী গিয়েছে। তখন সকলে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ হাতীটাকে দেখতে পায়নি; সকালে উঠে তার পায়ের দাগ দেখে তাদের ভারী ভাবনা হল। না জানি এ সব কিসের দাগ, আর না জানি তাতে কি হবে। তারা এর কিছুই বুঝতে না পেরে শেষে টিপাইয়ের ছেলেকে নিয়ে এল। সে এসে অনেক ভেবে বল্ল "ওহ্। বুঝেছি। রাত্রে চোর এসে উঘ্‌লি নিয়ে গেছে। সে বেটা বার বার বসেছিল, তাইতে উঘ্‌লির তলায় দাগ পড়েছে।"

কাশীর ওদিকে এমনি একটা পণ্ডিতের গল্প আছে, সেই পণ্ডিতের নাম ছিল 'লাল বুঝগ্‌গর।' সে এমনি হাতীর পায়ের দাগ দেখে বলেছিল—

"লাল্ বুঝগ্‌গর সব সম্‌ঝো আউর না সমঝে কোই,
চার পয়ের মে চক্‌কর্ বাঁধকে হরণা কূদে হোই।"

অর্থাৎ লাল বুঝগগর সব বুঝতে পারে, আর কেউ বুঝতে পারে না;—চার পায়ে যাঁতা বেঁধে হরিণ ছুটে গিয়েছে।

তুরস্ক দেশেও এমনি একটি বেজায় বুদ্ধিমান লোক ছিল, একবার একটা উট দেখে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল মশায়, এটা কি জন্তু? বুদ্ধিমান বল্ল, "তাও জান না? খরগোশ হাজার বছরের বুড়ো হয়েছে, তাইতে তার এমনি চেহারা হয়ে গিয়েছে।" কথাটা কিন্তু নিতান্ত মন্দ বলে নি, খরগোশ যদি হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারত, আর সেই হিসাবে তার নাক তুবড়ে গাল বসে মুখ লম্বা হয়ে আসত, তবে আর অনেকটা উটের মত চেহারা হত বৈ কি।

পঞ্জাবে এক বুদ্ধিমান বুড়োর কথা আছে, সে বেশ মজার। গ্রামের মধ্যে সেই লোকটি সকলের চেয়ে বুড়ো আর বুদ্ধিমান, আর সব বড্ড বোকা। একদিন রাত্রে সেই গ্রামের ভিতর দিয়ে একটা উট গিয়েছিল; সকালে উঠে তার পায়ের দাগ দেখে কেউ বুঝতে পারছে না যে কিসের দাগ। শেষে তারা সেই বুড়োর কাছে গিয়ে বল্ল, "দেখ ত এসে বুড়ো দাদা, এসব কিসের দাগ?" বুড়ো দাদা সঙ্গে এসে সেই উটের পায়ের দাগগুলো দেখে খানিক হাউ হাউ করে কাঁদল, তারপর হিহি হিহি করে হেসে ফেল্ল। তাতে সকলে ভারি আশ্চর্য হয়ে বল্ল, "তুমি কাঁদলে কেন দাদা?" বুড়ো বল্ল, "কাঁদব না? হায় হায়! আমি মরে গেলে তোরা কার ঠেঞে এ সব কথা জিজ্ঞেস করবি?" তাতে সকলে ভারী দুঃখিত হয়ে বল্ল, "আহা, ঠিক বলেছ দাদা। তুমি না থাকলে আর কাকে জিজ্ঞাসা করব? আচ্ছা তুমি আবার হাসলে

কেন?" বুড়ো বল্ল "হাঁসব না? হাঃ হাঃ হা—হা—আ—আ, আরে, আমিও যে বুঝতে পারলুম না, এ ছাই কিসের দাগ। হাঃ হাঃ হা—হা—আ—আ—আ—আ—।"

আর দু ভাইয়ের কথা বলে শেষ করি। এক গ্রামে অনেক চাষা ভূষো থাকে, তাদের সকলের কিছু কিছু টাকা কড়ি আছে, কিন্তু তাদের কেউ কখনো লেখা পড়া শেখেনি, সেজন্য তারা বড়ই দুঃখিত। একদিন তারা সবাই মিলে যুক্তি করল যে, "চল, আমরা দুটি ছেলেকে সহরে পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে আনি। আমাদের গ্রামে একটাও পণ্ডিত নেই, কেমন কথা?" এই বলে তারা তাদের গ্রামের মোড়লের দুটি ছেলেকে সহরে পাঠিয়ে দিল; তাদের বলে দিল যে, "তোরা বিদ্যে শিখে পণ্ডিত হয়ে আস্‌বি।"

তারা দুভাই সহরে চলেছে, পথের পাশে যা কিছু দেখেছে, কোনটারই খবর নিতে ছাড়ছে না। এক জায়গায় এক গাছতলায় একটা হাতী বাঁধা ছিল, তাকে দেখে তারা ভারি আশ্চর্য হয়ে পথের লোককে জিজ্ঞাসা করল "এটা কি ভাই?" তারা বল্ল "এটা হাতী।" তা শুনে দুভাই ভারী খুসি হয়ে বল্ল, "বাঃ, এরি মধ্যে ত এক বিদ্যা শিখে ফেল্লুম—হাতী, হাতী, হাতী, হাতী।"

তারপর সহরের কাছে এসে মন্দির দেখতে পেয়ে তারা একজনকে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি ভাই?" সে বল্ল, "এটা মন্দির।" তাতে দু ভাই বল্ল, "মন্দির, মন্দির, মন্দির, মন্দির, বাঃ আরেক বিদ্যে শেখা হল।"

বল্‌তে বল্‌তে তারা বাজারের ভিতর দিয়ে চলেছে। বাজারে মাছ, তরকারী, ডাল, চাল সবই আছে, আর সবই তারা চেনে, খালি আলু আর কখনো দেখেনি। সেই জিনিসটার দিকে তারা অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর আলুওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, "এগুলো কি ভাই?" সে তাতে রেগে বল্ল, "কোথাকার বোকা? এ যে আলু তাও জান না?" তারা দু ভাই সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে খালি বল্‌তে লাগল, "আলু, আলু, আলু, আলু—।"

তখন তাদের মনে হল, "ইস, আমরা কত বড় পণ্ডিত হয়ে গেছি। একটা বিদ্যে শিখলেই তাকে পণ্ডিত বলে। আর আমরা দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনটে বিদ্যে শিখে ফেল্লুম। আর কি; এখন দেশে ফিরে যাই।"

কাজেই তারা গ্রামে ফিরে এল। তারপর থেকে তারা পাল্‌কী ছাড়া চলে না। গ্রামের লোক তাদের দেখলেই দণ্ডবৎ করে আর বড় বড় চোখ করে বলে, "বাপরে। তিন মুখো পণ্ডিত হয়ে এসেছে।" এমনি করে কয়েক বছর চলে গেল। তারপর এক দিন হয়েছে কি, সেই গ্রামে কোত্থেকে এসেছে এক হাতী। গ্রামের লোক তাকে দেখেই ত আগে ছুটে পালাল। তারপর অনেক দূর থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে তাকে দেখতে লাগল, কিন্তু কেউ বল্‌তে পারল না এটা কি। শেষে একজন বল্ল, "শীগ্‌গির পণ্ডিত মশাইদের ডাক।" তখনি পাল্কী ছুটল পণ্ডিতদের আন্‌তে। তারা এসে চস্‌মা এঁটে অনেকক্ষণ ধরে হাতীটাকে দেখ্‌ল, তারপর বড় ভাই বল্ল, "এটা মন্দির।" তা শুনে ছোট ভাই বল্ল, "দাদার যে কথা! এত টাকা দিয়ে বিদ্যে শিখে এসে শেষে কিনা বল্‌ছে এটা মন্দির। আরে না না, এ মন্দির নয়,—এটা আলু। আলু॥"

(তিন)

(পূর্ব-প্রকাশিত অংশের চুম্বক :—

যখন পৃথিবীটা প্রলয়ের মুখে পড়েছিল, তখন কয়েক লক্ষ লোক একটা নতুন গ্রহ ইরসের দিকে রওনা হয়েছিলেন, সেই ইরস্ আমার জন্মস্থান। নানান্ জাতের, নানান্ ভাষাভাষী নানান্ মতের লোক ছিলেন তাঁরা, অথচ এখানে আমরা বেশ মিলেমিশে আছি। পুরোনো পৃথিবীকে যে-সব বিদ্যা শিখতে হাজার-হাজার বছর লেগেছিল, আমাদের সে সব জানা ছিল বলে, মাত্র দুশো বছরেই চাষ আবাদ থেকে সুরু করে, গ্রাম, সহর, পথঘাট স্কুল, কলেজ, ও বড় বড় কারখানা তৈরী করে আমরা সেখানকার সমান হতে পেরেছি।

আমি ইতিহাসের ছাত্র, পদার্থ বিদ্যার ছাত্র আমার বিশেষ বন্ধু মরিশ, ফিসার রসায়নের আর চিয়েন সাহিত্যের ছাত্র,—ছেড়ে-আসা পৃথিবীর কয়েকটা ভাষার সে চর্চা করে। আমরা চারবন্ধুই খেলাধুলোয় মজবুত। এটা আমাদের কলেজের শেষবছর। এরপর চিয়েনের আর আমার ঐতিহাসিক গবেষণা করার ইচ্ছা। আমাদের লাইব্রেরির বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে দুটো বই পেয়েছিলাম। একটা বইয়ে ছেড়ে-আসা পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। অন্য বইটা শূন্যযাত্রীদের একজনের রোজ-নামচার টুকরো—দুশো বছর আগেকার পৃথিবীর সেই প্রলয়ের কথা।

আমার একজন পূর্বপুরুষ পৃথিবী ছেড়ে আসবার জন্য, আরো কয়েকজন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও, প্রলয়ের সময় ইচ্ছা করেই সেখানে থেকে যান। সে জন্যে মনে মনে আমার বেশ খানিকটা গর্ব ছিল।

মরিশের দাদা হ্যারিশ এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। শুনলাম যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সোমোয়েণের সঙ্গে সে চলেছে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অভিযানে—যেখানে পৃথিবী থেকে আগত প্রথম কয়েক দল তাঁদের অদ্ভুত আকারের আকাশ-যান থেকে এখানকার মাটিতে নেমেছিলেন। আজ পর্যন্ত ঐসব অঞ্চলে

তাঁদের অনেকগুলো আকাশ-যান পড়ে আছে। সেগুলো চালানো হয় না, তার প্রধান কারণ হল যে ইন্ধনের সাহায্যে ওগুলো চলত, এখানে তার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় নি। কুড়ি বছর ধরে কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক এগুলো নিয়ে একটু আধটু সখের চর্চা করছেন।

একবার এনরিক নামে একজন অল্পবয়সী এঞ্জিনিয়ার, একটা আকাশ-যানে চড়ে, এট-ওটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সেটাকে চালিয়ে দেন। খানিকবাদে প্রচণ্ড বেগে সেটাকে সমুদ্রের মাঝখানে পড়তে দেখা যায়। হাসপাতালে মারা যাবার আগে এনরিক শুধু বলতে পারেন—"লাল হাতল, সাবধান!" আর "তিন নম্বর!" প্রফেসার সোমোরেনের অনুমতি নিয়ে আমরা চারবন্ধু, পরীক্ষার পরে, তাঁর অভিযানে যোগ দিতে যাচ্ছি। হোস্টেল বন্ধ হবার পরদিন আমরা সত্যি সত্যি রওনা হয়ে পড়লাম।)

প্রায় হাজার পনেরো মাইল যেতে হল, তার মধ্যে চারবার গাড়ি বদল। ঐ অবধি বেশ আরামে আসা গেল, তিরিস ঘণ্টা গাড়িতে আর গাড়ি বদল, স্টেশনে অপেক্ষা ইত্যাদিতে আরো চার ঘণ্টা। আমরা সভ্য জগতের প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছেছি, এইবারই হল আসল যাত্রা শুরু। এদিকে লোক-জনের বসতি নেই বললেই চলে। গোটা দুই মানমন্দির আর দুটো পাম্পিং স্টেশন ছাড়া সভ্যতার আর কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। বেজায় শীতের দেশ, চাষ আবাদ মোটে হয় না, কিন্তু জঙ্গল ভরা বিশাল বিশাল গাছ। মরিশের কাছে শুনলাম এগুলো নাকি দুশো বছর আগে সাবেক পৃথিবী থেকে আনা রেড্-উড্ গাছ। এগুলো যেমনি বিশাল তেমনি দীর্ঘায়ু হয়।

মানমন্দির দুটি পাহাড়ের ওপরে, মাঝখানে দুশো মাইল তফাৎ। পাম্পিং স্টেশন মানমন্দিরের পাশেই। দুই পাহাড়ের মাঝে প্রকাণ্ড একটা হ্রদ, পাহাড় থেকে বরফের নদী এসে সেই হ্রদে পড়েছে। এই হ্রদের জলই পাম্প করে দূরের সহরগুলোতে জল সরবরাহ করা হয়। দূরের মানমন্দির পর্যন্ত ভালো রাস্তা আছে, গাড়ি করে যাওয়া যায়, তার ব্যবস্থাও হ্যারিশের করে রাখবার কথা।

মানমন্দিরে নামকরা বৈজ্ঞানিকরা কাজ করেন, তাঁদের থাকবার জন্যে ভালো ভালো বাড়ি আছে। বাবার একজন বন্ধুও এখানে কাজ করতেন, পরে রিটায়ার করেও এইখানেই নিজের বাড়ি তৈরী করে বসবাস করছেন, এত দিন শীতের দেশে কাজ করে আর গরম সইতে পারেন না। এঁর মতো আরো অনেকে হ্রদের ধারে পাহাড়ের নিচে বাড়ি করে আছেন। মানুষের ভিড় আর কোলাহল তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। পাম্পিং স্টেশনে, মানমন্দিরে বেড়াতে যান, কর্মীদের সঙ্গে নতুন নতুন গবেষণা সম্বন্ধে আলোচনা করে সময় কাটান।

নেমেই বাবার বন্ধুর বাড়িতে উঠবার কথা ছিল, হ্যারিশ এসে সেখান থেকে আমাদের নিয়ে যাবে। এই দুশো মাইল যেতে অনেক সময় লেগে গেল, সাধারণতঃ কেউ এদিকে বেড়াতে আসে না, কাজেই যান-বাহনের তেমন ব্যবস্থা নেই। যাঁরা কাজের জন্যে আসেন তাঁদের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে। শেষ পর্যন্ত একটা মালবাহী গাড়ি করে রওনা হলাম, ঘণ্টা তিনেকে পাহাড়ের তলায় এসে পৌঁছলাম। ড্রাইভার বাবার বন্ধুর বাড়ি চেনে, সোজা সেখানে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি খালি বাড়ি! অথচ

হ্যারিশেরও উপস্থিত থাকার কথা। আশে পাশের বাড়িগুলোতে খবর নিতে গিয়ে দেখি কোনটাতেই লোক নেই!

শেষ অবধি এক জায়গায় দুটি লোককে পাওয়া গেল। তারা বলল—"কিছু দিন থেকে বাড়ি নেই, দূরে কোথায় গেছেন।" তার বেশি তারা কেউ জানে না। অগত্যা আবার বাড়ি ফি ভাবছি কি করা যায়, এমন সময় একটা ছোট গাড়ি করে একটিমাত্র লোক এসে, আমাদের দেখে থাম আমাদের কলেজের নাম করে সে জিজ্ঞাসা করল আমরাই সেখান থেকে এসেছি কি না। সব শু শেষে জানাল জিনিষপত্র নিয়ে যাবার জন্য হ্যারিশ তাকে পাঠিয়েছে।

বাড়ির দরজা খুলে দিয়ে সে আমাদের ঘরদোর বিছানাপত্র দেখিয়ে দিল, যথেষ্ট খাবার দাবারের ব্যবস্থা ছিল। তারপর গাড়িতে জিনিষগুলো বোঝাই করে বলল, "তোমাদের নিজেদের বাক্সটাক্স তুলে দাও, আমি নিয়ে যাই। তোমরা এখানে আরামে রাতটা কাটাও, কাল সকালে তোমাদের নি লোক আসবে।" এই বলে সে রওনা দিল

তখন বিকাল হয়ে আসছে, স্টেশনে পৌঁছেই আমরা পেট ভরে খেয়ে নিয়েছিলাম, কাজে সামান্য জলখাবার খেয়ে চারদিকটা দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। হ্রদের ধারে পাম্পিং স্টেশনে কাছে যেতেই, একটা বাড়ি থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে হেসে বললেন—"তোমরাই না সেই চা বন্ধু, হ্যারিশ যাদের কথা বলেছিল? থাকার খাওয়ার সব ব্যবস্থা ঠিক আছে তো?" তারপরেই বললেন—"চল, পাম্পিং স্টেশনটা দেখিয়ে দিই।" সেই মস্তবড় স্টেশনটা ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে আরো বললেন—"কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখ! যে সব আকাশযানে চড়ে দুশো বছর আগে পৃথিবী থেকে লোকরা এখানে এসেছিল, তারই গোটা দুই থেকে এঞ্জিন খুলে নিয়ে দেড়শো বছর আগে এই পাম্পের কাজে লাগানো হয়েছিল, সেই এঞ্জিন আজ পর্যন্ত সমানে চলছে, একটুও খারাপ হয় নি।"

মরিশ জিজ্ঞাসা করল—"দুটোই যখন সমানে চলছে, একটা বিগ্‌ড়োলে কি উপায় হবে?" তিনি বললেন—"আরো দুটো মজুৎ আছে, দরকার হলেই সেগুলোকে কাজে লাগানো হবে। তাছাড়া শুধু গ্রীষ্মকালেই দুটো পাম্প চলে, শীতকালে একটাই যথেষ্ট। এখানে নানা রকম যন্ত্রপাতি বোঝাই কয়েকটা বাক্সও ছিল, কিছুদিন আগে প্রফেসার সোমোরেণ নিজে এসে সেগুলো নিয়ে গেছেন। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ আশেপাশে লোকজন কেউ নেই? সব গেছে প্রফেসারের সঙ্গে। আমিও যেতাম, কিন্তু পাম্পিং স্টেশন ছেড়ে যাবার হুকুম নেই বলেই যাচ্ছি না।"

হ্রদের চারদিক ঘুরে চমৎকার রাস্তা, ভদ্রলোক আমাদের গাড়ি করে ঘুরিয়ে আনলেন। ঘণ্টা চারেক লাগল। তিনশো মাইল গাড়ি চড়া হল। তার পর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে উনি চলে গেলেন। আমরাও খেয়েদেয়ে অনেক রাত অবধি গল্প করে, তবে শুতে গেলাম।

ভোর না হতেই উঠে পড়ে যাবার জন্যে সবাই তৈরী। বসে বসে সময় কাটে না, বেলা বেড়েই চলেছে, অথচ হ্যারিশের দেখা নেই। শুধু চিয়েন বলল,—"কিসের জন্যে এত তাড়াহুড়ো বুঝি না।

সেখান থেকে আসতে হ্যারিশের সময় লাগবেই তো। মিছিমিছি এই সাত সকালে ঘুমটা ভাঙালে, আরো কিছুক্ষণ দিব্যি ঘুমোনো যেত !"

চিয়েনের এই একটা বিশেষত্ব আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করেছি। একটা নতুন কিছু করার আগে আমরা হয়ে পড়ি ব্যস্ত আর ও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে নেয় ! আমার আবার সে সময় একেবারেই ঘুম আসে না। কিন্তু কাজটা শুরু হয়ে গেলেই আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে যাই, ওদিকে কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চিয়েনের উদ্বেগের অন্ত থাকে না। মরিশ আর ফিসারও ব্যস্ত হয় বটে, তবে ভালো করে লক্ষ্য না করলে সেটা কারো নজরে পড়ে না। আমরা জানি বলেই বুঝি মরিশ একটু বেশি কথা বলছে আর ফিসার একটু বেশি গম্ভীর হয়ে গেছে।

বেলা আরো বাড়ল, তবু হ্যারিশের দেখা নেই। বসে বসে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, হঠাৎ খেয়াল হল চিয়েন আমাদের সঙ্গে নেই। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখি সে একেবারে রান্নাঘরে সেঁদিয়ে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করছে। . বললে—"তা আমাদের খিদে না পেতে পারে, কিন্তু হ্যারিশেরও কি পাবে না ? সে তো কোন সকালে বেরিয়েছে।" বেলা দশটা নাগাদ আর ঘরে টিকতে না পেরে বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এটা কেমন হল, লোকটার এখন পর্যন্ত দেখা নেই ! সামনেই রাস্তাটা খালি ফাঁকা পড়ে আছে, যান বাহনের চিহ্নমাত্র নেই। একটু বিরক্ত হয়েই ঘরে ঢুকতে যাব, এমন সময় হ্রদের বাঁ পাশের পাহাড়ের দিকে চোখ পড়ল। মনে হল পাকদণ্ডী বেয়ে দুজন লোক নামছে।

এর আগে যখন ওদিকে তাকিয়েছিলাম কিছুই নজরে পড়ে নি, একে গাছগাছলায় ঢাকা পথটি চট করে চোখে পড়ে না, তাছাড়া পাহাড় বেয়ে যে কেউ নেমে আসতে পারে সেটা ভাবতেই পারি নি বলে সেদিকে মনোযোগ দিয়ে দেখিও নি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে লোকদুটি কাছে আসতে হ্যারিশকে চেনা গেল, সঙ্গে একজন অচেনা লোক। তাকেও কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, সামনে এসে পড়লে বুঝলাম এই হল হ্যারিশের বন্ধু নিকলসন, মরিশের কাছে এর ছবি কতবার দেখেছি। আমার ডাকে চিয়েন, মরিশ আর ফিসার বেরিয়ে এল। আমরা তৈরী দেখে হ্যারিশ বললে,—"ওরে বাবা, বড্ড বেশি ব্যস্ত যে ! সেখানে যাওয়া কিন্তু যত সোজা ভেবেছ তত নয়। অনেকটা পথ হেঁটে তবে গাড়ি পাওয়া যাবে।"

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপর সকলে পেট ভরে খেয়ে নিলাম, তারও খানিক বাদেই রওনা হয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের নিচে এসে পৌঁছলাম, তারপর পাকদণ্ডী বেয়ে ওঠা। প্রথমটা একটু হাঁপ ধরছিল, এত খাড়াই চড়া তো আর অভ্যাস নেই, পরে আস্তে আস্তে সয়ে এল। চড়াই উৎরাই রাস্তা, পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছি. পা পিছলে গেলেই নিচে গড়িয়ে পড়বার যথেষ্ট ভয় আছে। বেশ সাবধানে চলেছি। নিচে হ্রদ আর পাহাড়ের ওপর মানমন্দিরের দৃশ্যটা বড় চমৎকার লাগছিল।

দিনটা বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু পাহাড়ে রাস্তায় হাঁটাতে গা গরম হয়ে উঠল, একটুও শীত লাগছিল না। কিন্তু দাঁড়ালেই শীতের বহরটি দিব্যি বোঝা যাচ্ছিল। ঘণ্টা দুই একটানা হেঁটে, এক জায়গায় বিশ্রামের

জন্যে থামলাম। রাস্তার পাশেই ছোট্ট পাহাড়ে নদী, তার জল খেতে গিয়ে টের পেলাম কি ঠাণ্ডা, পেটের ভিতর অবধি যেন জমে গেল। নিকলসন কথা বলে কম, সারাটা পথ আমাদের খুব নজর করে দেখছিল, এবার সে বললে—"হ্যারিশ, এরা পারবে মনে হচ্ছে।"

(চার)

পাকা রাস্তা থাকা সত্ত্বেও গাড়িতে না নিয়ে, হাঁটিয়ে এই বিদ্‌ঘুটে পথে কেন আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই কথাটা এর মধ্যে আমার অনেকবার মনে হয়েছিল। এতক্ষণে নিকলসনের কথায় বোঝা গেল আমরা কতখানি কষ্ট সহ্য করতে পারি, এ হল তারই পরীক্ষা। আবার রওনা হলাম এবং একটু বাদেই নামবার পালা শুরু হল। নিচে দেখলাম একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু পথঘাটের কোনও চিহ্ন নেই। নিচে পৌঁছে দেখি অনেক দিন আগেকার গাড়ি, চাকার বদলে চেন্‌ লাগানো, উঁচুনিচু রাস্তাবিহীন জায়গা দিয়েও স্বচ্ছন্দে চলে।

সামনে খোলা মাঠ, যতদূর চোখ যায় কোথাও কোনও বসতি নেই, চাষ-আবাদেরও চিহ্ন নেই। একধারে জঙ্গল, অসমান জমি, এবড়ো খেবড়ো. তারই ওপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। খানিক বাদেই একটা নদী দেখা গেল। হ্যারিশ বললে, "এটা সেই লেকেই গিয়ে পড়েছে, কিন্তু এত স্রোত আর পাথরে ভর্তি যে নৌকোয় যাতায়াত সম্ভব নয়।"

আরো মাইল কতক গিয়ে এক জায়গায়—দেখি তিন চারটে বিরাট যন্ত্র পড়ে আছে। তার কাছে এসে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। হ্যারিশ বলল, "ভালো করে দেখে নাও, এইসব যানে করেই আমাদের পূর্বপুরুষরা এখানে এসেছিলেন।

কি সব যান ? এক একটা প্রায় ১২০০ ফুট লম্বা চুরুটের মতো দেখতে। একদিকটা ছুঁচলো, কি একটা স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরী ; অন্য দিকটা চওড়া ল্যাজের মতো, সেদিকে কয়েকটা বড় বড় গর্ত। যন্ত্রের এক পাশে প্রায় ৫০ ফুট লম্বা, ৩০ ফুট চওড়া তিনটে ফাঁকা জায়গা।

তার মধ্যে দিয়ে ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। হ্যারিশ বলল, "এইখান দিয়ে এঞ্জিন আর অন্য সব যন্ত্রপাতি বের করে নেওয়া হয়েছিল। ঐ এঞ্জিনই পাম্পের কাজে লাগানো হয়েছে। চারদিক ঘুরে দেখে আবার রওনা হলাম। খুব ঠাণ্ডা ঐখানে, গায়ে গরম জামা, তবু শীত বাগ মানতে চাইছে না। দূরে জায়গায় জায়গায় সাদা মতো দেখা যাচ্ছে, কাছের পাহাড়গুলোর চূড়োর কাছে সবটাই সাদা। বুঝতে ভুল হয় না যে এবার আমরা বরফের দেশে এসে পড়েছি। খানিকবাদেই দৃশ্য বদলে গেল, উঁচুনিচু জমি ঠিকই আছে, তবে চারদিকে নানান আকারের টিলা, সব টিলা বরফে ঢাকা।

আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে, এমন সময় সামনে দেখি ছোট ছোট কয়েকটা বাড়ি হ্যারিশ বলে উঠল, "এসে গেছি, ঐ আমাদের ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে।" জিজ্ঞাসা করতে নিকলসন

বলল এসব তৈরী করার সমস্ত উপকরণ সেই ষ্টেশন থেকেই আনা হয়েছে, এখানে আসার অন্য ভালো রাস্তাও আছে।

ছোট একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে, বাড়ির দরজা খুলে দিয়ে হ্যারিশ বলল—

"এইখানে তোমাদের চার জনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।" দেখি আমাদের বিছানা ও জিনিষপত্র সব আগেই এসে গেছে। বিছানা পেতে, হাত মুখ ধুতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, ঠাণ্ডা কাকে বলে! জলতো নয়, ছুঁলেই মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে কেউ হাতটা কেটে ফেলল!

কোনোমতে মুখ হাত ধোয়া সারলাম, হ্যারিশ হাসতে হাসতে বলল—"আজ একটু কষ্ট কর, কাল থেকে গরম জলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সকালে তাড়া হুড়োতে, গরম জলের কথা মনেই হয় নি। তবে ভয় নেই, ঘর গরমের ব্যবস্থা আছে, নইলে শীতের চোটে ঘুমোতেই পারবে না!"

একটা বাঁশী বেজে উঠল আর হ্যারিশ তাড়া দিতে লাগল, ঐ বাঁশী বেজেছে, এবার খেতে যেতে হবে।" অন্ধকার রাত আর বাইরে সে কি ঠাণ্ডা! হ্যারিশ বলল, "দিনের বেলায় শীত অনেক কম থাকে। তাছাড়া এখন গ্রীষ্মকাল বলেই রাতে বেরুতে পারছ, নইলে ঠাণ্ডায় জমে যেতে হত।"

ওর সঙ্গে একটা বড় বাড়িতে ঢুকলাম, প্রশস্ত হল, তার ভিতরটি বেশ গরম, সেখানে অনেকে খেতে বসেছেন। হ্যারিশ আমাদের পরিচয় দেবার পর আমরাও বসে পড়লাম। তারপর তাড়াতাড়ি নিজেদের আস্তানায় ফিরে শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে গরম জল পেলাম, হাত মুখ ধুতে কোনওকষ্ট হল না। বাঁশি বাজতেই সকলে মিলে খাবার ঘরে গেলাম। দেখলাম সকালেই সকলে বেশ পেট ভরে খেয়ে নিচ্ছে। নিকলসন বলল, "এইবার সবাই কাজে বেরিয়ে যাবেন, ফিরবেন বেলা একটায়। তারপর খেয়েদেয়ে আবার বেরুবেন আর সেই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা আটটার আগে ফিরবেন না। এই হল এখানকার রুটিন।"

খাওয়ার পর হ্যারিশ আমাদের প্রফেসার সোমারেনের কাছে নিয়ে গেল। আলাপ হবার পরই তিনি বললেন, "হ্যারিশ, তাহলে ওরাও আমাদের সঙ্গে চলুক।"

তাই গেলাম। অনেকগুলো গাড়িতে চেপে আমরা জন পঞ্চাশ বেরিয়ে পড়লাম আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ছোট একটা পাহাড়ের ধারে এসে পৌঁছলাম। সেখানে দেখি একটা ছোটখাটো কারখানা বসে গেছে, অনেকগুলো ছোট বাড়িও রয়েছে। ওঁদের কথাবার্তা থেকে বুঝেছিলাম যে পালা করে ওঁরা ওখানে রাত কাটান।

কারখানার সামনে গাড়ি থামল। দেখলাম এরই মধ্যে জন কুড়ি লোক কাজ শুরু করে দিয়েছে। হ্যারিশ আমাদের ঘুরিয়ে সব দেখাল, এইজন্যেই নাকি সে কিছুক্ষণের ছুটি পেয়েছে। কারখানার পাশেই নদীর ধারে যেরকম যন্ত্র দেখেছিলাম, সেইরকম আরও গোটা কতক পড়ে আছে, দুটোকে খুলে ফেলা হয়েছে। পাশেই একটা ঘরে তাদের এঞ্জিন আর কলকব্জা সাজানো আর প্রোফেসার সোমোরেণ কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছেন।

ভিতরে গিয়ে দেখি কয়েকটা বড় বড় বাক্স খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, চারদিকে অদ্ভুত চেহারার

মেলা যন্ত্রপাতি ছড়ানো। কয়েকজন লোক হাতে বই নিয়ে, যন্ত্রপাতির সঙ্গে কলকব্জাগুলোকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন। হ্যারিশ প্রফেসারের কাছে চলে গেল, এমন সময় বাবার সেই বন্ধু এসে উপস্থিত। "কি প্রশান্ত, আমার বাড়িতে না থাকায় কোনও কষ্ট হয় নি তো?" কোনও কষ্ট হয়নি শুনে বললেন, "কি করি বল, এইখানে এই রকম কাণ্ড হচ্ছে আর আমি কি ঐখানে চুপ করে বসে থাকতে পারি? চলেই আসতে হল।"

ওঁর কথা থেকে বুঝলাম যে সেকালের এই সব বাক্সের মধ্যে যেমন অনেক যন্ত্রপাতি ছিল, তেমনি সেগুলি ব্যবহার করার নিয়ম কানুনের বইও ছিল। তাছাড়া অন্যান্য বই থেকেও ঐ সব বিশাল যন্ত্রের বিষয় অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। এখানকার কয়েকটা বই দেখে ওঁরা বুঝতে পেরেছেন যে যানগুলোকে মহাকাশে চালানো সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়মাবলা এই সব বইতে লেখা আছে। এখন অসুবিধা হল এই যে বইগুলো ছেড়ে আসা পৃথিবীর ভাষায় লেখা, তাও আবার তিন চারটে আলাদা ভাষায়। যেটুকু পাঠোদ্ধার করা গেছে, তাই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সব কটি বই ভালো করে না পড়লে যানগুলোকে আবার মহাকাশে চালানো যাবে না।

ক্রমশঃ

সেক্সপিয়ার

চার শো বছর আগে ইংল্যাণ্ডের স্ট্রাটফার্ড অব্ অ্যাভন নগরে উইলিয়ম সেক্সপিয়ার জন্মেছিলেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে তিনি একজন। সাধারণ পরিবারের ছেলে, বাপের কিছু জমি-জমা ছিল, খুব স্বচ্ছল না হলেও নিতান্ত গরীবও ছিলেন না তিনি। কেউ কেউ বলেন নাকি বাবা বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না, সরকারি কাগজপত্রে নিজের নাম সই না করে একটা চিহ্ন দিতেন। তবে সেকালে অনেকে লিখতে পড়তে জানা সত্ত্বেও নামের বদলে চিহ্ন দিতেন এ কথাও সত্যি।

বাপ যতটুকু লেখাপড়া শিখে থাকুন না কেন, ছেলেকে যে স্কুলে দিয়েছিলেন তার বহু প্রমাণ আছে। এমন কি স্কুলের কোন ঘরে কোন বেঞ্চিতে তিনি বসতেন তাও দর্শকদের আজও দেখানো হয়!

পৈত্রিক বাড়িটাও দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্বশুর বাড়িও লোকে গিয়ে দেখে আসে। তখন ইংল্যাণ্ডে রাণী প্রথম এলিজাবেথ রাজত্ব করছেন, ভারতে আকবর সাহের প্রবল প্রতিপত্তি। এ কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে ইংল্যাণ্ডে সে সময়কার অনেক বাড়িঘর আসবাবপত্র আজ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়, অথচ আমাদের দেশে সে সময়কার কতকগুলি ভাঙা মঠমন্দির প্রাসাদ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

উইলিয়ম্ সেক্সপিয়ার অল্প বয়সে ভারি দুরন্ত ছিলেন, একপাল দুরন্ত বন্ধুবান্ধব জুটতেও বেশি দেরি লাগেনি। তারা অতিশয় উৎপাৎ করে বেড়াত, এর ফল চুরি করে খাচ্ছে, ওর বাগানের হরিণ মেরে ফেলছে। ধরা পড়লে বেদম শাস্তিও পেতে হত। শেষটা উইলিয়ম লণ্ডন শহরে পালিয়ে বাঁচলেন। ততদিনে তাঁর বিয়েও হয়ে গেছে, যদিও বয়সটা নিতান্তই কম।

সেকালের লণ্ডনে বুদ্ধিমান ছেলেদের খাবার অভাব হত না। সরাইখানাগুলো ছিল লোক জমায়েৎ হবার আড্ডা। উঠোনে যাত্রা নাটক হত, তার না ছিল ভালো সিনসিনারি, না ছিল পর্দা। কিন্তু তাই দেখতে লোক ভিড় করে আসত, ছেলেপুলে জলখাবার নিয়ে খোলা উঠোনে গাদাগাদি হয়ে বসে নাটক দেখে দিন কাবার করত।

নাটকগুলো খুব মন্দ ছিল না, একেকটা তো রীতিমতো ভালো রচনা, লেখকও ছিলেন অনেক। এই রকম একটা জায়গাতেই সম্ভবতঃ সেক্সপিয়ারের প্রথম নাটকের সখ হয়েছিল। গ্লোব থিয়েটারের স্টেজে আসবাবপত্র সরাবার, ভারি জিনিষ বইবার একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়ে, নাটক শিখতে লেগে গেলেন।

লোকে নাটক দেখবার জন্যে পাগল, কিন্তু নিত্যি নূতন নাটক পাওয়া যাবে কোথায়? পুরোণো নাটক অদল বদল করে, এখান থেকে ওখান থেকে গল্প সংগ্রহ করে নাটক বানিয়ে নিয়ে কাজ চালাতে হত। দেখতে দেখতে ছোকরা সেক্সপিয়ার এই কাজে দক্ষ হয়ে উঠলেন।

বন্ধুবান্ধব সবাই হয় লেখে, নয় অভিনয় করে; নাটক সম্পর্কে উইলিয়মের আর কিছু জানতে

বাকি রইল না। শেষটা সাহস করে নিজেই নাটক লিখতে শুরু করে দিলেন। তাঁর আশ্চর্য প্রতিভা দেখে লোকে বিস্মিত হয়ে গেল।

বাস্তবিক মানবচরিত্র সম্বন্ধে এমন গভীর ধারণা, হৃদয়স্পর্শী ভাষার ওপর এমন দখল, নাটকের উপযুক্ত কাহিনী বেছে নেবার এমন নির্ভুল ক্ষমতা পৃথিবীর যে কোনো দেশে বড় একটা দেখা যায় না। আজ অবধি নয়।

অপর্যাপ্ত প্রতিভা থেকে অনেকগুলি নাটক দেখতে দেখতে রূপ নিল। হাসির নাটক, দুঃখের নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, কিছু বাদ গেল না। এমন কি বিখ্যাত দুঃখের নাটক 'ওথেলোর' মূল গল্প একটা পুলিশকোর্টের রিপোর্ট থেকে নেওয়া বলে শোনা যায়। গল্পগুলিও চমৎকার; কিন্তু নাটকের মধ্যে গল্পের চেয়ে অন্যান্য গুণ যে কত বড় সেক্সপিয়ারের নাটক পড়লেই তা বোঝা যায়। পুরোণো একেকটি জানা গল্প যেন যাদুমন্ত্রে অপূর্ব অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। এমন অপূর্ব কাব্যগুলি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

চারদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, রাণী এলিজাবেথের কানেও উঠল। তিনি নাটক দেখে খুশি হলেন, ফরমায়েস দিয়ে এক আধখানা লেখালেন পর্যন্ত। পয়সাকড়িও কিছু হল সেক্সপিয়ারের, কিন্তু লণ্ডনের সৌখীন জীবনে তিনি খুব সুখী হন নি।

শেষ অবধি আবার নিজের জন্মস্থানে ফিরে গেলেন। সেই দুরন্ত ছেলেটি এখন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছেন।

খুব বেশি দিন বাঁচেন নি সেক্সপিয়ার, ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বায়ান্ন বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করলেন। কিন্তু এমন প্রতিভার কখনও মৃত্যু হয় না, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর লোকে তাঁকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আসন দিয়ে থাকে। নানান ভাষায় তাঁর নাটকের অনুবাদ হয়েছে, যতই লোকে সেগুলি পড়ে ততই মুগ্ধ হয়। উঁচুদরের কবিতাও লিখেছিলেন তিনি, তবু নাট্যকার রূপেই তিনি লোকের মনে অমর হয়ে থাকবেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে আমি বেশ নরম গলায় গান গাইতে চেষ্টা করছিলুম, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না তো তুমি—' আর টেনিদা বেশ উদাস হয়ে একটার পর একটা চীনে বাদাম চিবিয়ে খাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় পাশ থেকে কে যেন গলা খাঁকারি দিয়ে বললে, হু-হুম্!

চেয়ে দেখি লম্বা চেহারার একটি লোক, গায়ে রং-চটা হলদে মতন একটা পুরোনো ওভারকোট, পরনে তালিমারা ট্রাউজার আর গালভর্তি এলোপাথাড়ি দাড়ির সঙ্গে এক মুখ হাসি। দাঁতগুলো আবার পানের ছোপ ধরা—ঠিক এক রাশ কুমড়োর বিচির মতো মনে হল।

লোকটা আবার বললে, আমি প্রতিবাদ করছি। এর চাইতে ভালো দেশ পৃথিবীতে অনেক আছে।

টেনিদার চীনে বাদাম চিবানো বন্ধ হয়ে গেল।

—আচ্ছা লোক তো মশাই। আপনি বাঙালী হয়ে বাংলা দেশের নিন্দে করছেন?

—আমি বাঙালী নই। আমি ভারতবর্ষের লোকই নই।

—তবে কি বাঙাল? না পাকিস্তানী?

—না—আমি হনোলুলুর লোক।

—হনোলুলু?—টেনিদার গলায় চীনে বাদাম আটকে গেল। আর আমি কাকের মতো হাঁ করে চেয়ে রইলুম লোকটার মুখের দিকে।

বার কয়েক কেশে টেশে টেনিদা সামলে নিলে। তারপর বললে, চালিয়াতির আর জায়গা পাননি স্যার? দিব্যি বাঙালী চেহারা আপনার—চমৎকার বাংলায় কথা বলছেন, আপনি হনোলুলুর লোক? তা হলে আমি তো ম্যাডাগাস্কারের লোক—আর এই প্যালাটা হচ্ছে আফ্রিকার গরিলা।

আমি দারুণ প্রতিবাদ করে বললুম, কক্ষনো না, আমি মোটেই আফ্রিকার গরিলা নই। বরং তোমাকে অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারু বলা যেতে পারে।

গাল ভর্তি এলোমেলো দাড়ি আর কুমড়োর বিচির মতো দাঁত নিয়ে আবার হেসে উঠল লোকটা। বললে, ছিঃ খোকারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে নেই। আমি হনোলুলুর লোক কিনা জানতে চাও? তোমরা অ্যানথ্রপোলজী পড়েছ?

আমরা বললুম, না, পড়িনি।

—পিকানথ্রোপাস্ ইরেক্টাসের কথা কিছু জানো?

আমরা আঁত্‌কে উঠে বললুম, না—জানি না।

—সেই জন্যেই বুঝতে পারছ না। এ-সব পড়লে-টড়লে জানতে, বাঙালী আর হনোলুলুর লোকের চেহারা একই রকম।

গোটা দুতিন কটকটে নামের ধাক্কাতেই আমরা কাত হয়ে গিয়েছিলুম, তেমনি বোকার মতো চেয়ে রইলুম লোকটার দিকে।

লোকটা তেমনি বলে যেতে লাগল: আর বাংলা শিখলুম কী করে? আমি হচ্ছি ওয়ার্লড্ ট্যুরিস্ট—অর্থাৎ ভূ-পর্যটক। আর জানোই তো, ট্যুরিস্টদের দুনিয়ার তামাম ভাষা শিখতে হয়।

—আপনি সব ভাষা জানেন?—টেনিদা এবার নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল।

—আলবৎ।

—জাপানী বলুন তো?

—কাই-দু-চি—নাগাসাকি-হিরোহিতো-উচিমিয়ো-কিচিকদা—বুঝতে পারছ?

আমি বললুম, পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আচ্ছা একটু জার্মান বলুন।

—ভোলতেন্‌জেন-কুলভুরক্যাম্প-ব্লিৎক্রিগ-গট্ ইন্ হিম্মেল!

টেনিদা বললে, খুব ইণ্টারেস্টিং তো? ফরাসীও নিশ্চয় জানেন?

লোকটা মিটমিট করে হেসে বললে, আঁফাঁ তেরিব্‌ল্—বঁজুর মঁসিয়ো—সিল্‌ ভু প্লে-ক্যাস্‌ কে সে ?

টেনিদা বললে, দারুণ।

আমি চোখ কপালে তুলে বললুম, নিদারুণ।

—আর শুনতে চাও ?

—না স্যার, এতেই দম আটকে আসছে। আপনার নামটা জানতে পারি ?

—আমার নাম ম্যাকাদিনি বেনিহ্বিতো অ্যাসপারাগাস ডি প্রোফাণ্ডিস্‌ !

—কী সর্বনাশ।

লোকটা তালিমারা ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরে বেশ কায়দা করে শিস্‌ দিলে একটা। বললে, আমাদের হনোলুলুর নাম একটু লম্বাই হয়। তোমাদের বাঙালী নামই বা কিসে কম ? এই তো একটু আগেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল—তাঁর নাম নিত্যরঞ্জন দত্ত রায়চৌধুরী।

টেনিদা মাথা চুলকে বলল, যেতে দিন স্যার, কাটাকাটি হয়ে গেল। কিন্তু অত বড় নামে তো আপনাকে ডাকা যাবে না, একটু শর্টকাট করতে পারলে—

—আচ্ছা, আচ্ছা, ম্যাকাদিনি বোলো। তোমাদের বাংলা মতে 'ম্যাকু' বাবুও বলতে পারো।

আমি বললুম, মাকু বললে হয় না ?

—তাও হয়।—লোকটা এক গাল হাসল : মাকুদাই বরং বোলো আমাকে। বেশ একটা ভাই ভাই সম্পর্ক হয়ে যাবে। আর জানোই তো—এটা বিশ্বপ্রেমের যুগ।

টেনিদা বললে, নিশ্চয়। এখন চারিদিকেই তো বিশ্বপ্রেম। তা মাকুদা—আপনি কিন্তু আমাদের প্রাণে বড্ড ব্যথা দিয়েছেন।

মাকুদা বললে, দিয়েছি নাকি ? গট ইন হিম্মেল। কখন দিলুম ?

—একটু আগেই। প্যালা গান গাইছিল, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'—আপনি ফস করে বলে বসলেন, আপনি তার প্রতিবাদ করছেন।

মাকুদা আমাদের পাশে বসে পড়ল এতক্ষণে। তালিমারা ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে সেটা ধরিয়ে নিলে। তারপর বললে, আঁফাঁ তেরিব্‌ল ! মানে—আমি খুব দুঃখিত। মাত্র তিন দিন আগেই আমি জাপান থেকে এসেছি কিনা। সেখানে যে আদর যত্ন পেয়েছি, তার কথা যখনই মনে পড়ছে—তখনই ভাবছি—হিরিসুমা কুচিকিদো—অর্থাৎ কিনা—আহা, সে স্বর্গ।

—তাই নাকি !

—কী আর বলব তোমাদের।—এলোমেলো দাড়িতে ভর্তি গালটাকে ছুঁচোলো করে নিয়ে মাকুদা চোঁ করে বিড়িতে একটা টান দিলে : প্রথম যেদিন জাপানে পা দিলুম—কাউকে চিনি-টিনি না, সবে দু পা পথে বেরিয়েছি, হঠাৎ দুজন লোক আমাকে স্যালুট করে বললে, ইসিকিমা কিচিকিচি ?—মানে, তুমি কি বিদেশী ? আমি বললুম, উচি উচি—মানে হ্যাঁ-হ্যাঁ। লোক দুটো বললে, ওকাকুরা আসাবুরো—মানে আমাদের সঙ্গে এসো।

টেনিদা জানতে চাইল : তারপর ?

—তারপর ? নিয়ে গেল একটা ফার্স্টক্লাস হোটেলে। কত যে কী খাওয়ালো সে আর কী বলব ! চপসুয়ে, চাউচাউ, ব্যাঙের রোস্ট্—আহা, মনে পড়লে এখনো পেটের ভেতর চনচন করে ওঠে। পেট ভরে খাইয়ে দাইয়ে হাতে দুশো ইয়েন—মানে জাপানী টাকা দিয়ে বললে, দোজিমুরা কাঁচুমাচু—অর্থাৎ কিনা, তোমায় সামান্য কিছু হাত খরচ দিলুম।

টেনিদা বললে, ইস্—একবার তো জাপান যেতে হচ্ছে। ও খাবারগুলো এখানকার চীনে হোটেলে পাওয়া যায়—ই-ই-স্ !

—যেয়ো। শুধু জাপান ? যেই ফ্রান্সে গেছি, অমনি এক ভদ্রলোক বোঁ করে তাঁর মস্ত মোটরটা আমার পাশে থামালেন। বললেন 'মঁসিয়ো, ভেনেজাভেক মেয়ো।'—মানে আমার সঙ্গে আসুন। গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেলেন তাঁর মস্ত বাড়ীতে। তারপর কী যত্ন—কী খাওয়া-দাওয়া। বললেন, 'আ তু দো লাং ?' মানে—ফরাসী দেশ দেখবেন ? 'ভূজ্যাত্ ত্রে মেশাঁত'—মানে আমার গাড়ী করে যত ইচ্ছে ঘুরুন।

আমি বললুম, টেনি দা, ফ্রান্সেও একবার যাওয়া দরকার।

টেনিদা বললে, হুঁ, কাল-পরশুর মধ্যেই বেরিয়ে পড়লে হয়। সে পরে ভাবা যাবে। কিন্তু মাকুদা, বাংলা দেশে এসে—

মাকুদা শেষ টান মেরে বিড়িটা সামনের একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলে। উদাস হয়ে বললে, বাংলা দেশ হচ্ছে এক নম্বরের নেফানজেন—মানে অতিশয় বাজে জায়গা। এক কাপ চা তো দূরের কথা—কেউ একটা বিড়ি পর্যন্ত অফার করে না হে। বিদেশী ট্যুরিস্ট্—হনোলুলু থেকে আসছি—আমার দিকে একবার কেউ তাকায় না পর্যন্ত ! কাল এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম—ট্রামটা কোন্ দিকে যাবে। যেই বলেছি, 'স্যার'— তিনি এক লাফে সাত হাত সরে গিয়ে বললেন, 'হবে না বাবা—মাপ করো।' আমি ভিখিরী নহি ?—মাকুদার চোখ জ্বলতে লাগল : শেম্ !

আমি আর টেনিদা এক সঙ্গে বললুম, শেম্—শেম্ !

মাকুদা তেমনি জ্বলন্ত চোখে বললে, আমি দেশে গিয়ে একটা ভ্রমণ কাহিনী লিখব। পৃথিবীর সব ভাষায় সে বইয়ের অনুবাদ হবে, লাখ লাখ কপি বিক্রী হবে তার। তাতে লেখা থাকবে, বাঙালী অতি নচ্ছার—মানে নেফানজেন, বাংলা দেশ অতি খারাপ—মানে 'ল্য শা বোতে'—মানে ইতিপুরো তাকাহাঁচি—মানে—

এই পর্যন্ত শুনেই আমাদের বাঙালী রক্তে আগুন ধরে গেল। দেশকে অপমান—জাতির নামে অপবাদ ! টেনিদা হঠাৎ গর্জন করে বললে, থামুন দাদা, আর বলতে হবে না। বাঙালীর পরিচয় এখনো আপনি পাননি। প্যালা !

—ইয়েস টেনিদা ?

—পকেটে হাউ মাচ ?

—ছটা টাকা আছে। একটা পড়ার বই কিনব ভেবেছিলুম।

—পড়া? পড়া এখন চুলোয় যাক। জাতির সম্মান বিপন্ন দেখতে পাচ্ছিস না? আমার কাছেও একটা পাঁচ টাকার নোট রয়েছে, কাকিমা তেল-সাবান কিনতে দিয়েছিল। কিন্তু ন্যাশনাল প্রেস্টিজ্‌ই

"প্যালা পকেটে হাউ মাচ?"

যদি যায়—কী হবে তেল সাবান দিয়ে? চল্‌—মাকুদাকে আমরা এন্‌টারটেন করি। সমস্ত বাঙালী জাতির পক্ষ থেকেই।

বইয়ের টাকা দিয়ে মাকুদাকে এন্‌টারটেন্‌ করা। বড়দার মুখটা মনে পড়তেই বুকের ভেতরে একবার আঁকুপাঁকু করে উঠল। কিন্তু দেশ এবং জাতির এই দারুণ দুর্দিনে 'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা'—মানে— 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি তো মেষ!'

টেনিদা বললে, চলুন মাকুদা—বাঙালীকেও একবার দেখে যান।

কুমড়োর বিচির মতো দাঁত বের করে মাকুদা বললেন, কোথায় দেখব -

—দি গ্রেট্‌ আবার খাবো রেস্টুরেণ্টে।

মাকুদা দেখলেন, ভালোই দেখলেন। চারটে কাটলেট, দু প্লেট মাংস, এক প্লেট্‌ পোলাও, এক প্লেট্‌ পুডিং। তারপর দু প্যাকেট ভালো সিগারেট আর তিনটাকা ট্যাক্সি খরচ আমরা ওঁর হাতে তুলে দিলুম। মানে আরো দিতুম, কিন্তু পকেট ততক্ষণে গড়ের মাঠ হয়ে গিয়েছিল।

—এইবার খুশি হয়েছেন মাকুদা -

ট্যাক্সিতে পা দিয়ে মাকুদা বললেন, বিলক্ষণ।

—বাঙালীর দয়া লিখবেন তো ভালো করে? আমার আর প্যালারামের কথা?

—সব লিখব, যদি আমার বই কেউ ছাপে।—বলে মাকুদা ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে, বাগবাজারে—জলদি! আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, আপনার বই ছাপবে না মানে? আপনি একজন ওয়ার্ল্ড টুরিস্ট—

—জীবনে আমি দমদমের ওপারে যাইনি। আমার নাম বেচারাম গড়গড়ি—বাগবাজারে থাকি। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল—তাই—তা বেড়ে খাইয়েছ, থ্যাঙ্ক ইউ, টা-টা—

আমাদের নাকের ওপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা॥

ব্যাঙগিন্নী

উমা দেবী

নাকছাবি হারিয়েছে ব্যাঙগিন্নী,
কোরাস—"সত্যপীরের দোরে মানো সিন্নী"।
বাঙ বৌ থপথপে পায়ে চলে যায়
চার দিকে ইতি উতি ভয়ে ভয়ে চায়।
নেয়েছে সে ভোরবেলা ডোবার জলে—
চিৎ হয়ে ভেসেছে সে পানার তলে—
পাঁকের সাবান মেখে হিম-হিম গায়
চলে যেতে উই-ঢিবি থেঁৎলেছে পায়।
হায় হায়! এই ফাঁকে কোনখানে ভুলে
পড়ে গেছে নাকছাবি নাক থেকে খুলে।
নাকছাবি হারিয়েছে ব্যাঙগিন্নী,
কোরাস—"সত্যপীরের দোরে মানো সিন্নী"।

ব্যাঙ-বৌ খায় নাকো কোন কিছু আর
একেবারে ছেড়ে দিল আহার বিহার।
সোনাব্যাঙ কোলাব্যাঙ জোলাব্যাঙ এসে
কত কী যে বুঝিয়েছে কত ভালোবেসে!

ব্যাঙ কর্তাও এলো কাতর পরাণ—
সেধে সেধে সেও বুঝি হলো হায়রান।
রেগে-মেগে বলে শেষে—"রাখো কান্নাটা,
না-হয় গড়িয়ে দেব কোমরের পাটা।"
নাকছাবি হারিয়েছে ব্যাঙগিন্নী,
কোরাস—"সত্যপীরের দোরে মানো সিন্নী"।
হারিয়েছে নাকছাবি ব্যাঙগিন্নী,
কোরাস—"সত্যপীরের দোরে মানো সিন্নী"।
আচ্ছা—তোমরা বলো, বে-খাওয়ার দিনে
বেয়াই বাড়ী কে যায় নাকছাবি বিনে?
কোনো পায়ে নেই তার ঘুঙুর-শিকলি,
চুল নেই, কোথায় বা পরবে টিকলি?
নাক ছিল মুখজোড়া—তাই মনোলোভা
নাকছাবি প'রে তার বেড়েছিল শোভা।
তাও শেষে হারালো—ওঃ—কী যে আফশোষ—
খুঁৎখুঁতে ব্যাঙবৌ কাঁদে ফোঁস-ফোঁস।
হারিয়েছে নাকছাবি ব্যাঙগিন্নী,
কোরাস—"সত্যপীরের দোরে মানো সিন্নী।"
ব্যাঙবৌ কাঁদে আর তাকায় আকাশে,
সব তারা নাকছাবি হয়ে যেন হাসে।
জ্যোৎস্নায় ভিজে ভিজে ঘাসেদের ফুল
নাকছাবি হ'য়ে যেন হাসে জুলজুল।
তরাসে ব্যাঙের বৌ হিমেল হাওয়ায়
হলুদ পাতার তলে বিছানা বিছায়।
নাকছাবি খুঁজে আন—ওঠে কলরোল,
না হ'লে ব্যাঙের বৌ—বল হরিবোল।
হারিয়েছে নাকছাবি ব্যাঙগিন্নী,
কোরাস—"সত্যপীরের দোরে মানো সিন্নী।'

পাখিদের কথা

পাখিদের কথা শুনতে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগে ? আমারও। সব রকম পাখি নয়, শুধু যাদের আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি, তেমনি কয়েকটি পাখির হালচালের কথা তোমাদের বলি।

আমাদের বাড়ির বাগানে নিমগাছের ডালে একটা ভাঙ্গা কলসী বহুদিন থেকে বাঁধা আছে। আসলে কিন্তু ওটা পাখিদের মনের মতন একটি ফ্ল্যাট্। প্রতিবছর অনেক পাখি বাসাটি পছন্দ করে যায়। অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি হয়, কিচির মিচির ক'রে সকলেই খুব তর্ক করে। অবশেষে অন্য সবাই হার মানে আর এক জোড়া থেকে যায় দখল ক'রে। এমনি করে ঐ বাসাটায় প্রথমে এসেছিল এক জোড়া লক্ষ্মীপ্যাঁচা, তারপর দুটি শালিখ, তারপর নীলকণ্ঠ।

নীলকণ্ঠ কর্তামশাই কদিন খুব ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে বাসাটার আশে পাশে উড়ে কি সব দেখলেন। তারপর উঁচু একটা ডালে বসে গিন্নীর সঙ্গে কি পরামর্শ হোলো। গিন্নী চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁটটা ডালে ঘ'ষে সায় দিলেন—অর্থাৎ বাসাটি ওঁদের পছন্দ হয়েছে। এরপর কিছুদিন বেশ চুপ্‌চাপ্। কারুর কোনো সাড়াশব্দও নেই। ওমা, তার কদিন পরেই দেখি কলসীটার যেখানটায় ভাঙ্গা—মানে ওদের দরজা আর কি, সেখানে দুটো বাচ্চা নীলকণ্ঠ মুখ বার করে বসে আছে। দেখে মনে হোলো বাইরের রোদ্দুর আর গাছপালা ওদের বেশ ভালোই লাগছে। তারপর ওদের মা'র সঙ্গে ওরা একটু দূরে একটা শিমুল গাছে গিয়ে বসল। ওড়বার সময়ে ওদের গভীর নীল রেশমী ডানা যে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল ! কিন্তু অত সুন্দর রঙ ডানাগুলো থেকে ঝরে পড়লে কি হবে, ওদের গলার স্বর কি বিচ্ছিরি ! অমন যাদের দেখতে তাদের কাঁ কাঁ করে কর্কশ সুরে ডাকতে শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিল ওরা যদি দোয়েল কি শ্যামার মত শিষ দিতে পারত তবেই যেন মানাত ! যাই হোক, বাচ্চারা উড়তে শেখার পরেই কিন্তু একদিন তারা সবাই বাসাটা খালি করে দিয়ে কোথায় চলে গেল। আর দেখতে পেলুম না।

গতবারে শীতের সময় কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলুম। অনেক শীতের পাখি দেখা হ'য়ে গেলো। হলুদে ছোপানো রেশমী গা বেনে-বৌ, ল্যাজ দোলানো ধূসর রঙের খঞ্জনা, কালো ভেল্‌ভেটের পালক গায়ে ফিঙে। বাদামী রঙের মস্ত বড় ল্যাজওয়ালা একটা পাখি সারা বাগান খালি হেঁটে বেড়াত। ওকে বলতুম ল্যাজঝোলা। কাঠ্‌ঠোক্‌রা ধরণের ছোট্ট সবুজ পাখি, গলার কাছটা লাল তাও দেখলুম। পাখিটা আপন মনে একটা গাছের শুকনো ডালে রোজ এসে ঠোক্কর মারতে লাগল। ডালটা বেশ শক্ত আর মোটা ছিল। আমি ভাবতুম ঐটুকু পাখি, তার এক রত্তি ঠোঁট—তা দিয়ে ঐ ডালে গর্ত করতে পারবে কি ? কিন্তু কিছুদিন পরে দেখি বেশ নিটোল একটি গর্ত সত্যিই হয়েছে আর সবুজ পাখিটা তার সঙ্গীকে নিয়ে সেখান থেকে বেরোচ্ছে আর ঢুকছে। এরপর বাচ্চাও হয়েছিল বোধ হয়, সে আর আমার দেখা হয় নি।

সব চেয়ে কাছ থেকে দেখতে পাই ছুটি পাখিকে—তারা আমাদের বাড়ির পোষা কোকিল আর টিয়া। টিয়াটা আগে ভারি ভীতু ছিল। খাঁচার ভেতর হাত গলিয়ে খেতে দিলে ভয়ে সিঁটিয়ে খাঁচার এক কোণে বসে থাকত আর চোখ পাকিয়ে দেখত। অবশ্য কাঁচালঙ্কার বেলায় লোভ সামলানো দায়—তাই হাত থেকে নিয়ে ভোঁ দৌড়। ইদানীং তার ভয় এবং খাঁচার ভেতর দৌড়দৌড়ি অনেকটা কমেছে। এদিকে আবার বেশ ঘুম-কাতুরেও আছে। কতদিন দেখেছি ছুধ মাখা ভাত খাবার পর চোখটা বন্ধ করে নিঝ্ঝুম্ হয়ে থাকে। ঝিমুনি আসে বোধহয় আর তখন ছোট্ট লাল টুক্টুকে জিবটা বার করে হাইও তোলে। সে ভারি মিষ্টি দেখতে।

তবে কোকিলটার সঙ্গেই আমার ভাব বেশি। আমাকে দূর থেকে দেখতে পেলে খাঁচার ভেতর ছট্ফট্ করতে থাকে। সমস্ত পালকগুলো ফুলিয়ে অদ্ভুত করে ডাকে—মনে হয় বলছে 'কি কি কি।' সেটা ওর খুব আনন্দের ডাক। তারপর কাছে এলে কুউ-কুউ করে খুব নীচে থেকে আস্তে আস্তে খুব চড়া সুরে ডাকতে থাকে। খাঁচার ভেতর হাত গলিয়ে দিলে হাতের ওপর ঝপ্ করে উড়ে এসে ব'সে নাচা-নাচি সুরু করে দেয়। হাত থেকে ভাত, কলা, পেঁপে, ছাতু লক্ষ্মীছেলের মত খেয়ে নেয়। হালুয়া খেতে অবশ্য ওরা ছুজনেই খুব ভালবাসে। তবে হ্যাঁ, সব সময়েই যে এমনি খোস মেজাজে থাকে তা নয়। রাগও আছে। একবার কোকিলের বাঁশের খাঁচাটা ভেঙ্গে যাওয়ায় লোহার খাঁচায় রাখতে গেলুম—অমনি চোখ লাল করে খুব চেঁচামেচি করতে লাগল, ঝট্পটানি আর থামতে চায় না। খাঁচার গায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্ত বার করে ফেললে। খাঁচার ভেতরে হাত দিতেই আঁচড়ে কামড়ে একসা করে দিলে। বুঝলুম নতুন খাঁচাটা ওর মোটে পছন্দ নয়। ওকে দেখে আমার কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু কি বা করা যায়।

আমাদের প্রতিবেশীনী চড়ুই গিন্নীর কথা বলে এবারে শেষ করব। তিনি আমাদের সামনের বাড়িতে থাকেন—না না, হাসবার কিছু নেই, ভেন্টিলেটার কি বাড়ি নয়? রোজ সকালে যেই আমি রান্নাঘরে চা করতে নাবি চড়ুই গিন্নীরও অমনি দিন সুরু হয়। তিনি রোজ সকালে আমাদের রান্নাঘরের দরজা দিয়ে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ঢোকেন; তারপর সোজা উড়ে গিয়ে বসেন বাসনের র‍্যাকে। পুরণো বাসনগুলো একটা কাঠের তাকে রাখা হয় আর তার খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে থাকে খুদে আরশোলা। আমাদের বিচ্ছিরি লাগলে কি হবে চড়ুই পরিবারের প্রাতরাশের ব্যবস্থাটি ওখান থেকেই হওয়া চাই। গিন্নী অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ছু একটি আরশোলা ধরে নিয়ে সোজা বাসায় চলে যান। এমনি হয় বেশ কয়েকবার। আমি ছু'একদিন পাঁউরুটির গুঁড়ো দিয়ে দেখছি; মুখে তুলেছেন বটে তবে খুব যেন মুখরোচক নয়—ঘুরে ফিরে সেই বাসনের তাক। ওঁর ব্যস্ততা দেখে বোঝা যায় সবাই বাড়ীতে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে কখন খাবার আসবে। এসব কাজে কর্তামশাইকে কিন্তু কখনও দেখি নি। একদিন শুধু চড়ুইকর্তাকে দেখেছিলুম ঝাঁটার কাঠির টুক্রো নিয়ে বাসায় ঢুকতে। বাসা তৈরীর ভার ওঁর ওপরে পড়ে থাকবে। তারপর কি হল সেই বাসার তা অবিশ্যি আমি জানি না; তবে গিন্নী এখনও রোজ সকালে আসেন, তোমরা যদি চাও তো আলাপ করিয়ে দিতে পারি।

জেনে রাখো (১)

ফুটবলের কথা

আমাদের দেশে যে ধরণের ফুটবল খেলা হয় তাকে বলে অ্যাসোসিয়েসন ফুটবল, কারণ এর নিয়মগুলি ব্রিটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েসন তৈরী করেছিল। সবসুদ্ধ সাত রকম ফুটবল খেলা আছে, তার মধ্যে কেবলমাত্র অ্যাসোসিয়েসন ফুটবলেই গোল্-কিপার ছাড়া আর কাউকে হাত দিয়ে বল ছুঁতে দেওয়া হয় না, এমন কি গোল-কিপারও বল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না।

আমাদের দেশে এই খেলার প্রবর্তন করেছিলেন সেইসব ইংরেজ শিক্ষক ও রাজপুরুষরা, যাঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতার আশেপাশে বসবাস করতেন। শোনা যায় এখানে প্রথম ফুটবল ম্যাচ্ খেলা হয় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে। দেখতে দেখতে খেলাটা ভারি জনপ্রিয় হয়ে উঠল, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই অনেকগুলি ফুটবল ক্লাবের পত্তন হল। এই সব আদি ক্লাবের একটি আজ অবধি সসম্মানে টিকে আছে; সেটি হল মোহনবাগান ক্লাব। ১৯১১ সালে প্রথম যে ভারতীয় টিম আই-এফ-এ শীল্ড জিতেছিল, সে হল মোহনবাগান।

জেনে রাখো (২)

গণিত শিক্ষা

এ কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় না কি যে পাঁচ হাজার বছর আগেও ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের পণ্ডিতরা গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কে যে সব গণনা করেছিলেন সেগুলিতে এক সেকেণ্ড পরিমাণেরও ভুল পাওয়া যায় না!

অতি উচ্চ শ্রেণীর গণিতের বই 'সূর্য সিদ্ধান্ত' লেখা হয়েছিল দু হাজার বছর আগে। এই সময়ে এদেশে দশমিক হিসাব ও শূন্যচিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়, অথচ সে সময় প্রায় সব জায়গায় কেবল মাত্র পুজো ও বলিদানের বেদী গড়তেই লোকে অঙ্কের হিসাবকে কাজে লাগাত।

পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে আর্যভট্ট তেত্রিশটি শ্লোক দিয়ে গণিতশাস্ত্রের একটি সোনার খনি তৈরি করে দিয়েছিলেন। কত তথ্য যে তার মধ্যে ছিল তার গুরুত্ব হয় তো তিনি নিজেও তখন বোঝেন নি, অথচ পরবর্তীকালের গণিতের প্রগতি সেই সব তথ্যের উপরেই অনেকখানি নির্ভর করেছিল। আশ্চর্য এই যে জ্যামিতির বিদ্যা সেই তুলনায় অনেক পেছিয়ে ছিল।

হিন্দুদের মতো বৌদ্ধরাও গণিতের চর্চা করতেন, যদিও কোনো বিখ্যাত বৌদ্ধ গণিতশাস্ত্রের পণ্ডিতের নাম সেরকম পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব নিজে আট বছর বয়সে বিদ্যাসাধনা শুরু করেন;

লিখতে পড়তে শিখেই তিনি অঙ্ক ধরেছিলেন। তখন অঙ্ককে বলা হত জ্ঞান বিজ্ঞানে বায়ান্তর বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সেকালে এক দুই তিন সংখ্যা চিহ্নের ব্যবহার ছিল না, ০ কে লেখা হত শূন্য, ১ হল আদি। তবে সম্রাট অশোকের সময়ের আগে থেকেই যে সংখ্যার চল হয়েছিল সেটা তাঁর শিলালিপি দেখলেই বোঝা যায়।

মোগল রাজারা স্থাপত্য ভালোবাসতেন। কিন্তু প্রাসাদ, মসজিদ, বাগান ও ফোয়ারা তৈরী করবার সময় তাঁরা তুর্কি স্থপতি আনতেন, ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে বড় একটা পরামর্শ করতেন না। যদিও আকবর সাহ মাঝে মাঝে একটু উৎসাহ দিতেন, তাও বলবার মতো কিছু নয়। অম্বরের রাজা জয়সিংহ মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত জগন্নাথ সম্রাটকে সম্মানিত করেছিলেন বলে শোনা যায়, নইলে দেশের গণিত-শাস্ত্রের তখন বড় দুর্দিন।

ইংরেজ আমলেও এদেশের বিশুদ্ধ গণিতের অনাদর চলেছিল। তাঁদের দৃষ্টি ছিল পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, স্থাপত্য ও বল-বিজ্ঞান বা মেক্যানিক্সের উপরে। এই সময় একমাত্র পণ্ডিত শ্রীনিবাস রামানুজনের নাম পাওয়া যায়, যাঁর অসাধারণ গণিত প্রতিভা দেখে ইংরেজ শিক্ষকরাই তাঁকে কেম্ব্রিজে গিয়ে পড়াশুনা করবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। খুব কৃতীও হয়েছিলেন তিনি, রয়েল সোসাইটি ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়ে তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পানের জন্ম কথা

(ভিয়েৎনামের গল্প)

সবিতা দাসগুপ্ত

ছোটবেলা থেকেই দেখছি দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে মা-মাসীরা পানের বাটা নিয়ে বসেছেন। তোমরাও হয়তো কখনও কখনও খাও। আর এখন তো রাস্তার মোড়ে মোড়ে পানের দোকান। এই পান খাওয়া কিন্তু ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানেই নয়—নেপালে আছে এমনকি ভিয়েৎনামেও আছে। আমাদের মত ভিয়েৎনামেও বিয়ে, পাকা-দেখা এসব উৎসবে পান দেওয়াটা চিরাচরিত রীতি। আর কিছু না খেলেও একটা পান অন্ততঃ খেতেই হবে। এটা আর কিছুই নয়—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এবং আতিথেয়তার চিহ্ন। ভিয়েৎনামে একটা সুন্দর কথা চলিত আছে—"সব কথোপকথন ও ভালবাসার আরম্ভই হচ্ছে পান দিয়ে।"

পান খেতে চুন সুপুরী লাগে একথা কে না জানে। কি করে পান খাওয়া আরম্ভ হোল এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে।

অনেক যুগ আগে ভিয়েৎনামে রাজা ছিলেন চতুর্থ ইভ্। তাঁর রাজত্বে দুই ভাই বাস করত—তান আর ল্যাং। তান বড়, ল্যাং ছোট, দুজনেই বেশ সুন্দর আর বুদ্ধিমান ছিল। তারা একই গুরু 'লু'র কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।

লু'র একটি খুব সুন্দর মেয়ে ছিল। তার সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে—গলার স্বরটিও ছিল ভারী মিষ্টি। সেই মেয়েকে দেখেই তো তানের খুব পছন্দ—বিয়ে করতে চাইল ওকে। লু বিয়েতে মত দিলেন—মেয়েটিও আপত্তি করল না। দাদার বিয়েতে ল্যাং খুব খুশী—আনন্দে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠল। শহরশুদ্ধ্ লোক এই বিয়ের উৎসবে মেতে উঠল—চারিদিক আলোয় আলোময় করে সাজানো হোল। হৈ চৈ আনন্দের মধ্যে তানের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ে করে কিন্তু তানের আর কোনদিকে নজর নেই—বৌ নিয়ে মত্ত হয়ে রইল দিনরাত। বৌও তাই স্বামীর কথাই ভাবে, তাকেই যত্ন আত্তি করে। এদিকে ঘরে যে একটি দেওর রয়েছে তাকেও যে যত্ন করা উচিত সেদিকে খেয়াল নেই।

এ পর্যন্ত ল্যাং কখনও তানকে ছেড়ে থাকেনি। এখন একা পড়ে গিয়ে বেচারীর খুব কষ্ট হতে লাগল। বৌদির অবহেলা সহ্য করে ছিল কোনরকমে কিন্তু যখন দেখল তানও ওর হয়ে একটা কথা বলছে না তখন মনের দুঃখে ঠিক করল ও চলে যাবে এখান থেকে। এরকম ব্যাপার হলে সাধারণতঃ লোকে বিরক্ত হয়ে নিজেদের জিনিষপত্র নিয়ে আলাদা হয়ে যায় কিন্তু ল্যাং ঠিক সাধারণ ছেলে ছিল না। এরকম দুঃখ কোনদিন আসতে পারে, তার ভাই তাকে কোনদিন ভুলে যেতে পারে সে ভাবতেই পারেনি।

সুতরাং একদিন রাত্রি ভোর হবার আগেই ল্যাং কাউকে কিছু না বলে কোন জিনিষপত্র না নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল !

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে হাঁটতে লাগল— কিছুক্ষণ পরে একটা জঙ্গলের সামনে এসে উপস্থিত হল। সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই হেঁটে চলল—কোথাও একটু বিশ্রাম করল না জঙ্গল পার হয়েও হেঁটে চলল, পা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল, খিদেয় পেটে ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেল তবুও তার হাঁটার বিরাম নেই। অবশেষে এক নদীর ধারে এসে পৌঁছল। শান্ত নদীটির আয়তন দেখে সে কেঁদে ফেলল—কি করে পার হবে এখন। নদীর ধারে বসে কাঁদতে কাঁদতে মরেই গেল ল্যাং।

ওপর থেকে দেবতারা সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন। ল্যাঙের জন্য খুব কষ্ট হোল ওঁদের। ওর কথা যাতে পৃথিবীর সকলের মনে থাকে তাই ওকে একটা পাহাড়ে পরিণত করে দিলেন। নির্জন জায়গা কাছে পিঠে কোন লোকালয় নেই, সেজন্য চতুর্দিক থেকে পাহাড়টা দেখা যেতো। কেবল নদীটা কাছে এসে গুণগুণ করে গান শুনিয়ে যেতো।

কিছুদিন পর্যন্ত তান আনন্দেই ছিল। ল্যাং যে বাড়ীতে নেই তান আর তার বৌ লক্ষ্যও করেনি—এমনই মত্ত ছিল তারা নিজেদের নিয়ে। একদিন হঠাৎ তানের চোখ খুলল—আরে! ল্যাং কোথায় গেল—ওকে তো দেখা যাচ্ছে না। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ—ল্যাং কোথাও নেই। পাগলের মত হয়ে উঠল তান—অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগল তার মন।

সে ঠিক করল ল্যাংকে খুঁজতে বেরোবে। একদিন ভোরে বৌকে কিছু না জানিয়ে চুপিচুপি সে বেরিয়ে পড়ল। ক্রমাগতঃ ডাকতে লাগল, "ল্যাং, তুমি কোথায়? সাড়া দাও, ফিরে এস।" কেউই তার কথায় উত্তর দিল না—কেবল প্রতিধ্বনি তাকে ব্যঙ্গ করতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে তানের পা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল, খিদের চোটে পেট ব্যথা করতে লাগল তবুও সে না থেমে এগিয়ে চলল। ক্রমে নদীর তীরে সেই উঁচু পাহাড়টার কাছে এসে পৌঁছল। পাহাড়ের ওপরে উঠে সেও কাঁদতে কাঁদতে মরে গেল।

ওপর থেকে দেবতারা সব দেখেছিলেন—মৃত তানকে তারা একটা সরু লম্বা গাছে পরিণত করলেন। নদী তেমনি গুনগুন করে গান শোনাতে লাগল।

এদিকে তানের বৌ জেগে দেখে তান নেই। ভয় হয়ে গেল তার। "তান গেল কোথায় আমাকে না বলে, ল্যাঙের মত বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল নাকি"—এসব ভাবতে ভাবতে সেও পাগলের মত হয়ে গেল। যেমনি ছিল তেমনিই দৌড়ে বেরিয়ে পড়ল তানকে খুঁজতে। চুল খুলে এলোমেলো হয়ে গেল—চোখের জলে বুক ভেসে গেল। সেও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে নদীর তীরে এসে পড়ল। দেখল সামনেই একটা পাহাড়, তার ওপরে সরু লম্বা এক গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ঐ গাছের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেও মরে গেল।

দেবতারা সব কিছুই দেখলেন—তানের বৌয়ের শেষ দেহভঙ্গিমার কথা মনে করে তাকে একটি লতায় পরিণত করলেন। নদী গুনগুনিয়ে তার অফুরান গান গেয়ে চলল।

বেশ কয়েক বছর বাদে একজন বৃদ্ধ লোকমুখে এই কাহিনী শুনে মুগ্ধ হলেন। তিনি সেখানে একটি মন্দির বানালেন এবং ভাইয়ে ভাইয়ে ভালবাসা ও স্বামীস্ত্রীর আনুগত্যের প্রতি মন্দিরটি উৎসর্গ করলেন।

তারপরে এল এক অনাবৃষ্টির সময়। নদী শুকিয়ে গেল, তার গান আর শোনা যেত না। বৃষ্টির অভাবে গাছপালা সব শুকিয়ে উঠল, ঘাসগুলো প্রথমে হলদে, তারপর বাদামী হয়ে গেল। কেবল পাহাড়ের ওপরের গাছটি ও তার পাশের লতাটি রইল সবুজ সতেজ।

ক্রমে এই গল্প লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সভাসদ্‌দের কাছ থেকে শুনে রাজা হং স্বয়ং এলেন এই ভালবাসা ও আনুগত্যের মন্দির দর্শন করতে। বিচিত্র সুন্দর দৃশ্য দেখে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন রাজা।

তাঁর লোকজনদের তিনি আদেশ দিলেন লতাটি থেকে কয়েকটা পাতা আর গাছটি থেকে কয়েকটা ফল তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। একটা ফল একটু চিবিয়ে পাতাটা মুখে দিলেন। একসঙ্গে দুটো চিবোবার পরে তাঁর মুখ থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বের হতে লাগল। একটুখানি পিক্ ফেললেন চুনা পাথরের ওপরে—অমনি সে জায়গাটা লাল হয়ে উঠল—রক্তের মতো লাল।

রাজার দেখাদেখি তাঁর সভাসদ্‌রা এবং তাদের দেখে দেশের অন্য লোকরা এই তিনটে জিনিষ মিলিয়ে খেতে লাগল—চুন, সুপারী, পান। আজ পর্যন্ত লোকে তাই খেয়ে আসছে।

গুড়-গড়াগড়ি

অমিতানন্দ দাশ

কুকুর মানুষকে কামড়ালে তা খবর হয় না, কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা খবর হয়। তেমনি, ছোটোখাটো জলের বন্যা প্রায়ই খবরের মধ্যে গণ্য হয় না—কিন্তু সে বন্যা যদি ঝোলাগুড়ের হয়?

ঝোলাগুড়ের বন্যা—অদ্ভুত শোনায়, না? কিন্তু সত্যি তা ঘটেছিল, আমেরিকার বস্টন বন্দরে, ১৯১৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী। বস্টনে গুড় চালান এসে একটা প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে জমা থাকত; সেদিন ২৮২ ফুট লম্বা আর ৫০ ফুট উঁচু ট্যাঙ্কটা ফেটে ৩½ লক্ষ মণ গুড়ের বন্যা বয়ে গেল।

দুপুর ১২টা ৪১এ ব্যাপারটা ঘটে। কিছু দূরে যে পুলিশ দাঁড়িয়েছিল সে একটা প্রচণ্ড গর্জন শুনে তাকিয়ে দেখে ট্যাঙ্কের তলার দিক থেকে গাঢ় রঙের গুড়ের স্রোত বেরিয়ে আসছে। তার চোখের সামনে ট্যাঙ্কটা তলা থেকে ওপর পর্যন্ত ফেটে গিয়ে পাহাড়ের মত উঁচু গুড়ের ঢেউ বেরিয়ে এল। আশেপাশের লোকেরা পরে বলে যে ট্যাঙ্কের ½" পুরু লোহার পাত ফাটার শব্দ হয় ঠিক একটা প্রকাণ্ড কাগজ ছেঁড়ার মত।

ট্যাঙ্কের ঠিক পাশে যে তিনতলা বাড়িটা ছিল সেটা মাটি থেকে উঠে গুড়ে ভেসে পিছনে রেল-লাইনের ব্রিজের তলায় গিয়ে পড়ে। তার তিনতলায় বাড়ির মালিকের যখন ঘুম ভাঙে তখন ঘরে কয়েক ফুট গভীর গুড়। আর একজন লোক গুড়ের কাছ থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে—গুড়ের স্রোত তার নাগাল পেয়ে তাকে ভাসিয়ে বন্দরের জলে নিয়ে গিয়ে ফেলে। জল থেকে যখন তাকে তোলা হলো, তখন সে অত্যন্ত ভীত এবং চ্যাটচ্যাটে—কিন্তু তার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নি।

ট্যাঙ্কের লোহার টুকরোগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েও অনেক ক্ষতি করে—একটা টুকরো রেললাইনের ব্রিজের লোহার থামকে ছুরি দিয়ে মাখন কাটার মতো কেটে বেরিয়ে যায়।

যাই হোক বন্যা তো ঘণ্টাতিনেকে থামল; আহতদের উদ্ধার করা হলো—কিন্তু লক্ষ লক্ষ মণ গুড় তখনো চারদিকে ছড়িয়ে রইল। স্বভাবতই এই বন্যা দেখতে লোকের ভিড় জমে গেল—আর কাজে বা দেখতে এসে যেই গুড়ের ওপর পা দেয়, গুড় তাকে চোরাবালির মতো আটকে ধরে। অনেক কষ্টে তারা উদ্ধার পায়, কিন্তু তাদের জুতো-জামায় করে সমস্ত বস্টন শহরে গুড় ছড়িয়ে পড়ে। পরের দিন বস্টনে ট্রামবাসের সিটে বা পার্কের বেঞ্চে বসলেই গুড়ে তার সঙ্গে সেঁটে যেতে হচ্ছিল।

তারপর এই এতো গুড় পরিষ্কার করা কি সোজা ব্যাপার? সমুদ্রের জল পাম্প করে তুলে তা দিয়ে গুড় ধোয়া হতে লাগল; বাড়ির নিচু ঘরগুলো থেকে গুড় বার করবার জন্যে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সাইফন কাজে লাগানো হলো। তবু শুধু গুড়ে ডুবে মরা লোকদের মৃতদেহ উদ্ধার করতেই এক সপ্তাহ লাগলো। তারপর বছরের পর বছর চাঁচা মোছা আর রঙ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও নাকি ভেজা-ভেজা দিনে ওই অঞ্চলের পুরোনো বাড়িগুলোতে মিষ্টি মিষ্টি গুড়ের গন্ধ পাওয়া যায়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক ঃ—

(১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার প্রসিদ্ধ গৃহযুদ্ধে একদলের সেনাপতি জেনারেল গ্রাণ্ট রিচমণ্ড সহর অবরোধ করিলেন কিন্তু দখল করিতে পারিলেন না। তাঁহার কয়েকটি নামজাদা সৈনিক কর্মচারী রিচমণ্ড সহরে শত্রুর হস্তে বন্দী রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এনজিনিয়ার, বুদ্ধিমান ও অসাধারণ সাহসী ক্যাপটেন সাইরাস হার্ডিং ছিলেন। হার্ডিংএর পুরাতন নিগ্রো ভৃত্য নেবও প্রাণপ্রিয় প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত ছিল না।

দুঃসাহসী সাংবাদিক গিডিয়ন স্পিলেট্‌ও সেই সময়ে রিচমণ্ড সহরে অবরুদ্ধ হন ও হার্ডিংএর সহিত পরিচিত হন। সহরের মধ্যে অবশ্য তাঁহারা ইচ্ছামতন চলাফেরা করিতে পারিতেন কিন্তু বাহিরে যাইবার উপায় ছিল না তাই তিনজনে পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রিচমণ্ড সহরের শাসনকর্তা তাঁহাদের সেনাপতি জেনারেল লির সাহায্য চাহিয়া দূত পাঠাইবার জন্য খাদ্যসামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্রসহ একটি বেলুন প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু যাত্রার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই দারুণ ঝটিকা আরম্ভ হইল, তাই যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইল।

পেনক্রফ্‌ট নামে এক অসম-সাহসী নাবিকও কার্যোপলক্ষ্যে রিচমণ্ড সহরে আসিয়া অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গে ছিল তাহার ভূতপূর্ব প্রভুর পুত্র পিতৃমাতৃহীন হারবার্ট। পেনক্রফ্‌ট হার্ডিংএর নিকট প্রস্তাব করিল যে অন্ধকার রাত্রে তাহারা ঐ বেলুনে চড়িয়া গোপনে রিচমণ্ড হইতে পলায়ন করিবে।

হার্ডিং, স্পিলেট ও নেব তৎক্ষণাৎ রাজি !

২০শে মার্চ রাত্রির গভীর অন্ধকারে প্রবল ঝটিকা ও তুষারপাত অগ্রাহ্য করিয়া পাঁচটি দুঃসাহসী যাত্রী

হার্ডিংএর প্রিয় কুকুর টপ্‌কে লইয়া, বেলুনে চড়িয়া, তার কাটিয়া দিল—কামানের গোলার মতন বেগে বেলুন উড়িয়া চলিল।

চারিদিন কুয়াশা ও ঝটিকার মধ্যে ক্রমাগত উড়িয়া যাইবার পর একটু পরিষ্কার হইলে যাত্রিগণ দেখিল যে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই সমুদ্র, ঝড়ের বেগে প্রচণ্ড ঢেউ উঠিতেছে। বেলুনের আবরণে বড় একটি ছিদ্র হইয়া ক্রমাগত গ্যাস বাহির হইতেছিল ও বেলুন ওই জলের দিকে নামিতেছিল। বোঝা কমাইবার জন্য যাত্রিদল একে একে সমস্ত জিনিসপত্র, খাদ্য, অস্ত্র, টাকা কড়ি এমনকি বেলুনের গাড়িটিও জলে ফেলিয়া জালের আবরণ ধরিয়া কোনও মতে ঝুলিয়া রহিল, কিন্তু তবু বেলুনের নিম্নগতি বন্ধ করা গেল না।

এমন সময়ে তাহারা দূরে ডাঙ্গা দেখিতে পাইল, কিন্তু বেলুন তখন শূন্যে থাকিতেই পারিতেছে না, এক একবার যাত্রিদল ঢেউয়ের মধ্যে ডুব খাইয়া উঠিতেছে।

ডাঙ্গা হইতে আধ মাইল দূরে হঠাৎ যেন ওজন কমিয়া যাওয়ায়, বেলুনটি আবার কিছুটা উপরে উঠিল ও ঘুরপাক খাইতে খাইতে বালির ডাঙ্গায় পড়িল। পাঁচজন যাত্রী ও একটি কুকুরের মধ্যে ডাঙ্গায় নামিল শুধু চারজন।

তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"চল তাঁকে গিয়ে বাঁচাই!")

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

সাইরাস হার্ডিং

ঢেউয়ের দারুণ আঘাতে সাইরাস হার্ডিং জলে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। টপ প্রভুর সাহায্যের জন্য নিজেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। গিডিয়ন্ স্পিলেট, পেন্‌ক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও নেব শ্রান্তি, ক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া তখনই নিরুদ্দেশ যাত্রীর সন্ধানে বাহির হইলেন।

বেচারি নেব-এর যা দুঃখ। প্রাণপ্রিয় প্রভুকে বুঝিবা হারায় সেই ভাবনায় তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সাইরাস হার্ডিং যখন ভাসিয়া গেলেন, তাহার মিনিট দুই পরেই তাঁহার সঙ্গীগণ ডাঙ্গায় পৌছিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে উদ্ধার করিবার আশা খুবই আছে। নেব্ বলিল— "চলুন, শীগগির তাঁর সন্ধান করি।"

স্পিলেট, বলিলেন—"হাঁ নেব। তাঁকে আমরা খুঁজে বা'র করবই করব।"

"জীবন্ত পাব নিশ্চয়ই।" "হাঁ নিশ্চয়ই," পেন্‌ক্রফট জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি সাঁতার জানেন ত?" নেব বলিল—"হাঁ, জানেন। তা ছাড়া, টপ তাঁর সঙ্গে আছে।" পেন্‌ক্রফট কিন্তু ঢেউএর অবস্থা দেখিয়া এ কথায় বড় ভরসা পাইল না। বিশেষতঃ, হার্ডিং যেখানে ভাসিয়া গিয়াছিলেন, সেখান হইতে ডাঙ্গা প্রায় আধ মাইল দূরে।

তখন বেলা প্রায় ছয়টা, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে ঘন কুয়াশা ছড়াইয়া রাত্রির অন্ধকার দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। পরিত্যক্ত যাত্রীর দল উত্তর দিকে চলিল। সকলে বালির উপর দিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে বালির সঙ্গে পাথরও মিশান, ঘাসটাসের চিহ্নমাত্র নাই। বড়ই অসমান উবড়ো খোবড়া জমি, আবার মধ্যে মধ্যে গর্ত্ত আছে—সেই গর্ত্ত হইতে প্রতি মুহূর্তে বড় বড় পাখী উড়িয়া পলায়ন করে। মাঝে মাঝে দলবদ্ধ পাখীও কর্কশ চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে। নাবিক পেন্‌ক্রফট বুঝিতে পারিল—পাখীগুলি-গাল করমোরেণ্ট প্রভৃতি সমুদ্রের পাখী।

চলিতে চলিতে যাত্রীদল চীৎকার করিয়া হার্ডিংএর নাম ধরিয়া ডাকে। আর কান পাতিয়া শুনে—কোন উত্তর পাওয়া যায় কিনা। হার্ডিং তীরে উঠিয়া থাকিলে এবং সেই স্থানের নিকট তাহারা আসিয়া থাকিলে, নিশ্চয়ই অন্ততঃ টপের ডাক শুনা যাইবে। কিন্তু ডাকের উত্তরে তাহার ঢেউয়ের গর্জন ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইল না।

এইরূপে প্রায় কুড়ি মিনিট হাঁটিয়া, যাত্রীদল ডাঙ্গার শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত। এখানে ডাঙ্গা চোখা হইয়া জলের সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে। পেন্‌ক্রফট বলিল—"এটা দেখছি একটা অন্তরীপ, সুতরাং চল ডান দিকে ফিরে চলি। তখন সমুদ্রের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া নেব বলিল—"ফিরে যাব যে, তিনি যদি ওখানে থাকেন?"

"তাহলে চল, সকলে মিলে আবার ডাকি।" সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া কত ডাকিল "ক্যাপটেন্ হার্ডিং আপনি কোথায়?" কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

অন্তরীপের অন্যদিক ধরিয়া যাত্রীদল চলিল। প্রায় দুই মাইল পথ চলিয়া একটা উচু পিছলা-পাথর পূর্ণ স্থানে গিয়া উপস্থিত। উহার পারেই আবার সমুদ্র। পেনক্রফট বলিল—"এটা যে দেখছি ছোট একটা দ্বীপ। আমরা ত এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এলাম।" বাস্তবিকই তাই; মাইল দুই লম্বা আর প্রায় ততখানি চওড়া, একটা ছোট্ট দ্বীপে যাত্রীর দল বেলুন হইতে পড়িয়াছিল।

এই জনমানবশূন্য ক্ষুদ্র দ্বীপটি কি অন্য কোন বড় দ্বীপের সঙ্গে সংলগ্ন। ইহার উত্তর কে দিবে? বেলুন হইতে যাত্রীদল শুধু ডাঙ্গাই দেখিতে পাইয়াছিল—তাহাও আবার কুয়াশার মধ্যে দিয়া ঝাপসার মত। তখন কি আর ডাঙ্গার ভেদ বিচার করিবার মত অবস্থা ছিল? এমন অন্ধকারে সে বিষয়ের মীমাংসা হইবে না। তবে যাত্রীদল বুঝিতে পারিল, যে, এই স্থানটি সমুদ্রে ঘেরা, ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। সুতরাং এখন অনুসন্ধান স্থগিত রাখিয়া, পরদিন আবার আরম্ভ করা যাইবে।

গিডিয়ন্ স্পিলেট বলিলেন—"আমরা ডেকে উত্তর পেলাম না বটে, কিন্তু তাতে পরিষ্কার কিছু বুঝা গেল না। হয়ত সাইরাসের গুরুতর আঘাত লেগেছে, কিংবা তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়াছেন—তাই আমাদের ডাকের উত্তর দিতে পারছেন না। সুতরাং আমাদের নিরাশ হবার কারণ নাই। এখন, তাহলে, চল এক কাজ করি—

একটা আগুনের ধুনি জেলে রাখা যাক, হার্ডিং দেখে বুঝতে পারবেন আমরা কোথায় আছি।" কিন্তু বহু সন্ধান করিয়া কাঠ কিংবা শুক্‌না ঘাস কিছুই পাওয়া গেল না—চারদিকে কেবলই বালি আর পাথর।

সাইরাস্ হার্ডিংকে সকলেই খুব ভাল বাসিত। তাঁহাকে হারাইয়া সকলের কিরূপ দুঃখ হইল তাহা বলিবার সাধ্য নাই। তাঁহার এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিবারও উপায় নাই। সুতরাং রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে। হার্ডিং হয়ত বা উদ্ধার পাইয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন, আর না হয় চিরতরে বিদায় লইয়াছেন।

সমস্ত রাত্রি যাত্রীদল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দারুণ ঠাণ্ডা কিন্তু কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্ষণকাল বিশ্রামের চিন্তা কাহারও মনে স্থান পাইল না। ক্রমে বাতাস বন্ধ হইয়া সমুদ্রের গর্জন থামিয়া গেল। সেই সময়ে নেবের একটা ডাকের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। হারবার্ট পেন্‌ক্রফটকে বলিল—"প্রতিধ্বনি যখন শোনা গেল, তখন নিশ্চয়ই পশ্চিমদিকে কাছে কোন উচু জায়গা আছে, সেটা সমুদ্রের তীরে কিংবা পাহাড় একটা কিছু হবে।" একটু একটু করিয়া আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় যাত্রীদল চাহিয়া দেখিল, আকাশে তারা দেখা গিয়াছে। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, প্রাতঃকালে (২৫এ মার্চ) আকাশ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট পশ্চিম দিকে উৎসুকচিত্তে তাকাইয়া রহিল—যদি বা জলের পরে তীর দেখা যায়। কিন্তু জল ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না, তখন পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তা যাক্, চোখে নাই বা দেখা গেল কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি—এই জলের ওপারে নিশ্চয়ই ডাঙ্গা আছে। ক্রমে কুয়াশা কাটিয়া গেল দেখা গেল, পূর্বদিকে বিস্তৃত সমুদ্র যেন দ্বীপটিকে ঘিরিয়া আছে, পশ্চিমে জলের পরে খুব খাড়া এবং উঁচু পাড়। দ্বীপ এবং ঐ তীরের মধ্যখানে প্রায় আধমাইল চওড়া একটা প্রণালী তাহাতে ভীষণ বেগে স্রোত বহিয়া যাইতেছে।

এই সময়ে নেব্ করিল কি—কাহাকেও কিছু না বলিয়া, মনের আবেগে প্রণালীর জলে লাফাইয়া পড়িল, সাঁত্‌রাইয়া ওপারে যাইবে। পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহাকে কত ডাকিল কিন্তু কিছুতেই সে ফিরিল না। তখন স্পিলেট, ও নেবের পিছনে যাইতে প্রস্তুত হইলে, পেন্‌ক্রফ্‌ট বাধা দিয়া বলিল—"প্রণালী পার হয়ে যদি ওপারে যেতে চান, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন। এখন জলে নামলে স্রোতের টানে সমুদ্রে গিয়ে পড়্‌বার ভয় আছে। আমার মনে হয় এখন ভাটা আরম্ভ হয়েছে—খানিক বাদেই জল ও স্রোত অনেক কমে যাবে আর সে সময় পার হতে মুস্কিল হবে না।"

তখন স্পিলেট্ বুঝিতে পারিলেন পেন্‌ক্রফ্‌ট ঠিক কথাই বলিয়াছে। এদিকে নেব্ স্রোতের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সাঁতারে নেব্ খুবই নিপুণ, স্রোত তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেও, প্রায় আধঘন্টা পরে সে অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইল। ওপারে মার্বেল পাথরের উঁচু দেওয়ালের নিচে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিয়া, তারপর ছুটিয়া পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার মনে ধারণা হইয়াছিল, প্রণালীর ওপারেই প্রিয় প্রভুর সন্ধান পাইবে।

নেবের সঙ্গীরা তাহার জন্য চিন্তিত হইয়াছিল। নেব্ তীরে পৌঁছিয়া অদৃশ্য হইলে পর, তাহারাও সেইদিকে তাকাইয়া রহিল—যেন ওপারে গেলেই সকলে নিরাপদ হইতে পারিবে। ক্ষুধায় সকলের পেট জলিয়া যাইতেছে। বালির মধ্যে রাশি রাশি ঝিনুক ছিল, তাহা খাইয়াই সকলে ক্ষুধা দূর করিল। ওপারের দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, ওটা একটা প্রকাণ্ড উপসাগর, ধনুকের মত বাঁকা। দক্ষিণ দিকে ক্রমে সরু হইয়া সুচের মত ছুঁচলো হইয়াছে এবং সেই ছুঁচলো তীরের পর হইতেই মার্বেল পাথরের খাড়া পাহাড়। উত্তরের প্রান্ত আবার

ঠিক তাহার উল্টো। সে দিকে উপসাগরটি ক্রমে চওড়া হইয়া গিয়াছে—তাহার তীর বেশ গোল। এই দুইটি প্রান্তের মধ্যে প্রায় আট মাইল ব্যবধান। উপসাগরের তীর হইতে আধ মাইল দূরে ছোট্ট দ্বীপটিকে দেখায় যেন একটা তিমি মাছের মৃতদেহ ভাসিয়া আছে। ক্রমে ভাটার জল কমিলে দেখা গেল, ওপারের তীরেও বালি আর মধ্যে মধ্যে কাল পাথর। তীরের পরেই প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু মার্বেল পাথরের পাহাড় চলিয়াছে প্রায় তিন মাইল অবধি। তারপর ডানদিকে যেন হঠাৎ সেটা খাড়াভাবে শেষ হইয়া গিয়াছে। ডানদিকের এই উঁচু পাড়ের পরে বড় বড় গাছপালা দেখা যায়—বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় সাত মাইল দূরে কতগুলি পাহাড় দেখা যায়। তাহার চুড়া বরফে ঢাকা, তাহাতে সূর্যের কিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

এই স্থানটি দ্বীপ, না কোন মহাদেশের অংশ তাহার মীমাংসা করিবার উপায় নাই। কিন্তু বাঁ দিকের এইরূপ এলোমেলো, উঁচু নিচু পাহাড়গুলি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—এই সকল পাহাড় পর্বত অগ্ন্যুৎপাত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গিডিয়ন স্পিলেট্, পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট খুব মনোযোগের সহিত ঐ সকল স্থান দেখিতে লাগিলেন। কে জানে—হয়ত বা এইস্থানেই তাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল বাস করিতে হইবে। মৃত্যুও যে এখানেই হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। কারণ স্থানটি দেখিলেই মনে হয়, এ পথে সম্ভবতঃ জাহাজের চলাচল নাই। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে, পূর্ণ ভাটার সময় প্রণালীটি প্রায় শুকাইয়া গেল। জল অতি অল্প স্থান জুড়িয়াই আছে, সহজেই ওপারে যাওয়া যাইবে। বেলা ১০টার সময় সকলে পোষাক পরিচ্ছদের পুঁটুলি করিয়া মাথায় বাঁধিল।

তারপর সাঁত্‌রাইয়া গিয়া সকলে ওপারে উপস্থিত। রৌদ্রে গা শুকাইয়া আবার সকলে কাপড়-চোপড় পরিল, এবং বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল—কিং কর্তব্যং অতঃপরম্।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

স্পিলেট্ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্য সকলকে সেস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, নেব্ যেদিকে গিয়াছিল সেইদিকে তিনিও চলিলেন। সাইরাস্ হার্ডিংএর সংবাদের জন্য তাঁহারও মন অস্থির—দেখিতে দেখিতে তিনি উঁচু পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। হারবার্ট ও তাঁহার পিছনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"হারবার্ট, থাম। সকলের গেলে চল্‌বেনা। বন্ধুরা ফিরে এলে, তাদের একটা থাক্‌বার জায়গা চাই। শুধু ঝিনুক শামুক খাওয়ায় ত চল্‌বে না—আর একটু ভাল খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতে হবে।"

হারবার্ট তখনই যাওয়া বন্ধ করিয়া বলিল—"বেশ, আমি প্রস্তুত আছি, আমাকে কি করতে হবে বল।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"আমরা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়েছি, ঠাণ্ডাও লেগেছে খুব, ক্ষুধাও পেয়েছে। সুতরাং একটা আশ্রয় চাই, আর আগুন এবং খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতে হবে। বনে গাছ আছে যথেষ্ট, গাছে পাখীর বাসা আছে—ডিমেরও অভাব হবে না। এখন একটা ঘর তৈরি কর্‌তে পার্‌লেই হয়।"

হারবার্ট বলিল—"তবে চল ঐ পাহাড়ে গিয়ে খুঁজি—দেখি কোন গহ্বর পাওয়া যায় কিনা। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট সমুদ্রতীরে উঁচু দেওয়ালের মত পাহাড়টার নিচে গেল, তখন জল অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। তাহারা দক্ষিণ মুখে চলিল। প্রায় দুইশত গজ গিয়া দেখিল, পাহাড়ের ভিতর হইতে একটা ঝরণা বাহির হইয়া আসিয়াছে। ঝরণার জল পরিষ্কার টলটলে, ঝরণাটা প্রায় একশত গজ চওড়া। দুইধারে গ্রেনাইট পাথরের

দেওয়ালের মত পাড়—প্রায় আধমাইল সোজাসুজি গিয়াই ঝরণাটা হঠাৎ বাঁকিয়া বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বুঝিতে পারিল, ভাটার সময় সমুদ্রের অতিরিক্ত জল নামিয়া গেলে, এই ঝরণার জলের আস্বাদন মিষ্টি হয়। হারবার্ট গহ্বরের সন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দেওয়ালটা সর্বত্র উঁচু খাড়া এবং মোলায়েম। যাহা হউক, দেখা গেল যে, মুখের কাছে এবং জোয়ারের জল যতদূর পৌঁছায় না ততদূরে, বড় বড় পাথরের প্রকাণ্ড একটা স্তূপ রহিয়াছে। গ্রেনাইট পাথরের দেশে এরূপ স্তূপ প্রায়ই দেখা যায়—এইরূপ পাথরের স্তূপকে "চিমনী" বলে। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট এই স্তূপের মধ্যে দিয়া অনেক ভিতরে ঢুকিয়া গেল। বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়া বেশ আলো আসিতেছে, ঠাণ্ডা বাতাসের ত কথাই নাই। পেন্‌ক্রফ্‌ট ভাবিল, যে, পাথর-বালি মিলাইয়া কতকগুলি ফাঁক বন্ধ করিয়া লইলে, এই চিম্‌নীটি বাস করিবার পক্ষে বেশ উপযোগী হইবে। হারবার্ট বলিল—"পেন্‌ক্রফ্‌ট। ক্যাপটেন হার্ডিংকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে—না? তাহলে, এই জায়গাটাকে এমন ক'রে নিতে হবে, যে, হার্ডিং ফিরে এলে যাতে এটা তাঁর পছন্দ হয়। চিম্‌নীটার বাঁ দিকের পথটায় যদি একটা উনুন করে নেওয়া যায়, এবং ধোঁয়া বেরুবার পথ রাখা যায়, তাহলে এটা বেশ ভাল বাড়িই হবে, না?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"ঠিকই বলেছ হারবার্ট। এখন আগুন জ্বালবার কাঠ রাশি রাশি সংগ্রহ করতে হবে, আর পাথরের ফাঁকগুলো বন্ধ করবার জন্য ডালপালাও জোগাড় করা চাই।"

হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট চিম্‌নীর গহ্বর হইতে বাহির হইয়া, নদীর বাঁ পাড় বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। এখানে নদীর স্রোত প্রবল, শুক্‌না কাঠ সব ভাসিয়া যাইতেছে। পেন্‌ক্রফ্‌ট ভাবিল—এই স্রোতের সাহায্যে ভারি ভারি কাঠ চিম্‌নীতে লইয়া যাইবার সুবিধা হইবে।

প্রায় সোয়া ঘণ্টা চলিবার পর দেখা গেল, নদীটা হঠাৎ বাঁদিকে বাঁকিয়া বনের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে। বনে নানা জাতীয় সুন্দর সুন্দর এবং বড় বড় গাছ, গাছের নিচে লম্বা ঘাস—তাহার মধ্যে দিয়া চলিবার সময়, শুক্‌না ডালপালা পায়ের নিচে পড়িয়া মট্‌মট্‌ শব্দে ভাঙ্গিতে ছিল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"এসব গাছের নাম জানি না, তবে, আমরা এগুলিকে জ্বালানি কাঠ বল্‌ব—এখন এই জ্বালানি কাঠেরেই আমাদের বেশী দরকার। সুতরাং যত পারা যায় সংগ্রহ করে নেওয়া যাক।

কাঠ সহজেই সংগ্রহ হইল। গাছ কাটিবার দরকার নাই, রাশি রাশি শুক্‌না কাঠ মাটিতেই পড়িয়া আছে। অত্যন্ত শুক্‌না কাঠ, অতি সহজেই জ্বলিবে। কিন্তু শুধু দুইজনের মত বোঝা নিলে চলিবে না, চিম্‌নী ভরিয়া যায় এত কাঠ নেওয়া চাই। এত কাঠ লইয়া যাইবার উপায় কি?

হারবার্ট বলিল—"স্রোতের সাহায্যে কাঠ চিম্‌নীতে নেওয়া যায় না?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"হাঁ একটা ভেলা বানাতে পারলে সহজেই নেওয়া যাবে।"

হারবার্ট বলিল—"কিন্তু এখন যে স্রোত উল্টোদিকে যাচ্ছে।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তাতে কি, এখন ভেলা না ভাসালেই হলো। ভাটার সময় জলের টান হবে চিম্‌নীর দিকে—তখন ভেলা ভাসান যাবে।"

তখন দুইজনে, যে যতটা বহিতে পারে শুক্‌না কাঠের আঁটি কাঁধে করিয়া নদীর পারে চলিল। নদীর পারে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যেও শুক্‌না কাঠ যথেষ্ট ছিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট ভেলা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নিকটেই নদীতে ছোট্ট একটা উপসাগরের মত ছিল। সেখানে জল অনেকটা স্থির—সেই জায়গায় কতকগুলি বড়

কাঠ মজবুত লতা দিয়া বাঁধিয়া ভেলা তৈরি হইল। ভেলার উপরে সমস্ত সঞ্চিত কাঠ বোঝাই করিয়া, দুইজনে অপেক্ষা করিতে লাগিল কখন ভাটা আরম্ভ হয়।

ভাটা আরম্ভ হইতে তখনও ঘন্টা কয়েক বাকি। হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট স্থির করিল, নদীর তীরের উপরকার উচু সমতল ভূমিতে উঠিয়া চারিদিকের দৃশ্য দেখিবে। নদীটা যেখানে বাঁকিয়া কোনার মত হইয়াছে, সেখানে হইতে প্রায় দুইশত ফুট পিছনে দেওয়ালের মত পাড়টা ক্রমে ধাপের মত করিয়া নীচু হইতে হইতে, একেবারে বনের কিনারা অবধি গিয়াছে—যেন দেওয়ালে চড়িবার এটা একটা স্বাভাবিক সিঁড়ি। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট অল্পক্ষণের মধ্যেই এই ঢালু সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গিয়া উঠিল। নদীর মুখের উপরেই যে উচু যায়গাটা ছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই উচু জায়গায় গিয়া তাহারা সমস্ত স্থানগুলিই দেখিতে পাইল—যেখানে তাহারা বেলুন হইতে নামিয়াছিল এবং যেখানে সাইরাস্ হার্ডিং অদৃশ্য হইয়াছিলেন। বেলুনের কোন অংশ যদি তীরে পড়িয়া থাকে, এবং তাহাতে যদি তখনও মানুষ ঝুলিয়া আছে দেখা যায়!

কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না—চারিদিকেই বিশাল সমুদ্র, আর তাহার তীর জনপ্রাণীহীন। স্পিলেট কিংবা নেব্‌কেও দেখিতে পাওয়া গেল না, হয়ত তাহারা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল।

হারবার্ট বলিল—"আমার মন বল্‌ছে যে, ক্যাপটেন হার্ডিংএর মত তেজস্বী লোক কি অন্য সাধারণ লোকের মত ডুবে মারা যাবেন? কখনই না, তিনি হয়ত তীরের কোনস্থানে উঠতে পেরেছেন—তুমি কি মনে কর, পেন্‌ক্রফট?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট ভারি দুঃখের সহিত মাথা নাড়িল। সাইরাস হার্ডিংকে সে আবার দেখিতে পাইবে, সে আশা তাহার ছিল না। তবু হারবার্টকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—"নিশ্চয় হারবার্ট। যেরূপ বিপদে পড়লে অন্য যে কেউ হোক একেবারে হাল ছেড়ে দিবে, সে বিপদ থেকে যে হার্ডিং মুক্ত হয়ে আসবেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

সেই উঁচুস্থান হইতে চারিদিকে দেখিয়া, পেনক্রফ্‌ট বলিল—"আমরা কি বাস্তবিকই একটা দ্বীপে পড়েছি?"

হারবার্ট বলিল—"দ্বীপ যদি হয়, তবে এটা একটা বিশাল দ্বীপ।"

আরো তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে, এ বিষয়ের মীমাংসা হইবে না। দ্বীপ হউক আর মহাদেশ হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এ স্থানটা খুবই উর্বর, দেখিতেও সুন্দর এবং এখানে নানাপ্রকার দ্রব্য-সামগ্রী উৎপন্ন হয়।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"আমাদের এই দুর্ভাগ্যের সময় আমরা যে এমন একটা মূল্যবান্ দ্বীপে পড়েছি, সে জন্য ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ।"

হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফট এই গ্রেনাইট্ পাথরের মঞ্চটির দক্ষিণ চূড়া ধরিয়া ফিরিতে লাগিল। চূড়াটির কিনারার করাতের দাঁতের মত উঁচু নীচু পাথরের ঝালর দেওয়া। শতসহস্র পাখী এই সকল পাথরের ফাটলে থাকে। হারবার্ট এক পাথর হইতে অন্য পাথরে লাফাইতে গিয়া, হাজার হাজার পাখীকে চমকাইয়া দিল।

পাখীগুলিকে দেখিয়া পেন্‌ক্রফট বলিল—"এগুলি যে দেখছি পাহাড়ের কবুতর। এখনই দেখা যাবে এদের বাসায় কত ডিম পাওয়া যায়, তারপর ডিমের আম্‌লেট্ খাওয়া যাবে।"

হারবার্ট বলিল—'ডিমের আম্‌লেট ত খাবে বুঝলাম, কিন্তু আম্‌লেট্ বানাবে কি তোমার টুপিতে? আমলেট্ রাধবার পাত্র কোথায়?"

গ্রেনাইটের কাটলে সন্ধান করিয়া সত্যসত্যই অনেক ডিম পাওয়া গেল। ডজন কয়েক সংগ্রহ করিয়া, পেন্‌ক্রফ্‌ট তাহার টুপিতে বাঁধিয়া লইল, ক্রমে ভাটার সময় হইয়া আসিবে, দুইজনে আবার নদীর ধারে সেই ভেলার কাছে নামিয়া আসিল। তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর। ভাটা আরম্ভ হইয়াছে। ভেলাটাকে ত চালাইয়া লইতে হইবে? পেন্‌ক্রফ্‌ট চতুর নাবিক—দড়ি-দড়ার বিষয়ে তাহার ভাল রকম জানা আছে। সে কতকগুলি শুকনা লতা সংগ্রহ করিয়া লম্বা দড়ি পাকাইল। দড়ি ভেলার মাথায় বাঁধিয়া, পেন্‌ক্রফ্‌ট সেই দড়ি ধরিয়া ভেলা টানিয়া চলিল। হারবার্ট লম্বা একটা কাঠের ডাণ্ডা দিয়া ভেলাটাকে ঠেলিয়া রাখিল, যাহাতে সেটা কিনারায় না ভিড়িয়া পড়ে। এইরূপে সেই শুকনা কাঠের বিশাল বোঝা লইয়া ভেলা নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিল। নদীর পাড় খুব সমান, চলিতে কোন মুস্কিল হইল না।

বেলা দুইটার পূর্বেই তাহারা ভেলা লইয়া, চিম্‌নী হইতে খানিক দূরে, নদীর মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

ভেলার বোঝা নামাইয়া, পেন্‌ক্রফ্‌ট প্রথমেই সেই গহ্বরের ফুটাগুলি বন্ধ করিয়া, সেটাকে বাসের উপযুক্ত করিতে আরম্ভ করিল। বালি, পাথর, মোচড়ান ডালপালা, কাদামাটি প্রভৃতি দিয়া দক্ষিণে বাতাসের মুখের ফুটাগুলি সব বন্ধ করিল। ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য একটা পথ রাখিয়া দিল। ক্রমে গহ্বরটিকে ৩।৪টি ঘরে পরিণত করা হইল। ঘর হইল বটে, কিন্তু উহা হইল গাধা থাকিবার উপযুক্ত ঘর। তাহা হইলেও ঘরগুলি শুকনা খট্‌খটে, আর তাহার মধ্যে বেশ সোজা হইয়া দাঁড়ান যায়। মেঝেতে বালি ছড়াইয়া দেওয়া হইল। মোটের উপর, অভাব পক্ষে ঘরগুলি হইল বেশ ভালই।

এই সব কাজ করিতে করিতে হারবার্ট বলিল—"আমাদের সঙ্গীরা বোধ হয় এর চাইতে ভাল যায়গার সন্ধান পেয়েছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট-বলিল—"তা খুবই সম্ভব। তবু, যখন কিছুই জানি না তখন আমাদের কাজটা করে রাখাই ভাল।"

হারবার্ট ভারি উৎসাহ করিয়া বলিল—"তারা যদি ক্যাপ্‌টেন্ হার্ডিংকে পেয়ে থাকে, আর তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে হাজির হয়, তাহলে কি মজাটাই না হবে।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"হাঁ নিশ্চয়ই। হার্ডিং চমৎকার লোক ছিলেন।"

হারবার্ট বলিল—"ছিলেন বল্‌ছ কেন? তবে কি তাঁর আশা ছেড়ে দিয়েছ?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"ভগবান না করুন—আশা ছেড়ে দিব কেন?"

ততক্ষণে বাসস্থান তৈরির কাজ শেষ হইয়াছে, এখন একটা উনানের ব্যবস্থা করিয়া খাবারের জোগাড় করিলেই হয়। সে কাজটা ও বিশেষ কঠিন কিছু নয়। ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য যে পথ রাখা হইয়াছিল, সেই পথের মুখে মাটিতে বড় চ্যাটাল একটা পাথর রাখা হইল—এটাই উনানের কাজ দিবে। শুকনা কাঠগুলি একটা ঘরে রাখিয়া দিয়া, পেনক্রফ্‌ট সেই উনানের উপর কতকগুলি শুকনা কাঠ আর ছোট ছোট ডালপালা রাখিল। তখন হারবার্ট জিজ্ঞাসা করিল পেন্‌ক্রফ্‌টের কাছে দিয়াশলাই আছে কিনা।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"নিশ্চয়ই আছে, আর নেহাৎ সৌভাগ্য বলেই আছে, তা না হলে ভারি মুস্কিল হতো।"

হারবার্ট বলিল—"আচ্ছা, অসভ্য বুনো লোকদের মত কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালান যায় না ?"

পেনক্রফ্‌ট বলিল—"তা যায় বৈকি, কিন্তু বুনো লোকেরা জানে কি ক'রে তা করতে হয়, আর বোধ করি, সেরূপ ভাবে আগুন জ্বালাতে হলে বিশেষ কোন রকম কাঠের দরকার। আমি অনেকবার চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু কিছুতেই কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালাতে পারি নাই। তাই বলি, আমার কাছে দিয়াশলাইটা বেশি কাজের ব'লে মনে হয়। ভাল কথা, আমার দিয়াশলাইটা কি হলো ?"

পেনক্রফ্‌ট তাহার কোট, ওয়েষ্ট কোটের পকেট, প্যাণ্টালুনের পকেট সমস্তই খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কি সর্বনাশ! দিয়াশলাইএর বাক্স ত কোথাও নাই। হারবার্টের দিকে চাহিয়া বলিল—"সেরেছে, বাক্সটা নিশ্চয়ই পকেট থেকে প'ড়ে গিয়েছে।"

হারবার্ট ও পেনক্রফ্‌ট ছুটিয়া বাহির হইল। দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা ছিল তামার তৈরি, উজ্জ্বল চকচকে—সহজেই চোখে পড়িবে। তাহারা নদীর ধারে বালির উপরে, পাথরের আড়ালে কত খুঁজিল, কিন্তু কোথাও সেটা পাওয়া গেল না।

তখন হারবার্ট বলিল—"পেনক্রফ্‌ট। ভাটা শেষ হয়ে আসছে এবেলা চল শীগ্‌গির, যেখানে বেলুন থেকে নেমেছিলাম, সেই জায়গাটা গিয়ে খুঁজে দেখি—যদি বাক্সটা বালির উপর প'ড়ে গিয়ে থাকে ?"

তাহার সম্ভাবনা মোটেই নাই, বালির উপর পড়িয়া গিয়া থাকিলেও, জোয়ারের সময় নিশ্চয়ই সেটাকে ধুইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে এই বিপদের অবস্থায় ওটা একটা দারুণ ক্ষতি। পেনক্রফ্‌ট বড়ই ভাবনায় পড়িল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

হারবার্ট বলিল—"বাক্সটা যদিও পাওয়া যায়, সেটাতে কোন কাজ হবে কি ? জলে ভিজে সেটা ত'বোধ করি অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে।"

পেনক্রফ্‌ট বলিল—"না বাবা, বাক্সটা খুব আঁট হয়ে বন্ধ হতো, তাতে জল ঢুকবার সাধ্য নাই।—তাহলে এখন কি করা যায় ?"

হারবার্ট বলিল—"আগুন জ্বাল্‌বার একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। সাইরাস্ হার্ডিং কিংবা স্পিলেটের কাছে হয়ত বা দিয়াশলাই থাকতে পারে।"

পেনক্রফ্‌ট বলিল—"হাঁ, তা থাকতে পারে বটে, কিন্তু উপস্থিত আমাদের কাছে ত আগুন নাই—সজীরা এসে খাবে কি ? আর আমার মনে হয়, ওদের কাছে দিয়াশলাই নাই, কারণ, সাইরাস হার্ডিং কিংবা নেব্ দুজনের মধ্যে কেউ তামাক খায় না। আর স্পিলেট যদিও তামাক খান, তবু তিনি ম্যাচ্ বাক্সটি ফেলে দিয়ে নোট বুকটিই বাঁচাবেন।"

হারবার্ট কোন উত্তর দিল না। ম্যাচ্ বাক্সটি হারাইয়া গিয়া দারুণ দুঃখের কারণ হইয়াছে বটে কিন্তু হারবার্ট দমিল না—তাহার বিশ্বাস কোন উপায়ে আগুন জ্বালান যাইবেই।

গহ্বরে ফিরিয়া আসিবার পূর্বে, হারবার্ট ও পেনক্রফ্‌ট অনেকগুলি ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া লইল। কোন রকমেই যদি আগুনের যোগাড় না হয় তবে, ঝিনুক খাইয়াই ক্ষুধা দূর করিতে হইবে।

হারবার্ট ও পেনক্রফ্‌ট যখন গহ্বরে ফিরিল, তখন বিকাল পাঁচটা, গহ্বরের ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার কোনাগুলিতে খুঁজিয়া দেখা হইল, কিন্তু দিয়াশলাই পাওয়া গেল না। প্রায় ছয়টার সময়, সূর্য যখন উঁচু জমির আড়ালে ডুবিতেছিল তখন হারবার্ট গহ্বরের বাহিরে পায়চারি করিতে করিতে দেখিতে পাইল—ঐ স্পিলেট ও নেব্ ফিরিয়া আসিতেছে

কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে আর কেহই নাই। ইহা দেখিয়া বালক হারবার্টের মন দুমিয়া গেল—সাইরাস্ হার্ডিংএর সন্ধান তাহারা পায় নাই।

স্পিলেট্ আসিয়াই ধপ্ করিয়া একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলেন—তাঁহার মুখে কথাটিও নাই। আর বেচারি নেব্। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষুদুটি লাল হইয়া গিয়াছে। চক্ষের জল বাধা না মানিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। মুখখানি দেখিলেই মনে হয়—প্রভুকে ফিরিয়া পাওয়া সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন আশা নাই।

খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর, একটু সুস্থ হইয়া স্পিলেট্ বলিতে লাগিলেন—কি রকমে তিনি আর নেব্ হার্ডিংএর সন্ধান করিয়াছেন। সমুদ্র তীর ধরিয়া প্রায় ৮ মাইল পর্যন্ত গিয়াছেন। যেখানে হার্ডিং ও টপ্ নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, সেস্থানও তাঁহারা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সমস্ত তীরটা নির্জন নিস্তব্ধ কোন কিছুর চিহ্ন টিহ্ন নাই। বালিতে কোন রকমের দাগ পর্যন্ত নাই। মানুষ যে কোনও দিন সেখানে দিয়া গিয়াছে, তাহারও কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ এইস্থানেই তীর হইতে প্রায় একশত ফুট দূরে, সাইরাস হার্ডিংএর সমাধি হইয়াছে।

স্পিলেট, তাঁহার বর্ণনা শেষ করিবামাত্র নেব্ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"কখনই না, আমার প্রভুর মৃত্যু কখনই হয়নি। ওরূপ অবস্থায় অন্য যে কোন লোকের মৃত্যু হইতে পারে—বাদে আমার প্রভুর। যে কোন রকম বিপদে পড়ুন না কেন তিনি তা থেকে উদ্ধার পাবেনই পাবেন।"

বলিতে বলিতে নেব্ কাহিল হইয়া পড়িল। বেচারি তখন বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—"হায়রে হায়। আর বুঝি প্রভুর সন্ধান পাওয়া যাবে না।"

হারবার্ট তখন নেবের নিকট গিয়া বলিল—"নেব্, কেঁদোনা হতাশ হয়োনা, আমরা তাঁকে খুঁজে পাব ভগবান্ দয়া করে তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু এখন আর দুঃখ করবার সময় না। তোমার খুবই ক্ষিধে পেয়েছে এখন কিছু খাও।"

এই বলিয়া হারবার্ট নেবকে কতকগুলি ঝিনুক খাইতে দিল।

অনেক ঘণ্টা যাবৎ নেব্ কিছুই খায় নাই। তবু সে তখন ঝিনুক খাইতে অস্বীকার করিল। প্রভুকে না পাইলে সে কিছুতেই বাঁচিবে না।

গিডিয়ন স্পিলেট কতকগুলি ঝিনুক কোনমতে গিলিলেন, তারপর মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। হারবার্ট তাঁহার নিকটে গিয়া, তাঁহার হাতখানি ধরিয়া বলিল—"আমরা একটা থাকবার জায়গা পেয়েছি। ক্রমেই রাত হচ্ছে, চলুন সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করবেন।"

স্পিলেট উঠিয়া দাঁড়াইলে হারবার্ট তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। পথে পেন্‌ক্রফ্‌ট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার নিকট ম্যাচ বাক্স আছে কিনা। স্পিলেট্ পকেট হাতড়াইয়া বলিলেন—"ছিল ত, বোধহয় ফেলে দিয়েছি।" এই বলিয়া তিনি পেন্‌ক্রফ্‌টকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহার কাছে আছে কিনা।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"না, আগুন জ্বালাবার অন্য কোন উপায়ও নাই।"

নেব্ বলিল—"হায়রে। আমার প্রভু উপস্থিত থাকলে, নিশ্চয়ই আগুনের একটা কিছু ব্যবস্থা করতেন।"

চারিজন নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে হারবার্ট বলিল "মিষ্টার স্পিলেট। আপনি বোধকরি ভাল ক'রে খোঁজেন নি। আবার দেখুনত অন্ততঃ দিয়াশলাই-এর একটা কাঠি পেলেও কাজ হবে।"

স্পিলেট্ তন্ন তন্ন করিয়া প্যানটালুন, ওয়েষ্ট, কোট, ওভারকোট সমস্ত খুঁজিতে লাগিলেন, মনে হইল,

যেন ওয়েষ্ট কোটের লাইনিংএর ভিতর একটা কাঠির মত কি জড়াইয়া আছে। তিনি কাপড়ের উপর দিয়া সেটাকে ধরিলেন কিন্তু বাহির করিতে পারিলেন না।

হারবার্ট বলিল—"দিন্ ত, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।"

বলিয়াই অতি যত্নের সহিত ধীরে ধীরে কাঠিটি লাইনিংএর ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল। কাঠিটি ঠিকই আছে, নষ্ট হয় নাই। পেন্‌ক্রফ্‌টের আনন্দ দেখে কে। সে কাঠিটি লইয়া গহ্বরে প্রবেশ করিল—তাহার পিছনে অন্য সকলেও গেল।

এই ছোট কাঠের ফালিটুকুর আর মূল্য কি? কত সময় কত দিয়াশলাইএর কাঠি লোকে মিছামিছি নষ্ট করে—কিন্তু এখন এই কাঠিটুকুই ভাবিয়া চিন্তিয়া পরম যত্নের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে।

পেটক্রফ্‌ট পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কাঠিটা খুব শুকনা। তখন বলিল—"একটু কাগজের দরকার।"

স্পিলেট তাঁহার নোটবুক হইতে একখানি পাতা ছিঁড়িয়া পেন্‌ক্রফ্‌টের হাতে দিলেন। সে কাগজ উনানের পাশে রাখিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। তারপর কয়েকখানা শুকনা কাঠের নীচে পরম যত্নের সহিত কিছু শুকনা ঘাস্ পাতা আর মস্ (শেওলা) রাখিয়া কাঠিটি পাথরে ঘষিল। বেশী জোরে ঘষিল না, পাছে কাঠিটির মুখের গন্ধক, যাহার জন্য কাঠি জ্বলে, সেটা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু তাহার চেষ্টা বিফল হইল—কাঠি জ্বলিল না।

তখন সে বলিল—"না, একাজ আমার দ্বারা হবে না। আমার হাত কাঁপছে, হারবার্ট। তুমি চে করে দেখ।"

হারবার্ট তাহার জীবনে কখনও এত ভীত এবং ব্যস্ত হয় নাই। তবু সে পেন্‌ক্রফ্‌টের হাত হইতে কাঠিটি লইয়া ঘষিল। ঘষিবামাত্র খানিকটা পট্ পট্ শব্দ করিয়া কাঠি জ্বলিয়া উঠিল। তখন কাগজখান ধরাইয়া মসের উপর ফেলিবামাত্র, দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

তখন আর কথা কি, আগুনটুকু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলেই, রান্নার জন্য আর কোন ভাবন থাকিবে না।

পেন্‌ক্রফ্‌ট দুই-ডজন বুনো কবুতরের ডিম আগুনে পোড়াইয়া, সুন্দর খাদ্য প্রস্তুত করিল। কয়েকদিন শুধু ঝিনুক খাইয়া যাহারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে, তাহাদের নিকট এই পোড়ান ডিম কিরূপ উপাদেয় হইল তাহা বুঝিতেই পারা যায়। আহারের পর নেব ভিন্ন সকলেই ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিল। বেচারি নে সারারাত্রি চীৎকার করিয়া, তাহার প্রভুকে ডাকিতে ডাকিতে সমুদ্রতীরে ঘুরিয়া বেড়াইল। ক্রমশঃ

গীতা মুখার্জি

অনেকদিন আগের ঘটনা। বিলাতে একজন বিখ্যাত শিকারীর মৃতদেহ একদিন পাওয়া গেল একটা ভিতর-থেকে-বন্ধ ঘরের মধ্যে। বন্দুকের গুলির আঘাতে মরেছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ভদ্রলোক শুয়েছিলেন একটা সোফার উপরে আর বন্দুকটা পড়েছিল ঘরের অন্য কোণে একটা টেবিলের উপরে। আবার ডাক্তাররা মৃতদেহ পরীক্ষা করে বললেন যে তাঁর মৃত্যু গুলি লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছিল। তাহলে তিনি কি'করে অতদূরে সোফা পর্যন্ত পৌঁছুলেন? গোয়েন্দারা ত' সব একেবারে বোকা হয়ে গেছিলেন। প্রথমে মনে হয়েছিল যেন সমস্ত ঘটনাটাই ভৌতিক বা অলৌকিক। অনেক ভেবে প্রধান গোয়েন্দা একটা কারণ বার করলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে বন্দুকের পাশেই ছিল একটা কাঁচের জানলা আর তার মধ্যে থেকে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল একটা জল ভর্তি কাঁচের গোল বাটীতে। সেই আলোর রশ্মি একত্রিত হয়ে পড়েছিল ঠিক সেই বন্দুকের নলের মধ্যে। তখনকার দিনে বন্দুকে কার্তুজের জায়গায় ব্যবহার করা হত গুঁড়ো বারুদ। সূর্যের আলোর উত্তাপে খুব সহজেই সেই বারুদে আগুন ধরে হয় সেই বিস্ফোরন, আর তার ফলে মারা যান দূরে শায়িত শিকারী মহাশয়। ব্যাপারটা ভূতুড়ে নয় কি?

কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তোমরা কি কখনও চশমার কাঁচ দিয়ে সূর্যের আলো একত্রিত করে কাগজে আগুন ধরাতে চেষ্টা করেছ? খুব পুরু চশমার কাঁচ দিয়ে সহজেই এটা করা যায়। ব্যাপারটা কি জান? চশমার কাঁচে এমন একটা জিনিস আছে যে তার মধ্যে দিয়ে আলোর রশ্মি গেলে সেটা আর সোজা থাকে না। যদি কাঁচটা পেটমোটা হয় তাহলে সব রশ্মিগুলো এক জায়গায় জড় হয়ে যায়। সে কাঁচটাকে আমরা বলি কনভেক্স (convex)। আর যদি কাঁচটার মাঝখান সরু হয় তাহলে আলোটা আরো বিক্ষিপ্ত হয়। আমরা সে কাঁচটাকে বলি কনকেভ্ (concave)। এই ছোট্ট বৈশিষ্টের উপরে ভিত্তি করে হয়েছে তৈরী আমাদের ক্যামেরা, দূরবীন, মাইক্রোসকোপ ইত্যাদি।

প্রথম দূরবীন আবিষ্কার করেছিলেন গ্যালিলিও সাহেব প্রায় ৩৫০ বছর আগে। তিনি চশমা তৈরী করতেন। একদিন তাঁর ছেলে তাঁর কয়েকটা ভাঙ্গা চশমার লেন্সের কাঁচ নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ দেখ্‌লো যে কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখ্‌লে দূরের গীর্জার চূড়ো কাছে এসে গেছে মনে হয়।

গ্যালিলিও সাহেব তখন একটা কাগজের নলের দু'দিকে দুটো কাঁচ বসিয়ে ছেলের জন্য তৈরী করে দিলেন পৃথিবীর প্রথম দূরবীন। ছেলে ত' খুব খুসী। তোমরা কি ঐরকম একটা দূরবীন তৈরী করতে চাও ?

তাহলে প্রথমে তোমাদের দরকার হবে দুটো চশমার কাঁচ। যত পুরু হয় ততই ভালো। এদের মধ্যে একটার হওয়া চাই পেটমোটা আর একটার পেট সরু। বুঝ্‌তে পার্‌লে কি ? এবার খানিকটা বাদামা কাগজ দিয়ে দুটো বড় চাকতি তৈরী কর। চাকতি দুটোর মাঝখানে একটা করে গোল ফুটো কর। এইবারে দুটো চাকতির মধ্যে কাঁচটা বসিয়ে ধারটা সেঁটে দাও—ঠিক এইভাবে অন্য কাঁচটাকেও
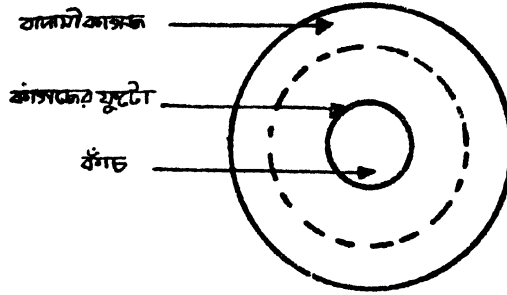
দুটো চাকতির মধ্যে বসাও। এবার একটু শক্ত পিচ্‌বোর্ড দিয়ে দুটো গোল টিউব তৈরী কর এমনভাবে, যাতে একটা অন্যটার মধ্যে ঢুক্‌তে পারে—ভিতরেরটা লম্বায় বাইরেরটার অর্ধেক হওয়া চাই। এবার ভিতরের টিউবের একদিকে পেটরোগা বা concave কাঁচটা বসিয়ে দাও আর বাইরেরটার উল্টোদিকে মোটা কাঁচটা বসিয়ে দাও। সাবধানে সাঁটবে যাতে কাঁচটা ঠিক সোজাভাবে লাগে।
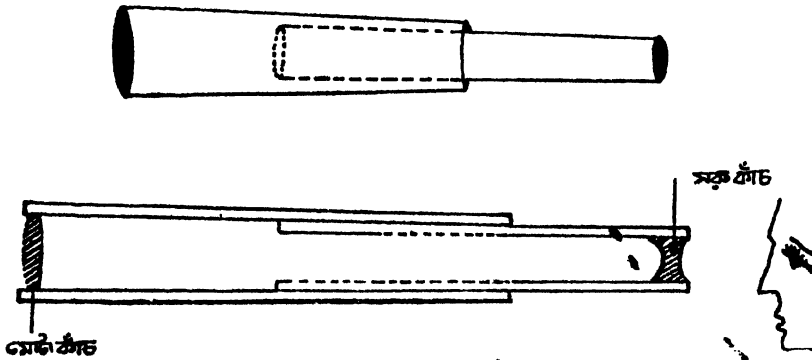
এবার সরু টিউবটার কাঁচের উপর চোখ রেখে দুটোকে একটু সামনে পিছন করে দেখ্‌বে খাসা দূরবীন হয়েছে। বাজারের টীনের তৈরী দূরবীনেও দেখবে ঠিক এইরকম ব্যবস্থা আছে।

লঙ্কা-দহন

লীলা মজুমদার

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান অশোকবন

পাত্র-পাত্রী

(১) হনুমান
(২) খুদে রাক্ষস
(৩) সীতা
(৪) চেড়িবৃন্দ
(৫) রাবণ

চুম্বক—সীতাকে উদ্ধার করবার জন্যে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাম লক্ষ্মণ সমুদ্রতীরে পৌঁছেই বুঝলেন সীতার সংবাদ আনবার জন্যে সমুদ্র পার হয়ে একজন কাউকে লঙ্কাদ্বীপে যেতে হয়। হনুমানের উপর এই কাজের ভার পড়ল। তিনি মহেন্দ্র পর্বত থেকে এক লাফ দিয়ে, পথে অনেক বিপদ কাটিয়ে, শেষে লঙ্কার লম্ব পর্বতে গিয়ে নামলেন। নগরের দরজায় লঙ্কাদেবী তাঁকে বাধা দিলেন, তাঁকে হারিয়ে দিয়ে, হনুমান রাবণের প্রাসাদ ও তার আশেপাশে সব জায়গা খুঁজেও সীতাকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে অশোক বনের দিকে গেলেন।

তারপর :—

স্থান—অশোকবন। হনুমানের প্রবেশ।

হনু—আরি বাপ! আর তো পা চলে না রে! এবার একটু না বসলেই নয়। উঃফ্! ঐ শিংশপা গাছটির আড়ালে বসে আগে বাঁদ্দুরে বিস্কুটগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক, তাপ্পর দেখা যাবে। বাবা! কত কষ্ট করে লুকিয়ে-চুরিয়ে জোগাড় করতে হয়েছে গো, কেউ না আবার দেখতে পেয়ে ভাগ বসাতে চায়!

(গাছের আড়ালে বসে বিস্কুট ভোজন। খুদে রাক্ষসের প্রবেশ)

খুদে—উঁ হুঁ হুঁ! বেড়ে গন্ধটি তো, ও পিসেমশাই, আমাকে দাও।

হনু—কেরে তুই, ভাগ্ বলছি। আমি তোর পিসেমশাই নই, তোর পিসেমশাই রাবণের বাড়ি গেছে, যা, যা, তুইও যা, এখানে কিছু হবে টবে না!

খুদে—তবে আমি চ্যাঁচাই—হা—আ—

হনু—আরে চুপ্ চুপ্, এই যে বিস্কুট। এতো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল বাপ্! কি যে করি এখন। কোথায় যে তাকে না খুঁজেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত টিকিটি দেখলাম না! পা ব্যথা সারলে এই বনটাকে সরু চিরুণি দিয়ে আঁচড়াব। তবু যদি না পাই—

খুদে—খাটের তলায় দেখেছ?

হনু—তুই থাম্ দিকিনি, কোথায় আবার খাটের তলায় দেখব, খাট তো সব রথের চূড়োর চেয়ে উঁচু।

(দূরে মলিন বেশে দুঃখী মুখে সীতার প্রবেশ। গায়ে সামান্য অলঙ্কার)

হনু—এই খেয়েছে! খিদে খিদে মুখ করে উটি কে আসছে? আবার না ভাগ বসায়! এ তো এক মহা জ্বালা দেখছি।

খুদে—উটি তোমার বিস্কুট খাবে না। উটি খায় না, চুল বাঁধে না, উটি সীতে। আরেকটু বিস্কুট দাও বলছি।

হনু—এ্যাঁ! সীতে কিরে! ঐ কি সীতা নাকি? হ্যাঁ তাই তো! গলার কণ্ঠিটা যেন রামচন্দ্র যেমন বলেছিল ঠিক তেমনি দেখা যাচ্ছে।

খুদে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ সীতে, আমার মা ওর চেড়ি কিনা, কই দিলে না বিস্কুট?

হনু—এই নে নে, সবগুলো খা, আমার খিদে চলে গেছে। ঐ নাকি সীতে? এরই জন্যে রামলক্ষ্মণ ইত্যাদি হেদিয়ে গেলেন? আরে ছ্যা ছ্যা, এর চাইতে কত সুন্দরী কিষ্কিন্ধ্যার পথেঘাটে গড়াগড়ি খাচ্ছে!—এখান থেকে যাবি কি না বল্?

খুদে—না, যাব না তো। মা বলেছে একটু নুন লঙ্কা দিয়ে—ও বাঁবা! এঁবার বোঁধ হয় রাঁবণ আঁসবে।

হনু—ওরে বাবা রে! ওগুলো কি সীতাকে ঘিরে দাঁড়াল! দেখেই যে আমার পিলে চমকাচ্ছে! কি ওগুলো? কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, ভাঁটার মতো চোখ? এ্যাঁ, সত্যিকার রাক্ষস নয় তো? শেষটা যদি আমাকেই চেটে খায়! কাজ কি বাপু ঘাঁটিয়ে! শিং-শপাটার মগ্‌ডালেতে চড়ে বসাই যেন ভালো মনে হচ্ছে!

(মগ্‌ডালেতে আরোহণ—সঙ্গে খুদে রাক্ষস)

খুদে—আঃ, সর না, আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না!

হনু—আরে বাবা চুপ, চুপ, এই সরে গেলাম।

খুদে—তোমার ল্যাজটা দিয়ে তাহলে আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখো নইলে যদি ভয়ের চোটে পড়ে যাই!

(রাবণের প্রবেশ, সঙ্গে অনুচর বৃন্দ)

সীতা—ফের এসেছিস্! যা বলছি, পালা এখান থেকে, নইলে—

রাবণ—নইলে কি, রাঁজকন্যে? বলি তোমার সাহস তো কম নয়, আমি একটা রাজা, আমার দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখে কি বলে ইয়ে—সবাই ভয় পায়, সবাই আমাকে ভালোবাসে, আমার গুণগান করে, আর তুমি আমাকে দেখলেই দাঁত খিঁচুতে শুরু কর!

সীতা—তোকে আমি থোড়াই কেয়ার করি! জানিস্ ইচ্ছে করলেই তোকে আমি ভস্ম করে এক ছিলা ছাই বানিয়ে দিতে পারি! নেহাৎ শ্রীরামের অনুমতি পাই নি বলে বেঁচে গেলি। ভালো চাস্ তো ভাগ্ এখান থেকে।

রাবণ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি, বাবা! ঠিক যেন আস্ত একটা কেউটে সাপ! এখন যাচ্ছি বটে,

কিন্তু এও আমি বলে গেলাম, আর দু মাস দেখব, তারপর সরষে বাটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঝোল সপ্‌সপে ঝাল রাঁধিয়ে—

চেড়িবৃন্দ—চাট্টি ঝরঝরে ভাত দিয়ে না মেখে—

রাবণ—চোপ্‌! যত মুখ নয় তত বড় কথা! ঝোল রাঁধা হলেও তোরা কিচ্ছু পাবি নে! ভালো চাস্‌ তো সীতাকে পোষ মানা, তারপর না হয় দেখা যাবে।

(রাবণের অনুচর সহ প্রস্থান)

দুর্মুখী—এই, শুনলি তো, বেশী তেজ দেখালে শুঁটকি মাছ হয়ে যাবি!

বিনতা—ওঃ! রাবণের রাণী হতে ওঁর আপত্তি! কোথাকার তুই কে রে, একটা চ্যাং মাছের মতো রূপের ছিরি! রাণী হবার তোর যোগ্যতা কোথায় রে যে অত দেমাক দেখাস্‌?

বিকটা—হাঁউ মাউ খাঁউ!

অজামুখী—অত কথায় কাজ কি ভাই? আয়, জল খাবার করি।

শূর্পনখা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁই হোঁক। বাঁবাঁ এঁখনো নাঁকের শোঁকে মলুম!

ত্রিজটা—ওরে, তোরা অমন করিস্‌ নে, বরং নিজেদের খেয়ে ফেল্‌! এতক্ষণ ঘুমুতে ঘুমুতে সে যা স্বপ্ন দেখলুম, ভেবেও আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছে!

চেড়িবৃন্দ—কি দেখলে, কি দেখলে, দিদি?

ত্রিজটা—দেখলুম রাবণ ন্যাড়া মাথায় তেল মেখে, লাল কাপড় পরে, গলায় করবী ফুলের মালা ঝুলিয়ে, পুষ্পক রথ থেকে ধপাস্‌!

চেড়ি—এ মা! ছি, ছি!

ত্রিজটা—আরো দেখলাম, রাবণ গাধায় চেপে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, গাধা থেকে পিছলে যেই না কাদায় পড়া, অমনি একটা কুচকুচে কালো মেয়ে এসে তার গলায় দড়ি দিয়ে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল— ।

চেড়ি—এ রাম! রাবণটার যদি কোনো আক্কেল থাকে!

ত্রিজটা—আরো দেখলুম রাম লক্ষ্মণ এলেন, সীতা চার দাঁতওয়ালা হাতির পিঠে উঠে চাঁদ সূর্য ছুঁলেন—ছ্যাখ্‌, তোরা সীতার পা ছুঁয়ে ক্ষমা চা, রক্ষা চা, তারপর এখান থেকে পালা!

চেড়িরা—পালা, পালা, পালা!

(চেড়িবৃন্দের প্রস্থান)

সীতা—হায়, হায়! আমি কি পাথর দিয়ে তৈরী যে তবুও বেঁচে আছি!

হনু—ছি, অমন বল্‌তে হয় না, মা! তুমি না জনক রাজার মেয়ে সেই সীতা, রাম যাকে খুঁজতে এসে সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। সেই সুগ্রীব আমাকে পাঠিয়েছেন। কত দেশে, কত বনে ঘুরে, শেষে সম্পাতি পাখির কথায় সাগর পেরিয়ে সত্যি বুঝি সীতা মায়ের দেখা পেলাম।

সীতা—এঁ্যা কে তুমি? এসব কথা কেন বলছ? তুমি নিশ্চয় রাবণ, আমার সঙ্গে ছলনা করছ?

(হনুমানের নিচের ডালে অবতরণ, খুদে রাক্ষস তখনো সঙ্গে) আরে এ যে একটা সত্যিকার বাঁদর। কিন্তু চেহারাটি তো আশ্চর্য, অশোক ফুলের মতো লাল গায়ের রং সোনার মতো চোখ—তাই যেন হয়, বাছা, তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।

হনু—রামচন্দ্র এই আংটি দিয়েছেন আপনাকে দিতে। এবার চলুন, আমার পিঠে চাপুন আপনাকে নিয়ে আমি সাগর পার হয়ে চলে যাই।

সীতা—ওমা সেকি! আমার ভারে যে তুমি চ্যাপটা হয়ে যাবে!

হনু—ইচ্ছা করলে আমি এর শত গুণ বড় হতে পারি। দেখবেন?

খুদে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও দেখব। ইস্, আমার মার মুখটি কি বড়, ঠিক ছাগলের মতো সুন্দর!

হনু—তুই থাম্ দিকি নি। বড়দের কথার মধ্যে কথা বলতে হয় না তাও জানিস্ না? মা সীতা, আর বিলম্ব করবেন না, আমার পিঠে চাপুন আমিও সাঁ করে উড়ে পড়ি।

খুদে—ধ্যাৎ! কি যে বলে! বাঁদর আবার ওড়ে নাকি!

সীতা—না বাছা হনুমান, ও আমি পারব না। সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাবার সময় নির্ঘাৎ আমি মাথা ঘুরে ধপ্ করে পড়ে যাব—

খুদে—তাহলে সুরসা-সাপিনী গপ্ করে তোমাকে গিলে খাবে। তাঁ হঁলে আঁমার মাঁর জঁল-খাঁবারের কিঁ হঁবে! ওমা—মা—গো—ও ও!

হনু—চোপ্, নইলে এক চড়ে তালগোল পাকিয়ে দেব, এই নে ধর, সুপুরি খা।

খুদে—কি মজা, না?

হনু—তা হলে কি হবে মা? এই বিকট রাক্ষুসীদের মধ্যে কি করে আপনাকে ছেড়ে যাই? সত্যি যদি খেয়ে ফেলে?

সীতা—না বাছা, সে ভয় নেই, রাবণ তা হলে ওদের আস্ত রাখবে না। তুমি নির্ভয়ে গিয়ে শ্রীরামকে আমার প্রণাম দাও, শ্রীলক্ষ্মণকে আশীর্বাদ দাও। আর ছাখ, এই আমার মাথা থেকে চূড়ামণি রত্নটি খুলে দিলাম, এটি আমার বিয়ের সময় আমার পিতা জনকরাজা আমার শ্বশুরের হাতে দিয়েছিলেন, এটি দেখলেই শ্রীরামের সেসব কথা মনে পড়বে। যাও বাছা নিরাপদে, তাঁদের শিগগির নিয়ে এসো, আমাকে তাঁরা উদ্ধার করুন। দুর্গা, দুর্গা!

হনু—আপনার চরণে শতকোটি প্রণাম করি, মা। (সীতার প্রস্থান)। এই আমি গেলাম বলে, কিন্তু তার আগে এই বনটাকে তছনছ করে দিয়ে যাবো। হেই, হুপ্, হাপ! মার মার মার, কাট্ কাট্ কাট্, গাছের ডাল ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্!

খুদে—আমিও ভাঙব, ও পিঁসে মঁশায় গোঁ, আঁমাকে ফেঁলে কোঁথায় চঁললে!

(হনুমানের গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে তুমুল কোলাহল সহ প্রস্থান)

বর্ষাতি

। গ্রাহক নং—৫১১, বয়স ১৪ বছর

টুপ্‌টাপ্‌ টুপ্‌টাপ্‌ পড়ে খালি বৃষ্টি,
বর্ষাতি আছে ভাই মানুষেরই সৃষ্টি।
বর্ষাতি গায়ে দিয়ে যেথা যাবে চলে যাও—
বৃষ্টির জল কভু লাগবে না এক ফোঁটাও।
বেস্‌সোঁর আবিষ্কার, বিজ্ঞানের দান,
তারি মাঝে প্রকাশিল বেস্‌সোঁর মান।
বেস্‌সোঁ লোকটি ভাই বড়ই চতুর,
বৃষ্টিহেতু অসুবিধা করিল ফতুর।
হইল উদ্ভব বর্ষাতি আঠারো শতকে
বেস্‌সোঁর নাম তাই জানিল কত লোকে।
বেস্‌সোঁর বর্ষাতি জেম্‌স্‌-এর চেষ্টায়
করিল যে উপকার অধিক মাত্রায়।
সাধিলেন দুরূহ কাজ এই দুইজনে
লভিলেন অমরতা মানবের মনে।

মৌমাছির বাসা

শিখর রায়—বারুইপুর (উকিল পাড়া)। বয়স ১০ বৎসর ॥ গ্রাহক নং ২৭০৬

প্রথম দৃশ্য

[মৌমাছি মধু সঞ্চয় করছে, এমন সময় ফড়িংয়ের প্রবেশ]

ফড়িঙ।—মৌমাছি ভাই কি করছ ?

মৌমাছি।—মধু সঞ্চয় করছি।

ফড়িঙ।—আমায় একটু দেবে ?

মৌমাছি।—আমায় যদি একটা কাজ করে দাও তাহলে দিতে পারি।

ফড়িঙ।—কি কাজ ?

মৌমাছি।—আমার বাচ্চাদের দেখে আসতে পার ?

ফড়িঙ।—হ্যাঁ দেখে আসছি, তা ভাই তোমাদের বাসায় অত গর্ত কেন ?

মৌমাছি।—ও গুলি গর্ত নয় আমাদের বাসা।

ফড়িঙ।—আচ্ছা ভাই ও গুলি কি দিয়ে তৈরী কর ?

মৌমাছি—আমাদের শ্রমিক ভাইদের পেটের নীচে একরকম মোম জন্মায়। সেই মোম দিয়ে এ বাসা তৈরী হয়।

ফড়িঙ।—বাঃ। চমৎকার তো।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দুদিক দিয়ে মৌমাছি এবং ফড়িঙের প্রবেশ]

মৌমাছি।—কি দেখলে ?

ফড়িঙ।—দেখতে কি দিলে ?

মৌমাছি।—কেন ?

ফড়িঙ।—এই দেখনা শ্রমিকেরা আমার কি করেছে।

মৌমাছি।—আহা, দূর থেকে জিজ্ঞেস করলে পারতে। আমাদের কষ্ট করে সঞ্চয় করা মধু মানুষেরা অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয় তাই এ ব্যাবস্থা।

ফড়িঙ।—মানুষেরা তো খুব স্বার্থপর।

মৌমাছি।—তা আর বলতে।……

কাল বৈশাখী ঝড়

মায়া দাস—বয়স ১১, বছর "শান্তিনিকেতন"। গ্রাহক সংখ্যা ২৭৯২।

দুপুর থেকেই একটু একটু করে মেঘ জমছিল। বিকেল বেলা দেখি সারা আকাশে মেঘ। হু হু করে চারদিক থেকে মেঘ এসে জড় হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে ফেলল। বিকেল বেলাতেই মনে হচ্ছিল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একদল চড়ুই পাখি কিচমিচ করতে করতে তাদের বাসায় ফিরে গেল, দূরে বহু দূরে কয়েকটা সাদা বক কালো মেঘের তলা দিয়ে উড়ে গেল। একটা দমকা হাওয়া এসে ঝড়ের আগমনী বার্তা বয়ে নিয়ে গেল।

খানিক পরে আস্তে আস্তে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল, শেষে সেই হাওয়া ভীষণ ঝড়ের আকার ধারণ করল। কী ভীষণ ধুলোর ঝড়, বাইরে বেরোন দূরে থাক বারান্দায় পর্যন্ত আসা যাচ্ছে না। পাশের বাড়িটা পর্যন্ত আবছা দেখাচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে দূরে অনেক দূরে যেন বাড়িটা। মাঝে মাঝে মেঘগুলো গর্জন করে উঠছে। ধুলোয় চার দিক ভরে গেছে। বড় বড় উঁচু উঁচু গাছের ডালগুলো ঝড়ে বেঁকে গেছে আর গাছগুলোকে কেমন যেন নেড়া নেড়া দেখাচ্ছে। আশ্রমের কত গাছেরই ডাল ভেঙেছিল। আম্রকুঞ্জের কত আমই না পড়েছিল। গাছে গাছে সোঁ-সোঁ শব্দে হাওয়া দিচ্ছে। ঝড়ের মুখে উড়ে চলেছে সাদা-সাদা কার্পাস তুলো আর ঝরা পাতা। হাওয়ার শব্দে কান পাতা যাচ্ছে না। ক্রমে ক্রমে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। চার দিক থেকে বৃষ্টির ঝাপ্টা আসতে লাগল। হঠাৎ কড় কড়াৎ করে কোথায় যেন বাজ পড়ল। আমরা ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। কয়েক মিনিটের জন্য আকাশের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চিরে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল চারি দিক আলোয় আলো হয়ে গেল।

গুড়্ গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল। মনে হল কে যেন একটা লোহার রোলার আকাশের এদিক থেকে ওদিকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা কয়েক জনে গান ধরলাম—

রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে ;
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,

কানে আসতে লাগল একটানা বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দ।

কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বৃষ্টি থেমে গেল। চার দিক নিস্তব্ধ নিঝুম। শুধু মাঝে মাঝে গাছ-পালাগুলিকে শিউরে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক এক ঝলক ভিজে হাওয়া। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ মিট মিট করে উঠল একটা তারা।

বুঝলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে॥

॥ খোয়াই ॥

নীলা দাস, বয়স—১৪২ বছর। গ্রাহক নং ২৭৯২ ॥

শান্তিনিকেতন ছাড়িয়ে একটু আশেপাশে এগিয়ে গেলেই চোখে পড়ে খোয়াই। সেই যেখানে—

"মাটি গেছে ক্ষয়ে
দেখা দিয়েছে
উর্মিলার লাল কাঁকড়ের নিস্তব্ধ তোলপাড় ;
মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি…"

আর যেখানে—

"ছোট ছোট অখ্যাত খেলার পাহাড়
বয়ে চলেছে তার তলায় নামহীন খেলার নদী।"

সেইখানেই আমাদের খোয়াই।

খোয়াইয়ে এলে মনে হয় যেন দূরবীনের উল্টোদিকের দেশে এসে পড়েছি। ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ের মত টিবি। তার মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে বর্ষার ক্ষীণ জলধারা। আশেপাশে যেসব খেজুর গাছ রয়েছে তারাও কেমন বেঁটে বেঁটে।

দূরে দেখা যায় সাঁওতাল গ্রাম। মনে হয় কে যেন তাকে নিপুণ তুলির টানে এঁকে দিয়েছে। অন্যদিকে তাকালে চোখে পড়ে ধু ধু করা মাঠ। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এক একটি তালগাছ। তার অনেক অনেক দূরে আঁকা রয়েছে একটি নীল গণ্ডী। দিনের শেষে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে তখন মনে হয় খোয়াইয়ের রাঙা মাটিতে যেন আগুন লেগেছে। পায়ে চলা পথ দিয়ে ঘরে ফিরে যায় কর্মক্লান্ত সাঁওতাল মেয়ের দল। দূর থেকে কানে আসে তাদের গানের সুর। রাখাল ছেলের বাঁশীর রেশটুকু হারিয়ে যাওয়ার আগেই খোয়াইয়ের উপর নেমে আসে অন্ধকার।

খোয়াই চিরদিন ছোটদের কাছে একটি মস্ত বিস্ময়ের বস্তু। কতদিন আগে বালক রবীন্দ্রনাথ ঘুরে বেড়াতেন এর ছোট ছোট পাহাড় পর্বতে। কখনো বা খেজুর গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে ভরাতেন কবিতার খাতা। তারপর কেটে গেল কত বছর। কত পরিবর্তন হয়ে গেল শান্তিনিকেতনের। কোথায় হারিয়ে গেল সেই ছোট্ট বালকটি। আর খোয়াই সেকি সেই রকমই আছে? না, তারও এসেছে পরিবর্তন।

দিন দিন খোয়াই বাড়তে লাগল। গ্রাস করতে এল শান্তিনিকেতনকে। কিন্তু সেই হল তার কাল। তৈরী হল কৃত্রিম বন। খোয়াইয়ের দর্প গেল নষ্ট হয়ে।

আজও খোয়াই আছে। তবে তার গৌরবময় দিন আর নেই। সে আজ মৃত প্রায়।

পড়ুয়াদের রোজনামচা থেকে

জীবন সর্দার

কী ফুল ভালোবাস তুমি? বেল মালতী যুঁই টগর বকুল—কত ফুলের নাম বলতে পারবে? যদি জিগগেস করি কী পাখি—কী পাখি ভালোবাস তুমি? একটু ভাবতে হবে। ফুলের মতো ভালো পাখিকে বোধ হয় বাস নি। প্রকৃতি পড়ুয়ার চোখ, মন—বৈজ্ঞানিকের চোখ মন। আর হৃদয় ভালোবাসায় ভরা। সেই চোখ মন আর হৃদয় দিয়ে দেখা কয়েকটি প্রকৃতি-পড়ুয়ার 'রোজনামচা'র পাতা আমার কাছে আছে। তা থেকে তুলে তুলে তুলে আমি দেখাতে চাই, অল্প কয়েকদিনের চেষ্টায় কত ভালো 'পড়ুয়া' হওয়া যায়।

দু-নম্বর পড়ুয়া সুদীপ চক্রবর্তী গত অক্টোবরে বোলপুরে গিয়ে কয়েকদিন ছিল। তার ভাষায় তার কথা শোনো।

'বোলপুর রেল লাইনের ধারে একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে আমরা থাকতাম। ইচ্ছে করেই সে বাড়িতে ইলেকট্রিক আনা হয় নি। বাড়ির একদিকে বিরাট বিরাট গাছ আর ঘন ঘন ঝোপ। সন্ধ্যে হবার সাথে সাথেই নানারকম শব্দ করতে করতে পাখিরা ঘরে ফিরত। দিনের আলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত। পাখির ডাক তখন ঝিমুনি পেত। এই সময় রোজই অনেকক্ষণ ধরে একটানা পেঁচার ডাক শুনতাম—বুবুম্ বুম্। একদিন আমার মনে হল, দেখি ওদের সম্বন্ধে কতটুকু জানা যায়।

'পেঁচা কি দিনের আলো মোটেই পছন্দ করে না? রাতেই ওদের ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।

গায়ের রঙ এমন যে দিনের বেলা ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিল—অনেক কাছে গিয়েও বুঝতে পারিনি। ওদের খুঁজে বের করতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিল।

'একদিন আন্দাজেই গুদামঘরের ভিতর খুঁজে পেয়েছিলাম। পরে গাছের কোটরেও ওদের খোঁজ পেয়েছি। ওদের বাসার তলায় প্রচুর হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখেছি। ওদের বাসাও একটা যেমন তেমন হাড়গোড় আর খড়কুটো দিয়ে তৈরী।

'আমি যে পেঁচাগুলো দেখেছি সেগুলো প্রায় পায়রার সমান। মুখটা আয়তক্ষেত্রাকার। বড় বড় দুটো ড্যাবড্যাবে চোখ। কান দুটো ইচ্ছে করলেই শুইয়ে রাখতে পারে। রাতের শিকারী পাখি—তাই কি পেঁচার চোখ কান এত বড়! ঠোঁটটাকে অনেক সময় নাক বলে ভুল হয়। বেড়ালের মতো গোঁফ রয়েছে।

'পেঁচা উড়লে শব্দ হয় না। সারা শরীর নরম পালকে ঢাকা। দিনের বেলা সারাক্ষণ চোখ বুজে ঝিমোয়। পায়ে চারটে আঙুল। তাতে নখগুলি ধারালো। নখ দিয়ে কিছু ধরলে সহজে ছাড়ে না।

'একদিন সন্ধ্যেবেলায় দেখলাম একটা পেঁচা পায়ে একটা ইঁদুর ধরে গুদামঘরে ঢুকে গেল। আমিও চুপি চুপি পিছু নিলাম। দেখলাম পেঁচাটা ভয়ানক হিংস্রভাবে নখ দিয়ে ইঁদুরটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে। সাপের মতো হিস্ হিস্ শব্দ করছে আর দুলছে। এদের কখনো মাংস ছাড়া আর কিছু খেতে দেখিনি। ঠোঁটের কাজ পায়ের নখ দিয়েই সেরে নেয়।

'একদিন খুব সাহস করে কাছে গিয়েছিলাম। ওরে বাব্বা, যা চটে গেল। হিস্ হিস্ শব্দ করে দুলতে লাগল। মাঝে মাঝে ছোবল মারতে আসে। ভয়ে পালিয়ে এলাম।

'আর একদিন একটা খুব মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম,—পেঁচাটা সহজে দৃষ্টি ঘোরাতে পারল না। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, ওটা দুলে দুলে সামনের দিকে হিস হিস করতে থাকল। আমি তক্ষুণি পাশে সরে গেলাম। আমার পাশে সরে যাওয়া ব্যাপারটা বুঝতে ওর অনেকক্ষণ সময় লাগল।

'পেঁচার ডাকের কয়েকটা রকমফের শুনেছি :

(ক) শিকার ধরার কিছু আগে (সন্ধ্যাবেলায়) বুবুম্-বুম্ (গম্ভীর স্বরে)।

(খ) শিকারটাকে ছিন্ন-ভিন্ন করার সময়—হিস্-হিস্।

(গ) কোনো কারণে ভীষণ উত্তেজিত হলে বা ভয় পেলে—হিস্ হিস্।

(ঘ) ভয় দেখাতে (ঠোঁট বুকে ঠুকে)—খট্ খট্।

(ঙ) মারামারি করার সময়—ক্যাঁচ ক্যাঁচ, কট্ কট্।

(চ) রাত্রিরে ঘণ্টায় ঘণ্টায়—কিচির মিচির ও নিম্ নিম্।"

অন্য কোনো পড়ুয়া পেঁচা সম্বন্ধে আর কিছু জানলে আমাকে জানাতে ভুলো না'। সুদীপের রোজনামচার পাতায় এই শেষ কথা।

আর—একজনের কথা বলছি। সে তার শহরের আশেপাশে জলায় জলায় ঘুরে, সেই জলায় জলের পোকার খোঁজ করে চলেছে। তার অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

বারো-নম্বর পড়ুয়া বেবী দাশ। গত বছর সেপ্টেম্বরের এক সকালে কাঁধ-ঝোলায় কাঁচের শিশি, চিমটে, ছুরি, আতসী কাঁচ আর টেস্ট টিউবে কিছু ফর্মালিন ভরে বেরিয়ে পড়ল। পরের টুকু তারই কথায় শোনো :

হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম চুঁচড়ার কপিডাঙার মতিঝিলে। বিরাট ঝিলটা বুজে বুজে ভাগ—ভাগ হয়ে গেছে। তারই একটাতে ধোবারা কাপড় কাচছে। আর একটাতে একজন ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। আমি একটা শুঁড়ি পথ ধরে ঝিলটার উত্তর-পাড়ে চলে গেলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি—পোকা ধরতে কোথায় নামব। ঘাট ছাড়া আর সব জায়গাই কচুরী পানায় ভরা। একটা বন-শিউলির ডাল ভেঙে পানা সরাতে লাগলাম। ফর ফর করে ফড়িংগুলো উড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর দেখলাম একরকম পোকা জলের উপর পা ফেলে ফেলে ডাঙার দিকে আসছে। দেখেই মনে হল এদের যেন চিনি। ঠিক তাই। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম এরা 'আলোর পোকা'। শ্যামা পোকার সাথে এক রকম কালো রঙের পোকা দেখা যায়—এরা তারাই। আকারে একটু বড়। রুমালে ছেঁকে কয়েকটা ধরলাম।

'এদের পা ছ'টি। ছটো খাবার ধরার শুঁড়। আর ছটো শুঁড় মাথার উপর তোলা—এমনভাবে নাড়াচ্ছে যেন হাওয়া শুঁকে দেখছে কে কোথায় আছে। পিঠের উপর কালো ছটো ডানা—পাতলা পর্দার মতো। পিঠের উপর সমান করে পাতা।

'বেশীর ভাগ সময়ই ওরা জলের উপর আলতো ভাবে পা ফেলে ফেলে চলেছে। চলবার সময় শরীরটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছে।'

'লক্ষ্য করে দেখলাম এদের চোখ মাছির মতো—অর্থাৎ পুঞ্জাক্ষি। হাত-পাগুলো জোড়া-দেওয়া। এদের পিঠের রঙ কালো। পেটের দিকে হালকা সবুজ। কয়েকটা পোকা টেস্ট টিউবে ভরে নিলাম। পাশ থেকে লক্ষ্য করে দেখলাম আরও ছটো পা রয়েছে সামনে। সেগুলি মুড়ে আছে তাই উপর থেকে দেখতে পাই নি। সামনের এই পা-জোড়া একটু ছোট। মাথাটা অনেকটা আরশুলার মতো।

'আমি তন্ময় হয়ে দেখছি, কখন আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে লক্ষ্য করি নি। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। আমি উঠে ঘরে ছুটলাম।'

আমার কথা—যে ছটি পড়ুয়ার রোজনামচা থেকে একটি করে পাতা তোমাদের পড়তে দিলাম তারা কেউ তোমাদের চেয়ে খুব বড় নয়। বুঝতে পারছ আমাদের চারপাশে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কী বিচিত্র আর-একটা জগত জীবনের খেলা চলছে। কিন্তু ব্যস্ত আমরা, তার খোঁজ নিতে পারি না। তাই আমাদের হাসি গান শুধু আমাদেরই। বড় স্বার্থপরের মতো একা একটি জগতেই আমরা বন্দী।

এসো আমরা সেই বন্ধন কাটি। 'সন্দেশ' যে পড়ে সেই প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তরের সভ্য হতে পারে। আমাকে চিঠি লিখলেই তাকে সব নিয়ম-কানুন জানিয়ে দেব।

কম করে চারজন পড়ুয়া মিলে একটা প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালা গড়তে পারে—যে কোনো জায়গায়। দল বেঁধে কাজ করায় তাতে বেশ সুবিধে। কি ভাবে কী কাজ করতে হবে চিঠি লিখলেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

কী পাখি ভালবাস তুমি? কী ফুল? তোমার চলার পথের সবগুলো গাছের নাম বলতে পারবে? পোকা-মাকড় কি শুধু আমাদের ক্ষতিই করে? ওরা আমরা মিলে যে জগৎ, তার অর্ধেকটা জানা মানে কিছুই জানা নয়। সব জানার চেষ্টা করতে হবে।

নতুন পড়ুয়া

(৭৫) শর্মিলা রায় (শান্তিনিকেতন) ॥ (৭৬) অনুরাধা সেনগুপ্ত (দেরাদুন) ॥ (৭৭) সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া) (৭৮) তীর্থ কমল মিত্র (কলকাতা) ॥ (৭৯) অভিজিৎ দে (কলকাতা) ॥ (৮০) অশোক চক্রবর্তি (কলকাতা)

শ্রীঅরবিন্দ দাসগুপ্ত

আমাদের বিশ্ববরেণ্য প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তার পরিচয় কারুরই অজানা নেই। খেলোয়াড় হিসাবে খেলার মাঠে তিনি বেশী নাবেন নি কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত খেলোয়ার। যৌবনে টেনিস খেলেছেন, ক্রিকেট খেলেছেন, ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে ছুটেছেন। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার পরও তিনি তখনকার দেশরক্ষামন্ত্রী সর্দ্দার বলদেব সিংএর সঙ্গে বেডমিণ্টন খেলেছেন। বন্যায় যাদের বাড়ীঘর ভেসে গেছে তাদের সাহায্যের জন্য অনুষ্ঠিত খেলায় নিজে ক্রিকেট ব্যাট হাতে মাঠে নেমেছেন অধিনায়ক হিসাবে, একটী দলকে পরিচালনা করেছেন, ক্যাচ লুফেছেন, বোলিং করেছেন।

দিল্লীতে নেশনেল স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করার সময় তিনি বলেছিলেন "ইংরেজী ভাষা অনুযায়ী ক্রিকেট" কথাটার অর্থ প্রকৃত খেলোয়াড় সুলভ মনোবৃত্তি, ন্যায় ও নীতি। এই মনোভাব বজায় রেখে শুধু ক্রিকেট নয় আর সব রকমের খেলাই খেলা উচিৎ। "খেলার জন্যই খেলা", তাঁর এই অমর বাণী আজ ক্রীড়াজগতের আদর্শ হওয়া উচিৎ।

১৯৫১ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান গেম্‌সের প্রধান উৎসাহদাতা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্রী নেহেরু। ক্রিকেট, হকি, ফুটবল খেলার আসরে সময় পেলেই তিনি উপস্থিত হতেন। তার মৃত্যুতে ক্রীড়াজগৎ হারিয়েছে একজন বিরাট পৃষ্ঠপোষক।

ক্রিকেট

ইংলণ্ড সফররত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল এ পর্যন্ত মোট ১০টী খেলায় যোগদান করে ৪টীতে জয়ী হয়েছে। বাকী খেলার মধ্যে ৪টী খেলা হয়েছে সমান সমান ও ২টী হয়েছে বৃষ্টির জন্য বাতিল।

মোট ৫টী টেস্ট খেলার মধ্যে প্রথমটী ট্রেণ্টব্রিজে ৪ঠা জুন থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৃষ্টির জন্য খেলাটী অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। খেলার গতি দেখে মনে হচ্ছে এবারকার দু দলই প্রায় সমান শক্তিশালী। অবশ্য দু দল প্রায় সমান হলে খেলার প্রতিযোগিতা বেশী হয় ও কাজেই খেলা হয় বেশী উপভোগ্য।

তেল আবিবে (Tel-aviv) এশিয়ান লীগ ফুটবল কাপের খেলায় ইস্রায়েল অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে। তারা হংকং কে হারিয়েছে ১-০, ভারতবর্ষকে ২-০ গোলে ও দক্ষিণ কোরিয়াকে ২-১ গোলে। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ভারতবর্ষ।

রি ও ডি জেনারোতে তে অনুষ্ঠিত ব্রেজিল বনাম ইংলণ্ডের আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় ব্রেজিল ৫-১ গোলে জয়ী হয়েছে। ফুটবল খেলায় ব্রেজিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও তারাই বর্তমান বিশ্ব-চ্যামপিয়ন।

হকি

ভারত ভ্রমণরাত মালয়েশিয়ার হকি দল এর মধ্যে ৬টী টেস্ট্ ম্যাচে তিনটীতে ড্র করেছে ও তিনটীতে পরাজিত হয়েছে। কেনিয়া ও মালয়েশিয়ার বাছাই হকি দলের খেলা দেখে সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে ভারতের বিশ্বদরবারে হকি খেলায় যে শ্রেষ্ঠ আসন ছিল তা আর বেশীদিন থাকবে না।

ফুটবল লীগ

কলকাতা মাঠে লীগের খেলা এখনও জমে ওঠেনি। লীগ খেলা এ বৎসর দেরীতে শুরু হয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে খেলার মাঠে শুধু বিষাদের ছায়াই নেমে আসে নি, বেশ কিছুদিন খেলা বন্ধ রাখা হয়েছিল। মনে হয় ফুটবল জমে উঠতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। জুনের ৯ তারিখ পর্যন্ত খেলায়, ১৫টী ক্লাবের মধ্যে মোহনবাগান, ইস্ট্‌বেঙ্গল ও ইস্টার্ণ রেলওয়ে অপরাজিত আছে আর কটা, জর্জ টেলিগ্রাফ ও পোর্ট কমিশনার্স এখন পর্যন্ত কোন খেলা জিততে পারেনি।

নতুন ধাঁধা

১। দুইটি আকার মোর, ভুল নাই তাতে,
চক্রবৎ গোলাকার, ফিরি হাতে হাতে।
শেষের আকার মোর কেড়ে নিলে পরে,
দেহ মোর মোলায়েম, ফাঁকা রূপ ধরে।
নিরাকার হলে হই অম্লরসময় ?
সংসারে সকলে মোর জানে পরিচয়।

২। যদুর মা তাকে দুটো ঘটি দিয়ে বললেন 'যা—৭ সের জল নিয়ে আয়।' ঘটি দুটির একটি ছিল ৩ সেরী, একটি ৫ সেরী। বলতো কেমন করে যদু ওজন ঠিক করবে ?

৩। লীলাদের বসবার ঘরে লীলা, শীলা, নীলা, আর ইলা খেলা করছিল।

বেলা এসে একটি ছোট লাঠি দেখিয়ে তাদের বলল—'এই লাঠিটা আমি ঘরের মেঝেতে সোজাভাবে শুইয়ে রাখব, কিন্তু তোমরা কেউ এটাকে ডিঙিয়ে যেতে পারবে না !'

সবাই কলরব করে উঠল—'নিশ্চয় এর মধ্যে কোনও চালাকি আছে।'

বেলা বলল—'তোমাদের চোখ, হাত, পা কিছুই ধরব না বা বাঁধব না। আমি কেবল লাঠিটা রাখব আর তোমরা একে একে ডিঙোতে চেষ্টা করবে।'

সবাই বলল—'হতেই পারে না'—কিন্তু বেলা যখন লাঠিটা রাখল তখন সত্যিই কেউ সেটাকে ডিঙিয়ে যেতে পারল না।

বলতো বেলা কি ভাবে লাঠি রেখেছিল ?

উত্তর পাঠাবার শেষ দিন ৩০শে আষাঢ় অথবা ১৪ই জুলাই।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

৪।৬৩ আর ৫।৬৩ এই দুইটি প্রতিযোগিতারই অনেকগুলো উত্তর আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে থেকে আমাদের মতে সব চেয়ে ভাল তিনটি নিচে ছাপা হল। এরা যথাক্রমে ১৲, ৮৲, ও ৫৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার পাবে।

এ'ছাড়াও আরো অনেকে বেশ ভাল উত্তর দিয়েছে।

প্রতিযোগিতা : ৪।৬৩-র ফলাফল

প্রথম : কুমারী দীপালী পাল—বয়স ১১ বৎসর।

দ্বিতীয় : শ্রীমান উজ্জ্বল কুমার সিদ্ধান্ত—বয়স ১১ বৎসর।

তৃতীয় : কুমারী দুর্গা সিদ্ধান্ত—বয়স ৯ বৎসর।

প্রতিযোগিতা ঃ ৫।৬৩-র ফলাফল

প্রথম ঃ কুমারী অরুণা বসু—বয়স ১৪ বৎসর।

দ্বিতীয় ঃ কুমারী রীণা সেনগুপ্তা—বয়স—১৩ বৎসর।

তৃতীয় ঃ শ্রীমান অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়—বয়স ১৪ বৎসর।

প্রতিযোগিতা ঃ ৪।৬৩-র লেখা।

(১)

যদি কুমড়ো-পটাশ রাগে—
তক্তপোষে শুক্তো ঢেলে চাটবে সাঁঝের আগে;
খালপাড়েতে মালকোঁচাটি ছুপিয়ে হলুদ ফাগে,
আঁকসি চ'ড়ে উঠবে, যেথা ডিম পেড়েছে কাগে!

(২)

(যদি) কুমড়ো পটাশ রাগে—
কেউ না যেন কলার গাছে শলার আঁচড় দাগে!
নাকের ওপর বাঁ হাত রেখে, ডান-পা ফেলে আগে,
সবাই যেন তিনকাঠিতে টিন পিটিতে লাগে।

(৩)

(যদি) কুমড়ো পটাশ রাগে—
খবরদার! কেউ যেন না সামনে থেকে ভাগে!
বাজিয়ে দিয়ে তবলা-ডুগি ধিনতা-ধাতিন ধাগে,
সবাই যেন আমের রসে জাম গোলাতে লাগে।

প্রতিযোগিতা ঃ ৫।৬৩-র লেখা

(১)

কোন্নগরের খ্যাদন গুইদের ঘাট; চুনীবাবুর ছেলে জলে ঝাঁপাচ্ছিল, টুকটুকে ঠোঁট ডুবিয়ে ঢেউ তুলছিল থুবড়ি। দানি ধোপানী পিক ফেলে বল্লে—"ভাগো!"

(২)

কাল খড়গপুর গোলবাজারের ঘণ্টেশ্বর চাটুজ্যের ছোট জামাই ঝগড়ুলাল টালিগঞ্জে ঠেলেঠুলে ডবল-ডেকারে ঢুকলেন; তারপর থমকে দেখেন ধুতি পাঞ্জাবি ফর্দাফাঁই! বেচারি ভ্যাবাচাকা!

(৩)

কমল খোসনবিশ গেছে ঘাবড়ে। চোর ছেঁচড়ের জায়গা ঝাঝা। টমটম ঠেঙ্গিয়ে ডাক-বাংলোয় ঢুকলো। তখন থমকিয়ে দেখে ধর্মদাস পেয়াদা ফাঁকায় বাক্স ভাঙ্গছে!

(১) নীলা ও মায়া দাস—গ্রাহক সংখ্যা ২৭৯২

তোমাদের চিঠি পেলাম। নতুন বছরের চাঁদা যারা পাঠায় নি, অথচ গ্রাহক থাকবে না বলে জানায়ও নি, তাদের কাছে বৈশাখ সংখ্যা ভি-পি ডাকে পাঠানো যেতে পারে। না পেয়ে থাকলে পত্রপাঠ সম্পাদককে চিঠি ও নতুন বছরের চাঁদা ৯৲ টাকা পাঠিয়ে দিও।

ফাল্গুন চৈত্র সংখ্যায় আমাদের পত্রিকা প্রকাশে দেরী হওয়ার কথা বলা হয়েছে; আশা করা যায় নতুন ব্যবস্থায় কাগজ পেতে তোমাদের দেরী হবে না।

(২) অলক কুমার নন্দ—গ্রাহক সংখ্যা ২৪৪২

এই যে তোমার চিঠির উত্তর দিচ্ছি। তবে বলেইছি তো হাজার হাজার চিঠি যদি আসে তা হলে সবগুলির উত্তর দিতে পারব না, বেছে বেছে দেব! যাদের লেখা হাত পাকাবার আসরে ছাপা হবে তাদের সবাইকে জানিয়ে দেওয়াও হবে। সব লেখা তো আর ছাপা যায় না। বৈশাখ সংখ্যা পেয়েছ নিশ্চয়।

(৩) সুমিত্রা ও সুদীপ্তা পাল—গ্রাহক সংখ্যা ১৭৮১

হাত পাকাবার আসরটাকে বাড়াবার কথা লিখেছ, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু তাহলে তোমরাও আরো বেশী বেশী করে ভালো ভালো লেখা পাঠিও।

(৪) অমিতাভ দাশগুপ্ত—গ্রাহক সংখ্যা ৫৫৫

খেলাধুলার কথা এখন থেকে প্রত্যেক মাসেই বেরুবে, তবে সব সময়ই যে একজন লেখকই লিখবেন এমন কোনো কথা নেই।

মজার কার্টুনের কথা আমরাও ভাবছি; জান তো সবুরে মেওয়া ফলে। আশা করছি এখন থেকে ধাঁধা সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট হবে, কারণ নিয়মিত ধাঁধা ও তার উত্তর ছাপা হবে।

সম্পাদকীয় (জ্যৈষ্ঠ)

কই, চৈত্রমাসের 'কবিতায় হেঁয়ালি' সম্পর্কে কেউ কিছু লিখলে না যে? আমরা তো অনেক চিঠি আশা করেছিলাম। সবাই কি উত্তরটা, অর্থাৎ কার বিষয়ে কবিতাটি, বুঝতে পেরেছিলে? উত্তর হল 'বাতাস'। এবার চৈত্র সংখ্যাটি খুলে মিলিয়ে দেখ তো কবিতাটি বাতাসের বিষয় খাটে কিনা।

মাঝে মাঝে কয়েকটি প্রশ্ন পাই, তার উত্তর আগেও দেওয়া হয়েছে, তবু আবার দিচ্ছি। যারা গ্রাহক নয়, তাদের চিঠির উত্তর ছাপা হয় না। তবে কিছু জানবার থাকলে সম্পাদককে চিঠি লিখলে তার উত্তর দেওয়া হয়।

হাত-পাকাবার-আসর সম্পর্কেও এই কথা খাটে। যারা গ্রাহক নয় তাদের লেখা ছাপা হয় না। প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হলে, কিম্বা ধাঁধার উত্তর পাঠাতে হলেও গ্রাহক হওয়া চাই। অবিশ্যি মাঝে মাঝে আমরা এই নিয়মটির ব্যতিক্রম করি এবং তখন পাঠকদের জানিয়েও দিই। গ্রাহক হবার কোনো বয়স নেই, কিন্তু কোনো বিষয়ে যোগ দিতে হলেই বয়স হওয়া চাই সতেরোর নিচে।

যখনই চিঠি লিখবে, রচনা বা উত্তর পাঠাবে, সর্বদা গ্রাহক সংখ্যা ও বয়স দেবে।

আরেকটা কথা আবার বলছি, কপি রেখে লেখা পাঠিও, কারণ ডাকে বা অন্যত্র হারিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অমনোনীত রচনা ফিরিয়ে দেবার আমাদের কোনো ব্যবস্থা নেই। যে সব রচনা আমরা ছাপব, শুধু সেগুলির লেখকদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

"একেরে অনন্ত করে' বিশ্বময় করিয়াছ দান !
একটি প্রাণের মূল্যে মৃত্যু তুমি আজ মহীয়ান।"

৪র্থ বর্ষ | ৩য় সংখ্যা

জুলাই ১৯৬৪ | আষাঢ় ১৩৭১

যখন বড় হব

উপেন্দ্রকিশোর রায়

আমি তাই ভাবি ব'সে ছেলেবেলা কদিন রবে,
শেষে যখন বড় হ'ব তখন কিবা করব সবে।
তখন মোরা সবাই হব অতিশয় সুস্থির,
আর ভারি বিদ্বান্ আর বড় গম্ভীর।
থাকব নাকো দিনরাত শুধুই খেলা নিয়ে,
কব কাজের কথা (সবাই) শুনবে মন দিয়ে।
বড় লোক হই যদি কাজ করব ভারি,
না হলেও করব কাজ যতটুকু পারি।
সব কাজ কাজ ভাই ছোট বড় হোক্ যাই,
ভাল পথে খেটে খাই তাতে লাজ নাই ভাই।
দোকান করিলে দিব জিনিসটি খাঁটি,
হক্ দর ঠিক মাপ কাজ পরিপাটি।
ডাক্তার হই যদি করোনাকো ভয়,
মিষ্টি ওষুধ দিব খেতে তেতো ঝাঁঝি নয়।
লিখি যদি বই তার দাম হবে অল্প,
রাঙা ছবি পাতে পাতে আর শুধু গল্প।
মোরা যদি রাঁধি খেয়ে হব খুশি,
নুন দিব ঠিক ঠিক ঝাল নেই বেশি।

নিজের হাতে

আশাপূর্ণা দেবী

—হ'ল !

ঘুম ভেঙে উঠে বিছানা থেকে নেমে চটিতে পা গলাতে গিয়েই হল এক কাণ্ড ! একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড ! মেজাজ বিগড়ে দেবার কল একেবারে।

নাঃ, সারাজীবনে একটা দিনও পেলে না ফেলু দাছ, একটা দিনও না। অথচ, সারাজীবন ধরেই ওই বাসনাটা ছিল ফেলুদাত্বর। মানে যখন তিনি 'দাছ' তো দূরের কথা দাদাও হননি। তখন থেকেই।

বাসনাটা এমন কিছু খারাপও নয়। বরং বেশ উচ্চাঙ্গেরই বলা চলে। আর কিছু নয়, একটু ভাল মেজাজে থাকবার বাসনা। জীবনটা শুধু হাসিহাসি মুখ আর, আর খুসি খুসি মন নিয়ে কাটিয়ে দেবেন তিনি, এইটুকু, মাত্র এইটুকু।

কিন্তু ওই, ওই সামান্য ছ' অক্ষরের ছুটো কথার পথেই ত্রিভুবনের যত বাধা। জীবনভোর তো দূরস্থান, পুরো একটা দিনও ভোর থেকে রাত অবধি খুসি খুসি মনে, হাসি হাসি মুখে কাটাতে পেলেন না ফেলু দাছ। বিশ্বসংসারের যত হিংসুটে আর উনচুটে লোক দাত্বর খুসিতে ঘুঁসি মারতে, আর হাসিকে ফাঁসিতে লটকাতে তাল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আর শুধুই কি লোক ?

ত্রিলোকের কোনটা নয় ?

জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ, আকাশ বাতাস, কেউ ভুলে থাকে ফেলু দাছকে ? ভোলে না।

এই যে বলা কওয়া নেই, ডুম্ করে বিষ্টি আসা, হঠাৎ ধুমধাম করে ঝড় ওঠা, ছুপুরবেলার কাঠ ফাটা রোদ্দুর আর ভোরবেলার ঘুম নষ্ট করা আলো নিয়ে আকাশ ব্যাটার ফেলুদাছুর সঙ্গে ইয়ার্কি মারা, এসব কি হাসি আর খুসির পক্ষে বেশ উপযুক্ত ?

আর এই যে—শীতকালের বিটকেল শীত, গরমকালের উৎকট গরম, আর বসন্তকালের গায়ে 'জলবসন্ত' বের করে ছাড়বার হাওয়া, এসব কাকে জ্বালাতন করবার জন্যে ? ঘুমের সময় শনশনিয়ে ঘুরে বেড়ানো আর গুনগুনিয়ে গান গাওয়া মশা, এবং 'কুটুস কুটুস' কামড়দার ছারপোকাই বা বিধাতা পুরুষ কার জন্যে সৃষ্টি করেছিলেন ?

এ ছাড়া পিঁপড়ে আছে, বিছে আছে, ইঁছুর আছে আরশোলা আছে, রাস্তায় বেরোলে হাড় জিরে-জিরে ঘীয়ে ভাজা কুকুর আছে আর লেকে বেড়াতে গেলে মোটা থপথপে কোলা ব্যাঙ আছে, আরও কত কীই না আছে। কার কথা ভেবে এসব পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল ?

মোট কথা আজীবন পঞ্চ ভূতের সব ভূত কটাই ফেলুদাছুর চারধারে দাঁত খিঁচিয়ে বসে আছে। ফেলুদাছু তবে এই সংসারকে দাঁতের আলো দেখাবার ফুরসৎ পাবেন কোন ফাঁক দিয়ে ?

পাননি, পান না, পেলেন না।

ফেলুদাছুর সঙ্গে সারা পৃথিবীর ছুর্ব্যবহার।

দেখ সেই পাঠশালা থেকে সুরু করে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত, (মানে শেষ অবধি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন দাছু) ক্লাসের সমস্ত পাজী লক্ষ্মীছাড়া ছেলেগুলো দাছুকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ক্লাসে উঠে গেছে। দাছু যে এক একটা ক্লাসে ছু'তিন বছর করে থেকে ধীরে সুস্থে ক্লাসে উঠতে ভালবাসেন, তা বোঝেনি। কাজেই দাছু বেচারাকে যত সব 'খোকা-খোকা' নতুন ছেলেদের সাথে পড়তে হয়েছে।

আরে বাবা। সবেতেই তাড়াহুড়ো করার দরকারটা কি ? মানুষতো আর ঝড় নয় যে, কেবল ছুটবে আর ছুটবে ? তা' সে সব কে বোঝে ? 'ফেল্ ফেল্' করে ফেলুদাছুকে একেবারে নাস্তানাবুদ করেছে সবাই। মাষ্টাররা আবার বলতে সুরু করলেন 'ফেলারামের বাবা ছেলের নামকরণের সময় বাড়তি একটা আকার দিয়েছেন দেখছি, আসলে নাম হবার কথা ফেল্‌রাম।'

তা' হলেই বোঝ ?

কোথা থেকে হাসি মুখ আর খুসি মন পাবেন ফেলু দাছু ? কেন, জগতে কি আর নাম ছিল না ? নাম না পাও অভিধান ছিল না ? বাংলা অভিধান ? তা থেকেই তো নাম পেতে। তা নয় মা বাপ হয়ে এই শত্তুরতাইটি করে রেখেছ ? সারাজীবন তো ওই 'ফেলা'র বোঝা ঘাড়ে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে দাছুকে ?

তবু চেয়েছিলেন ফেলু দাছু, হাসি খুসি মন মুখ নিয়ে কাটাতে।

শুনতে পাওয়া যায় নতুন বিয়ের পর মাঝে মাঝে হঠাৎ বিছ্যুৎ চমকানোর মত হাসি চমকাতো ফেলুদাছুর মুখে। ফেলু দিদিমার মুখেই শোনা। বিছ্যুতের চমক খেলতো, শ্বশুরবাড়ী থেকে যেদিন নেমন্তন্ন আসতো।

কর্সা ধুতি পাঞ্জাবী পরতেন সেদিন দাত্থ, চুলে 'নবাব পছন্দ' টেরি কাটতেন, গোঁফে 'বেগম বাহার' খোসবু মাখতেন, আরো কী কী যেন করতেন সব।

কিন্তু ?

হ্যাঁ, দুঃখের চরম রহস্য ওই 'কিন্তু'র মধ্যেই। কিন্তু নেমন্তন্নর পরের দিন ফেলুদাত্থ আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। মানে পারতেন না ঠিকই, তবে পারতেই হতো। অন্ততঃ দিনে পঁচিশবার পারতে হতো। ডাক্তার না ডাকা পর্যন্ত পেরেই চলতে হতো। আর ডাক্তার বলতো 'কী খেয়েছিলেন ?'

তা' হলেই বল, হাসার সুযোগ জীবনে পেলেন কখন ফেলুদাত্থ ? একদা ফেলুদাত্থর ছেলে মেয়ে দুটো নাকি ভাল করে পাশ করেছিল, ফেলুদাত্থর ইচ্ছে হয়েছিল খুসি মনে একটু হাসেন, কিন্তু হলনা।

কী করে হবে ? সঙ্গে সঙ্গে যত আত্মীয় স্বজন আর কুটুম্ব, বন্ধু আর পড়শী, তারস্বরে চেঁচাতে লাগল 'সন্দেশ চাই, সন্দেশ চাই।' সে একেবারে 'আমাদের দাবী মানতে হবে' গোছের ব্যাপার।

সেই এলাহি কাণ্ড লোককে সন্দেশ খাইয়ে ফেলু দাত্থর বাইশ দিন মাথা ধরে থাকল। কপালে টাইট করে রুমাল বেঁধে রেখে জন্মের শোধ কপালটায় একটা গর্তই হয়ে গেল। অতএব হাসতে পেলেন না ফেলুদাত্থ। ছেলে মেয়ের পাশ করার আহ্লাদে হাসতে পেলেন না।

'তা' এসব তো বড় বড় ব্যাপার, প্রতিনিয়ত ছোট ব্যাপারই কী কম ? এই যে ফেলুদাত্থ বাসে ট্রামে চড়তে গেলেই তিন ভুবনের লোক এসে সেই গাড়ীটাতেই ঠেলাঠেলি করে উঠতে চায়, ফেলু দাত্থ বাজারে গেলে, দোকানীগুলোই জিনিস পত্তরের ইয়া ইয়া দাম হাঁকে, ফেলুদাত্থ রেলগাড়ী চড়ে কোথাও যেতে গেলে ফেলুদাত্থকে না নিয়েই নাকের সামনে দিয়ে ট্রেনটা বোঁ বোঁ করে দৌড় দেয়, এসব কি উড়িয়ে দেবার মত ? না উড়িয়ে দেবার মত নয়। সারাজীবন এই সব অবিশ্বাস্য ঝামেলা পুড়িয়ে পুড়িয়ে মেরেছে তাঁকে।

তবু—

তবু প্রতি রাত্রে শোবার সময় সংকল্প করে শোন ফেলুদাত্থ, কাল থেকে—

কাল থেকে আর খাড়া গোঁফ নিয়ে বাড়ীসুদ্ধ লোককে তাড়া করে বেড়ানো নয়। কাল থেকে শুধু বাঁধানো দাঁতের হাসি।

হয় না !

হয়তো সক্কাল বেলাই কেউ 'এক চোখ' দেখিয়ে বসলো, হয়তো ঘুম ভেঙেই দেখলেন দোরের সামনে জুতো ওল্টানো, হয়তো অফিস বেরোবার কালে পাজী নাতি দুটো ছুঁচ ধোবা আর ঝাড়ুর নাম করে বসলো। হয়তো বা সারটা দিন যাহোক করে কেটেও সন্ধেটা হয়ে গেল গুবলেট।

বাড়ী ফিরেই চোখে পড়ল বাড়ীর সামনে কুলপিওলা জাঁকিয়ে বসেছে, নয়তো ফুচকাওলা তার

স্টক্ প্রায় শেষ করে ফেলেছে। এমন কি ফেলু দিদিমা আর তাঁর বৌমা পর্যন্ত সেই আসরে জমজমাট! এর পর থাকবে হাসি মুখ?

তবু তো অফিসের কথা বললাম না।

সেখানে সাহেব থেকে চাপরাশি পর্যন্ত ফেলুদাত্নর মেজাজের উপর আগুনের সেঁক মারছে।

তা হলে? কি করে সারাজীবনের সাধ মিটবে ফেলুদাত্নর।

মেটে না।

চিরকাল তাই মুখটা প্যাঁচা, নাকটা বোঁচা, আর গোঁফটা খোঁচা করে কাটাতে হচ্ছে ফেলুদাত্নকে।

তবু—

হ্যাঁ তবু ফেলুদাত্ন জীবনের চরম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কাল, আজ সারাদিন, ভোর থেকে রাত শুধু হাসবেন! হো হো হাসি, হাহা হাসি, ফিকফিক হাসি, ঝিকঝিক হাসি, মুচকি হাসি, ফচ্‌কে হাসি, বাঁকা হাসি, পাকা হাসি সব রকমের হাসি 'ট্রাই' করবেন।

কেন? জিগ্যেস করছো, আজই কেন?

কেন তা হলে বলি—

আজ ফেলুদাত্নর বড় আদরের নাতনী 'আহ্লাদী'র বিয়ে!

আহ্লাদীই যে দাত্নর আসল নাতনী। প্রাণের প্রাণ চোখের মণি। আরও ত্নটো নাতনী আছে ফেলুদাত্নর, গোটা ত্নত্তিন নাতি, ত্ন চক্ষের বিষ সেগুলো।

হতভাগারা হাঁটে যেন সেপাইয়ের ঘোড়া, ঘোরে যেন কলের লাট্টু, খায় যেন চড়াই পাখী, আর ঘুমোয় যেন, 'সর্ষে ফোড়ন।'

তার ওপর সব চেয়ে গা জ্বালানো আর হাড় পোড়ানে ব্যাপার হচ্ছে, পাজীরা ফি বছর ক্লাসে না উঠে ছাড়বে না। কেন ত্নটো বছর একটা ক্লাসে একটু সুস্থির হয়ে হয়ে বসা যায় না?

বসবে না!

অস্থিরের রাজা যে।

শুধু আহ্লাদী।

আহ্লাদীটি ফেলুদাত্নর একেবারে মনের মতনটি! আহ্লাদী হাঁটে আস্তে, ঘোরে আস্তে, খায় [illegible]তটি, ঘুমোয় অনেকটি। আর স্কুলে? ত্ন'তিন বছরের কমে এক একটি ক্লাস থেকে নড়ে না। ফেলুদাত্ন [illegible]ন্য নাতনীদের বলেন 'শিখতে পারিস না? দিদিকে দেখে শিখতে পারিস না? তা নয়। মেয়ে না [illegible]লিটারী! সব সময় দৌড়ঝাঁপ!'

তা সেই মনের মতন নাতনীটির আজ বিয়ে!

তাই ফেলুদাত্ন ঠিক করে রেখেছিলেন কিছুতেই আজ মেজাজ খারাপ করবেন না। সারারাত [illegible]রপোকা কামড়ালে না, সারারাত মশাদের গলায় আধুনিক গান শুনতে হলেও না। ঘুম থেকে উঠে [illegible]চ ধোবা চটি উল্টোনো ইত্যাদি যত কিছু যাচ্ছেতাই হলেও না। আজ সব হজম করবেন।

আজ শুধু আহ্লাদীর কত সব গহনা শাড়ী হল তা দেখবেন, কত লোকজন এল তা' দেখবেন, কত কী রান্না হচ্ছে তা দেখবেন, কেমন খাসা বরটি হল তা দেখবেন, আর লোককে দেখাবেন, ফেলুদাত্বও পারেন পুরো একটা আস্ত দিন শুধু হাসতে, শুধু আহ্লাদে ভাসতে, শুধু সব্বাইকে ভালবাসতে।

গতকাল বলেও রেখেছিলেন সবাইকে, 'দয়া করে কালকের দিনটা অন্ততঃ আমার একটু মেজাজ ঠিক করে থাকতে দিও তোমরা। জীবনে একটা দিন।'

ছোট নাতিটা বলেছিল, 'দাত্ব কী কী করবো আমরা আর কী কী করব না, একটু লিস্ট্ করে দাওনা বরং—'

ফাজিল সেই ছেলেটাকে মারতে উঠেছিলেন দাত্ব। উঃ ওই ছেলেটা স্রেফ্ একটা বিচ্ছু। পালালো, এমন হাসতে হাসতে যে ফেলুদাত্বর ইচ্ছে হল—

নাঃ কী যে ইচ্ছে হ'ল তা নিজেই জানেন না ফেলুদাত্ব।

অতঃপর ফেলুদিদিমাকেই কড়া করে শাসিয়ে রেখেছিলেন ফেলুদাত্ব। 'নজর রেখো, বুঝলে একটু নজর রেখো চারদিকে। আমার আহ্লাদীর বিয়ে কাল, কালকেও যেন আমাকে চেঁচাতে না হয়।'

ফেলুদিদিমা অবশ্য বলেছিলেন, 'চেঁচানো তোমার সাধ!'

কিন্তু সেটা দাত্বর সামনে নয়, আড়ালে। তবু জনে জনে ধরে ধরে বলেও রেখেছিলেন তিনি, 'দাত্ব যা পছন্দ করেন না, তা তোরা করিসনা বাপু।'

অবিশ্যি তা শুনে দিদিমার বৌমা বলেছিলেন, 'তা হলে কাল সমস্ত সংসারটাকে রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়। নইলে—মানে জেগে থাকলেই তো নড়বে মানুষ। আর আমরা নড়লেই বাবার মেজাজ চড়বে।'

কিন্তু সেও আড়ালে।

শ্বাশুড়ীর সামনে নয়।

মোটের মাথায় ফেলুদাত্ব আশা করেছিলেন একটা দিন তিনি পাবেন।

কিন্তু হল না।

ঘুম ভেঙে উঠে চটিতে পা গলাতে গিয়েই পায়ের নীচে একটি শব্দ 'পুট।'

চটাস করে চটিটাকে আছড়ে পা থেকে ছাড়ালেন ফেলুদাত্ব, আর দেখলেন যা ভেবেছেন তাই! চটির মধ্যে চটকে পড়ে আছে একটি আরশোলা।

সক্কালবেলা জীব হত্যা! এই শুভদিনে।

এরপরেও মেজাজ ভাল থাকবে, এটা তো আর আশা করা যায় না? দাত্বর মেজাজটাতো আর সত্যি আইসক্রীম দিয়ে তৈরি নয়?

অতএব যা করতে চাননি দাত্ব, তাই করলেন, বাঘের হুঙ্কারে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এটা কী? এটা কী হল?'

সর্বনাশ করেছে!

বাড়ী সুদ্ধু লোক একেবারে বাজে পোড়া তালগাছের মত স্থির নিথর কাঠ! তারাও ভাবল, হল কি!

না, দাদুর দরজায় যাবার সাহস হয় না কারুর, শুধু এ ওর মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কতক্ষণ না যাবে?

দাদু কী থেমে আছেন ?

দাদু চেঁচাচ্ছেন, 'একটা দিনও হ'ল না ? মাত্তর একটা দিন তোমরা আমার সঙ্গে একটু কম শয়তানী খেলতে পারলে না ? বাড়ীতে আর কারো চটি ছিল না ? চটি নিউকাট গ্রীসিয়ান, ডার্বি সু কাব্‌লি হাওয়াই কী নেই বাড়ীতে ? তাদের মধ্যে আরশোলা রাখা যেত না ? একটা কেন, একশোটাই রাখতে পারতে। এই হতভাগা গরীবের ছেঁড়া চটিটাই আরশোলা রাখবার পক্ষে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা বলে মনে হ'ল তোমাদের ?'

'আরশোলা আবার রাখবে কে ?'

ফেলুদিদিমা আর থাকতে পারলেন না, বলেই ফেললেন কথাটা। 'খুব একটা দামী জিনিস নাকি ? তাই লোকে যত্ন করে তুলে রাখতে যাবে ?'

'রাখতে যাবে না ! বলি রাখতে যাবে না তো এলো কোথা থেকে ?'

ছোট নাতি বলে ওঠে, 'এমনিই ছিল বোধ হয় দাদু। থাকে তো জুতোর মধ্যে।'

'থাকে ! থাকে !' ফেলুদাদু খাড়া গোঁফ আরো খাড়া করে তাড়া করে আসেন, 'ইয়ার ছোক্‌রা, খুব যে কথা শিখেছ দেখছি ! জুতোর মধ্যে থাকে ! সিঙাড়ার মধ্যে আলু থাকে জানি, কচুরীর মধ্যে ডালবাটা, চপের মধ্যে মাংস থাকার নিয়মও জানি, পুলির মধ্যে নারকেল, কিন্তু কই, এতখানি বয়সে জুতোর মধ্যে আরশোলা থাকার কথা তো শুনিনি কখনো, ওটাই বুঝি তাহলে তোমাদের লেটেস্ট্‌ ফ্যাসান ?'

ফেলুদিদিমা বলেন, 'যত সব অনাছিষ্টি কথা ! তুচ্ছ কারণে—'

'তুচ্ছ কারণ ! সকালবেলা পায়ের নীচে একটা জীবহত্যে—'

জীবহত্যে !

হঠাৎ খুকখুক করে একটা হাসির শব্দ ওঠে। হাসি ! দাদুর রাগের সময় হাসি !

'কে রে ! কে হাসছে !'

'দাদু আমি !'

ঘুমভাঙা চোখ নিয়ে আহ্লাদী দুলে দুলে হাসছে।

'তুমি !'

দাদু গম্ভীরভাবে বলেন, 'কেন তুমি হঠাৎ হাসছ কেন ?'

'জীবহত্যে শুনে দাদু ! ওটা তো প্লাস্টিকের আরশোলা !'

প্লাস্টিকের !

প্লাস্টিকের !

প্লাস্টিকের !

ফেলু দিদিমা থেকে সুরু করে তাঁর ছেলে বৌ নাতি নাতনী ঠাকুর চাকর নাপিত পুরুত সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, 'প্লাস্টিকের !'

'হ্যাঁ গো !'

আহ্লাদী আবার খুকখুকিয়ে হেসে ওঠে, 'দেখনা ! ভাল করে না দেখেই তুমি একেবারে—'

'আমি একেবারে !'

'হ্যাঁ গো। দেখ না, পায়ের তলা দেখ।'

ফেলুদাদু এতক্ষণে অনুভব করেন পায়ের তলাটা তাঁর বেমালুম পরিষ্কার। শুধু ওই 'পুট' শব্দটাই মাথার মধ্যে খট্ করে গিয়ে ! আশ্চয্যি অবিকল আরশোলার মত ফেটেও গেছে চৌচীর হয়ে।

ফেলুদাদুর মুখের চেহারা ভিমরুলের চাকের মত হয়ে ওঠে। মাথার চুল হরি সংকীর্তন সুরু করে দেয়, আর খাড়া গোঁফ নিজে তেড়ে এসে তাড়া দেয়, আর কাউকে নয়, বড় আদরের আহ্লাদীর দিকেই।

'বলি, কে করেছিল ? কে এই ইয়ার্কিটি করেছিল ?'

আহ্লাদী ফিক্ করে হেসে বলে, 'আমি গো-দাদু ! তুমি কাল বললে আমার বিয়ের দিন তুমি সকাল থেকে খালি হাসবে। তাই তোমাকে হাসাবার জন্যে—'

হাসাবার জন্যে !

দাদু চেঁচিয়ে উঠে বলেন, 'হাসাবার জন্যে না ফাঁসাবার জন্যে ! বাড়ীতে এই একটা মাত্তর মেয়েই ভাল ছিল, সেটাও বিয়ের নামে গোল্লায় যেতে বসলো ! গিন্নী ! বলে পাঠাও বরের বাড়ীতে, বিয়ে হবে না !

বিয়ে হবে না !

না !

'তা'হলে এই সব নাপিত পুরুত—'

'চলে যেতে বল !'

'মাছ মিষ্টি দই ক্ষীর—'

'দোকানে ফেরৎ দাও !'

'নেমন্তন্নীদের ?'

'ভাগাবে !'

হঠাৎ আহ্লাদী ডুকরে ওঠে। 'দাদু জীবনে একবার মাত্র একটা বিয়ে হচ্ছিল—'

ফেলুদাদু তাঁর আদরের আহ্লাদীর কান্নাতেও বিচলিত হন না। বজ্র হুঙ্কার পাড়েন, 'হ্যাঁ আমিও জীবনে একটা দিন মাত্র একটু হাসতে চেয়েছিলাম !'

'তা তুমি না রেগে হাসলেই তো পারতে।'

'না রেগে হাসতে পারতাম ?'

'কেন পারতেনা ? ইচ্ছে করলেই তো হাসা যায়।' হাসিটা তো নিজেরই হাতে। হাসতে তো আর পয়সা লাগে না।'

হঠাৎ ফেলুদাদু থমকে যান।

২

অবাক অবাক চোখে তাকান।

তারপর বলে ওঠেন, ‘কী বললি! ইচ্ছে করলেই হাসা যায়? রাগের বদলে হাসলে চলে? হাসিটা নিজের হাতে? ও গিন্নী এ মেয়েটা বলে কী! কই একথা তো কোনদিন ভেবে দেখিনি, হাসিটা নিজের হাতে। হা হা হা, হা হা হা! তাই তো— সত্যিই তো হাঃ হাঃ হা! হাসতে তো পয়সাও লাগেনা। এক পয়সাও না। হা হাঃ হাঃ!’

আর এই নিজের হাতের জিনিসটা আমি এতদিন পরের হাতে ভেবে—হাঃ হাঃ হা।’

বয়স হলো ষাট
তা বলে কি ছাড়তে পারি
টেনিস খেলার মাঠ !

বিকেল হলেই জুটি
কমবয়সী খেলার সাথী
দেয় না আমায়

আধ ঘণ্টা ব্যাপী
বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
আমার লাফালাফি ।

হয় না যে বিশ্বাস
এমনি করে কেটে গেল
বছর পঞ্চাশ ।
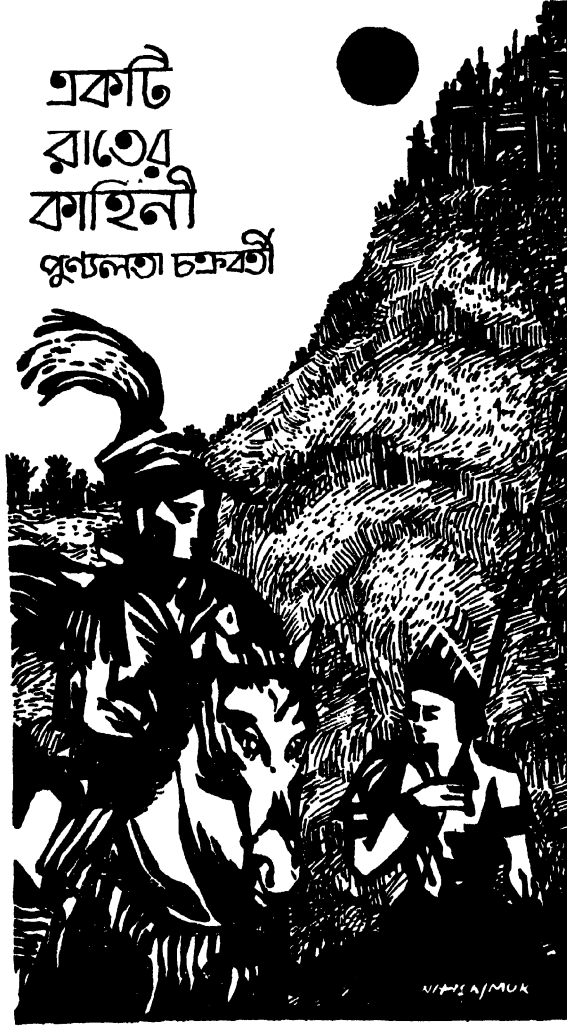
(আয়র্ল্যাণ্ড দেশের রূপকথা)

সে অনেক অনেক দিন আগেকার কথা—একদল আইরীশ্ পদাতিক সৈন্য ডাবলিন্ সহর থেকে মার্চ্ করে যাচ্ছিল কর্ক্ সহরে। পথে ফার্ময় নামে একটা গ্রামের কাছে এসে সন্ধ্যা হয়ে গেল, সৈনিকরাও খুব ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, গ্রামে পৌঁছিয়েই তাদের সার্জেণ্ট্ সেখানকার বিলেট্-মাস্টারের খোঁজ করল।

বিলেট্মাস্টারের কাজ হ'ল, কোনও সৈন্যদল গ্রামে এলে তাদের থাকার আর খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া; তাড়াতাড়ি সে সব ব্যবস্থা করে দিল—অফিসারদের জায়গা দিল সরাইখানায়, আর

সৈনিকদের ভাগে ভাগে দুচারজন করে গ্রামের লোকদের বাড়িতে রাখল। গ্রামের লোকেরা প্রায় সকলেই গরীব মানুষ, ভাল খাবার আর নরম বিছানা তারা কোথায় পাবে ? তাদের সম্বলের মধ্যে ছিল আলুপোড়া—তাই যত্ন করে সৈন্যদের খেতে দিল, আর ঘরের মেঝেতে খড় বিছিয়ে তাদের শুতে দিল।

একে একে সকলের ব্যবস্থা হয়ে গেল, শুধু একজন ছাড়া—নেডক্লীন্ বলে একটি সৈনিক অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ঘরের কোণে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কেউ তাকে দেখতে পায় নি! হঠাৎ চম্‌কিয়ে নেডের ঘুম ভেঙ্গে গেল, ধড়মড়িয়ে উঠে সে বিলেট্‌মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করল, "মশাই, আশা করি আমার জন্যও একটা ভাল জায়গা ঠিক্ হয়েছে ?"

ভালমন্দ কোনো জায়গাই যে আর খালি নেই, বিলেট্‌মাস্টার সেকথা ভাল করেই জানে, তবু সে চালাকি করে বলল "হাঁ, হাঁ, আছে বৈ কি! তোমাকে জায়গা দিয়েছি থিয়ার্ন্ পাহাড়ের মিস্টার ব্যারীর বাড়িতে—এ অঞ্চলের মধ্যে সেটাই হ'চ্ছে সব চেয়ে ভাল বাড়ি।" শুনে তো নেড্ মহা খুসী হয়ে মিস্টার ব্যারীর সন্ধানে চল্‌ল, আর বিলেট্‌মাস্টার নিজের চেয়ারে বসে হো-হো করে খুব একচোট হেসে নিল—আরে, মিস্টার ব্যারী কি আর আজকের লোক? সেকালের সেই পুরানো আয়র্ল্যাণ্ডের তিনি ছিলেন একজন জাঁদরেল সর্দার—কয়েকশো বছর আগেই তিনি মারা গিয়েছেন, থিয়ার্ন্ পাহাড়ের উপরে তাঁর সেই প্রাসাদ এখন একটা ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে।

নেড্ বেচারা শ্রান্তদেহে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির খোঁজে চলেছে, পথে একজন গ্রামবাসীকে দেখে জিজ্ঞাসা করল "থিয়ার্ন্ পাহাড়ের মিস্টার ব্যারীর বাড়িটা কোথায় বলতে পারো ভাই? সেইখানে আজ আমার রাত কাটাবার ব্যবস্থা হয়েছে।"

লোকটি একটু অবাক হয়ে বললো "হ্যাঁ, বলতে পারি বৈ কি—ঐ যে উঁচু পাহাড়টা দেখছো, ওটাই হ'ল থিয়ার্ন্ পাহাড় ওরই চূড়োয়, মিস্টার ব্যারীর বাড়ি—কিন্তু সেখানে তো কোনও সৈনিকের রাত কাটাবার ব্যবস্থা হ'তে কোনো দিন শুনিনি—এই প্রথম শুনলাম!"

লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে নেড্ পাহাড়ের দিকে রওনা হ'ল; কিন্তু কাছে গিয়েই তো তার চক্ষুস্থির—উপরে উঠবার রাস্তাটি যেমনি খাড়া তেম্‌নিই এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো! কি আর করবে? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত শরীরটাকে জোর করে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে সে উঠছে, হঠাৎ পিছনে খটাখট খটাখট্ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল—ঘাড় ফিরিয়ে দেখল যে, বিশাল দেহ একটি লোক প্রকাণ্ড একটা ছেয়ে রঙের ঘোড়া ছুটিয়ে সেইদিকে আসছে।

কাছে এসে, ঘোড়া থামিয়ে লোকটি জিজ্ঞাসা করল "কে হে তুমি? কোথায় যাচ্ছ?"

নেড বলল, "আমি থিয়ার্ন পাহাড়ের মিস্টার ব্যারীর বাড়ির খোঁজে যাচ্ছি।"

'তাই নাকি? তা' দেখা হয়ে ভালই হ'ল—আমিই থিয়ার্ন পাহাড়ের ব্যারী।" "মশাই, গ্রামের বিলেট্‌মাস্টার আজ আপনার বাড়িতেই আমার রাত কাটাবার ব্যবস্থা করেছেন।" "বিলেট্‌মাস্টার? ওহো, তাকে তো খুব চিনি—গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ভাল গরু আছে তার। ক্যারিকাব্রিক্‌এর মাঠে সেগুলো থাকে। আচ্ছা, বেশ! চলো আমার সঙ্গে খুব যত্ন করেই তোমাকে রাখবো।'

খাড়া পাহাড়ের রাস্তায় বিশাল দেহ লোকটি ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, তার পিছনে নেড কোনোমতে আঁকৃড়িয়ে পাকৃড়িয়ে উঠছে আর ভাবছে, "বাপ্‌রে! লোকটা কি মানুষ, না দৈত্য?" পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে দেখল—মস্ত এক চমৎকার তিনতলা বাড়ি, তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যই যেন তার সমস্ত জানালা দরজা খোলা—ঘরে ঘরে আলো ঝল্‌মল করছে। ভিতরে গিয়ে সে কী আরাম! জীবনে কখনও নেড্‌ তেমন আরাম পায়নি; তারপর, সে কী বিরাট ভোজ! বিশেষ করে গো-মাংসের রোস্টটি যা হয়েছিল, তেমন মোলায়েম সুস্বাদু রোস্ট্‌ সে জীবনে কখনও খায়নি! ক্ষিদেও পেয়েছিল তেমনি! প্রাণভরে পেটপুরে খেয়ে নিল, চিম্‌নীর পাশে বসে ক্লান্ত শরীরটাকে জিরিয়ে তাজা করে নিল, তারপর মিস্টার ব্যারী তাকে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গেলেন—চমৎকার সাজানো শোবার ঘর, খাটের উপরে ধবধবে নরম পালকের বিছানা। মিস্টার ব্যারী তার হাতে একটা চক্‌চকে কালো চামড়া দিয়ে বললেন, 'আজ রাত্রে যে গরুটার মাংস রোস্ট্‌ খেলে, এটা তারই চামড়া। কাল সকালে তুমি এটা নিয়ে গিয়ে বিলেট্‌মাস্টারের হাতে দিয়ো .আর বলো যে, থিয়ার্ন পাহাড়ের মিস্টার ব্যারী এটা তাকে উপহার দিয়েছেন। আচ্ছা এখন গুড্‌ নাইট্‌! এবার বেশ করে ঘুমোও!" তারপর, সেই নরম বিছানায় শোবামাত্র, আঃ, কী আরাম! মুহূর্তের মধ্যে নেড্‌ গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে গেল।

সে ঘুম তার ভাঙ্‌ল পরদিন সকালে, চোখেমুখে রোদের ঝলক্‌ লেগে; অবাক হয়ে নেড্‌ চারদিকে চেয়ে দেখল—কোথায় গেল সেই সাজানো তিনতলা বাড়ি, সেই নরম বিছানা, আর সেই বিরাট-বপু ব্যারীমশাই? নীল আকাশের নীচে, খোলা পাহাড়ের গায়ে, ঘাসের উপর সে শুয়ে আছে, কোথায় যেন স্কাইলার্কপাখি গান গাইছে, আর কানের কাছে একটা মৌমাছি গুন্‌গুনিয়ে বেড়াচ্ছে—আশেপাশে পড়ে আছে ভাঙা পাথরের স্তূপ্‌! তবে কি সবই সে স্বপ্ন দেখেছিল? কিন্তু, এই তো তার হাতের কাছে পড়ে আছে মিস্টার ব্যারীর দেওয়া সেই চিকন কালো চাম্‌ড়াটা—এটা তবে কোত্থেকে এল? বেচারা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না, তবু, মিস্টার ব্যারীর কথামত চামড়াটা তো বিলেটমাস্টারের হাতে দিতে হবে? পাহাড় থেকে নেমে সে সোজা বিলেটমাস্টারের বাড়ির দিকে চল্‌ল।

দূর থেকে নেডকে আসতে দেখেই বিলেটমাস্টার মনে মনে হাসলো—ভাবলো, "কেমন জব্দ করেছি বোকাটাকে।"

নেড ঘরে ঢুকতেই, মুচকি হেসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কিহে, কি খবর? বলি, থিয়ার্ন পাহাড়ে রাতটা কেমন কাটলো?"

"ওহ, চমৎকার। আপনি ঠিকই বলেছিলেন মশাই, অমন ভাল বিলেট আর এ অঞ্চলে দুটি নাই। আর স্বয়ং মিস্টার ব্যারী আপনাকে কি উপহার পাঠিয়েছেন, দেখুন।" চক্‌চকে কালোর উপরে গোল গোল সাদা দুটি ফুটকি কাটা সেই চামড়াটা নেড তাঁর হাতে দিল—বিলেট মাস্টার তো অবাক!

ঠিক সেই মুহূর্তেই বিলেটমাস্টারের রাখাল ছেলেটা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল—"পালের মধ্যে সব

চেয়ে সেরা সেই কালো গাইটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।" ঘরে ঢুকে মনিবের হাতে সেই কালো চামড়াটা দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠলো "আরে, এই তো তারই চামড়া! কালোর মধ্যে ঐ ছুটো সাদা ফুটকি, এ যে আমার আজন্মের চেনা; এ কী করে হ'ল?"

কী করে হ'ল বিলেটমাস্টারের আর বুঝতে বাকি রইল না। নিরীহ পথশ্রান্ত মানুষকে কষ্ট দিয়ে আমোদ করার জন্য থিয়ার্নপাহাড়ের মিস্টার ব্যারীই তাকে এই সাজা দিয়েছেন। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল যে, আর কখনও এমন কাজ করবে না।

ওদিকে নেড আর তার দলের সৈন্যরা সকালে আবার মার্চ করে কর্ক সহরের দিকে চলল—কবেই তো তারা সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। আর, যদি না পৌঁছে থাকে, তবে কে জানে, হয়তো এখনও তারা মার্চ করে চলছে তো চলছেই!

আজগুবিপুরের রাজা গপ্পিদাসের নাম তোমরা শুনেছ কি? তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার আর বুদ্ধির কথা যদি শোন ত হাঁ করে থাকবে। তিনি নিজেই সে সব কথা বলেন। আর যত মোসাহেবের দল অবাক হয়ে শোনে। মাঝে মাঝে একটু অবিশ্বাসও হয়। কিন্তু, কেউ আর সে কথা খুলে বলতে সাহস পায় না।

একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর রাজামশাই তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেন; চারদিকে মোসাহেবের দল ঘিরে বসল। এক চিমটি নস্যি নাকের ভিতর দিয়ে কসে নিশ্বাস টানলেন আর হ্যাঁ—চো—করে এক ভীষণ হাঁচি বের হলো। তারপর গল্প সুরু হল :—

"হাঁ! তাহলে তোমরা আমার ছেলেবেলার কথা শুনবেই দেখছি। আচ্ছা, দুচারটে গল্প তাহলে বলাই যাক।"

একদিন সন্ধ্যার সময়ে ঘোড়া চড়ে বাড়ি ফিরছি, এমন সময়ে দেখি সামনেই এক প্রকাণ্ড কাদার নালা। হঠাৎ আমার মনে হলো যে কয়েকদিন আগে ঐ নালার উপর দিয়ে গিয়েছিলাম, তখন একটা সাঁকো ছিল তার উপর। সম্প্রতি ঝড়ে সেই সাঁকোটা ভেঙে গেছে।

ঘোড়াকে লাফিয়ে নালাটা পার হতে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই; কাজেই তাকে লাফ দেওয়ালাম। শূন্যে উঠতেই দেখি যে, লাফটা তত জোরে দেওয়া হয় নি; হয়ত নালার মধ্যেই পড়ে' যেতে পারি। অমনি বুদ্ধি করে' ঘোড়ার মুখ বোঁ করে ঘুরিয়ে দিলাম; আর ঠিক যেখান থেকে লাফ দিয়েছিল, সেখানেই এসে থামলাম। তার পর ঘোড়াটাকে কয়েক পা পিছনে নিয়ে গেলাম। যাতে এবার দৌড়ে এসে লাফ দিতে পারে।

এবারেও লাফটা ঠিক আন্দাজ মত হয় নি; কিন্তু আমি আগে থেকে সেটা ঠাওরাতে পারি নি; তাই ঘোড়া শুদ্ধ আমি কাদার মধ্যে গিয়ে পড়লাম। ওঃ, সে কি কাদা! ডুবতে ডুবতে একেবারে আমার কোমর পর্যন্ত আর ঘোড়ার গলা পর্যন্ত সব ডুবে গেল। আমি দেখলাম সর্বনাশ উপস্থিত! যা করবার এখনই করতে হয়। ঘোড়াটাকে পা দিয়ে আচ্ছা করে চেপে ধরে, নিজের টিকি ধরে এইসা টান দিলাম যে, আমি শুদ্ধ ঘোড়া কাদা থেকে উঠে এল। তারপর ঘোড়া একলাফে কাদা পার হয়ে গেল।

আরেকদিন শিকারে বেরিয়ে একটা চমৎকার শেয়াল দেখতে পেলাম। তার গায়ের চামড়া-খানা ঠিক মখমলের মতন নরম আর সোনালী রঙের। লেজটা নরম লম্বা লোমে ঢাকা। এমন সুন্দর জন্তুর চামড়াখানা আস্ত পেতে বড় লোভ হলো। কিন্তু, গুলি করলেই চামড়া ফুটো হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, তাই ভাবতে লাগলাম কি করা যায়! আস্তে আস্তে ঘোড়া থেকে নেমে, একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। সঙ্গে একটা পেরেক ছিল, গুলির বদলে সেটাকেই বন্দুকে ভরে নিলাম।

তারপরে শেয়ালের লেজ লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়তেই শেয়ালভায়া একদম আটকা পড়ে গেলেন; পেরেকটা শেয়ালের লেজকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে গেঁথে দিল। তখন আমার বড় মজা; আমি করলাম কি, শেয়ালের মুখের চামড়াটা ছুরি দিয়ে চিরে দিলাম, আর কসে চাবুক লাগালাম তাকে। তাড়াতাড়িতে শেয়ালভায়া চামড়ার ভেতর থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে দে দৌড়!—চামড়া রইল গাছে আটকে। তখন মজা করে আস্ত চামড়া নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

আরেকদিন শিকারে বেরিয়ে একটা প্রকাণ্ড শিংওয়ালা হরিণ দেখতে পেলাম। তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে থলে থেকে গুলি বের করতে গিয়ে দেখি যে, একটাও গুলি নাই সঙ্গে। বড় দুঃখ হল তখন, এমন হরিণটাকে মারা গেল না! সঙ্গে যদি ছোট দু-এক টুকরো পাথরও থাকত, তাহলে তাই দিয়েই গুলি করতাম হরিণকে। যাহোক, সকাল থেকে যে সের দু'এক কুল খেয়েছিলাম, তারই

ক'টা বিচি ছিল সঙ্গে ; অগত্যা তাই দিয়েই গুলি করলাম। হরিণ তো শিঙের মাঝখানে গুলি খেয়ে একটিবার মাথা নাড়ল ; তারপর সটান ছুটে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। এরপর থেকে সকলেই আমাকে ঠাট্টা করত ; কেউ যদি কুল খেত, তাহলে তার বিচিগুলো আমাকে দিয়ে বলতো 'ভাই, এগুলো দিয়ে হরিণ মেরো।' আমি কেবল মাথা হেঁট করে সব শুনতাম।

কিছুদিন বাদে একবার শিকার করতে গিয়ে দেখি এক প্রকাণ্ড হরিণ চলেছে, তার দুই শিঙের মাঝখানে এক মস্ত কুলগাছ জন্মিয়েছে। দেখেই বুঝলাম, এ সেই হরিণ, যাকে কুলের বিচি দিয়ে গুলি করেছিলাম। সেই বিচি শিঙের মধ্যে থেকে এতদিন প্রকাণ্ড গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমনি আর যাবে কোথায় ? এক গুলিতে হরিণটাকে মারলাম। তাতে হরিণও পেলাম, কুলও পেলাম, কারণ কুলগাছটা ভরা চমৎকার পাকা কুল ছিল।

(কবিতা)

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

কেঁদোবাঘের বয়স হ'ল শুনছি যাবে কাশী
ঘর-দোর তার সামলাবে কে ?—এল বেড়াল মাসী।
মাসী আছে, মেসো আছে, নামটি যাহার হুলো,
বললে, "বাপু তীর্থে যাবে, হিংসে আগে ভুলো।"
কেঁদো বলে, "সেটা কি আর এমন কঠিন কাজ,
তিলক কেটে জপছি মালা—ভক্ত আমি আজ
হিংসে কভু করবো না আর তোমরা যতই বলো,"
পাপের কথা শুনলে কেঁদোর নয়ন ছলোছলো।
মাসী বলে, "আহা বাছার দেখছ কেমন ক্ষোভ,
ধর্মে মতি হ'লে কি আর ছাড়তে নারে লোভ ?"
ভাবলে হুলো বাঘের ছেলের হিংসে কোথায় যাবে,
তীর্থে গেলে হয়ত সেথায় মানুষ ধরেই খাবে।
বললে সে তাই ফন্দী এঁটে—"খবর আছে জানা
পুবের বনে দেখে এলাম অনেক হরিণ ছানা ;
হৃষ্ট এবং পুষ্ট যেমন, তেমনি চিকণ দেহ
পালিয়ে ওরা যায় না ছুটে করলে তাড়া কেহ।
শুনেই কেঁদোর জিভ্‌টি বেয়ে ঝরতে থাকে জল,
কচি ছানার মাংস আহা !—মন হ'ল চঞ্চল।
বললে, "মেসো, বলছ যখন, দেখেই তবে আসি
আত্ম রেখেই ধর্ম হবে,—নাইবা গেলাম কাশী।"

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক ঃ—

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধে, অবরুদ্ধ রিচমণ্ড সহরে পাঁচটি অসমসাহসী ব্যক্তি আটকা পড়িয়াছিলেন ; তাঁহারা হইলেন, অসাধারণ বুদ্ধিমান ও কার্যক্ষম এঞ্জিনিয়ার ক্যাপটেন সাইরাস্ হার্ডিং ও তাঁহার প্রভুভক্ত ভৃত্য নেব্, বিখাত সাংবাদিক গিডিয়ন স্পিলেট, সুদক্ষ নাবিক পেনক্রফ্‌ট এবং তাঁহার প্রাক্তন প্রভুপুত্র পিতৃমাতৃহীন হারবার্ট। এক ঝড়ের রাত্রে তাঁহারা পাঁচজন (হার্ডিংএর প্রিয় কুকুর টপ্‌কে লইয়া) বেলুনে চড়িয়া পলায়নের চেষ্টা করেন। প্রচণ্ড ঝটিকায় বেলুনটিকে অনির্দিষ্ট পথে কয়েকদিন উড়াইয়া লইবার পরে তাঁহাদের মধ্যে চারিজন একবস্ত্রে ও শূন্যহস্তে এক নির্জন দ্বীপে অবতরণ করিলেন কিন্তু ক্যাপটেন হার্ডিং বা টপের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। দ্বীপটির পশ্চিমে, একটি প্রণালীর অপর পারে এক বৃহৎ ভূখণ্ড দেখা গেল কিন্তু তাহাও আর একটি দ্বীপ না কোনও মহাদেশের অংশ সেকথা বুঝিবার কোনও উপায় ছিল না। প্রণালী পার হইয়া স্পিলেট ও নেব্ হার্ডিংকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। পেনক্রফ্‌ট এবং হার্বাট, বালি ও কাঠের সাহায্যে গ্রেনাইট পাথরের একটি 'চিমনী' অথবা স্তূপকে বাসোপযোগী করিয়া লইলেন, কিন্তু দিয়াশলাইয়ের অভাবে আগুন জ্বালিতে পারিলেন না। ৮ মাইল দূর পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও হার্ডিংএর সন্ধান না পাইয়া স্পিলেট ও নেব ফিরিয়া আসিলেন। স্পিলেটের পকেটে একটি মাত্র দিয়াশলাই কাঠি পাওয়া গেল। অতি সন্তর্পণে হার্বাট তাই দিয়া আগুন জ্বালিল। পোড়ান বন্য পাখীর ডিম খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া অন্য সকলে নিদ্রার চেষ্টা দেখিলেন। কিন্তু বেচারি নেব সারারাত্রি চীৎকার করিয়া তাহার প্রভুকে ডাকিতে ডাকিতে সমুদ্রতীরেই ঘুরিয়া বেড়াইল।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বীপে পরিত্যক্ত যাত্রীদের নিকট জিনিসপত্র কি কি ছিল? কিছুই না—পরিধানের পোষাক ভিন্ন কোন অস্ত্র বা কোন রকম যন্ত্রপাতি কিছুই ছিল না। এমন কি একটা ছুরি পর্যন্ত কাহারও নিকট ছিল না। বেলুনটাকে হালকা করিবার জন্য, যাহা কিছু জিনিসপত্র সমস্তই জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জিনিসের মধ্যে গিডিয়ন স্পিলেটের নিকট ছিল দুটি জিনিস—তাঁহার নোটবুক এবং তাঁহার ঘড়িটি। এই দুই জিনিস যে তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নহে—কেমন করিয়া জানি রহিয়া গিয়াছে। এখন এই শূন্যতার মধ্য হইতেই তাঁহাদিগকে সমস্ত দরকারী জিনিস করিয়া লইতে হইবে।

এই সময় সাইরাস্ হার্ডিং উপস্থিত থাকিলে, তাঁহার যেমন আশ্চর্য বুদ্ধি এবং আবিষ্কারের মাথা, তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমে সমস্ত দরকারী জিনিসের ব্যবস্থা করিয়া লইতেন। কিন্তু—হায়! হার্ডিংকে পুনরায় দেখিতে পাইবার আশা খুবই কম। এখন ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করা ভিন্ন পরিত্যক্ত যাত্রীদলের আর গতি নাই।

এখন কথা হইল এই, যে দ্বীপের এই অংশেই কি পরিত্যক্তদল স্থায়ীভাবে বাস করিবে? এই স্থান কোন মহাদেশের অংশ, এখানে মানুষের বসতি আছে কিনা, এসব বিষয়ের কোন সন্ধান লইবে না কি? ইহা অতিশয় কঠিন সমস্যা, যত শীঘ্র সম্ভব এই বিষয়ের মীমাংসা হওয়া দরকার। যাহা হউক, পেন্‌ক্রফ্‌টের পরামর্শে স্থির হইল, যে সম্প্রতি তাহারা আরও কিছুদিন চিমনীতে বাস করিয়া, পরে সন্ধানের কাজে লাগিবে। এই সন্ধান কার্যে শরীরে বল থাকা নিতান্তই দরকার, সুতরাং পাখীর ডিম এবং শামুক ঝিনুক খাদ্যে চলিবে না—অন্য কিছু বলাধান খাদ্যের প্রয়োজন।

বাস করিবার পক্ষে চিম্‌নী আশ্রয়টি বেশ ভালই হইয়াছে। আগুন জ্বলিয়াছে, সে আগুন সজীব রাখা মুস্কিল হইবে না। সমুদ্রের ধারে এবং পাহাড় পর্বতে ঝিনুক ও পাখীর ডিম যথেষ্ট। শত সহস্র পাখী পাহাড়ের উপর উড়িয়া বেড়ায় লাঠির আঘাতে কিংবা পাথর ছুড়িয়া সহজেই উহাদিগকে মারিতে পারা যাইবে। নিকটেই বনে অনেক গাছ আছে, তাহাদের ফল সুখাদ্য হইতে পারে, আর জলের ত অভাবই নাই, চিমনীর নিকটেই মিষ্ট পানীয় জল বর্তমান। সুতরাং স্থির হইল, যে, কিছুদিন চিমনীতে বাস করিয়া, পরে তাহারা দ্বীপের তথ্য সংগ্রহ করিবে। এই ব্যবস্থায় নেব খুব সন্তুষ্ট হইল। তাহার প্রভু দ্বীপের যেস্থানে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, সে স্থানটি সহসা ছাড়িয়া যাইতে নেবের মন মানিবে কেন? সাইরাস্ হার্ডিং জন্মের মত চলিয়া গিয়াছেন, একথা নেব কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। প্রভুর মৃতদেহ শুধু চক্ষে দেখা নয়, হাত দিয়া স্পর্শ না করা পর্যন্ত নেব কিছুতেই মানিবে না যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সেইদিন, ২৬শে মার্চ, প্রাতঃকালেই নেব আবার সমুদ্রতীর দিয়া উত্তরদিকে চলিল। যেখানে সম্ভবতঃ চিরকালের জন্য হার্ডিংএর সমাধি হইয়াছে—সেই স্থানটিতে গিয়াই উপস্থিত হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট প্রভৃতি অন্য সকলে পায়রার ডিম এবং ঝিনুক দ্বারাই সকাল বেলার আহার শেষ করিল। পাথরের ফাটলে সমুদ্রের জল শুকাইয়া নুন হইয়াছিল, সেই নুন হারবার্ট সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল বলিয়া সকালের খাওয়াটা হইল বেশ তৃপ্তির সহিত।

আহারের পর হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট বনে চলিল—শিকারের সন্ধানে। গিডিয়ন্ স্পিলেট চিম্‌নীতেই রহিলেন। আগুনটাকে উস্‌কাইয়া রক্ষা করিতে হইবে। আর, সম্ভাবনা না থাকিলেও যদি বা নেব হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া কোন রকম সাহায্য চায়।

পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট রওনা হইল, পথে তাহারা গাছের মোটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইল—সেটাই হইল তাহাদের শিকারের অস্ত্র। চলিতে চলিতে তাহারা পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিল—চিমনীর ভিতর হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহারা ক্রমে নদীর বাঁ দিক দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। তারপর নদীর পাড় ধরিয়া, ঘন এবং উঁচু ঘাস-বনের মধ্যে দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চলিল। ক্রমে নদী সরু হইয়া গিয়াছে। নদীর দুই ধারের বড় বড় গাছগুলির ডালপালা উচু পাড়ের উপর দিয়া পড়িয়া, যেন দুটি খিলান করা তোরণের মত দেখা যাইতেছিল।

বনের মধ্যে পথ হারাইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়, সেজন্য, পেন্‌ক্রফ্‌ট নদীর গমন পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল—পথ হারাইলে ও পুনরায় যাত্রার স্থানে ফিরিয়া আসা সহজ হইবে। নদীর তীর ধরিয়া চলাও বড় সহজ নয়। গাছের ডালপালা জলের উপর পর্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে তাহার উপর আবার লতা পাতা, ঝোপ কাঁটাও আছে। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট হাতের লাঠি দিয়া সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া, পথ করিয়া চলিল। নদীর বাঁ পাশের তীর অনেকটা সমতল ও জলা ভূমির মত—এদিক সেদিক দিয়া অনেক ঝরণা বহিয়া চলিয়াছে। নদীর ডান পাড় অসমান—হঠাৎ উচু, হঠাৎ নীচু, সে পাড় দিয়া চলা কঠিন।

পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট প্রায় এক ঘণ্টা চলিয়া, মাত্র মাইল খানেক পথ অগ্রসর হইল। জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই, মধ্যে মধ্যে মাটিতে বন্য জন্তুর পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল, কিন্তু দাগ দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল না কোন্ জন্তু।

এই সময়ে ছোট ছোট পাখী উড়িয়া গিয়া গাছের ডালে বসিল। উড়িবার সময় কতকগুলি পালক পড়িয়াছিল। হারবার্ট উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব বেশ জানিত। একটি পালক পরীক্ষা করিয়া বলিল যে, "এগুলি কুরকাস্ পাখী, বেশ চমৎকার খেতে, মাংস খুব নরম, আর সহজেই কাছে গিয়ে, লাঠির ঘায়ে মার্‌তে পারা যাবে।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট উঁচু ঘাসের মধ্যে দিয়া গুড়ি মারিয়া অগ্রসর হইল। একটা গাছের গোড়ায় গিয়া দেখিল। নীচের ডালগুলি ছোট ছোট পাখীতে ভর্তি। কুরকাস্ গুলিও গাছের ডালে বসিয়া পোকা মাকড় খুঁজিতেছে।

শিকারী দুইটি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়াই, হাতের লম্বা লাঠি দিয়া—ঠিক যেমন কাস্তে দিয়া ঘাস কাটে—তেমনি ভাবে এক ঘায় একদল কুরুকাস্ ধরাশায়ী করিল। বোকা পাখীগুলি উড়িয়া পালাইবার পূর্বেই প্রায় একশতটা মারা গেল। একটা ডালে কুরুকাসগুলি ঝুলাইয়া লইয়া, শিকারীদ্বয় চলিল। এই সামান্য কয়টি পাখীতে কি হইবে? আরও অনেক শিকার সংগ্রহ করা চাই, ঘাসের ভিতর দিয়া চলিবার সময়, কত জন্তু ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। লম্বা লম্বা ঘাস, কিছু দেখিবার জো নাই চিনিবার উপায় নাই।

পেন্‌ক্রফ্‌ট দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিল—"হায়রে, এসময়ে যদি টপ সঙ্গে থাকৃত? কিন্তু টপ কোথায় —সে হয়ত তার প্রভুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছে।"

বিকালের দিকে, প্রায় তিনটার সময় নূতন নূতন পাখীর দল দেখা গেল, জুনিপার গাছের ডালে বসিয়া ফল খুঁটিয়া খাইতেছে। এমন সময় হঠাৎ বিগলের আওয়াজের মত শব্দে বন কাঁপিয়া উঠিল। ব্যাপার কি? এক রকমের বন-মোরগ, যাহাকে আমেরিকায় "টেট্রা" বলে—এ তাহারই গলার কর্কশ স্বর। একটু পরেই দেখা গেল, দলে দলে জোড়া বাঁধা টেট্রা গাছের ডালে বসিয়া আছে। পাখীগুলি খুব বড় মোরগের মত, তাহার মাংস চমৎকার সুস্বাদ। পেন্‌ক্রফ্‌ট ভাবিল—যেরূপ হউক অন্ততঃ একটাকে ধরিতেই হইবে। কিন্তু কাছে যাওয়াই মুস্কিল, ধরা ত দূরের কথা। বারকয়েক চেষ্টা করিয়া ফল হইল না, শুধু পাখীগুলিকে চমকাইয়া দেওয়া হইল।

তখন পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"না, এরূপ ভাবে হবে না—সুতোর সাহায্যে ঠিক মাছের মত ক'রে এগুলোকে ধরতে হবে।

এই বলিয়া সে ৬।৭ টা টেট্রার বাসা খুঁজিয়া বাহির করিল। প্রত্যেক বাসায় ৩।৪ টা করিয়া ডিম ছিল, সেগুলিকে ঘাঁটিল না। এই বাসায় ধাড়ী পাখীগুলো নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। বাসার চারিদিকে টোপশুদ্ধ বড়্‌শি খাটাইয়া রাখিলে পাখীগুলি ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট সরু এবং মজবুত লতা দিয়া ১৫।২০ ফুট লম্বা কতকগুলি সুতা বানাইল। সেই সুতার এক মাথায় মুখ বাঁকান কাঁটা বাঁধিয়া তাহাতে একরকম লাল পোকা গাঁথিয়া, সুতার বড়শি-বাঁধা মুখগুলি বাসার কাছে রাখিয়া দিল। তারপর সুতার অন্য মাথাগুলি ধরিয়া, হারবার্টের সহিত বড় একটা গাছের আড়ালে বসিয়া রহিল। হারবার্টের মনে কিন্তু একটুও ভরসা ছিল না, যে, ইহাতে কোন ফল হইবে।

আধঘণ্টা পরে দেখা গেল, টেট্রাগুলি সত্য সত্যই বাসার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। আসিয়াই মাটি খুঁটিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। শিকারী যে তাহাদের অপেক্ষায় লুকাইয়া আছে, সেটা বুঝিতেই পারিল না। ক্রমে পাখীগুলি টোপ-গাঁথা বড়শির কাছে আসিয়া উপস্থিত। পেন্‌ক্রফ্‌ট আস্তে আস্তে সুতোতে হেচ্‌কা টান দিতে লাগিল। সেই টানে পোকাগুলি নড়িয়া উঠিবে আর পাখীরা ভাবিবে সেগুলি জীবন্ত। বাস্তবিক তাহাই হইল। পোকাগুলি নড়িবামাত্র, ৩।৪ টা টেট্রা সেগুলিকে আক্রমণ করিয়াই একেবারে পেটের মধ্যে। আর যায় কোথায়। সেই মুহূর্তে পেন্‌ক্রফ্‌ট এক হেঁচ্‌কা টান, আর পাখীর বাছারা ঠিক মাছের মত করিয়া বড়্‌শিতে গাঁথিয়া গেলেন। হারবার্ট পূর্বে এরূপভাবে শিকার কখনও দেখে নাই, কাজেই হাততালি দিয়ে সে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। নিতান্ত শুধু হাতে তাহারা ফিরিবে না—এই ভাবিয়া উভয়ের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন বেলা প্রায় ছয়টা শরীর ও শ্রান্ত ক্লান্ত, সুতরাং পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট কাঁধে শিকার ঝুলাইয়া, নদীর পার দিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই আসিয়া চিমনীতে উপস্থিত হইল।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

গিডিয়ন্‌ স্পিলেট, সমুদ্রতীরে নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। চারিদিকে আকাশে দারুণ ঝড়ের আয়োজন হইয়াছে—সে দিকে তাঁহার দৃষ্টিই নাই। হারবার্ট আসিয়া চিমনীতে ঢুকিল, পেন্‌ক্রফ্‌ট গেল স্পিলেটের কাছে। চিন্তামগ্ন স্পিলেট পেন্‌ক্রফ্‌টকে দেখিতেই পাইলেন না। নিকটে গিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"আকাশ দেখে মনে হচ্ছে, রাত্রে ভীষণ ঝড় হবে—না?"

স্পিলেট ফিরিয়া দেখিলেন পেন্‌ক্রফ্‌ট। তাহার কথার উত্তরে তিনি বলিলেন "আচ্ছা, বল দেখি পেন্‌ক্রফ্‌ট হার্ডিংকে যখন জলের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন বেলুনটা তীর থেকে কতদূরে ছিল।"

স্পিলেটের হঠাৎ এরূপ প্রশ্নে পেন্‌ক্রফ্‌ট ভারি বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তবু বলিল—"প্রায় বারশত ফুট দূরে ছিল।"

স্পিলেট বলিলেন—"টপ্‌ও তাহলে ততখানি দূরেই নিরুদ্দেশ হয়ে ছিল?"

পেন্‌ক্রপ্‌ট বলিল—"হাঁ তত দূরেই।"

স্পিলেট বলিলেন—"আমার আশ্চর্য বোধ হচ্ছে এই যে, হার্ডিং ত ডুবেছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে টপ্‌ও কি ডুবে মারা গেল। আর দুটো দুটো মৃতদেহের একটাও কি ভেসে সমুদ্রতীরে কোথাও এসে লাগ্‌ল না?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"তখন সমুদ্রের যে রূপ ভীষণ অবস্থা ছিল—সেটা আর বিচিত্র কি? তা ছাড়া হয়ত বা প্রবল স্রোত মৃতদেহ ভাসিয়ে অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছে।"

স্পিলেট বলিলেন—"এ সম্বন্ধে তোমার মত যাই হোক না কেন, আমার মত তা নয়। তুমি দুঃখিত হয়ো না আমার মতে হার্ডিং এবং টপ, দুজনেরই এক সঙ্গে এরূপভাবে নিরুদ্দেশ হওয়াটা বড়ই অসম্ভব বলে মনে হয়, এবং এটার কোন কারণ বোঝা যায় না।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলে আমি বাস্তবিকই সুখী হতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়—ও বিষয়ে আমার একটা স্থির ধারণা জন্মে গিয়েছে।"

এই কথা বলিয়া পেটক্রফ্‌ট চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিল। নূতন কাঠ দিয়া হারবার্ট ইতি পূর্বেই বেশ আগুন জ্বালাইয়াছিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট তখনই লাগিয়া গেল খাদ্য প্রস্তুত করিতে।

সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত নেব্‌ ফিরিল না। তাহার এত বিলম্ব দেখিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট একটু ব্যস্ত হইল। তবে কি তাহার কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে? এই দেরীর কারণ হারবার্ট অন্য ভাবে নিল। সে ভাবিল—হয়ত বা এমন কোন নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার দরুণ নেব্‌কে বেশী করিয়া হার্ডিং এর সন্ধান করিতে হইতেছে এবং সে জন্যই তাহার ফিরিতে এত বিলম্ব। সে হয়ত বা কোন রকম চিহ্ন বা পায়ের দাগ দেখিতে পাইয়া, প্রভুর সন্ধানে ব্যস্ত—এই মুহূর্ত্তে সে হয়ত প্রভুর খুব নিকটে গিয়াছে। এইরূপে হারবার্ট তাহার অনুমানের কথা বলিল। কেহই তাহার কথায় বাধা দিল না—স্পিলেট বরং সে কথায়ই সায় দিলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট অনুমান করিল অন্য রকম—নেব্‌ হয়ত প্রভুর সন্ধানে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে, এবং সেটাই তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইবার কারণ। হারবার্ট ত তখনই প্রস্তুত ছিল, যে নেবের সন্ধানে যাইবে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বাধা দিয়া বলিল,—"এই অন্ধকারে আর এমন বিশ্রী রাতে গিয়ে কোন ফল নাই, বরং অপেক্ষা করা ভাল।"

স্পিলেট ও পেন্‌ক্রফ্‌টের কথায় সায় দিলেন। ক্রমে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইল। দক্ষিণ-পূর্বদিক্ হইতে দারুণ ঝড়ো বাতাস বহিতে লাগিল। সমুদ্রের অবস্থা হইল সাংঘাতিক। পর্বত প্রমাণ ঢেউ পাহাড়ের গায়ে আঘাত করিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বৃষ্টি। রাত্রি আটটার সময়ও নেব্‌ ফিরিল না। এইরূপ বিশ্রী দিনে ফিরিবেই বা কেমন করিয়া? হয়ত বা কোন গহ্বরে সে আশ্রয় লইয়াছে। ঝড় বৃষ্টি কমিলে আসিবে। আহারাদি করিয়া সকলে শয়ন করিল। বাহিরে ঝড়ের বেগ ক্রমে বাড়িয়া, বেলুন-যাত্রার ঝড়ের মত অবস্থা দাঁড়াইল। সৌভাগ্য বশতঃ খুব মজবুত এবং বড় বড় গ্রেনাইট পাথরের চাপ দ্বারা চিমনীটি প্রস্তুত ছিল। ঝড়ের দাপটে চিমনী এক একবার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল বটে, কিন্তু বিশেষ কোন অনিষ্ট হইল না।

পেন্‌ক্রফ্‌ট দুই তিনবার উঠিয়া গিয়া, বাহিরের ঝড়ের অবস্থা দেখিয়া আসিল। এইরূপ প্রলয়কাণ্ডের সময় হারবার্ট গভীর নিদ্রায় অচেতন, ক্রমে পেন্‌ক্রফ্‌টও ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু মনের অবেগে স্পিলেট্ কিছুতেই ঘুমাইতে পারিলেন না। তাঁহার কেবলই দুঃখ হইতে লাগিল—কেন তিনি নেবের সঙ্গে গেলেন না। রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

যখন ভোর হইবার কয়েক ঘণ্টা বাকি আছে, পেন্‌ক্রফ্‌ট তখনও ঘুমে অচেতন—এমন সময় দারুণ ঝাঁকুনি খাইয়া সে উঠিয়া বসিয়াছে। ব্যাপার কি?

গিডিয়ন স্পিলেট্ উপুড় হইয়া বলিলেন—"শুন, পেন্‌ক্রফ্‌ট। কান পেতে শুন।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট খানিকক্ষণ শুনিয়া বলিল—"বাইরে ঝড়ের গর্জন ছাড়া, কৈ, আর ত কিছু শোনা যাচ্ছে না।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"আরে না, ঝড়ের শব্দ হবে কেন? আমার স্পষ্ট মনে হলো, যেন—"

"যেন কি?"

"কুকুরের ডাকের মত শুনেছি।"

তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"কি কুকুরের ডাক! অসম্ভব। এই দারুণ ঝড়ে ক করে বুঝলেন, যে,—"

"থাম, আবার ভাল ক'রে কান পেতে শুন।"

এবারে খুব মন দিয়া পেনক্রফ্‌ট শুনিল। তখন তাহারও মনে হইল, যেন, ঝড়ের একটু বিরামের সময়, রে কুকুরের ডাক-ই স্পষ্ট শোনা গেল।

তখন সে মহা ব্যস্ত হইয়া বলিল—"হাঁ, হাঁ ঠিকই বলেছেন—কুকুরের ডাকই বটে।'

তখন হারবার্টও জাগিয়া ছিল, সে চেঁচাইয়া উঠিল—"টপের ডাক। এ টপের ডাক ছাড়া আর কিছুই তে পারে না।"

তখন তিন জনেই বাহিরের দিকে ছুটিল। কিন্তু বাতাসের জোর ভীষণ, বাহিরে যাইতে তাহাদিগকে লক্ষণ বেগ পাইতে হইল। বাহিরে গিয়া দেখিল, পাথরে হেলান দিয়া ছাড়া সটান দাঁড়ান অসম্ভব। রিদিকে চাহিয়া দেখিল ভীষণ অন্ধকার—সমুদ্র আকাশ, মাটি সব যেন মিশিয়া একটা শুধু বিশাল কালমত খা যাইতেছে—আলোর নাম গন্ধও নাই। ঝড়ের আঘাতে সকলে স্তব্ধপ্রায়, জলে ভিজিয়া একাকার, লিতে চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম। এইভাবে কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকার পর হঠাৎ আবার কুকুরের ডাক নে হইল যেন খানিক দূরেই ডাকিতেছে। এটা নিশ্চয়ই টপের ডাক। কিন্তু টপ কি একা, না সঙ্গে অন্য কহ আছে? খুব সম্ভব টপ্ একা—নেব্ তাহার সঙ্গে থাকিলে, এতক্ষণে সে চিমনীর কাছে আসিয়া পড়িত।

পেন্‌ক্রফ্‌ট ছুটিয়া চিম্‌নীতে গিয়া ঢুকিল। খানিক পরেই একটা জলন্ত কাঠ লইয়া বাহিরে আসিয়া পস্থিত। তখন্ সেই জলন্ত কাঠখানি আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া, সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে শিষ্ দিল। তখন নে হইল, যেন, এই সঙ্কেতেরই অপেক্ষা ছিল—কারণ, সেই মুহূর্তে ডাক ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া, দেখিতে খিতে একটা কুকুর অন্ধকারের মধ্যে হইতে লাফাইয়া চিম্‌নীর পথে আসিয়া উপস্থিত। পেন্‌ক্রফ্‌ট, স্পিলেট হারবার্ট কুকুরের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকিলেন। জলন্ত আগুনে শুক্‌না কাঠ ফেলিয়া দেওয়া হইল— মনীর পথ আলোকে উজ্জ্বল।

হারবার্ট চেঁচাইয়া উঠিল—"এ সত্যি সত্যিই টপ।"

কুকুরটা সাইরাস হার্ডিংএর প্রিয় টপই বটে। এই জাতীয় কুকুর খুব দ্রুতগামী এবং ইহাদের ঘ্রাণশক্তি তিশয় প্রবল। টপ একা কেন? তাহার প্রভু কিংবা নেব্ কোথায়? টপ চিমনীর অস্তিত্ব ও জানে না, বে কেমন করিয়া এখানে আসিল—বিশেষতঃ এরূপ অন্ধকারে এবং এই ভীষণ ঝড়ের মধ্যে? আরও আশ্চর্যের ষয় এই—টপ্ একটুও ক্লান্ত হয় নাই। কাদা কিংবা বালির দাগটি পর্যন্ত গায়ে নাই।

স্পিলেট্ বলিলেন—"কুকুর যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন তার প্রভুকেও নিশ্চয় পাওয়া যাবে।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট দেখিল, যে, তাহার অনুমান সবই মিথ্যা হইয়াছে, সুতরাং সে তখনই যাইবার জন্য প্রস্তুত ইল। যত্নের সহিত উনানের আগুনটি ঢাকিয়া, তাহার উপর কয়েকটা শুক্‌না কাঠ রাখিল। তারপর মালে কিছু খাদ্য বাঁধিয়া লইয়া একেবারে প্রস্তুত।

টপ চলিয়াছে সকলের আগে। মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া সকলকে যেন তাহার সঙ্গে যাইতে বলিতেছে—তাহার পিছনে স্পিলেট্, হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফ্‌ট। তখন ঝড় উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছে। ঘন মেঘের মধ্যে দিয়া চাঁদের আলো বিন্দুমাত্রও দেখা যায় না। অজানা পথে চলা মুস্কিল, তাহার চাইতে টপের বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই ভাল। সকলে তাহাই করিল। বাতাসের জোর এতই প্রবল যে পরস্পরে কথাবার্তা বলা অসম্ভব। যাহা হউক, একটা বিষয় যাত্রীদের পক্ষে অনুকূল ছিল—ঝড় বহিতেছিল তখন পিছন দিক্ হইতে। নতুবা চক্ষে বালির আঘাত লাগিয়া অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব হইত। পিছন দিক হইতে বাতাস যেন তাহাদিগকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। নেব্ তাহার প্রভুকে পাইয়াছে এবং সেই যে টপকে চিমনীতে পাঠাইয়াছে—সে বিষয়ে কাহারও মনে তখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ক্রমে উঁচু পাহাড়ের পথ পার হইয়া যখন তাহারা বাঁকিয়া চলিল, তখন পাহাড়ের আড়াল পাইয়া, ঝড়ো বাতাসের হাত হইতে সকলে রক্ষা পাইল। সোয়া ঘণ্টা কাল তাহারা একরকম ছুটিয়াই চলিয়াছিল। ক্লান্তও হইয়াছিল খুবই, এখন যেন হাঁপ ছাড়িয়া সকলের প্রাণ বাঁচিল। এখন পরস্পরে কথাবার্তা বলিতে আর মুস্কিল নাই। কথায় কথায় হারবার্ট সাইরাস্ হার্ডিংএর নাম করা মাত্র, টপ দুই তিনবার ডাকিয়া উত্তর দিল—যেন বলিল, তাহার প্রভু বাঁচিয়াই আছেন।

হারবার্ট বলিল—"টপ, তিনি বেঁচে আছেন—না?"

টপ—আবার ডাকিয়া উত্তর জানাইল—হাঁ।

আবার সকলে চলিলেন, পাহাড়ের আড়াল ছাড়াইয়া যাওয়া মাত্র মনে হইল যেন ঝড়ের বেগ আরও বাড়িয়াছে। নীচু হইয়া সকলে চলিয়াছেন, তবু গতি দ্রুত। টপ সকলের আগে আগে; গন্তব্য পথ চিনিয়া চলিতে তাহার কিছুই মুস্কিল হইতেছে না।

এবারে বাঁ পাশে উন্মত্ত সমুদ্র ফেলিয়া সকলে উত্তর মুখে চলিয়াছেন। মনে হইল, যেন, জমি আর তেমন উঁচু নীচু নয়, অনেকটা সমতল। বাতাস তাহাদিগকে তেমন বেগে আঘাত না করিয়া মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

ভোরের দিকে ৪টার সময়, তাঁহারা হিসাব করিয়া বুঝিতে পারিলেন প্রায় পাঁচ মাইল পথ আসিয়াছেন। হাওয়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা। পোষাক পরিচ্ছদ যথেষ্ট না থাকায়, সকলেরই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কাহারও মুখে অভিযোগ নাই—টপ্ যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানেই সকলে যাইবেন।

ছয়টার সময় রাত্রি প্রভাত হইল। তখন তাঁহারা চিম্‌নী হইতে প্রায় ছয় মাইল পথ আসিয়াছেন। এখানে সমুদ্রের তীর খুব সমতল ডান পাশে, জলে পর্বতের ডগাগুলি ভাসিয়া আছে। বাঁ পাশে যতদূর দেখা যায় খালি বালির ঢিপি আর কাঁটা গাছ।

এই সময় টপ্ হঠাৎ ভারি চঞ্চল হইয়া উঠিল। সম্মুখের দিকে ছুটিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে—যেন সকলকে মিনতি করিতেছে দ্রুত চলিবার জন্য। এইখানে টপ্ সমুদ্রতীর ছাড়িয়া, বালির ঢিপিপূর্ণ সমতল জমির দিকে চলিল। আশ্চর্য বুদ্ধি বলে সোজা চলিতে লাগিল একটুও ইতস্ততঃ করিল না। তাহার পিছনে পিছনে যাত্রীদলও চলিয়াছেন। চারিদিকে একেবারে মরুভূমির মত, কোন প্রাণীর চিহ্নটি সর্য্যন্ত নাই। কেবলই বালির ঢিপি আর মধ্যে মধ্যে ছোট বড় পাহাড় পর্বতও আছে। সমুদ্র তীর ছাড়িয়া পাঁচ মিনিট পর্যন্ত চলিলে পর, সকলে একটী গহ্বরের মত জায়গায় আসিয়া উপস্থিত—যেন উঁচু একটি ঢিপিরপিছনে একটী, গর্ত খুঁড়িয়া রাখা হইয়াছে। এখানে আসিয়া টপ থামিয়া, জোরে একটা ডাক দিল স্পিলেট, হারবার্ট ও পেন্‌ক্রফট্ সকলে উর্দ্ধশ্বাসে গহ্বরের মধ্যে

প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—মাটিতে ঘাসের বিছানার উপর লম্বমান্ একটি দেহের পাশে, নেব, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। লম্বমান দেহটি ক্যাপ্‌টেন হার্ডিংএর।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

পেনক্রফট্, হারবার্ট ও গিডিসন স্পিলেট্ গহ্বরে ঢুকিল, নেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া নড়িল চড়িল না।

পেনক্রফট্ শুধু জিজ্ঞাসা করিল—"বেঁচে আছেন কি?"

নেব্ এ কথারও কোন উত্তর দিল না। স্পিলেট্ ও পেনক্রফটের মুখ মলিন হইয়া গেল, হারবার্ট হাত দুখানি জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারুণ দুঃখে নেব্ স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে—সে সঙ্গীদিগকে দেখিতেও পায় নাই, পেনক্রফটের প্রশ্ন শুনিতেও পাইল না। গিডিসন্ স্পিলেট্ অসাড় দেহটির পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। সাইরাস হার্ডিংএর কোট খুলিয়া, তাঁহার বুকে কান লাগাইয়া শুনিতে লাগিলেন—হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি আছে কিনা।

অনেকক্ষণ এরূপভাবে চেষ্টা করিবার পর বলিলেন—"হার্ডিং এখনও বেঁচে আছেন।"

এ কথা শুনিয়া পেনক্রফ্‌টও "হার্ডিংএর পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। সেও ধুক্‌ধুকানি শুনিতে পাইল, অধিকন্তু, তাহার মনে হইল, যেন, হার্ডিংএর মৃদু নিশ্বাস তাহার গালে লাগিয়াছে।

স্পিলেটের আদেশে হারবার্ট তখনি ছুটিল জলের সন্ধানে। খানিক দূরে গিয়াই জল পাইল বটে, কিন্তু জল লইয়া যাইবার পাত্র কোথায়? তখন সে তাহার রুমালটি ভিজাইয়া লইয়া ছুটিল।

স্পিলেট্ ভাবিয়াছিলেন জল দিয়া হার্ডিংএর শুধু ঠোঁট দুখানি ভিজাইবেন, সুতরাং রুমালের জলেই সে কাজ হইল। ঠাণ্ডা জল ঠোঁটে লাগাইবামাত্র, আশ্চর্য ফল দেখা গেল—হার্ডিং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন এবং মনে হইল, যেন, তিনি কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

তখন স্পিলেট্ বলিলেন—"হার্ডিংকে আমরা নিশ্চয় বাঁচাতে পারব।"

একথা শুনিয়া বেচারি নেবের মনে আশা জাগিয়া উঠিল। সে তাহার প্রভুর শরীরের কাপড় খুলিয়া দেখিতে লাগিল, কোন খানে আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা। কিন্তু মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কোন স্থানে একটি আঁচড়ের দাগও দেখা গেল না,—বড়ই অদ্ভুত কথা। কারণ, ঢেউএর আঘাতে নিশ্চয়ই তিনি পাহাড়ের গায়ে গিয়া পড়িয়াছিলেন। হাত দুখানিতেও কোন আঘাতের চিহ্ন নাই—ব্যাপার কি? ঢেউএর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তবু শরীরে কোন ক্ষতচিহ্ন নাই কেন? এই আশ্চর্য ব্যাপারের মীমাংসা কে করিবে?

মীমাংসা পরে হইবে। হার্ডিং সুস্থ হইয়া যখন কথা বলিতে পারিরেন। তখন তিনিই এই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। এখন তাঁহাকে সুস্থ করাই প্রধান কর্ত্তব্য, শরীর ভাল করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া দিলে, এরূপ অবস্থায় জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসে। তখন পেন্‌ক্রফ্‌টের গায়ের মোটা গেঞ্জিটি লইয়া, সকলে হার্ডিংকে ঘষিতে মাজিতে লাগিলেন।

এই ঘষা মাজার ফলে, ক্ষণকালের মধ্যেই হার্ডিং হাত দুখানি নাড়িলেন নিশ্বাসও অনেকটা স্বাভাবিক ভাবেই পড়িতে লাগিল। শরীরের অত্যধিক ক্লান্তি বশতঃই হার্ডিং ক্রমে নির্জীব হইয়া পড়িতেছিলেন। স্পিলেট্ প্রভৃতি সকলে আসিয়া উপস্থিত না হইলে হার্ডিং নিশ্চয়ই মারা যাইতেন।

পেন্‌ক্রফট্ নেব্‌কে বলিল—"নেব্। তুমি হয়ত ভেবেছিলে, তোমার প্রভু মরেই গিয়েছেন—না?"

নেব বলিল—"হাঁ সত্যি তাই ভেবেছিলাম, টপ্ আপনাদের সন্ধান পেয়ে এখানে যদি না নিয়ে আস্‌ত তাহলে আমি এতক্ষণে তাঁর দেহটি কবর দিয়ে, নিজের মৃত্যুর অপেক্ষায় এখানেই পড়ে থাকৃতাম।"

ইহার পর নেব্ সকল ঘটনা বলিল। আগের দিন চিম্‌নী হইতে বাহির হইয়া, সমুদ্রের ধারে পাহাড়ে ও বালির মধ্যে অনেক সন্ধান করিয়াছে—কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পায় কি-না।

অনেক সন্ধানেও কোন ফল হইল না। মরুভূমির মত সমুদ্র-তীর, কোন দিন সেখানে কোন মানুষ আসে নাই। তারপর তীর ধরিয়া অনেকদূর চলিয়া গেল—যদি বা প্রভুর শরীর ঢেউএর আঘাতে বহু দূরে লইয়া গিয়া থাকে।

নেব্ বলিল—"আমি তীর ধ'রে আরো দুই মাইল গেলাম, খুব ভাল ক'রে সন্ধান করতে করৃতে গেলাম। কাল বিকালে প্রায় পাঁচটার সময় হঠাৎ দেখ্‌লাম বালিতে পায়ের দাগ।"

পেনক্রফট্ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পায়ের দাগ?"

নেব্ বলিল—"হাঁ, পায়েরই দাগ।"

স্পিলেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই দাগগুলো কি জলের ধার থেকেই আরম্ভ হয়েছিল?"

নেব্ বলিল—"না, জোয়ারের জল যতদূর ওঠে, তারপর থেকে দাগ দেখ্‌লাম, নীচের দাগগুলো বোধ করি জলে ধুয়ে গিয়েছিলো।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"তারপর কি হলো?"

নেব বলিল—দাগগুলি দেখে ত আমি ভারি ব্যস্ত হয়ে গেলাম। দাগগুলি স্পষ্ট আর ক্রমে ভিতরের দিকে গিয়েছে। এই দাগ ধ'রে ধ'রে প্রায় পোয়া মাইল গেলাম। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। এই সময় হঠাৎ কুকুরের ডাক শুন্‌তে পেলাম। খানিক পরেই দেখি টপ্ এসে উপস্থিত—টপ্‌ই আমাকে প্রভুর কাছে নিয়ে এল। প্রভু মরার মত পড়ে রয়েছেন দেখে, তাঁকে বাঁচাবার জন্য নানা রকম চেষ্টা করলাম, কিন্তু ফল কিছুই হলো

না। শেষে হঠাৎ মনে হলো টপের কথা, ও যেমন বুদ্ধিমান, কুকুর ও গিয়ে যদি আপনাদের ডেকে আন্তে পারে। টপ মিষ্টার স্পিলেটকেই বেশী চিন্‌ত তাই, বার কয়েক তাঁর নাম করে আঙুল দিয়ে দক্ষিণের দিকে দেখালাম। আশ্চর্যের বিষয় তখনি টপ্ এক লাফ দিয়ে ছুটে চলে গেল, তারপর খানিক পরেই আপনারা এসে উপস্থিত হয়েছেন।"

নেবের বিবরণ সকলে খুব মন দিয়াই শুনিলেন, সাইরাস্ হার্ডিং কি করিয়া সে ঐরূপ গুরুতর অবস্থায় প্রায় মাইল খানেক দূরে এই গহ্বরে আসিয়াছিলেন, এটা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার।

স্পিলেট্ বলিলেন—"নেব। তাহলে তুমি তোমার প্রভুকে গহ্বরে আন নাই?"

"না আমি আনি নাই।"

অতি আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু হার্ডিং সুস্থ না হইলে, কিছুই জানিতে পারা যাইবে না। মাজাঘষায় হার্ডিংএর শরীরে ক্রমে রক্তের স্বাভাবিক চলাচল আরম্ভ হইল। তিনি আবার হাত নাড়িলেন, তারপরে মাথা নাড়িলেন—মুখ দিয়ে অস্পষ্ট কয়েকটি কথাও বাহির হইল। নেব্ প্রভুর শরীরের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল, সে তখন কথা বলিল কিন্তু মনে হইল, যেন, তিনি কিছু শুনিলেন না। তাঁহার চক্ষু দুটি বুজিয়াই রহিল। পেন্‌ক্রফটের বড়ই দুঃখ হইল—আগুন নাই; আগুন জ্বালিবার কোনও উপায়ও নাই। হার্ডিংএর পকেটে কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু তাঁহার ওয়েস্ট্ কোটের পকেটে তাঁহার ঘড়িটা ছিল। এখন হার্ডিংকে চিম্‌নীতে লইয়া যাওয়া নিতান্তই দরকার। ক্রমেই তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে লাগিল। পেন্‌ক্রফট্ কিছু টেট্রার মাংস সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। হারবার্ট সমুদ্রতীর সন্ধান করিয়া দুইটা বড় বড় ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া আনিল। সেই ঝিনুকে জল লইয়া তাহাকে টেট্রার মাংসের রস মিশাইয়া হার্ডিংকে খাওয়ান হইলে পর তিনি, ধীরে ধীরে চোখ মেলিলেন।

নেব্ ত উপুড় হইয়াই ছিল, প্রভুকে চাহিতে দেখিয়া "আমার প্রভু। আমার প্রভু।" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

এবার হার্ডিং তাহার কথা শুনিলেন। নেব, স্পিলেট এবং অন্যদেরও শুধু চিনিতে পারিলেন তাহা নহে। সকলেরই হাত আস্তে আস্তে চাপিয়া আনন্দ জানাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন কি কথাও বলিলেন। এবারে কথাগুলি অনেক স্পষ্ট, বেশ বুঝা গেল। বিড় বিড় করিয়া বলিলেন—দ্বীপ না মহাদেশ? পেন্‌ক্রফ্‌ট ত একেবারে অবাক। যে লোক মৃত্যুর মুখে, সে জ্ঞানলাভ করিয়াই জিজ্ঞাসা করে—দ্বীপ না মহাদেশ, একি অদ্ভুত লোক! তখন স্থির হইল, সাইরাস্ হার্ডিংকে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য ডাল ও লতাপাতা দিয়া একটা খাটিয়ার মত (স্ট্রেচার) প্রস্তুত করিতে হইবে। স্পিলেট হার্ডিংএর নিকট রহিলেন, অন্য সকলে গেল স্ট্রেচার লইয়া ফিরিয়া আসিল।

হার্ডিং তখন ঘুমের ভাবে ছিলেন। ক্রমে ক্রমে ফেকাসে চামড়া লাল হইয়াছে। একটু পরেই ঘুমের ভাব দূর হইল, কনুইএর উপর ভর দিয়া একটু উঠিয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন।

স্পিলেট বলিলেন—এখন আমার কথা শুনতে পারবে, হার্ডিং, কোন কষ্ট হবে না ত?

মৃদু-স্বরে হার্ডিং বলিলেন—না, তা হবে না, কি বলবে বল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—আমার মনে হয়, সাইরাস্ হার্ডিং আর খানিকটা টেট্রার স্যুপ খেয়ে নিয়ে যখন গায়ে আরও জোর পাবেন—তখন কথা শুনতে পাবেন খুব ভাল করেই।

এই বলিয়া পেন্‌ক্রফ্‌ট হার্ডিংকে এবারে শুধু টেট্রার রস না দিয়ে, তাহার সঙ্গে খানিকটা মাংসও মিলাইয়া দিল—হার্ডিং খানিকটা খাইলেন, বাকিটা অন্য সকলে মিলিয়া খাইয়া যৎ কিঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল।

গিডিয়ন স্পিলেট তখন হার্ডিংকে সব কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বেলুন হইতে পতন, হার্ডিংএর সন্ধান। তাঁহার প্রতি নেবের অদ্ভুত ভক্তি ভালবাসা, টপের আশ্চর্য বুদ্ধি প্রভৃতি কোন কথাই বলিতে বাকি রাখিলেন না।

তখন হার্ডিং ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হলে তোমরা আমাকে সমুদ্র তীরে পেয়ে এখানে বয়ে আন নি?"

স্পিলেট বলিলেন—"না।"

"সমুদ্র থেকে এই গহ্বর কতটা দূরে?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল "প্রায় এক মাইল দূরে। আপনি যেমন আশ্চর্য বোধ করছেন, আমরাও তেমনি আপনাকে এই গহ্বরে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি।"

হার্ডিং বলিলেন, "বাস্তবিকই বিষয়টা বড় অদ্ভুত।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—আচ্ছা আপনাকে যখন ঢেউ এসে বেলুন থেকে ধুয়ে নিয়ে গেল, তার পর থেকে কি কি ঘটনা হয়েছে আপনি বলতে পারেন কি?

সাইরাস্ হার্ডিং চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বিশেষ কিছু জানেন না, প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে বেলুনের জাল হইতে ছিঁড়িয়া নিয়াছিল্। প্রথমে ত জলে পড়িয়াই একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে জলের উপর ভাসিয়া ঝাপ্‌সা আলোতে বুঝিতে পারিলেন—একটা কোন জন্তু তাঁহার পাশে হাবুডুবু খাইতেছে। জন্তুটা টপ্—তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সে নিজেও জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। তারপর বেলুনটাকে আর দেখিতে পান নাই। দুটি প্রাণীর ওজন হইতে হঠাৎ মুক্তি পাইয়া বেলুন বিদ্যুদ্বেগে চলিয়া গিয়াছিল।

উন্মত্ত সমুদ্রের উপর, তীর হইতে আধ মাইল দূরে হার্ডিং ভাসিতেছেন জোরে সাঁতরাইয়া ঢেউয়ের সঙ্গে লড়িতে চেষ্টা করিলেন। টপ তাঁহার কাপড় কামড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু প্রবল স্রোতে তাঁহাকে উত্তর দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল; প্রায় আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর তিনি আর পারিলেন না, জলে ডুবিয়া গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে টপকেও টানিয়া নিলেন। তারপর হইতে এ পর্যন্ত আর কোন ঘটনা তাঁহার মনে নাই।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—নেব যখন সমুদ্র তীরে আপনার পায়ের দাগ দেখেছে, তখন নিশ্চয় আপনি নিজেই এই গহ্বরে এসেছিলেন. মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে হার্ডিং বলিলেন—তাই হবে নিশ্চয়। তোমরা সমুদ্র তীরে মানুষের কোন চিহ্ন পাও নাই?

স্পিলেট বললেন—বিন্দুমাত্রও না। তা ছাড়া, ঘটনাক্রমে যদি কারো সঙ্গে তোমার দেখা হতো, তাহলে সে তোমাকে ঢেউ থেকে বাঁচিয়ে এরূপ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাবে কেন?

হার্ডিং বলিলেন—স্পিলেট তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আচ্ছা নেব, তুমি ত আমাকে···হয়ত তোমার জ্ঞান ছিল না···তখন···না, তা ও একেবারে অসম্ভব। আচ্ছা, পায়ের চিহ্নগুলি এখনও আছে কি?

নেব বলিল—হাঁ আছে বৈকি, এই গহ্বরে আসবার মুখেই টিপিটার পিছন দিকে একটু আড়াল জায়গায় চিহ্ন আছে।

হার্ডিং বলিলেন—পেন্‌ক্রফ্‌ট। আমার জুতোটা নিয়ে গিয়ে দেখ—পায়ের সঙ্গে তলাটা মিলে কিনা।

নেব পথ দেখাইয়া চলিল, পেন্‌ক্রফট ও হারবার্ট জুতো হাতে দুইজনেই তাহার পিছনে পিছনে গেল।

তখন হার্ডিং স্পিলেটকে বলিলেন—এটা তো বড়ে অদ্ভুত ব্যাপার। কি করে আমি এই গহ্বরে এলাম?

স্পিলেট ও মহা বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, 'তা আর বলতে—ব্যাপারটা একেবারে বুদ্ধির অগম্য।'

হার্ডিং বলিলেন—থাক্, এমন আর ও কথায় ভেবে লাভ নাই, পরে এ সম্বন্ধে আলাপ করা যাবে।

এই সময়ে সকলে ফিরিয়া আসিল। হার্ডিংএর জুতোর তলা পায়ের দাগের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। এটা যে সাইরাস্ হার্ডিংএর-ই পায়ের দাগ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

হার্ডিং বলিলেন—দূর ছাই, আমি মিছামিছি নেবকে বল্‌ছিলাম সে অজ্ঞান অবস্থায় কিছু করেছিল কিনা। কিন্তু এটা বোধ করি আমারই কাজ—ঘুমন্ত অবস্থায় নিজেই এই গহ্বরে এসেছিলাম। টপই আমাকে ঢেউয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল।

এই বলিয়া হার্ডিং টপকে কত না আদর করিলেন, বাস্তবিক তখন মনে হইল, যে, সাইরাস্ হার্ডিং-এর উদ্ধারের জন্য টপেরই সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য। বেলা বারটার সময় সকলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। সাইরাস্ হার্ডিং তখন যথেষ্ট দুর্বল। মনের জোরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু পেন্‌ক্রফটের কাঁধে ভর দিতে হইল, নতুবা পড়িয়া যাইতেন।

স্ট্রেচার আনিয়া হার্ডিংকে তাহাতে শোয়ান হইল। স্ট্রেচারের দুই পাশে দুইটা লম্বা কাঠ বাঁধা ছিল। একদিকে পেন্‌ক্রফট্ অন্যদিকে নেব্—এইভাবে স্ট্রেচার তুলিয়া লইয়া সকলে চলিল চিমনীর দিকে। প্রায় আট মাইল পথ গেলে পরে তবে চিম্‌নীতে পৌঁছান যাইবে। তাড়াতাড়ি যাইবার উপায় নাই, আবার মধ্যে মধ্যে থামিতেও হইবে—সুতরাং ছয় ঘণ্টার কমে চিম্‌নীতে পৌঁছান যাইবে না। বাতাসের জোর তখনও বেশ, কিন্তু বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। হার্ডিং কনুইএ ভর দিয়া, মাথা তুলিয়া চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। বিশেষভাবে দেখিলেন দ্বীপের ভিতর দিকে। স্থানটার উঁচু নীচু চেহারা, বনজঙ্গল এবং তদুৎপন্ন জিনিসপত্র দেখিয়া, তাঁহার মনে ভরসা হইল। একটু পরেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বিকালে প্রায় ছয়টার সময় সকলে চিম্‌নীতে পৌঁছিল। স্ট্রেচার মাটিতে নামান হইল—হার্ডিং তখনও ঘুমাইতে ছিলেন।

পেন্‌ক্রফট্ দেখিলেন কি আশ্চর্য। ঝড়ে চারিদিকের চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। পরিবর্তন অনেকই হইয়াছে—সমুদ্রতীর বড় বড় পাথরের চাপে একেবারে ভর্তি। বুঝিতে পারা গেল, ঝড়ের সময় সমুদ্র ফুলিয়া গ্রেনাইট্ পাহাড়ের নীচ পর্যন্ত আসিয়াছিল। হঠাৎ পেনক্রফ্‌টের মনে একটা দারুণ দুর্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত। উর্দ্ধশ্বাসে সে চিমনীর পথে গেল, মুহূর্ত পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া, নীরব নিস্তব্ধভাবে সঙ্গীদের পানে চক্ষু বড় করিয়া তাকাইয়া রহিল,—চিমনীর আগুন নিবিয়া গিয়াছে। আগুন ধরাইবার জন্য পোড়া নেকড়া প্রভৃতি সরঞ্জাম যাহা কিছু সব জলে ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের জল চিম্‌নীতে ঢুকিয়াও অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই চিমনীর ভিতরের জিনিষপত্র ওলট্ পালট্ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট হইয়া একাকার। ক্রমশঃ

লঙ্কা-দহন

লীলা মজুমদার

স্থান রাবণের সভাগৃহ

জুড়ির গান—রামায়ণের বাহাদুর রামচন্দ্র নয় ;
কহ বাহু তুলে বদন খুলে,
হনুমানের জয় ॥
সাগর পারের নামটি শুনে,
শুষেণ পাহে ভয় ॥
শতবলীর অষ্ট রম্ভা,
গয় গবাক্ষের লয় ॥
অঙ্গদ হলেন শিবনেত্র,
ভাবেই তন্ময় ॥
আর মূর্তিমান জাম্ববান,
চক্ষু বুজে রয় ॥
হাত পা পেটে সেঁদোয় পাছে
লঙ্কা যেতে হয় ॥
ঢের ঢের বীর জানা আছে,
কেউ না লাগে হনুর কাছে,
কোথা সুগ্রীব বিভীষণ,
চটি ফেলে পলায়ন।
ঐ লঙ্কা গিয়ে একলা হনু
সীতার খবর লয় ॥

পাত্র-পাত্রী

কালনেমি
১ম গায়ক
২য় গায়ক

স্থান—রাবণের সভাগৃহ

কালনেমি—আঃ! আবার গোড়া থেকে শুরু কর্, নে ধর্—(বেসুরো গলায়)—রাবণ্ রাবণ্ রাবণ্ রাবণ্—

বন্দনাগায়কেরা (সুর করে) রাবণ বধিবে রাম লক্ষ্মণ,
মেরে করবে তুলো ধুনো
—আহা, রাবণের কথা শুনো—

পাটাবে শমন-সদন
ঐ দুরন্ত বিভী—ষণ,
রাবণ বধিবে রামলক্ষ্মণ—

১ম গায়ক—তার মানে কি সগর।

কালনেমি—মানে আবার কিরে। হ্যাঁরে। এই সামান্য জিনিষটার মানে বুঝতে পাল্লি নারে ইডিয়ট।

১ম গায়ক—না, না, বুঝতে পেরেছি ঠিকই, তবে কি জানেন, ঐ একটু গুলিয়ে যাচ্ছে, কি বলছে তা টের পাচ্ছি নে—উ উ—উ!

কালনেমি—ওকি? ও কি হচ্ছে?

১ম গায়ক—চিমটি কাটছে স্যার! তাহলে মানেটা—?

২য় গায়ক—দুৎ! ওঁকে জিগেস কচ্ছিস্ কেন রে? উনি কি গাইতে জানেন? নাকি অন্য কিছু জানেন?

কাল—চোপ্। বেয়াদব! হ্যাঁ—কি বলছিলাম যেন—? ও হ্যাঁ গানের আবার মানে কি রে? গানের বুঝি মানে হয়?

২য় গায়ক—না স্যার, না স্যার, গানের সুর হয়।

কাল—ও-ও! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ওঠ্ বলছি, উঠে দাঁড়া! বল তুই-ই বল মানেটা কি?

২য় গায়ক—বলছি, বলছি—ঐ রাবণ বধিবে—অর্থাৎ কিনা রাবণকে পিটিয়ে হাড় করবে—কে করবে?—না রামলক্ষ্মণ! বুঝলে কি না, তাতেও রক্ষে নেই, রাবণের হালটা কি হল শোন, তাজ্জব যুদ্ধসজ্জায় বিভীষণের প্রবেশ, ব্যাটা বেজায় দুরন্ত, রাবণের ঠ্যাং ধরে হিড় হিড় করে টেনে একেবারে শমন-সদন! পুড়িয়ি টুড়িয়ে একাকার!

সভাস্থ সকলে—সাধু, সাধু! দশমুণ্ডুর একটা টিকি পর্যন্ত থাকবে না, বা, বা, বেশ, বেশ!

১ম গায়ক—তাপ্পর কি হবে?

কাল—তাপ্পর কি হবে! ন্যাকা! তাপ্পর কি হবে উনি জানেন না যেন। কোথাকার গবেট রে! তাপ্পর রাবণ অক্কা পেলে, রামলক্ষ্মণ এসে লঙ্কা সহর তছনছ করে দেবে, তোদের কাউকে বাকি রাখবে না! তাই বলছিলুম যুদ্ধ কর্, যুদ্ধ কর্!

১ম গায়ক—যুদ্ধ করব? এই যে গান গাইতে বললেন?

কাল—তুই তো আচ্ছা গাধারে, ঠাট্টার সময় ইয়ার্কিও বুঝিস নে। রাবণ ম'লে—

দ্বারপালের প্রবেশ—সৃ—সৃ—সৃ—চুপ, চুপ, রাবণ আসছে।

কাল—সৃ-সৃ-সৃ—বসে পড়, যে যার জায়গায় বসে পড়। খোল করতাল ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ সব রেডি?—আচ্ছা এইবার—

১ম গায়ক—রাবণ আসছে? কই, তাহলে মরে নি তো? এ কি রকম অন্যায় কথা!

কাল—সৃ-সৃ-সৃ—আরম্ভ কর, আঃ, এটা কি পেট চুলকোবার সময় নাকি রে?

গায়কবৃন্দ—(বাদ্যের সঙ্গে)—রাবণ বধিবে রামলক্ষ্মণ!

মেরে করবে তুলোধুনো—

রাবণ—চো—প্! ওহে কালনেমি মামা, বাইরে অত হট্টগোলটা কিসের? হাতিমুখো ঘোড়ামুখো একদল মেয়েছেলে দেখলাম যেন।

কালনেমি—এঃ! গোলমাল নাকি? আমি গান শেখাচ্ছিলাম কি না—

রাবণ—ঢের হয়েছে, এবার ক্ষান্তি দিন। প্রহরী!

(দ্বারপালের প্রবেশ)

রাবণ—বাইরে কি হচ্ছেটা কি? খেয়েদেয়ে মুখে একটা পান ফেলে সভায় একটু ঘুমোতেও দিবি না নাকি? কে ওরা?

দ্বারপাল—ওরা না—ওরা অশোকবন থেকে এয়েচে, সেখানে নাকি কি সব হয়েছে!

রাবণ—এ্যাঁ! অশোক বনে আবার কি হল? ডাক্, ডাক্ শিগগির ওদের।

দ্বারপাল (দরজার কাছে গিয়ে)—অয়। তোমরা এবার এসো! (ছয় সাতটি রাক্ষসীর প্রবেশ, অজামুখীর সঙ্গে খুদে রাক্ষসও আছে)

১মা—তবে না ঢুকতে দেবে না, এক চড়ে এক্কেবারে সব দাঁতগুলোকে—!

২য়া—না, দেবে না ঢুকতে, ওর ঘাড় দেবে!

৩য়া—এই সর ব্যাটা, দরজা থেকে! দে ব্যাটাকে ঠেলে যমের বাড়ি পাঠিয়ে।

৪র্থ—ওর কান ছিঁড়ে দে!

৫মা—চিম্‌টি কাট্!

৬ষ্ঠ—খিম্‌চে দে, খিম্‌চে দে!

৭মা—এ্যাঁ! এইবার মজা বোঝ বাছাধন! বলে নাকি ঢুকতে দেবে না। হাঁ!

দ্বারপাল—ওরে বাবারে, মেরে ফেললেরে! (পলায়ন)

রাবণ—(অবাক হয়ে)—মামা এরা কারা? অমন কচ্ছে কেন?

দ্বারপাল—(মাথা চুলকিয়ে) তা আর করবে না স্যার? অশোক বন যে ভেঙ্গে চুরমার, ওদের বাসাফাসার আর কিছু রাখেনি।

রাবণ—কে রাখেনি?

অজামুখী—ঐ একটা বাঁদর, মহারাজ! ভারি দুষ্টু, কত মানা করছি, শুনছে না।

রাবণ—কোথাকার বাঁদর? কি চায় সে? কেউ দেখেছে তাকে?

খুদে—আমি দেখেচি মহারাজ। আমি না—আমি ওর বন্দুক্! আমাকে বিস্কুট দেছে! খুব ভালো বাঁদর—

অজা—এই চুপ, চুপ, পাজি বেয়াড়াকে ভালো বলতে হয় না!

রাবণ—কি চায় সে?

খুদে—তা জানি নে, কি সব খাচ্ছিল তো মগ্‌ডালে বসে। সীতাকে বললে—আমার পিঠে চাপুন, আমি বোঁ করে উড়ে যাই!—বাব্বা সীতার কি ভয়! কিছুতেই গেল না! আমি হলে—

রাবণ—চোপ্‌!—বাঁদরটার আস্পর্ধা তো কম নয়! গাছপালা ভাঙ্গছে, তা তোমরা কেউ বাধা দিতে পারলে না? একটা সামান্য বাঁদর দেখে ভয় পেলে?

১মা রাক্ষসী—ওমা! তেড়ে আসে যে, ভেংচি কাটে, ল্যাজ আছড়ায়, কান নাড়ে আর বিকট চ্যাঁচায়!

২য়া—আর ল্যাজ দিয়ে পাকিয়ে ধরে এই বড় বড় গাছ শেকড় বাকল সুদ্ধু উপড়িয়ে আনে!

রাবণ—মামা! একটা সামান্য বাঁদর—নাঃ, সামান্য বাঁদর নয় তাহলে! হয়তো রাম লক্ষ্মণই বাঁদর সেজে—

(সভাস্থ সকলে উঠে দাঁড়িয়ে)—এঁ্যা! রাম লক্ষ্মণ! ও বাবা! তাহলে আমরা কোথায় যাব গো!

রাবণ—চোপ্‌! কাপুরুষ কোথাকার, রাম লক্ষ্মণের নাম শুনেই তোমাদের আত্মাপাখি খাঁচা ছাড়া তো তারা সামনে এলে যুদ্ধু করবে কি করে? বস। যে যার কাজ কর। আমি একটু ভেবে দেখি।—

(সকলে বসে যে যার জিনিষপত্র গুছোয়)

১ম সভাসদ্‌—হ্যাঁ, আমার আবার স্বর্ণপটিতে জরুরি কাজ আছে। কাজ কত্তে আমাকে সেখানেই যেতে হয়।

২য়—আমাকে আবার যেতে হবে রথের ইষ্টিশনে, শ্বশুর মশাই কলম্বো হয়ে আসছেন কি না—

৩য়—উওক্‌! আমার পেটটা এমন মোচড় দিয়ে উঠল যে এখানে আর থাকা নয়!

৪র্থ—ওদিকে, আবার আমার জন্যে তিনটে লোক বসে রয়েছে—

রাবণ—ওরে, জম্বুমালীকে ডাক্‌, সে যা হয় একটা ব্যবস্থা করুক। এই, তোর নাম কি রে? আমার পা থেকে নাগ্রা জোড়াটি খুলে দে তো, আমি পা দুটোকে তুলে বসি। কেমন ব্যথা ব্যথাও কচ্ছে। তাছাড়া সিংহাসনের তলাটাতে তো শুধু রামলক্ষ্মণ কেন, হাতিঘোড়াও লুকিয়ে থাকতে পারে!

সভাস্থ সকলে—এঁ্যা! (সকলের ঠ্যাং তুলে বসন্‌)

রাবণ—কই, জম্বুমালী এখনও এল না?

১ম সভাসদ্‌—জম্বুমালী আসতে পারবে না, স্যার, ওর দাঁত কন্‌কন্‌ কচ্ছে!

রাবণ—কে বলেছে ওর দাঁত কনকন কচ্ছে, হতভাগা?

১ম সভাসদ্‌—বাঁ! ওঁ নিজেই তোঁ যাঁবার সঁময় বঁলে গেঁল।

রাবণ—কি বলে গেল ?

১ম সভা—বলল—ভুঁড়ো ব্যাটা আমার কথা জিগেস কল্লে বলিস আমার দাঁত কনকন কচ্ছে, আমি এখন ঘুমুতে গেলুম।

রাবণ—ঘুমুতে গেলুম ? ব্যাটা আর ঘুমুবার সময় পেল না! বেশ, ও না যায় তো বিরূপাক্ষ যাক্।

বিরূ—আমি, স্যার ? আমি কি করে যাব, আমার না পায়ে ফোস্কা ? তাছাড়া গুরুদেবের বারণ আছে।

রাবণ—আহা ! কি জ্বালা, তোমার সঙ্গে দুর্ধর, প্রঘস, ভাসকর্ণ, যূপক্ষ সবাই যাবে।

বিরূ—কই, কই তারা ? এখানে কাকেও তো দেখছি না।

রাবণ—মামা, পাইক পাঠিয়ে তাদের ধরে এনে বাঁদরটাকে বধ করতে পাঠিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।

(রাবণের শয়ন ও নিদ্রা, বিরূপাক্ষ, কালনেমি ও সভাস্থ সকলের প্রস্থান।
রাবণের নাক ডাকা শুনে যেতে যেতে রাক্ষসীদের চমক্ লাগন)

(মঞ্চের আলো নিবে গিয়ে আবার জ্বলে উঠবে। রাবণ তখনো নিদ্রিত। নাক ডাকা
সমানে চলেছে। হুড়মুড় করে কালনেমির প্রবেশ)

কাল—বলি ও রাজা, ও ভাগ্নে, আর কত ঘুমুবে ? এদিকে সবগুলোই যে পটল তুলল ! তুমি কখন যাবে ?

রাবণ—(চমক) এঁ্যা ! কে কি তুলল বললে যেন ?

কাল—(কপাল চাপড়ে) হায়, হায়, ওদিকে লঙ্কার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি এদিকে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছ !

রাবণ—(পেটে হাত বুলিয়ে) বড্ড খেইছিলুম কি না, সত্যি মন্দোদরীর মতো অমন আরেকটি খাসা রাঁধিয়ে দেখলুম না। তা—কে পটল তুলেছে বললে ?

কাল—কে তোলে নি তাই বল। দুর্ধর, প্রঘস, ভাসকর্ণ, জম্বুমালী, বিরূপাক্ষ—

রাবণ—এঁ্যা, বল কি ? একটা ছোট বাঁদরে—

কাল—ছোট নয়, ভাগ্নে, ইচ্ছে মতো সে পর্বতের সমান বড় হতে পারে ! আর সে কি যুদ্ধ ! এই বড় বড় থাম্বা খুলে নিয়ে তাই দিয়ে পিটোচ্ছে, ঐ রথের ওপর লাফিয়ে পড়ে ঘোড়াটোড়া সব সুদ্ধ চ্যাপটা জিবে গজা। ঐ হাতি দিয়ে হাতি মারছে, ঘোড়া দিয়ে ঘোড়া মারছে, রাক্ষসগুলোকে ইঁদুরের মতো দূরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, আর তাদের খুঁজে পাচ্ছে না !

রাবণ—কি সর্বনাশ ! কিন্তু অক্ষ যদি—

কাল—অক্ষ ? অক্ষ কি আর আছে ? তাকে একেবারে ধুলোপড়া করে দিয়েছে !

রাবণ—হায় ! হায় ! এও ছিল কপালে !

কাল—এখন কেঁদে কি হবে, ভাগ্নে ? তখন পই পই করে বলি নি, ঐ সীতেটিকে এনো না, এনো না, তা কে কার কথা শোনে ! সে যাক গে, এখন কুমার ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে গিয়েছেন। দেখতে দেখতে ব্যাটাচ্ছেলেকে বেঁধে এইখানে নিয়ে এসে ফেলবেন দেখো, ব্রহ্মাস্ত্র আটকানো শুধু বাঁদরের কেন, রামারও কম্মো নয় !

নেপথ্যে—জয়, কুমার ইন্দ্রজিতের জয় ?

মিলিত কণ্ঠ—হেঁইয়া হো, হেঁইয়া হো, হেঁইয়া হো !

কাল—ঐ বোধ হয় এল, ভাগ্নে, ওঠ, ওঠ, আর ভাবনা নেই। ক্রমশঃ
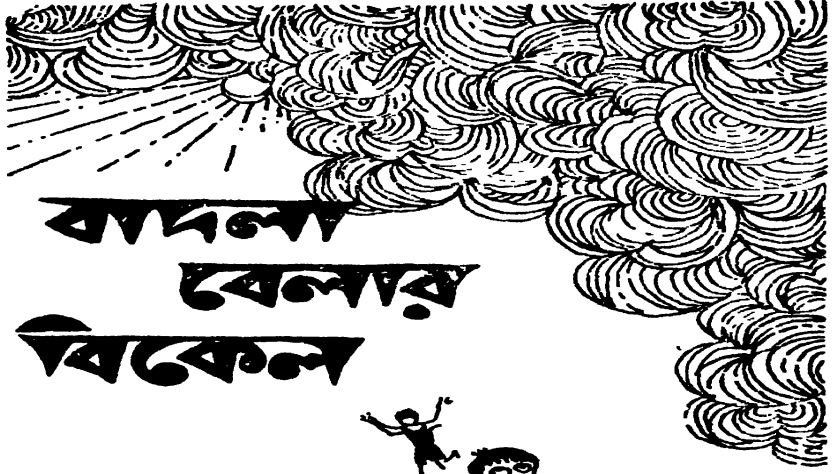
শ্রীসুকৃতি রায়চৌধুরী

সকলে — আয়রে আয়রে সকলে
ছুটে ছুটে দলে দলে
এই বিকেল বেলা
আয় ভাই সুরু করি মোদের খেলা ।

১ম বালক — কি জোরে বাতাস বয় হুহু করে

২য় বালক — আহা কি ভালো
গা'টা জুড়ালো

৩য় বালক — গাছগাছালির দল কেমন নড়ে ।

১ম বালিকা — একি একি সুরু হল ঝড় দেখি যে

২য় বালিকা — বৃষ্টি নামলে ডাহা মোরা যাবো যে ভিজে

সকলে	এই বিকেল বেলা
	আকাশে জমেছে ওই মেঘের মেলা।
বালিকারা	সুয্যিমামা ওগো সুয্যি মামা
	কোথা তুমি লুকিয়েছে রোদের রেখা
বালকেরা	সুয্যিমামা ওগো সুয্যি মামা
	আর কত খুঁজবো গো দাওনা দেখা
সকলে	এই বিকেল বেলা
	কেমনে করবো সুরু মোদের খেলা।
	ওই ওই ওই এল বৃষ্টি
	ডুবে যাবে মাঠ ঘাট
	ডুববে বাজার হাট
	বরুণদেব দিলে কোপ দৃষ্টি।
বালিকারা	বারে বারে বিদ্যুৎ চমকায়
বালকেরা	বাজ পড়ে তালগাছ পুড়ে যায়
সকলে	এক বৃষ্টি
	অনাসৃষ্টি
	এই বিকেল বেলা
	কি করে চলবে তবে মোদের খেলা।
বালিকারা	বরুণদেব বরুণদেব বৃষ্টি থামাও
	খেলা ভেঙে দিয়ে কি যে মজা পাও
	হও শান্ত, হও শান্ত
	হও ক্ষান্ত, হও ক্ষান্ত
বালকেরা	এ পাগলামি তোমার
	চলবে না কো আর
	হও শান্ত হও শান্ত
	হও ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত।
বরুণদেব	শোনো শোনো লক্ষ্মীসোনা ছেলেমেয়ের দল
	রাগ করোনা আমার ’পর নই আমি পাগল
	বৃষ্টি না হলে
	শস্য না ফলে
	জানো না কি তা ?

ধুলায় ধূসর ধরিত্রীরে স্নান করিয়ে দিই
উঁচু উঁচু বাঁধগুলো সব জলে ভরে দিই
আমি যে মিতা।
রোদে পোড়ে যারা গরমে
কষ্ট যে ওঠে চরমে
বরষার করুণ ধারায় খোলে মনের আগল
তোমাদের বন্ধু আমি নই আমি পাগল।
তোমাদের ভালবাসি
তাই বারে বারে আসি
চললাম আমি এবারের মতো
আর হবে না জল।

বালকেরা — সেই ভালো সেই ভালো
বালিকারা — আমরা চাই যে আলো
সকলে — এখন খেলব খেলার শেষেতে যত পারো জল ঢালো
বালিকারা — কি মজা বাঃ
বালকেরা — হাঃ হাঃ হাঃ
সকলে — রোদ উঠেছে সরে গেছে ওই মেঘের দলটি কালো
রামধনুতে আজ
নানা রঙের সাজ
মোরা খেলবো মোরা নাচবো
মোরা গাইবো মোরা হাসবো
মোরা জেনেছি সূর্য্যি ভালো
মোরা জেনেছি বৃষ্টি ভালো
আলো আর আঁধারে ভরা
মোদের এই জীবন।

[নাচ ও গানের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীরা এটি যে কোন সাধারণ মঞ্চে অভিনয় করতে পারে। লেখকের কাছে আবেদন করলে গানের স্বরলিপি পাওয়া যাবে।]
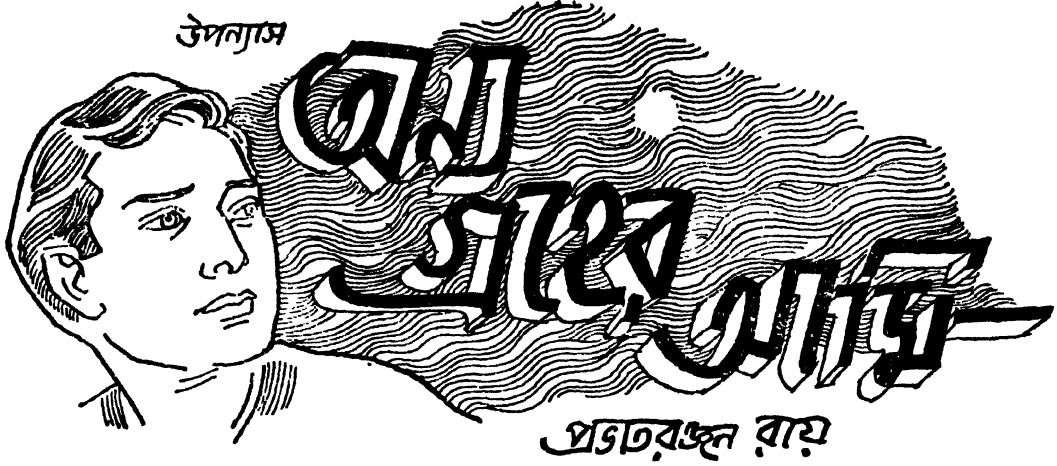
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব প্রকাশিত অংশের

চুম্বক—সুদূর ভবিষ্যতের গল্প, তখন মহাকাশে পৃথিবীর লোকেরা যাতায়াত করে। পৃথিবীতে আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায়, কয়েক লক্ষ লোক মহাকাশযানে করে, অন্য এক সূর্য মণ্ডলীতে পৃথিবীর সদৃশ একটা গ্রহে নেমে বসবাস করতে লাগল। এই ঘটনার দুশো বছর পরে, প্রশান্ত কুমার, চিয়েন, মরিশ ও ফিসার বলে সেই গ্রহবাসী চারজন বন্ধু কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে, সুদূর অঞ্চলে বেড়াতে গেল। সেখানে প্রফেসার সোমোরেণ ও তাঁর সহকারীরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন। তবে গবেষণার বিষয়টা যে কি তাদের কেউ জানে না। মরিশের ভাই হ্যারিশ ও তার বন্ধু নিকলসনও সেখানে কাজ করে।

পুরোনো পৃথিবী থেকে যাত্রীরা এই অঞ্চলেই প্রথম নেমেছিল; তাদের ভাঙ্গা আকাশযানগুলি এখনো পড়ে আছে। একটা ভাঙ্গা বাক্সে পুরোনো পৃথিবীর কিছু বইও পাওয়া গেছিল।

পাঁচ

পুরোনো পৃথিবী থেকে আনা বইগুলি ওঁরা পড়তে পারছেন না শুনে চিয়েন খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল—"চলুন তো দেখি বইগুলোকে একবার, আমরা কিছু বুঝতে পারি কি না - সেখানকার কয়েকটা ভাষার কিছু কিছু আমরা জানি।" আমিও তার কথায় সায় দিলাম। আমাদের উৎসাহ দেখে বাবার বন্ধু একটু হেসে বললেন—"আরে অত ব্যস্ত কিসের। প্রফেসার সোমোরেনকে হ্যারিশ এই কথা বলেছিল বলেই তো তোমাদের এখানে আসবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, নইলে তোমাদের মতো সদ্য কলেজ ছাড়া কেউ কি এরকম একটা বৈজ্ঞানিক দলে যোগ দিতে পারে নাকি?" অবিশ্যি এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে এখানে আমাদের সমবয়সী কেউ নেই; সকলেই আমাদের চেয়ে অনেক বড়। হ্যারিশ, নিকলসন আর দু তিন জনই যা ছিল অল্প বয়সীদের দলে।

হ্যারিশের কাছে যেতেই সে কয়েকটা বই দেখিয়ে দিল। বই তিনটে উল্টেপাল্টে দেখি তার ভাষা আমি জানি না বটে, কিন্তু চিয়েন খুব ভাল করেই জানে। চিয়েন একটা বই নিয়ে তখুনি বসে পড়ল, একটুক্ষণ পরেই তার তর্জমা করে ডিক্টোগ্র্যাম যন্ত্রে বলে যেতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো টাইপ হয়ে যেতে লাগল। আমি এদিক ওদিক দেখতে দেখতে আবার কারখানার ভিতরে গিয়ে পড়লাম। সামনেই খোলা বাক্সগুলো পড়ে, দেখে কৌতূহল হল, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। তার মধ্যে যেসব যন্ত্রপাতি ছিল সেগুলোকে বের করে নেওয়া হয়েছে, একটা বাক্সের ভিতরে কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ পড়ে ছিল; তার উপর নজর পড়াতে, সেগুলোকে তুলে নিলাম। অনেক দিনের পুরোনো কাগজ, হাতের লেখায় ভরা। একটু তাকিয়ে মনে হল ভাষাটা পড়তে পারব, সব কটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ভরলাম।

এতক্ষণ মরিশ আর ফিসার কি করছে খেয়াল ছিল না, হঠাৎ ওদের কথা মনে পড়াতে, ওদের খুঁজতে বেরোলাম। কাছাকাছি ওদের দেখতে না পেয়ে, কারখানার বাইরে এসে দেখি ছোট পাহাড়টায় উঠে, টেলিস্কোপ দিয়ে এক দিকে ওরা কি যেন দেখছে। আমিও সেদিকে রওনা দেব ভাবছি, এমন সময় ওরা নামতে শুরু করল, তাই আর গেলাম না। নেমে আমার কাছে পৌঁছতে ওরা প্রায় বেলা বারোটা বাজিয়ে ফেলল এবং ঠিক সেই সময় নিকলসন এসে বলল—"চল, চল, এবার সবাইকে খেতে যেতে হবে, অতএব ঐ গাড়িতেই ফেরা যাক।"

এবার লক্ষ্য করলাম সকালের যাত্রীদের কেউ কেউ সেখানে রয়ে গেলেন, তাঁদের বদলে অন্য কয়েকজন গাড়িতে উঠলেন। একটু আশ্চর্য হয়ে হ্যারিশকে বললাম—"কি ব্যাপার?" সে বললে—"এখানে এই রকমই ব্যবস্থা, হাতের কাজ শেষ না করে কেউ আসতে চান না, কাজেই এক দল হয়তো থেকে গেলেন আর অন্যরা চলে এলেন।"

চিয়েনকেও না দেখে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তার তর্জমা শেষ হয় নি, তাছাড়া বইটা থেকে দরকারী তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, কাজেই সেও আটকে রয়ে গেছে। ক্যাম্পে ফিরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু বেড়াচ্ছি, এমন সময় নিকলসন এসে বলল—"এবেলাটা ক্যাম্পেই কাটাতে পার, ফিরে যাবার কোনো দরকার নেই।"

আমরা ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলাম—"কাল যেতে পারব তো?"

সে হেসে বলল—"কাল কেন, আজই আবার যেতে পার, কেউ কোনো আপত্তি করবে না, তবে নতুন জায়গায় এসেছ, হয়তো চারদিকটা ভালো করে ঘুরে দেখতে ইচ্ছা করতে পারে, তাই ও কথা বললাম।" আমরা থেকেই গেলাম, অন্যেরা ফিরে গেলেন।

ফিসার আর মরিশ কি যেন আলোচনা করছিল, আমার কাছে এসে বলল, "ভালোই হল—তুমি থেকে গেলে, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

তখন আমি ওদের সেই হাতেলেখা কাগজগুলো দেখিয়ে বললাম—"এখানে নিরিবিলিতে এগুলো পড়বার চেষ্টা করব ভাবছি, কিন্তু পাহাড়ের ওপর থেকে অত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছিলে বল তো।

ফিসার বললে—"আরে, তাই নিয়েই তো কথা। চল, ঘরে গিয়ে ভালো করে আলোচনা করা যাবে।" নিজেদের ডেরায় ফিরে গেলাম।

ঘরে ঢুকেই ফিসার বলল—"কি দেখছিলাম জানো? কারখানায় বড় বড় যন্ত্র নিয়েই সব মশগুল, আশে পাশে কি আছে না আছে, তার তেমন খোঁজ কেউ নেন নি, তাই শুনে পাহাড়ে গিয়ে চড়লাম। মরিশই প্রথমে দূরে কি একটা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আরে, দেখ, ঐ দূরে ছোট্ট একটা যন্ত্রের মতন কি পড়ে আছে।' সেটাকে ভালো করে দেখবার জন্যে নীচে নেমে একটা টেলিস্কোপ নিয়ে আবার পাহাড়ে উঠলাম। টেলিস্কোপ দিয়ে ভালো করে দেখতেই বুঝলাম মরিশের অনুমান ভুল নয়, সত্যিই একটা যন্ত্র পড়ে আছে। আমরা ঠিক করেছি সম্ভব হলে কাল সকালে একটা গাড়ি নিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারটা।"

একথা শুনে আমিও ওদের সঙ্গে যাওয়া ঠিক করে ফেললাম। ফিসার বলল—"চিয়েনকেও সঙ্গে নিতে হবে, কিন্তু ও যে ছাড়া পাবে তাতো মনে হয় না।" তারপর মরিশ বলল—"এবার আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধু তার গবেষণায় মত্ত হোক।" এই বলে ফিসারকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও কাগজ নিয়ে বসে পড়লাম।

একে বহুকালের পুরোনো কাগজে হাতের লেখা, তার আবার তাড়াহুড়ো করে লেখা, তাই পড়তে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছিল। একটুখানি পড়েই চমকে উঠলাম। আমাদের কলেজের লাইব্রেরির সঙ্গে যে একটা পুরোনো বইয়ের কথা আগেও বলেছি, যেটা আসলে একটা রোজনামচা, অর্থাৎ ডায়রির কয়েকটা ছেঁড়া পাতা, এও যেন সেই একই লোকের লেখা বলে মনে হল। গোড়ায় অন্যমনস্কভাবে পাতাগুলা ওলটাচ্ছিলাম, এবার সেগুলোকে ঠিক করে সাজিয়ে নিলাম। এও একটা রোজনামচার টুকরো, মাঝে মাঝে পাতা নেই, হয়তো সেই বাক্সেই নয়তো অন্য কোথাও পড়ে আছে।

কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই বুঝলাম সময় নেবে। হাতের লেখা পড়তে কষ্ট হচ্ছিল একথা তো আগেই বলেছি, যদিও ভাষাটা আমার খুব ভালো করেই জানা। একটু অবাক যে হই নি তাও নয়, কারণ ভাষাটা হল আমার সাবেক আমলের মাতৃভাষা, অর্থাৎ তোমরা যাকে বাংলা বল, যে ভাষায় এই গল্প তোমাদের জন্যে লিখছি। প্রথম কয়েক পাতা ওলটাতেই দু চারজনের নাম পেলাম, তার মধ্যে একটা নাম আমারি একজন পূর্বপুরুষের। তাঁর ছবি এখনো আমাদের বাড়িতে আছে, সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় থাকাতে ধরতে পারলাম। এও জানতে পারলাম যে পৃথিবী ছেড়ে চলে আসবার সময় যাঁরা অন্যদের আগে ছোট ছোট যন্ত্র করে প্রথম আমাদের এই গ্রহে এসেছিলেন, জায়গাটা মানুষের আবাসের যোগ্য কি না পরীক্ষা করবার জন্যে, ইনি সেই দলের একজন।

এঁরাই প্রথম এসেছিলেন অচেনা অজানা জগতে, দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে। বেশ কিছু দিন ঘোরাঘুরির পর তাঁরা খবর পাঠালেন যে এ জায়গাটা মানুষ থাকবার উপযোগী। তারপর অন্যরা সকলে বড় যানগুলি নিয়ে এখানে নেমে পড়লেন।

রোজনামচাটার মোটামুটি একটা তর্জনা খাড়া করলাম, অবশ্য সব কটা পাতা শেষ হল না।

প্রায় সবটাই সেই পৃথিবী ছেড়ে আসার সময়কার একটা ধারাবাহিক বিবরণী। কয়েক জায়গায় যন্ত্র সম্বন্ধে লেখা আছে, সেগুলো যতটা সম্ভব ভালো করে তর্জনা করে, যত্নের সঙ্গে লিখে ফেললাম। যা বুঝলাম তাতে মনে হল যানগুলো নানা রকম ইঞ্জিন দিয়ে চালানো হত। জলে, ডাঙায়, আকাশে চালাবার সময়ে জেট্ ইঞ্জিন ব্যবহার হত আর মহাকাশে যাবার সময়ে অ্যাটমিক ইঞ্জিন বা আভিকর্ষিক ইঞ্জিন, যাকে গ্র্যাভিটেসনেল্ ইঞ্জিন বলা হয়—তাই ব্যবহার করা হত। এই শেষটার সাহায্যে নাকি মাধ্যার্ষণের শক্তিকে কমানো বাড়ানো যায়, এমন কি আকর্ষণের বদলে বিকর্ষণও করে নেওয়া যায়।

ছয়

বিকেল হয়ে এসেছিল, মুখ হাত ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সব চুপচাপ, শুধু গুটিকতক বাড়িতে লোকজন আছে ; তাঁদের কারো সঙ্গেই আলাপ হয় নি মনে পড়াতে, তাঁদের বাড়ি যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় দেখি মরিশ আর ফিসার আসছে। এসেই মরিশ বলল, জানো, আমরা
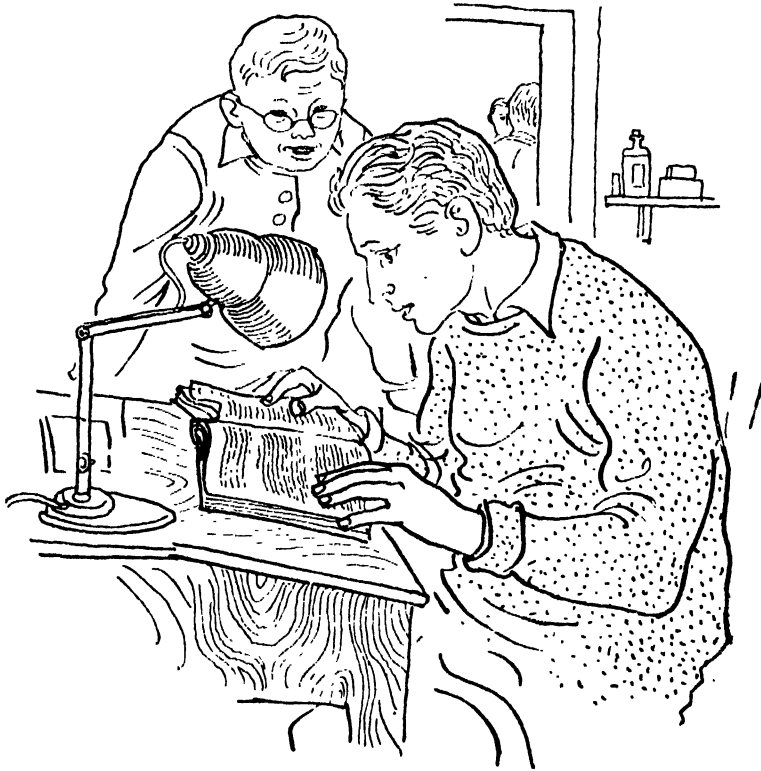
মানমন্দিরে গিয়েছিলাম, সেখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন অনেক দিন আগে তিনি যখন এখানে প্রথম এসেছিলেন তখন চারদিকে খুব ঘুরে বেড়াতেন। ছোট যন্ত্রটার কথা শুনে আগে বললেন যে জঙ্গলটা পেরিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের পাশে ঠিক ঐ রকম আরো গোটা তিন

যন্ত্র পড়ে আছে। ঐখানে পাহাড়ের গায়ে কয়েক জায়গায় অনেকখানি খোঁড়া হয়েছিল বলে মনে হল। তাছাড়া পাহাড়টা ঘুরে ভালো করে দেখে তিনি নানারকম ধাতুর সন্ধানও পেয়েছিলেন। এমন কি কয়েক জায়গায় তেজস্ক্রিয় ধাতুর অস্তিত্ব টের পেয়ে, সেখানে বেশি ঘোরাফেরা করা নিরাপদ নয় ভেবে চলে আসেন। তারপর চাকরিতে কাজের চাপে আর ওদিকে নজর দেবার সময় পাননি।

আমার তর্জমার কথা শুনে ওদের সে কি আগ্রহ! ফিসার বলল—"সবকটা পাতাই ভালো করে তর্জমা করে ফেল, নিশ্চয় অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে।" তারপর লেকের ধারে বসে তিনজনে গল্প করছি, হঠাৎ ফিসার বলে উঠল—"এই রকম একটা ছোট যান চেপে যদি সেই পুরোনো পৃথিবীকে একবার দেখে আসতে পারি, তাহলে মনে করব আমার জীবনটা সার্থক হয়েছে। কথাটা আমাদের সকলেরই মনের মতো, তাই নিয়ে আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। লেকের ধারে থেকে উঠে বাড়ি চলে এলাম, একটু পরেই কারখানা থেকে গাড়িগুলোও ফিরে এল।

আরো একটু পরে চিয়েন ঘরে ঢুকে একটা চৌকির ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল। খানিক জিরিয়ে সে বললে—"বাপরে বাপ! এর চেয়ে পরীক্ষার পড়াও ভালো। প্রফেসার সোমোরেন বিশ্রাম কাকে বলে জানেন না আর অন্যদের যে বিশ্রামের দরকার হতে পারে, তাও বোঝেন না। এক নাগাড়ে তর্জমা করে গেছি আর কিছুটা টাইপ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার নিজে এসে সেগুলো নিয়ে গেছেন। সব চেয়ে মজা হল, তর্জমা করতে করতে একটা অদ্ভুত কথা পেলাম, কিছুতেই তার মানে বুঝলাম না। কথাটা হল HERA CLOPONABE হেরা ক্লোপোনেবি। আমার তো কথাটাকে একটা জুৎসই গালভরা গালাগালি বলে মনে হচ্ছিল, অথচ ঐ কথাটা নিয়েই প্রফেসারের কি উৎসাহ! সারাদিন ধরে ওঁরা ক'জনে ঐ কথাটা নিয়ে আলোচনা করেছেন, অন্য কোনো দিকে নজর দেননি।

চিয়েনের কথায় বুঝলাম ওর তর্জমা থেকে যে রকম দরকারী তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, ঐ কাজেই ওকে দিন কয়েক আটকা থাকতে হবে। খাবার ঘণ্টা শুনে খাবার ঘরে গিয়ে দেখি সকলেই খুব খুসি। চিয়েনকে দেখেই সবাই যেরকম আনন্দ প্রকাশ করলেন, তাতে বুঝতে অসুবিধা হল না যে ওঁরা আশা করছেন ওর তর্জমা থেকে আরো অনেক কিছু জানা যাবে।

হ্যারিশ আমার পাশেই বসেছিল, রোজনামচার কথা শুনে বলল—"চটপট অনুবাদটি শেষ করে ফেল দিকিনি, তারপর প্রফেসারকে জানাতে হবে।" খাবার পর হ্যারিশ আর নিকলসন গল্প করতে করতে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এল। ফিসার সেই ছোট যানটির কথা বলল—"কাল সকালে একটা গাড়ি পেলে ওটাকে দেখতে যাবার ইচ্ছা আছে। প্রফেসারকে এখবরটা এখনই দিতে হচ্ছে।" এই বলে ও আর হ্যারিশ চলে গেল। আমরা একটুক্ষণ গল্প করে শুতে গেলাম।

পরদিন সকালে হাতমুখ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসারের কাছ থেকে ডাক এল। সবাই মিলে গেলাম তাঁর কাছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে শেষে বললেন—'বেশ, ভালো কথা একটা গাড়ি নিয়ে যন্ত্র দেখতে যেতে পার। আর দেখ প্রশান্ত, তুমি ধীরেসুস্থে তর্জমা শেষ কর,

কিন্তু কোথাও যদি যানগুলো চালানো সম্পর্কে কিছু পাও, তাহলে সেটুকু আগে তাড়াতাড়ি করে তর্জমা করে দিও। খানিক বাদেই খেয়েদেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, কারখানায় পৌঁছে হ্যারিশ আর নিকলসন গেল আমাদের গাড়ির ব্যবস্থা করতে।

গাড়ি এলেই আমরা রওনা হলাম। পেছনেই দেখলাম দুটো বিরাট মালগাড়ি আসছে, তার প্রথমটা নিকলস চালাচ্ছে। একটু গিয়েই রাস্তা গেল শেষ হয়ে, খোলা প্রান্তরে এসে পড়লাম। ছোট ছোট টিপি, বড় বড় পাথরের চাঙড়া এদিক ওদিক ছড়ানো; সেগুলোর পাশ কাটিয়ে, খানা খন্দ পার হয়ে চলতে হচ্ছিল। বেলা প্রায় বারোটার সময় পাহাড়ের কাছে পৌঁছনো গেল। এক-পাশে ছোট যানটা পড়ে আছে। বড় যানগুলোর যেন ছোট সংস্করণ, প্রায় ১৫০ ফুট লম্বা আর সেই অনুপাতে চওড়া। মালবাহী গাড়ি দুটোকে যন্ত্রটার পাশে এনে রাখা হল।

গাড়ি থেকে নেমেই হ্যারিশ বলল—"বেলা অনেক হয়ে গেছে, কাজও অনেক আছে। কাজেই আগে খেয়ে নিয়ে, তারপর কাজে লাগতে হবে।"

সঙ্গে খাবার ছিল, পেট ভরে খেয়ে দেয়ে, একটু বিশ্রাম করে কাজ শুরু করা গেল। দুটো গাড়িতেই কপিকল লাগানো। প্রথমে চুম্বক শক্তির সাহায্যে যন্ত্রটা তোলার চেষ্টা হল। কিন্তু সেটা এমন একটা ধাতুর তৈরী যার ওপর চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি কাজ করে না। শেষ পর্যন্ত যন্ত্র দিয়েই তুলতে হল। হ্যারিশ বলল, "অবাক্ কাণ্ড। এই ছোট যন্ত্রটা কি করে এত ভারী হল বুঝতে পারলে কি? বড় যানগুলো তুলতে যতটা শক্তির দরকার হয়েছিল, এই খুদেটাকে তুলতে যে তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তির দরকার হচ্ছে। ভাগ্যিস এখানকার সবচেয়ে শক্তিশালী গাড়িদুটোকে এনেছিলাম, নইলে তোলাই যেত না।"

অবশেষে ওটাকে গাড়িদুটোর ওপরে চাপিয়ে রওনা হওয়া গেল। অত শক্তিশালী গাড়ি, তবু যেন চলতেই পারছে না। অনেক কষ্টে বেশ রাত করে, গাড়ি নিয়ে যখন কারখানার কাছাকাছি এসেছি, দেখি আমাদের খোঁজে প্রফেসার তখনো বসে আছেন। দেরীর কারণ শুনে বললেন—"কাল সব দেখব। এখন তোমরা ক্যাম্পে গিয়ে খাওদাও, ঘুমিয়ে নাও।"

খাবার ঘরে দেখি চিয়েন আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। আমাদের দেখেই বলল—"ভাবিয়ে তুলেছিলে সবাইকে, যা দেরী করলে। সব খবর তো শুনলাম, তোমাদের কি মনে হয়?"

আমি বললাম—"হ্যারিশ নিকলসনই ঘায়েল হয়ে গেছে, আমরা তো কোন ছার।"

খেয়ে দেয়ে ঘরে এলাম। ফিসার এতক্ষণ চুপ করে ছিল, হঠাৎ সে চিয়েনকে জিজ্ঞাসা করল—"কিরে অনুবাদটা কদ্দুর এগুল?"

চিয়েন বলল—"একটা বই শেষ হয়েছে, তবে সে সাপ না ব্যাঙ আমাকে বাপু জিজ্ঞাসা না করাই ভালো। কিন্তু তাতেই প্রফেসার আর তাঁর সঙ্গীরা মহাখুসি। বিশ্রামের জন্য কালকের দিনটা ছুটি দিয়েছেন।"

সবাই খুব ক্লান্ত, রাতও অনেক হয়েছিল, তাই বিশেষ কিছু কথাবার্তা না বলেই যে যার শুতে

গেলাম। পরদিন উঠতে একটু দেরীই হয়ে গেল। হাত মুখ ধুতে না ধুতে খাবার ঘণ্টা পড়ল। খাবার পর বেরুলাম, চিয়েন কিন্তু গেল না। সে বললে, "অনেক কষ্টে মোটে একদিন ছুটি পাওয়া গেছে, কাজে কাজেই একটু আরাম করে ঘুমিয়ে সেটার সদ্ব্যবহার করা যাক। মিছিমিছি দৌড়ঝাঁপের কোনো মানেই হয় না। (ক্রমশঃ)

রূপকথা

আভা বর্ধন

রাণা, রুমা, সুজয়, নিনি বাব্‌লা, জয় দাদির কাছে ঘন হয়ে বসে বললে—'বলনা দাদি, সেই গল্পটা ?'

'কোনটা বলব ?—'

প্রতিবাদ জানিয়ে রাণা বললে—'যেটা সেটা নয়, তোমার যা ইচ্ছে—'

'আচ্ছা শোন' বললেন দাদি, ডিবে থেকে একটা পান তুলে মুখে পুরে, জরদার কৌটাটা খুলে দু'আঙ্‌ুলে করে খানিকটা জরদা মুখে ফেলে দিলেন। পানটা একটু চিবিয়ে বললেন—'শোন তবে, তোমাদের মতো আমিও ত ছোট ছিলুম—'

হেসে উঠল নিনি—'ছোটরা বুঝি দাদি হয় ? ছোট হলে তুমি কি ক'রে দাদি হবে ?'

'বাঃ রে, আমি কি একেবারেই দাদি হয়ে জন্মেছিলাম ? আমিও তোমাদের মত এই ছোট্টটি ছিলাম, আমারও মা ছিলেন, দাদি ছিলেন। আমিও তোমাদের মত গল্প শুনতাম দাদির কাছে। এই পৃথিবীর দিকে বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে আমিও তাকিয়ে থাকতাম সব কিছুর দিকে। এমনি করে পৃথিবীর সঙ্গে আস্তে আস্তে হ'ল আমার পরিচয়। আমি কথা কইতে শিখলাম, আমি আস্তে আস্তে ক' খ' পড়তে আরম্ভ করলাম, স্কুলে যেতে সুরু করলাম। তারপর একদিন বড় হলাম।—যাক সে কথা এবার গল্প, না ?'

সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল 'হ্যাঁ হ্যাঁ—'

দাদি সুরু করলেন—'তিন রাজপুত্র, একজনের মাথা নেই, একজনের হাত নেই, একজনের পা নেই এমন তিন রাজপুত্তুর, তিন ঘোড়ায় চেপে, তিন ঘোড়ার আবার একটার মাথা নেই, একটার পা নেই, একটার শরীর নেই, এমন তিন ঘোড়ায় চেপে মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। কত বন কত জঙ্গল, কত নদ, নদী পেরিয়ে চলেছে তাদের ঘোড়া বেগে ছুটে। দুপুরের রোদ্দুর মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ করছে। তিন রাজপুত্তুর ক্লান্ত হয়ে পড়লেন কোথায় একটু বিশ্রাম করবেন, খিদেতেও পেট জ্বলে যাচ্ছে। খেতেও হবে। ঘুরতে ঘুরতে তিনটা গাছ পেলেন। একটা গাছের গোড়া নেই, একটা ওপড়ানো—একটা কাটা হয়ে গেছে। এমনি তিনটি গাছ পেয়ে ওরা মনের আনন্দে তিন ঘোড়া বেঁধে, গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।'

সুজয় হেসে বললে—'দাদির কি গল্প, গাছের তাহ'লে কি আছে যে তার ছায়াতে বসবে ?'

দাদি বললেন—'বাধা দিলে কি ক'রে গল্প হবে, বলত ?—'

রাণা রেগে বললে—'থাম না সুজয় দাদা, তুমি বল দাদি, তারপর ?'

'তারপর—' দাদি আবার সুরু করেন—'এখন খেতে হবে, কোথায় দোকান, কোথায় বাজার রান্নার সব কিনতে হবে'ত, তিনজনে তিনদিকে গেলেন।'

একজন—এক দোকান পেলেন তার চাল নেই, ঘর নেই, সেই দোকান থেকে নিয়ে এলেন এক হাঁড়ি, হাঁড়ির আবার তলা নেই। আর এক রাজপুত্তুর ঘুরে ঘুরে পেলেন এক দোকান তার মাল নেই মশলা নেই, সেখান থেকে নিয়ে এলেন চাল, আর একজন পেলেন এক দোকান তাতে ঘর নেই দোর নেই, ফাঁকা সেখান থেকে মাংস কিনে আনলেন। এক উনুন তৈরী হ'ল, কাঠ নেই—কয়লা নেই—উনুন ধরিয়ে ভাত মাছ চাপিয়ে নাইতে যাবেন। পুকুর কোথায়? খুঁজতে হবে ত? খুঁজতে খুঁজতে তিনটি পুকুর পেলেন। এক পুকুরে জল নেই, এক পুকুর বোঁজা, এক পুকুর কাটা হয়নি। তিন পুকুর পেয়ে তিন রাজপুত্তুর মহা আনন্দে নাইতে নামলেন। খুব স্নান করলেন, সাঁতার কাটলেন তারপর কাপড় ছেড়ে এসে দেখলেন রান্না তৈরী। তিনজনে খেয়ে গাছের নিচে শুয়ে, আরামসে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রোদ্দুর গড়িয়ে গেছে, পরিশ্রান্ত তিন রাজপুত্তুরের তখনও ঘুম ভাঙ্গেনি। হঠাৎ হেঁইও, হেঁইও, পাল্কী চলে হেঁইও, শব্দে ঘুম ভাঙ্গল তাঁদের চোখ রগড়ে রাস্তার দিকে চেয়ে উঠে পড়লেন তিনজন। শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল তাঁদের দিকে। তিন পাল্কী দেখা গেল, রাজপুত্তুররা উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এল পাল্কী ঠিক তাঁদেরই কাছে। পাল্কীতে পরমাসুন্দরী তিন রাজকন্যা বেড়াতে বেরিয়েছেন। অপরূপ তাঁদের রূপ, একজনের গলায় গলগণ্ড, একজনের হাতে গোদ, একজনের পায়ে গোদ। রাজপুত্তুররা ঐ রূপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। মনে মনে সবাই পণ ক'রে বসলেন এদের ছাড়া তাঁরা আর কাউকে বিয়ে করবেন না।

রাজকন্যারাও তিন রাজপুত্তুরকে দেখে পাল্কী থেকে নামলেন। যার মাথা নেই সেই রাজপুত্র পছন্দ করলেন, যার গলায় গলগণ্ড। যার হাত নেই, যার হাতে গোদ। যার পা নেই, তিনি পছন্দ করলেন যার পায়ে গোদ। একে একে সবাই যার যার পছন্দ মতো রাজকুমারীকে নিজের নিজের অভিপ্রায় জানালেন। রাজকুমারীরাও তো মহাসুখী, এমন সুন্দর রাজপুত্রদের বিয়ে করতে কার না ইচ্ছে বল?

বন থেকে ফুল এনে মালা গেঁথে ওখানেই তাঁরা মালাবদল ক'রে নিলেন মনোমত পাত্রীর সঙ্গে। খবর গেল রাজার কাছে। রাজাতো আহ্লাদে আটখানা। আলো, বাজনা, নিয়ে লোকজন, পাইক, পেয়াদা, শাস্ত্রী, চৌদল নিয়ে এলেন এদের নিয়ে যেতে।

তিন রাজপুত্র তিন রাজকন্যা নিয়ে রাজপুরীতে এলেন। চারদিকে বেজে উঠ্‌ল শাঁখ, মেয়েরা দিলেন হুলুধ্বনি, বরণ ক'রে তুললেন রাজকন্যাদের। রাজপুরীতে আনন্দের হাট বসে গেছে। কত রাত ধ'রে গান চলল। কত খাওয়া দাওয়া। উৎসবের জাঁকজমকে রাজপুরী গম্‌গম।

সব মিটে যেতে, রাজামশাই বললেন—'ডাক্‌ ছুতার মিস্ত্রী'।

মিস্ত্রী কাঁপতে কাঁপতে ভয়ে ভয়ে বল্লে—'হুজুর, কি আদেশ।'

'রাজকুমারীর গলগণ্ড কেটে, রাজপুত্রের মাথা বানাও।'

'যো আজ্ঞে।'

'রাজকুমারীর হাতের মাংস দিয়ে, রাজপুত্রের হাত বানাও।'

'যো আজ্ঞে।'

'রাজকুমারীর পায়ের গোদ কেটে, রাজপুত্রের পা বানাও।'

'যো আজ্ঞে।'

তিনদিন তিন রাত পরিশ্রম, কাটা, আর সেলাই, করে করে, তৈরী হ'ল মাথা নেই রাজপুত্রের মাথা, হাত নেই যার তার হাত, পা নেই যার তার পা। রাজকুমারীদের গলা হাত আর পা হ'ল সুন্দর। সুখের সংসার হল রাজা আর রাণীর।

আন্তি বুড়োর পদ্যি

সত্যজিৎ রায়

The White Knight's Song—Lewis Carroll.

বলবার আছে যা' তা' বলি আজ তোরে
  (বলবার বেশি কিছু নেই)
দেখেছিনু বুড়ো এক ফটকের পরে,
    সব্বার থুত্থুড়ে যেই।
আমি তারে শুধোলাম, 'বুড়ো তুই কেরে ?
    দিন তোর কাটে কোন কাজে ?'
জবাবেতে বুড়ো কথা বলে তেড়ে মেড়ে
    মোর কানে কিছু ঢোকেনা যে !

বুড়ো বলে, 'ধরি আমি ফড়িং-এর ছানা
  যেই ছানা ঘুম দেয় মাঠে,
তাই দিয়ে রেঁধে নিয়ে মোগলাই খানা
    ফেরি করি গঞ্জের হাটে ;
সেই খানা খেয়ে নিয়ে খালাসির বেটা
    পাড়ি দেয় সাগরের জলে—
এই করে কোনমতে খেয়ে আধপেটা
    কায়ক্লেশে দিন মোর চলে।'

বুড়ো বকে ; আমি পড়ি চিন্তার ফেরে—
    দাড়ি যদি কারো হয় সবুজই,
থুৎনির সামনেতে হাতপাখা নেড়ে
    সেই দাড়ি ঢাকা যায়না বুঝি ?
বুড়ো দেখি চেয়ে আছে কাঁচুমাচু মুখে,
    আমি ভাবি কী যে বলি তারে,
তারপরে মেরে এক কীল তার বুকে
    বলি, 'বল্, আয় কিসে বাড়ে।'

বুড়ো বলে, 'শোন, আমি পাহাড়ের বুকে
খুঁজে ফিরি ঝরণার জল,
সেই জল পেলে পরে চক্‌মকি ঠুকে
চট করে জ্বালি দাবানল।
তার ফলে সেই জল টগ্‌বগ্‌ ফুটে
হয়ে যায় মকরধ্বজ,
কোবরেজে এসে তায় নেয় লুটেপুটে,
আমি পাই কী বা সেটা বোঝ!'

এদিকেতে আমি ভাবি, আর সব ছেড়ে
খাই যদি শুধু পাটিসাপটা,
ওজনটা দিন দিন যাবেনা কি বেড়ে?
বাড়বেনা উদরের মাপটা?
এইবার বুড়োটার কাঁধ দুটো ধরে
বেশ করে দিয়ে তিন ঝাঁকি
বলি, 'তোকে বারবার শুধোনোর পরে
প্রশ্নটা বুঝছিস না কি?'

বুড়ো বলে, 'কেয়া বনে—কাঞ্চির তীরে
খুঁজি আমি শুশুকের চোখ,
সেই চোখে গাঁথি হার মাঝ রাত্তিরে,
সেই হার কেনে বাবুলোক।
এইভাবে বলো কেবা হয় লাখপতি,
সোনাদানা হয় আর কজনের?
এই হার বেচে কার হয় উন্নতি,
দেড় পাই দাম যার ডজনের?'

'খন্দেতে খুঁজি আমি খাস্তা কচুরি,
ফাঁদে ধরি কাঁকড়ার ছানা,
জঙ্গলে জঙ্গলে করি ঘোরাঘুরি,
পাই যদি হংসের ডানা।

বোঝো তবে,' বলে বুড়ো এক চোখে হেসে,
 'কত খেটে হয় মোরে খেতে।
বাবা তুমি বেঁচে থাক। অ্যান্দুরে এসে
 মোর কথা শোন কান পেতে।'

আমি ভাবি বকবক করে বুড়ো কী যে,
 একবার মন দিয়ে ভাবে কি—
মর্চেই ধরে যদি হাবড়ার ব্রীজে,
 সরবৎ ঢাললেই যাবে কি?
যাক্, তবু বলবই বুড়ো লোক খাশা,
 খাশা তার রোজগার ফন্দী,
বেঁচে থাকে সেও যেন—এই মোর আশা।...
 এইবার নিজ কাজে মন দিই।

সেই থেকে কভু যদি বুড়ো আঙ্গুলে
 লেগে যায় শিরীষের আঠা,
অথবা যদিবা দেখি হিসেবের ভুলে
 ডান বুটে ঢোকে বাম পা-টা,
কিম্বা হঠাৎ যদি বাটখারা ভারী
 পায়ে পড়ে থেঁৎলায় নখটা
তক্ষুনি মনে পড়ে মুখখানা তারই
সেই থুথ্‌ড়ে বুড়ো (তারে ভুলতে কি পারি?)

যার চুল সব সাদা, যার সাদা গোঁফদাড়ি,
যার হাবভাবে মনে হয় যেন গোবেচারী,
যার বুক ভরা দুঃখেতে ধুক্ ধুক্ নাড়ী,
যার চোখ দুটো জ্বল জ্বলে মুখখানা হাঁড়ি,
যাকে দূর থেকে মনে হয় দাঁড়কাক ধাড়ি,
যার ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস পড়ে তাড়াতাড়ি—

সেই ফটকেতে বসা বুড়ো লোকটা।

জেনে রাখো ঃ—

নিউ ইয়র্কের তিন শো বছর

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরটিকে দেখে যতই চকচকে নতুন, অতি আধুনিক মনে হবে না কেন, আসলে তার বয়সের গাছপাথর নেই। এ বছর তার তিনশো পুরবে। অবিশ্যি লণ্ডন সহর তার চেয়ে অনেক বেশী পুরোনো, তবে সেটা তাকে দেখলেই বোঝা যায়। নিউ ইয়র্ক সহর কেবলি বাড়ছে, কেবলি বদলাচ্ছে, কেবলি রং ফেরাচ্ছে, ভোল পালটাচ্ছে। এমন কি বহুকাল আগে নিউ ইয়র্কের একজন মেয়র বলেছিলেন এ সহরটা তৈরী যদি কখনো শেষ হয় তো দেখতে হবে খাসা! এক বছরের অনুপস্থিতির পর নিউ ইয়র্কে ফিরলে, তাকে আবার নতুন করে চিনতে হয়, এই রকম একটা প্রবাদও আছে।

সহরটা দূর থেকে দেখতে আশ্চর্য, অদ্ভুত; বিরাট বিরাট সত্তর আশী একশো দেড়শো তলা বাড়ি-গুলোকে মনে হয় সিমেণ্ট কংক্রিট আর কাঁচের পর্বতমালা! আর রাতে যখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলে সে যে কেমন দেখায় তা কল্পনা করা যায় না।

নিউ ইয়র্ক সহর প্রতিষ্ঠা হবার প্রায় চল্লিশ বছর আগে, হল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিকরা জায়গাটাকে স্থানীয় রেডইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল। দাম পড়েছিল চব্বিশ ডলারের মেকি গয়নাগাঁটি! তারপর ঐ জায়গাতে নিউ অ্যাম্‌স্টারড্যাম নাম দিয়ে ছোট্ট একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল রিচর্ড নিকল্‌স্‌ বিনা যুদ্ধে গ্রামটাকে দখল করে, নিউ ইয়র্ক নাম দিয়ে একটি সহর পত্তন করলেন। সেই নিউ ইয়র্কই বেড়ে বেড়ে তার বর্তমান রূপ নিয়েছে। নিউ ইয়র্ক যে শুধু একটা বিরাট সহর তা নয়, এখানেই আমেরিকার প্রাণের কেন্দ্র; আমেরিকার অর্থনীতি, ব্যবসা, শিক্ষা, শিল্পচর্চা, পরিবহন, পুস্তক প্রকাশন, সব কিছুর হৃৎ-পিণ্ডটাই যেন এখানে। আয়তনটিও নেহাৎ কম নয়, সহরের যেখানে ব্যবসা ও শিল্পের কেন্দ্র, সে জায়গাটির মাপ ১৫½ বর্গমাইল; সেখানে রোজ ৩৩ লক্ষ লোক যাওয়া আসা করে। আশী লক্ষ লোক বাস করে এই সহরে। এরা নানান দেশের, নানান জাতের, নানান ধর্মের মানুষ।

এইটাই আমেরিকার একটা বিশেষত্ব, প্রায় সমস্ত ইউরোপের মানুষ এখানে এসে মিশে গিয়ে 'আমেরিকার মানুষ' বলে পরিচিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকে স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করবার আশায় দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল। তার উপর এখানেই 'ইউনাইটেড নেসন্স' এর কেন্দ্র; ১১৪ টি দেশের প্রতিনিধিরাও এখানে বাস করে। অনেকে তাই নিউ ইয়র্ককে "পৃথিবীর রাজধানী" নাম দিয়ে থাকে।

ভারি ঘটা করে এ বছর নিউ ইয়র্ক তার তিন শো বছরের জন্মদিনের উৎসব পালন করছে। উৎসবের নাম হল "নিউ ইয়র্ক নিখিল বিশ্ব প্রদর্শনী"; এই প্রদর্শনী দু'বছর ধরে চলবে; কেউ হেঁটে তার একশো ভাগের এক ভাগও দেখতে পারবে না; গাড়ি চেপে ঘুরতে হবে, তার চমৎকার ব্যবস্থাও আছে। শোনা যাচ্ছে নাকি সাত কোটি অতিথি আসবে নিউ ইয়র্কের জন্মোৎসবে যোগ দিতে।

তোমরাও যাবে নাকি?
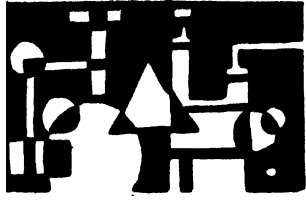
অ্যাটমের ইতিকথা

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

আজকালকার দিনে অ্যাটমের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে সেই যে একদিন পৃথিবীশুদ্ধ লোককে ভয়ানক রকম চমকে দিয়ে ফাটল ছুটি অ্যাটম বোমা আর সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ছুটি শহর ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেল—তার পর থেকে অ্যাটমের কথা না জেনে কি আর কারো নিস্তার আছে? কি এই বিচিত্র বস্তু অ্যাটম? কোথা থেকে এর আগমন? এতদিন এর নাম শোনাই বা যায়নি কেন? অ্যাটম সংক্রান্ত নানারকম খবর প্রায়ই কাগজে দেখে এর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কৌতূহল হওয়াটা স্বাভাবিক। শোনা গেছে অ্যাটম বোমার চেয়ে আরো বিকট, আরো ভয়াবহ শক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে ঐ অ্যাটমের মধ্যে, শোনা গেছে যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াও অ্যাটম-দৈত্যকে পোষ মানিয়ে লাগান হয়েছে মানুষের কল্যাণকর কাজে, শোনা গেছে নটিলাস নামে এমন অ্যাটম শক্তি-চালিত সাবমেরিনের কথা যাকে জ্বালানী ভর্তি করার জন্য কোনদিন কোন বন্দরে থামতে হবে না, শোনা যাচ্ছে যখন পৃথিবীর সব কয়লা আর পেট্রোলিয়ম ফুরিয়ে যাবে তখন সমস্ত রকম তেজের ইন্ধন জোগাবে অ্যাটম—উনুনে জ্বলবে আগুন হয়ে, চালাবে কলকারখানা, জাহাজ প্লেন, পাখা, ইস্ত্রী আর রেডিও।

মানুষ কবে প্রথম অ্যাটমের কথা ভেবেছিল? সত্যি বলতে কি এই আশ্চর্য বস্তুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভাল করে জানা গেছে মাত্র কিছুদিন আগে, কিন্তু এর কথা নিয়ে যে আড়াই হাজার বছর আগেও লোকে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছে পুরাকালের দর্শনে, ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ছোটরা যেমন কি করে কি হল, কেমন করে হল, কেন হল জানতে চেয়ে চেয়ে বড়দের অতিষ্ঠ করে দেয় ঠিক তেমনি সভ্যতার আদিযুগে যখন চারিদিকের জীবজগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট তখন তাদেরও মনে ছেলেমানুষের মত নানারকম আজগুবী প্রশ্নেরা ভীড় করত।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসে আনেক্সাগোরাস নামে এক দার্শনিক ছিলেন। বস্তু কি দিয়ে তৈরী এই চিন্তা তাঁকে কেবলই উদব্যস্ত করত। তিনি ভাবলেন আচ্ছা, কোন জিনিসকে নিয়ে যদি ভাঙতে আরম্ভ করি তাহলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়! ধরা যাক এক টুকরো সোনাকে আধখানা করলাম, তারপর তার একটি টুকরো নিয়ে তাকেও আধখানা করলাম, তারপর সেই

আধকেও আধ, তাকেও আধ, তাকেও আধ—ভাবতে ভাবতে আনেক্সাগোরাসের আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার উপক্রম। তিনি দেখলেন সৃষ্টির শেষদিন অবধি তিনি যদি ঐ টুকরোটিকে কেবলই আধখানা করে যান তবু তাঁর আধখানা করা কোনদিনই ফুরোবে না। তার মানে বস্তু অন্তহীন, বস্তুর শেষে কোনদিন পৌঁছন যাবে না।

প্রায় ঐ সময়েই গ্রাসে ছিলেন ডেমোক্রিটাস নামে আর একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি দেখলেন পৃথিবীতে সব কিছুই চলেছে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ধরে। পৃথিবীতে সব কিছুরই একটা সুচারু রূপ আছে রীতি আছে। তা থেকে তার মনে হল বস্তুর আদিতে এমন কোন জিনিস আছে যার কোন বদল নেই। তা যদি না থাকত তাহলে মেঘের পুঞ্জের মত সব সময়ই এই দৃশ্যমান জগত ভেঙ্গে চুরে আকার বদলাতে থাকত। সুতরাং ডেমোক্রিটাসের বদ্ধমূল ধারণা হল পদার্থের আদিতে আছে এক ধরণের কণা, তিনি তার নাম দিলেন অ্যাটম—তার কোন বদল নেই, কোন শক্তি তাকে বিনাশ করতে পারে না, না ভেতর থেকে, না বাইরে থেকে। বস্তু তৈরী হয়েছে অ্যাটম নামে এই কণিকা দিয়ে, এই কণার চেয়ে ছোট আর কিছু হতেই পারে না, গ্রীক ভাষায় অ্যাটমস বলে একটা কথা আছে, তার মানে যাকে আর কাটা যায় না। সেই থেকে অ্যাটম কথাটির উৎপত্তি।

ডেমোক্রিটাসের মতে এই অ্যাটম বা বস্তুর আদি কণা আছে বলেই পাখীর ডিম থেকে জন্ম নিচ্ছে একই রকম পাখী, গাছের বীজ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে একই রকম গাছ। লুক্রেশিয়াস নামে এক গ্রীক কবি ডেমোক্রিটাসের কল্পনায় রঙ চড়িয়ে এক বিরাট কবিতা লিখলেন। যে গুণে প্রতি বসন্তে এক গাছে একই রকম ফুল ফোটে, যে গুণে একই জাতের পাখীদের পাখায় জাগে একই রঙ—সে সবের মূলে আছে ঐ শাশ্বত বস্তুর কণা—যার নাম অ্যাটম—যার ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই, যা কেবল স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুকে দেয় আকার, রূপ, বর্ণ।

আড়াই হাজার বছর আগেও যে মানুষের মাথায় এই সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণার উদ্ভব হয়েছিল সেটা খুবই আশ্চর্যের কথা। ভাবলে অবাক হতে হয় কি করে কোনরকম পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেণ্ট ছাড়াই ডেমোক্রিটাস পদার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক অনুমান করেছিলেন। তাঁর অনুমান ঠিক না ভুল সেটা অবশ্য তাঁর জানার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু বহু শতাব্দী পরে বৈজ্ঞানিকদের হাতে যখন নানারকম এক্সপেরিমেণ্টের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হল তখন বোঝা গেল ডেমোক্রিটাসের অনুমান কতদূর সত্যি। প্রায় ঐ সময়েই, কি তারও আগে ভারতবর্ষের দার্শনিকেরা পদার্থ কি দিয়ে তৈরী এই নিয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং এই নিয়ে চমৎকার সব সিদ্ধান্ত বেদে লিখে গেছেন। অ্যাটমের প্রথম ধারণা যে তাঁদেরই মাথায় এসেছিল একথাও অনেকে বলেন। তবে তাঁদের রচিত সূত্রগুলিতে সন তারিখ ঠিকমত না থাকার ফলে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। কারো কারো মতে গ্রীকদের কাছ থেকেই হিন্দুরা পরমাণুবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। সেটা সত্যি হোক বা না হোক বৈশেষিক দর্শন ও পরে জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে পরমাণু নিয়ে গভীর আলোচনা আছে। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে পদার্থের সবচেয়ে ছোট অংশের নাম অণু—এই অণুর না আছে আদি মধ্য বা অন্ত, না আছে বিনাশ। অ্যাটম সম্বন্ধে

বহুদিন পরে ইউরোপে যে সব তথ্য মেনে নেওয়া হয় তার অনেকগুলিই পাওয়া যায় জৈন দর্শনে। এমন কি অ্যাটমের ভেতরে কি ধরণের শক্তি আছে, তারা কেমন ভাবে কাজ করছে ইত্যাদি নানা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা হয়েছে এতে। এই পর্যন্ত পৌঁছতে বাকী পৃথিবীর দুহাজার বছর লেগে গিয়েছিল।

ডেমোক্রিটাসের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এঁর অনুমান মোটামুটি ভাবে নির্ভুল হলেও তার মধ্যে একটা গোড়ায় গলদ থেকে গিয়েছিল। অ্যাটমের যে অবিভাজ্য রূপ কল্পনা করে তার নামকরণ করা হল, পরে অ্যাটমের কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেখা গেল যে এমন কি অ্যাটমকেও ভাঙ্গা যায়। তবে সেকথা অনেক পরে আসবে।

ডেমোক্রিটাসের এই থিওরী বহুদিন পর্য্যন্ত আলোচিত হয় নি। তার প্রধান কারণ অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটল লোকটি ছিলেন বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। নানা বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির মত এখনও পণ্ডিতমহলে তাঁর নাম ভক্তিভরে স্মরণ করা হয়। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় ডেমোক্রিটাসের অ্যাটমিক মতবাদে এঁর একেবারেই আস্থা ছিল না। বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ছিল একেবারে অন্য ধরণের মত। তাঁর মতে পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থ আছে চারটি—আগুন, হাওয়া, জল ও মাটি। যা কিছু দেখতে পাই আমরা, এমন কি আমরা নিজেরাও আকার পেয়েছি এই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে। এই চারটি বস্তুই শাশ্বত, চিরস্থায়ী। এদের বিনাশ নেই।

মধ্যযুগে ইউরোপের অল্পশিক্ষিত তান্ত্রিকদের কাছে এই থিওরীটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তারা অ্যারিস্টটলকে কতটা বুঝেছিল সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তারা মনে করে নিল যেহেতু অ্যারিস্টটলের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জিনিসই কম বেশী পরিমাণে আগুন, বাতাস, জল, মাটি এই চারটি জিনিসের যোগফলে উৎপন্ন, সুতরাং লোহা, সীসে, তামা ইত্যাদি পদার্থকে সোনায় পরিণত করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। ব্যাপারটা শুধু ঐ আগুন, বাতাস, জল মাটি এই চারটি মৌলিক দ্রব্যের পরিমাণ কম-বেশী করা। মানুষের মনে লোভের চেয়ে বড় পাপ নেই। এই লোভের বশবর্তী হয়ে সেই সময় যে কত ভুয়ো যাদুকরের উদয় হল, তার ইয়ত্তা নেই। তারা বললে তারা যে কোন লোককে এনে দিতে পারে রাজার সম্পদ। বলাই বাহুল্য এই সব কারসাজীর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। চতুর্দশ শতাব্দী অবধি তাই ইউরোপের মহা দুঃসময়। লোকে কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল। অ্যারিস্টটলের কথা নির্বিচারে মেনে নেওয়াটাই হয়ে দাঁড়াল একমাত্র রেওয়াজ। এমনও সময় গেছে যখন অক্সফোর্ড কেমব্রিজে অ্যারিস্টটলের বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করলে ছাত্রদের জরিমানা দিতে হত।

এই দুহাজার বছর ডেমোক্রিটাসের অ্যাটমিক মতবাদ চাপা পড়ে রইল। ইতিমধ্যে অ্যারিস্টটলের মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দার্শনিকের উদয় না হলে হয়ত পরবর্তীকালে অ্যাটমের সন্ধান এতটা পিছিয়ে যেত না। পৃথিবীর চেহারাই অন্যরকম হয়ে যেত কিনা তাই বা কে জানে। অ্যাটমের কেন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে নতুন বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স,

তার বয়স মাত্র তিরিশ বছর। তবে মোটামুটিভাবে এর সূত্রপাত হয়েছে ঠিক বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার কয়েক বছর আগে। ১৮৯৬ সালে অ্যাটম সম্বন্ধে যে কৌতূহল ও গবেষণার সূত্রপাত হল সেই পর্যন্ত কি করে পৌঁছন গেল তার ইতিহাসও খুব চমকপ্রদ। সে কথা বলতে গেলে আবার ফিরে যেতে হয় সেই রেণেশাসের সময়, যখন কুসংস্কার ও অন্ধ আনুগত্যের আওতা থেকে মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও চিন্তা সবে ছাড়া পেয়েছে। সেই সময় এমন সব বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল যাঁরা শাস্ত্রের কথাই ধ্রুব সত্য বলে না মেনে যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাইলেন, চাইলেন বুদ্ধি দিয়ে জানতে। শুরু হল বিজ্ঞানে এক্সপেরিমেণ্ট—হাতে কলমে পরীক্ষা করে সন্দেহ ভঞ্জন করার যুগ।

ক্রমশঃ

হাত পাকাবার আসর

শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত

গ্রাহক নং—২৬০১ বয়স—১৪ বৎসর

ভাই সন্দেশ—

নিখিল বঙ্গ কবিতা সংঘে
হতে চাই ভাই সভ্য
মঞ্জুর কর আবেদন মোর
এ আসরে আমি নব্য।
হয়তো আমার নামটি হবে না
'গণ্ডালু' দলভুক্ত
'বীসিন্দিষ্ঠা' নামটি শুনতে
একান্তই কি তিক্ত ?
বীণার নামের রয়ে গেল 'বী'
হাসির 'হা' হল হাওয়া
নন্দিতার শুধুই '(অ গো) ন্দি'
শর্মিষ্ঠার (আমি) ষ্ঠা গেল পাওয়া।
মালুর মতন কাব্যপ্রতিভা
হয়তো আমার নেই
কালুর মতন সভাপতি হতে
ক্ষমতা রাখে বা কে-ই ?
কর্মসচীব হয়ে আছে টুলু
বুলু আছে সহকারী
বীসিন্দিষ্টার কার্যতালিকা
জানিও হে তাড়াতাড়ি

বীর হাবুলদার বীরত্ব

সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাহক নং ৭৪৭। বয়স ১৩

"এই-ই পড়ে যাবি যে" আমাকে একটা গর্তে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে বিকট ভাবে চেঁচিয়ে উঠল হাবুলদা।

শীতকাল। অ্যানুয়েল পরীক্ষা হয়ে গেছে। তাই আমরা সবাই মিলে হাবুলদাকে ধরে বেঁধে পাড়াগাঁয়ের দিকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম, যদিও হাবুলদা প্রথম ঐ দিকে যেতে রাজী হয়নি। হাবুলদা আমাদের চেয়ে ৬-৭ বছরের বড়। তিনি হলেন এক নম্বরের গুলবাজ, অর্থাৎ মিথ্যা বড়াই করতে পাড়ার মধ্যে সেরা। যদিও আমরা তার কাছে তার গল্পের কোন প্রতিবাদ করতাম না। তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নয় ভয়েতে। পথে যেতে যেতে হাবুলদা গল্প আরম্ভ করল (বলা বাহুল্য সেই গুল গল্পই)—

"আমার বয়স তখন তেরো কি চোদ্দ অর্থাৎ তোদের মতন বয়স। তখন আমার বাবা চাকরী করতেন আসামে, তাই আমরাও বাবার সঙ্গে সেইখানেই থাকতাম, রাত্রিবেলা একদিকে শেয়াল ডাকছে হুক্কা হুয়া করে অন্যদিকে আরও কত সব জানোয়ার তাদের তোরা কখনও চোখে তো দেখিসই নি এমন কি নাম পর্যন্ত শুনিস নি।"

"তোমার ভয় করত না হাবুলদা?" কথার মাঝে প্রশ্ন তুলল কণক। হাবুলদা একটা তুড়ি দিয়ে বলল, "আমার আবার ভয়, ওসব শুনতে শুনতে কান পচে গেছিলো। কতদিন বর্ষার রাত্রে একা একা আম কুড়োতে যেতাম। একদিন কি হয়েছিল শোন্, আমি তো আম কুড়োতে গেছি এমন সময় একটা শেয়াল আমার দিকে তাড়া করে এল, আর আমিও অপেক্ষা না করে যেই একটা ইট তুলে মেরেছি এমনি বেচারীর একটা পা মট্ করে ভেঙে গেল" এই বলে হাবুলদা শেয়ালটার পায়ের জন্য আক্ষেপ করতে লাগল।

"তুমি আম খেতে খুব ভালবাস না হাবুলদা?" প্রশ্ন বাবলুর। এই কদিন হল সে কণকের বাড়ি বেড়াতে এসেছে, কণকের মাসতুত ভাই না কে হয়। আমাদের চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট। এর মধ্যেই হাবুলদার প্রিয় ভক্ত হয়ে পড়েছে। গল্পে বাধা দেওয়াতে হাবুলদা রেগে গিয়ে বলল, "এই জন্যই কুচো চিংড়িদের সঙ্গে আনতে নেই।" তারপরই অ্যাবাউট টার্ণ হয়ে বলল, "চল ফিরে যাওয়া যাক।" ফেরার পথে শুরু করল আবার সেই গাঁজাখুরি গল্প।

"একদিন কয়েকজন বন্ধু মিলে বেড়াতে বেরিয়েছি সঙ্গে যত সব ভীতু বন্ধুগুলো।" হাবুলদা এমন ভাব দেখালে যেন নিজে খুব সাহসী। ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল, সবাই ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছি। শুনেছিলুম, কোন্ জংগল থেকে একটা মানুষ খেকো বাঘ এসেছে। একটু

এগিয়ে গিয়ে যেই মোড় বেঁকেছি ওঃ বাবা সামনে দেখি সেই বিরাট মানুষ খেকো বাঘ। আমার সঙ্গে ব্যাঘ্র মশায়ের একেবারে চোখাচোখি। আমার বন্ধুরা তো সব বাবারে মারে করে যে যে দিকে পারল ছুট লাগাল। আমি হাতে একটা চেলা কাঠ তুলে এগোতে লাগলাম, যেই বাঘটা হালুম করে লাফিয়েছে অমনি আমি—"

এই পর্যন্ত শুনেই দেখি হাবুলদা হাওয়া। শেষে অনেক খুঁজে দেখি ওমা আমি যে গর্তটায় পড়ে যাচ্ছিলাম সেই গর্তটায় পড়ে হাবুলদা কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছে। বাবলুর মাথায় তখনও আমতত্ত্বই ঘুরছে (আম সত্ত্ব নয়) সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বলল, "গর্তে আম পড়েছিল নাকি গো ?"

শীতকালে যে আম হয় না সেটা বাবলুর মাথায় ঠিক আসেনি।

ক্রীড়া জগৎ

অরবিন্দ দাশগুপ্ত

ফুটবল

এ বৎসরের প্রথম ডিভিসন লীগ খেলা শুরু হয়েছিল। সম্পূর্ণ প্রাণহীন পরিবেশের মধ্যে, সেই ড্র আর ড্র, তাতে ছিল না কোন বৈচিত্র্য, কোন উত্তেজনা অথবা ক্রীড়া-নৈপুণ্য। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল কি করে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও বি, এন, আর এর মতন দলগুলি পাল্লা দিয়ে পয়েন্টের পর পয়েন্ট নষ্ট করতে শুরু করেছিল। এর মধ্যে মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল দলের প্রথম খেলাটা এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ খেলা বলে অভিহিত করা যায়। তার পরেই উল্লেখযোগ্য খেলা ছিল ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মহোমেডান স্পোর্টিং এর খেলা। এখন পর্যন্ত শুধু মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল অপরাজিত রয়েছে। ইস্টার্ণ রেলওয়ে এ বৎসরের লীগের প্রতিযোগিতায়, মোহনবাগান ও ইস্ট্‌বেঙ্গলের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে চলেছে। তার ঠিক পিছনেই রয়েছে বি, এন, আর, দল। আর সাধারণ দলগুলির মধ্যে স্পোর্টিং ইউনিয়ন উন্নত ধরণের ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা ইস্ট্‌বেঙ্গল ও মোহনবাগানের কাছ থেকে একটি করে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। লীগের কোঠায় বর্তমান প্রথম ৫টী দলের স্থান নীচে উল্লেখ করা হোল :—

		মোট খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র	পয়েন্ট
মোহনবাগান	—	১৩	৭	০	৬	২০
ইস্টবেঙ্গল	—	১৩	৬	০	৭	১৯
ইস্টার্ণ রেলওয়ে	—	১৪	৬	১	৭	১৯
বি, এন, আর	—	১৩	৬	২	৫	১৭
এরিয়ান্‌স	—	১২	৬	৩	৩	১৫

খেলাধুলায় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকার প্রতি বৎসর দেশের বাছাই খেলোয়াড়দের **অর্জুন পুরস্কার** দিয়ে থাকেন। এ বৎসর মোহনবাগান ও ভারতীয় একাদশের কেপটেন শ্রীচুনী গোস্বামী সে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার নির্বাচন মোহনবাগানের সভ্যদের বিশেষ করে ও বাংলা-দেশের ক্রীড়ামোদীদের সাধারণভাবে সুখী করেছে। মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকে এক অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত গোস্বামী বলেছেন যে মোহনবাগান এর পক্ষ হয়ে খেলতে পারার সুযোগ লাভ করেই তিনি খেলা শিখবার সুযোগ পেয়েছেন ও সেজন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

ইরাণের সঙ্গে ফিরতি খেলাতেও ভারতবর্ষ পরাজিত হয়েছে। খেলায় শুরুতেই ভারত প্রথম গোল করেছিল। তাতে অনেকেই আশা করেছিলেন ভারত বোধহয় এ খেলায় প্রথম পরাজয়ের প্রতিশোধ নিবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইরাণই জিত্‌ল ৩—১ গোলে। ভারতীয় দলের পরাজয়ের মূল কারণ দলীয় সংহতির অভাব।

ক্রিকেট :

ইংলণ্ড ভ্রমনরত অস্ট্রেলিয়ান একাদশ তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড দলকে ৮ উইকেটে পরাজিত করেছে। অস্ট্রেলিয়ান দলের বাছাই খেলোয়াড়দের নাম সর্বপ্রথম ঘোষণা হবার পর অনেকে মন্তব্য করেছিলেন যে অনেক বৎসরের মধ্যে এত দুর্বল অস্ট্রেলিয়ান দল ইংলণ্ড সফরে আসে নি এবং ইংলণ্ডের কাছে তাদের পরাজয় অবধারিত। প্রথম দুটি টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিত হলে ইংলণ্ডের খেলাই হয়েছিল বেশী আকর্ষণীয়! কিন্তু তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ন জয়লাভ করেছে। ভূতপূর্ব অস্ট্রেলিয় অধিনায়ক হ্যামেট লিখেছেন ব্যাটিং বোলিং, ফিল্ডিং অর্থাৎ খেলার সর্ব বিভাগেই অস্ট্রেলিয়া উন্নততর ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখিয়েছে। এ দুদলের মধ্যে আরও দুটী টেস্ট ম্যাচ খেলা হবে। এ দুটো খেলার ফলাফলের উপর নির্ভর করবে কোন দল এবৎসর 'এসেজ' (ASHES) জয় করবে। তৃতীয় টেস্টে জয়লাভ করে অস্ট্রেলিয়া স্বভাবতই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে ও তাদেরকে পরাজিত করা ইংলণ্ডের পক্ষে হয়ত সম্ভবপর হবে না। তবে ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যৎবাণী করা নিতান্ত বিপদজনক।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের সংক্ষিপ্ত ফলাফল :—

		১ম ইনিংস		২য় ইনিংস
ইংলণ্ড	—	২৬৮	—	২২৯
		পার্কস—৬৮		(বেরিংটন—৮৫)
		ডেক্‌স্‌টার—৬৬		
অস্ট্রেলিয়া	—	৩৮৯	—	১১১
		(চার্জ্জ—১৬০		(রেডপাথ—৫৮)
		লড়ী—৭৮)		নট আউট

টেনিস

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বেলডন চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শেষ হয়েছে। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কৃষ্ণান এবার যোগ দেন নি। ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিলেন প্রেমজিৎলাল ও জয়দীপ মুখার্জী। জয়দীপ মুখার্জী ৪র্থ রাউণ্ডে পরাজিত হন। অস্ট্রেলিয়ার রয় ইমার্সন (Emerson) তার নিজের দেশের ফ্রেড স্টোলকে ফাইনেলে পরাজিত করে এ বৎসরের চ্যামপিয়ন হয়েছেন। পর পর আট বার চেষ্টা করে এবার তিনি কৃতকার্য হয়েছেন। জয়লাভের পর তিনি মন্তব্য করেন যে বার বার হেরে তিনি জয়লাভের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। মেয়েদের সিঙ্গলস্ এ জয়ী হয়েছেন ব্রেজিলের মেরিয়া বুনো। তিনি ফাইনেলে গতবৎসরের চ্যামপিয়ান মার্গারেট স্মিথকে পরাজিত করেন। মেরিয়া বুনো ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে ও উইম্বেলডন বিজয়ী হয়েছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তার পর কয়েক বৎসর খেলায় যোগ দিতে পারেন নি।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

সিঙ্গলস

পুরুষদের : ইমার্সন ৬-৪ ; ১২-১০ ; ৪-৬ ও ৬-৩ সেটে ফ্রেডস্টোলকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের : মেরিয়া বুনো ৬-৪, ৭-৯, ও ৬-৩ সেটে কুমারী মার্গারেট স্মিথকে পরাজিত করেন।

ডাবলস্

পুরুষদের : বব হুইট ও ফ্রেডস্টো ৭-৫, ১১-৭ ও ৬-৪ সেটে ইমার্সন ফ্লেচারকে পরাজিত করেন।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

বর্ষায়

জীবন সর্দার

'আজ কি বৃষ্টি হবে বলে তোমার মনে হয় ?'

আকাশের দিকে মুখ তুলে নীলাঞ্জন বললে, 'হতেও পারে। কেন না দেখতে পাচ্ছি,

'কোদালে-কুড়ুলে মেঘের গা',
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা' (য়ু)।

খনার বচন মিথ্যা হবার নয়।'

'খনার কথা ছেড়ে দিয়ে যদি তাদের কথাই ধর, যারা প্রথম ফসল বীজ বুনেছিল আর যারা পাল তুলে প্রথম পাড়ি দিয়েছিল। তারা সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। কখন মেঘ জমবে, জল হবে। হাওয়া কখন কোন দিক থেকে বইবে। তারপর, দিনের পর দিন দেখে দেখে

আবহাওয়ার মতিগতি তারা তিল তিল করে জেনে ফেললে। নীলাঞ্জন আমাকে এখানেই থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলে, আবহাওয়া বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ ?'

প্রশ্নটা সে সোজা ভাবেই করলে কিন্তু উত্তরটা কি এতই সোজা ! এ বিষয়ে আমার সামান্য পড়াশুনা ছিল। বললাম।

আমার কথার খেই ধরে নীলাঞ্জন বললে, 'বুঝলাম—বর্ষা এল, মাটি সরস হল, গাছ সবুজ থেকে আরও সবুজ হল। বই এর তথ্য আমার জানা নেই, চোখে দেখা বর্ষাকালের দশটা খাঁটি খবর আমাকে দিতে পার ?'

এইখানেই আমার ভয়। বই পড়ে না হয় কিছু বলতে পারি। কিন্তু চোখে দেখা খাঁটি ছোটদের চেয়ে কে ভাল বলতে পারে ! তবুও ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কোন্ দশটা খবর ?'

সে বলে গেল :

এক) বর্ষাকালে হাওয়া কোন দিক থেকে আসে ?

দুই) যে মেঘে বৃষ্টি হয় তার চেহারা কেমন ?

তিন) সব মেঘে কি একই ভাবে বৃষ্টি হয়—ঝমঝম, টাপুর টুপুর বা ইলশে গুড়ি ? যদি না হয় কোন মেঘে কেমন বৃষ্টি হয় ?

চার) বর্ষায় সব ধরনের পাতাই কি একই রকম ভিজবে—যেমন, মোটা-পুরু পাতা, পাতলা-পিছল পাতা বা শুঁয়োওলা পাতা ?

পাঁচ) বর্ষায় সব জায়গার মাটি কি একই রকম ভিজবে—ভিজে কাদা হবে, না চট করে জল শুকিয়ে যাবে ?

ছয়) বর্ষাকালে, দিনে ও রাতে কি একই রকম পোকা দেখা যাবে—তারা কি আগেও ছিল, না নতুন এলো ?

সাত) বর্ষায় ব্যাংরা সবাই কি একই ডাক ডাকে—সোনাব্যাং কোলাব্যাং এদের ডাকে মোটা বা মিহি সুরের কোন গরমিল আছে ?

আট) বর্ষাকালে ক'রকমের ব্যাংএর ছাতা দেখতে পাওয়া যাবে—কি ধরনের জায়গায় তারা হয় ?

নয়) এমন কোনো জাতের পাখি দেখেছ যাদের সাদা রং বর্ষাকালে হলদেটে হয়ে যায় ?

দশ) কি কি ফুল বর্ষাকালে বেশী দেখছ—তাদের গন্ধ বেশী না রং বেশী ?

খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি দশটার একটা প্রশ্নের উত্তরও আমি দিতে পারিনি। নীলাঞ্জন আমাকে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ অবধি সময় দিয়েছে। তার মধ্যে দশটা প্রশ্নের জবাব চাই।

প্রকৃতি-পড়ুয়া বন্ধুরা, তোমরা যদি পার, ঐ তারিখের মধ্যে যে কেউ যে কোনো প্রশ্নের উত্তর ভাল করে দেখে, আমাকে জানিয়ে দিও। সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় যাতে তোমাদের ঠিক উত্তরগুলো ছাপতে পারা যায়।

চৈত্র ১৩৭০ (এপ্রিল ১৯৬৪) এর প্রতিযোগিতার ফলাফল

১৩৭০ সালের সন্দেশের গ্রাহকদের নিম্নলিখিত লেখাগুলি সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

	লেখার নাম	লেখকের নাম	কত নম্বর পেয়েছে
প্রথম	পঞ্চুলাল	প্রিয়ংবদা দেবী	৪০৫
দ্বিতীয়	পলাশগড়ের রহস্য	নলিনী দাশ	৪০৩
তৃতীয়	হট্টমালার দেশে	লীলা মজুমদার ও প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩৩২
চতুর্থ	ঝানু চোর চানু	উপেন্দ্র কিশোর রায়	২৬৫
পঞ্চম	প্রফেসর শঙ্কু ও হাড়	সত্যজিৎ রায়	২২২
ষষ্ঠ	বাদুড় বিভীষিকা	”	১৯৫
সপ্তম	শিবু আর রাক্ষসের কথা	”	১৭৭
অষ্টম	পটলবাবু ফিল্মস্টার	”	১৬০
নবম	বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম	”	১৫৬
দশম	গল্পের চেয়ে ভয়ঙ্কর	ময়ুখ চৌধুরী	১২২

এ ছাড়াও এই লেখাগুলি অনেক গ্রাহকের ভাল লেগেছিল—(১১) তোমরাও আসতে পার—যদি এখানে আস—জয়ন্ত চৌধুরী (১২) উপেন্দ্র কিশোর রায়ের কথা—সুবিমল রায় (১৩) পাজি পিটার উপেন্দ্র কিশোর রায় (১৪) নিখিল বংগ কবিতা সংঘ—নলিনী দাশ (১৫) সদানন্দ স্বদেশলাল—সুবিনয়

রায় (১৬) মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র—গৌরী চৌধুরী। কোনও গ্রাহকের মতামতই সাধারণ মতামতের সঙ্গে হুবহু মেলেনি, তাই আমরা যাদের সব চেয়ে বেশি মিলেছে সেই হিসাব করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান ঠিক করলাম। এরা যথাক্রমে ১৫৲, ১০৲ ও ৫৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার পাবে। পুরস্কার এইমাসের মধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

প্রথম—গ্রাঃ নং ২৭০৩—শুভঙ্কর ঘোষ।

দ্বিতীয়—গ্রাঃ নং ১৯৩৪—অঞ্জন গুপ্ত।

য়—গ্রাঃ নং ২৩৪৫—কাঞ্চন কুমার সেন।

বৈশাখের ধাঁধার উত্তর

(১) টুকরোগুলির ওজন ছিল ১, ৩, ৯ এবং ২৭ সের। (দাঁড়িপাল্লার একদিকে ১ এবং অন্যদিকে ৩ দিলে ২ সের পাওয়া যাবে, ৩ ও ১ একধারে দিলে পাবে ৪ সের, একদিকে ৯ অন্যদিকে ৩ ও ১ দিলে ৫ পাবে আর শুধু ৩ দিলে পাবে ৬ সের। এইভাবে হিসাব করে যাও, ১ থেকে ৪০ পর্যন্ত প্রতি সের ওজন করতে পারবে)

(২) জলকণা (জল, বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি)

(৩) শঙ্খ অথবা শাঁখ।

উত্তর দাতাদের নাম:—

গ্রাহক নং	নাম
৩২	মধুচ্ছন্দা ফৌজদার।
১৮১	মিষ্টি ও বাসুবেন্দু গুপ্ত।
১৮৫	শকুন্তলা সেনগুপ্ত।
১৯২	অন্তরা ও ফুল্লরা সেন।
২৮২	অর্চনা দত্ত।
৩২০	অভিজিৎ দাশগুপ্ত।
৪২৪	অশোক ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়।
৫৯৩	দেবব্রত ভট্টাচার্য।
৮৫৩	তপন কুমার দত্ত।
১৩১৬	অমিতা ভদ্র।
১৪৮০	সুচিত্রা সেন।
১৮২১	শিবানী বসাক।
১৮৩৯	স্বপন মুখোপাধ্যায়।
১৮৫৮	ব্রততী দাস।
২৩০১	তপতী ভট্টাচার্য।
২৪৬৭	পার্থ মিত্রা ঘোষ।
২৮৮৮	স্নেহাংশু কুমার নাগ।

নতুন গ্রাহক

চন্দ্রা দত্তরায়

সঞ্জীব প্রসাদ মৈত্র

সমীর কুমার অধিকারী

অশোক ও বাণী চট্টোপাধ্যায় আর তারাপদ দেব।

এ মাসে আমরা বহুসংখ্যক গ্রাহকের কাছ থেকে দুটি বা একটি সঠিক উত্তর পেয়েছি। যারা তিনটি ধাঁধারই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে কেবল তাদের নামই ছাপা হল।

নতুন ধাঁধা

(১লা ভাদ্র অথবা ১৭ই আগস্টের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে এসে পৌঁছান চাই)

(১)

৪৫ কে এমন চারিটি ভাগে ভাগ কর যে প্রথম ভাগটির সঙ্গে দুই যোগ করলে, দ্বিতীয় ভাগটি থেকে দুই বাদ দিলে, তৃতীয় ভাগটিকে দুই দিয়ে গুণ করলে আর চতুর্থ ভাগটিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ফল সমান হয়।

(২)

(এক চোর আর এক চোর কে চিঠি লিখেছে, তার মধ্যে সংকেতে একটা গোপন খবর দেওয়া আছে। গুপ্ত সংবাদটি কি বল তো ?)

"চোদ্দ রাত ইন্দুর মা ললিতের শিয়রে বসে পুত্রসেবায় রত। পার্বতী ঠাকরুণ ইন্দু বেচারাকে দেখতেই রীতিমত হয়রান। ইন্দ্রনাথ লেখাপড়ায় সর্বাংশে মুর্খ, হরিশেরও বিশেষ পড়াশুনা দরকার। খুড়ামশাইকে বলো সারদা বলল, ধানবাদে নেড়া চমৎকার লিচু বেচছে।"

(৩)

(ফাঁকগুলিতে সাধারণ শব্দ না বসিয়ে সংখ্যা বসিয়ে পূর্ণ কর)

ঔষধ প্র——

বর্ষাতি———ঘায় খোস, দাদ,———ড়ায়

লাগাইলে এ———. মলম,

মিশিয়া———সহ নি———ণ করে দাহ

ক্ষ————সাক্ষাৎ যেন যম।

কুইনিনে———ক রয় জ্বরের———ণ চয়

এ————ন সমূলে জ্বর নাশে।

রোগী ভাবে "ভাল——— ———কেমনে সয়"

সে————াও সারে ত্রিবাকসে।

———ন ধাবক চূর্ণ, শোধিত———নাঞ্জন

ক————টি রোগের প্রতিকার,

শুনি লোক মুর——— কিন্তু জেনো মিথ্যা———

অদ্ভুত ঔষধ সমা————।

সম্পাদকীয়

এ মাসের সম্পাদকীয়তে পত্রবন্ধুর বিষয়ে একটু বলতে চাই। তোমাদের অনেকের কাছ থেকে "পত্রবন্ধু" হবার আবেদন পাচ্ছি, কিন্তু তারও কতকগুলো মোটামুটি নিয়ম মেনে চলা দরকার। প্রথমতঃ সন্দেশের মাধ্যমে পত্রবন্ধু করতে চাইলে, উভয় পক্ষের সন্দেশের গ্রাহক হওয়া উচিত। অতএব গ্রাহক সংখ্যাটি দেওয়া নিতান্ত দরকার। তারপর ধরেই নিচ্ছি বয়সটা ১৭ র নিচে এবং অভিভাবকদের মত নেওয়া হয়েছে। এত পত্রবন্ধুর চিঠির মধ্যে কেবল রূপা মিত্রেরটা ছাপা যায়। রূপার বয়স ১১, গ্রাহক সংখ্যা ১৩৯৩। শখ ডাক টিকিট জমানো, কোটেশন বা উদ্ধৃতি জমানো, খেলাধুলা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তথ্য সংগ্রহ। ঠিকানা ৫/১ বি মাধব চ্যাটার্জি লেন। কলিকাতা—২০

এই সংখ্যার প্রথম ছবির তলার দুটি পংক্তি লিখেছেন শ্রীশশাঙ্ক জীবন চক্রবর্তী।

চিঠিপত্র

শ্যামলী দে সরকার—গ্রাহক সংখ্যা ১৬১৮

আশা করি এত দিনে সত্যি বিশ্বাস করছ যে সন্দেশ নিয়মিত ভাবে প্রতি মাসেই বেরুবে। অনেক পেছিয়ে পড়েছিল বলে ঠিক মাসটিকে ধরে ফেলতে দু এক মাস সময় নিচ্ছে। তারপর দেখবে শ্রাবণেরটা শ্রাবণেই বেরুচ্ছে, ভাদ্রেরটা ভাদ্রে ইত্যাদি। তোমরা গত বছরের পুরস্কার ঠিক সময়ে পাওনি বলে আমরা দুঃখিত, এবার পেয়ে গেছ ত? তবে তোমাদের পাঠানো কবিতার কথা জানানো হবে শুধু যদি কবিতা বা অন্য যে কোনো লেখা মনোনীত হয়ে থাকে। ফেরৎ দেবার ব্যবস্থাও আমাদের নেই, কাজেই সর্বদা কপি রেখে লেখা পাঠিও।

রূপা মিত্র

তোমার চিঠি পড়ে বুঝলাম প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর তোমার ভালো লাগে। আসলে লেখক মশায়ের অসুস্থতার জন্যে একমাস বাদ গেছিল। এখন থেকে নিয়মিত লেখা বেরুবার কথা। তোমার কিছু বক্তব্য থাকলে প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তরের নামে সন্দেশ কার্যালয়ের নতুন ঠিকানায় চিঠি লিখো। পত্রবন্ধুর কথা সম্পাদকীয়তে দেখ।

চিঠিপত্র আমাদের কাছে আরো কিছু এসেছে, কিন্তু সেগুলিতে আমাদের কয়েকটা নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে বলে উত্তর দেওয়া গেল না। প্রথমতঃ, সর্বদা গ্রাহক সংখ্যা ও বয়েস এবং ঠিকানা দেবে। তারপর বয়সটা ১৭র নিচে না হলে উত্তর দেওয়া হয় না। প্রশ্নগুলো ও একেবারে আজেবাজে হলে, তারই বা কি করে উত্তর দেওয়া যায়? পূজা সংখ্যায় কি পড়তে চাও নিশ্চয় জানাবে। ইতি।

সঃ সঃ

যখন বড় হব

উপেন্দ্রকিশোর রায়

সা সা সা -রা | গা গা গা রা | গা গা রা গা | গা পা মা গা |
আ মি তা ই ভা বি ব' সে ছে লে বে লা ক দিন র বে

রা গা মা গা | রা রা সা সা | ধ্া ধ্া সা রা | সা গা রগা সা |
শে ষে য খন্ ব ড় হ ব ত খন্ কি বা কর্ ব স বে

গা গা গা গা | গা মা রা রা | গা গা সা গা | রা া রা া |
ত খন্ মো রা স বাই হ ব অ তি শ য় সু ০ স্থি র

সা া সা রা | গা া গা া | পা া সা রা | মা া রা া |
আ র ভা রী বি ০ দ্বা ন্ আ র ব ড় গ ০ ম্ভী র

ধা ধা মা পা | ধা সা সা া | ধা ণা র্সা র্রা | ণসা -ধা -পা া |
থাক্ ব না ক দি ন রা ত শু ধুই খে লা নি ০ য়ে ০

মা পা ধা পা | মা গমা রা া | সা সা গা রা | মা মগা রা গা |
ক ব কা জের ক ০ থা ০ দে খিস্ ত খন্ ভা ই স বাই

সা সা গা রা | মা া গা া |
শুন্ বে ম ন দি ০ য়ে ০

সা সা সা া | সা া সা সা | ধ্া সা সা রা | গা া গা া |
ব ড় লো ক হ ই য দি কা জ কর্ ব ভা ০ রী ০

পা পা রা রা | গা গা সা া | ধ্া ধ্া সা রা | গা -গরা সা া |
না হ লে ও কর্ ব কা জ য ত টু কু পা ০ রি ০

পা । গা । | গা । গা । | গা মা রা রা | রা -রা রা গা |
স ব কা জ কা জ ভা ই ছো ট ব ড় হো ক্ যা ই

পা পা পা ধা | না না ধা । | পা ধা পা -গা | পা । পা । |
ভা ল প থে থে টে খা ই তা হে লা জ না ই ভা ই

গা পা । পা | পা পা গা পা | ধা না । না | ধা ধা পা পা |
দো কা ন্ ক রি লে দি ব জি নি স্ টি খাঁ ০ টি ০

গা । পা । | গা । রা । | সা । রা গা | রা । সা । |
হ ক্ দ র্ ঠি ক্ মা প কা জ প রি পা ০ টি ০

সা । মা । | মা । মা পা | ধা ধা ধা ধা | ধা -র্সা -ণা -ধা |
ডা ক্ তা র হ ই য দি ক রো না ক ভ ০ ০ য়

মা পা ধা র্ণা | ধা পা মা মা | রা রা মা মা | গা । মা । |
মি ষ্টি ও দুধ দি ব খে তে তে তো ঝাঁ ঝি ন ০ য় ০

সমা মা মা মা | মা । মা । | ধা । পা ধা | মা । রা । |
লি খি য দি ব ই তা র দা ম হ বে অ ০ ল্প ০

সা রা গা রা | রা রা সা রা | মা মা । মা | ধা পা পা । |
রা ঙা ছ বি পা তে পা তে আর শু ০ ধ্ গ ০ ল্প ০

পা পা পা পা | পা -ণা ধা । | পা ধা পা মা | গা মগা রা । |
যো রা য দি রাঁ ০ ধি ০ খে য়ে হ বে খু ০ শি ০

ধা -না ধা না | সা । ণা । | ধা । মা -ধা | পা । মা । |
নু ন দি ব ঠি ক্ ঠি ক্ ঝা ল ন য় বে ০ শি ০

৪র্থ বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা

আগস্ট, ১৯৬৪। শ্রাবণ ১৩৭১

ক্ষ্ঁ্যং

নলিনী দাশ

ক্ষ্ঁ্যং দেখেছ ?
ক্ষ্ঁ্যং কে চেনো ?
ক্ষ্ঁ্যং এর কথা শোন !
ক্ষ্ঁ্যং এসেছে—
সন্দেহ নাই কোন !
যেদিন ভোরে
কেমন করে'
ওঠার আগে
বিশ্রী লাগে !
কোথায় হারায়
জুতোর পাটি
উল্টিয়ে যায়
দুধের বাটি !
রোদ ওঠে না
ফুল ফোটে না,
কালচে দেখায়
নীল আকাশের রঙ ;
(সেদিন) বুঝবে এলো
ক্ষ্ঁ্যং !

ক্ষঁ্যং চেনো না ?

ক্ষঁ্যংকে জানো ?

ক্ষঁ্যংএর কথা শোন !

ক্ষঁ্যং এসেছে, সন্দেহ নাই কোন !

ইস্কুলেতে

যেদিন যেতে

নানান বাধা,

মেজাজ গরম

হারায় কলম

জামায় কাদা !

ভুল হয়ে যায়

অঙ্ক খালি

বইয়ের পাতায়

লাগছে কালি,

ছুটতে গেলেই

পড়বে কুপোকাৎ ।

(জেনো) ক্ষঁ্যং এলো নির্ঘাৎ !

ক্ষঁ্যং জানো না ?

ক্ষঁ্যং দেখোনি ?

ক্ষঁ্যংএর কথা শোন,

ক্ষঁ্যং এসেছে, সন্দেহ নাই কোন !

যেদিন হারায়

লাট্টু ও বল,

ঝগড়া বাধায়

বন্ধুর দল,

ভাঙবে চুড়ি,

ছিঁড়বে ঘুড়ি

কাটবে আবার

যতই ঘুড়ি কেনো

(সেদিন) ক্ষঁ্যং এসেছে জেনো !

কিন্তু যেদিন গায়ের জোরে
বলতে পার 'চাইনে তোরে !
তুই কেরে ক্ষ্যাং !
কোন্ দেশি ঢং ?
ঠিক যেন সং'—
দেখব সেদিন
ক্ষ্যাং আসে আর
　　　　কেমন করে !
দেখবে সেবার
　　　　জামা জুতো,
হারায় না আর
করে ছুতো,
ভূগোল পড়া,
অঙ্ক করা,
হাতের লেখা
বাংলা শেখা,
(সেদিন) সবই চমৎকার
(জেনো) ক্ষ্যাং আসেনি আর !
ক্ষ্যাংকে যেদিন
　　　　বলতে পার 'ভাগো—
দেখব কেমন
　　　　আমার পিছে লাগো !'
নাচবে গাবে
　　　　মনের সুখে,
করবে খেলা
　　　　হাস্য মুখে
খুব ঘুমোবে
　　　　পেটটি ভরে খাবে।
(সেদিন) ক্ষ্যাং পালাতে
পথ খুঁজে না পাবে !

পটলের রাঙাপিসেমশায় লিখলেন 'অতি চমৎকার জায়গা। তোফা বাংলো বাড়ী, চাকর, বেয়ারা, ঝাঁকা ঝাঁকা মুরগী, ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ, পরীক্ষার পর যদি শরীরটা সারাতে চাও....।'

তার উত্তরে পটল লিখলে 'ঘুঁটে আর গুপে আছে কি না?'

পিসেমশায় লিখলেন 'না না, তারা থাকলে তোমায় কি আর আসতে লিখি? তাদের দুজনকেই শিখদের গুরুকুলে দিয়েছি। ভেবে দেখলাম বাংলা, বিহার, ইউ-পি, সব জায়গার বোর্ডিং ইস্কুলই ত' ঘুরে দেখল, এখন ক'বছর গুরুকুলেই থাক। মাস্টারের সঙ্গে আমি আলাপ করে দেখেছি, হাতের কবজি বেশ চ্যাটালো, রোজ তিনশো মিটার দৌড়য়, মনে হচ্ছে ওরাই পারবে। তোমার পিসীমার মন খুব খারাপ। তাঁর জন্যে সোনামুগের ডাল আর বারুইপুরের পটল এনো। বাড়ীতে শুধু পুঁটে আছে।

সে অতি পেটরোগা নিরীহ ছেলে। দাদাদের মত নয়। অবিশ্যি কথাটা একটু বেশী বলে। তাতে আর এমন কি!'

ঘুঁটে আর গুপে নেই শুনেই পটলের মনটা বেশ হাল্কা হ'য়ে গেল। পটলের এই পিসেমশায়টি যুদ্ধে গিয়েছিলেন ডাক্তার হয়ে! সেখানে গিয়ে একজোড়া গোঁফ, লাল চোখ আর বাজখাঁই গলা বাগালেন। আর একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস নিয়ে এলেন, আত্মীয় স্বজন যে দেখা করতে আসে, সে মুখ খোলবার আগেই চেঁচিয়ে তাকে দাওয়াই বাতলাতে থাকলেন। ওষুধের মধ্যে এক ক্যাস্টর অয়েল আর জ্বরের মিক্শ্চার। যুদ্ধে যারা যায় তাদের সব অসুখ না কি ওতেই সেরে যায়। এমন কি কান কটকট, দাঁতে ব্যথা থেকে সুরু করে 'ঐ শত্রু এল, ঐ বোমা মারলে, ঐ বন্দুক ছুঁড়লে' এই সব বাতিকে ভোগা মনের অসুখ পর্যন্ত ঐ ওষুধেই সারে।

পিসেমশায় যখন বাড়ী এলেন যুদ্ধ ফুরোতে, ততদিনে পিসীমা ঘোর বৈষ্ণব হয়ে গেছেন। তাঁর বুড়ো গুরুদেব ঘনঘন যাতায়াত করেন। পিসেমশায় ত কাশ্মীরের গপ্প টপ্প করবেন বলে গোঁফ পাকিয়ে মনের খুশীতে চলে এলেন। এসে দেখেন পিসীমা তেলক কেটে ঘুরছেন, বাইরের ঘরে বসে তিনটে নেড়া মাথা লোক কীর্তন গাইছে, তাঁর তিন বংশধর গুরুদেবের পাশে বসে চামর দোলাচ্ছে।

দেখেই ত' তাঁর মেজাজ খাপ্পা। মুরগী লে আও, পাঁঠা কাটু, এই সব ফাঁকা গর্জন ক'রে গুরুদেবকে বেদম ভড়কে দিলেন। ছেলেদের জিগ্যেস করলেন 'ইদিকে আয়। তোদের নাম কি?'

পিসীমা কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন 'গুরুদেব বললেন…'

'নাম কি?' পিসেমশায় গর্জন করলেন।

'ওর নাম ঘনশ্যাম দূর্বাদল কানু।'

'ঘুঁটে।'

'অ্যাঁ?'

'ঘুঁটে নাম রাখলুম। ও ছুটোর নাম কি, অ্যাঁ? ক'বছর যুদ্ধে গেছি এরমধ্যেই…'

'ওকে ডাকেন গোপীজন পদবল্লভ…'

'ওঃ, আর শুনতে চাইনা, শুনতে চাইনা, এই হোঁৎকাটার নাম থাকুক গুপে, আর ঐ লিকলিকে মিচকেপটাশটার নাম পুঁটে।'

'অমন বিতিকিচ্ছে নাম রাখলে ইস্কুলে ছেলেরা…'

'হ্যাঁ! ওরা এখন যাবে বোর্ডিঙে, তারপর সৈন্য হবার স্কুলে। যুদ্ধের সময়ে, বিপদের সময়ে ডাকবার পক্ষে ছোট নামই ভাল।'

তা, পটলের দু'ভাই ঘুঁটে তালুকদার আর গুপে তালুকদার তারপরই ক্যারম খেলবার ঘুঁটি হয়ে গেল। এক একটা ইস্কুলে যায় আর বাড়ী ফিরে আসে। কেউ জানায় ঘুঁটে এবং গুপে. পকেটে হেলে সাপ নিয়ে মেমসাহেবের ক্লাসে গিয়েছিল। কেউ বলে বই খাতা বেচে দিয়ে সন্ন্যেসীদের সঙ্গে পালাচ্ছিল।

শেষে পটলের বাবা বললেন 'কোথায় ভাল পড়াশুনা হয় তা না দেখে বরং কোন বোর্ডিং অতি দুর্গম জায়গায়, কোথায় মাস্টারদের হাতের গুলী লোহার মত, এইসব খোঁজ কর।'

পটলের পিসেমশায় এখন কাঁদকাঁদ। পটলের বাবা বললেন 'এখন ত এইসব ছেলেই চাই। এরাই সমুদ্রের নিচে নামবে, পাহাড়ের চূড়োয় উঠবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। মাঝামাঝি সময়টা একটু কষ্টকর বটে। তা ওই যা বললাম, মাঝসমুদ্রে বা পাহাড়ের খাদে কোথাও বোর্ডিং আছে কি না খোঁজ কর।'

সেই গুপে আর ঘুঁটেই নেই। শেষ যেবার দেখা হয়, সেবার বড় দাদা ব'লে পটলকে বেশী কিছু নাকাল করেনি, শুধু কয়লাঅলার নৌকো চেপে বড়গঙ্গা গিয়ে, বড়নৌকোর মাঝিদের সঙ্গে নিরুদ্দেশ হচ্ছিল। পটলকে সেজন্যে দিনদুয়েক ছুটোছুটি করতে হয়।

তারা যখন নেই, তখন আর ভাবনা কি? একদিন টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়ল পটল। স্টেশনে অবিশ্যি একজন কেমন যেন ভদ্রলোক তার দিকে আঙুল দেখিয়ে একবার চেঁচিয়ে 'সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁটে ব্যাটাকে ধর' বলে হেসেছিলেন। আর একবার, বেরোবার আগে জিমিটা জুতোর বকলেশ চিবিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেগুলোকে তেমন কোন আমল দেয়নি পটল। হুঁসিয়ারগড় যাবার মজাই ওই। যাবার সময়ে কিছুই খেয়াল থাকে না।

তবে হ্যাঁ, যাবার পথে আরো একজনকে সঙ্গী পাওয়া গেল, দিব্যি তেলচুকচুকে চেহারার একজন ওভারসিয়ার বাবু। পটল হুঁসিয়ারগড়ে যাচ্ছে শুনে বলে দিলেন 'আর যেখানে খুসী যাবেন মশায়, ঐ ডাক্তারবাবুর বাসায় যাবেন না।'

'কেন?'

'ওর ছোট লেড়কা বড়া বিচ্ছু আছে'

যেই শুনলেন পটল ডাক্তারবাবুর শালার ছেলে, অমনি কথা পালটে নিলেন।

পটল যখন হুঁসিয়ারগড় স্টেশনে নামছে তখন শুধু কানে কানে বললেন 'ফিরে যাবার ট্রেনটা কিন্তু চারঘণ্টা বাদেই। চারঘণ্টার মধ্যে দিব্যি নেয়ে খেয়ে নেওয়া যায়।' বলেই মুচকি হেসে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। আর তখনই পটল বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার শুনতে পেল 'পট্লা, চলে আয়!'

পিসেমশায়ের বাড়ী যাওয়া সোজা নয়। গাড়ী ক'রে পঁচাত্তর মাইল, তারপর বিশমাইল হাতীর পিঠে। তারপর চারমাইল রোপওয়েতে, শূন্য দিয়ে ঝুড়িতে চেপে দুলতে দুলতে, তারপর টাট্টু ঘোড়া।

'এত দুর্গম জায়গায় কেন?'

পিসেমশায় মুচকি হেসে বললেন 'গুপে আর ঘুঁটের হাত থেকে পালিয়ে আছি। তাছাড়া চিঠিপত্তর বিলি করতে আসা কঠিন, তাই পিওনরা চিঠি জমাতে থাকে। মাসতিনেকের আগে পাওয়া যায় না। এই ধর তিনমাস বাদে সব চিঠিপত্তর আনলে। তাতে একটা অসুবিধা এই, যে প্রমোশন হলে, বা ট্রান্সফার হলে বা মাইনে বাড়লে জানা যায় না। কিন্তু অন্য দিকটার কথা ভেবে দেখ। গুপে বা ঘুঁটে আবার রাস্টিকেট হলেও জানতে হচ্ছে না।'

'এখন ওরা কেমন আছে ?'

'ভালই থাকবে। ওদের ইস্কুলে শিখ গুরুজীর একজন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন, আরেকটি মুগুর ভাঁজে। ওরাই পারবে।'

পথে যেতে যেতে পিসেমশায় গম্ভীর হয়ে বললেন 'তোকে আসতে লিখেছি তার একটা অন্য কারণও আছে।'

'কি ব্যাপার ?'

'বলছি।' ব'লে ঘ্যাঁচ করে গাড়ী থামিয়ে পিসেমশায় নেমে পড়লেন। বললেন জীবজন্তু দেখলে ভয় পাসনে। এখানকার হেঁড়োলগুলো পর্যন্ত ভারী অমায়িক। আমি তোর জন্যে গোটাকয় পান্তো আর এক হাঁড়ি দই নিয়ে আসি, তোর পিসী পইপই ক'রে বলে দিয়েছিল।' বলেই মুচকি হেসে তিনি জঙ্গলে ঢুকে গেলেন।

পটল নতুন জামাইবাবুর কাছ থেকে পাওয়া লাল টুকটুকে ডায়েরীটা খুলে প্রাণের বন্ধু পানুর কাছে প্রতিশ্রুতি রাখতে চেষ্টা করল। অনেক ভেবেচিন্তে যখন পেনসিল বাগিয়েছে, তখনই দেখে গাড়ীর বনেটের ওপর বসে একটা ইয়াবড়া গিরগিটি তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। বিরক্ত হয়ে লিখে রাখল 'হুঁসিয়ারগড়ে সবাই মুচকি হাসে। ওভারসিয়ার, পিসেমশায়, গিরগিটিটা পর্যন্ত।'

তারপর, গাড়ীতে ফিরে এসে পিসেমশায় আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। কি যেন চিন্তা করে বললেন 'দেখ পটল, ঘুঁটের চে' তুই যখন বড়, তখন তোকেই আমাদের বড় ছেলে বলা যায়।'

'ঐ আর কি, ভাবার্থে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুধু কি মনের ভাবে ? তোকে দেবে বলে তোর পিসিমা বালিশের খোলের মধ্যে কবে থেকে টাকা জমাচ্ছে, পিসী মরলেই বেশ কিছু অর্থও পাবি।'

পটল হঠাৎ ভয়ানক ভয় পেল। বলল 'পিসেমশায়, তুমি আমায় ঘুঁটেদের কাছে নিয়ে যাচ্ছ না ত ?'

'না না। তা'প্পরে শোন পটলা, আমি তোর পিসীর মত চিপ্পু নই। য' দেব, তা সময় থাকতে …এই নে, আমার ঘড়িটা তুই নে !'

তিনশো গ্রাম ওজনের ঝকঝকে ঘড়িটা হাতে নিয়ে পটল অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

'ব্যাপারটা কি জানিস ? এই হুঁসিয়ারগড় থেকে মাইল তিরিশ দূরে আমাদের এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। আমি আর তোর পিসীমা যাব। তুই একটা দিন পুঁটেটার কাছে থাকবি। আমার পুরনো কম্পাউণ্ডার আছে, সব দেখে শুনে রাখবে, পারবি ত ?'

'ওঃ, এই কথা ?' পটল হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল 'সে জন্যে এত কিন্তু হবার কি আছে ?'

'না না, কিচ্ছু নেই। তা ছাড়া…' একটু উৎফুল্ল হয়ে তিনি বললেন 'কম্পাউণ্ডার আমার বাড়ীর আউট হাউসেই থাকে। দরকার টরকার হলেই ডাকিস, কেমন ?'

তারপর শেষ পর্যন্ত পিসীমার বাড়ী পৌঁছল পটল। একটা দিন কেটে গেল হুই হুই করে। পরদিন আরো হইরই তুলে পিসীমারা কাপাসধুরা রওনা হয়ে গেলেন। বলে গেলেন 'কাল সকালেই ফিরব বাবা। একটা রাত কাটিয়ে দে।'

পিসীমারা যখন গেলেন, তখন বিকেল।

পুঁটের পাশে যখন গিয়ে বসল পটল, তখন সন্ধ্যে। এ বাড়ীতে সাতটার মধ্যে খেয়ে নেওয়াই নিয়ম। ভরপেট মুরগীর পোলাও আর খাশা পুডিং খেয়ে পটলারা বিছানায় গিয়ে বসল। রোজকার মত পিসেমশায়ের খিটখিটে চেহারার দরোয়ান এসে বিছানার ঢাকনা তুলে খাটের নীচে দেখে, দরজা জানলা পরখ ক'রে চলে গেল। বাইরের দরজা একটু ফাঁক রইল, ওখানে দরোয়ান এসে একটু বাদে শোবে। পটল স্প্রিং-এর বিছানায় আরাম ক'রে দুলছিল। জিগ্যেস করলে 'হ্যাঁরে পুঁটে, দরোয়ান কি দেখছিল খাটের তলায়? চোর আছে কি না!'

এগারো বছর বয়স আন্দাজে পুঁটের চেহারাটা ভারী নরম নরম। মাথার চুল ছাঁটা, মুখের ভাব গম্ভীর, গালদুটো ফোলা। 'দেখছিল ভালুক টালুক আছে কি না!'

'হ্যাঃ, ঘরের মধ্যে ভালুক!

'কেন, বাবা বলেনি?'

'কেন, ভালুকের কথা বলতে যাবেন কেন? কলকাতা থেকে নেমন্তন্ন করে এনে কেউ কি ভালুকের কথা বলে?'

পুঁটে মুচকি হাসল। বলল 'তা বলবে কেন? তোমাকে আনার পেছনে ওঁদের যে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সেই জন্যে বলে নি। নইলে কে না জানে হুঁশিয়ারগড়ে একটা বিশেষ জাতের হিংস্র ভালুক আছে আর এখানে, এই বাড়ীতেই পরপর···যাক্ গে বলব না!'

'কি ব্যাপার?'

'তোমার মনে নেই হয়ত, দাদা ছোড়দার জন্যে পরপর দুটি মাস্টার রাখা হয়!'

'খুবই স্বাভাবিক।'

'তাঁরা দুজনেই ভালুকের হাতে পড়েছিলেন।'

'দুজনেই! কি সর্বনাশ! তারপর কি হল?'

'কি আর হবে। বিছানার চাদর তুলে ত কেউ দেখে নেননি।'

'অমন কায়দা করে চুপ করে যাসনে বাপু। হলটা কি!'

'আঃ, বলছি না। একজনের চশমা পাওয়া গিয়েছিল, আর একজনের দেড়খানা ঠ্যাং।'

পটল জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। জঙ্গল আর পাহাড়, আর তার উপর একটা রাক্ষুসে লালচে রঙের চাঁদ। 'দরজা জানলাগুলো বুঝি সে জন্যেই?···'

'না না।' পুঁটে মিষ্টি ক'রে হাসল 'ও কিছু না। এখানে একরকম ভাইপার জাতের সাপ আছে না! রোজই আটটা দশটা মারা হয়। ঐ শোন না, গোপাল কেমন ধপ ধপ করে সাপ মারছে।'

কান পেতে শব্দটা শুনে পটল বললে 'কিন্তু, কেমন যেন গামছা কাচার শব্দ বলে মনে হচ্ছে না?'

পুঁটে ঘাড় নেড়ে বললে 'তাই ত হবে। ইঁদারার ধারে যেখানে বসে গোপাল গামছা কাচে, সেখানকার গর্ত থেকে হয়ত ভাইপার, অর্থাৎ বোড়া যাকে বলে, একটার পর একটা বেরুচ্ছে ত' বেরুচ্ছেই, গোপাল মারছে ত মারছেই…।'

'থাক থাক।' পটল আর শুনতে চায়না এসব 'তার চে' আয় শুয়ে পড়া যাক্।'

'আমার মনে হয় পটলদা, তোমাকে সব ভেঙে বলাই ভাল।'

'কি?'

'এই, তোমাকে আজ এখানে কেন আনা হয়েছে। কেনই বা বাবা তোমাকে আমার কাছে রেখে মাকে নিয়ে সরে পড়েছে। কেনই বা কম্পাউণ্ডার বাবু রাতে একবারও তোমার সামনে এলেন না।'

'সে আবার কি?' পটল এখন রীতিমত ঘাবড়ে গেছে।

'বলছি।' বলে চারদিক দেখে নিল পুঁটে। তারপর একলাফে উঠে এল পটলের বিছনায়। পটল দেখতে পেল পুঁটের চোখ জ্বলজ্বল করছে, কপালে ঘাম, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। পুঁটে বলতে লাগল 'কখনো কি তোমার এ সন্দেহ হয়েছে, যে এত জায়গা থাকতে দুর্গম হুঁশিয়ারগড়ে বদলী হবার কারণ কি?'

'না।'

'তার কারণ হচ্ছে তোমার এই পিসেমশায়টি এখন ঐ রোগা লিকলিকে কম্পাউণ্ডার বাবুর হাতের মুঠোয়।'

'কেন বলত!'

'কেন না কম্পাউণ্ডার বাবু আসলে হচ্ছেন একজন পাকা কালী সাধক। ফি বছর এমনি দিনে একবার করে ওঁর লুকিয়ে কালীপুজো করা চাই।'

'পুজো করা ত ভাল কথা।'

'আর সেই পুজোয় আস্ত একটি ছেলেকে ধরে এনে ঘ্যাঁচা ঘ্যাঁচ! বুঝলে কিছু?'

'আঁক্কাঁ!' পটলের গলা দিয়ে একটা বিকৃত বিদঘুটে আওয়াজ বেরুল। 'হ্যাঁ, আঁক্কাঁ!' পুঁটে সায় দিল।

'আমাকে··আমাকে···।' পটলের মনে হল পেটের ভেতর মুরগীগুলো লাফালাফি করছে, কানের কাছে ট্রেণ হুইসিল বাজাচ্ছে, মাথার ভেতর দিয়ে কলকাতার পুরনো পুরনো বাগবাজারের ট্রামগুলো যাচ্ছে।

পুঁটে মুচকি হাসল।

বলল 'তোমাকে অগত্যা আর কিছু পাওয়া না গেলে···বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আনা হয়েছে। এবার তিন তিনটে বলি চাই কি না! সব জানি আমি। কোথায় গেল আমাদের ঘরের চাকর

মাণিক, গোরুর চাকর ঝব্বু, কাঠ চ্যালাবার চৈতেরাম! তিনদিন ধরে তাদের দেখতে পাচ্ছি না কেন? রক্তপাত মা দেখতে পারে না, তাই কি তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়?'

'কোথায় গেল চৈতেরাম?' পটল বোকার মত আবার সুধোল।

'আমি জানি। পেছনের বড় আস্তাবলের পাশের চোরকুঠরীতে হাত পা বাঁধা হয়ে পড়ে আছে। আস্তাবলে কালীপুজো হচ্ছে কি না!'

'পুলিশ! পুলিশ নেই এখানে!'

'আছে। কিন্তু খবর দেবে কে? এ বাড়ীর দরোয়ান চাকর ড্রাইভার সবাইকে বশ করে ফেলেছে কম্পাউণ্ডারবাবু। তা ছাড়া পটলদা, একান্ন মাইল দূর থেকে পুলিশ রোপওয়েতে ঝুলতে ঝুলতে যখন আসবে, তার অনেক আগেই ওদের আত্মা দুলতে দুলতে স্বর্গে চলে গেছে।'

'তবে!' বলে পটল ভাবলে বিরাট হাঁ করে মনের সাধে একবার চেঁচিয়ে নিলেই ভয় কাটবে। কিন্তু সবে পেল্লায় একটা হাঁ করেছে কি করেনি, এমন সময়ে পুঁটে ফস্ করে আলো নিভিয়ে দিলে। বললে 'শুয়ে পড়। ঘুমোবার ভাণ কর। আমার কথা সত্যি কি না হাতে নাতে প্রমাণ পাবে।'

সত্যিই তাই।

কেড্স জুতো পায়ে বেড়ালের মত নিঃশব্দে কম্পাউণ্ডারবাবু দরজার কাছে এলেন। সার্টের কলারের ওপর সজনে ডাঁটার মত উঁচু সরু গলা তার ওপর নারকেলের মতো লম্বাটে গোল মাথা। চোখে নিকেলের চশমা, একঝুড়ি গোঁফের নিচে সর্বদাই পান চিবোবার চপাৎ চপাৎ শব্দ শোনা যায়। ওঃ, কি ভয়ানক ধড়িবাজ লোক। ঘণ্টা কয়েক আগে আবার পটলের চিবুকে হাত রেখে চুকচুক শব্দের ঘটা কি! খসখসে গলায় আদুরে সুর এনে আবার বলা হচ্ছিল 'তিনিরা গেছে তাতে কি! একটা দিন আমার কাছে থাকবে। ভয় পাবে না।'

আর ঐ দরোয়ানটা! ঐ খিটখিটে মুখ, সদাই অসন্তোষ, ও সব হচ্ছে ওপরের ভাণ। আসলে! পুঁটে চিমটি কাটলে।

'সব ঠিক আছে ত!' কম্পাউণ্ডারবাবুর গলা।

'সব ঠিক।'

'ওদিকে চোরকুঠরীতে তিনটে?' পটল লাফিয়ে ওঠে আর কি।

'তিনটেই। দেখবেন বাবু, গিন্নী মা টের পাবেন না ত? টের পাইলে কিন্তু আমার চাকরী চলিয়ে যাবে।'

'না না!' কম্পাউণ্ডারবাবু ভয়নক শয়তানী হাসি হাসতে হাসতে কেশে ফেললেন। তারপর সুড়ুৎ সুড়ুৎ শব্দ করে নস্যি টেনে বললেন গর্ত খোঁড়া আছে। পুঁতে ফেলবি। শিয়ালে না টানে এইটুকু শুধু দেখবি।'

'তিনটেই?'

'তিনটেই!'

'ভোগে লাগাইয়া দিলে হত না !'

'পাগল না কি ! যতই মশলা দাও না কেন, গন্ধ পেয়ে যাবে।'

'কোনরকম রিস্কে কাজ নেই।'

'যা বলেন আপনি ! আপনি দেবতা, আমি ত আপনার পা ধরে পড়িয়ে আছি—'

'আচ্ছা আচ্ছা, মায়ের কাছে তোমার কথা নিশ্চয়—দেখ দরোয়ান, ছোঁড়াগুলো ঘুমোচ্ছে ত ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি এবার চলিয়ে যান্। আমি আস্নান করে খাঁড়া নিয়ে যাই !'

ছায়ামূর্তি তুটো সরে গেল। পুটে কাঁদোকাঁদো গলায় বললে 'পটলদা, নিজের কানে শুনলে সব। আমি ত একটা ছোট ছেলে। নিরুপায়। ওদের তিনজনকে জলজ্যান্ত কাটবে, মাটির নিচে পুঁতবে—'

'দরোয়ানটা আবার ভোগে মাংস রাঁধতে চাচ্ছিল !'

'আমার কথা কে শুনবে ! তুমি ইচ্ছে করলে পুলিশকে ফোন করতে পার—'

'নিশ্চয় করব।'

তু'ভাই সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। কেন না, তখনই বাড়ীর পেছন থেকে চাপা শঙ্খঘণ্টা শোনা গেল। তুজনেই হাতে ডাণ্ডা বাগিয়ে ছুটে বেরুল। পুঁটে বললে 'আগে টেলিফোন কর, তার পর ওখানে—মানে আমরা তু'জন ত আটকাতে পারব না কিছু—ঐ আর কি সাক্ষী থাকা—!'

অতএব আগে টেলিফোন।

তারপর ঝপাং করে ফোন নামিয়ে রেখেই ওদিকে ছোটা। কিন্তু শুধু ছুটে কি আর এসব সর্বনাশকে আটকানো যায় ? পটল আর পুঁটে ছুটে গেলে হবে কি, ততক্ষণে দরোয়ান নতুন গামছা মালকোঁচ মেরে পরে ফেলেছে। হাতে ইয়াবড়া এক খাঁড়া, তাতে আবার একটা চোখ আঁকা। জল চৌকির ওপর এই পেল্লায় এক প্রতিমা, চারদিকে পুজোর উপচার। কম্পাউণ্ডারবাবু একটা আনকোরা বেঁটে ধুতি পরে আসন পেতে বসে আছেন।

পেছনে কান্নার শব্দ। বুকফাটা ফোঁপানি। এ কি! পিসীমার পরমবিশ্বাসী রাঁধুনী পেল্লাদ কাঁদে কেন ?

'কাঁদে না, কাঁদে না !' কম্পাউণ্ডারের গিন্নী ভিজে ভিজে গলায় ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

'অপনি ত বলছেন কাঁদব না ! কিন্তু গিন্নীমা যদি জানতে পারেন তবে আমার কল্‌জে খেয়ে লেবেন !'

বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে কম্পাউণ্ডারবাবু হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন 'আঃ, শুভকাজে বাধা দেয় না ! যার চোখে কান্না আসে সে বাইরে যাক্ ! দেশে থাকতে এই আমি শত শত বলি নিজহাতে দিই নি ? আর আজ এই সামান্য—দরোয়ানই কাটুক ! এই সামান্য জিনিষ কেটে আমি হাত কালো করতে চাই না ! বাজনা বাজা !'

সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন জয় মা, জয় মা বলে চেঁচিয়ে উঠল।

কম্পাউণ্ডারবাবুর চারটে ছেলে ভয়ানক শব্দে কাঁসরে ঘা দিলে।

'জজ্ঝয় মা কালী, দোইয়া মোয়ী' বলে যেমন দরোয়ান খাঁড়া তুলে কোপ দিতে যাবে, অমনি পটল আর পুঁটে 'সাবধান ! সাবধান !' বলে ডাণ্ডা বাগিয়ে ঢুকে পড়েছে।

যেই না ঢুকে পড়া, অমনি পেল্লাদ 'কলকেত্তার দাদাবাবু সব দেক্কে লিয়েছেন গো, আমি এর মধ্যে নেই !' বলে পটলকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দরোয়ানজীর খড়্গ ঝপাং করে আগেই নেমে এল। পেল্লাদের ধাক্কায় অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে পটল বললে 'পুঁটে, জ্ঞান হারাসনে। সাক্ষী হতে হবে !'

ঠিক বারো ঘণ্টা কেটেছে।

বাইরের ঘরে পিসীমা, পিসেমশাই, পুলিশ, পটল, চেয়ারে। মাটিতে উপু হয়ে বসে কম্পাউণ্ডার

জয়মা কালী, দোইয়া মোয়ী

ফোঁপাচ্ছেন। দরোয়ান মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। সামনে পেল্লায় আকারের তিনটে কুমড়ো। খণ্ড খণ্ড করে কাটা। সেদিকে চেয়ে পিসীমা মাঝে মাঝে ফোঁপাচ্ছেন বটে, সেটা কান্নার শব্দ ও হতে

পারে, হাসির দমকও হতে পারে। পিসেমশায়ের চেহারা থমথমে লাল, গোঁফের ডগা শূন্যপানে উঠে গেছে।

'মশায়, আপনাকে ফোন করা হয়েছিল বটে…'

'শুনলাম তিনতিনটে মার্ডার….ওফ, একান্ন মাইল ঝুলে এসেছি, ভাবতে পারেন!'

'আল্লা, মার্ডার ত হচ্ছিলই! পুঁটেকে যখন রেখে গেছি তখন তিনটে মার্ডার কেন, ভূমিকম্পও হতে পারত!'

(পটলের দিকে চেয়ে) 'তোকে বললুম! এত এত হিন্ট্ দিলুম! (দারোগাকে) তা মশায়, এসে পড়েছেন ত ডাক্তারেরই কাছে! রোপওয়ের ঝুড়িতে চেপে গতরে ব্যথা হয়েছে বই ত নয়! দরোয়ান!'

হঠাৎ হুঙ্কারে দারোয়ান একেবারে কেঁপে টেঁপে অস্থির। পিসেমশায় বললেন 'দারোগাবাবুকে ভাল ক'রে ডলাই মলাই ক'রে দাও। তারপর গোসল করবার জন্যে গরম জল দিয়ে দাও ওঁকে।'

'হুজুর মা বাপ!'

দরোয়ান দারোগাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে চলল। পিসীমা ডেকে বললেন 'রামভরোসে বাবু, এসে ভালই করেছেন। কাপাসধুরা থেকে অনেক মিষ্টি মেঠাই দিয়ে দিয়েছে!'

পিসেমশায় ধমক দিয়ে বললেন 'বিলক্ষণ! না খেয়ে উনি যাবেন কোথায়? আচ্ছা সত্যবাবু, এবার বলুন দেখি মশায়, ব্যাপার কি? অমন উৎকৃষ্ট তারকেশ্বরের কুমড়ো! গিন্নী কৃষিমেলায় দেবে, পুরস্কার পাবে বলে সামলে রাখা…!'

পিসীমা বললেন 'ওঃ, বিয়েবাড়ীর কাজের জন্যে চৈতেরাম, ঝব্বু আর মাণিককে নিয়ে গিয়ে কি ভুলই করেছি!'

কম্পাউণ্ডারবাবু ফিঁচফিঁচ করে কেঁদে বললেন 'এ বাড়ীতে গুরুদেব আমদানী করে গিন্নীমার যা নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল, তা স্মরণ করেই সার, গুপ্ত কালীপুজার ব্যবস্থা করা হয়।'

হাতজোড় করে বললেন 'দেশে থাকতে সার, এই বাহুর জোরে (সার্টের আস্তিন থেকে হাত বের করে নেড়ে দেখালেন) পুজোর সময়ে শতাধিক কুমড়ো এবং চালকুমড়ো উঠোনে গড়াগড়ি যেত। তাই দেখেই ত সেকেণ্ড মুন্সেফ বাবাকে বললেন, উপীন, তোমার এ ছেলে বাঁচলে হয়! এ যে দেখি অদ্ভুত কর্মঠ। তা আপনিই বলুন সার, অন্তত তিনটে কুমড়ো বলি না দিলে কি আমার মন শান্ত হয়?'

'মাগুরমাছ!'

'অ্যাঁ?'

'মাগুরমাছ খান?'

'না সার। আমি ঘোর নিরিমিষাশী। আমার গিন্নী অবশ্য··

পিসেমশায় হুঙ্কার ছেড়ে বললেন 'চাকরী যদি রাখতে চান, এখানে যদি থাকতে চান…

'হ্যাঁ সার, এ অতি উত্তম স্থান!'

'তবে আপনি প্রত্যহ নিজ হাতে মাগুরমাছ কাটবেন, মুরগী জবাই করবেন, পাখি মেরে খাবেন?'

'আমি বোষ্টম ভাবে ভাবিত সার!' কম্পাউণ্ডার নিজেই পাখির মত আর্ত শব্দ করলেন।

'বোষ্টম ভাবে ভাবিত! মনের ভেতর গোপন ইচ্ছে, জিঘাংসায় ভর্তি, এদিকে বোষ্টমভাব! আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে, এখন আমার বুঝতে বাকি নেই, শুধু কুমড়ো নয়, লুকিয়ে আপনি যা পাবেন তাই কচাকচ কাটবেন! বলতে কি, এখন মনে হচ্ছে, কলাগাছগুলো আপনিই কেটেছিলেন!'

'সার অন্তর্যামী!' কম্পাউণ্ডার ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। তারপর, 'যা যা বললেন তাই হবে সার!' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'এখন পটলচন্দ্র!'

পিসেমশায় তার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'কুমড়ো কাটা দেখলে তোর মাথায় রক্ত উঠে যায় জানতুম না ত! না, পুঁটের কথা শুনে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলি!...'

পটল নীরব।

পিসীমা এতক্ষণ পরে ভাল করে মুখ খুললেন। বললেন, 'কুমড়ো কাটতে দেখে ক্ষেপে গিইছিলি বাবা? আহা, শুনে বুকটা আমার জুড়িয়ে গেল। একেই বলে টান! হাজার হলেও ও ত জানে যত্নের ফল ওগুলো! বাবা, ঘরে চ, তোর জন্যে যা রেখেছি...'

পিসেমশায় এবার মুচকি হাসলেন। চোখটিপে বললেন 'বলেছিলুম না? যাক্‌গে যা হয়েছে হয়েছে, এখন আর কোন গোলমাল হবে না, মন ঠিক করে থেকে যা!'

পিসীমা বললেন 'হ্যাঁ, ঘুঁটে আর গুপেও আসছে!'

'অ্যাঁ!' বলে পিসেমশায় ও পটল একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পুঁটে বললে 'পটলদা, বিয়েবাড়ীর লুচিমাংস গরম করা হয়েছে। রামভরোসেবাবু বসে আছেন।' একইরকম সুরেলা গলায় বললে 'বাবা, দাদা ছোড়দা বোধহয় এসে গেছে, ড্রাইভার ত তাই বললে।'

তারপর পুঁটে মুচকি হাসলে।

ছড়া

আশানন্দন চট্টরাজ

তাসের দেশে বাঁশের মাচা,
মাচায় বাঁধা পাখির খাঁচা ;
পাখির খাঁচা চাদর ঢাকা
ঝুল্‌ছে তাতে রূপোর টাকা।
রূপোর টাকা, মোহর, গিনি
গুন্‌ছে বসে বিড়াল 'মিনি।'
বিড়াল 'মিনি' গামছা কাঁধে
রোজ ছুপুরে, 'পোলাও' রাঁধে।
'পোলাও' রাঁধে বানর পিসি,
পিসির কোলে, তেলের শিশি।
তেলের শিশি, বেলের খোলা,
'ফুচ্‌কা'-ভরা তেঁতুল গোলা।'
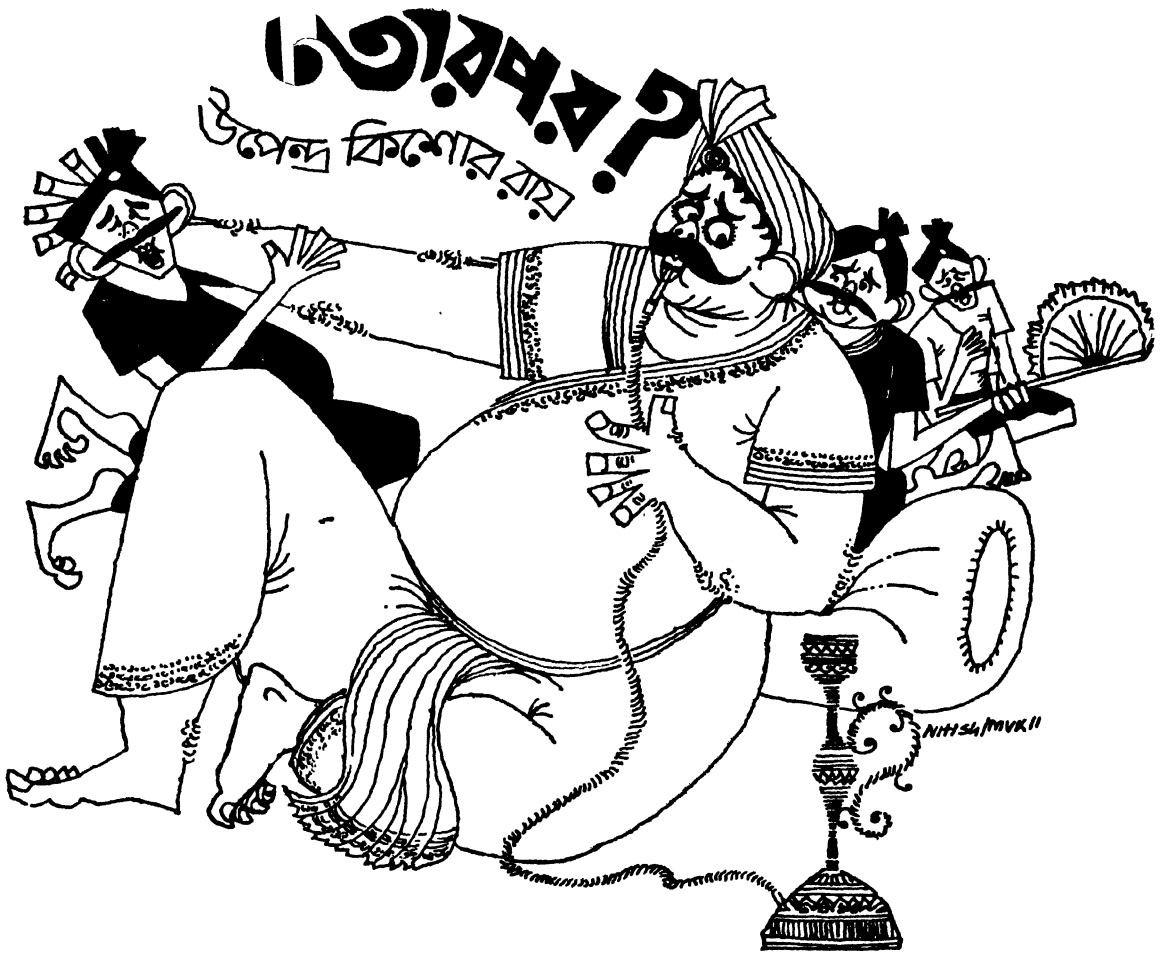
এক যে রাজা, তার ভারী গল্প শোনার সখ। কিন্তু তা থাকলে কি হয়,—রাজা মশাইকে কেউ গল্প শুনিয়ে খুসী করতে পারে না।

রাজা মশাই বলেন, 'যে আমাকে গল্প শুনিয়ে খুসী করতে পারবে, তাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দিব, না পারলে কান কেটে নিব।' তা শুনে দেশ বিদেশের কত ভারী ভারী নামজাদা গল্পওয়ালা কোমর বেঁধে গোঁফে তা দিয়ে গল্পের ঝুড়ি নিয়ে আসে, কিন্তু কেউ রাজামশাইকে খুসী করতে পারে না। যাবার সময় সকলেই কাটা কান নিয়ে দেশে যায়।

গল্প বলতে গেলেই রাজা মশাই খালি বলেন 'তার পর?' 'তার পর' 'তার পর' করে গল্পওয়ালার দফা শেষ করে তবে তিনি ছাড়েন। 'রাক্ষস মরে গেল'—'তারপর?' রাজপুত্র বেঁচে গেলেন— 'তারপর?' 'বৌ নিয়ে দেশে এলেন'—'তার পর?' 'ভারী আনন্দ হল'—তার পর? 'আমার কথা ফুরুল'।—'তারপর?' 'নটে গাছটি মুড়ুল'—'তার পর?' এমনি করে আর কত বলবে? কাজেই

শেষে একবার তাকে বলতে হয়, 'আর আমি জানি না' বা 'আর বলতে পারছি না।' তাহলেই রাজা বলেন 'তবে গল্প বলতে এসেছিলে কেন ? কাট তবে বেটার কান।'

এই ত ব্যাপার। রাজা মশাইয়ের তার পরের শেষও কেউ করে উঠতে পারে না, অর্ধেক রাজ্যও পায় না, লাভের মধ্যে কানটি যায়।

সেই দেশে থাকে এক নাপিত, সে বড্ড কুঁড়ে, কিন্তু ভারী সেয়ানা। সে ভাবল অর্ধেক রাজ্য যদি পাই, তবে নেহাৎ মন্দ হবে না ; একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি ? না হয় কানটা যাবে।

এই বলেই সে জামা জোড়া পরে, মস্ত পাগড়ী বেঁধে, লম্বা ফোঁটা কেটে, রাজার সভায় গিয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে যোড় হাতে বল্ল, মহারাজের জয় হোক। হুকুম হয়ত কিছু গল্প শোনাই।

রাজা বল্লেন, ভাল, ভাল। কিন্তু আমার সর্ত জানত, খুসী করতে পারলে অর্ধেক রাজ্য দিব, না পারলে কানটি কেটে নিব।

নাপিত বল্ল, আমার গল্পের আগাগোড়া শুনতে হবে, মাঝখানে থামতে বলতে পারবেন না।

রাজা বল্লেন, তাই সই, আমিও ত তাই চাই।

তখন নাপিত চাকর মহলে গিয়ে আচ্ছা করে ছিলিম আট দশ তামাক টেনে এসে খুব গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল।—মহারাজ, এখান থেকে অনেক দূরে এক আজব দেশ আছে। অমনি মহারাজ বল্লেন, তার পর ?

সেইখানে অনেকদিন আগে ভারী নামজাদা এক রাজা ছিলেন।—তার পর ?

তার রাজ্যের একধার থেকে আরেক ধার যেতে ছ মাস লাগত।—তার পর ?

আর সে রাজ্যের মাটি যে কি সরেশ ছিল, কি বলব ?—তার পর ?

তাতে এক সের ধান বুনলে, দশ মণ ধান পাওয়া যেত।—তার পর ?

তাই দেখে রাজা মশাই তাঁর রাজ্যের সকল জমিতে ধানের চাষ করালেন।—তার পর ?

আর তাতে ধান যা হল ! সে ধান রাখবার জন্য যে গোলা তয়ের হয়েছিল, তার এক ধারে দাঁড়ালে আরেক ধার দেখা যেত না।—তার পর ?

লাখে লাখে মোষের গাড়ী লেগেছিল, সে ধান গোলায় আনতে। এত বড় গোলা তাতে একেবারে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, আরেকটু হলেই ফেটে যেত।—তার পর ?

তারপর সেই ধানের খবর পেয়ে পঙ্গপাল যা এল ! পঙ্গপালে দশ দিক ছেয়ে গেল, আকাশ অন্ধকার, হাওয়া চলবার যো নাই, শ্বাস টানলে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল নাকে ঢোকে।—তার পর ? তার পর ?

বেটারা এসেছে ধান খেতে। কিন্তু রাজামশায়ের গোলা কি যেমন তেমন করে গড়া ? পঙ্গপালের সাধ্যি কি, তাতে ঢুকবে ? দশ দিন বেটারা বন্ বন্ করে গোলার চারধারে ঘুরে বেড়াল, বেড়ার কোনখানে একটা বিঁধ বার করতে পারল না।—তার পর ? তার পর ?

তার পর এগার দিনের দিন কয়েকটা ডানপিটে ছোকরা পঙ্গপাল খুঁজে খুঁজে কোত্থেকে গিয়ে

একটা বিঁধ বার করেছে, অনেক ঠেলাঠেলি করলে তা দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়।'—'তার পর? তার পর?'

তখন তাদের পালের গোদাটা এসে সেই বিঁধের মুখে বসে বল্ল, ঠ্যাল্‌তরে বাপু—সকলে তোরা সবাই মিলে, দেখি, ভিতরে ঢুকতে পারি কি না।—তার পর?

তার পর, ওঃ। সে কি বিষম ঠেলাঠেলি। গোদা বেটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল, তবু বল্‌লে 'ঠ্যাল, ঠ্যাল।'—তার পর?

শেষে অনেক কষ্টে, অর্ধেক ছাল বাইরে রেখে তবে গিয়ে ভিতরে ঢুকল।—তার পর?

ঢুকে একটি ধান মুখে করে নিয়ে, বিঁধের কাছে এসে বল্ল, এবারে আমাকে টেনে বার কর্।—তার পর?

ওহ্। সে কি টানাটানি। আরেকটু হলেই বেটা ছিঁড়ে যেত। যা হোক অনেক কষ্টে সে ধানটি নিয়ে বাইরে এল।—তার পর?

তারপর আরেক বেটা গিয়ে বসেছে সে বিঁধের মুখে, আর তেমনি ঠেলাঠেলির পর ভিতরে ঢুকেছে, আর একটি ধান নিয়ে তেমনি টানাটানির পর বাইরে এসেছে।—তার পর?

তার পর আরেক বেটা গিয়ে ঢুকেছে, আর একটা ধান নিয়ে বাইরে এসেছে।—তার পর?

তার পর আরেক বেটা।—তার পর? আরেক বেটা।—তার পর? আরেক বেটা। তার পর? আরেক বেটা।—

রাজা মশাই যতই বল্লেন, তার পর? নাপিত ততই খালি বলে, আরেক বেটা।

দণ্ডের পর দণ্ড এমনি ভাবে গেল। রাজা মশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু না শুনে উপায় নাই,—বলেছেন আগাগোড়া শুনবেন, থামিয়ে দিতে পারবেন না। সন্ধ্যার সময় রাজা মশাই আর থাকতে না পেরে বল্লেন, 'আরে, আর কত বল্‌বে? এখনো কি শেষ হল না?'

নাপিত যোড় হাতে বল্ল, 'সে কি মহারাজ? সবে ত আরম্ভ। গুটি কয়েক পঙ্গপাল সবে গুটি কয়েক ধান নিয়েছে। এখনো গোলা ধানে বোঝাই, আকাশ পঙ্গপালে অন্ধকার।'

কাজেই আর কি করা যায়? আরো দু দিন বসে পঙ্গপালের কথা শুনলেন। তারপর আর কিছুতেই থাকতে না পেরে, কেঁদে বল্লেন, 'আমার ঢের হয়েছে বাবা। অর্ধেক রাজ্য নেও, নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।'

তখন নাপিতের খুব মজাই হল।

খুঁতখুঁতে হাঁস

সুবিনয় রায়

প্রকাণ্ড বিলের কালো জলে শত শত রাজহাঁস থাকে। তারা সারাদিন মনের আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়ায় আর খায় দায়। একটি শাদা হাঁসের কিন্তু দিনরাতই খুঁতখুঁতি লেগে আছে— কেন তার চেহারা আরো সুন্দর হয় না—কেন তার গায়ে নানারকম রং হয় না—কেন তার পালক কোঁকড়ানো হয় না—ইত্যাদি।

শেষটায় সে একদিন সত্যিই মনের দুঃখে বিলের জল ছেড়ে উড়ে চলে গেল। অনেক দূর গিয়ে সে এক ছোট সহরে একটা ছোট বাড়ির ছাতে গিয়ে বসল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল, সাম্নের বাড়িতে লেখা রয়েছে—'পালক ধোয়া হয়, রঙ্গানো হয়, কোঁকড়ান হয়;—দর সস্তা; পরীক্ষা প্রার্থনীয়।' খুঁতখুঁতে হাঁস তখনই সেই বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে গেল।

প্রথমেই এক চশমা পরা বুড়োর সঙ্গে তার দেখা। সে বুড়োকে বলল, 'মশাই! আমার পালক সুন্দর করে' নানা রঙে রঙ্গিয়ে দিতে পারেন? ডানার পালকগুলি একটু কোঁকড়ান হলে ভাল হয়।'

বুড়ো বলল 'পারবো না কেন? এক টাকা লাগবে।'

হাঁস বিলের ধারে একদিন একটা টাকা কুড়িয়ে পেয়েছিল,—তাই সে বুড়োকে বলল 'হাঁ, দেবো।'

বুড়ো তখনই শিশিভরা রঙ্ এনে তার গা সুন্দর করে রঙ্গিয়ে দিল। লাল, নীল, হলদে সবুজ, বেগুনি, গোলাপী, সোনালী, রূপালী—কোন রংই বাদ গেল না। ডানার পালকগুলি সুন্দর করে কোঁকড়ান হল।

হাঁসের তো ভারি ফুর্তি! সে বুড়োকে টাকাটা দিয়েই উড়ে নিজের দেশের দিকে রওনা হল। কিন্তু তার মনের আনন্দ আর বেশিক্ষণ রইল না। রঙ্গিন হাঁস দেখে সকলেই ভাবল 'বাঃ কি সুন্দর পাখি! এমন আশ্চর্য সুন্দর পালক আর কোন পাখির নেই; এটাকে মারতে পারলে হয়।'

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। দলে দলে লোক পন্ পন্ করে হাঁসের পিছনে ছুটল; কারো হাতে গুলতি, কারো হাতে তীর ধনুক, কারো হাতে বন্দুক, কেউ পাথর, কেউ ইঁট পাটকেল নিয়েই ছুটছে। চারিদিকে সাঁই সাঁই, ফুটফাট, দুমদাম শুনে ভয়ে হাঁসের প্রাণ উড়ে গেল! বেচারা প্রাণপণে উড়ে উঁচুতে উঠল; কিন্তু লোকেরা তার পিছন ছাড়ে না। বন্দুকের গুলি তখনও দুমদাম তার পাশে ফাটছে।

হাঁস বেচারা ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগল;—আর বোধহয় সে উড়তে পারবে না। তার মাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে এল। বেচারা প্রায় পড় পড়!

এমন সময়, কোথা থেকে ঝম ঝম বৃষ্টি নামল আর হাঁসের গায়ের রঙ্ সব ধুয়ে একেবারে ধবধবে শাদা রঙ্ বেরিয়ে পড়ল। বুড়ো রঙ্-ওয়ালা সব কাঁচা রঙ্ দিয়েছিল। যখন সকলে দেখল যে হাঁস একেবারে শাদা, তখন তারা বলল 'আরে ছ্যাঃ—এ যে রঙ্ করা হাঁস। চল্ চল, ঘরে ফিরে

চল্।' তারাও ঘরে ফিরে গেল, হাঁসও বেঁচে গেল। সেদিন থেকে সে বেচারা আর কখনও খুঁতখুঁত করে নি।

নাড়ুবাবুর পেন উদ্ধার

অজন্ত রায়

নাড়ুবাবু যখন সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলছে—রাগে, দুঃখে হতাশায়! ওঃ এক সপ্তাহের মধ্যে দু-দুটো পেন পকেটমার হয়ে গেল। প্রথমটা না হয় বাজে ছিল কিন্তু এবারেরটা একটা দামী সেফার্স। আর শুধু কী তাই, ঐ সবুজ সেফার্সটা তিনি তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখার জন্য প্রাপ্ত মূল্যের টাকায় কিনেছিলেন। বড্ড পয়া পেন ছিল।

নাড়ুবাবু একজন উঠতি লেখক। আর ঐ সেফার্সটা না খুললে তাঁর হাতই আসতে চায় না। এ তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন। পেনটা খুললেই, প্লট, চরিত্র, ভাষা সব হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসতে থাকে। অন্য পেন নিয়ে চেষ্টা করে দেখেছেন—স্রেফ সময় নষ্ট। এক কলম লেখা এগোয় নি।

আজ কী না সেই পেনটাই গেল। নাড়ুবাবু আর ভাবতে পারেন না।

অফিসটাইমে বাসে উঠে পেন সামলানই বা কী করে। এদিকে আবার পেন না নিয়ে গেলেও চলে না। ওঃ, যা ভিড়। বিশেষতঃ যাবার সময়। আসার সময় না হয় কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ভিড়টা কমে গেলে বাসে চাপেন। কিন্তু যাবার সময় তো আর একঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরোনো যায় না। তা হলে যে খাওয়াই হবে না।

আর বাসে উঠে কোনরকমে রড্ আঁকড়ে ঝুলে থাকাই দায়। তার মধ্যে কী আর কে তাঁর পকেটের ভার দয়া করে লাঘব করেছেন, তার খেয়াল রাখা যায়! তিনিই তো কতসময় পয়সা বার করতে গিয়ে ভুল করে নিজের ভেবে অন্যের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছেন। অসম্ভব ব্যাপার।

তা পেন না হয় আবার হবে কিন্তু ঐটি না ফিরে পেলে যে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ইতি—

রাত্রে খাবার পর ছাদে উঠে ক্রমাগত পায়চারি করছেন। মাথাটা ঠাণ্ডা না হয়ে উত্তরোত্তর গরমই হয়ে উঠছে। প্রায় স্ফুটনাঙ্কে যখন পৌঁছেছে হঠাৎ সেই সময় বুদ্ধিটা বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। দেখা যাক কী হয়। মরীয়া হয়ে উঠেছেন নাড়ুবাবু। হ্যা, ঐ ভাবেই চেষ্টা চালাবেন। যাক কিছু পয়সা আর পরিশ্রম।

পরদিন নাড়ুবাবু সময় মতোই অফিসে হাজির হলেন। আর গিয়েই সাত দিনের ছুটির দরখাস্ত দিলেন ঝেড়ে—'আঙ্কেল সিরিয়াস,' অফিসের লোকদের বলে এলেন, কাকা এই আছেন কী নেই। ডাক্তার বদ্যি তাঁকে একাই সব সামলাতে হচ্ছে। কবে আবার জয়েন করতে পারবেন, ঠিক কিছুই বলতে পারছেন না।

পরদিন থেকে নাড়ুবাবু তাঁর অভূতপূর্ব অভিযান আরম্ভ করলেন।

অফিসের সময়মতো খেলেন, তারপর পান চিবোতে চিবোতে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়ালেন। হুড়মুড় করে বাস এসে পড়ল। বাসের গায়ে লোক বাদুড় ঝোলা ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে বাসের মধ্যকার আর উঠতি যাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল লেগে গেল। একপক্ষ উঠতে দেবেন না। অন্যপক্ষও অপ্রতিরোধ্য। নাড়ুবাবু বহুদিনের অর্জিত দক্ষতায় ওরই মধ্যে টুক করে ভিতরে সেঁদিয়ে পড়েছেন। কেউ উঠলেন, কেউ পারলেন না। কেউ বা নেমেছেন, কিন্তু ধুতির কোঁচাকে বাস ছেড়ে নামানো যাচ্ছে না। হৈ হৈ, রৈ রৈ কাণ্ড। তালেগোলে বাস দিল ছেড়ে।

এ লাইনে এক মাত্র—নং হল অফিস পাড়ায় যাবার বাস। আর এ সময় তার সব কটাতেই থাকে ভয়ানক ভিড়। এর মধ্যে কী নিজেকে বাদে অন্য কিছু সামলানো চলে।

নাড়ুবাবু উঠে জুৎ করে দাঁড়ালেন। রড্‌টা দুহাতে আঁকড়ে ধরলেন তারপর সজোরে গলা চড়ালেন—'দেখবেন মশাইরা পকেট সামলে। অসাবধান হয়েছেন কী পকেট থেকে পেন হাওয়া হয়ে যাবে। আমার, মশাই, গত কালই একটা নতুন পেন চলে গেল।'

দু-একটা সহানুভূতি সূচক গলা পাওয়া গেল।

—'যা বলেছেন। আমারও একটা গেছে আগের মাসে

—'আরে এ লাইনটা পেনচুরির জন্য বিখ্যাত।'

একটি দাড়ি গোছের বৃদ্ধের চাঁচা ছোলা গলা শোনা গেল—'একখানা মোটে বাস। আর বাসও বাড়ায় না। আমাদের গভরমেণ্ট যা হয়েছে। বেশ তবে পকেট মারা গেলে গভরমেণ্ট আমাদের ক্ষতিপূরণ দিক। কেন দেওয়া হবে না বলুন?"

নাড়ুবাবুকে আর বেশি কিছু করতে হল না! বাসসুদ্ধ সবাই তাদের স্বচক্ষে দেখা বা ভীষণ বিশ্বস্তসূত্রে শোনা নানারকম চমকপ্রদ পকেটমারার কাহিনী পরস্পরকে শোনাতে আরম্ভ করে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে পেন-টেনগুলোর প্রতি সজাগ হয়ে উঠল।

নাড়ুবাবুর অফিস অনেকটা পথ। তিনি কিন্তু মাঝামাঝি গিয়েই নেমে পড়লেন। গড়ের মাঠে একচক্কর ঘুরে নিয়ে আবার একটা ফিরতি বাসে উঠলেন, এবং উঠেই হাঁক ছাড়লেন—

'মশাইরা পেন সামলে, আমার কালই একটা গিয়েছে। শুনলাম এ লাইনে পেন হাতাবার কয়েক জন নামকরা ওস্তাদ যাতায়াত করছেন।'

ব্যাস, আগেকার মতই সারা বাস পকেটমারার আলোচনায় গরম হয়ে ওঠে। যে যার পকেটে হাত দিয়ে জিনিস টিনিস সব আছে কী না দেখেও নেয়। নাড়ুবাবু বাড়ির কাছে এসে নেমে পড়লেন।

এইরকম বার দু-এক যাতায়াত করে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লেন। তা মেহনত তো কম হয়নি। মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাড়ু এখনই ফিরলি?'

—'হ্যা মা, তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে গেলাম। এরকম এখন কয়েকদিন পাব।'

—'তা বেশ।' বলে মা চলে গেলেন, আর নাড়ুবাবুও পাশ ফিরে এক লম্বা ঘুম মারলেন।

এটাই আপাতত নাড়ুবাবুর দৈনন্দিন কর্মধারা হয়ে দাঁড়ালো। চারদিন ধরে তাঁর ঐ রুটিন চলছে। সকালে অফিস টাইমে বাসে ঘোরা আর উঠেই সকলকে পকেটমার সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া।

নাড়ুবাবুকে এখন বাসের লোক বেশ চিনে গেছে।

অফিস টাইমে বাস স্টপে তাঁকে দেখবামাত্র বাসের লোক হৈ হৈ করে ওঠে।

—'এই যে দাদা এসে গেছেন।'

—'আরে দাদাকে দেখেই পকেটের কথা মনে পড়ে গেল। দেখি আবার সব ঠিকঠাক আছে কী না।'

নাড়ুবাবুও সাবধান করেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পকেটের জিনিসপত্তর সব সামলে। খুব খারাপ রাস্তা, মশাই।'

ছেলে ছোকরারা টিপ্পনী কাটে, 'কী দাদা, কাজের ফাঁকে পরোপকার করে একটু পুণ্য সঞ্চয় করছেন না কী?'

'আরে জানিস না, দাদা হলেন 'পকেটমার নিবারণী সংঘে'র একজন জাঁদরেল মেম্বার।'

নাড়ুবাবু রাগেন না, হাসেন।

কোনো নতুন যাত্রী জানতে চায়, 'কী ব্যাপার বলুন তো। পকেটমার হয়েছে না কী?'

নাড়ুবাবু তৎক্ষণাৎ বিস্তারিত করে বোঝান—'খুব সামলে চলবেন। এই সময় রুটের বাসে

পকেটের জিনিস পত্তর একেবারে অস্থাবর। বিশেষ করে পেন! এই দেখলেন আছে, পাঁচ মিনিট পরেই দেখবেন হাওয়া।'

আর তিনি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাসসুদ্ধ লোকের নানান্ পকেটমারার গল্প মনে পড়ে যায়। কারও কারও পকেটমারার গল্প স্টক ফুরিয়ে যাওয়ায় চুরি, ডাকাতি রাহাজানির গল্পে বাস মুখর হয়ে ওঠে।

নাড়ুবাবু হৃষ্টচিত্তে সব লক্ষ্য করেন।

এই রকম কয়েকবার যাতায়াত করে বাড়ি ফিরে আসেন। আর এসেই টেনে ঘুম।

সেদিন পঞ্চম দিন। নাড়ুবাবু আফিসের দিকে যাত্রী বাসটা থেকে গড়ের মাঠের কাছে তাঁর প্রথম ট্রিপটা দিয়ে নামলেন। একটু হাওয়া খেয়ে আবার একটা উল্টোদিকের বাস ধরবেন। তারপর আবার অফিসের দিকের।...এই রকম চলবে, বেশ কিছু পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে। তা যাক্, তিনি ছাড়ছেন না।

গড়ের মাঠের গাছের ছায়ায় ঘুরছেন। একজন পেন্টালুন আর হাওয়াই সার্ট পরা মাঝবয়সী লোক একই সঙ্গে বাস থেকে নেমে গুটিগুটি তাঁর পিছনে পিছনে আসছিল। হঠাৎ কাছে এসে ডাকল, 'ও মশাই, ইদিকে একবার আসবেন। একটা কথা ছিল।'

নাড়ুবাবু আড় চোখে চেয়ে বললে, 'বলুন।'

—'চলুন না ঐ ফাঁকা গাছটার নিচে। তাড়া আছে?'

—'নাঃ তাড়া তেমন নেই, চলুন।'

গাছটার তলায় এসেই লোকটি তেড়িয়া হয়ে উঠল,

—'আচ্ছা মশাই, কদিন ধরে দেখছি আপনি এই সময়েতে বাসে চড়ে কেবল ইদিক উদিক করেন, উঠেই কেবল পকেটমারের গল্প ফাঁদেন। বলি ব্যাপারটা কী? আপনার আর কিছু কাজকম্ম নেই না কী?'

নাড়ুবাবু বলেন, 'মানে আমার পেনটা সেদিন গেল কী না। তাই অন্যদের একটু সাবধান করে দিচ্ছি। আর কিছু নয়।'

—'ওঃ, খুব যে দেখছি অন্যের ভালো মন্দের চিন্তা। তা পেনটা ফিরে পেলে কী করবেন?'

—'আজ্ঞে, কাল থেকেই আবার অফিস যাব। তবে না পাওয়া পর্যন্ত অফিস মুখো হচ্ছি না। আমার পয়া পেন, মশাই।'

—'বটে।' লোকটি গম্ভীর হয়ে যায়। 'কবে হারিয়েছিল?'

—'গত সোমবার সকাল দশটা নাগাদ।'

—'অ,' ইতিমধ্যে লোকটি তার দু-হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এইবার দু-হাতই বার করে এনে নাড়ুবাবুর সামনে দুই-মুঠো খুলে ধরল। দু-মুঠোয় নানান রঙের হরেক রকমের একগাদা পেন।

—'দেখুন কোনটা আপনার। সব কটাই নিয়ে এসেছি।'

নাড়ুবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁর সবুজ সেফার্সটিকে চিনে ফেলেছেন, আর টপ্ করে তুলে নিয়েছেন, লোকটির প্রসারিত মুঠো থেকে। পরম আদরে হাত বোলাতে থাকেন তাঁর হারানিধির গায়ে।

'—ব্যাস, মিলেছে তো। তা হলে আর কাল থেকে ঝুট ঝামেলা করবেন না। ওঃ, ভারী তো একটা পেন গিয়েছিল আজ পাঁচদিন ধরে কী কাণ্ডটাই না আরম্ভ করেছেন।'

নাড়ুবাবু বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'ভারী পয়া পেন, মশাই। এটা ছাড়া আমার লেখাই বেরোয় না।'

—'আর আমার হালটা কী হয়েছে ভাবুনতো।' লোকটি ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ওঠে। 'আজ পাঁচ দিন ধরে স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে আছি। আপনার জ্বালায় সব কাজকম্ম প্রায় বন্ধ। আমার আবার এই বাস রুটে সকালের অফিস টাইমে মাত্র এক ঘণ্টা ডিউটি। ব্যাস, তার পরেই অন্য লোকের পালা। আর আমিও বাকি সকালটা বিলকুল বেকার। তা রোজকার-পাতি না থাকলে সংসারটা চালাই কী করে বলতে পারেন?'

নাড়ুবাবু অপ্রস্তুতের মত মাথা চুলকান।

'—আজ্ঞে ঠিক এতটা চিন্তা করিনি। মানে……।'

'—ঠিক আছে। পেন তো পেয়ে গেছেন। কাল থেকে বাসে উঠে ঐ সব বাজে বকবেন না তো?'

—'মোটেই না। কী দরকার আমার মুখ ব্যথা করে। স্রেফ অফিস যাব আর আসব।' নাড়ুবাবু অম্লান বদনে উত্তর দেন।

—'হ্যাঁ, মানে ঐ পুলিশ টুলিশে দেবার মতলব নেই তো?'

—'আরে না না।' নাড়ুবাবু শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 'আবার পেনটা খোয়াই! আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

—'তা হলে কথা দিচ্ছেন। মনে রাখবেন কিন্তু। প্রমিস্।'

—'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, চলুন না একটা পান খাওয়া যাক।' পেন ফিরে পাওয়ার আনন্দে নাড়ুবাবু গদগদ।

—'সরি, আজ একদম সময় নেই। একটু কাজ আছে। নমস্কার।' লোকটি ততক্ষণে হনহন করে বাসস্টপের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

পরদিন থেকে নাড়ুবাবু অফিস যেতে আরম্ভ করলেন, এবং ঐ সবুজ সেফার্সটা বুক পকেটে নিয়েই।

প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেছে। নাড়ুবাবু লেখায় বেশ নাম করে ফেলেছেন। তার এখনও সেই সবুজ সেফার্সটিতেই তিনি লিখে থাকেন।

বাসে সেই লোকটির সঙ্গে তাঁর বারকয়েক দেখা হয়েছে। চোখাচোখি হতেই তিনি পরিচিতের মতন তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁত বার করেছেন। লোকটি কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

হিসেব করা শক্ত নয়

সমর দেব

আজকে মাসের পয়লা তারিখে দিয়ে দেব তোর মাইনে
'টাকা বাকী রাখি' এ কথাটা আমি মোটেই শুনতে চাইনে।
পনেরোটা টাকা হিসেবে যে তোর মাইনেটা আছে ধার্য
পরে অবশ্য বাড়াব বলেছি দেখে শুনে তোর কার্য।
টাকা নিতে হলে আগেই হিসেব করে নিবি কড়াক্রান্তি
জানবি কাউকে ফাঁকি দিয়ে আমি পাইনে মোটেই শান্তি।
বোঝাব হিসেব। মন দিয়ে শোন্ সহজে বুঝতে পারবি।
নিজেই চেষ্টা কর না রে কেন অপরের ধার ধারবি ?
মোটের উপর বারোদিন তুই এ মাসে কামাই করলি
আট আনা হিসেবে ছ টাকা যে তোর বাদ যাবে সেটা ধরলি ?
ডিস আর কাপ চারটে ভেঙ্গে তো এ মাসেই দফা সারলি
চার টাকা তাই বাদ যাবে তোর। কথাটা বুঝতে পারলি ?
নতুন কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিলি আজও দেখ মনে রাখি
বেশী নয় মোটে তিন টাকা বাদ দিলে থাকে কত বাকী ?
এই তো সেদিন এক টাকা তুই হারালি পথের পরে
এক টাকা বাদ দিলে কত থাকে বল্না হিসেব করে।
সর্ষের তেল নষ্ট করলি হবে তা একপো মাপলে
ঝাঁটাটা বল্তো আস্ত থাকে কি অহেতুক অত চাপলে ?
খেসারৎ তাই এক টাকা তোকে দিতে হবে এই জন্যে
অবিচার আমি করিনা মোটেই জিজ্ঞাসা কর অন্যে।
হিসেব করাটা শক্ত নয়তো। বলছি তাই তো বারবার
বাকী যা রইলো নগদে মেটাবো করি নাকো ধারে কারবার।
আরে আরে একি ? পনেরো টাকাই হবে যে দেখছি কাটতে
নিজের দোষেই বাধ্য হলিতো বিনা মাইনেতে খাটতে॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক :—

(আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়, পাঁচটি অসমসাহসী ব্যক্তি, অবরুদ্ধ রিচমণ্ড সহর হইতে বেলুনে চড়িয়া পলায়ন করিতে গিয়া, নিদারুণ ঝটিকার প্রকোপে একবস্ত্রে ও শূন্যহস্তে এক নির্জন ভূখণ্ডে পরিত্যক্ত হন। প্রথমে সাইরাস হার্ডিংকে পাওয়া যায় নি। স্পিলেট, পেনক্রফ্‌ট্ হারবার্ট এবং নেব্ একটি গ্রেনাইট পাথরের স্তূপ বা চিমনীকে বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। তাঁহাদের নিকট একটিমাত্র দেশলাইর কাঠি ছিল, তাই দিয়া বহুকষ্টে তাঁহারা আগুন জ্বালিলেন ও শুকনা কাঠের সাহায্যে সেটিকে সযত্নে রক্ষা করিলেন। আবার প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়াছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে হার্ডিংএর কুকুর টপকে পাওয়া গেল, এবং তাহার পিছনে গিয়া, চিমনী হইতে বহুদূরে এক গহ্বরের মধ্যে, মৃতপ্রায় অবস্থায় হার্ডিংএর সন্ধান মিলিল। স্ট্রেচারে করিয়া বহুকষ্টে যখন তাঁহাকে চিমনীতে লইয়া আসা হইল, তখন দেখা গেল যে ঝড়ে আগুন নিবিয়া গিয়াছে !)

নবম পরিচ্ছেদ

চিমনীর আগুন নিবিয়া গিয়াছে—পেনক্রফ্‌টের মুখে একথা শুনিয়া অন্য কেহ তাহার মত ঘাব্‌ড়াইলেন না। নেব্ তাহার প্রভুকে পাইয়াছে, মনের আনন্দে সে পেনক্রফ্‌টের কথায় কানই দিল না।

স্পিলেট্ বলিলেন "সত্যি পেনক্রফ্‌ট। আগুন থাক্ বা নিবে যাক তাতে আমার কিছু এসে যায় না।"

পেনক্রফ্‌ট বলিল—"আগুন যে একেবারে নিবে গিয়েছে।"

"তাতে আমার বয়ে গিয়েছে।"

"জালাবার যে কোন উপায় নাই।"

"তুমি একটি মূর্খ, পেনক্রফ্‌ট।"

"কিন্তু মিষ্টার স্পিলেট্, আমি আবারও—"

"সাইরাস্ উপস্থিত আছেন দেখ্‌ছ না? তিনি আগুন জালাবার একটা উপায় করে নেবেন।"

"কি দিয়ে উপায় করবেন?"

"ঘোড়ার ডিম দিয়ে।"

এ কথার উপরে পেনক্রফ্‌ট আর কি বলিবে? তাহার মনের মধ্যেও যে অন্যদের মতই হার্ডিংএর উপর অগাধ ভরসা। তাহাদিগের নিকট হার্ডিং যেন সর্বজ্ঞ—বৈজ্ঞানিক যাহা কিছু আছে, সবই হার্ডিংএর পেটে; মানুষের যত রকম বুদ্ধি থাকা সম্ভব হার্ডিংএর মাথায় তাহার কোনটিরই অভাব নাই। হার্ডিং সঙ্গে থাকিলে তাহাদিগের অভাব কিসের? নিরাশাই বা আসিবে কেন?

স্ট্রেচারের ঝাঁকানির ফলে সাইরাস্ হার্ডিং আবার অজ্ঞান হইয়া গেলেন, আগুনের ব্যবস্থার কথা তাঁহাকে তখন জিজ্ঞাসা করা গেল না। যাহা হউক, কিছু পুষ্টিকর খাদ্য এখন হার্ডিংকে খাওয়ান দরকার। টেট্রার মাংস সবই শেষ হইয়াছে, চিমনীতে কুরকাসের মাংস যাহা ছিল, জল ঝড়ের কল্যাণে তাহাও শেষ হইয়াছে। শিকার করিয়া কোন জন্তু পাখী আনা যায় বটে, কিন্তু আগুন থাকিলে তবে ত রান্না হইবে? চিমনীর মধ্যে বড় ঘরটিতে হার্ডিংকে রাখা হইল। সমুদ্রের আগাছা শেওলা প্রভৃতি দিয়া, তাঁহার জন্য বেশ নরম বিছানা করা হইয়াছে। কিন্তু ঝড়ে চিম্‌নীর ফাটলগুলির ছিপি খুলিয়া যাওয়ায় ঘরের মধ্যে ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া—হার্ডিংএর পক্ষে তাহা অনিষ্টকর সেজন্য সকলের গায়ের কোট প্রভৃতি খুলিয়া হার্ডিংকে চাপা দেওয়া হইল। সেইরাত্রে সকলের খাদ্য হইল শুধু শামুক আর ঝিনুক। আগুনের কি উপায় হইবে? পেনক্রফ্‌ট ত ভাবিয়াই অস্থির। উপায় যত রকমের ছিল, কোনটাই সে বাদ দেয় নাই, কিন্তু আগুন জ্বলিল কৈ? বুনো লোকেরা যে কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন জালায়, সে উপায়েও কোন ফল হইল না। ঘষাঘষিতে কাঠ গরম হইল বটে, কিন্তু যাহারা ঘষিল তাহারা গরম হইল কাঠের ডবল। পেনক্রফ্‌টের পরে হারবার্ট কাঠে কাঠে ঘষিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া "পেনক্রফ্‌ট ত হাসিয়াই খুন। সে নিজে যাহা পারিল না তাহা পারিবে কি-না বালক হারবার্ট! তাই সে বলিল—"ঘষ বাবা ঘষ—খুব ভাল করে ঘষতে থাক।"

হারবার্ট বলিল—"ঘষছিই ত। আগুন জালাতে পারব বলছি না, কিন্তু গা-টা গরম করে নি—নইলে যে শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।"

ইহাদিগের নিষ্ফল চেষ্টা দেখিয়া স্পিলেট্ বলিলেন—"আমি ত বার বার বল্‌ছি, হার্ডিং কখনই এই সামান্য বিষয় নিয়ে তোমাদের মত ঘাব্‌ড়াতেন না। এই বলিয়া তিনি চিম্‌নীর পথে বালির উপর শুইলেন। হারবার্ট নেব ও পেনক্রফ্‌ট সকলেই শয়ন করিল। টপ্‌ ঘুমাইল তাহার প্রভুর পায়ের নীচে।

দশম পরিচ্ছেদ

পরদিন, ২৮এ মার্চ প্রাতঃকালে হার্ডিং জাগিলেন। জাগিয়াই আবার সেই প্রশ্ন—"এটা দ্বীপ না দেশ?"

পেনক্রফ্‌ট বলিল—"ক্যাপ্‌টেন্। সেটা এখনও আমরা কিছু জান্‌তে পারি নাই। আপনি সুস্থ সবল হয়ে যখন আমাদের নিয়ে বেরুতে পারবেন, তখনই জানা যাবে।"

হার্ডিং বলিলেন—"আমার বোধ হয়, আমি এখন বেশ যেতে পারব।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া সটান দাঁড়াইয়া বলিলেন—"বড় দুর্বল বোধ করছি, আমাকে কিছু খেতে দাও। তোমাদের আগুনের ব্যবস্থা আছে না?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"বড়ই দুঃখের বিষয়—আগুন নাই। ছিল বটে কিন্তু এখন নিবে গিয়েছে।"

হার্ডিং বলিলেন, "এ বিষয় পরে ভেবে দেখা যাবে। অন্য কিছু ব্যবস্থা না হয়, দিয়াশলাই বানিয়ে নিব।"

"তাহলে দিয়াশলাই, কাঠি, মশলা প্রভৃতি সরঞ্জাম—সবই বানাবেন?"

"সবই বানিয়ে নিব পেন্‌ক্রফ্‌ট।"

বিষয়টা পেন্‌ক্রফ্‌টের নিকট তত সহজ বোধ না হইলেও সে হার্ডিংএর কথায় বাধা দিল না।

ইহার পর সকলেই চিম্‌নী হইতে বাহির হইলেন। আকাশ বেশ পরিস্কার, সূর্য সবেমাত্র সমুদ্রের প্রান্ত হইতে উঁকি মারিতেছেন। হার্ডিং একটা পাথরের উপর বসিলেন। হারবার্ট তাঁহাকে কতকগুলি শামুক ঝিনুক খাইতে দিল। এই বিশ্রী খাদ্যই হার্ডিং খানিকটা পরিষ্কার জলের সাহায্যে তৃপ্তির সহিত গিলিলেন।

আহারের পর হার্ডিং বলিলেন, "কালকে আমরা জানতে চেষ্টা করব—এটা দ্বীপ না দেশ। এখন আর কিছু করবার নাই।" পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"করবার আছে বৈকি—আগুন"।

হার্ডিং বলিলেন, "ব্যস্ত হয়ো না, পেন্‌ক্রফ্‌ট আগুন আমরা তৈরি ক'রে নিব। আচ্ছা কাল যখন তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে আস, তখন পশ্চিমের দিকে যেন একটা উঁচু পাহাড় দেখেছিলাম—সেটার উপরে উঠ্‌লে সমস্ত দ্বীপটা বেশ দেখা যাবে। কাল এই পাহাড়ে চ'ড়ে সব দেখব। এখন তাহলে আর কিছু করবার নেই।" নাছোড়বান্দা পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"আছেইত—আগুন।"

স্পিলেট বলিলেন—"আগুন আগুন করে এত ব্যস্ত হলে কেন, পেন্‌ক্রফ্‌ট? বল্‌ছি, আগুন হার্ডিং করে নিবেন।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া হার্ডিং বলিলেন—"আমাদের অবস্থা দেখছি শোচনীয়। কিন্তু এটা নিশ্চয়—যদি কোন দেশে পড়ে থাকি তবে দুঃখ কষ্ট পেয়ে শেষে হয়ত উদ্ধার পাব। যদি এটা দ্বীপ হয় এবং এখানে লোকের বসবাস থাকে, তবে, তাদের সাহায্যে উদ্ধারের চেষ্টা হতে পারে। আর যদি এটা মরুভূমি হয়, তাহলে আমরা নিজেরাই উদ্ধারের পথ দেখে নিব।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"এটা দ্বীপই হোক আর দেশই হোক্—এটা কোন্ জায়গায় মনে হয় হার্ডিং?"

হার্ডিং বলিলেন—"এ বিষয়ে ঠিক করে বলা কঠিন। আমার মনে হয়, প্রশান্ত মহাসাগরের কোনখানে জায়গাটা হবে। আমরা যখন রিচমণ্ড সহর ছেড়ে আসি তখন উত্তরপূব থেকে ঝড় আসছিল। যদি ঝড়ের গতিটা আগাগোড়া ঠিকভাবে থেকে থাকে, তবে আমরা নর্থ কেরোলিনা, সাউথ কেরোলিনা, জর্জিয়া মেক্সিকো এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কতক অংশ পার হয়ে এসেছি। বেলুনটা তাহলে ছয় হাজার মাইলের কম পথ আসেনি। আমরা হয় ম্যান্‌ডেভা দ্বীপপুঞ্জে কিংবা নিউজিল্যাণ্ডে এসে পড়েছি, এটা যদি ঠিক হয়, তবে দেশে ফিরে যাওয়া কঠিন হবে না। আর যদি এই জায়গাটা পরিত্যক্ত এবং চল্‌তি পথের বাইরে কোন স্থান হয়ে থাকে, তবে, ঐ উঁচু পাহাড়ের উপর উঠলেই সব বুঝতে পারা যাবে। তখন ভাবা যাবে—এখানে চিরকাল থাকবার ব্যবস্থা কিরূপ করা যেতে পারে।"

হারবার্ট বলিল—"কাল যে পাহাড়ে চড়বেন বলছেন, আপনি পরিশ্রম সহ্য করতে পারবেন কি?"

হার্ডিং বলিলেন—"আমার ত মনে হয় পারব—তবে তুমি আর পেন্‌ক্রফ্‌ট যদি চতুর শিকারী হও, তবেই সেটা সম্ভব।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"শিকারের জন্ত ভাবনা কি। শিকার নিয়ে ফিরে এলে রোস্ট করার ব্যবস্থা হলে নিশ্চয়ই শিকার নিয়ে আসব।"

হার্ডিং বলিলেন—"তুমি আগে শিকার আন ত, তখন দেখা যাবে রোস্ট্‌ করার ব্যবস্থা হয় কি না।"

নেব, হারবার্ট, ও পেন্‌ক্রফ্‌ট তখনই বাহির হইল শিকারের সন্ধানে, তাহাদের অস্ত্র হইল গাছের মোটা ডাল, আর টপ ত সঙ্গেই আছে।

পথে যাইতে যাইতে পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"ফিরে গিয়ে যদি দেখি চিম্‌নীতে আগুন জলছে তাহলে বুঝব স্বয়ং অগ্নিদেব এসে আগুন জেলে দিয়ে গিয়েছেন।"

শিকারী তিনটি বনে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না, টেট্রা কুরুকাস্‌ ও যেন কোথায় পলায়ন করিয়াছে। নেব্‌ ঠাট্টা করিয়া বলিল—পেন্‌ক্রফ্‌ট, এই যদি তোমার শিকারের নমুনা হয় তবে ত দেখছি রোস্ট করবার জন্ত আগুনের দরকার হবে না।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"ব্যস্ত হয়ো না। শিকারের অভাব হবে না ফিরে গিয়ে আগুন পেলেই হয়।"

নেব্‌ বলিল—"আমার প্রভু আগুন করে নেবে—একথা বিশ্বাস কর না তুমি?"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল "যখন দেখব গিয়ে দাউ দাউ করে আগুন জলছে, তখনই বিশ্বাস করব।"

ক্রমে বেলা দুইপ্রহর হইল, শিকারের সন্ধান তবুও চলিয়াছে। হারবার্ট এক রকমের গাছ দেখিতে পাইল তাহার ফল খাইতে বেশ অনেকটা বাদামের মত। তিনজনে পেট ভরিয়া কতক খাইল, আর সঙ্গে করিয়া লইলও বিস্তর। এমন সময়—"টপ নিশ্চয়ই কিছু দেখতে পেয়েছে" বলিয়া নেব ছুটিয়া একটা ঝোপের দিকে গেল। ঝোপের মধ্যে টপ চীৎকার করিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া একটা শব্দ হইতেছে। সকলে ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল—টপ একটা জন্তুর কান কামড়াইয়া ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। জন্তুটা দেখিতে শুয়রের মত—প্রায় দুই ফুট লম্বা আর ব্রাউন রংএর। মনে হইল যেন, জন্তুটার পায়ের তলা হাঁসের পায়ের তলার মত জোড়া। হারবার্ট দেখিয়াই বলিল—এটা ক্যাপিবারা। নেব্‌ লাঠির আঘাতে জন্তুটাকে মারিতে যাইবে, এমন সময় হঠাৎ টপের মুখ হইতে কান ছাড়াইয়া সেটা একেবারে হারবার্টের উপরে গিয়া ছুটিয়া পড়িয়াছে, এবং হারবার্টকে প্রায় চিৎপাত করিয়া বনে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। হারবার্ট, নেব, পেন্‌ক্রফ্‌ট সকলেই তাহার পিছনে ছুটিল। টপ আগেই ছুটিয়াছিল। জন্তুটা পাইন্‌ বনের ভিতরে গিয়া একটা ডোবার জলে ডুবিয়া গেল, শিকারী তিনজন একেবারে অবাক। টপ তখনই জলে লাফাইয়া পড়িল বটে, কিন্তু ক্যাপিবারা একেবারে তলাইয়া গিয়াছে। হারবার্ট বলিল—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, নিশ্বাস নিতে জন্তুটাকে জলের উপর উঠতেই হবে। বাস্তবিকই তাহাই হইল। কয়েক মিনিট পরে জন্তুটা জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যেই টপ লাফাইয়া একেবারে সেটার ঘাড়ে, এবং টানিতে টানিতে সেটাকে ডাঙ্গায় আনিয়া উপস্থিত। তখন নেব লাঠির এক ঘায়েই জন্তুটাকে শেষ করিয়া দিল। জন্তুটাকে কাঁধে লইয়া সকলে আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে চিম্‌নীর দিকে ফিরিয়া চলিল। তখন বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে, টপের কল্যাণে পথ চিনিতে মুস্কিল হইল না। দেখিতে দেখিতে তাহারা নদীর পারে আসিয়া উপস্থিত। পেন্‌ক্রফ্‌ট পূর্বের মত ভেলা বানাইয়া জলে ভাসাইয়া দিল—ভেলা শিকারীদের লইয়া চলিল চিম্‌নীর দিকে। নদীতীরে ভেলা হইতে নামিয়া গজ পঞ্চাশেক পথ যাইতেই পেন্‌ক্রফ্‌ট হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই চিম্‌নীর দিকে চাহিয়া এক চিৎকার—"নেব, হারবার্ট। দেখ দেখ চিম্‌নীর দিকে চেয়ে দেখ।"

সকলে চাহিয়া দেখিল—চিম্‌নীর পাহাড়ের মধ্যে হইতে ঝলকে ঝলকে ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

খানিক পরেই শিকারী তিনটি চিম্‌নীর মধ্যে জলন্ত আগুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। হার্ডিং ও স্পিলেট্ সেখানে ছিলেন। পেন্‌ক্রফ্‌টের মুখে কথা নাই—হাতে সেই ক্যাপিবারাটি লইয়া, একবার হার্ডিংএর মুখের দিকে একবার স্পিলেটের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

স্পিলেট বলিলেন—"দেখছ কি, আগুন, সত্যি করে আগুন জলছে। এখন শুয়রটা রাঁধ—সকলে খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করি।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—"আগুন জালাল কে?"

স্পিলেট বলিলেন "কে আর জালাবে? স্বয়ং সূর্যদেব এসে জালিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।"

স্পিলেট কথাটা ঠিকই বলিলেন। সূর্যের উত্তাপেই আগুন জলিয়াছে। কিন্তু কে তাহার ব্যবস্থা করিল? হারবার্ট সাইরাস হার্ডিংকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কাছে কি তাহলে আগুন জালাবার কাঁচ (burning glass) ছিল?"

হার্ডিং বলিলেন—"না হারবার্ট, আমার কাছে তা ছিল না, কিন্তু আমি বার্ণিং গ্লাস তৈরি করে নিয়েছি।"

তখন হার্ডিং আগুন জালাইবার কলটি দেখাইলেন, প্রকৃত বার্ণিং গ্লাস নয় বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের এবং স্পিলেটের ঘড়ির কাচ—এই দুইখানা কাচ লইয়া তাহাতে জল পুরিয়াছেন। তারপর আঠার মত কাদা কাচ দুইখানার কিনারায় লাগাইয়া, তাহা একত্র জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহাতেই বার্ণিং গ্লাস প্রস্তুত হইল, এবং তাহার ভিতর দিয়া সূর্যের উত্তাপ শুক্‌না ঘাসের উপর ফেলিবামাত্র, দাউ দাউ করিয়া আগুন জলিয়া উঠিয়াছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট অবাক হইয়া একবার হার্ডিংএর দিকে তাকায়, একবার বার্ণিং গ্লাসটি দেখে। সে বুঝিতে পারিল, হার্ডিং যাদুকর না হইলেও নিতান্ত সাধারণ মানুষ নহেন।

ইহার পর নেব, ও পেন্‌ক্রফ্‌ট শুয়রটাকে ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া আগুনে ভাজিয়া ফেলিল।

সেদিনকার আহার খুব তৃপ্তির সহিতই হইল। ক্যাপিবারার মাংস ছিল চমৎকার। আহারের সময় হার্ডিং কোন কথা বলিলেন না—পরের দিন কি কি করিতে হইবে, সে চিন্তাতেই তিনি মগ্ন ছিলেন। আহারের পর সকলে বেশ আরামে ঘুমাইলেন।

পরদিন, উনত্রিশে মার্চ ঘুম হইতে জাগিয়াই, সকলে দ্বীপের অবস্থা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শুয়রের উদ্বৃত্ত মাংস যথেষ্ট ছিল, তাহাতে চব্বিশ ঘণ্টা বেশ চলিয়া যাইবে। পথে অন্য শিকারও মিলিতে পারে। পেন্‌ক্রফ্‌ট খানিকটা পোড়া নেকড়া সঙ্গে লইল আগুন জালাইবার জন্য, বেলা সাড়ে সাতটার সময় যাত্রীদল বাহির হইল—সকলেরই হাতে মোটা এক একটা গাছের ডাল, এবং সেটাই হইল শিকার এবং আত্মরক্ষার অস্ত্র।

"দ্বাদশ পরিচ্ছেদ"

চিমনী হইতে কিছু দূরেই উঁচু একটা পাহাড়—সেটার উপরে উঠিয়া দ্বীপটির চতুর্দিক খুব ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। পেন্‌ক্রফ্‌টের পরামর্শে বনের মধ্যে দিয়া যাতায়াত স্থির হইল। পাহাড়ের নিকটে যাইবার জন্য এই পথটিই সোজা এবং সহজ। ফিরিবার সময় অন্য পথে ফিরিতে হইবে।

বনের মধ্যে দিয়া যাইবার সময়, টপ্ ছোট খাট পলায়মান জন্তুগুলিকে তাড়া করিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা সময় নষ্ট হয় বলিয়া হার্ডিং টপকে বাধা দিলেন। আগে পাহাড়ে চড়িয়া দ্বীপটি দেখা, পরে অন্য কাজ। ক্রমে বন পার হইয়া সকলে খোলা জায়গায় আসিলে দেখা গেল, সম্মুখে খানিক দূরেই সেই পাহাড়। পাহাড়ের দুইটি চূড়া।

দেখিতে মোচার ডগাটির মত। একটা চূড়ার আগাটি প্রায় আড়াই হাজার ফুট উপরে যেন ছাঁটিয়া দিয়াছে. চুড়াটি এক দিকে ঠিক যেন পোস্তা বাঁধা। এই পোস্তা দুই দিকে পাখির পায়ের আঙ্গুলের মত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যখানে সমান জমি, তাহাতে বড় বড় গাছ, গাছগুলি প্রায় নীচু চুড়াটির সমান উঁচু। পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব দিকে গাছের সংখ্যা কম, এবং পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঝরণার মত দেখা গেল। যাত্রীদল প্রথমে ছোট চুড়াটিতেই উঠিল। সাইরাস হার্ডিং দেখিলেন জমি, পাহাড় পর্বত সমস্তের উপর দিয়াই যেন এক সময়ে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্ন এখনও পরিষ্কার বর্তমান। ভূমিকম্পের তেজে চারিদিকে সমস্ত জমিই খুব উঁচু নীচু।

হারবার্ট পর্বতারোহণের সময় মাটিতে জন্তুর পায়ের দাগ দেখিতে পাইল।

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—এসব জন্তু যদি উঠবার পথে আমাদের বাধা দেয়?

স্পিলেট্ ভারতবর্ষে বাঘ শিকার করিয়াছেন আফ্রিকায় সিংহ মারিয়াছেন। তিনি বলিলেন—পথে জন্তু এসে বাধা দিলে, তার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু বড় জন্তুর পায়ের দাগ যখন দেখা গিয়েছে, তখন আমাদের খুব সাবধান হয়ে চলা উচিত। বেলা বারটার সময় যাত্রীদল একটা ঝরণার ধারে, গাছের নীচে বসিয়া বিশ্রাম ও কিছু জলযোগ করিল। ততক্ষণে তাহারা চূড়ার প্রায় অর্দ্ধেক পথ উঠিয়াছে। এখান হইতে অনেক দূর পর্যন্ত সমুদ্র দেখা যায়। দক্ষিণ দিকে পর্বতের একটা উঁচু স্থানের জন্য কিছু দেখা যায় না। বাঁ দিকে, উত্তর ধারে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। বিশ্রাম ও আহারের পর, বেলা একটার সময়, সকলে আবার পর্বতে উঠিতে লাগিল। এবারে দক্ষিণ-পশ্চিমে পথ, ক্রমে তাহারা একটা ঘন ঝোপের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। মাঝে মাঝে মোরগের মত ফেজান্ট জাতীয় ট্রেগোপান্ পাখী দেখা যাইতে লাগিল। গিডিয়ন স্পিলেট আশ্চর্য কৌশলে একখণ্ড পাথর ছুড়িয়া একটা ট্রেগোপান্ মারিলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট্ শিকার পাইয়া ভারি খুসী হইল। ক্রমে ঝোপ পার হইয়া, যাত্রীদল একে অন্যের কাঁধে ভর দিয়া, প্রায় একশত ফুট খাড়া পথ উঠিলে পর, সমান জমি পাওয়া গেল। এখানে জমিতে অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন বেশ আছে। এখানে শ্যামর (chamois) ও ছাগল জাতীয় জন্তুর পায়ের দাগ অনেক দেখা গেল। তারপর হঠাৎ দেখা গেল, প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে ছয়টা বড় রকমের জন্তু দাঁড়াইয়া আছে। মাথায় বড় বড় শিং, পিছনের দিকে বাঁকান—গায়ে ভেড়ার মত লোম। জন্তুগুলি দেখিয়াই হারবার্ট বলিল—"এগুলো যে মুসমন্।" জন্তুগুলি বড় বড় কাল পাথরের আড়ালে দাঁড়াইয়া, অবাক হইয়া যাত্রীদিগকে দেখিতে লাগিল—মনে হইল যেন, পূর্বে তাহারা মানুষ কখনও দেখে নাই। হঠাৎ কেন জানি ভয় পাইল আর ঊর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট। বিকাল চারিটার সময় গাছের সীমা শেষ হইল। আর পাঁচশত ফুট উঠিতে পারিলেই, প্রথম চূড়ার নীচে সমতল জমিতে পৌঁছান যাইবে এবং সেখানে যাত্রীদল রাত্রি কাটাইবার স্থির করিল। উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা পথ ঘুরিয়া বহু কষ্টের পর সকলে সমান জমিতে উপস্থিত হইল।

হারবার্ট নেব্ পেন্‌ক্রফ্‌ট লাগিয়া গেল আগুন জ্বালিবার কাজে। রাত্রিতে ঠাণ্ডা হইবে ভীষণ এবং সেইজন্যই আগুনের দরকার রান্নার জন্য নহে। আগুন জ্বলিল, অবশিষ্ট শুকরের মাংস দ্বারাই আহার হইল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার মধ্যে আহারাদি সব শেষ। আহারের পর স্পিলেট বসিলেন তাহার নোট বুক লইয়া, দিনের ঘটনা লিখিতে। নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট শয়নের ব্যবস্থা করিতে লাগিল হার্ডিং হারবার্টকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন, পর্বতের উঁচু চূড়াটির অবস্থা দেখিতে।

সুন্দর পরিষ্কার রাত্রি, অন্ধকারও বেশী নয়। প্রায় কুড়ি মিনিট চলিয়া হার্ডিং দাড়াইলেন। এখানে চুড়াদুটির ঢালু গা মিলিয়া এক হইয়াছে, চূড়ার গা ঘুরিয়া আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যাহা হউক উঠিবার

একটা উপায় হইল। ঠিক তাঁহাদের সম্মুখেই দেখিলেন, গভীর একটা গর্ত রহিয়াছে, এটা আগ্নেয়গিরির মুখ—ভারি অসমান, উঁচু নীচু। অতীত কালে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল, তাহার দারুণ গলিত পাথর প্রভৃতি মাটিতে পড়িয়া বেশ সিঁড়ির মত হইয়াছে—উঁচু চূড়াটির উপরে উঠা মুস্কিল হইবে না। এই সমস্ত দেখিয়া হার্ডিং আর বিলম্ব করিলেন না; হারবার্টের সহিত অন্ধকারে গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। তখনও প্রায় হাজার ফুট উঠিতে হইবে, হার্ডিং স্থির করিলেন বাধা না পাওয়া পর্যন্ত গহ্বরের ভিতরের চড়াই দিয়া উঠিতে থাকিবেন। সৌভাগ্য-ক্রমে চড়াইয়ের পথ ক্রেটারের (আগ্নেয়গিরির মুখ) ভিতরেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরের দিকে উঠিয়াছিল, তাহাতে চড়িবার পক্ষে সুবিধাই হইল।

আগ্নেয় পর্বত এখন সম্পূর্ণ রূপে নিবিয়া গিয়াছে। পর্বতের গা দিয়া ধোঁয়া বাহির হয় না, গহ্বরের ভিতরে তাকাইলে আগুন দেখা যায় না; সাড়া নাই, শব্দ নাই, কম্পন নাই—পর্বত শুধু যে নিদ্রিত তাহা নহে, একেবারে মরিয়াই গিয়াছে। হার্ডিং হারবার্টকে লইয়া ক্রেটারের ভিতরের দেওয়াল বাহিয়া ক্রমে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—আকাশের গোলাকৃতি অংশ দেখা যাইতেছে। সাইরাস হার্ডিং ও হারবার্ট যখন উঁচু চূড়ার ডগায় পা দিলেন তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। গভীর অন্ধকার, দুই মাইল পরিমাণ স্থানের বেশী চক্ষে দেখা যায় না।

সমুদ্র কি তবে দ্বীপটিকে ঘিরিয়া আছে? না ইহা কোন মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত? এখনও সে কথার মীমাংসা হইবার নয়। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, সব দিকেই সমুদ্র যেন আকাশের সঙ্গে গিয়া মিলিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল যেন আকাশের একপাশে একটি আলো দেখা গেল। এই আলোর ছায়া যেন জলের উপরে পড়িয়া কাঁপিতেছে। এটি চাঁদের আলো, সরু ধনুর মত চাঁদটি, একটু পরেই ডুবিয়া যাইবে।

হার্ডিং হারবার্টের হাতখানি ধরিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"হারবার্ট বুঝতে পেরেছি—আমাদের এটা দ্বীপ।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ ঢেউএর নীচে অদৃশ্য হইল।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে হার্ডিং হারবার্টের সহিত চিম্‌নীতে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন ৩০এ মার্চ প্রাতে সাতটার সময়, তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া হার্ডিং, স্পিলেট, হারবার্ট, পেনক্রফ্‌ট ও নেব্ সকলে আবার চলিলেন—সেই মৃত আগ্নেয় পর্বতের চূড়ায় উঠিয়া, দিনের আলোকে খুব ভাল করিয়া চারিদিক্ দেখিতে হইবে। হার্ডিং আগের দিন বিকালে সে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই চলিলেন। চূড়ায় পৌছিবামাত্র, চারিদিকে চাহিয়া সকলে সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিলেন—সমুদ্র, সমুদ্র। চারিদিকেই সমুদ্র।

সাইরাস্ হার্ডিং হয়ত ভাবিয়াছিলেন, চূড়ায় উঠিয়া দিনের আলোকে দূরে তীর দেখিতে পাইবেন—পূর্ব দিনে অন্ধকার ছিল বলিয়া তাহা দেখা যায় নাই। কিন্তু চারিদিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কিছুই দেখা গেলনা—সমুদ্র যেন সব দিকেই আকাশের প্রান্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তীর কিংবা কোন জাহাজের পাল—কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না, অসীম গোলাকার জলরাশির ঠিক মধ্যখানে তাঁহাদিগের দ্বীপটি অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে যেন ভীষণ কোন জন্তু—যেন একটি 'তিমিঙ্গিল' নিদ্রা যাইতেছে। বাস্তবিক দ্বীপটা দেখিতে অনেকটা তিমিমাছের আকৃতির মতই ছিল। গিডিয়ন্ স্পিলেট, তখনই ইহার একটা নক্‌সা আঁকিয়া

ফেলিলেন। বোধ হইল দ্বীপটির পরিধি এক শত মাইলেরও বেশী হইবে। দ্বীপের পূর্বদিকের অংশটি, যেখানে যাত্রীদল বেলুন হইতে পড়িয়াছিল—সেই স্থানটি একটা উপসাগরের মত। উহার এক পাশ চোঁখা অন্তরীপের মত হইয়া গিয়া সমুদ্রে শেষ হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব দিকে আর দুইটি অন্তরীপ এবং সেখানেই উপসাগরটির শেষ।

উত্তর-পূর্ব তীর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম তীরটা গোলাকার। এই তীরের প্রায় মধ্যখানে সেই মৃত আগ্নেয় পর্বতটি। দ্বীপের সকলের চাইতে সরু স্থানটা, অর্থাৎ চিম্‌নী এবং পশ্চিম তীরের নদী পর্যন্ত স্থানটা দশ মাইল চওড়া। দ্বীপের লম্বালম্বি দূরত্ব ত্রিশ মাইলের কম হইবে না। দ্বীপের মধ্যের জায়গাটায়—পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিকটা জুড়িয়া সমুদ্রতীর পর্যন্ত প্রকাণ্ড বন। উত্তর. ভাগটা শুষ্ক এবং বালিপূর্ণ। যাত্রীর দল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে আগ্নেয় পর্বত এবং পূর্ব তীরের মধ্যখানে একটা হ্রদ রহিয়াছে—তাহার কিনারায় অগণ্য সবুজ গাছপালা। হ্রদটি দেখিয়া মনে হইল,—ইহা সমুদ্র হইতে একটু উঁচুতে অবস্থিত। পেন্‌ক্রফ্‌ট জিজ্ঞাসা করিল—"হ্রদের জল কি সুস্বাদু হবে?"

হার্ডিং বলিলেন—"নিশ্চয়। দেখছনা—হ্রদের জল পর্বতের ঝরণা থেকে নেমে এসেছে।"

হারবার্ট বলিল "এই দেখুন, একটা ছোট্ট নদী যেন হ্রদে এসে পড়েছে।"

হার্ডিং বলিলেন—"এই নদীর জল দিয়াই যখন হ্রদের জল, তখন খুব সম্ভবতঃ অন্য দিকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়বার একটা পথও আছে। ফিরবার পথে এটা দেখে যেতে হবে।"

এই বাঁকাচোরা ঝরণা এবং নদীর জল দিয়াই দ্বীপটি উর্বর, হয়ত বা গভীর বনের মধ্যে অন্য কোন জলাশয়ও আছে। বনটিও বড় কম নয়। দ্বীপের দুই তৃতীয়াংশ স্থান জুড়িয়া বন। উত্তর দিক দেখিয়া সেখানে নদী ঝরণার অস্তিত্ব আছে বলিয়া বুঝা গেল না। মধ্যে মধ্যে জলাভূমি আছে বটে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর্বতের চুড়ায় থাকিয়া, যাত্রীদল চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। এখন একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তরের উপর এই পরিত্যক্ত যাত্রীদলের ভবিষ্যৎ ভালমন্দ নির্ভর করে। এই দ্বীপে কি মানুষের বাস আছে? এই প্রশ্নটি গিডিয়ন স্পিলেট্ করিলেন। চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া যাহা মনে হইল তাহাতে এই প্রশ্নের উত্তর "না"—এখানে জন-মানবের বসতি নাই। ঘর বাড়ী গ্রাম ধোঁয়া কিছুই দেখা গেল না। যাত্রীদল যেখান হইতে দেখিয়াছেন, সেখান হইতে দ্বীপের শেষ সীমা ত্রিশ মাইলের উপর, এত দূরে লোকের বসতি থাকিলে, তাহা পেন্‌ক্রফ্‌টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও দেখিতে পাইবে না।

ভবিষ্যতে আরও অনুসন্ধান করা যাইবে। এখন মানিয়া লওয়া গেল—দ্বীপটি জনমানবশূন্য। তাহা হইলেও নিকটবর্তী অন্য কোন দ্বীপের লোক এখানে আসিতে পারে ত? এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া কঠিন—চারিদিকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ত কোন দ্বীপ দেখিতে পাওয়া গেল না। যাহা হউক পঞ্চাশ মাইলের পরেও দ্বীপ থাকিতে পারে ত? সেখানকার লোকের পক্ষে নৌকা কিংবা ক্যানু (Canoe) চড়িয়া এই দ্বীপে আসা মুস্কিল হইবে না। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

দ্বীপের অনুসন্ধান শেষ হইল। ফিরিবার পূর্বে হার্ডিং ধীর, গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বন্ধুগণ, এই দ্বীপে আমাদের অনেক কাল থাকতে হবে। হঠাৎ কোন জাহাজ এসে উপস্থিত হওয়াও বিচিত্র নয়। হঠাৎ বলছি এইজন্য, যে, এটা অতি নগণ্য দ্বীপ—জাহাজ চলাচলের পথে মোটেই নয়।"

স্পিলেট্ বলিলেন—"হার্ডিং, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। যাহোক আমরা সকলেই মানুষ। তোমার উপরে ভরসা খুবই আছে। আমরা এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে বাস করব।" স্পিলেটের কথায় সকলেই খুব উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল।

ফিরিবার সময় হার্ডিং বলিলেন—"চল এক কাজ করি—দ্বীপের পাহাড় পর্বত, নদী নালা, উপসাগর-অন্তরীপ সকলগুলিরই এক-একটা নাম দেওয়া যাক।"

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—"আমাদের প্রথম আড্ডার নাম দিয়েছি আমি 'চিম্‌নী'—কারো আপত্তি না থাকলে সেটার চিম্‌নীই নাম থাক্‌।"

হারবার্ট বলিল—"ক্যাপ্‌টেন হার্ডিং, মিস্টার স্পিলেট, নেব্‌, পেনক্রফ্‌ট সকলের নামেই এক একটির নামকরণ করি না কেন?" নেব্‌ অবাক হইয়া বলিল—"আমার নামে নাম হবে?" বলিয়াই তাহার ধপ্‌ধপে সাদা দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। যাহা হউক সকলেই আমেরিকার লোক, তাই শেষে হার্ডিং-এর প্রস্তাব মত, আমেরিকার প্রসিদ্ধ নামসকল লইয়াই দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করা হইল। বড় দুটি উপসাগরের একটির নাম হইল "ইউনিয়ন্‌ বে" আর একটির নাম হইল "ওয়াশিংটন্‌ বে" আর পর্বতটির নাম রাখা হইল 'ফ্র্যাঙ্কলিন্‌ পর্বত'। দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপদ্বীপটি দেখিতে অনেকটা সাপের লেজের মত, নাম হইল 'সার্পেন্টাইন পেনিনসুলা'। দ্বীপের অন্য প্রান্তের উপসাগর হইল 'শার্ক গাল্‌ফ্‌' কারণ সেটি দেখিতে যেন হাঙ্গরের দুটি ঠোঁট হাঁ করিয়া আছে। এই শার্ক গাল্‌ফের দুটি অন্তরীপ হইল "নর্থ ম্যাণ্ডিবল্‌" আর "সাউথ ম্যাণ্ডিবল্‌" অন্তরীপ। বড় লেকটির নাম হইল "লেক গ্রাণ্ট্‌"।

চিম্‌নীর উপরে, গ্রেনাইট পাহাড়ের খাড়া পাহাড়গুলির চূড়ায় যে সমতল স্থানটি ছিল, তাহার নাম হইল "প্রস্‌পেক্ট হাইট", এখান হইতে সমস্ত উপসাগর বেশ ভাল রকম দেখা যায়। তারপর, যে নদীর জল যাত্রীদল পান করে এবং যাহার নিকটে তাহারা বেলুন হইতে পড়িয়াছিল, তাহার নাম রাখিল "মার্সি নদী", দ্বীপের ক্ষুদ্র যে অংশটিতে যাত্রীদল বেলুন হইতে পড়িয়াছিল—তাহার নাম হইল "সেফ্‌টি আইল্যাণ্ড"। সকলের শেষে দ্বীপটির নাম হইল "লিঙ্কন আইল্যাণ্ড"। ক্রমশঃ

লঙ্কা-দহন

লীলা মজুমদার

চুম্বক—দলবল নিয়ে সমুদ্রতীরে পৌঁছে রামলক্ষ্মণ সীতার খোঁজ নিতে হনুমানকে লঙ্কায় পাঠালেন। নানান বিপদের মধ্যে সাগর লঙ্ঘন করে, অনেক কষ্টে লঙ্কা নগরে ঢুকে, হনুমান কোথাও সীতাকে খুঁজে পান না। অবশেষে অশোক বনে দীনহীন অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেলেন ও রামের আংটি দেখিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে, সব কথা শুনলেন। স্থির হল রামলক্ষ্মণ এসে সীতাকে উদ্ধার করবেন। সীতার দুঃখে, রাগে ক্ষোভে হনুমান অশোক বনের গাছ উপড়ে, বড় বড় প্রাসাদ ভেঙ্গে, হাজার হাজার রাক্ষস মেরে, রথ গুঁড়িয়ে একাকার করলেন। শেষ পর্যন্ত রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে বেঁধে তাকে রাজসভায় পাঠালেন। তারপর ঃ—

চার

(রাবণ সিংহাসনে পা গুটিয়ে বসে ব্যস্ত হয়ে হাঁটু নাচাচ্ছেন। মন্ত্রীরা থেকে থেকে ভয়ে ভয়ে সিংহাসনের তলায় উঁকি মারছেন। সভাসদ্ ও জনতা ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করছে, দরজার দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু বাইরে গিয়ে দেখবার সাহস হচ্ছে না।)

(নেপথ্যে, সুর করে)—মারো জোয়ান, হেঁইয়ো!
আউর ভি থোড়া, হেঁইয়ো!
এমনি ভারি, এমনি মোটা,
আর কোথা কেউ নেই-ও!
হেঁইও মারা বল্!

(গান)—উরি বাবারি!
ব্যাটা বড় ভারি!
খায় শুধু গুপ্‌গাপ্,
ডাক ছাড়ে হুপ্‌হাপ্।
অমন ভালো নগর চূড়ো
পিটিয়ে করলে গুঁড়ো গুঁড়ো!
ভালোমানুষ সাজে কিন্তু
মনটা বড় খল!
আহা, অশোক বনের দশা দেখে
চক্ষে ঝরে জল!
হেঁইয়ো মারা বল্।

(আষ্টেপৃষ্ঠে দড়িদড়া দিয়ে হনুকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আট দশজন রাক্ষসের প্রবেশ ও ধপাস করে দোর গোড়াতেই হনুকে ফেলন।)

(রাক্ষসদের গান)—বলি ও রাবণ-রাজা,
এ কেমন দিলে সাজা!

কাঁধে চেপে ব্যাটাচ্ছেলে
গাচ্ছে রামনাম !
ভারের চোটে প্রাণটা বেরোয়
ঝরছে মোদের ঘাম !
ভোগের বেলা—

হনুমান (খোঁচা দিয়ে)—বলি, ও অলম্বুসের দল, এটা কি গান গাইবার সময় হল ? এইখেনেতে নামালি যে বড় ? ওঁর কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে ফেল্, নইলে আমাকে উনি ভালো করে অবলোকন করবেন কি করে ? এরি মধ্যে হাঁপিয়ে গেলি নাকি ? কি খাস্ তোরা ? দুব্বো ঘাস বুঝি ?

১ম রাক্ষস্—আর পারিনে বাপু। অত যে বক্তিমে করছিস্, নিজে হেঁটে এইটুকু যেতে পারিস্ নে ?

হনু—ই-ই-স্ ! তোর কাজ আমি করব কেন রে, ইডিয়ট্ ? কেন, তুই মাস কাবারে মাইনে পাস্ না ? তাছাড়া আমি বন্দী দশায় রাজ সমীপে আনীত হচ্ছি, অত হাঁটা লাফা আমার শোভা পায় না। নে নে, তোল দিকি ! আচ্ছা, আমিই না হয় নিজের থেকে তোদের ঘাড়ে চাপছি। এই নে, ধর !

(ঘাড়ে ঠ্যাং স্থাপন)

২য় রাক্ষস্—উ-হু-হু-হু, ওরে বাবারে, মরে গেলাম রে, কাঁধটা গেল গো ! ও রাজা, বসে বসে দেখছ কি ? তোমার সামনেই যে আমাকে চ্যাপ্টা করে ফেলল !

রাবণ—চোপ্ ! কি, হচ্ছেটা কি ? এই কি তবে সেই দুর্বৃত্ত দুরাচার যে আমার সোনার অশোকবন লণ্ডভণ্ড করে এক কাণ্ড করেছে ? ওমা ! এতো একটা সাধারণ কপি দেখছি—

জনতার মধ্য থেকে—কি ? কি বলছে রাবণ, ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না ; অমন বিড়বিড় কচ্ছে কেন ? গলায় জোর পায় না নাকি ?

রাবণ—(চিৎকার করে) এটাকে এনেছিস্ কেন ? একে তো একটা সাধারণ কপির মতো দেখাচ্ছে !

জনতার মধ্যে—(১ম কণ্ঠ) কবি ? এ্যাঁ ? বাঁদরটাকে কবি বলছে কেন ?

(২য় কণ্ঠ) কবিদের মতো মাথায় লম্বা লম্বা লোম বলে বোধ হয়।

মন্ত্রী—আঃ, তোরা চুপ করবি কি না ? কবি নয়, কপি।

১ম কণ্ঠ—কপি ? কপি কি ভাই ?

২য় কণ্ঠ—কপি জানিস্ না ? বাঁধা কপি, ফুল কপি, ওল্ কপি—ওকে খেয়ে ফেলা হবে কি না, তাই কপি বলা হচ্ছে।

১ম কণ্ঠ—ও-ও ! আমি কপি খেতে বড্ড ভালোবাসি।

রাবণ—চোপ্ ! তোদের দিনরাত খালি খাই আর খাই, লজ্জাও করে না।

মন্ত্রী—আহা, মহারাজ, ওদের অমন বলতে নেই, ওরা হোল গিয়ে আপনার প্রজা, যুদ্ধের সময়

প্রাণ দেবে, ওদের চটাতে হয় না।—শোন বাছা, কৃষ্ণপক্ষে কপি খেতে নেই, যাও, এখন যে যার জায়গায় বস দিকি নি।

রাবণ—আমরা তো ছোটবেলায় ধামাচাপা দিয়ে বাঁদর ধরতাম, তা এটাকে ধরতে ব্রহ্মাস্ত্র লাগল কেন! ইকি! বাঁদরটা আমার দিকে অমন পিটপিট করে তাকাচ্ছেই বা কেন?

হনু— অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতি!
ওহে রাবণ, পবন নন্দন কচ্ছে তোমার স্তুতি।
যেমন বিরাট বাহু তোমার,
তেমনি বুকের ছাতি,
এত রূপের সঙ্গে কেন
এতটা বজ্জাতি?

রাবণ—কে এ? এতো সাধারণ বাঁদর নয়। একি তবে শিবের অনুচর নন্দী? নাকি অসুরদের রাজা বাণ? একটু দেখতো, মন্ত্রী।

নিকুম্ভ—হ্যাঁরে কে পাঠিয়েছে তোকে? কুবের? যম? ইন্দ্র? বরুণ? সত্যি কথা বল্ দিকি নি, তা হলে তোর বাঁধন খুলে দেবে। মিথ্যা বললে কিন্তু পিটিয়ে পাপোষ বানাব।

হনু—বাঁধন আবার খুলবে কি গো? সে তো এমনিতেই খুলে গেছে। অন্য কিছু দেবে তো দাও।

রাবণ—এ্যাঁ! ব্রহ্মাস্ত্র খুলে গেছে মানে? সে আবার খোলে নাকি?

নিকুম্ভ—এ্যাঁ! সত্যিই তো দেখছি! এটা কি করে সম্ভব হল, তাতো বুঝলাম না।

হনু—মহারাজ, এ গবেটটাকে পেন্‌সিল দিয়ে দিন। ব্রহ্মাস্ত্রের ওপর শনের দড়ি বাঁধলে ব্রহ্মাস্ত্র খুলে যায়, আহম্মুকটা তাও জানে না। ওরে ব্যাটা, নিদেন মাছের মুড়ো খা, বুদ্ধি বাড়বে।

সভাসদরা—(বেঞ্চিতে উঠে দাঁড়িয়ে) এ্যাঁ! তাই নাকি? বাঁধন খোলা নাকি? যদি কামড়ায়? ও বাবা! তবে আমরা এখন বাড়ি যাই, আমাদের খাবার সময় হয়ে গেছে, স্ত্রী ছেলে-পুলেরা অপেক্ষা করছে!

(সকলের পাশের দরজার দিকে অগ্রসর)

রাবণ—চোপ! যে যার আসনে বসগে। (হনুকে) বাছা, তুমি কি চাও?

হনু—চাই অনেক কিছুই, তবে সে আর দিচ্ছে কে? আপাততঃ মা জানকীকে ছেড়ে দিলেই খুসি থাকব।

রাবণ—(চিৎকার করে) বাঁদরটার তো বড় বেশি আস্পর্ধা দেখছি। বন্দী অবস্থাতেও চোখ রাঙাচ্ছে।

হনু—ওমা, বলে কি! চোখ রাঙালাম কোথায়? আমার চোখটাই যে লালমতন। সত্যি রাঙালে তোমার দাঁত কপাটি লেগে যেত না? তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, সীতামাকে

ছেড়ে দাও। নইলে তুমি, তোমার রাণীরা, তোমার ছেলেপুলে, ভাইবোন, পিসেমশাইরা, কালনেমি-মামা, সভাসদ্, অনুচর, সহচর, বন্ধু, বেরাদার, লঙ্কাসহর সব সুদ্ধ ধুলোপড়া হয়ে যাবে, কিচ্ছু বাকি থাকবে না—

সভাসদ্‌রা—(একবাক্যে)—না, না, না, না, আমরা এ বিষয়ে কিচ্ছু জানি না ; ঠাকুরমশাই বারণ করে দিয়েছেন ; তাছাড়া আমরা কেউ সেখানে ছিলাম না।

রাবণ—চোপ, কাপুরুষের দল। দ্যাখ, বাঁদর তোমার অনেক বেয়াদবি সহ্য করেছি, আর নয়। বুঝতে পারছি তুমি রামচন্দ্রের অনুচর, নইলে ইঁদুর বাঁদর নিয়ে আর কার লঙ্কা আক্রমণ করবার আস্পর্ধা হবে ? তোমার উচিত সাজার ব্যবস্থা করছি। মন্ত্রী, একে বধ করা হোক।

নিকুম্ভ—সহজে মরবে বলে তো মনে হয় না স্যার, যা ঠ্যাঁটা ! তাছাড়া—।

রাবণ—থামলে কেন মন্ত্রী ? তাছাড়া কি ?

জনতার মধ্যে থেকে—ও বলতে ভয় পাচ্ছে, রাজা। পাছে ভালো কথা শুনতে পেয়ে তুমি রেগে যাও।

রাবণ—নির্ভয়ে বল মন্ত্রী। তাছাড়া কি ?

হনু—কি আবার তাছাড়া ! ও বলতে চায় যে দূতকে মারতে নেই, স্যার। তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা যেতে পারে। তাকে লাঠি পেটা করা যেতে পারে। ঠ্যাং ভাঙ্গা, কান ছেঁড়া, মাথা নিচের দিকে করে গাছ থেকে ঝুলোনো, এ সবই চলতে পারে, কিন্তু মারা যায় না।

রাবণ—কেন যায় না ?

নিকুম্ভ—কি যেন একটা হয়, ঠিক মনে পড়ছে না, মহারাজ, তবে ভারি খারাপ কিছু।

রাবণ—বেশ, তোমাদের যখন সকলেরই তাই ইচ্ছা, তাই হোক।

হনু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো। নইলে আমাকে বধ কল্লে, রামলক্ষ্মণের কাছে কে গিয়ে তোমাদের সাহসের কথা বলবে শুনি ? ঐ সাগর লাফানো তোমাদের কম্ম নয়। তাছাড়া আমি গিয়ে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে না বললে, তাঁরা না আবার ভেবে বসেন যে আমার কথা শুনে তোমাদের মুখগুলো দিস্ কাইণ্ড অফ স্মল্ হয়ে গেছে, কিছু বলতেও ভয় পাচ্ছ ! আর সব চেয়ে বড় কথা, বধ কল্লে যদি শেষটা সত্যি সত্যি মরে যাই, তা হলে কি হবে ?

রাবণ—চো—প্। নাঃ, আর তো সহ্য করা যায় না। এ হতভাগাটার ল্যাজে আচ্ছা করে ন্যাকড়া জড়িয়ে—

১ম রাক্ষস—অত ন্যাকড়া কোথায় পাব, স্যার ? দেখছেন না চোখের সামনে বাঁদরটা কেমন হু—হু শব্দে বেড়ে যাচ্ছে !

রাবণ—কোথায় পাব আবার কি ? কেন, তোদের পরণে কি কাপড় জামা নেই ? তার থেকে ছিঁড়ে নিবি। তার ওপর বেশ করে তেল ঢেলে—যে যার বাড়ি থেকে তেল আনবি—হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন, বেশ করে তেল ঢেলে, আগুন লাগিয়ে, সারা সহরময় ঘুরিয়ে আনবি ব্যাটাকে।

সবাই দেখুক রাবণের সঙ্গে যারা বে-আদবি করে, তাদের কি দশাটা হয়। যাও, একে তুলে নিয়ে যাও।

হনু—দেখো বাবু, ভালো করে তুলো কিন্তু। আমার আবার বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুলটা কন্‌কন্‌ করে, তেঁতুল খেলে বাড়ে, ওটিতে যেন লাগিয়ে দিও না। নাও, তোল এবার, ওয়ান-টু-থ্রি—

জনতার মধ্যে—হি-হি-হি এ বাঁদরটা তো বেড়ে মজার রে! চ', চ', সঙ্গে যাই।

হনু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবি বইকি, সহরের কোথায় কি আছে, ভালো করে দেখিয়ে দিবি। কাল রাতে এমনি অন্ধকার ছিল যে কিচ্ছু মালুম দিচ্ছিল না। চল, যাওয়া যাক, ন্যাকড়া জড়ানো, আগুন লাগানো, সবই বোধ হয় আমাকেই শিখিয়ে দিতে হবে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। দুর্গা দুর্গা।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—অশোক বনের নিকটস্থ রাজপথ। ব্যস্ত হয়ে চেড়িদের ঘোরাঘুরি। লঙ্কাদেবীসহ একদল রাক্ষসের হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ।

১ম চেড়ি—বল না গো কি সর্ব্বনাশটা হচ্ছে? আকাশ লালে লাল। ফটফট হুড়মুড় শব্দ! একি প্রলয় শুরু হল নাকি গা?

খুদেরাক্ষস—ওমা ও কি কথা! প্রলয়দা নয় মোটেই; ও আমার বন্ধু হল্লুমান মজা কচ্ছে!

২য় চেড়ি—তা বাপু, তোমার বন্ধুর মজা করবার রকমটি তো বেশ! কিন্তু হচ্ছেটা কি তাই শুনি।

খুদে—ওমা, তাও জান না বুঝি। হল্লুমান বললে কিনা আমাকে বধ করে কাজ নেই, শেষটা যদি সত্যি মরে যাই! তাই রাবণ রাজা বললেন—বেশ, ব্যাটার ল্যাজে ন্যাকড়া জড়িয়ে, তেল ঢেলে, আগুন লাগিয়ে, সহরে বেড়াতে নিয়ে যাও!

৩য় চেড়ি—ওমা কি কাণ্ড! তাপ্পর কি হল?

১ম রাক্ষস—হল কি জান, যত ন্যাকড়া জড়ায় হল্লুমান ততই বড় হয়। তাই দেখে এই লঙ্কাদেবীর সে কি রাগ! বললেন, থাক্, আর জড়িয়ে কাজ নেই, ঐ ওতেই যবে। শেষটা আমার মন্দিরের প্রদীপে সলতে দেবার জন্যে এক চিলতে ত্যানাও যে বাকি থাকবে না। এবার তেল ঢেলে আগুন লাগাও।

১ম চেড়ি—ব্যাটা তখন খুব জব্দ হল নিশ্চয়!

২য় রাক্ষস—জব্দ না হাতি! চোখ বুজে বলে কি না, আঃ কি আরাম! ঠিক যেন চন্দন মাখাচ্ছে। একটুও গা পুড়ছে না দেখেছিস্?

খুদে—হ্যাঁ, খালি ন্যাকড়াগুলো পুড়ছে, তার কি গন্ধ রে বাবা! আমাকে দেখে হল্লুমান বললে—ল্যাজ পুড়বে কি করে, আমি যে পবনের পুত্র।

(সীতার প্রবেশ)

সীতা—কি হয়েছে ? ও কিসের শব্দ ? আকাশ লাল কেন ? আমার বড় ভয় কচ্ছে।

২য় চেড়ি—হবে আবার কি, ঠাকরুণ ? তোমার পেয়ারের তাঁবামুখো বাঁদরটা এদিকে পুড়ে শিক্‌-কাবাব ! তার বেশি কিছু হয় নি।

সীতা—হা ভগবান ! এও লিখেছিলে আমার কপালে !

(রোদন)

খুদে—ওমা ছিঃ ! বুড়ো ধাড়ি মেয়ে আবার কাঁদছে ! তাছাড়া মোটেই হনুমান পোড়ে নি। সে বললে, দেখেছ, রাস্কেলগুলোর আস্পদ্দা দেখেছ, আমার ল্যাজে দেশলাই দেওয়া হচ্ছে ! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি ! এই না বলে অতবড় শরীরটাকে গুটিয়ে এতটুকু করে ফেলল। ব্যস্‌। সব দড়ি ফস্‌ ফস্‌ করে খসে গেল।

২য় চেড়ি—তারপর ?

লঙ্কাদেবী—তাপ্পর ? হা, সব্বনাশ, তাপ্পর ব্যাটাচ্ছেলে লম্ব পাহাড়ের সমান উঁচু এক লাফে পগার পার ! ল্যাজে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে, যেখানেই যায় বাড়িঘর পুড়ে ছাই। সঙ্গে সঙ্গে সে কি হাওয়া, হু হু করে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আগুন লেগে যায় ! দেখতে দেখতে আমার সোনার লঙ্কা পুড়ে কাঠকয়লা ! এখন আমার ভোগের ব্যবস্থাটা কি হবে তাই বল্‌ তোরা ! ক্ষীর, সর, মোষের মাংসের কালিয়া—হায়, হায় !

সীতা—আর হনুমান ? তার কি হল ?

খুদে—(হেসে)—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, তাকে ধরতে পাল্লে তো হবে ! যে কাছে যায় তার মাথা ফাটিয়ে চীনেপটকা ! তাপ্পর দিব্যি সুন্দর সমুদ্রের জলে ল্যাজ ডুবিয়ে আগুন নিবিয়ে আমাকে বললে—উঃ ! তোদের দেশে বড্ড ধোঁয়া রে, দে আমার মুখে একটা বড় দেখে পান ফেলে দিকিনি ! যেই না পানটা দিয়েছি, অমনি হু—প্‌ করে পগার পার !

অজামুখী চেড়ি—এঁ্যা ! পান কোথা পেলি, বল্‌ হতভাগা ! আমার কৌটো থেকে নিয়ে থাকিস্‌ যদি, তা হলে তোর কানছটোর আর কিছু রাখব না ! (কান পাকড়ানো)

খুদে—উ—হুঁ—হু, ছাড় ছাড় মা, বড্ড লাগে ! তোমার পান মোটেই নিই নি, ও তো বিশ্রী তেতো ! রাবণের সভা থেকে যেই না সব মজা দেখতে বেরিয়ে এসেছে, আমিও ইজের ভর্তি করে পান নিয়ে পালিয়েছি !—আরে, ঐ যে হনুমান আসছে ! এ দিকে, বন্ধু, এই যে এদিকে !—ই কি ! সবাই পালায় কেন ?

হনুমানের প্রবেশ।

(সীতা ও খুদে ছাড়া, সকলের পলায়ন)

হনু—(সীতার পায়ে পড়ে)—উঃ ! তুমি তাহলে পুড়ে খাক হও নি, মা সীতে ! যা ভয় হয়েছিল, ভাবলুম রাগের মাথায় তোমাকে শুদ্ধ বেগুনপোড়া বানিয়ে ফেলিনি তো ! তাপ্পর দেখি

অশোকবন যেমন সবুজ তেমনি সবুজ! বাবা, ধড়ে প্রাণ এল! এবার তবে বিদায় দাও, মা, শ্রীরামকে গিয়ে খবর দিই।

সীতা—তুদিন জিরিয়ে গেলে হত না, বাছা?

খুদে—জিরুবে কোথায় শুনি? বাড়িঘরের কিছু রেখেছে কি যে জিরুবে! না, বাপু, তুমি এবার কেটে পড়। আর দেখ, আবার যখন আসবে, আমার জন্যে বেশি করে বাঁতুরে বিস্কুট এনো, কেমন?

হনু—তথাস্তু! এবার তবে বিদেয় হই। (সীতাকে প্রণাম করে প্রস্থান)

সীতা—তুগ্‌গা! তুগ্‌গা!

(বাঁদরদলের প্রবেশ ও গানসহ নৃত্য।)

১ম দল রামায়ণের বাহাতুর রামচন্দ্র নয়,
বল বাহু তুলে, বদন খুলে,
হনুমানের জয়।

২য় দল অবাক হল রাবণ রাজা,
লঙ্কা পুড়ে আলু ভাজা,
হনুমানে দিলে সাজা,
উল্টো ফল হয়!

১ম দল কর হনু গুণ গান!
উট কপালের তুপাশেতে
হের বাঁধাকপি কান!

২য় দল রামায়ণ কথা সোটা
লেমনেড্‌ সমান!
রামায়ণের বাহাতুর ইত্যাদি।

সমাপ্ত
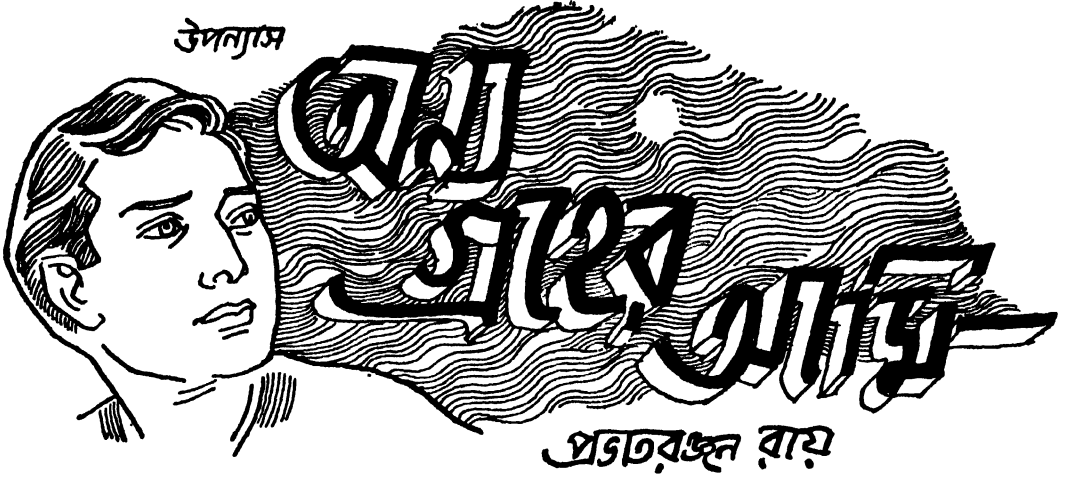
পুর্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—।

পৃথিবীর আসন্ন প্রলয়ের সম্ভাবনায় কয়েক লক্ষ লোক মহাকাশ-যান করে, অন্য এক সূর্যমণ্ডলীতে, অনেকটা পৃথিবীর মতো এক গ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এই ঘটনার ছ'শ' বছর পরে সেই গ্রহে প্রশান্তকুমার, চিয়েন, মরিশ ও ফিসার নামে চার বন্ধু, কলেজের শেষ পরীক্ষার পর সুদূর অঞ্চলে গেল, যেখানে তাদের পুর্বপুরুষেরা পৃথিবী থেকে এসে প্রথম নেমেছিলেন। প্রফেসর সোমোরেন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা সেখানে কি এক বিশেষ গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। মরিশের দাদা হ্যারিশ ও তার বন্ধু নিকলসন তাঁদের সঙ্গেই কাজ করত। পুরোনো পৃথিবীর কয়েকটি ভাষা চিয়েন খুব ভাল জানত এবং প্রশান্ত কুমারও কিছু শিখেছিল। পৃথিবার কতগুলি বই চিয়েন তর্জমা করতে লাগল আর প্রশান্তকুমার কয়েকটি ছেঁড়া রোজনামচার পাতার পাঠোদ্ধার করে দেখল মহাকাশ-যান চালানো সম্বন্ধে নানা তথ্য আছে।

বেড়াতে বেড়াতে ফিসার ও মরিশ দূরে একটি ছোট মহাকাশযান পড়ে থাকতে দেখল। প্রফেসরের অনুমতিক্রমে তারা বিরাট একটি মালগাড়িতে তুলে সেটাকে কারখানায় নিয়ে এল।

সাত

কারখানায় পৌঁছেই সকলে সেই ছোট যন্ত্রটাকে গাড়ি থেকে নামাবার চেষ্টায় লেগে গেলেন। যন্ত্রর একটা দরজা খুলে প্রফেসার ভেতরে ঢুকে গেলেন, একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললেন—"এবার চেষ্টা করে দেখ তো, আমার বিশ্বাস এবার ওটাকে নামাতে কোনো কষ্ট হবে না।" আমরা ব্যাপার দেখে অবাক্, তাতে প্রফেসার বললেন—"এর জন্যে চিয়েনের তর্জমাকে প্রশংসা কর, সেটা থেকেই এর সূত্র পেয়েছি।"

যন্ত্রটাকে নামাবার পর, সকলে তার চারদিক ঘুরে দেখতে লাগলেন আর আমরাও সেই ফাঁকে

টুক করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। চমৎকার ব্যবস্থা; শোবার ঘর, বসবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, সবই আছে। সামনের দিকে চালকদের বসবার জায়গা, তার চারপাশটা একটা স্বচ্ছ জিনিষ দিয়ে তৈরী, বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যায়। সেখানে যে কতরকম কলকব্জা রয়েছে সে আর কি বলব! চারটে হাতল, তার একটার রং লাল ও তাছাড়া অনেকগুলি যন্ত্র রয়েছে, তার প্রত্যেকটার সামনে ঘড়ির মতো কাঁটা লাগানো। মরিশ তাই দেখে বলল—"ঐ দেখ, তিন নম্বর হাতলটা লাল। মনে পড়ে এন্‌রিকের কথাগুলো?"

ঠিক সেই সময় হ্যারিশের সঙ্গে প্রফেসারও এসে ঢুকলেন, তাঁর পেছন পেছন নিকলসন এবং আরো কয়েকজন লোক, তাদের হাতে কাগজ পত্র। নিকলসন আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বলল, "বাঃ, এনেছ বটে একখানা যন্ত্র! আবার চিয়েনের তর্জমা দেখে এটাকে চালাবার সবিশেষ বিবরণও পাওয়া গেছে। এখন প্রফেসার আশা করছেন যে কয়েক দিনের মধ্যেই এটাকে আবার চালু করতে পারবেন।" এই বলে ওঁরা সবাই কাজে লেগে গেলেন, তার মধ্যে আমাদের থাকাটা বড়ই বেমানান লাগছিল, কাজেকাজেই আমরা গুটি গুটি বেরিয়ে এলাম।

বেরোবার আগে আমার সেই তর্জমাটুকু হ্যারিশের হাতে দিয়ে এলাম। বাইরে এসে ফিসার মরিশকে জিজ্ঞাসা করল—

"আচ্ছা, হ্যারিশকে কি মানমন্দিরের সেই ভদ্রলোকের কথা বলেছ?"

মরিশ বললে—"ঐ যাঃ! এঁরা সব যে রকম ব্যস্ত ছিলেন আর আমরা নিজেরাও যন্ত্র নিয়ে এত মত্ত ছিলাম যে ওকথা জানাতে একবারে ভুলে গেছি।"

এমন সময় জেট্ ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দ শুরু হল, তাকিয়ে দেখি যন্ত্রটার দুই পাশের খানিকটা ঢাকনা সরে গেছে আর সেখান দিয়ে বড় বড় চাকা দেখা যাচ্ছে। খোলা দরজার সামনে এসে হ্যারিশ আমাদের ভেতরে যেতে ইসারা করল। আমরা চড়ার সঙ্গে সঙ্গে যানটা চলতে আরম্ভ করল। বেশ জোরেই চলতে লাগল; দরজাটা বন্ধ করা মাত্র ঐ প্রচণ্ড শব্দ আর আমাদের কানে এল না।

মিনিট কয়েক পরে যানটা যখন থামল, দরজা খুলে দেখি ওটা কারখানার সামনেই থেমে আছে, কিন্তু চাকার দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা ঘুরে আসা হয়েছে। প্রফেসারকে খুব খুসি দেখলাম, তাঁরা সবাই নেমে গেলেন। তখন হ্যারিশকে সেই ভদ্রলোকের কথাটা বলা হল, সেও অমনি প্রফেসারকে খবরটা জানাতে ছুটল।

আমরা যন্ত্রের ভেতরটা ভালো করে দেখতে লাগলাম। কলকব্জার সামনে ফিসার আর মরিশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, আমার কাছে এসেই, দেয়ালের গায়ে অনেকগুলো সুইচ্ লাগানো ছিল, তার একটাকে টিপে দিল। আমি হৈ হৈ করে উঠতে না উঠতে দেখি, সুইচের পাশেই দেয়ালের খানিকটা আবরণ সরে যাচ্ছে। সেখানেও একটা জানলা বেরিয়ে পড়ল, এটাও সামনের দিকটার মতোই স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা। আবার সুইচ্‌টা টিপতেই আগের মতো দেয়াল এসে জানলাটাকে আড়াল করে দিল।

মরিশ বলল, "আরে, অত ভয় কিসের, না জেনে কি আর সুইচ টিপছি। একি স্কুলের নিচু ক্লাসের ছেলে পেয়েছ যে সামনে এক গাদা সুইচ দেখলেই মনের আনন্দে একটার পর একটা টিপে যাব? অন্য সুইচগুলোতে কি হয় জানা নেই, কাজেই হাত দেবারও সাহস নেই। এবার চল্‌রে, অনেক বেলা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।" ঠিক সেই সময় হ্যারিশ আবার ফিরে এসে বলল—"বলি, কি করা হচ্ছে? সবাই তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে আর তোমরা এখানে ছেলেমানুষের মতো খেলা করছ নাকি? এবেলা আমরা কেউ আজ ক্যাম্পে ফিরছি না, এখানেই দুপুরের খাবার আয়োজন হয়েছে। এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো খেতে চল তো।"

খাওয়াদাওয়া চুকতেই নিকলসন খবর দিল প্রফেসার ডাকছেন। ছুটলাম তাঁর কাছে, আমাদের সব কথা শুনে, অবিলম্বে সেই পাহাড়ে যাবার ব্যবস্থা করতে বললেন হ্যারিশকে। তারপর যন্ত্র চালানো সম্বন্ধে সহকারীদের সঙ্গে আবার আলোচনা শুরু করে দিলেন। আমাদের সঙ্গে হ্যারিশও সেখান থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসেই সে বললে, "তোমরাই দেখছি কাজটা উদ্ধার করলে। ঐ বড় বড় যন্ত্র নিয়ে এতদিন নাড়াচাড়া করে শুধু এইটুকুই জানা গেছিল যে অনেক লোকজন, মালমশলার দরকার। কিন্তু সে সব যে কোথা থেকে জোগাড় হবে, তার কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। চিয়েন সমস্ত তথ্য বের করে দিয়েছে, তোমরা প্রথমে ছোট যন্ত্রটার সন্ধান দিলে, আবার এখন পাহাড়টার খবর এনে দিচ্ছ! তোমাদেরই জিত হল, সেই সঙ্গে প্রফেসার আমার ওপরেও খুসি, কারণ আমি না থাকলে এখানে আসার কথা তোমাদের মনে হত না, আর তোমরা না এলে এত তাড়াতাড়ি এত খবর মোটেই পাওয়া যেত না!" এই বলেই সে চলে গেল।

সবাই যন্ত্র নিয়ে মশগুল রয়েছেন দেখে আমরা নিজেদের খেয়ালে এদিক ওদিক বেড়াতে লাগলাম। ফিসার হঠাৎ বললে—"আমার মনে হচ্ছে প্রফেসার একবার গিয়ে সেই পুরোনো ছেড়ে-আসা পৃথিবীটাকে দেখে আসতে চান। আমরাও যদি সঙ্গে যেতে পারি, তাহলে কি মজাটাই না হয়! কিন্তু এতগুলো পণ্ডিত লোক থাকতে, আমাদের মতো সদ্য কলেজ ছাড়া ছেলেকে এরকম একটা অভিযানে নেবেই বা কেন? সত্যি কথা মানতেই হবে আমাদের যোগ্যতা কতটুকু?"

মরিশের মহা আপত্তি। "আরে, সেখানে এখনও যদি কেউ বেঁচে থাকে, তা হলে তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে দোভাষীর তো দরকার হবে। দেখছই তো ওখানকার পুরোনো ভাষা জানে এমন লোক এঁদের মধ্যে কেউ নেই।"

বেড়াতে বেড়াতে বেলা কেটে গেল, বিকেলের জলখাবারের সময় এসে গেল। তারপর প্রফেসারের কথায় আমরা সকলে আবার সেই যানটাতে চড়লাম, এবং সেটা চেপেই ক্যাম্পে ফিরলাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মানমন্দিরের কাছে পৌঁছলাম। তখনও সন্ধ্যা হয় নি, বেরিয়ে দেখি সেখানে যত লোক থাকেন প্রায় সবাই উপস্থিত। চিয়েন ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, ওকে দেখে আমরা তিনজন দৌড়ে কাছে যেতেই ও বলল,—"বাঃ, বেশ আছ! সবাই মিলে মজা করে যন্ত্র চড়ে এলে আর আমি পড়লাম বাদ।"

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বললাম, "বন্ধু, মন খারাপ করার কিছু নেই। এই অভিযান যদি সফল হয়, সেটা তোমারই কেরামতি। ভাগ্যিস পুরোনো ভাষাগুলো শিখেছিলে, তাই তর্জমাটা করতে পারলে সেটার ওপর নির্ভর করেই এঁরা আজ কত নতুন বিষয় জানতে পারলেন, তারই ফলে যন্ত্রটাকে চালাতে পারলেন!"

এমন সময় হ্যারিশ এসে রস-ভঙ্গ করে দিল, এসেই বলল—"চিয়েন আর প্রশান্ত, তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বে। ভোর থেকে আবার কাজের পালা শুরু।" এইটুকু বলেই সে চলে গেল। আমাদের মেজাজ গেল চড়ে, কোথায় সারাদিনের ঘটনা চিয়েনকে রসিয়ে রসিয়ে বলব, না তার বদলে তাড়াতাড়ি শোবার হুকুম! কিন্তু কি আর করা, মনে মনে রাগ হজম করে, একটু অন্ধকার হতেই আমরা দুজন খাবার ঘরে হাজির হলাম।

(আট)

ভোর না হতেই প্রফেসার সোমোরেন চিয়েনকে আর আমাকে ডেকে পাঠালেন। চিয়েনের সে কি রাগ! "কি কুক্ষণেই এইসব বিদ্‌ঘুটে ভাষা শিখেছিলাম, তার ফলে কোথায় একটু আরাম করে ঘুমুব না রাত থাকতে ডেকে তোলা! এমন জানলে এই পোড়া দেশে কে আসত!" কিন্তু রাগই হক আর যাই হক, আমরা নিরুপায়, তাড়াহুড়ো করে মুখ হাত ধুয়ে ছুটলাম। প্রফেসার কাজ-পাগলা লোক, কাজের নেশায় স্নান খাওয়া ঘুম এ সবের ধার ধারেন না সেটা জানি, অন্যদের যে এগুলোর দরকার তাও ভুলে যান। কাছে যেতেই বললেন—

"চিয়েন, সতেরো নম্বরের বইটা তাড়াতাড়ি অনুবাদ করে দাও আর প্রশান্ত, রোজনামচার বাকি কটা পাতা চটপট অনুবাদ করে দাও, আমার হাতে সময় খুব কম।"

এই বলেই একজন সহকারীকে ডাকলেন, "দেখ, হ্যারিশ আর নিকলসন যেন এই ফর্দ নিয়ে এক্ষুনি কারখানায় গিয়ে ফর্দ মতন যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখে।" ফর্দ নিয়ে সে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন, প্রফেসার কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়লেন। চিয়েন আর আমি সেখান থেকে চলে এসে নিজেদের কাজে লাগলাম।

দুপুরের খাবার ঘণ্টা শুনে হাতের কাজ নামিয়ে রেখে উঠে পড়লাম। সকালের খাবার কাজের জায়গায় বসেই খেয়েছি, এবার সকলের সঙ্গে খাওয়া যাবে, তারপর একটু বিশ্রাম করা যাবে আশা করেছিলাম। কিন্তু সে গুড়ে বালি। হ্যারিশ এসে পাশের টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে, বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল—"এখানেই খেয়ে নিতে প্রফেসার বললেন, নইলে অনেকটা সময় মিছিমিছি নষ্ট হবে।"

কি ভীষণ রাগ হল যে কি বলব! গোমড়া মুখে খেতে বসলাম। খেতে খেতে ভাবছি কি এমন মহামূল্য খবর এই পাতাকটাতে পাওয়া যাবে, যার জন্যে এত তাড়া! ভারি তো খবর—কোথায় সে কোন দু'শো বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে আসবার সময়ে পথের দুচারটে ঘটনার বর্ণনা, তার জন্যে এত

কি ! সেখান থেকে রওনা হবার বেশ কয়েক মাস পরে Kruger 60 (ক্রুগার সিক্স্‌টি) নামের একট নক্ষত্রপুঞ্জের কাছ দিয়ে যাবার সময়, যাত্রীদের একটা প্রচণ্ড শক্তিমান চৌম্বক ক্ষেত্রের সামনে পড়তে হয়েছিল। এইখানেই নাকি দলের কয়েকটি যান ঐ আকর্ষণের জোরে ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চলে যায়। বাদবাকিরা কেমন করে মুক্তি পেয়ে এই জগতে চলে আসেন, এইটুকু খবরই শুধু আছে রোজনামচাটাতে আর এইটুকু জানবার জন্যেই এই কঠোর ব্যবস্থা।

এত তাড়াহুড়ো করানোর জন্যেই বোধহয় মনে একটা বিরক্তির ভাব এসেছিল, নইলে এ সব পড়ে আমার নিজের যে একটুও উত্তেজনা হয় নি, তা বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। খাওয়ার পর বাকি কটা পাতা তর্জমা করতে বসব, এমন সময় প্রফেসার নিজে এলেন খোঁজ নিতে কতটা হয়েছে।

যেটুকু হয়েছিল তাঁর হাতে তুলে দিয়ে, লেখার বিষয়বস্তুর কথা তাঁকে বললাম, তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন—"দেখ, প্রশান্ত, সবটাই কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে অনুবাদ করে যাবে, কোনো কিছু যেন বাদ না যায়।" তারপরেই একটা সুখবর দিলেন—"জান না বোধ হয়, রোজনামচাটার আরও পাতা পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে, কারখানা আর মানমন্দিরে যত বাক্স আছে সব খুঁজতে লোক পাঠিয়েছি।"

প্রফেসারকে দেখে মনে হল না যে তিনি যে কাউকে খুব একটা খাটুনির কাজে লাগিয়েছেন, এটা ভাবতে পারছেন। বেশ হাসি হাসি মুখেই চলে গেলেন আর আমিও বাকি পাতাগুলো নিয়ে পড়লাম। রাতের খাবার সঙ্কেতের ঘণ্টা খানেক আগেই আমার কাজ শেষ হল। ভোর থেকে মুখ বুজে প্রায় ষোল ঘণ্টা একটানা কাজ করে গেছি, কোমর ঘাড় পিঠ সব টনটন করছে। কাগজপত্র গুছিয়ে হ্যারিশের হাতে দিয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের ডেরায় ফিরে খাটের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘণ্টা শুনে খেতে গিয়ে দেখি বেশ একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। হ্যারিশ আমাকে দেখে কাছে এসে বলল—"তোমার তর্জমাটা নিয়েই এতক্ষণ খুব আলোচনা হচ্ছিল। ওটার সঙ্গে চিয়েনের কাজের ফল যোগ করে, যে সমস্ত নতুন তথ্য জানা গেছে, তাতে আমাদের অভিযানটি এবার সফল হতে পারে বলেই সকলে আশা করছেন।"

এই সময় প্রফেসারও বাকি সবাইকে নিয়ে খেতে এলেন, তাঁর সঙ্গে চিয়েনও এল। সোজা আমার পাশে ধপ্‌ করে বসে পড়ে সে বলল—"ওরে বাপরে ! সত্যি করে বল তো পরীক্ষার জন্যেও কখনো কি এরকম খাটতে হয়েছে ! এমন জানলে কে এখানে আসত ! কোথায় আরামসে একটু ঘুমুব, না সতেরো আঠারো ঘণ্টা মুখ বুজে এক টানা খাটা ! এ কি সহ্য হয় !"

খেতে খেতে সে আরো বলল ;—"দেখছিস্‌ সবাই কি রকম উত্তেজনার মধ্যে রয়েছেন, অথচ কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেই বলেন—না, এমন কিছু না, তোমাদের তর্জমাগুলো খুব কাজে লাগছে, কত নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে—এই রকম ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের জবাব দিচ্ছেন !"

খাবার পর খেয়াল হল মরিশ আর ফিসার খেতে আসেনি। চিয়েন বলল—"সকালে ওরা যখন কারখানায় যাচ্ছিল, তখন সঙ্গে যে পরিমাণ খাবার গেল, তাতে তখনই সন্দেহ হয়েছিল যে ওরা আজ রাত্রে

বাড়ি ফিরবে না।" আরো একটু পরে সত্যি সত্যিই নিকলসন এসে খবর দিয়ে গেল যে মরিশ আর ফিসার রাত্রে ফিরবে না আর চিয়েনকেও সকাল থেকেই কাজে লাগতে হবে!

ঘরে ফেরার সময় চিয়েনকে বললাম—"যদি আমার জানা ভাষায় কোনো বই থাকে, তা হলে আমিও তোমাকে সাহায্য করব।" দুজনেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কাজেই শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি চিয়েন বেরোবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"ও কি চিয়েন, কি ব্যাপার?" সে বলল, "ঠিক করেছি আজ আমিই আগে গিয়ে হ্যারিশকে কাজের জন্যে তাগাদা দেব!" আমিও তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ওর সঙ্গে বেরোলাম। যে ঘরে সে কাজ করছিল সেখানে ঢুকেই চিয়েন বলল—"দেখ কাণ্ডটা!" দেখি টেবিলে নম্বর লাগানো কয়েকটা বই সাজানো, তার পাশেই প্রফেসারের হাতে লেখা নির্দেশ রয়েছে কোন নম্বরের পর কোন নম্বরের বই তর্জমা করতে হবে।

সব চেয়ে আশ্চর্য হলাম পাশেই খোলা দরজা দিয়ে প্রফেসারের ঘরে বেশ ক'জন লোককে দেখে। তাঁদের দেখেই বোঝা গেল কেউ রাত্রে ঘুমোন নি। আমাদের পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখে প্রফেসার বলে উঠলেন—"এ কি, তোমরা এখনো ঘুমোতে যাও নি কেন? তারপর সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাঁর কি হাসি!"

অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন—"যাও, তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও।" তারপর আমাদের বললেন—"চিয়েন, তোমার কাজ তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ, আর প্রশান্ত, আমি স্নান করে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

সবাই চলে গেলেন। চিয়েন কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রলোক ওর পাশে এসে বসলেন। আমি অন্য বইগুলোর পাতা উল্টোতে গিয়ে দেখি তিন নম্বর বইয়ের ভাষা আমার জানা। তখুনি কাগজ কলম নিয়ে তর্জমা শুরু করে দিলাম আর মাঝে মাঝে চিয়েনের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ও যেন নিজের মাতৃভাষায় লেখা বই পড়ছে, প্রায় গড়গড় করে ডিক্টোগ্রামে বলে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো টাইপ হয়ে যাচ্ছে। শুধু যেখানে অঙ্কের ব্যাপার, কিম্বা বিজ্ঞানের খটমট কথা আসছে, সেখানে থেমে যাচ্ছে। তখন পাশের ভদ্রলোকটি বইটা নিয়ে সে সব লিখে দিচ্ছেন।

(ক্রমশঃ)

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

তিতপুঁটি, মাছরাঙা ও আমি

জীবন সর্দার

মাছধরার বাতিক নেই আমার। কিন্তু সব শিকারীর সঙ্গী হতে আমার ভারী শখ। মাছ-শিকারীরাও বাদ যান না।

দিনটা মেঘলা ছিল, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল না—যেদিন নীলাঞ্জন আর তার মেজদার সাথে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। পথে যেতে যেতে একটা বাক্সে খাবারের সুন্দর গন্ধ পেলাম। ঢালটি তুলে দেখি বিচিত্র রঙের লাড্ডু।

নীলাঞ্জন মুচকি হেসে বললে, ওগুলো মাছের 'চার'।

মানে ?

মানে, জলে বঁড়শি ফেললেই আর মাছ ধরা দিতে আসে না। তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে, লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসতে হয় 'টোপের' কাছে। এই লাড্ডুই সেই জিনিস, যা মাছকে গন্ধে টেনে আনবে বঁড়শির কাছে। এতে আছে—বাসি-রুটির গুঁড়ো, রসগোল্লা আর ঘিয়ের গাদ, গাছ-পিঁপড়ের ডিম আর গন্ধের জন্যে দু'এক রকমের মশলা।

বুঝেছি, চারের গন্ধে মাছ এলো। চারের খাবার ঠুক্‌রে গেল। তারপর টোপে গাঁথা বঁড়শি যেই গেলা, দাও এক টান—মাছ ডাঙায়।

না, তা' নাও হতে পারে। কেননা, টোপটি তোমার এমন নাও হতে পারে যে, যে মাছ চার খেতে আসবে সে মাছ টোপের খাবার খাবে।

মাছের আবার খাবারের বাছ-বিচার আছে নাকি ?

আছে না ! কোনো মাছ শুধু আমিষ খায়, কেউবা নিরামিষাশী। আবার কেউ কেউ দুইই।

তার কথার অর্থ ভাল করে বুঝিনি। তোমরাই বল, একটা পুকুরে মাছেদের এত রকমারি খাবার কে জোগাবে !

নীলাঞ্জন বললে, ব্যাপারটা তোমাকে পথে বোঝানো যাবে না। পুকুরঘাটে চলো।

আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোকের পুকুর। বাঁধানো ঘাট। গড়ানে ধার, ধারে ধারে নারকোল গাছ। পুকুরের এক কোণে এক ঝাড় বাঁশ গাছ। তার একটায় একটি মাছরাঙা বসে। জলের রঙ সবুজ। বাইরের নালা দিয়ে এ পুকুরে জল আসার ব্যবস্থা নেই।

নীলাঞ্জনের মেজদা এত পথ একটাও কথা বলেননি। শুধু শুনেছেন। এবার আমাকে জিগ্যেস করলেন, কী দেখছ একমনে ?

পুকুরটা। জলের রং কী সবুজ।
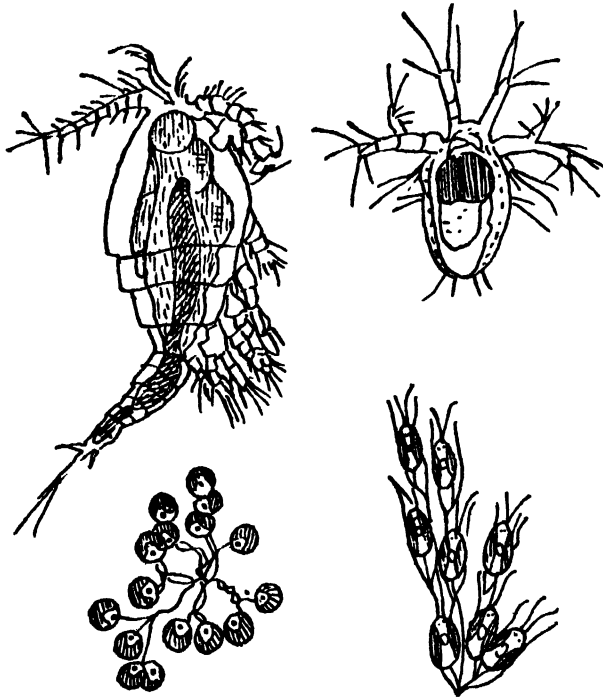
মাছের খাবার প্ল্যাংটন

তার কারণ, জলে এমন অনেক ধরণের গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিস ভাসছে যাতে জলের রং অমনি দেখায়। এই গুঁড়োগুলোর সাথে মিশে আছে মাছের খাবার। তাকে বলে প্ল্যাংটন্। ওটা দুরকমের। উদ্ভিদ বা শেওলা জাতীয় আর প্রাণী বা পোকা-মাকড় জাতীয়। মাছেরা যার যা পছন্দ তেমনি খাবার

বেছে নেয়। কোন্ মাছ কোন্ জাতের খাবার খায় তা দেখে, তুমি সে আমিষাশী না নিরামিষাশী ধরতে পারবে।

কিন্তু ভাববার আরও একটা দিক আছে। রোদ, জলের তলায় কতদূর আর যেতে পারে! কিন্তু জলের রোদ না হলে চলে না। পুকুরের জলকে তুমি দুটো ভাগে আলাদা করে দেখতে পার। যে অবধি আলো পৌঁছয় আর 'অন্ধকারের দেশ'। আলোর অংশে সবুজ গাছপালা দেখতে পাবে। এই পুকুরের ধারটা গড়ানে বলে অনেকটা জায়গায় আলো পৌঁছয় বলে সবুজ গাছ রয়েছে। সবুজ গাছপালা যাদের খাবার জোগায় সে সব মাছের আনাগোনা এখানে।

এর একটু হের ফের হতে পারে। তা অবশ্য অন্য কারণে—মাছের মুখের, মানে, ঠোঁটের গড়নের জন্যে।

কোন মাছের ঠোঁট দুটো সমান সমান, কারো উপরের দিকে একটু বাঁকানো, কারো বা নীচের দিকে। এমনি হওয়ার ফলে, প্রথম দল, সোজাসুজি সামনে থেকে খাবার সহজেই খেতে পারে, দ্বিতীয় দল উপরে ভাসা, আর তৃতীয় দলের পক্ষে নীচে গড়ানো খাবার খেতে সুবিধে।

আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলাম ততক্ষণে নীলাঞ্জন 'চার' ফেলে জায়গা ঠিক করে ফেলেছে। সে নিজে ছোট্ট একটা ছিপ নিয়ে ঘাটের এক কিনারে দাঁড়িয়ে মাছ ধরতে লেগে গেল।

আমি নিলাম মোটা দেখে একখানা ছিপ্। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে, হেঁইও বলে মাঝপুকুরে বঁড়শি ফেললাম।

মেজদা বললেন, সে কি, চার থেকে অত দূরে কী মাছ ধরতে চাও তুমি?

বোয়াল, গম্ভীর গলায় বললাম।

এখানে বোয়াল কোথায় পেলে? বোয়াল শখ করে কি কেউ পুকুরে রাখে! ওটা যে মাছ-খেকো মাছ। পুকুরের নিরীহ মাছ সব সাবাড় করে দেয়।

শখ করে কেউ না রাখুক, হতে তো পারে।

আমার কথা শুনে মেজদা হেসে গড়াগড়ি। মাছ কি কখনো পুকুরে এমনি এমনি হয় নাকি! হাসতে হাসতেই তিনি বললেন। বাগানে যেমন 'চারাগাছ' লাগাতে হয়, পুকুরেও তেমনি 'চারামাছ' ছেড়ে দিতে হয়। তা ও জান না!

বছরের এই সময়টায়, মানে বর্ষাকালে আমাদের দেশের নদীনালা খালবিল জলে একেবারে টৈ-টম্বুর হয়ে যায়। আর সেই সময়ই নদী বেয়ে ডিমভরা মাছেরা উজানে রওনা হয়। তারপর, যেখানে তার বাচ্চারা ডিম ফুটে বেরিয়ে সহজে বাঁচবে বলে বুঝতে পারে সেখানেই ডিম ছাড়ে। চারা-মাছ ধরার লোকেরা খুঁজে খুঁজে সেই ডিম জলসুদ্ধ্ নিয়ে আসে। তারপর কুনকো মেপে বিক্রী করে পুকুরওলার কাছে।

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলায়, সার সার এমন পুকুর আছে, যেখানে এক পুকুরের জল, বর্ষাকালে অন্য পুকুরে গড়িয়ে যেতে পারে। সেখানকার মাছেরা স্রোতে ভেসে চলার আভাস পেয়ে পুকুরেই ডিম ছাড়ে। এ ছাড়া পুকুরে ডিম ছাড়ার কথা বেশি শুনবে না।

আমরা যেমন হাওয়া বদল করতে যাই, যাযাবর পাখিরা যেমন শীত পড়লে জায়গা পালটায়, মাছেরাও তেমনি জল পালটায়। অবশ্য ভিন্ন কারণে। হয় ডিম পাড়ার জন্য, নয়তো ওদের জায়গায় খাবারের অভাব হলে বা জল খারাপ হয়ে গেলে।

ইলিশ মাছের কথা ধরো। বছরের প্রায় বেশির ভাগ সময় এরা সমুদ্রে কাটায়। বর্ষাকালে নদী যখন জলে থৈ থৈ, অক্সিজেন পাওয়া যায় প্রচুর, তখন ওরা কম নোনা জলের জায়গা এই নদীগুলোতে ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়ে প্রায় দেড়শো দুশো মাইল। তারপর সুবিধে মত ডিম ছাড়ে।

বাব্‌বা, বোয়াল মাছ কেন এই পুকুরে পাব না তার উত্তরে এত। আগে জানলে চুপ থাকতুম।
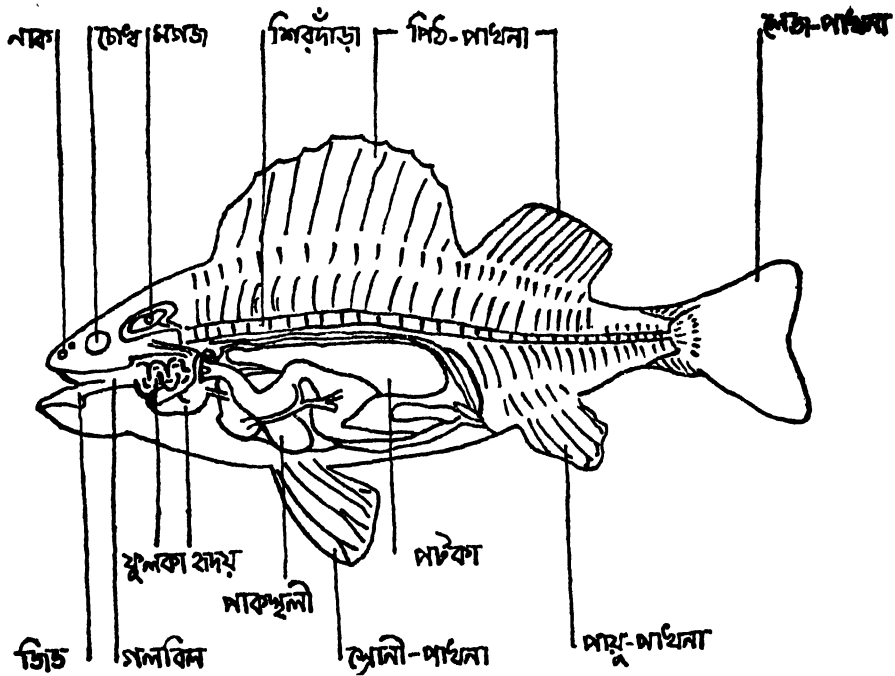
মেজদা যদিও কথা বলছিলেন কিন্তু ওর নজর ছিল ফাৎনার দিকে। ফ্যাৎনা হঠাৎ নড়ে উঠল অমনি উনি চুপ করলেন। টুক্ টুক্ টুক্, কেউ যেন আলতো ভাবে টোপ ঠুকরে যাচ্ছে।

ছোট্ট মাছ। মেজদা বললেন।

ঠিক। নীলাঞ্জন বললে। এই দেখ না কত ধরেছি।

যতক্ষণ আমরা বকবক করেছি ততক্ষণে সে গোটা দশেক পুঁটি ধরে তার ঝাঁপিতে পুরেছে।

মেজদার ফাৎনা আবার নড়ে উঠল। টানবার জন্য যেই তিনি ছিপে হাত দিয়েছেন, মাছরাঙাটা ঝুপ করে জলে পড়েই আবার উঠে গেল। কিছুই পায়নি সে। ফাৎনা নড়াও বন্ধ হয়েছে তখুনি।

মেজদা বঁড়শি তুলে ফের টোপ গাঁথলেন। ছিপের ডগা দিয়ে জলে একটু টগ্‌বগ্‌ শব্দ করলেন। তারপর ঠিক জায়গায় বঁড়শিটা ফেললেন।

ছিপের ডগা গিয়ে টগবগ্‌ শব্দ করার কারণটা বুঝতে পারলাম না। সে কি জল ফড়িং ছুটো তাড়াবার জন্যে। ও ছুটো বারবার ফাৎনায় এসে বসেছিল।

মেজদাকে জিগগেস করতে তিনি বললেম, শব্দ করেছি ছোট্ট ছোট্ট মাছগুলোকে তাড়াবার জন্যে। বারবার খাবার খেয়ে ফেল্‌ছে।

মাছেরা কি শুনতে পায়?

পায় না? ভালই পায়। জেলেরা যখন জাল ছোঁড়ে আর সেটা যখন গোল হয়ে ঝপ্‌ করে জলে পড়ে, মাছেরা শব্দে তখন ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে উপর দিকেই। জেলের জাল তাদের ধরতে উপর থেকেই নাবে। সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে শব্দকে খুব কাজে লাগানো হচ্ছে। শব্দের মতো আলোও মাছ ধরার কাজে লাগছে।

কেরলে ধানের ক্ষেতে চিংড়ি ধরতে দেখেছিলুম। রাতের বেলা ভাঁটা এলে ক্ষেতের বাঁধের দরজা খুলে দেয় জেলেরা। দরজার উপরে থাকে আলোর মশাল, নীচে জলের তলায় থাকে জাল পাতা। আলো দেখে দরজার মুখে চিংড়ির ভিড় বাড়ে, আর ভাঁটার টানে দরজা দিয়ে বেরিয়ে জালে এসে ধরা পড়ে। মজার কায়দা না!

মেজদার হয়তো মাছধরার আরও কায়দা বলার ইচ্ছে ছিল। আমার শোনার ইচ্ছে ছিল না। আমার ইচ্ছে ছিল নীলাঞ্জনের ছিপটা নিয়ে টপাটপ কয়েকটা পুঁটি ধরি।

আমার ইচ্ছেটা সে বুঝতে পেরে ছিপটা দিল। পুকুরের এককোণে দাঁড়িয়ে ছিপ ফেললাম। তখখুনি, টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌—ফাৎনা নড়ে উঠ্‌লো। তারপর, আবার যেই টুক্‌ আমিও হেঁইও বলে মারলাম এক টান।

রূপোলি একটা ছোট্ট মাছ বঁড়শির সাথে উঠেই ঝপ্‌ করে ফের জলে পড়ে গেল। মাছরাঙাটা তক্‌খুনি কোথা থেকে এসে সেটা মুখে নিয়ে উধাও।

সেদিন আর কিছু ধরতে পারিনি। এত কথা বললে কি কাজ হয়। বাড়ি ফিরে নীলাঞ্জনের পুঁটিগুলো ভেজে খেলাম। বেশ খেতে। শুধু মাথাটা তেঁতো।

অরুন্ধতী চ্যাটার্জি

নতুন গ্রাহক—বয়স—৬½ বছর

ভারতের পিতা তুমি জওহরলাল
তব আশীর্বাদ পেয়েছি মোরা এতকাল
তুমি চির সুন্দর মহৎ এবং মহান
বিধাতাকে পূজি মোরা স্মরি মহাপ্রাণ
তুমি আজ গেলে চলে
মোদের মনে দুঃখ দিলে
তোমায় আজি জানাই প্রণাম
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।

নির্ভীক পুরুষ জওহরলাল

সন্দীপন দাশগুপ্ত

বয়স ১১—গ্রাহক নং ২৮৯৩

সর্বজন-শ্রদ্ধেয় প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ২৭শে মে তারিখে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁর নির্ভীকতার একটি নিদর্শন এখানে দেওয়া হইল। ভারত তখন সবে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। এমন সময় সংবাদ আসিল যে, জামিয়া মিলিয়া ইস্‌লামিয়ার বিদ্যালয় ভবনে গণ্ডগোল বাধিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। (তিনি কোন ব্যাপারে প্রাণ বাঁচানোর জন্য চিন্তিত হন নি।) একটি গাড়ি লইয়া একা একা তিনি ঐ বিদ্যালয়ের

দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে আক্রমণকারীর সংখ্যা কত হইবে তাহা চিন্তা না করিয়া, সৈন্যসামন্ত না লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে সেখানে গেলে কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না। তিনি সেখানে যাইতেই গোলমাল বন্ধ হইয়া গেল, এবং তিনি মিটমাট করিয়া নিকটস্থ গ্রামের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে গাড়ি থামাইয়া কৃষকদের কাছে খাবার জল চাহিলেন। কৃষকেরা জল দিল। (অথচ কৃষকেরা এই লোকটিকে চিনিতে পারিল না।) এবং একজন বলিল চা খাবেন? জওহরলালকে তখন তাহারা পিতলের নলওয়ালা কলসীর চা দিল। জওহরলাল ক্ষেতের আলের উপর বসিয়া চা খাইতে খাইতে কৃষকদের সহিত ঘরকন্নার গল্প জুড়িয়া দিলেন। এদিকে লেডী মাউণ্টব্যাটেন জওহরলালের বিপদের আশঙ্কায় বিব্রত হইয়া জামিয়া মিলিয়াতে গাড়ী লইয়া ছুটিলেন, এবং দেখিতে পাইলেন নেহেরু কৃষকদের সহিত আলের উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন।

চাচা নেহেরু

করবী গুপ্ত

গ্রাহক নং—২৪২৩

মহাজাতি সদনের কাছে জাতীয় রক্ষীবাহিনী ময়লা অপসারণ করছে। এমন সময় একটি ঝকঝকে সুন্দর গাড়ী এসে থামলো। গাড়ী থেকে নামলেন আমাদের অতি আপন জন। উনি এসেছেন কাজ দেখতে। কিন্তু এটা পূর্ব-ঘোষিত কার্যসূচীর মধ্যে না থাকাতে তেমন ভীড় হয়নি। উনি কাজ দেখে চটপট করে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিলেন কারণ ১০টার সময় আবার বৈঠক আছে সেখানে যোগ দিতে হবে। কিন্তু গাড়ীতে উঠতে গিয়ে আর উঠা হল না।

না, গাড়ী নষ্ট হয়ে যায়নি। তবে? তিনি গাড়ীতে না উঠে আস্তে আস্তে ফুটপাতের দিকে এগিয়ে গেলেন। সব্বাই অবাক্ এ উনি কোথায় যাচ্ছেন? কিন্তু তাঁকে যে যেতেই হবে উনি যে আমাদের ভালোবাসেন।

রাস্তার এক পাশে নোংরা কাপড় জামা পরে ছোট্ট একটি মেয়ে ওর দাদার হাত ধরে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখছিল। উনি এগিয়ে গেলেন মেয়েটির কাছে। তারপর স্নেহের সংগে ঐ মেয়েটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন হাসি মুখে। বাচ্চা মেয়েটি প্রথমে অবাক হয়ে গেল। এর পর হেসে গড়িয়ে পড়লো।

উনিও হাসলেন। তারপর মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। এই দৃশ্য দেখে চারদিক থেকে তখন জয়ধ্বনি উঠলো।

কে এই আপন জন বোলতে পার? উনি যে আমাদের সবার প্রিয় চাচা নেহেরু।

১৩৬৬ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে শেষবার তাঁকে দেখেছিলাম। উনি সভায় আসছিলেন পাশে ছিলেন পশ্চিমবংগের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। আমরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দুপাশে লাইন করে দাঁড়িয়েছিলাম। উনি হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছিলেন। আমি ছোট পিসির হাত ধরে

দাঁড়িয়ে ছিলাম, উনি যখন কাছে এলেন তখন তাঁকে তাঁরই প্রিয় লাল গোলাপ দিলাম! উনি হাসতে হাসতে আমার হাত থেকে ফুলটা নিলেন।

আজো আমার ঐ দিনটির কথা মনে আছে। কিন্তু আর তো তাঁকে দেখতে পাবো না, আর উনি আমার হাত থেকে লাল গোলাপ নেবেন না। চাচাজীকে আজ প্রণাম জানাই।

নেহেরুকে

মাল্যশ্রী চক্রবর্তী

বয়স ১৬—গ্রাহক নং—২৩৭০

ভারতভূমিকে রিক্ত করিয়া তুমি চলে গেছ দূরে
শোকের কালিমা তাইতো নেমেছে সারাটি ভারত জুড়ে।
মধ্য গগনে সূর্য যেমতি জ্বলে গো দীপ্ত তেজে
তেমতি তুমি গো চিরদিন ছিলে দেশের দশের মাঝে।
ধ্যানের প্রতিমা ছিল যে ভারত প্রিয় সে জননী তব
কত ভালো তুমি বেসেছ তাহারে এখন কাহারে কব।
পরাধীন সেই মাতৃভূমির ব্যাথায় কাতর তুমি
শপথ করিলে পরশ করিয়া জননী জন্মভূমি—
"নিবারণ আমি করিব মা তোর সকল দুঃখ লাজ"
রেখেছিলে তুমি প্রতিজ্ঞা তব ভোলনি তোমার কাজ।
দুখিনী জননী তোমার বিহনে অশ্রু ফেলিছে আজ
কোথা গেছ তুমি মাতাকে ফেলিয়া শোকের সাগর মাঝ?
শিশুরা তোমার প্রাণপ্রিয়তর ছিল যে জীবন ধরে
জন্মদিনটি রেখেছিলে তাই "শিশু দিবসের" তরে।
তোমার কীর্তি হবে না মলিন শাশ্বত তাহা হবে
ভারতের বুকে তোমার আসন চিরদিন পাতা রবে।
শান্তি পেয়েছ কর্মক্লান্ত মহামরণের মাঝ
"আত্মা তোমার শান্তিতে থাক" প্রার্থনা করি আজ।
যেথা তুমি গেছ, যেথা তুমি আছ, যেখানেই যাও যবে,
মোদের নীরব প্রণতি তোমারে চিরদিন ঘিরে রবে।

সম্পাদকীয়

তোমরা হয়তো ভাবো যে রেলগাড়িতে ভিড় আজকালই হয়, সেকালে সবাই ভারি আরামে যাওয়া আসা করত। তা হলে ১৯শে আগষ্ট, ১৮৫৪ সালে শোভাবাজার বালাখানা থেকে প্রকাশিত "সম্বাদ ভাস্কর" নামক খবরের কাগজটি থেকে একটুখানি তুলে দিই, শোন :—

"লৌহবর্ম্ম দিয়া বাষ্পীয় শকট চলিতেছে ইহাতে প্রতি দিবস হাবড়া শ্রীরামপুর, ফরাসডাঙ্গা হুগলি এই চারিস্থানে লোকারণ্য হইতেছে। লোকদের ভিড়ে টিকিট বিক্রয় গৃহে ক্রেতারা প্রবেশ করিতে পারেন না, যাঁহারা ঠেলাঠেলি করিয়া অতি কষ্টে অগ্রে যান, তাঁহারাই টিকিট প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন প্রতি দিবস প্রতি আড্ডা হইতে দুই আড়াই শত লোক ফিরিয়া যাইতেছেন। ইহাতে রেলরোড কোম্পানি-দিগের লাভের হানিও হইতেছে, হাবড়া হইতে যাঁহারা হুগলি যাইবেন, কিম্বা হুগলি হইতে যে সকল আরোহীরা কলিকাতায় আসিবেন তাঁহারা টিকিটের অধিক মূল্য দিবেন, কিন্তু সে সকল লোক বাছনী হয় না। হাবড়া হইতে যে সকল লোক শ্রীরামপুরে গমন করিবেন, কিম্বা হুগলী হইতে যে সকল ব্যক্তি ফরাসডাঙায় আসিবেন, তাঁহারাই অগ্রে টিকিট লইয়া যান। অধিক মূল্য-দাতাদিগের ফিরিয়া যাইতে হয়, ঐ সকল ব্যক্তিরা দুঃখ পান এবং রেলওএ কোম্পানিদিগের পক্ষেও লাভের অনেক ব্যাঘাত হয় আর বহু জনতায় ইহাও হইতেছে নিচ শ্রেণীতে টিকিট ক্রেতারা উচ্চ শ্রেণীতেও যাইতেছেন।

আমরা রেলরোড কোম্পানিদিগের লাভের উন্নতি দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি, অতএব প্রার্থনা করি এই সকল গোল নিবৃত্তির কোন সদুপায় হয়।···· এইক্ষণে বাষ্পীয় শকটে গমনার্থ যত লোক উৎসাহান্বিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের গমনোপযুক্ত গাড়ি সকল প্রস্তুত হউক। যাঁহারা এই বিষয়ে লভ্য করিতে উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহারা অতি শীঘ্র অধিক গাড়ি প্রস্তুত করিলে দেখিতে পাইবেন প্রতি দিবস গাড়ি ভাড়ার টাকা রাখিবার স্থান পাইবেন না।"

এখানে বলে রাখা ভালো যে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেণ যাতায়াত শুরুই হয়েছিল ১৮৫৪ সালের আগস্ট্ মাসে ; আজ একশো দশ বছর পরেও ট্রেণের ভিড় আর টিকিট কেনার মজাটা দেখতেই পাচ্ছ !

চিঠিপত্র

যারা চিঠিপত্র লেখে তারা যদি নিজেদের গ্রাহক সংখ্যা ও নাম, বয়স ও ঠিকানা দেয়, তা হলে ভালো হয়। এবার অনেক নতুন গ্রাহক লিখেছে, তাদের গ্রাহক সংখ্যা সম্পর্কে কিছু জানানো হয় নি, কিন্তু পত্রিকার মোড়কে একটা সংখ্যা দেওয়া আছে। সেইটিই তাদের গ্রাহক সংখ্যা। কিন্তু নাম, ঠিকানা, বয়স দিও।

"জনৈক পাঠক" এগুলি দেয় নি, কিন্তু সে জানতে চেয়েছে ৺প্রিয়ম্বদা দেবীর লেখা পঞ্চুলালের গল্প আর শ্রীআশুতোষ ধরের লেখা 'জিয়ন পুতুলে'র গল্প কি করে এক রকম হল। আমাদের মনে হচ্ছে এ প্রশ্নের একটি উত্তর দেওয়া দরকার।

আসল ব্যাপার হল গল্পটি এঁরা কেউ তৈরী করেন নি, পুরোনো ইটালিয়ান গল্প 'পিনকিও' অবলম্বন করে লিখেছেন, কাজেই কাহিনী এক। প্রিয়ম্বদা দেবীর লেখাটি বছর ৪০ আগে সেকালের 'সন্দেশে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

দেবব্রত মণ্ডল, কলকাতা, গ্রাহক সংখ্যা ২৫০৭

সন্দেশের বিজ্ঞান বিভাগে একে একে সব বিজ্ঞানীদের লেখা প্রকাশ করবার বাসনা আমাদের আছে বৈকি।

নীহারিকা—শ্রীপুর, গ্রাহক সংখ্যা ১৮০৩

জানইতো সর্বদা পুরো নাম ঠিকানা, বয়স দিতে হয়। যাদের লেখা ছাপা হল না, তারা যেন হতাশ হয়ে লেখা বন্ধ না করে, আরো ভালো লেখার চেষ্টা করে।

সমীর কুমার অধিকারী—বাঁকুড়া

নতুন গ্রাহকদের সম্পর্কে কি লিখেছি দেখলে তো? যাদের লেখা মনোনীত হয় শুধু তাদের জানানো হয়। জানবার জন্য খাম বা টিকিট পাঠিও না। আরো ভালো লিখো, কেমন? কবিতার মিল, ছন্দ সম্বন্ধে অভ্যাস কর। অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও নানান নিয়ম আছে, একটু জেনে নিও।

ঊর্মিলা চৌধুরী—পুরুলিয়া

তোমার বয়স, গ্রাহক সংখ্যা ইত্যাদি না জানালে হাত পাকাবার আসরের জন্য লেখা বিচার করা হবে কি করে?

পত্রবন্ধু চাই—(১) গৌতমী ভট্টাচার্য—গ্রাহক সংখ্যা ১৮৬১

বয়স ১১—পড়ে ৭ম শ্রেণীতে—সখ, গল্প পড়া ও লেখা, নাচ, ব্যাড্‌মিণ্টন।

(২) হৈমন্তী মুখোপাধ্যায়—নতুন গ্রাহক

বয়স—১০ বছর ৯ মাস

বৈশাখ মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল :

গর্দভের ছানার বিষয়ে গ্রাহকেরা এত মজার মজার ছড়া লিখেছ যে আমরা তার মধ্যে প্রথম-দ্বিতীয় স্থান ঠিক করতেই পারলাম না ! যে তিনটি পদ্য আমাদের সব চেয়ে ভাল লেগেছে সেগুলি নিচে ছাপা হল, এরা সকলেই ১০৲ টাকা মুল্যের পুরস্কার পাবে। কিন্তু, এ ছাড়াও আরো অনেকগুলি লেখা বেশ প্রশংসার যোগ্য হয়েছিল।

(১)

গর্দভের দুর্গতি—(১৯১২, কেয়া রায়)

নর্দমা-কর্দমে পড়ে গর্দভের ছানা
রেগে বলে "আনো হেলি-কপটর খানা,
উড়িব আকাশে, কারো শুনিব না মানা,
নোংরা এ পৃথিবীটা আছে মোর জানা !"

(২)

উপস্থিত বুদ্ধি—(নতুন গ্রাহক, অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

শীতলা-মন্দির পাশে ধোপা ভাটীখানা,
নর্দমা-কর্দমে পড়ে গর্দভের ছানা,
তর্জন গর্জন করে অকর্মার দল,
অর্জুন ছুটে গিয়ে ডাকে দমকল !

(৩)

গর্দভের দুর্গতি—(২৪৬৭, পার্থমিত্রা ঘোষ)

মর্কট, কর্কট আর গর্দভ-নন্দন,
নর্দমার ধারে করে নর্তন কুর্দন।
সারমেয় দল সেথা যবে দিল হানা
নর্দমা-কর্দমে পড়ে গর্দভের ছানা।

জ্যৈষ্ঠ-মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

১। টাকা।

২। বেলা লাঠিটাকে দেয়ালে আগাগোড়া ঠেকিয়ে শুইয়ে রেখেছিল।

৩। ৫ সেরী ঘটি ভর্তি জল যদু প্রথমে ৩ সেরী ঘটিতে, যতটা ধরে, ঢালল। তারপরে ৩ সেরী

ঘটির জল ফেলে দিয়ে তাতে বাকি ২ সের রাখল। এখন ৫ সেরী ঘটিটা আবার ভর্তি করে নিলেই সে ৭ সের জল পাবে।

যারা সব কয়টি ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর দিয়েছে তাদের নাম নিচে ছাপা হল। এর মধ্যে দীপঙ্কর বসুর উত্তরটি কিছুটা উল্লেখযোগ্য—একটি কথাও না লিখে সে কেবল ছবি এঁকেই সব ধাঁধাঁর উত্তর দিয়েছে!

১ দীপঙ্কর বসু, ২৭ অমিতাভ সেন, ৯৭ সান্ত্বনা দাস, ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ৩২১ কবিতা ও অজন্তা ঘোষ, ৩৩৭ অশোক ও বেলা চট্টোপাধ্যায়, ৪০৩ বুদ্ধদেব নিওগী, ৪২৪ অশোক ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ৪২৭ শর্মিলা মুখার্জি, ৪৩৬ পূরবী চক্রবর্তী, ৬৮৩ চৈতালী সেন, ৭০৭ মন্দিরা দেব, ৭৭৫ শ্বেতারাণী সেনগুপ্ত, ৭৭৭ অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮০৩ কৌস্তুভ বসু, ৮৪২ কৃষ্ণা, স্বাতী ও দীপংকর মুখার্জী, ৮৪৯ স্মরণ দাশগুপ্ত, ৮৫৩ তপন কুমার দত্ত, ৮৬১ শিপ্রা ও মিত্রা গোস্বামী, ৯৪৮ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০১২ নির্মাল্য, জয়মাল্য ও সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০৯৭ ঝুমকা সেন, ১৩৩৬ অমিতাভ ভদ্র, ১৪৪৭ যুগলকান্ত ভট্টাচার্য, ১৪৫৩ জগদীশ ভট্টাচার্য ও সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫১৬ মধুমিতা সেন, ১৫৭১ কঙ্ক ও শঙ্খ রায় চৌধুরী, ১৬১৩ অভিজিৎ ও ভারতী দে ১৬৫৪ সুপ্রিয় দত্ত, ১৬৬৫ রত্নাবলী চক্রবর্তী, ১৮০৮ বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮২৬ শিবানী বসাক, ১৮২৭ অনুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৮ নন্দিতা দাশ, ১৯০৭ বাসব বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯১৯ মাধুরী রক্ষিত, ২১৬২ কাজল দত্ত, ২২০২ তিলক গুপ্ত, ২২১৭ দীপংকর সান্যাল, ২৩০১ তপতী ভট্টাচার্য, ২৫০৭ দেবব্রত মণ্ডল, ২৬৭২ সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, ২৬৮৮ উজ্জ্বলেন্দু গুপ্ত, ২৭০২ অঞ্জন প্রকাশ সেনগুপ্ত, ২৭৬৫ সুমিত্রকুমার বিশ্বাস, ২৮৮৯ রণজিৎ দে।

নতুন—১৩৭ মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, ২৩৩ সব্যসাচী দত্ত, ৩৩৫ সুমিত্রা ভাদুড়ী, শৈবাল দত্ত, স্মরণজিৎ ও শম্পা চক্রবর্তী, শিবাজী চক্রবর্তী, অমিতাভ ও সুচরিতা দাশগুপ্ত।

নতুন ধাঁধা

(১)

"একটু সরিয়ে নিয়ে খেলা থেকে মন,
জানাও আমাকে লিখে কে আছ কেমন।"

উপরের দুটি পংক্তিতে দেখ ঠিক একই শব্দ বসিয়ে মিল দেওয়া হয়েছে। তেমনি করে নিচের পঙ্‌ক্তিতে প্রত্যেক দুটি পংক্তিতে একই শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

"রাখাল বালক এক মেষের-
কুড়ায় রাখিত নানা পাখীর-

একদিন ঘরে খুঁজে না পেয়ে———
বলে চোর ধরে এনে মারিবে———
না ধরিতে পেরে চোর রাগে সেই———
ভুঁয়ে পড়ে করে সুরু হাত-পাদি———
মা দিলেন দেখাইয়া ছিল তা———
তেল মেখে তারপর গেলেন———
রেখেছিল নিজে সব কাগজেতে———
পেয়ে শেষে খুসি হয়ে খাইল সে———

(২)

একটা ইস্কুলের ভূগোল পরীক্ষায় বড় মজার প্রশ্ন এসেছিল—দেখতো তোমরা তার উত্তর জান কিনা।

(ক) কোন সহর বেড়ে যাচ্ছে ?
(খ) কোন সহর খোলা নয় ?
(গ) কোন জায়গা খাবার জন্য ?
(ঘ) কোন নদী থেকে চাঁদ পালিয়েছে ?
(ঙ) কোন নদীকে শুনতে বলছে ?
(চ) কোন জায়গা বাজান যায় ?
(ছ) কোন জায়গায় চিকিৎসক থাকে ?
(জ) কোন জায়গা শাদা ?
(ঝ) কোন জায়গা শুকনো ?
(ঞ) কোন হ্রদে সন্ধ্যা হবে ?

(৩১ শে ভাদ্র বা ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ধাঁধার উত্তর আমাদের হাতে পৌঁছান চাই)

ক্রীড়াজগৎ

অরবিন্দ দাশগুপ্ত

ফুটবল—লীগ কোঠায় শীর্ষস্থানীয় ও দুই অপরাজিত দলের ফিরতি খেলায় ইস্ট্ বেঙ্গল চির-প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ক্লাবের কাছে ৩—১ গোলে পরাজয় স্বীকার করেছে। পর পর ৯টি খেলায় জয়লাভ করে এইটেই ইস্ট্ বেঙ্গলের প্রথম পরাজয়। এ বৎসরের লীগ প্রতিযোগিতায় এইটেই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ খেলা। খেলার গতি অনুসারে মোহনবাগানের জয়লাভ যথার্থ হয়েছিল সন্দেহ নাই। ইস্টবেঙ্গলের সাথে খেলার আগে মোহনবাগান দুটী বড় ফাঁড়া কাটিয়েছিল এরিয়ান্স ও ইস্টার্ণ রেলওয়ের সঙ্গে খেলায়। দুটো খেলাতেই অবশ্য মোহনবাগান উন্নতনৈপুণ্যের খেলা দেখিয়ে জয়লাভ করেছিল। লীগকোঠার এখন যে অবস্থা তাতে কে শীর্ষস্থান অধিকার করবে তার থেকে কে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবে সেটাই বেশী দর্শনীয়।

লীগের অন্যান্য ডিভিসনের খেলাও প্রায় শেষ হয়ে এল। বহুদিনের পুরাণো ক্লাব এরিয়ার স্পোর্টিং এবার দ্বিতীয় ডিভিসনে প্রথম স্থান অধিকার করে আগামী বৎসর প্রথম ডিভিসনে খেলবার অধিকার লাভ করেছেন। আর একসময়ের শীর্ষস্থান অধিকারী ঐতিহাসিক কলকাতা ফুটবল ক্লাব আর তৃতীয় ডিভিসনে সব শেষ স্থান অধিকার করে আগামী বৎসর চতুর্থ ডিভিসনে খেলতে বাধ্য হবেন। কলকাতা ফুটবল ক্লাবের এই পরিণতি ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া কিছুই বলা যায় না। এ দল এককালে ফুটবল খেলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এরা মোট ৮বার লীগ বিজয়ী ও ৯ বার আই. এফ. এ. শীল্ডবিজয়ী হয়েছিল। এ দলের এক কালের নাম-করা খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্মারসেন, চিস্‌হোম, কলভিন, বেনেট, প্যাজেট, নাইট, কেন, উইলিয়ামসন, ব্যাঙ্কস্ অন্যতম।

হকি—আগামী অলিম্পিক খেলা জাপানের রাজধানী টোকিওতে অনুষ্ঠিত হবে। অনেক জল্পনা কল্পনার পর সে খেলায় যোগদানকারী ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পাঞ্জাবের সেণ্টার হাফব্যাক চিরঞ্জিত সিং যার অধিনায়কত্বে ভারত লিওর আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছিল, তিনি নির্বাচিত হয়েছেন দলের অধিনায়ক। সহ অধিনায়কের মর্যাদা লাভ করেছেন হরিপাল কৌশিক। টোকিওর অলিম্পিক খেলার জন্য দল বাছাই হলেও অলিম্পিক খেলার পূর্বে এরা নিউজিল্যাণ্ড ও মালয়েশিয়া ভ্রমণে যাবেন। নির্বাচিত দল সম্বন্ধে বলবার বিশেষ কিছুই নাই। অনেক সমালোচকের মতে উধম সিং এর জায়গায় অন্য কোন কম-বয়স্ক খেলোয়াড়কে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। ইমানুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়াটাও উল্লেখযোগ্য। তাকে নিলে দলের আক্রমণ ভাগটা আরও শক্তিশালী হোত সন্দেহ নাই। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নামের তালিকা নীচে দেওয়া হোল—

গোল :—লক্ষণ সিং ও ক্রিষ্টি।

ব্যাক :—গুরবাক্স্ সিং ও ধরম সিং

হাফ ব্যাক :—জগজিৎ, চিরঞ্জিত সিং, রাজেন্দর সিং ও মহিন্দর

ফরোয়ার্ড :—যোগীন্দর সিং, হরিপাল, পিটার হরবিন্দর সিং, বাণ্ডু প্যাটেল, উধম সিং ও আলী সৈয়দ।

হকিতে ভারতের অবিসম্বাদিত বিশ্বনেতৃত্ব গত অলিম্পিকে পাকিস্থান কেড়ে নিয়েছিল। ভারতবর্ষের অগণিত নরনারীর ঐকান্তিক প্রার্থনা যেন সে হৃত গৌরব ভারতবর্ষ এ বৎসর ফিরে পেতে পারে।

ক্রিকেট—ওল্ড টেফোর্ডে ইঙ্গ অস্ট্রেলিয়ান চতুর্থ টেস্ট্ ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলেও এ খেলাটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ টেস্ট্ ম্যাচে বইয়েছে রানের বন্যা, সেঞ্চুরী, ডবল সেঞ্চুরী, ত্রিপল সেঞ্চুরী আর রেকর্ড-ভাঙ্গা কীর্তিকলাপ। ট্রিপল সেঞ্চুরী করেছেন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক সিমসন, ডবল সেঞ্চুরী করেছেন ইংলণ্ডের ক্লে ব্যারিংটন। সেঞ্চুরী করেছেন অস্ট্রেলিয়ান বিল লরী, আর ইংলণ্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার। পাঁচ দিনের খেলায় দুটী দল সংগ্রহ করেছে ১২৭১ রাণ আর মোট দুই ইনিংসে মোট ৪০টী উইকেটের মধ্যে পড়েছে মাত্র ১৮টী উইকেট।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত ফলফল নীচে দেওয়া হোল :—

	১ম ইনিংস	দ্বিতীয় ইনিংস
অস্ট্রেলিয়া	৮ উইকেটে ৬৫৬	৪ রান
	(স্পিমন ৩১১, লরী ১০৬, বুথ ৯৮)	(ষোল উইকেট বা ইনিংস)

ইংলণ্ড—৬১১

(ব্যাকিংটন—২৫৬ ডেক্সটর—১৭৪)

এ খেলা অমীমাংসিত থাকায় পঞ্চম টেস্ট্ ম্যাচে ইংলণ্ড জয়লাভ করলেও 'এসেজ' এবারও অস্ট্রেলিয়ারই থাকবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ভাদ্র এবং আশ্বিন মাসের সন্দেশ একত্রে পূজা-সংখ্যা প্রকাশিত হবে। তার আয়তন হবে তিনচারটি সাধারণ সংখ্যার সমান এবং বাজারে দাম হবে ২.৫০/৩.০০ টাকা—কিন্তু গ্রাহকদের তার জন্য কোনও অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে না।

গ্রাহকেরা যদি ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৬০ নঃ পঃ ডাকটিকিট পাঠিয়ে দাও তাহলে তোমাদের সন্দেশ রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান হবে।

কেউ যদি লোক মারফত বা নিজে এসে পূজা-সংখ্যা নিয়ে যেতে চাও, সেটাও আমাদের ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে জানাও।

১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাদের কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া যাবেনা তাদের পত্রিকা 'under certificate of posting' পাঠান হবে। কিন্তু তবু যদি পূজা-সংখ্যাটি ডাকে হারিয়ে যায় তবে এর ক্ষতিপূরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

ষান্মাসিক গ্রাহকদের চাঁদার মেয়াদ পূজা-সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। তোমরা যদি আশ্বিন মাসের প্রথমেই চাঁদার টাকা পাঠিয়ে দাও, কিম্বা কবে টাকা পাঠাবে জানিয়ে দাও, তাহলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে।

হারুকে ধরেছে বুঝি
ঘোড়া রোগে ভাই,
বাজারেতে যেতে হলে
'র‍্যালে' খানা চাই।
যদি যায় বজবজ
বিশ মাইল দূর
'র‍্যালে'খানা পেলে তার
ঠোঁটে ফোটে সুর,
শিস দিয়ে গাড়ি নিয়ে
ছুটে চলে রঙ্গে
মনখানা দোলে তার
ফুর্তি-তরঙ্গে।
সেন-র‍্যালে লিমিটেড, কলিকাতা
SRC-82ABEN
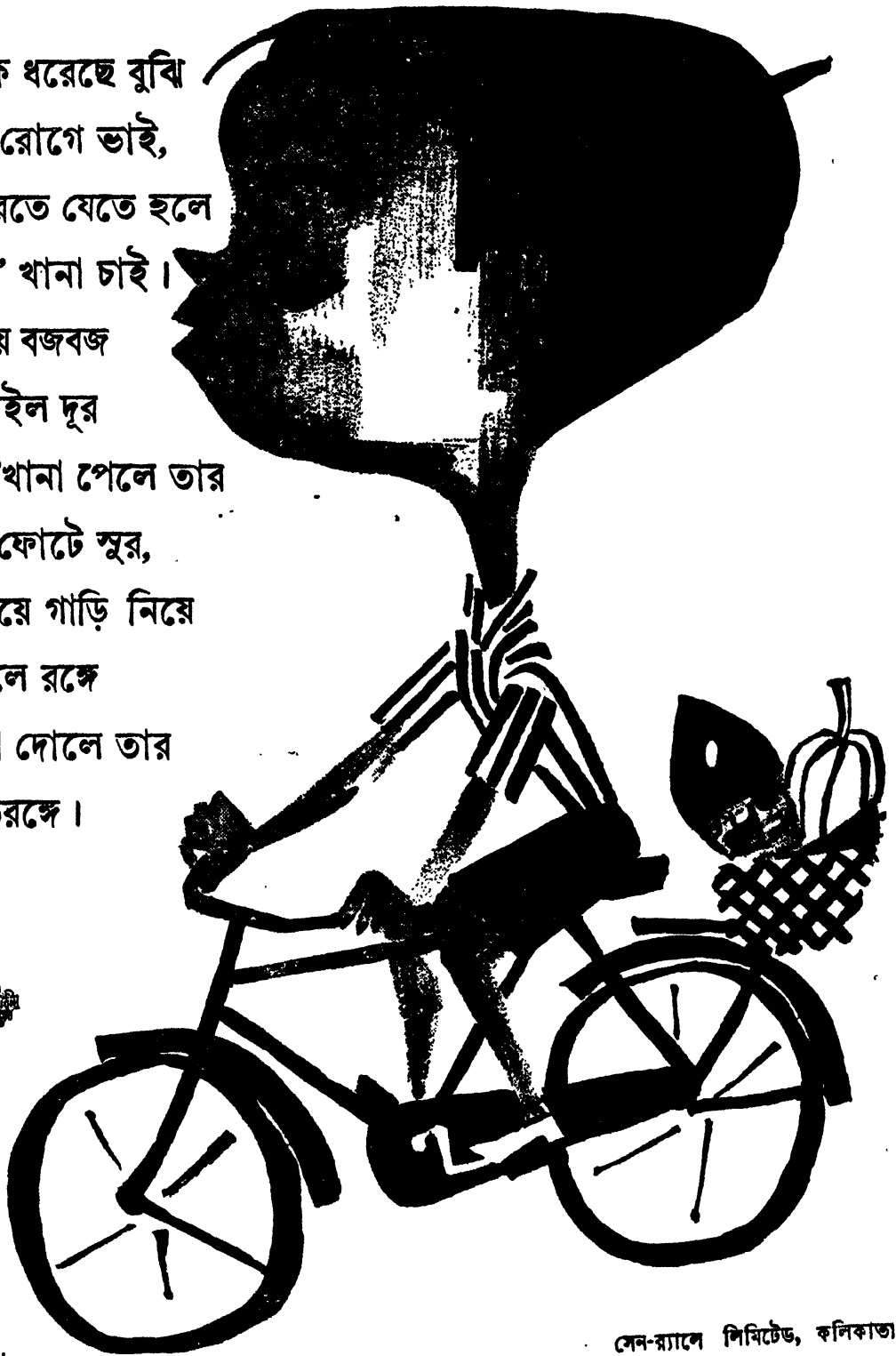
ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্রিকা

৪র্থ বর্ষ | সপ্তম সংখ্যা

নভেম্বর ১৯৬৪ | কার্তিক ১৩৭১

সম্পাদক | লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়

'সন্দেশ'এর বার্ষিক চাঁদা
সডাক ৯.০০

চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা :
ম্যানেজার 'সন্দেশ'
১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা-৯

*

২+২=৭
ব্রিটানিয়া বিস্কুট
খেলে মন ভোলে
স্বাদে ঠাসা ভরপুর
বলছে সকলে।
মুচমুচে নিমকীতে
লোভ টেনে আনে
“উপাদেয় ম্যাঙ্গো”
কেনা আর মানে—
“থিন এরারুট” “মারী”
“ক্রীম ক্র্যাকার” মানি
অরুচির মুখ খোলে
খেলে একখানি।
অল্পেতে শেষ করি
পরিচয় যা-যা
বিস্কুট রাজ্যেতে
“ব্রিটানিয়া” রাজা।
ব্রিটানিয়া
বিস্কুট
JWTBC 1414

ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্রিকা

৪র্থ বর্ষ | অষ্টম সংখ্যা

ডিসেম্বর ১৯৬৪ | অগ্রহায়ণ ১৩৭১

সম্পাদক | লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়

'সন্দেশে'র বার্ষিক চাঁদা
সডাক ৯'০০

চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা :
ম্যানেজার 'সন্দেশ'
১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা-৯

Unity
REGISTERED TRADE MARK
STEEL SAFETY PINS
ইউনিটি
সেফটিপিনের
জুড়ি নেই
* সেরা জিনিস
* সুগঠিত মাথা
* সূক্ষ্ম মুখ
* পুরু নিকেল পালিশ
* চমৎকার গড়ন
'ইউনিটি' মার্কাটি জর্জ গুড্‌ম্যান লিমিটেড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক ;
এর রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী
গেস্ট, কীন, উইলিয়ামস, লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ নয়াদিল্লী

GKW 5187A

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা
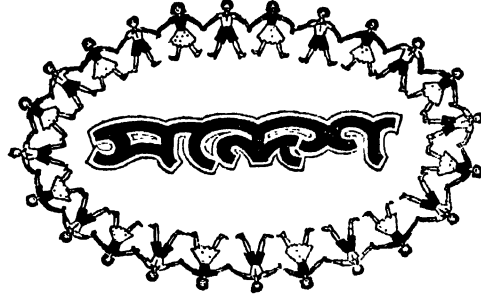
৪র্থ বর্ষ | নবম সংখ্যা

জানুয়ারী ১৯৬৫ | পৌষ ১৩৭১

সম্পাদক | লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়

'সন্দেশে'র বার্ষিক চাঁদা
সডাক ৯·০০

চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা :
ম্যানেজার 'সন্দেশ'
১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা-৯

*

৪র্থ বর্ষ | দশম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ | মাঘ ১৩৭১

সম্পাদক | লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়

২+২=৭
ব্রিটানিয়া বিস্কুট
খেলে মন ভোলে
স্বাদে সেরা ভরপুর
বলছে সকলে।
মুচমুচে নিমকীতে
লোভ টেনে আনে
উপাদেয় "গ্লুকো"
কেনা আর মানে—
"থিন এরারুট" "মারী"
"ক্রীম ক্র্যাকার" মানি
অরুচির মুখ খোলে
খেলে একখানি।
অল্পেতে শেষ করি
পরিচয় যা-যা
বিস্কুট রাজ্যেতে
"ব্রিটানিয়া" রাজা।
ব্রিটানিয়া
বিস্কুট
JWTBC 1414

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৪র্থ বর্ষ | একাদশ সংখ্যা

মার্চ ১৯৬৫ | ফাল্গুন ১৩৭১

সম্পাদক | লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়

দিলীপের দলবল
ইস্কুলের ফিল্ম শো-তে
উনি আমাদের আজ একটা ফিল্ম দেখাবেন। তোমরা যে যার জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকবে বুঝলে!
হুর্ রে!
এই, সব চুপ!
তোমরা কেউ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এলেই আমি শুরু করতে পারি।
আমি নিভিয়ে আসছি!
না, না আমি যাচ্ছি!
আজ আমি যে ছবিটা তোমাদের দেখাচ্ছি, তাতে দেখবে উড়ো-জাহাজ। কি ভাবে উড়ো জাহাজ তৈরি হয়, কি ভাবে চলে— তা এ ছবিতে তোমরা সব দেখতে পাবে!
হুর্ রে!
দিলীপ! ঐ দ্যাখ, জেট প্লেন!
চুপ, চুপ! ব'সে পড়্!
এ কী হল?
বন্ধ হয়ে গেল যে!
ইস্, কী কাণ্ড!
কী মুস্কিল! ফিল্মটা কেটে গেছে। এক্ষুনি ঠিক করে ফেলছি। একটু আলো চাই যে। কেউ উঠে বাতি জ্বেলে দেবে?...
বাতি জ্বালাবার দরকার হবে না। আমি টর্চ ধরছি, আপনি বা সারাবার সারিয়ে ফেলুন!
হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ভালো!
ব্যস, সব ঠিক হয়ে গেছে। ভাগ্যিস, হাতের কাছেই একটা টর্চ ছিল!
যাক! এবার আমরা নির্ঝঞ্ঝাটে ছবিটা দেখতে পারব।
হাতের কাছে যেন সব সময় 'এভারেডী' টর্চ থাকে। কখন কী দরকার পড়ে কে বলতে পারে!

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৪র্থ বর্ষ | দ্বাদশ সংখ্যা

এপ্রিল ১৯৬৫ | চৈত্র ১৩৭১

সম্পাদক | লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়

"অন্য গ্রহের আমি"

৪র্থ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা

নভেম্বর ১৯৬৪। কার্তিক ১৩৭১

বুলবুলি

উমা দেবী

বুলবুলিকে কেউ বোকো না, কেউ করো না মানা,
যখন তখন নালিশ করা হোক না স্বভাব-খানা।
ভোর হয়েছে যখন সবে—আধখানা চাঁদ হেসে
যেই শুয়েছে আবছা সবুজ পুবের আকাশ ঘেঁসে,
অমনি তো তার চোখের ঘুমও কোথায় যাবে চলে-
করবে সুরু বকবকানি শুয়ে মায়ের কোলে।
নিজের মনে গাইবে সে গান—গল্প করবে নিজে,
নিজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চোখের জলে ভিজে
ধড়মড়িয়ে বিছনা ছেড়ে আসবে পাশের ঘরে—
এ-র ও-র তা-র ঘুম ভাঙাবে মিষ্টি-গলার স্বরে।

বুলবুলিকে কেউ মেরো না — কেউ বোকো না তাকে,
যতই খুশি নালিশ করুক যেমন খুশি যাকে !
ঐ দাদাভাই বেরিয়ে গেল বই-পত্তর রেখে,—
ঐ যে দিদি মুখ বাড়িয়ে ছাদের পাঁচিল থেকে
গল্প করছে ! ও—মা, ওদের বেড়ালছানা কেন
হাঁক পাকাচ্ছে এমনতর, মরে যাচ্ছে যেন !
পাশের বাড়ির টুকুন সোনা—এমন দুষ্টু ছেলে
চুলটা কেন টেনে বা দেয় একলা আমায় পেলে ?
ভাইটা এমন চেঁচাচ্ছে যে কানটা ঝালাপালা !—
মা কেন যায় বেড়াতে রোজ টালির থেকে টালা ?

বুলবুলিকে সবাই মিলে আদর কর শুধু,
খাওয়াও তাকে মণ্ডা-মিঠাই মিশ্রি-মাখম দুদু,
ঝাল ডালমুট, আলু-কাবলি, ফুচকা, পাঁপর-ভাজা,
নোনা বাদাম, আমসত্ত্ব, শোনপাপড়ি, খাজা।
দাওনা ওকে বেড়াতে রোজ যেখানে তার খুশি,
সঙ্গে শুধু থাকবে পোষা ছোট্ট শাদা পুষি।
আদুড় গায়ে খালি পায়ে চুলে কিলিপ গুঁজে,
এখানে আর ওখানে তার বন্ধু বেড়াক খুঁজে।
চান করবে যখন খুশি যখন খুশি শোবে—
পুতুলকে তার য'বার খুশি সাবান জলে ধোবে !

তেপান্তরের মাঠ যেখানে শেষ, তার পরে শুরু হয়েছে গম্ভীরনগরের রাজার রাজ্য। মাঝখানে বইছে একটি ছোট্ট নদী। রূপমতী, নেহাৎই ছোট্ট; বোঝাই কেবল বালি আর ছোট্ট নুড়ি পাথরে। তার তীরে না চরে গরু, না খেলা করে রাখালের দল। পথিকেরা পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে ভুলেও বিশ্রাম নেয় না তার তীরে। নদীর ধারে নেইকো একটিও ছায়ামেলা গাছ। আছে শুধু ফণি মনসার ঝোপ আর বাবলা গাছের সারি। সুর্যিদেবের সঙ্গেও যেন নদীটার চিরকেলে আড়ি; সরু সুতোর মতো তার মাঝ দিয়ে যে একটুখানি জল বয়ে চলেছে, তাও যেন শুষে নিতে চায়। কিন্তু চিরকাল এ নদী এমন ছিল না।

সেদিন থেকেই এমনি হোল। রাজা হয়েই যুবরাজ রাজ্যের নাম পালটে দিলেন। রাজ্যের নাম ছিল হৈমন্তীপুর, তার বদলে হোলো গম্ভীরনগর। এমন মিষ্টি নাম পালটে একটা বিশ্রী বদ্‌খত্ নাম দেওয়াটা কেউই পছন্দ কোরল না; কিন্তু উপায় কি! রাজপুরোহিতের ছেলে জীবন বললে, 'রাজ্যের এমন সুন্দর মিষ্টি নামটা পালটে দেওয়াটা কি ঠিক হোলো? মনগুলো এবার আমাদের শুকোতে সুরু করবে।' রাজামশাই বেজায় ধমক দিয়ে বললেন, 'মন আবার কি? ওকি দেখা যায়? ওকি ছোঁয়া যায়? মন বলে কোনো জিনিষ আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনে। ওসব মিথ্যে কথা।'

এরপরে সাধ্যি কোথায় রাজামশাইকে কিছু বুঝিয়ে বলার। কেউ কিছু বলতে সাহস করলে না, কিন্তু বেজায় মনমরা হয়ে পড়ল রাজ্যের মানুষরা। রাজামশাই হুকুম জারি করলেন সৈন্য আর পেয়াদারা ঝলমলে পোষাক পরতে পাবে না, তাদের পরতে হবে কালো কাপড়ের উর্দি; তাতে নাকি তাদের খুব জাঁদরেল দেখাবে; কিন্তু তাদের দেখতে হোল ঠিক যমদুতের মতো।

রাজবাড়ির বাগানের বেলা, চামেলী, হেনা, যুথী, বকুল, সব গাছ কেটে ফেললেন। মানা করলেন রাজ্যে গানের রেওয়াজ চালাতে। সভাগায়কদের তিনি বিদায় দিলেন। তার বদলে আসন দখল করল টিকিধারী খটমটে নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের দল, যারা শুধু তর্ক করতেই ভালবাসে; যুক্তির শেকলে মনটাকে

বেঁধে ফেলতে চায়। সন্ধ্যেবেলা রাজবাড়ির নহবৎখানায় পিলু-বাঁরোয়ার সুরে সানাই বেজে উঠত; রাজামশাইএর আদেশে তা হোল বন্ধ।

রাজ্যের বুড়ো মন্ত্রী ছিলেন বড়ই রসিক। রোজ গভীর রাত্রে পাকা গোঁফে আতর মেখে, গলায় একগাছি যুথীর মালা প'রে খোসমেজাজে ছাদে বসে সরোদে 'বেহাগ' সুর আলাপ করতেন। তখন সমস্ত আকাশ বাতাস যেন গুমরে গুমরে কেঁদে উঠত। আকাশ কাঁদত, বাতাস কাঁদত; চাঁদের কান্না, তারাদের কান্না যেন আলো হ'য়ে ঝরে প'ড়ত পৃথিবীর ওপর। বাগানের বকুল, হেনা, বার বার কেঁদে ঝরে পড়ত বাগানের ঘাসে। বুড়ো যখন সরোদ ছেড়ে উঠতেন তখন দেখতেন মেয়ে নন্দিতা পাশে বসে; চোখের জলে তার গাল দুটো ভিজে গিয়েছে। বুড়োর চোখ দুটো কখন যে ছলছল হয়ে গিয়েছে কে জানে। কেন যে এমন হোত কে জানে; কিন্তু রোজই এমনি হোত। রাজামশাইয়ের আদেশে বুড়োর এ আনন্দটুকুও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রাজামশাই হুকুম দিলেন, রাজ্যের সমস্ত বাড়ির রঙ কালো করে ফেলতে; তার আগেই শ্বেত পাথরের রাজবাড়ির সবটাই কালো রঙে কালি করে দিলেন। সমস্ত আনন্দ উৎসব হোল বন্ধ; একটা নিষেধ যেন চোখ উঁচিয়ে রয়েছে। বাগানের গাছগুলোরও ফুল ফোটানো, ফুল ঝরানো থামলো; পাখির দল সর্বনাশা রাজ্য ছেড়ে উড়ে গেল পাশের রাজ্যে।

হেমন্তের উৎসবে কত আত্মভোলা বাউলের দল আসত মেলায়; তারা আর এল না, বলতে লাগল, 'রাজ্যের মানুষগুলো যেন হাসতে ভুলে গিয়েছে; রাজার এমন বিশ্রী আদেশ তোমরা মেনে চলতে পার; কিন্তু আমরা ত' আনন্দের পথ ধরে চলি, আমরা এ নিষেধ মেনে চলি কেমন করে? আনন্দ ছাড়া আর আমাদের কিই বা সম্বল আছে!' অথচ পাশের রাজ্যগুলোতে বইতে লাগল হাসির বন্যা। অনেকেই রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। এমনি করে আর ক'দিন চলে। বুড়ো মন্ত্রীও বেজায় মুষড়ে পড়লেন, কেবল নন্দিতা তাঁকে সান্ত্বনা দেয়।

এমন সময় ভারী মজার ব্যাপার হোল। রাজামশাই হুকুম দিয়েছিলেন রাজ্যের সেরা দর্জিকে একশো সাঁইত্রিশ গজ কালো রেশমের কাপড়ের একটা পাগড়ী তৈরী করতে। তাতে বসানো হবে দু'শো চুয়াত্তরটা পান্না। পাগড়ী তৈরী হোল। পাগড়ী নয় ত যেন একটা বিরাট বস্তা। রাজামশাই গোমড়া মুখে একদিন সেই পাগড়ী মাথায় দিলেন; তিনশো মোসাহেব বেসুরো গলায় বার বার আবৃত্তি করতে লাগল 'গম্ভীরনগরের গম্ভীরাধিপতি শ্রীশ্রীখিনখিনে খুঁৎ খুঁৎ সিংহের জয় হোক।' এমন বিশ্রী পরিবেশে তার্কিক নৈয়ায়িকরা পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠল, রাজামশায়ের পাগড়ীটা আসলে হয়েছিল মাথার চেয়েও অনেক বড়; সেটা পরে তাঁকে ঠিক মেলার সঙএর মত মনে হচ্ছিল। পাগড়ীটা তাঁর কাঁধ পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল।

এমন অদ্ভুত পোষাক দেখে রাজপুরোহিতের ছেলে জীবন 'হিঃ হিঃ' করে হেসে উঠল। আর যাবে কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ জন পেয়াদা তার হাত ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে সভার বাইরে বার করে দিল। কিন্তু এমন সময় সবাইকে অবাক ক'রে রাজামশাইও 'হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ' করে

হেসে উঠলেন। সেনাপতি ভুরু কোঁচকালেন। মন্ত্রী মশাইএর চোখ ওপরে উঠে গেল; তিনি'ত বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে রাজামশাই হাসছেন। কোটাল'ত আমতা আমতা ক'রে বললেন 'রাজ্যের ঘোর অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে ঃ রাজামশাই না হ'লে হাসছেন কেন! এক্ষুণি রাজ্যে ঢোল দিয়ে জানানো হোক—সবাই যেন সাবধানে থাকে, ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে আসছে।'

সবাইকে অবাক করে রাজামশাই হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ করে হেসে উঠলেন

নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা হাসির কারণ খুঁজে বের করবার জন্যে বিরাট বিরাট পুঁথি খুলে বেজায় চিৎকার করে তর্ক সুরু করলেন। সভায় সুরু হোল হট্টগোল আর হৈ চৈ; অথচ এদিকে রাজামশাইএর হাসি আর থামে না। হেসে হেসে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন তবুও 'ফিক ফিক্' ক'রে হাসি বন্ধ

হোল না। সেনাপতি কোটালকে পরামর্শ দিলেন রাজবাড়ীর কবরেজকে ডাকতে, বললেন 'হয়ত এটা অসুখও হ'তে পারে ; গম্ভীরনগরে সুস্থ লোক হাসে না, অসুস্থ না হলে।'

কবরেজ মশাই একঘণ্টা ধরে রাজামশাইএর নাড়ী টিপলেন। শেষকালে গম্ভীর মুখে বললেন, 'ভীষণ অবস্থা ; সমূহ বিপদ রাজামশাইএর বুদ্ধির প্রদাহ হয়েছে।' তিনি রাজামশাইকে খানিকটা কি ওষুধ খাওয়ালেন ; তাতে সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা 'ওয়াক ওয়াক' করে বমি হ'য়ে গেল। কবরেজ মশাই মাথা নেড়ে বললেন 'এ দুঃসাধ্য রোগ, আমার দ্বারা কিচ্ছুটি হবে না।'

সেনাপতির মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। গুজবে আর হুজুগে রাজ্যে বেজায় গোলমাল সুরু হোল। এদিকে রাজামশাই হাসি'ত থামালেনই না উপরন্তু বাড়িয়ে ফেললেন। কোনো উপায় না দেখে সেনাপতি, কোটাল, মন্ত্রী পরামর্শ করে রাজ্যে ঢোল দিলেন যে যদি কেউ রাজামশাইএর হাসি থামাতে পারে তবে তার যে কোনো একটি ইচ্ছে পূরণ করা হবে। কেউ সাহস করে এগিয়ে এল না।

কিন্তু হঠাৎ সবাইকে আশ্চর্য করে বুড়ো মন্ত্রীর মেয়ে নন্দিতা বললে, আমি পারি।' সে এতক্ষণ মন্ত্রীর পাশে বসে মুচকি মুচকি হাসছিল। সেনাপতি বললেন, 'বটে ? তবে থামাও হাসি।' নন্দিতা দৌড়ে গিয়ে রাজামশাইএর পাগড়ীটা মাথা থেকে একটানে মেজেতে ফেলে দিল। বুড়ো মন্ত্রী মশাই 'হায় হায়' করে উঠলেন। সেনাপতির ইঙ্গিতে পঞ্চাশ জন সৈন্য তলোয়ার খুলে ফেলল। সেনাপতি বললেন 'কি ! রাজামশাইএর মাথায় হাত ! দাঁড়াও তোমায় মজা দেখাচ্ছি, ফাজিল মেয়ে কোথাকার।'

এদিকে হয়েছে কি, পাগড়ীটা মাটিতে পড়ামাত্র দশ বারোটা আরশোলা পাগড়ি থেকে বেরিয়ে সিংহাসনের তলায় লুকোলো ; আর বেজায় আশ্চর্যের ব্যাপার যে রাজামশাই হঠাৎ হাসি থামিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে সিংহাসনের ওপর চোখ বুজে নাক ডাকাতে সুরু করলেন।

আসলে হয়েছিল কি, দর্জির দোকানে ছিল আরশোলার আড্ডা। তার দোকান থেকেই এক গাদা আরশোলা রাজামশাইএর পাগড়ীর কাপড়ের ফাঁকে ফাঁকে বেশ সুখেই ঘরকন্না করছিল। রাজা-মশাই পাগড়ী মাথায় দিলে তারা বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় শুঁড় নেড়ে কানের তলায়, ঘাড়ে, মাথায় একটু সুড়সুড়ি দিয়ে ফেলেছিল। যাই হোক রাজামশাইএর হাসি থেমে যেতে সেনাপতি খুবই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

ততক্ষণে রাজামশাই ঘুম থেকে উঠেছেন ; সেনাপতি তাঁর কানে কানে কি যেন বললেন। তাতে তিনি খুব খুশি হয়ে মাথা নেড়ে নন্দিতাকে বললেন, 'তোর ওপর আমি খুব খুশি হয়েছি ; আমার হাসি এতক্ষণ না থামলে নিশ্চয়ই অক্কা পেতাম। উঃ আমার পেটে ব্যথা হয়ে গিয়েছে হাসতে হাসতে। ভদ্রলোকে কখনও হাসে, ছ্যাঃ ছ্যাঃ। তোর ইচ্ছেটা আমি পূরণ করব, চট্‌পট্ বলে ফেল্।'

নন্দিতা মুচকি মুচকি হাসতে সুরু করল, রাজামশাই দিলেন প্রচণ্ড ধমক, 'ফের হাসছিস ! এবার তোকে বেজায় শাস্তি দেব। বলেছি না যে আমার রাজ্যে হাসা চলবে না।' তারপর

মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার মেয়েকে সাবধান করে দাও মন্ত্রী ; রাজার সামনে এ বেয়াদবি'ত ভাল নয়।'

মন্ত্রীমশাই তখন বেজায় ভয় পেলেন ; কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'এবারের মত ওকে ক্ষমা করুন, রাজামশাই।' রাজামশাই নন্দিতাকে বললেন, 'কি চাই ?' নন্দিতা গম্ভীর হয়ে বলল, 'রাজা মশাই আপনি হুকুম দিয়েছেন যে আপনার রাজ্যে হাসা চলবে না, আনন্দ করা চলবেনা, গান বাজনা করা চলবে না ; আমার প্রার্থনা আপনি এই নিষেধ তুলে নিন চিরদিনের মত।'

নন্দিতার কথায় রাজসভায় যেন বাজ পড়ল। মন্ত্রী'ত মাথায় হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। রাজামশাই একেবারে নির্বাক, তিনি এখন বুঝতে পারছেন যে নিজের জালে তিনি নিজেই পড়েছেন, বুদ্ধির খেলায় তিনি এই ছোট্ট মেয়েটির কাছে হেরে গিয়েছেন। হঠাৎ রাজামশাই বললেন, 'বেশ সমস্ত নিষেধ আমি চিরদিনের মত তুলে নিলাম।' তারপর এক দৌড়ে অন্দরমহলে ঢুকলেন, ভারী লজ্জা পেয়েছেন তিনি।

এদিকে সারা রাজ্য জুড়ে নন্দিতার জয় জয়কার। সেদিন সারা রাত্রি ধরে চলল হাসির হুল্লোড়। লোকগুলো যে কতদিন প্রাণ খুলে হাসেনি। বুড়ো মন্ত্রী বাড়িতে ফিরে সরোদে নতুন করে তার বাঁধলেন! তারপর নন্দিতার হাত ধরে বাগানের মাঝে একটা বকুল গাছের তলায় এসে বসলেন। 'আজ বেহাগ নয়, বাবা আজ তুমি 'জয় জয়ন্তী' বাজাও।'

বুড়ো মন্ত্রী আজ যেন সুরপাগল হয়ে গেলেন, বাজনা তাঁর আর থামে না। এদিকে বকুল ফুল ঝরিয়ে গাছের তলা ভরিয়ে ফেলল। অনেক রাত্রে বুড়ো মন্ত্রী সরোদ থামালেন। তারপর নন্দিতাকে কাছে টেনে মিষ্টি চুমো দিয়ে বললেন, 'নন্দিতা, আজকের এ জয় ত' তোর শুধু একার নয়, শুধু এ রাজ্যের মানুষের নয়। এ সমস্ত মানুষের জয়, যারা নুয়ে পড়ে হাসতে ভুলে গেছে, লজ্জায়, ভীরুতায়।' নন্দিতা তখন বুড়োর কাঁধে মাথা রেখে তার ছোট্ট হাত দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ততক্ষণে রাজবাড়ির নহবৎখানা থেকে রাত্রির তৃতীয় প্রহরে মালকোষের সুর তাদের আরও উদাস করে দিয়েছে। বকুল তখনও ঝরে চলেছে ; সারারাত্রি ধরে ও ঝরাবে তার হাসি। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া যেন পূব দিক থেকে ভেসে এল, কেমন যেন জোলো হাওয়া। নন্দিতা বলল, 'বাবা রূপমতীতে বান এসেছে।'

ওর মাথায় হাত দিয়ে মন্ত্রী বললেন, 'আসবেই ত মা ; মানুষের মনে যখন আনন্দের বান এসেছে ; নদীর বুকে আসবেনা।' রসিক বুড়ো আবার সরোদটি তুলে 'বেহাগ' ধরলেন।*

*শ্রীশৈল চক্রবর্তী মহাশয়ের 'দি লাফিং কিং' গল্পটির ছায়া অবলম্বনে রচিত।

পারস্য দেশে মৌশেল নামে একটা রাজ্য ছিল। সেখানকার বাদশার ছেলে ফাদাল্লার যখন বিশ বছর বয়স হল, তখন সে তার বাবাকে বল্ল, 'বাবা, আমি দেশভ্রমণে যাব।' তার বাবা খুশি মনেই রাজী হলেন।

ছেলের বিদেশে যাতে কোন কষ্ট না হয়, তার জন্য তিনি সঙ্গে প্রচুর জিনিসপত্র, লোকলস্কর ও ধনরত্ন দিয়ে দিলেন। শাহজাদা ফাদাল্লা বিখ্যাত শহর বাগদাদের দিকে রওনা হলেন। পথে নির্জন মরুভূমিতে একদল বেদুইন দস্যুর হাতে পড়ে সর্বস্বান্ত হলেন তিনি। দস্যুরা তাঁর সঙ্গের লোকজনকে মেরে ধনরত্ন সব ছিনিয়ে নিলে।

তারপর শাহজাদার পরণের পোষাক পর্যন্ত খুলে নিয়ে একটা ছেঁড়া ভিখিরীর পোষাক পরিয়ে ছেড়ে দিলে তাকে। বাদশার ছেলে পথের ভিখিরীর মত ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে বাগদাদ শহরে এসে পৌঁছলেন। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, কি আর করেন। ভিক্ষে না করে উপায় নেই, কিন্তু কেউ যদি চিনে ফেলে তাঁকে এই ভয়ে ভিক্ষেয় বেরুতেও সাহস পাচ্ছেন না। অবশেষে শহরের একপ্রান্তে মস্ত বড় একটি বাড়ির দরজায় এসে কিছু খেতে চাইলেন।

অমনি ঐ বাড়ির দাসী তাঁকে এনে দিলে কিছু রুটী ও মিষ্টি। সেই সময় হঠাৎ হাওয়ায় জানালার পর্দাটা সরে যেতে শাহজাদা অবাক হয়ে দেখলেন একটী গোলাপের মত সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে আবার পর্দার আড়ালে চলে গেল সেই মেয়েটী।

কিন্তু ফাদাল্লা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, যদি হাওয়ায় পর্দাটা আর একবার সরে যায় এবং মেয়েটীকে দেখা যায় সেই আশায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, আর দেখা গেল না তাকে। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখন তিনি একজন পথিককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন এই বাড়ির মালিক শহরের নগরপাল।

হতাশ ও ক্লান্ত ফাদাল্লা শহরের অন্য ধারে একটা ভাঙ্গা মস্‌জিদে গিয়ে রাতের মত আশ্রয় নিলেন। অনেক রাতে হৈচৈ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখেন একদল লোক চুরি করে চোরাই মাল নিয়ে এসে ওখানে বসে মহা ফুর্তিতে খাওয়া দাওয়া করছে।

ফাদাল্লাকে দেখে তারা বললে, 'কে রে তুই ?'

ফাদাল্লা বললেন, 'আমি একজন ভিখিরী।' শুনে তারা খুব খুশি, বললে, 'ঠিক আছে, আমাদের দলে আয়।'

অগত্যা তাদের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করছেন এমন সময় একদল পাহারাওয়ালা এসে দলবল-সুদ্ধ ফাদাল্লাকে বেঁধে নিয়ে চলল কাজীর কাছে বিচারের জন্য।

চোরগুলো তাদের দোষ স্বীকার করল, আর ফাদাল্লা তার সমস্ত ঘটনা খুলে বলল কাজীর কাছে, এমনকি সেই নগরপালের মেয়েটীর কথাও। শুধু গোপন রাখলে যে সে মৌশেলের বাদশার ছেলে। এদিকে কাজীর সঙ্গে নগরপালের ভীষণ শত্রুতা—তার ইচ্ছে ছিল ঐ পরমাসুন্দরী মেয়েটীকে বিয়ে করে। কিন্তু নগরপাল তাতে রাজী নয়। কাজীর মাথায় একটা কুবুদ্ধি খেলে গেল। সে ভাবলে এই ভিখিরীটার সঙ্গে যদি ঐ সুন্দরী মেয়েটীর বিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে নগরপালকে খুব জব্দ করা হয়।

সে খুব ভালমানুষ সেজে মেয়েটীর বাবাকে বললে, 'পুরণো কথা সব ভুলে যাও বন্ধু। এক দেশের

বাদশার ছেলে ছদ্মবেশে বাগদাদে বেড়াতে এসে তোমার মেয়েকে দেখে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে গেছে। সে এখন আমার অতিথি। তুমি যদি রাজি থাক, তবে আমি বিয়ের ব্যবস্থা করি।'
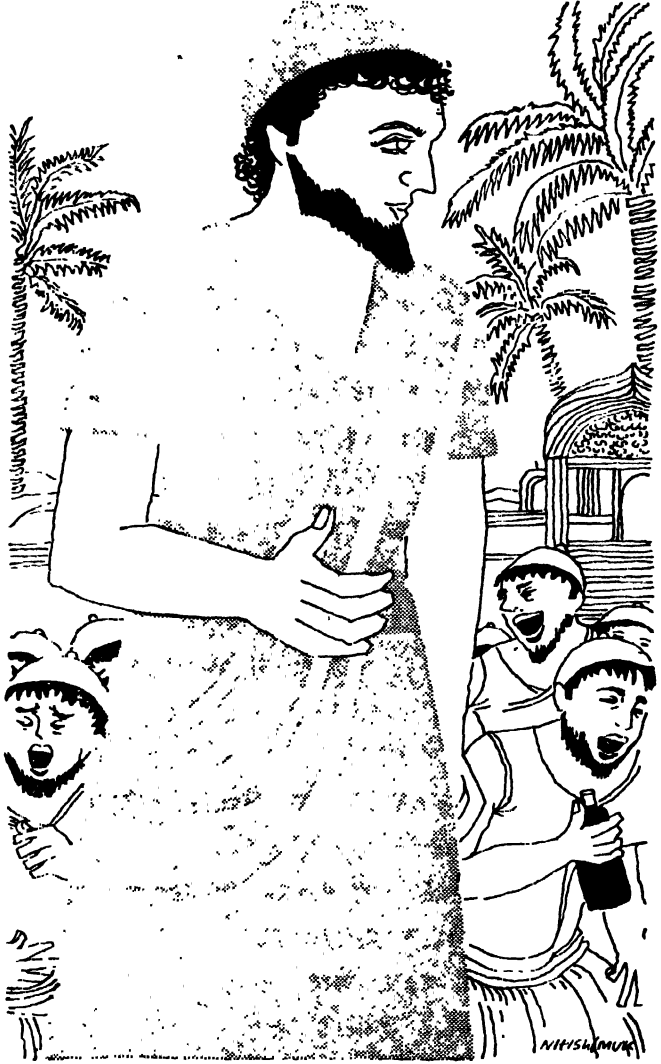
···চোরাই মাল নিয়ে এসে মহাফুর্তিতে খাওয়া দাওয়া করছে

নগরপাল কাজীর সঙ্গে তাঁর বাড়ি গিয়ে ফাদাল্লাকে দেখে ভারি খুশি। হবেই বা না কেন? শাহাজাদার চেহারা এমনিতেই সুন্দর, তার ওপর কাজীর দেওয়া বহুমূল্য পোষাকে তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল।

মহা ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। পরদিন দুষ্টবুদ্ধি কাজী করলে কি—ফাদাল্লার পরিত্যক্ত ভিখিরীর ছেঁড়া পোষাক নিয়ে নগরপালের বাড়ি এসে উপস্থিত, সব ফাঁস করে দেবে বলে। ফাদাল্লা তখন সকলের সামনে সব কথা খুলে বললেন এবং তার আসল পরিচয় দিলেন।

শুনে সকলের আনন্দের সীমা রইল না, কেবল হিংসুটে কাজী নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে নিজের মাথার চুল নিজেই টেনে ছিঁড়তে লাগল।

কিছুদিন বাগদাদে থাকার পর ফাদাল্লা সুন্দরী জামরুদকে নিয়ে মৌশেলে ফিরে গেলেন, রাজ্যে খুব ধুমধাম আনন্দ উৎসব হ'ল। বাদশা বেগম তো ছেলে বৌ পেয়ে খুশিতে ভরপুর।

কয়েক বছর পর বাদশা মারা গেলে ফাদাল্লা তাঁর সিংহাসনে বসলেন। তাঁর রাজত্বে প্রজারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে লাগল। তাঁর রাজসভায় একদিন এক দরবেশ এল। এই দরবেশ অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ফাদাল্লার সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে একদিন সে তাকে শিকারে নিয়ে গিয়ে বললে, 'আমি এমন একটা মন্ত্র জানি, যা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমি যে কোনো মৃতদেহে ঢুকে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি।'

ফাদাল্লা তো শুনে অবাক, তিনি তক্ষুণি এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখার জন্য অস্থির। শিকারে বেরিয়ে তাঁরা তখন একটা হরিণ মেরেছিলেন, গাছের তলায় হরিণটার প্রাণহীণ দেহ পড়েছিল। দরবেশকে বললেন, 'এই হরিণটাকে বাঁচাও দেখি।' দরবেশ তখুনি মন্ত্র বলে নিজ দেহ ছেড়ে হরিণের দেহে চলে গেল। মৃত হরিণটা সঙ্গে সঙ্গে চার পায়ে লাফিয়ে উঠল, আর দরবেশের দেহটা প্রাণহীন হ'য়ে পড়ে রইল।

আবার যখন সে তার নিজের দেহে ফিরে গেল, তখন বাদশা ঐ মন্ত্র শেখানোর জন্য দরবেশকে খুব অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। অবশেষে সে তাঁকে ঐ মন্ত্র শিখিয়ে দিল। পরীক্ষার জন্য ফাদাল্লা যেই মন্ত্র আউড়ে হরিণের দেহে চলে গেছেন, দুষ্টু দরবেশ এই সুযোগে তাড়াতাড়ি বাদশার মৃত শরীরে চলে গেল মন্ত্রবলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধনুক তুলে হরিণটাকে মেরে ফেলতে গেল, যাতে করে নির্বিঘ্নে বাদশা সেজে নিজে মৌশেলের সিংহাসনে বসতে পারে।

দরবেশের মতলব বুঝতে পেরে হরিণ তো প্রাণপণে ছুট—দরবেশের অনভ্যস্ত হাতের নিক্ষিপ্ত তীর তার গায়ে লাগল না। এদিকে বাদশাবেশী দরবেশ রাজ্যে ফিরে এসে পরমানন্দে রাজ্য ভোগ করতে লাগল। তবে তার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

বেগম জামরুদও দেখলেন শিকার থেকে ফিরে বাদশার মনটাই যেন বদলে গেছে—সেই সরল মহান ফাদাল্লা যেন নিষ্ঠুর ক্রুরবুদ্ধি এবং অত্যাচারী হয়ে ফিরে এসেছে। তিনি তো আর ভেতরের খবর জানেন না।

এদিকে জাল বাদশার মনে সর্বদা একটা ভয়, হরিণবেশী ফাদাল্লা কখন কি ভাবে তার উপর প্রতিশোধ নেয়, তার ঠিক কি ? সে হুকুম দিল রাজ্যে যত হরিণ আছে মেরে ফেলা হোক। চারিদিকে হরিণ মারার ধুম দেখে, ফাদাল্লা দেখলেন হরিণ হয়ে থাকলে তাঁর আর বাঁচার উপায় নেই। তাই একটা

কোকিলের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তার মধ্যে চলে গেলেন মন্ত্র বলে।

কোকিল হয়ে রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটা গাছে বসে গান গাইতে লাগলেন। বেগম জামরুদ পাখির গানে মুগ্ধ হয়ে সেটাকে ধরে আনার হুকুম দিলেন। পাখি তো ধরা পড়তেই চায়। সোনার খাঁচায় খুব যত্নে পাখিকে রেখে দেওয়া হ'ল। বেগম সাহেবা রোজ গান শোনেন পাখির—তার মনের কথা তো আর বুঝতে পারেন না। পাখির মধ্যে থেকে শাহাজাদা ভাবেন কি করে পাজী দরবেশটাকে জব্দ করা যায়।

একদিন দেখেন রাজবাড়ীর পাশেই একটা কুকুর মরে আছে। শাহাজাদা তখন করলেন কি, একটা ফন্দী এঁটে পাখির দেহ ছেড়ে কুকুরের শরীরের মধ্যে চলে গেলেন। পাখিটা তৎক্ষণাৎ মরে গেল।

বেগম সাহেবা তাঁর আদরের পাখির এই দশা দেখে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে কোনো মতে শান্ত করতে না পেরে শাহজাদারূপী দরবেশ তাঁকে খুশি করার জন্য বললে, 'আমি একটা মন্ত্র জানি, তাই দিয়ে রোজ কিছুক্ষণের জন্য পাখিটাকে আমি বাঁচিয়ে দেব, তুমি প্রাণ ভরে গান শুনো।'

এই বলে তখুনি পাখির দেহে নিজেকে চালিয়ে দিতেই, পাখিটা আবার বেঁচে উঠে গান করতে আরম্ভ করল। আর শাহাজাদার দেহটা পড়ে রইল মৃত অবস্থায়। বেগম জামরুদ খুসি হয়ে গান শুনতে লাগলেন।

এদিকে পাশেই কুকুররূপী শাহজাদা অপেক্ষা করছিলেন, তিনি কি আর এ সুযোগ ছাড়েন? তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর নিজের শরীরে চলে এলেন, আর উঠে দাঁড়িয়েই, আর দেরী নয়, কেউ কিছু বুঝবার আগেই পাখিটার ঘাড় দিলেন মটকে।

জামরুদ, 'আহা, কর কি, কর কি' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। তৎক্ষণ ফাদাল্লা তাঁকে পাজী দরবেশের সমস্ত কীর্তি কাহিনী খুলে বললেন। কেমন করে তার পাল্লায় পড়ে হরিণ থেকে পাখি, পাখি থেকে কুকুর এবং শেষ কালে কুকুর থেকে নিজের দেহে ফিরে আসতে পেরেছেন তা' শুনে জামরুদ পাখির শোক ভুললেন এবং দুজনে মিলে পরম সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন!

প্রকাণ্ড প্রমাদ

সুবিনয় রায়

প্রফেসার আত্মম্ভরী ঘোষকে চেন তো? তিনি হলেন ডাক্তার ঢক্কানিনাদ ঘোষের মেজ ছেলে। বড় ছেলে উগ্রচণ্ডী ঘোষ হরিহরপুর কলেজের ফিলসফির প্রফেসার।

আত্মম্ভরীবাবুও হরিহরপুর কলেজের ইতিহাসের প্রফেসার বটে, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে তাঁর নিজের ল্যাবরেটরিতে (বা পরীক্ষাগারে)। সেই অদ্ভুত ল্যাবরেটরি সম্বন্ধে লোকে খুব অল্প কথাই জানে। তাঁর অ্যাসিস্টাণ্ট (বা সাহায্যকারী) শমনদমন সিংহও মিশুক লোক নন্;—আর মিশুক হলেই বা কি? তাঁরও তো অধিকাংশ সময় ল্যাবরেটরিতে কাটে।

সে দিন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সরস সমাচার'-এর সহকারী সম্পাদক সত্যসখা সরকার আত্মম্ভরী বাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন; তা' থেকে দু'চার কথা জানা যায়।

প্রবন্ধের নাম 'আত্মম্ভরীর আত্মকথা'। তাতে লেখা আছে কেমন করে ছেলেবেলায় এক দিন সন্ধ্যায় রাস্তার ধারে বেড়াল-ধরা-কলের এক্সপেরিমেণ্ট (বা পরীক্ষা) করতে গিয়ে কলের ফাঁদের তার এক বেজায় মোটা ভদ্রলোকের পায়ে আটকে গিয়ে ভদ্রলোক হোঁচট খেয়ে একটা টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খান। টেবিলের উপর ছিল একটা রঙের গামলা। সেই রঙ ছিট্‌কে গিয়ে ধাবধাবাপুরের জমিদার মশাইএর গায়ে লাগে; তিনি তখন মোটরে চড়ে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছিলেন। জমিদার মশায়ের শালে, মুখে, হাতে রঙের ছিটা তো লাগলই, নূতন হলদে মোটরে রঙের ছিটা লেগে অনেকটা চিতাবাঘের মত হয়ে গেল। সঙ্গের বরকন্দাজ আর মোটর ড্রাইভারের গায়ে আর মুখেও রঙের ছিটা লাগল।

আর যাবে কোথায়। মোটা ভদ্রলোক, জমিদার মশায়ের ড্রাইভার আর বরকন্দাজ এবং জমিদার মশাই স্বয়ং 'ধর, ধর' করে বালক আত্মম্ভরীকে তাড়া কর্‌লেন। সেও দমবার পাত্র নয়। গম্ভীর ভাবে একটা মোটা হলদে পিচ্‌কারি হাতে তুলে নিয়ে 'ফী—ই—ই—ই—চ্' 'ফী—ই—ই—ই—চ্' করে একবার মোটা ভদ্রলোক, বরকন্দাজ, ড্রাইভার আর জমিদারমশাইএর নাকে কি একটা ধোঁয়ার মতন জিনিস ছেড়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে চারজনেই 'হ্যাঁ—চ্চোঃ' করে ঘন ঘন গভীর হাঁচির চোটে অস্থির হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। ততক্ষণে আত্মম্ভরী অদৃশ্য।

রাস্তার লোকে সে দৃশ্য দেখে এত জোরে হেসেছিল যে থানা থেকে এক দল পুলিশ লাঠি হাতে ছুটে দেখতে এল এত হল্লা কিসের।

জমিদার মশাই, মোটা ভদ্রলোক প্রভৃতি মানে মানে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লেন। বেড়াল-ধরা কলটা পুলিশ থানায় নিয়ে গেল, কিন্তু মালিকের বিরুদ্ধে থানায় কেউ কোনও ডায়েরি

করায় নি বলে পরে সেটা মালিককে ফেরত দেওয়া হল। বালক আত্মম্ভরী বাড়ি গিয়ে অমনি তার নোট বইএ লিখে রাখলেন ;

'(১) মার্জারধরক যন্ত্র'—পরীক্ষায় চমৎকার উৎরেছে। যত বড় বেড়ালই হোক্ না কেন, ঠিক ধরা যাবে। মোটা বাবুর ওজন তিন মণের কম হবে না।

(২) 'হাঁচল'—এও খুব ভাল উৎরেছে। এক ঝলকায় ২০।২৫ হাঁচি নির্ঘাত ;—মোটা বাবুর ৩৪টা হাঁচি হয়েছিল। গোলমরিচের গুঁড়ো আর মাদ্রাজী কড়া নস্য আর একটু বেশী মিশালে ভাল হয়।'

১৪ বছর বয়স থেকে এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ হয়। এম-এ পাশ করে আত্মম্ভরী বাবু প্রফেসার হন! তখন আরও উঁচুদরের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে কিন্তু তিনি একদিনও এক্সপেরিমেণ্ট ছাড়েন নি।

আজকাল নাকি তিনি নানা রকমের রাসায়নিক পরীক্ষা করে বহু আশ্চর্য ওষুধ আবিষ্কার করছেন। তার দুচারটির বিষয় 'সরস সমাচার' যা লিখেছে নিচে তুলে দিলাম :—

(১) টেঁকুরল—এই তরল পদার্থ অদ্ভুত ফলপ্রদ। পর্ণকুটিরবাসী দরিদ্রও ইহার এক ফোঁটা মাত্র সেবনে কালিয়া, কোর্মা, পোলাও প্রভৃতির টেঁকুর অনায়াসে তুলিতে পারিবে।

(২) 'বুদ্ধীন'—ইহার সাহায্যে বোকাও অচিরাৎ বুদ্ধিমান হইয়া যাইবে। ঔষধ ঠিক স্থান কাল-পাত্রে না পড়িলে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হইবে।

(৩) 'ডাকল'—নিদ্রাকালে যাহাদের নাক ডাকে না, ইহার এক ফোঁটা মাত্র নাসিকায় ঢালিয়া দিলে বহু দূর হইতে তাহাদের নাসিকা-গর্জন শুনা যাইবে। সামান্য বেশী মাত্রায় ঘন ঘন গভীর হাঁচির সম্ভাবনা।

(৪) 'মশকারি'—নামটি 'মশকারি' বটে কিন্তু ইহাকে 'সর্বারি' বলা যাইতে পারে। গায়ে মাখিয়া শুইলে ইহার অত্যুগ্র গন্ধে মশা, মাছি, ছারপোকা, বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছি এমন কি মানুষ এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না। গন্ধ বহুকাল স্থায়ী।'

প্রবন্ধের শেষে 'সরস সমাচার' লিখেছে 'প্রণম্য প্রশান্তপ্রকৃতি প্রফেসারের প্রত্যেক প্রচেষ্টায় প্রতিভাত প্রদীপ্ত প্রভাত প্রভাংশু-প্রতিম প্রভূত প্রতিভা প্রকৃষ্ট-প্রকারে প্রকট।'

আজকাল নাকি প্রফেসার ঘোষ 'বিষে বিষক্ষয়' বিষয়ে পরীক্ষায় লেগেছেন। ড্রেনের দুর্গন্ধ দূর করবার জন্য তিনি নানা রকম উৎকট দুর্গন্ধ জিনিস ড্রেনের মধ্যে ঢেলে পরীক্ষা করেছেন 'দুর্গন্ধে দুর্গন্ধক্ষয়' (অথবা তাঁর ভাষায় 'গ্যাসে—গ্যাসক্ষয়') হয় কিনা। এর জন্য তিনি পচা চিংড়ির আরক, ছুঁচোর আরক, গাঁধি পোকার আরক, গাঁদালের আরক, মুলো-পচার আরক, বাঁশ-পচানো জলের আরক প্রভৃতি ১৯ রকমের উৎকট দুর্গন্ধি জিনিস তৈয়ারী করেছেন। পাড়ার লোকের জ্বালায় তাঁকে বাড়ি ছেড়ে গ্রামে মাঠের মাঝখানে গাছের তলায় বাড়ি তৈয়ারী করে ল্যাবরেটরি বসাতে হয়েছে—দুর্গন্ধে নাকি পাড়ার লোকে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সেখানেও তাঁকে অতি সাবধানে জানলা দরজা এঁটে

কাজ করতে হয়। ঐ উৎকট দুর্গন্ধের মধ্যে তাঁরা কি করে কাজ করেন কেউ কখনও দেখেনি, কারণ কারও এত উৎসাহ নাই যে সেখানে দুর্গন্ধের মধ্যে গিয়ে দেখে আসে। শুনেছি তাঁরা নাকি একরকম গ্যাস-মুখোস ব্যবহার করেন।—

* * *

হরিহরপুরে আজ হৈ হৈ কাণ্ড। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বাবু বিপদবারণ বসু বিজ্ঞাপনে বহু বার বলেছেন সহজে সহরের ড্রেনের দুর্গন্ধ দূরের উপযুক্ত উপায় যিনি আবিষ্কার করবেন তাঁকে ১০০০৲ পুরস্কার দেওয়া হবে। আজ প্রফেসার আত্মম্ভরী ঘোষ মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা ও কর্মচারীদের কাছে তাঁর আধুনিক আশ্চর্য আবিষ্কার 'দুর্গন্ধীন' পরীক্ষা করে দেখিয়ে দেবেন। দারুন-দুর্গন্ধওয়ালা ড্রেনে দুই ফোঁটা 'দুর্গন্ধীন' দিলে দুই সেকেণ্ডে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে।

গোলাপবাগান গলির ড্রেনের গন্ধ সব চেয়ে বেশী; সেখানেই সকালে কর্তারা কাপড়ে নাক ঢেকে ড্রেনের চারি দিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন—এখনই আত্মম্ভরী বাবু শমনদমন বাবুকে দিয়ে 'দুর্গন্ধীন' -এর আশ্চর্য গুণ পরীক্ষা করে দেখাতে আসবেন।

বেলা তখন ঠিক ৮টা—ভঁ—অঁ—অঁ—প্ করে মোটর হর্নের আওয়াজ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার ঘোষ আর সিংহ মশাই এসে হাজির হলেন।

যথারীতি আদর সম্ভাষণ প্রভৃতির পর মোটর থেকে দুটি কাঠের বাক্স নামানো হল। তার একটির মধ্যে একটি তুলো ভরা কাঠের বাক্স, তার মধ্যে ছোট একটি কৌটা তার মধ্যে তুলোয় ঘেরা একটি ছোট্ট শিশি। সেই শিশির আবার কাঁচের ছিপির উপর একটি কাঁচের ঢাকনি লাগানো; ঢাকনির চারি পাশ আবার গালা দিয়ে বেশ করে আঁটা। এত কাণ্ড করে মাত্র ১০ ফোঁটা 'দুর্গন্ধীন' আনা হয়েছে, কারণ, এক ফোঁটাই নাকি 'দারুণ—est' দুর্গন্ধ দূর করার পক্ষে যথেষ্ট।

এবার পরীক্ষা আরম্ভ হবে। বিপদবারণ বাবু এবং অন্যান্য সকলে একবার নাকের কাপড় খুলে মুহূর্তের জন্য ড্রেনের গন্ধটা শুঁকে গন্ধের গভীরতা আর উৎকটতা অনুভব করে নিলেন।

তার পর প্রফেসার ঘোষের মোটর থেকে যে বাক্সটি নামানো হয়েছিল তার মধ্যে থেকে কয়েকটি অদ্ভুত মুখোস গোছের যন্ত্র বের করা হল। সেগুলো নাকি 'Gas-mask' (অর্থাৎ গ্যাস্ থেকে আত্মরক্ষার মুখোস)। প্রত্যেকের মুখে এক একটি মুখোস পরিয়ে দিয়ে প্রফেসার ঘোষ বললেন। 'এবার আপনারা একটু সরে দাঁড়ান। আমি শিশির ছিপি খুলব।'—বলেই তিনি আর সিংহ মশাই এক-একটি মুখোস পরে নিলেন।

এবার শিশির ছিপি খুলে ড্রেনের মধ্যে ফোঁটা ঢালবার পালা। প্রফেসার ঘোষ আস্তে আস্তে ছিপির উপরের ঢাকনির গালা চেঁছে ফেলে দিয়ে ঢাকনি খুলে শিশিটাকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে ধরলেন। সিংহমশাই ছিপি খুলবার জন্য প্রস্তুত হলেন। হাত দিয়ে ধরে ছিপি খুলবার রীতিমত চেষ্টা করলেন— কিছুতেই কিছু হল না। তখন একটা মোটা চিমটে দিয়ে ধরে কাঁচের ছিপিতে এক পাক দেওয়া হল। অমনি শিশির গলাটি ভেঙ্গে ছিপিশুদ্ধ গলা সিংহ মশায়ের হাতে উঠে এল আর শিশির ভিতর থেকে

দারুণ গ্যাস্ ভুস্—ভুস করে বের হতে লাগল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত সকলেই শিশির দিকে চেয়ে ছিলেন। তার পর যখন 'দুর্গন্ধীন' এর দারুণ দুর্গন্ধ সেই মুখোস ভেদ করেও তাঁদের নাকে অল্প অল্প যেতে আরম্ভ করল তখন সকলেই আত্মমর্যাদা ভুলে সেই মুখোস পরেই চোঁচা দৌড় দিয়েছেন—শিশিটি রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

এর পর যা ঘটেছিল তা আর বেশী বলে কাজ নেই। সে পাড়ার সব বাড়ি দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল। আশ পাশের গাছপালা থেকে ফুল-ফল ঝরে পড়ে গেল। কাক, চিল, চড়াই সব উড়ে পালিয়ে গেল। ঘরের বেড়াল, ইঁদুর ছুঁচো, আরশুলা, মাছি, মশা, সব পালিয়ে গেল। যে সব ছাগল, গরু আশে পাশে বাঁধা ছিল তারা পালাতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেল। লোকের আর সেদিন দুর্গন্ধে খাওয়া হয় নি। মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে মুখোস পরে এসিড ঢেলে আলকাতরা ঢেলে আগুন ধরিয়ে শিশি শুদ্ধ জ্বালিয়ে শেষ করে তবে পাড়ার লোক রক্ষা পেল।

প্রফেসার ঘোষ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সেই রাত্রেই হরিহরপুর ছেড়ে কোথায় জানি চলে গেলেন—অনেকে বলে তিনি বিলাত গেছেন। শমনদমন বাবু আফগানিস্থানে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। 'সরস সমাচার' লিখল: 'দুর্গন্ধ-দূরের দুরাশায় দারুণ 'দুর্গন্ধীন' প্রয়োগের প্রচেষ্টায় প্রথমেই প্রকাণ্ড প্রমাদ।'

হেইয়া চাষ করছিল। আশে-পাশে কেউ নেই! অদূরে বেশ ঘন ঝোপ। ঝোপটা পেরিয়েই একটা জলা। তারপর বন। অপর দিকে খোলা মাঠ। চাষের ক্ষেত, কোনটা 'আমকেষ্ট'র কোনটা আবিছল্লার, কোনটা বা এই হেইয়ার।

সোনালি মাছ

এক
আছে মাছ
সোনালি রং সে,
সুখে থাকে খুশি মনে
আমার ছোট ঘরের কোনে
সাঁতরে বেড়ায় মনের সুখেতে ॥
খেলা ঘরে বন্দী থাকে মাছ
সামনে রঙীন কাঁচ।
ভরা চোখে চেয়ে
মুখোমুখি
দেখি,

দেখি
কেমনে
খুশি মনে
একলা খেলে
সোনা-ঝরা
পাখনা
মেলে।

মায়ের মন।

'না
তুই
যাস নি,
সেই খানে
বনের ধারে,
বিটলে শেয়াল—
এক এসেছে কাল
খেয়ে নেবে একেবারে!'
ছাগল ছানাকে তার মা
অনেক বার করলো মানা।
মায়ের চোখে ঘুম নামে যেই,
ছাগল ছানা তো আর নেই,
গান ধরে আপন মনে,
চললো দূরের বনে।
আর ফেরেনি হায়!
দিন কেটে যায়
আজও বনে
এক মনে,
তার মা
খোঁজে
রে!

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

চিঠি-পত্র

এবার চিঠিপত্রের উত্তর দেবার আগে, সাধারণভাবে কয়েকটি কথা না বলে পারলাম না। আমাদের কিশোর গ্রাহক-গ্রাহিকার জন্য এ বিভাগটি খোলা হয়েছে, কিন্তু কিছুদিন থেকে এমন কতকগুলো চিঠি মাঝে মাঝেই পাচ্ছি যেগুলোর পাকা বুড়োর মতো মতামত কোনো কিশোর গ্রাহক-গ্রাহিকার উপযুক্ত নয়।

তাছাড়া সকলেই জানে কোনো কিছু লিখে পাঠাবার সময়, সঙ্গে বয়স ও গ্রাহক সংখ্যা দুই-ই দিতে হয়। আমার কাছে এক তাড়া চিঠি জমে গেছে, যাতে বয়স দেওয়া নেই বলে উত্তর দেওয়া গেল না। কিন্তু মাঝে মাঝে একেকটা চিঠি আসে যার বিষয়ে কিছু বলা খুবই উচিত। যেমন সলিলকুমার দাস, গ্রাহক নং ৭৭৮, দু'পাতা হাতে লেখা চিঠি, তাতে সাত আটটা বানান ভুল, যাঁদের লেখা নিয়মিত বেরোচ্ছে তাঁদের লেখা কেন বেরোচ্ছে না বলে অনুযোগ, ইত্যাদি দায়িত্বশূন্য কথা।

আরেকটি কথাও এখানে বলে রাখি। সন্দেশের বেশির ভাগ লেখাই ৮ থেকে ১৫ বছরের পাঠকদের মনে করে, কিছু কিছু থাকে আরো ছোটদের জন্যে। কিন্তু সেগুলিকে আলাদা করে দেওয়া হয় না এইজন্য যে পাঠকরা নিজেরা পত্রিকাটাকে উল্টেপাল্টে মনের মতো জিনিস খুঁজে নেবে এইটুকু আমরা আশাকরি।

পত্রবন্ধু সম্বন্ধেও কিছু বলা উচিত। ঠিকানা আমরা ইচ্ছা করেই দিই না, গ্রাহক সংখ্যা ও নাম দিয়ে, সম্পাদক মহাশয়ের হেপাজতে চিঠি দিও, আমরা যথাস্থানে পাঠিয়ে দেব।

পত্রবন্ধু চাই। শ্রাবণী দাশগুপ্তা, এন্ ৯৪৬, বয়স ১৫, শখ ডাকটিকিট জমানো, বই পড়া, াজনা।

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে অবরুদ্ধ রিচমণ্ড সহর হইতে বেলুনে চড়িয়া পলায়ন করিতে গিয়া পাঁচটি অসম-সাহসী ব্যক্তি একবস্ত্রে ও রিক্তহস্তে এক নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হন।

সমস্ত কাজই ইঁহাদিগকে গোড়া হইতে সুরু করিতে হইল। দারুণ পরিশ্রম করিয়া ও বুদ্ধি খাটাইয়া ইহারা মাটির বাসন, ইঁট, লোহা, স্টিল ইত্যাদি তৈরি করিলেন। গ্র্যানিট পাথরের গহ্বরে চমৎকার বাসস্থান হইল দড়ির মই ঝুলাইয়া আসা-যাওয়ার পথ হইল।

এইরূপে ক্রমে ইহাদের বহু অভাব পূর্ণ হইল কিন্তু কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিতে লাগিল যাহার কোনও মীমাংসা হইল না।

একটি শূকরের বাচ্চার দেহে বন্দুকের গুলী পাওয়া গেল। একটি বন্দী কচ্ছপ রহস্যজনক-ভাবে মুক্তি পাইল। অথচ দ্বীপে কোনও জনমানুষের চিহ্ন পাওয়া গেল না। বালির মধ্যে, দুইটি পিঁপার সঙ্গে বাঁধা একটি সিন্দুক তাঁহারা পাইলেন। সিন্দুকটি পোষাক, বই, অস্ত্র, যন্ত্র ইত্যাদি মূল্যবান জিনিসে ভর্তি। জিনিসগুলি সবই নূতন, কিন্তু তাহাতে কোনও নির্মাতার নাম নাই। ইহা বড়ই অদ্ভুত কথা!

হয় তো কোনও ডুবন্ত জাহাজ হইতে সিন্দুকটি ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু জাহাজডুবির আর কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না।

সকলে স্থির করিলেন যে সাবধানে থাকিতে হইবে এবং সমস্ত দ্বীপটি ভাল ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। পেন্‌ক্রফ্‌ট্‌ একটি ক্যানো প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

ক্যানো প্রস্তুত হইলে পরে তাঁহারা তাহাতে চড়িয়া নদী-পথে দ্বীপের চারিদিকে ঘুরিতে বাহির হইলেন।

নদীর ধারে নানারকম শাকসব্জী ও গাছপালা পাওয়া গেল। সমস্তদিন ক্যানো চালাইবার পর রাত্রে নদীর ঝরনার কাছাকাছি আসিয়া নৌকার তলা আটকাইয়া গেল। তাঁহারা সেইখানে রাত্রিযাপন করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

৩১এ অক্টোবর, প্রাতে ছয়টার সময় তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া সকলে আবার রওয়ানা হইলেন। সমুদ্রতীরে পৌঁছিতে কতক্ষণ লাগিবে? হার্ডিং বলিয়াছিলেন সমুদ্র-তীর ঘণ্টা দুই একের পথ। কিন্তু সেটা নির্ভর করে কিরূপে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহার উপরে। সম্ভবত ঘাস লতাপাতা কাটিয়া পথ করিতে হইবে। সেজন্য যাত্রীদল হাতে কুড়াল লইয়া চলিলেন। বন্দুকও সঙ্গে লওয়া হইল। রাত্রে যখন হিংস্র জন্তুর ডাক শুনা গিয়াছে তখন সাবধান হওয়া ভালো। নেব ও পেনক্রফ্‌ট দুই দিনের মত খাদ্য সঙ্গে করিয়া লইল। হার্ডিং সকলকে বন্দুক ছুঁড়িতে বারণ করিয়া দিলেন। সমুদ্র-তীরের নিকট কোন লোক থাকিলে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া তাঁহাদিগের আগমনবার্তা জানিতে পারিবে।

উঁচু নিচু ঢালু জমি পার হইয়া সকলে শুষ্ক উর্বর জমিতে পৌঁছিলেন। এখানকার মাটি দেখিয়া মনে হইল মাটির নীচে ঝরনা কিংবা জলাভূমি থাকার দরুণ জমি বেশ উর্বর হইয়াছে। কিন্তু মার্সিনদী এবং রেড ক্রীক ছাড়া সেখানে অন্য কোন নদীর অস্তিত্ব ছিল না। পথে আবার অনেকগুলি বানর দেখিতে পাওয়া গেল। মানুষ দেখিয়া তাহারা ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল, যেন পূর্বে এরূপ জীব আর কখনো দেখে নাই। দলে বানর অসংখ্য কিন্তু তাহাদের মেজাজ ঠাণ্ডা, কাহারও মনে অনিষ্ট করিবার কোন ইচ্ছা দেখা গেল না!

বেলা সাড়ে নয়টার সময় পথে একটি বাধা আসিয়া উপস্থিত। সমুখে নূতন একটি ঝরনা, প্রায় ৩০/৪০ ফুট চওড়া আর তাহাতে ভীষণ স্রোত! এখন উপায় কি? এই ঝরণা পার না হইলে ত সমুদ্রতীরে যাওয়া যাইবে না।

হার্ডিং বলিলেন—'কোন চিন্তা নাই। এই ঝরনা নিশ্চয়ই সমুদ্র গিয়ে পড়েছে। এটার তীর ধরে গেলেই সমুদ্র-তীরে গিয়ে উপস্থিত হতে পারব।'

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করুন, আমি দুপুরের খাদ্যের একটু ব্যবস্থা করে নি।' বলিয়াই সে ঝরনার ধারে উপুড় হইয়া পড়িয়া হাত জলে ঢুকাইয়া দিল। পরমুহূর্তে দেখা গেল, সে বড় বড় কতকগুলি চিংড়ি মাছ তুলিয়া আনিয়াছে! নেব ত আহ্লাদে গলিয়া গেল। কিন্তু পেনক্রফ্‌ট দুঃখ করিয়া বলিল—'হায়রে! লিঙ্কন্ দ্বীপে অন্য সবই আছে, নাই শুধু তামাক!'

মাছ ধরিতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগিল না। ইহার মধ্যে পেনক্রফ্‌ট চিংড়ি মাছ দিয়া একটা থলি ভর্তি করিয়া ফেলিল। তারপর সকলে আবার রওনা হইলেন। বনের মধ্য দিয়া চলিতে কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু ঝরনার পাড় ধরিয়া চলিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। স্থানে স্থানে বড় জন্তুর পায়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল—ঝরনার জল খাইতে আসিয়াছে।

ঝরনার দুই ধারেই বন, তাহাতে বড় বড় গাছও আছে, সুতরাং বেশি দূরে কিছু দেখিবার উপায় নাই। বনের মধ্যে, অন্তত ঝরনার আশে পাশে, কোন জন্তু আছে বলিয়া মনে হইল না। থাকিলে টপ নিশ্চয়ই চেঁচামেচি করিয়া তাহাদের অস্তিত্বের সংবাদ দিত।

বেলা প্রায় দশটার সময় হারবার্ট হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল—'সমুদ্র! সমুদ্র!' শুনিয়া হার্ডিং একটু আশ্চর্য হইলেন বটে, কিন্তু খানিক অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন—সুমুখে সত্য সত্যই সমুদ্রের পশ্চিম তীর বিস্তৃত রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব তীরের সঙ্গে পশ্চিম তীরটির কোন সাদৃশ্য নাই। পাহাড়, পর্বত, বালি—কিছুই সেখানে নাই। বনটাই সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত আসিয়াছে, উঁচু গাছগুলি একেবারে জলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছে—দেখা যায়, যেন সমুদ্র তীরে গাছ-বনের একটা খুব উঁচু বর্ডার দেওয়া। ঝরনার জল এখানে আসিয়া প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু হইতে হু হু শব্দে সমুদ্রের জলে পড়িতেছে! এই ঝরনাটির নাম দেওয়া হইল 'ফল্‌স রিভার'। তীরের এই বন-জঙ্গলের বর্ডারটি প্রায় দুই মাইল পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তারপর ক্রমেই গাছপালা কমিয়া গিয়া, শেষে তীরটি দাঁড়াইয়াছে—যেন সোজা একটা লাইনের মত।

একটা উঁচু ঢিবির উপরে পেনক্রফ্‌ট্ ও নেব রান্না করিল। সেখান হইতে চারিদিক অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। দৃষ্টি যতদূর চলে তাহার মধ্যে কোন জাহাজ কিংবা অন্য কোন চিহ্ন টিহ্ন কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু সাইরাস হার্ডিং সমস্তটা পশ্চিম দিক—অর্থাৎ গোটা সার্পেনটাইন পেনিনসুলাটা নিজে তন্ন তন্ন করিয়া না দেখা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন না।

আহারের পর প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় আবার যাত্রা আরম্ভ হইল! ফল্‌স্ রিভার হইতে সার্পেনটাইন পেনিনসুলার শেষ (রেপ্টাইলেণ্ড) পর্যন্ত বারমাইল পথ। পরিষ্কার সমান জমি হইলে, এই পথটুকু যাইতে চার ঘণ্টা লাগিত। কিন্তু এখন গাছপালা কাটিয়া পথ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে হইবে। সুতরাং দ্বিগুণ সময়ের দরকার।

সম্প্রতি কোন জাহাজ ডুবি হইয়াছে, এরূপ কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। স্পিলেট বলিলেন—'চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়নি বলেই যে জাহাজডুবি হয়নি, এ ধারণা ভুল। চিহ্ন টিহ্ন হয়ত সমুদ্রের জলে ভেসে চলে গিয়েছে।' স্পিলেট ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। শূকরের পেটে বন্দুকের গুলির কথাই প্রমাণ করিতেছে যে মাস তিনকের মধ্যে লিঙ্কন দ্বীপে কেহ না কেহ বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল।

বেলা পাঁচটা বাজিতে চলিল, তখনও দুই মাইল পথ বাকি আছে। সুতরাং গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া, আবার ক্যানোর কাছে ফিরিয়া আসা অসম্ভব। রেপ্টাইলেণ্ডেই রাত্রি কাটাইতে হইবে। বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নাই, সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্য আছে। প্রায় সাতটার সময় যাত্রীদল রেপ্টাইলেণ্ডে পৌঁছিলেন। এখানে সমুদ্রতীরের বনের শেষ। তারপর হইতে কেবল বালি, পাহাড়-পর্বত। হয়ত বা এখানে জাহাজডুবির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাত্রি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

পেনক্রফ্‌ট্ ও হারবার্ট একটা ভালো জায়গা খুঁজিতে বাহির হইল। বনের প্রান্তে একটা বাঁশের ঝাড় দেখিতে পাইয়া হারবার্ট মহা উল্লাসে বলিল, 'ভালই হলো, এই বাঁশে অনেক কাজ দিবে।'

পেনক্রফ্‌ট্ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাঁশে আবার কী কাজ দেয়?'

হারবার্ট বলিল, 'বাঁশের পাতলা চটা বানিয়ে সুন্দর বাস্কেট তৈরি করা যায়। বাঁশের ফাঁপা চোঙ্গা দিয়ে জলের পাইপ করা যায়। বাড়ি ঘর তৈরি করতেও বাঁশ খুব কাজে লাগে। বেশ হালকা মজবুত আর তাতে সহজে পোকা ধরে না। আর শুনেছি ভারতবর্ষে নাকি এই বাঁশের নরম কুঁড়ি খায়—আমাদের দেশে যেমন য়্যাস পারেগ্যাস্ খায়, তেমনি বাঁশের কোঁড়ও খেতে খুব চমৎকার।'

রাত্রের বাসস্থান বেশীক্ষণ খুঁজিতে হইল না। তীরের পাহাড়ে ঢেউ-এর আঘাতে অনেকগুলি গহ্বরের মত হইয়াছিল। তাহারই একটা বড় রকমের গহ্বর দেখিয়া, সবেমাত্র তাঁহারা ঢুকিতে যাইবেন—এমন

সময় গহ্বরের ভিতর একটা দারুণ গর্জন শোনা গেল। পেনক্রফ্‌ট্ হারবার্টকে একটানে পিছনের দিকে একটা বড় পাথরের আড়ালে আনিয়া বলিল—'আমাদের বন্দুকে ছোট গুলি ভরা আছে, গর্জনটা কোন সাংঘাতিক হিংস্র জন্তুর, এই ছোট গুলিতে তার কিছুই হবে না।' ঠিক এই সময় গহ্বরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা জন্তু আসিয়া উপস্থিত! জন্তুটা ক্রমে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার চক্ষু দুইটা আগুনের ডেলার মত জ্বলিতেছে। তখন দেখা গেল, জন্তুটা জাগুয়ার, এবং মনে হইল যেন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাহার এটা প্রথম নয়।

এই সময় স্পিলেটও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারবার্ট ভাবিল, তিনি হয়ত জাগুয়ারটাকে দেখিতে পান নাই, তাঁহকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। এই ভাবিয়া যেই হারবার্ট তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে যাইবে, অমনি তিনি হাত তুলিয়া তাঁহাকে বারণ করিলেন। পরমুহূর্তে স্পিলেটের বন্দুকের গুলি জাগুয়ারের চক্ষু দুটির মধ্যখানে গিয়া লাগিল। জাগুয়ারটা সবেমাত্র লাফ দিবার আয়োজন করিয়াছিল, এমন সময় স্পিলেটের গুলি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া তখনই মরিয়া গেল।

ততক্ষণে হার্ডিং নেব সকলেই আসিয়া উপস্থিত। চমৎকার জন্তুটি, ইহার চামড়া গ্র্যানিট হাউসে লইয়া যাইতে হইবে।

স্পিলেট বলিলেন, 'আপদ দূর হয়েছে, এখন আমরা নিরাপদে এই গহ্বরে রাতটা কাটাতে পারব।'

পেনক্রফ্‌ট্ বলিল—'বাইরে থেকে অন্য জাগুয়ার যদি এসে হাজির হয়?' ইহার ব্যবস্থাও স্থির করা হইল। গহ্বরের মুখে প্রকাণ্ড কাঠের ধুনি জ্বালিয়া রাখিলেই বাহির হইতে কোন জন্তুর আক্রমণের ভয় থাকিবে না।

জাগুয়ারের দেহটা গহ্বরের ভিতর লইয়া নেব সেটার চামড়া ছাড়াইতে লাগিয়া গেল। অন্যেরা রাশি রাশি শুক্‌না কাঠ আনিয়া গহ্বরের মুখে জড় করিলেন। হার্ডিং কতকগুলো শুক্‌নো বাঁশের টুক্‌রা কাটিয়া সেই কাঠের সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন।

এইরূপ ব্যবস্থার পর সকলে গহ্বরের ভিতরে গেলেন। গহ্বরের মেঝেতে দেখা গেল, রাশি রাশি হাড় পড়িয়া রহিয়াছে—সেই সকল হাড় জাগুয়ার বাবাজীর দৈনিক আহারের উদ্বৃত্ত। সকলের বন্দুকে গুলি ভরিয়া রাখা হইল—রাত্রে যদি কোন জন্তু আক্রমণ করিতে আসে? আহারাদি শেষ হইলে, কাঠের স্তূপে আগুন ধরাইয়া সকলে শয়ন করিলেন। ক্রমে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে অনেক পর পর বাঁশের গাঁইট ভীষণ শব্দে ফুটিয় উঠিতেছে—সে শব্দ শুনিলে মহা হিংস্র জন্তুও ভয়ে পলায়ন করিবে।

এইরূপে বাঁশ ফুটাইয়া বন্য জন্তুর ভয় দেখাইবার কায়দাটি হার্ডিংই প্রথম বুদ্ধি করিয়া বাহির করিয়াছেন তাহা নহে। মার্কোপোলের ভ্রমণ বৃত্তান্তে লেখা আছে—মধ্য এশিয়ার তাতারেরা এইরূপ বাঁশ ফুটাইয়া তাহাদের তাঁবু হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জাগুয়ারের গহ্বরে আরামে ঘুমাইয়া যাত্রীদল রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সমুদ্রতীরে গিয়া চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুই দেখা গেল না। হার্ডিং টেলিস্কোপ লইয়া অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। তখন প্রশ্ন হইল—দ্বীপের দক্ষিণ দিক কখনও দেখা হয় নাই, সে কাজটি কি তখনই আরম্ভ করা হইবে?

গিডিয়ন স্পিলেট তখনই দক্ষিণ তীর অনুসন্ধান করিবার পক্ষে মত দিলেন। স্থানটি গ্র্যানিট হাউস হইতে চল্লিশ মাইল দূরে, কিন্তু তাহা হইলেও কাজটি এ যাত্রায়ই শেষ করিতে হইবে।

পেনক্রফ্‌ট্‌ বলিল—'তা বেশ কথা, কিন্তু আমাদের নৌকাটার কী ব্যবস্থা হবে?'

স্পিলেট বলিলেন, 'সেটা ত মার্সি নদীর উৎপত্তি স্থানে একদিন যাবৎ আছেই—না হয় একদিনের জায়গায় দুই দিনই রইল। দ্বীপে ত আর চোরের ভয় নেই?'

পেনক্রফ্‌ট্‌ বলিল, 'তাহলেও, কচ্ছপের ব্যাপারটার কথা যখন মনে পড়ে তখন ভরসাও বড় হয় না।'

স্পিলেট বলিলেন, 'কচ্ছপটাকে ত সমুদ্রে উল্টে দিয়েছিল।'

হার্ডিং বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'সমুদ্র উলটে দিয়েছিল না কি, তা কে বলতে পারে?'

নেব বলিল, 'আমরা যদি সমুদ্র তীর ধরে ক্ল-কেপে যাবার চেষ্টা করি, তাহলে পথে যে মার্সি নদী পড়বে, সেটা পার হবে কী করে?'

পেনক্রফ্‌ট্‌ বলিল, 'গোটা কয়েক গাছের গোড়া জলে ভাসিয়ে দিলেই পার হওয়া যাবে। সে কাজের ভার আমার উপর রইল, তার জন্যে ভাবনা হবে না। আমাদের সঙ্গে খাদ্য যথেষ্ট আছে, তাছাড়া পথেও শিকারের অভাব হবে না। সুতরাং এখনই রওনা হওয়া যাক।'

ক্ল-কেপ হইয়া গ্র্যানিট হাউসে ফিরিতে হইলে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ। আর দেরি করিলে চলিতে না। ইহাতেও গ্র্যানিট হাউসে পৌঁছিতে রাত্রি হইবে।

সকাল ছয়টার সময় যাত্রীদল রওয়ানা হইলেন। বন্দুকে গুলি পুরিয়া লওয়া হইল। টপ সকলের আগে—চলিতে চলিকে সে বনে ঢুকিয়া ছুটাছুটি না করিয়া ছাড়িল না।

উপদ্বীপের শেষ ভাগ হইতে সমুদ্রতীর গোল হইয়া প্রায় পাঁচ মাইল পর্যন্ত চলিয়াছে। এই স্থানটি দেখিতে দেখিতে যাত্রীদল পার হইলেন। সম্প্রতি এখানে কোন মানুষ যে তীরে আসিয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

পেনক্রফ্‌ট্‌ বলিল, 'এখানে দেখছি শুধু খাড়া খাড়া পাথর আর বালির পাড়। আমার মনে হয়—এখানে কোন জাহাজ এলে তার আর রক্ষা থাকবে না।'

স্পিলেট বলিলেন, 'জাহাজ এসে মারা গেলেও তার কিছু না কিছু চিহ্ন থেকে যাবে ত?'

পেনক্রফ্‌ট্‌ বলিল, 'চিহ্ন থাকলেও—ওই পাহাড়ে আর বালির মধ্যে তা পাওয়া যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, বালিতে যা পড়বে, দেখতে দেখতে সব চাপা পড়ে যাবে। খুব বড় জাহাজের মাস্তুলটাও এ বালিতে অল্প দিনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।'

বেলা একটার সময় যাত্রীদল কুড়ি মাইল পথ চলিয়া, ওয়াসিংটন উপসাগরের অন্য পারে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করা হইল।

আহার এবং বিশ্রামে আধ ঘণ্টা কাটাইয়া, সকলে আবার রওনা দিলেন। বিকালে প্রায় তিনটার সময় তাঁহারা একটা নির্জন জলাশয়ের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটি একটা স্বাভাবিক বন্দরের মত, সমুদ্র হইতে এটি দেখা যায় না। একটা খালের মত সমুদ্র হইতে আসিয়া এই জলাশয়ের সঙ্গে মিলিয়াছে। স্পিলেটের প্রস্তাব অনুসারে স্থির হইল এই বন্দরের ধারে বিশ্রাম ও জলযোগ করিতে হইবে। আয়োজন প্রচুর ছিল। এই জলযোগের পর একেবারে গ্র্যানিট হাউসে না পৌঁছান পর্যন্ত আর আহারের প্রয়োজন হইবে না।

এই স্থানটি সমুদ্র হইতে ৫০।৬০ ফুট উঁচু। এই উঁচু জায়গাটি হইতে অনেক দূরে পর্যন্ত সমুদ্র দেখা যায়। হার্ডিং টেলিস্কোপ লইয়া বিস্তর চেষ্টা করিলেন। কোন জাহাজ কিংবা জাহাজডুবির কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

স্পিলেট বলিলেন, 'আর কি! লিঙ্কন দ্বীপে এখন আমাদেরই পূর্ণ অধিকার, কোন দাবী দাওয়া করবার লোক আর কেউ আসবে না।'

হারবার্ট বলিল, 'কিন্তু বন্দুকের গুলি! সেটা ত আর কাল্পনিক নয়।'

গুলির কথা পেন্‌ক্রফ্‌ট্ কিছুতেই ভুলিতে পারে না, সেটায় তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়াছে। সুতরাং হারবার্টের কথার উত্তরে বলিল,—'পোড়া কপাল! বন্দুকের গুলি কাল্পনিক হতে যাবে কেন?'

স্পিলেট বলিলেন—'তাহলে কি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে?'

হার্ডিং বলিলেন —'এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, মাস তিনেক আগে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক—একটা জাহাজ এখানে এসেছিল।'

স্পিলেট বলিলেন—'তাহলে কি সে জাহাজটা কোন চিহ্ন না রেখে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে?'

'না—স্পিলেট, তা নয়। তবে এটা ঠিক যে কোন মানুষ এই দ্বীপে এসেছিল এবং এখন আর সে এখানে নাই।'

হারবার্ট বলিল—'তাহলে জাহাজটা আবার চলে গিয়েছে?'

হার্ডিং বলিলেন—'সে রকমই তো মনে হয়।'

এইসব কথাবার্তার পর সকলে উঠিতে যাইবেন, এমন সময় শুনিতে পাওয়া গেল টপ ভীষণ চেঁচামেচি করিতেছে। কেন? একটু পরেই কাদা মাখান একটা কাপড়ের টুকরা মুখে করিয়া টপ বন হইতে বাহির হইয়া আসিল।

নেব কাপড়ের টুকরাটি হাতে লইয়া দেখিল—খুব মজবুত একটা কাপড়ের টুকরা।

টপ তবু চিৎকার করিয়া আসা-যাওয়া করিতেছিল। তখন মনে হইল যেন তাহার সঙ্গে বনের দিকে যাইবার জন্য সকলকে ইঙ্গিত করিতেছে।

পেন্‌ক্রফ্‌ট্ বলিল—'এবারে বোধ করি গুলির মীমাংসা করবার জিনিস পাওয়া গেল।'

সকলে টপের পিছনে পিছনে ছুটিলেন—বনের ধারে উঁচু দেবদারু গাছ ছিল, সেই দিকে। মিনিট সাত আট পরে একটা খোলা জায়গায় গিয়া উপস্থিত, জায়গাটার চারিদিকে খুব উঁচু কতগুলি গাছ। অনেক সন্ধান করিয়াও কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না। টপ কিন্তু তবু চীৎকার করিতেছে, ক্রমে সে একটা উঁচু গাছের দিকে ছুটিয়া গেল।

এমন সময়ে পেন্‌ক্রফট হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল—'আরে খাসা! খাসা! জাহাজডুবির চিহ্ন খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রাণ হয়েছি। কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি—ঐ দেখ গাছের আগায় চিহ্ন ঝুলছে!'

তখন সকলে চাহিয়া দেখিলেন দেবদারু গাছের ডগায় খুব বড় একটা সাদা কাপড় ঝুলিতেছে। তাহারই একটা টুকরা মাটিতে পড়িয়াছিল এবং সেটাই টপ মুখে করিয়া আনিয়াছিল।

স্পিলেট বলিলেন—'এটা ত জাহাজডুবির জিনিস নয়—এটা যে'—

পেন্‌ক্রফট তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—'বুঝতে পেরেছি, এটা হচ্ছে আমাদের সেই বেলুনের অবশিষ্ট অংশ।'

ই বলিয়াই আনন্দে সে লাফাইতে লাগিল। তারপর আবার বলিল—'এখন আর ভাবনা কি! এই বেলুনের

কাপড়ে আমাদের অনেক বছরের পোষাক হবে। মিষ্টার স্পিলেট, দেখুন—আমাদের লিঙ্কন দ্বীপের গাছে জামার কাপড় জন্মায়!'

পেন্‌ক্রফটের আনন্দের সঙ্গে তখন সকলেই যোগ দিলেন। বাস্তবিক বড়ই সৌভাগ্যের কথা যে লিঙ্কন দ্বীপের গাছে বেলুনটা আটকাইয়া গিয়াছিল এবং দ্বীপবাসিগণ আবার সেটা খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

নেব, হারবার্ট ও পেনক্রফট গাছে চড়িয়া দুই ঘণ্টা পরিশ্রমের পর বেলুনটাকে নামাইয়া আনিল। শুধু বেলুনের আবরণটা নয়, তাহার চারিদিকের জালের ছিন্নভিন্ন দড়িগুলি, বেলুনের মুখের ঢাকাটি এবং লঙ্গরটি—সব শুদ্ধ আনিল। গোটা বেলুনটা আস্ত রহিয়াছে, শুধু তলার দিকে একটা অংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

পেন্‌ক্রফট বললি—'বেলুন আস্ত থাকুক বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকুক, তাতে কিছু এসে যাবে না—ভবিষ্যতে এ দ্বীপ ছেড়ে যেতে হলে বেলুনে চড়ে আর কিছুতেই যাওয়া হবে না, না ক্যাপ্‌টেন? যা হোক, এখন বেশ বড় করে নৌকা বানান যাবে, তাতে বেলুনের কাপড় দিয়ে খাসা পাল বানিয়ে দিতে পারব।'

এ সব বিষয় পরে চিন্তা করা যাবে। সম্প্রতি বেলুনটিকে একটা নিরাপদ স্থানে রাখা দরকার। এত বড় কাপড় ও দড়ি-দড়ার বোঝা গ্র্যানিট হাউসে বহিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তবু ঝড় হইবার পূর্বেই ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকলে মিলিয়া টানাটানি করিয়া বেলুনটাকে সমুদ্রতীরে লইষা গেলেন। সেখানে পাহাড়ের মধ্যে একটা সুন্দর গহ্বর পাওয়া গেল, ঝড়বৃষ্টির সময়ও সেটা নিরাপদ স্থান হইবে। এই গহ্বরে বেলুনটাকে যত্নপূর্বক রাখিয়া বেলা ছয়টার সময় সকলে আবার ক্লকেপের পথে চলিলেন। যাইবার পূর্বে ঐ স্থানটির নাম রাখা হইল 'বেলুন বন্দর।'

পথে যাইতে যাইতে নানা বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। যত শীঘ্র সম্ভব মার্সি নদীর উপর একটা পোল বানাইতে হইবে—যাহাতে দ্বীপের দক্ষিণ অংশে ইচ্ছা করিলেই যাওয়া যায়। তারপর বেলুনটাকে আনিবার জন্য ঠেলাগাড়ি লইয়া যাইতে হইবে—শুধু ক্যানোর সাহায্যে এ-কাজ অসম্ভব।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। 'ফ্লোটসাম্ পয়েন্ট', (যেখানে জাহাজডুবির সিন্দুক পাওয়া গিয়াছিল) পৌঁছাইতে একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। সেখান হইতে গ্র্যানিট হাউস আরও চার মাইল পথ। যাত্রীদল মার্সি নদীর তীর ধরিয়া চলিয়া, যখন তাহার মুখের কাছে প্রথম বাঁকটায় পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি প্রায় বারটা বাজিয়াছে। গ্র্যানিট হাউসে পৌঁছিয়া ক্লান্তি দূর করিবার আশায় সকলে ব্যস্ত হইলেন।

গভীর অন্ধকার রাত্রি, এখানে মার্সি নদী পার হইতে হইবে। এখানে নদী প্রায় আশি ফুট চওড়া। পেন্‌ক্রফট ও নেব কুড়াল লইয়া ভেলা বানাইতে লাগিয়া গেল। হার্ডিং ও স্পিলেট নদীর তীরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হারবার্ট তীরে পায়চারি করিতেছিল, হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া নদীর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—'ওটা কি ভাসছে?'

পেন্‌ক্রফ্‌ট্ কাজে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল অস্পষ্ট একটা কি জিনিস ভাসিয়া আসিতেছে। দেখিয়াই সে চেঁচাইয়া উঠিল—'নৌকো! ওটা যে আমাদের ক্যানোটা!'

জিনিসটা আরো নিকটে আসিলে দেখা গেল যে তাঁহাদেরই ক্যানোটি বাঁধন দড়ি ছিঁড়িয়া মার্সি নদীর জলে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া উপস্থিত!

লম্বা একটা কাঠের সাহায্যে নেব্ ও পেন্‌ক্রফট নৌকাটিকে তীরে ভিড়াইল। তখন হার্ডিং দেখিলেন ক্যানোর বাঁধন দড়িটি যেন পাথরে ঘষা খাইয়া কাটিয়া গিয়াছে।

স্পিলেট মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন—'হার্ডিং, এটা কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়!'

হার্ডিং গম্ভীরভাবে বলিলেন—'সেটা আর বলতে! খুবই অদ্ভুত ঘটনা।'

যাত্রীদল ভূত-প্রেতের কথা বিশ্বাস করিলে নিশ্চয় মানিয়া লইতেন যে ইহা একটি ভৌতিক ঘটনা! যাহা হউক, সেই 'অপদেবতাটি' যে দ্বীপবাসিগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই সব কাজ করিতেছেন সে বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ক্যানোতে চড়িয়া সকলে মার্সি নদীর মুখে আসিলে নৌকাটিকে তুলিয়া চিম্‌নির ধারে সমুদ্রতীরে রাখা হইল। সকলে গ্র্যানিট হাউসের সিঁড়ির দিকে চলিলেন।

এই সময়ে টপ্‌ ভারি চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নেব অন্ধকারে সিঁড়ির সন্ধান করিতে করিতে চেঁচাইয়া উঠিল—কি সর্বনাশ! সিঁড়ি ত নাই!'

ক্রমশঃ

রথের মেলা

সুরুচি সেনগুপ্ত

রথের চূড়ায় উড়্‌ছে নিশান্ পৎপৎ পৎপৎ,
ঐ দেখোনা দূরে চেয়ে তেঁতুল গাছের ফাঁকে—
আজকে যে মা, রথের মেলা, আজকে যে মা, রথ—
ওদিকের ওই বড় মাঠটায় ছোট নদীর বাঁকে।

সারা বছর মাঠটা ছিল চোর কাঁটাতে ছেয়ে,
প'ড়েছিল হেথা, হোথায় ছেঁড়া চটির পাটি,
গরু-ছাগল চ'রত মাঠে ঘাসদূর্বা খেয়ে,
থাক্‌ত প'ড়ে এনামেলের ফুটো গেলাস বাটি।

আজকে সে মাঠ ভ'রে গেছে কত দোকান পাটে,
মাঠটা তো আর মাঠ নেই মা, হ'য়ে গেছে মেলা,
হাজারো লোক এসে জড়ো হ'য়েছে সেই মাঠে,
পুতুল নাচ, বানর নাচ, আরো কত খেলা।

নাগরদোলায় বন্‌বন্‌বন্ দুল্‌ছে ছেলেমেয়ে,
কতরকম ম্যাজিক দেখায় অদ্ভুত এক লোক,
দেখ্‌লে তুমি একেবারে যাবে অবাক হ'য়ে
আস্‌ছে সবাই, কাছের কিম্বা অনেক দূরের হোক্।

দোকানীরা মাথায় বয়ে, নয়তো কাঁধে বাঁক্—
নিয়ে আস্‌ছে কত জিনিষ, কত পুতুল, বল,
কতই যে মা গণ্ডগোল, কেবল হাঁক্‌ডাক্।
আলোয় আলোয় চার্‌দিক আলোয় ঝল্‌মল্।

রথে কারা ব'সে আছেন ব'ল্‌তে তুমি পারো ?
দু'জন ঠাকুর নাম জগন্নাথ আর যে বলরাম,
দুটি ভাইয়ের মাঝখানেতে ব'সে আছেন আরো
আদরের ছোটবোনটি—সুভদ্রা তাঁর নাম।

রথের দড়ি টান্‌ছে সবাই—হেঁইয়ো-হেঁই হুই—
গড়গড়িয়ে চলেছে রথ, খুশির নাহি শেষ,
আষাঢ়ের আকাশেতে মেঘ জমে থই-থই !
ঝম্‌ঝমিয়ে নামে যদি, তবেই হবে বেশ্‌ !

মেলায় যাবো শুনে বুঝি অম্‌নি পেলে ভয় ?
ভাব্‌ছো বুঝি হারিয়ে যাবো ? কখ্‌খনো তা' নয়।
দুটো পকেট ভ'রে আমায় পয়সা দিয়ে দিয়ো—
ঠিক্‌ সময়ে আস্‌ব ফিরে—তখন দেখে নিয়ো।
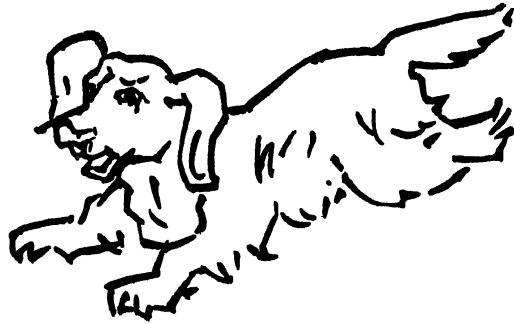
কলকাতার বর্ষা

মুরারিমোহন বিট

জল পড়ে ঝির্ ঝির্

দেহ করে শির্ শির্।

জল পড়ে ঝর্ ঝর্

পথ বেয়ে জল যায়

তর্ তর্ তর্ তর্॥

ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝরছে রে বৃষ্টি,

পথ-ঘাট ভেসে গেল একি অনাসৃষ্টি!

জল-পড়া কুয়াশায় চলে নাকো দৃষ্টি—

সবে বলে, থাম্ থাম্ থাম্ ওরে বৃষ্টি!

বৃষ্টিটা থামলো

পথে লোক নামলো।

হাঁটু-ভর জল পথে থৈ-থৈ করছে,

পথচারী অসহায়! দুর্ভোগে মরছে!

ট্রাম বাস গাড়ি-ঘোড়া সব কিছু বন্ধ,

সাঁত্‌রাতে হবে ভাই, নেই কোন সন্দ।

রিক্সায় যেতে পারো, মনে বুঝি বাধ্‌ছে?

তিন আনা ভাড়া যেথা—তিন টাকা হাঁক্‌ছে?

দোকানের মাঝে জল টলটল করছে,

বাড়ি বসে দোকানীরা ভেবে ভেবে মরছে।

অফিসেতে যাওয়া আজ ঘটবে না ভাগ্যে,

পড়ুয়ারা বলে আজ পড়াশুনো থাক্‌গে।

ঠন্‌ঠনে কালীতলা গলা-জলে ভাসছে,

ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি দূর হতে হাসছে।

এলো ফের্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি,

থাম্ থাম্ থাম্ ওরে, একি অনাসৃষ্টি!

পড়ুয়াদের মেঠো-খসড়া থেকে

জীবন সর্দার

[পড়ুয়াদের দেখা, কত খবর যে আমার কাছে এসে জমেছে, তার থেকে কিছু তুলে, সবাইকে না দেখালে শান্তি পাচ্ছি না। জীঃ সঃ।]

বেবী দাশ। হুগলী। 'স্নান খাওয়া সেরে এক বন্ধুর বাড়ির পুকুর ধারে, জলে পা' ডুবিয়ে পৈঠার পরে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকতেই দেখি পিলপিল করে কুঁচো চিংড়িরা সব সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরের দিকে আসছে। একেবারে জলের কিনারায় এসে থামল। হাত চাপা দিয়ে একটাকে ধরতে গেলাম। লাফিয়ে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পালাল। আবার একটু বসে থাকতে দেখি ওরা সব সারে সারে আসছে। বসে বসে দেখতে লাগলাম ওরা কি করে। দেখি যে, ওরা শ্যাওলা খাচ্ছে।

বৃষ্টির জল বাগান থেকে পুকুরে নামতে নামতে একটা নালার মত হয়েছে। নালার পাশে গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড! কত যে ছোট চিংড়ি! নালায় স্রোত নেই। চিংড়িগুলো বুক মাটিতে ঠেকিয়ে বেশি জলের দিক থেকে ডাঙ্গার দিকে আসছে। ওরা মাছ বা অন্য জলের পোকার মত ভাসছে না, মাটি ঘেঁসে, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলছে। গামছায় ছেঁকে কয়েকটাকে ধরলাম। সবচেয়ে বড়টা লম্বায় দেড় ইঞ্চি। হালকা সবুজ রং। কাঁচের মত স্বচ্ছ শরীর। ওটাকে উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করতে বসলাম।'

মিতালি দত্ত। 'গত শীতে হাজারিবাগ ছিলাম। আমাদের বাসার বাগানের দক্ষিণ কোণে একটা মস্ত বড় বটগাছের নিচু কোটরে কয়েকটা শালিকদের বাসা আছে। তারই একটা বাসায় দেখলাম ছোট্ট ছোট্ট তিনটে শালিক বাচ্চার সঙ্গে একটা চড়ুইএর বাচ্চাও রয়েছে। বড় দুটো শালিক নিজেদের বাচ্চার সাথে চড়ুইএর বাচ্চাটাকেও পালছে।

'শালিক-বাচ্চাগুলোর গা ধূসর রংএর। পালক গজায়নি। খুব ছোট্ট ছোট্ট চোখ—ঘোলাটে সাদা। আমি ওদের সামনে একটা গাছের পাতা ধরলাম। ওরা টেরই পেলনা। বুঝলাম, ওদের চোখ ফোটেনি।

'চড়ুই বাচ্চাটার গায়ের রং হাল্কা খয়েরী। ওটারও পালক ওঠেনি, কিন্তু চোখ ফুটেছে।

আমার হাত কামড়ে দিল। কিন্তু এত নরম ঠোঁট যে লাগলই না। চিঁচিঁ করে ডাকছিল বাচ্চাটা।

'আমি লক্ষ্য করে দেখেছি সব পাখির ছানার মুখের ভিতরটা লাল। বড় হলে কিন্তু সে রং আর থাকে না।'

আশিসকুমার দে। বহরমপুর। 'আমাদের এখানে ঝোপজাতীয় একরকম কাঁটা গাছ আছে। সবাই বলে 'মণীন্দ্রকাঁটা'। লম্বায় সাত ফুটের বেশি হয়না গাছটা। ওর গা ভর্তি অসংখ্য কাঁটা। আমাদের গায়ে ফুটলে বেশ যন্ত্রণা হয়। গাছটার আসল নাম কেউ বলতে পারেনা।

'মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র একবার রাঁচি থেকে এই গাছের বীজ এনে এখানে লাগিয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর নামেই গাছের নাম হয়েছে। একটা বেশ মোটা কাণ্ড থেকে, অসংখ্য ডালপালা বেরিয়ে, একটা চার পাঁচ ফুট ব্যাসের ঝোপ তৈরী হয়। গাছে বারমাস ফুল থাকে। ফুল হয় গোছা গোছা। এক একটা গুচ্ছে অনেক ফুল থাকে। ফুলের রং—নীলচে, লালচে, এবং হলদেটে। খুব শুকনো জায়গাতেও ঐ গাছ বেঁচে থাকতে পারে। ফল হয় ছোট কালো রংএর। ভেতরে বীজ থাকে।'

গৌতম দত্ত। কলকাতা। 'দীঘায় বেড়াতে গিয়েছিলাম এপ্রিল মাসে। একদিন দুপুরবেলা, বাড়ি থেকে দূরে, সমুদ্রের ধারে বালির পাহাড়ের উপর একটা পাখি দেখলাম। ওটা ছ' ইঞ্চির বেশি বড় নয়। সারা দেহ ধুসর, ডানা দুটি খয়েরি, পা-কালো। পাখিটি বালির মধ্য থেকে ছোট্ট ঠোঁট দিয়ে কি খুঁটে খাচ্ছিল। সারাটা দুপুর ঐ পাখির খাওয়া দেখে দেখে আমার কাটল।'

দীপঙ্কর সান্যাল। বোম্বাই। 'এখানে একরকমের অদ্ভুত পাখি রোজ দেখতে পাই। লক্ষ্য করেছি তারা কোন বাড়িতে বাসা বাঁধে না। মাঝারি লম্বা গাছে ওরা বাসা বাঁধে। বেশি সময়ই কলকে বা স্থলপদ্ম গাছে। পাখিগুলি বেশী রোদ্দুরে যায় না। ওদের মাথার রং হলদে। গায়ের রং-সাদা। ঠোঁট-লাল। মুখ-সাদা। লেজ-কালো আর উপর দিকে ওঠানো। কোন পড়ুয়া কি, পাখিটার নাম বলতে পারবে ভাই?'

জুলু সেন। হায়দরাবাদ। 'আমাদের বাড়িতে যে মাধবীলতা গাছটা আছে, একদিন রাত্রিবেলা হঠাৎ দেখলাম—সরু ঠোঁটওলা একটা ছোট পাখি বসে আছে। যখন মুখ গুঁজে বসে থাকে তখন সাদা বলের মত দেখায়। পরের দিন ভোরে আর পাখিটিকে দেখলাম না।'

ভোলানাথ বসু। কলকাতা। (বয়স—৭)। 'পাখিরা সবাই এক রকম নয়। কাক একদম কালো। শালিক—তামাটে কিন্তু পা আর চোখের চারপাশ হলুদ। কাকাতুয়া—সাদা, ওর ঠোঁট ছাই রং-এর। চড়ুই—সাদা আর খয়েরী। টিয়া কিন্তু সবুজ। কোথাও ঘন কোথাও ফিকে। টিয়ার ঠোঁট লাল। কোকিল একদম কালো। চোখ—লাল। এতগুলোর মধ্যে শুধু কোকিলই গান গায়।'

প্রবীর বসু। কলকাতা। 'একদিন সকালে দেখলাম একটা সাদা বক উড়ে গেল আমাদের

বাড়ির খুব কাছ দিয়ে। লম্বা গলা গুটিয়ে, লম্বা পা দুটো পেছনে টান করে সে উড়ে গেল। ফিকে হলুদ রঙের ঠোঁটটা।

'আমি ভাবছি এ বকটা হঠাৎ দলছাড়া হয়ে সহরের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কেন। সাদা বকদের দল বেঁধে থাকতেই দেখেছি। এ হঠাৎ দলছাড়া কেন?'

কাঞ্চন সেনগুপ্ত। কলকাতা। 'টালিগঞ্জের গ্রাম-অঞ্চলে আমাদের বাড়ি। বাড়ির সামনে বাগান আছে। অনেক দিন ধরে দেখছি মৌমাছিরা বাগান থেকে ফুলের মধু নিয়ে আমাদের ঘরের দিকে যায়। একদিন ওদের অনুসরণ করে দেখলাম, আমাদের ঘরের কড়ি কাঠে ওরা মৌচাক গড়েছে। মৌচাকটা হলুদ মোম দিয়ে তৈরী। ভিতরে নিশ্চয়ই মধু আছে? সারাদিন মৌমাছিরা মৌচাকে বসে না জানি কি করে। মৌচাক ভেঙ্গে মধু নিতে জানি না। কোন পড়ুয়া বলে দেবে, কেমন করে মৌচাক ভেঙ্গে মধু নিতে হয়?'
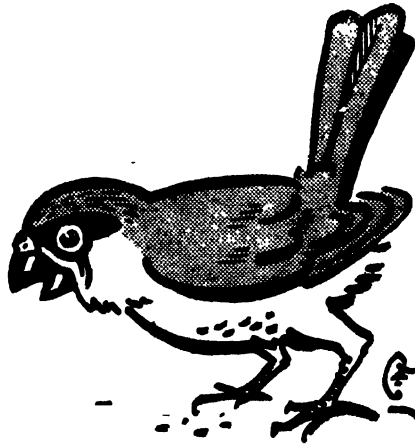
পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক :—

বদ্রীবাবুর বাপ-মা মরা একমাত্র ভাইপো কম্বলের নিরুদ্দেশ হবার সংবাদ পেয়ে টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল ও প্যালারাম 'দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রিন্টিং হাউসের' অন্ধকার ঘরে ঢুকে, বদ্রীবাবুর কাছে, তাকে খুঁজে দেবার প্রস্তাব আনল।

'খুঁজে বের করলেও আপত্তি নেই, না করলেও আপত্তি নেই। কিন্তু কোনও খরচা দিতে পারব না'—গম্ভীরভাবে জানালেন বদ্রীবাবু।

আরো জানা গেল যে এক নামকরা কুস্তিগীর, জঁাদরেল মাস্টার রাখবার পরেই কম্বল নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে এবং বদ্রীবাবুর ধারণা যে সে চাঁদে গেছে। ছোটবেলা থেকেই নাকি কম্বলের চাঁদ সম্বন্ধে একটা 'ন্যাক্' ছিল, তাছাড়া সে একটা কাগজে চাঁদের কথা লিখে রেখে গেছে।

বদ্রীবাবুর প্রেস থেকে চারজনে বেরোবামাত্রই বোঁ-ও-ও করে একটা পচা আম ছুটে এসে পাশের দেয়ালে ফাটল।

তখনই বোঝা গেল যে কম্বলের নিরুদ্দেশ হবার পিছনে একটা গভীর চক্রান্ত-জাল আছে এবং এরই মধ্যে শত্রুপক্ষের আক্রমণ সুরু হয়ে গেছে !

॥ ৩ ॥

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লুম। তারপর টেনিদা মোটা গলায় বললে, 'হুঁ উড়ুম্বর।'

'উড়ুম্বর ?'—আমি অবাক হয়ে বললুম, 'তার মানে কী ?'

'মানে উড়ন্ত আক্রমণ—অম্বর হইতে।' টেনিদা আরো গম্ভীর হয়ে বললে, 'ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।'

হলেই বা প্রকাশ্য দিবালোকে শত্রুর আক্রমণ, ক্যাবলা ভুল ব্যাকরণ সইতে পারল না। সে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল : 'কখনো না, ওটা ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হতেই পারে না। আর অম্বর হইতে উড়ন্ত আক্রমণ—এ কিছুতেই উড়ুম্বরের ব্যাসবাক্য নয়। তাছাড়া উড়ুম্বর মানে—'

'শটাপ্—তক্কো করবি না আমার সঙ্গে।' টেনিদা দুমদাম করে পা ঠুকল : 'আমি যা বলব তাই কারেক্ট্, তাই গ্রামার। আমি যদি ক্যাবলা মিত্তির সমাস করে বলি, মিত্তির হইয়াছে যে ক্যাবলা—সুপ্সুপা সমাস, তা হলে কে প্রতিপদ করে তাকে একবার আমি দেখতে চাই।'

বেগতিক বুঝে ক্যাবলা চশমাশুদ্ধ নাকটাকে আকাশের দিকে তুলে চিল-ফিল কী সব দেখতে লাগল, কোন জবাব দিলে না। হাবুল সেন বললে, 'না তারে ছাখ্তে পাইবা না। গাঁট্টা খাওনের লাইগ্যা কারই বা চাঁদি সুড়্ সুড়্ কোরতাছে ? কী কস্ প্যালা, সৈত্য কই নাই ?'

আমি হাবুলের মতোই ঢাকাই ভাষায় জবাব দিলুম, 'হঃ, সৈত্যই কইছস।'

টেনিদা বললে, 'না, এখন বাজে কথা নয়। গোড়াতেই দেখছি ব্যাপার বেশ পুঁদিকেরী—মানে, দস্তুরমতো ঘোরালো। অর্থাৎ কম্বল মাস্টারের থাপ্পড়ের ভয়েই পালাক আর চাঁদে চড়বার চেষ্টাই করুক, সে নিশ্চয় কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। তা না হলে একটা পচা আম অমন ভাবে আমার কান তাক করে ছুটে আসত না। বুঝেছিস, ওটা হল ওয়ার্নিং। যেন বলতে চাইছে, টেক্ কেয়ার, কম্বলের ব্যাপারে তোমরা নাক গলাতে চেয়ো না।'

আমি বললুম, 'তা হলে আমটা ছুঁড়ল কে ?'

টেনিদা একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল, যাকে বাংলায় বলে 'হাই ক্লাস।' তারপরে নাকটাকে কি রকম একটা ফুলকপির সিঙ্গাড়ার চোখা করে বললে, 'তা যদি এখুনি জানতে পারতি রে প্যালা, তা হলে তো রহস্য-কাহিনীর প্রথম পাতাতেই সব রহস্য ভেদ হয়ে যেত। যেদিন কম্বলকে পাকড়াতে পারব, সেদিন আম কে ছুড়েছে তা-ও বুঝতে বাকী থাকবে না।'

বললুম, 'আচ্ছা, ছাতে ওই যে কাকটা বসে রয়েছে, ওর মুখ থেকেও তো হঠাৎ আমটা—'

ক্যাব্লা বললে, 'বাজে বকিসনি। কাকে এক-আধটা আমের আঁটি ঠোঁটে করে হয়তো নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু অত বড়ো একটা আম তুলতে পারে কখনো ? আর মনে কর, যদি ওই কাকটাকে

ওয়েট্ লিফটিং চ্যাম্পিয়ান--মানে ওদের মধ্যেই—ধরা যায়, তা হলেও কি আমটাও বুলেটের মতো ছুড়ে দিতে পারে ?'

হাবুল ঘাড় নেড়ে বললে, 'যে কাগটা আম ফেইক্যা মারছে, সে হইল গিয়া ডিস্কাস্-থ্রোয়িং-এর চ্যাম্পিয়ান।'

টেনিদা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার আর হাবুলের মাথা কটাং করে একসঙ্গে ঠুকে দিলে। খুব খারাপ মুখ করে বললে, 'আরে গেল যা ! এদিকে দিবা-দ্বিপ্রহরে কলিকাতা শহরে আমার ওপর শত্রুর আক্রমণ —আর এ দুটোতে সমানে কুরু-বকের মতো বক বক করছে ! শোন্—একটাও আর বাজে কথা নয়। আমটা যে আমার দিকেই তাক করে ছোঁড়া হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোন্ বাড়িথেকে ছুঁড়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু খামোকা আমার সঙ্গে লাগতে সাহস করবে, এমন বুকের পাটাও এ পাড়ায় কারো নেই। টেনি শর্মাকে সকলেই চেনে। অতএব প্রতিপক্ষ অতিশয় প্রবল। সেইজন্যে মনে হচ্ছে, এখন পচা আম পড়েছে, একটু পরে ধপাৎ করে একটা পেঁপেও পড়তে পারে। আর বড়ো সাইজের তেমন-তেমন একখানা পেঁপে যদি হয়, তা হলে সে চীজ যারই মাথায় পড়ুক, আমরা কেউই অনাহত থাকব না।'

হাবুল সেন বললে, 'আর দশ কিলো ওজনের একখান পচা কাঠাল পোড়লে সকলেরেই ধরাশায়ী কইর‍্যা দিবো। যদি আত্মরক্ষা কোরতে চাও, অবিলম্বে এইখান থিক্যা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর।'

যুক্তিটা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, আমরা আর দাঁড়ালুম না। চটপট পা চালিয়ে একেবারে চাটুজ্জেদের রকে।

টেনিদা বসতে যাচ্ছিল, ক্যাবলা বললে, 'না—এখানে নয়। রাস্তার ধারে বসে কোনো সীরিয়াস আলোচনা করা যায় না। চলো আমাদের বৈঠকখানায়। বাবা ট্যুরে বেরিয়েছেন, কাকা গেছেন দিল্লীতে, বেশ নিরিবিলিতে বসে সব প্ল্যান ঠিক করা যাবে।'

প্রস্তাবে আমরা একবাক্যে রাজী হয়ে গেলুম। সত্যিই তো, এখন আমাদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। শত্রুর চর সব সময় আমাদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখছে কিনা, কিছুই তো বলা যায় না। তা ছাড়া ক্যাবলার মা নানারকম খাবার করতে ভালোবাসেন, খাওয়াতেও ভালোবাসেন, তাঁকেও তো একটু খুশি করা দরকার।

তা খাওয়াটা মন্দ জমল না। ক্যাবলার মা কেক তৈরী করছিলেন, গরম গরম আমাদের কেটে এনে দিলেন। 'হট কেকে'র সঙ্গে চা টা খেয়ে আমাদের মেজাজ খুলে গেল।

টেনিদা আমাদের লীডার বটে, কিন্তু সে অ্যাক্শনের সময়। মাথা ঠাণ্ডা করে বুদ্ধি জোটাবার বেলায় ওই ক্ষুদে চেহারার ক্যাবলা মিত্তির। তা না হলে কি আর টপাটপ পরীক্ষায় স্কলারশিপ পায় !

ক্যাবলা প্রথমেই পকেট থেকে কম্বলের লেখার সেই নকলটা বের করল।

—'টেনিদা, এই লেখাটার মধ্যে একটা সূত্র আছে মনে হয়।'

টেনিদা বললে, আহা, 'সূত্র তো বটেই। পরিষ্কার লিখছে, নিরুদ্দেশ হচ্ছি। মাস্টারের ঠ্যাঙানি খাওয়ার ভয়ে যেদিকে হোক লম্বা দিয়েছে। কিন্তু কম্বলের মতো একটা অখাদ্য জীব চাঁদে গেছে, এ হতেই পারে না। আমি কখনো বিশ্বাস করব না—তা বত্রীবাবুই বলুক আর কেদারবাবুই বলুক।'

ক্যাবলা হিন্দী করে বললে, 'এ জী, জেরা ঠহ্‌রো না। আরে চাঁদ-উঁদ ছোড় দো, উতো বিল্‌কুল দিল্লাগী মালুম হচ্ছে আমার। নীচের লেখাগুলোই একটু ভালো করে দেখা দরকার। ওদের কোনো মানে আছে।'

আমি বললুম, 'ওই চাঁদ—চাঁদ্‌নি-চক্রধর? তোর মাথা খারাপ হয়েছে ক্যাব্‌লা। ওগুলো স্রেফ পাগলামি, ওদের কোনো মানেই হয় না।'

'বেশি ওস্তাদী করিস্‌নি প্যালা, আমি কী বলছি তাই শোন্‌। কম্বলকে আমরা সকলেই জানি। তার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড়ও আমাদের অজানা নয়। সেদিনও সে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, ইটালীর মুসোলিনী কি বেলেঘাটার মৃণালিনী মাসিমার বড়ো বোন? তার হাতের লেখা দেখলে উর্দু কিংবা কানাড়ী বলে মনে হতে থাকে। বন্ধুগণ, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, যাকে স্রেফ পাগলামি বলে মনে হচ্ছে, তা হল ছ-লাইনের একটি কবিতা। তাতে ছন্দ আছে, মিলও আছে। কম্বলের সাধ্যও নেই ওভাবে ছন্দ মিলিয়ে, মিল রেখে, ছটা লাইন দাঁড় করায়।'

হাবুল মাথা নাড়ল: 'হ, বুঝছি। আর কেউ লেইখ্যা দিছে।'

'ঠিক, আর কেউ লিখে দিয়েছে। কিন্তু খামোকা লিখতে গেল কেন? নিশ্চয় ওর একটা মানে আছে।'—ক্যাবলা কাগজটা খুলে ধরে পড়তে লাগল: 'চাঁদ-চাঁদনি-চক্রধর। চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর। নিরাকার মোষের দল—আচ্ছা টেনিদা?'

টেনিদা বললে, 'ইয়েস।'

'আমার মাথায় প্ল্যান এসেছে একটা। একবার চাঁদনির বাজারে যাবে!'

'চাঁদনির বাজার!'—আমরা তিনজনে একসঙ্গে চমকে উঠলুম। টেনিদা নাক কুঁচকে, মুখটাকে শোনপাপড়ির মতো করে বললে, 'কী জ্বালা, চাঁদনির বাজারে যেতে যাব কেন?'

ক্যাবলা আরো বেশি গম্ভীর হল।

'ধরো সেখানে যদি চক্রধরকে পেয়ে যাই? কিংবা কে জানে চন্দ্রকান্তের সঙ্গেই দেখা হয়ে যেতে পারে হয়তো।'

'নাকেশ্বরও বইস্যা থাকতে পারে—কেডা কইবো?'—হাবুল জুড়ে দিলে।

'সবই হতে পারে'—ক্যাবলা বললে, 'চলো না টেনিদা, ঘুরেই আসি একটু। যদি কোনো খোঁজ না-ই পাওয়া যায়, তাতেই বা ক্ষতি কী। ছুটির দিন, একটু বেরিয়েই নয় আসা যাবে।'

'কিন্তু বেড়াবি কোথায়?'—টেনিদা বিরক্ত হল: 'চাঁদনি তো আর একটুখানি জায়গা নয়। সেখানে চক্রধর বলে কেউ যদি থাকেই, তাকে কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে?'

'এক পালা খড়ের ভেতর থেকে গোয়েন্দারা ছুঁচ খুঁজে বের করতে পারে, আর চাঁদনি থেকে

একটা লোককে আমরা খুঁজে পাব না? এই কি আমাদের লীডারের মতো কথা হল? ছি-ছি, বহুৎ শরম কি বাত!'

আর বলতে হল না। তড়াক করে টেনিদা লাফিয়ে উঠল: 'চল্ তা হলে, দেখাই যাক একবার।'

আমরা বেরিয়ে পড়লুম। চীনে বাদাম খেতে খেতে যখন চাঁদনির বাজারে যাওয়ার জন্যে ট্রামে চাপলুম, তখনও আমরা কেউ ভাবিনি যে সত্যি-সত্যিই আমরা এবারে একটা রহস্যের খাসমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। আমাদের সামনে এমন দুরন্ত অভিযান ঘনিয়ে আসবে।

চাঁদনির বাজারে ঢুকে টেনিদা কেবল এক ভদ্রলোককে বোকার মতো জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, 'মশাই, এখানে চক্রধর বলে কেউ'—হঠাৎ হাবুল থাবা মেরে তাকে থামিয়ে দিলে। বললে 'টেনিদা—টেনিদা—ওই যে! লুক দেয়ার!'

একটি ছোট সাইনবোর্ড। ওপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা: শ্রীচক্রধর সামন্ত। মৎস ধরিবার সর্বপ্রকার সরঞ্জাম বিক্রেতা। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।'

অবশ্য 'মৎস্যে' য-ফলা নেই, তাছাড়া লেখা রয়েছে 'পরিক্ষা প্রার্থনীয়।' কিন্তু তখন বানান ভুল ধরার মতো মনের অবস্থা ক্যাবলার মতো পণ্ডিতেরও নয়। আমরা চারজনেই হাঁ করে সাইনবোর্ডটার দিকে চেয়ে রইলুম কেবল।

—ক্রমশঃ

মহাবিশ্ব সম্মেলন প্রতিযোগিতার ফলাফল।

কেবলমাত্র একজনের উত্তরই সম্পূর্ণ ঠিক হয়েছে। কিন্তু আরো তিনজনের উত্তর প্রায় ঠিক এবং কয়েকজনের উত্তর সামান্য ভুল হয়েছে। তাছাড়াও ভাল উত্তরের সংখ্যা অবশ্য অনেক।

সম্পূর্ণ ঠিক উত্তর—১৮৭২ অনিরুদ্ধ ও অশোক নাগ—প্রথম পুরস্কার।

প্রায় ঠিক উত্তর—৭৮২ সায়নদেব মুখোপাধ্যায়, ৮৬৩ অরুন্ধতী ও অগ্নিমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ২৭০৩ শুভঙ্কর ঘোষ — দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার

খুব ভাল উত্তর ও খুব ভাল কবিতা—২৮০৩ সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়—বিশেষ পুরস্কার

খুব ভাল উত্তর—১৫ বনশ্রী দাশ, ৯৮৩ জ্যোতির্ময় মজুমদার, ১২০৭ রত্না দত্ত, ১২১৫ সুরঞ্জন সিংহ, ১৬১৯ অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭৯৫ সুপ্রিয় ভট্টাচার্য আর ২৩০৯ তপতী ভট্টাচার্য।

আরো কয়েকজনের পদ্যে, গল্পে ও ছবিতে উত্তর বেশ ভাল হয়েছে কিন্তু তারা খুব বেশি সংখ্যক নাম লিখতে পারে নি ;—

ছবিতে—১৬৯১ অর্চনা ও ত্রিদিবকুমার সাহা।

গল্পে—১৮৩৮ ভাস্কর গুপ্ত।

পদ্যে—৬৪৪ মধুমিতা ঘটক, ১৩৭৬ জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়। (আর একজনের পদ্য খুব মজার, কিন্তু নামধাম নেই।)

১। অশ্বত্থ গাছ—ভারতবর্ষ।
২। স্লথ—মধ্য আমেরিকা।
৩। গোরিলা—আফ্রিকা
৪। কালো রাজহাঁস—অস্ট্রেলিয়া
৫। গোখুরো সাপ—ভারতবর্ষ
৬। হেলানো টাওয়ার—ইটালি (পিসা)
৭। পিরামিড—ঈজিপ্ট্
৮। তাজমহল—ভারতবর্ষ (আগ্রা)
৯। এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিং—আমেরিকা (নিউ ইয়র্ক)
১০। স্টোনহেঞ্জ—ইংলণ্ড (সল্‌স্‌বারি)
১১। হাতি—আফ্রিকা
১২। ক্যাঙ্গারু—অস্ট্রেলিয়া
১৩। কলিসিয়াম—ইটালি (রোম)
১৪। হাউস অব্ পার্লামেন্ট্—ইংলণ্ড (লণ্ডন)
১৫। বৌদ্ধ স্তূপ—ভারতবর্ষ (সারনাথ)
১৬। গণ্ডোলা—ইটালি (ভেনিস)
১৭ আইফেল টাওয়ার—ফ্রান্স্ (প্যারি)
১৮ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—ভারতবর্ষ (কলকাতা)
১৯ পুলিশ—ইংলণ্ড (লণ্ডন)
২০ তিব্বতী লোক—তিব্বত
২১ রেডইণ্ডিয়ান—আমেরিকা
২২ বেদুয়িন—আরব দেশ
২৩ স্ফিংক্স্—ঈজিপ্ট্
২৪ কুতব মিনার—ভারতবর্ষ (দিল্লী)
২৫ ফুজিয়ামা—জাপান
২৬ কাঞ্চনজঙ্ঘা—ভারতবর্ষ
২৭ প্রাচীর—চীন
২৮ স্ট্যাচু অব্ লিবার্টি—আমেরিকা (নিউ ইয়র্ক)
২৯ ইগ্‌লু—উত্তর মেরু অঞ্চল
৩০ পিপীলিকা ভুক—মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা
৩১ নাগাযোদ্ধা—ভারতবর্ষ (নাগাল্যাণ্ড)
৩২। উইণ্ড্‌মিল—হল্যাণ্ড

নতুন ধাঁধা

উত্তর দেবার শেষ তারিখ ১৬ই অগস্ট

(১)

আছি জলে, আছি স্থলে, আছি ফুলেফলে।
নীলিমায় আছি আর অনিলে, অনলে।
প্রলয়ের কালে আমি আসিব আবার।
বল তো গ্রাহক ভাই, কি নাম আমার।

(২)

বুড়ো কিন্তু বুড়ো নয় বয়সে সমান হয়,
কিন্তু সবে বৃদ্ধ কয়, জানো তার পরিচয়?

(৩)

ছুটিতে জুটেছি মামাবাবুর ————
দিন কাটে খেলা ধুলা, হৈচৈ
দুপুরে পুকুরে যাই মাছের
(বিড়ালের ভাগ্যে হায় না ছেঁড়ে ————।)
মালিদের কাছে শিখি বাঁধিতে————।
কি জানি কোথায় গেছে কেতাব————।
লেখা পড়া কোন কিছু করিতে————।
আদর করিয়া পোষা বাঁদর————।
পাড়ার ছেলেরা আসে বন্ধুত্ব————,
ফলমুল খেতে দিই কলার————।

(উপরের কবিতাটির প্রতি দুই লাইনের শেষের শূন্যস্থান এমন কথা দিয়ে পূর্ণ কর যা শুনতে একই রকম কিন্তু অর্থ আলাদা।)

(৪)

আমাদের পাড়ায় থাকেন এক প্রসিদ্ধ কবি, এক বিখ্যাত সমাজ সেবক, এক মস্ত পালোয়ান আর এক নামজাদা চিত্রকর। তাঁদের নাম হল আনন্দ নন্দন, স্বদেশ রঞ্জন, বিপুল-বিক্রম আর ললিত সুন্দর।

তাঁদের কারো নামের সঙ্গে কাজের কোন মিল আছে কিনা তা অবশ্য বলে দেব না। তবে এটুকু বলছি যে :—

(১) আনন্দ নন্দন বয়সে বিপুলবিক্রমের চেয়ে বড়।

(২) কবির কোনও আত্মীয় নাই এই পাড়ায়।

(৩) চিত্রকর ও সমাজ সেবক সম্পর্কে ভাই হন।

(৪) আনন্দ নন্দন হলেন স্বদেশ রঞ্জনের ভাই পো।

(৫) সমাজসেবক পালোয়ানের খুড়ো নন, এবং পালোয়ান ও চিত্রকরের খুড়ো নন।

এবার বল দেখি কার কি নাম এবং কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক।

ধাঁধার উত্তর

কোন কোন গ্রাহক লিখছ যে ধাঁধাগুলি ভাল লাগছে, কেউ কেউ লিখছ যে সহজ লাগছে, আবার কয়েকজন লিখেছ ধাঁধা বেশি কঠিন, বিশেষতঃ চতুর্থ ধাঁধাটা। গ্রাহকদের মধ্যে ছোট ও বড় নানারকম আছে বলে সহজ ও কিছুটা কঠিন ধাঁধা দেওয়া হয়, যাতে ছোটরাও কিছু কিছু পারে আর বড়দেরও ভাল লাগে।

চতুর্থ ধাঁধাটায় সাধারণতঃ একটু বুদ্ধি ও যুক্তি খাটাবার প্রয়োজন হয়। মুখে মুখে উত্তর বার করতে যদি অসুবিধা হয়, কাগজে ছক কেটে চেষ্টা করে দেখো।

এবার দ্বিতায় আর তৃতীয় ধাঁধাটা অনেকে একটুর জন্য ভুল করে ফেলেছ, আরো সাবধানে লিখো।

যারা গ্রাহক নও, তাদের অনেকের কাছ থেকে বেশ ভালভাল উত্তর পেলাম। ধাঁধা করতে যখন তোমাদের এত ভাল লাগে, এবার গ্রাহক হয়ে যাও, তাহলেই তোমাদের পাঠান উত্তর ছাপান হবে।

(১) বাতাস।

(২) বর, তাল, গোল, বালা!

(৩) মাছি, বোলতা, জোনাকি, মশা, প্রজাপতি, উই, মৌমাছি, বিছা।

(৪) ক—জানেন তামিল ও ইংরাজি।
খ—জানেন তামিল ও হিন্দী।
গ—জানেন ক্যানারিজ ও ইংরাজি।
ঘ—জানেন হিন্দী ও ইংরাজি।

উত্তর দাতাদের নাম

উত্তর পাঠাবার শেষদিন দেওয়া ছিল না বলে ঐ পৃষ্ঠা ছাপাবার দিন পর্যন্ত সব উত্তর নেওয়া হল যাদের সব কটি উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ—

২৮২ অর্চনা দত্ত, ৩২১ কবিতা ও অজন্তা ঘোষ, ৪৯১ অলোকা ও মল্লিকা চন্দ্র, ৬০৮ আনন্দ-নন্দন

ও ঝুলন দাশগুপ্ত, ৮৫৩ তপন দত্ত, ৮৫৮ দেবকুমার লাহিড়ী, ৮৬৯ উদয়ন কুমার মুখোপাধ্যায়, ১০৯৭ ঝুমকা সেন, ১২৬৭ জয়শ্রী মজুমদার, ১৫০৭ ব্রততী গুহ, ১৬১৩ ভারতী ও অভিজিৎ দে, ১৭৮৮ পলাশ বরণ পাল, ১৮২৪ স্মৃতিলেখা গুহ, ১৮৩৮ ভাস্কর গুপ্ত, ১৯১৯ মাধুরী রক্ষিত, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২১০২ সায়ন চট্টোপাধ্যায়, ২১৯৫ মুকুর দাশগুপ্ত, ২৩০৫ অরূপ দত্তগুপ্ত, ২৩১৫ চন্দন সৌরভ মিত্র, ২৪২৩ করবী, জবা, দীপানী গুপ্ত, ২৪৩৪ তমিস্রাহরণ সান্যাল, ২৪৬৯ অভিজিৎ গুহ, ২৪৮৬ অরুন্ধতী রায়, ২৪৯৯ দেবীপ্রসাদ সিংহ, ২৫১১ সাত্যকি রায় ও গৌতম ভট্টাচার্য, ২৫৪২ তন্ময় সেনগুপ্ত, ২৫৭৪ অপরাজিতা ব্যানার্জি, ২৭০৯ শঙ্কর ঘোষ, ২৭২৮ লেখনী ও তন্ত্রী মুখোপাধ্যায়, ২৭৩০ প্রদীপ দত্ত, ২৭৪৩ মাধুরী বর্মন, ২৭৭৩ মৌসুমী ও মৌটুসী সেন, ২৭৭৬ অভিজিৎ সেনগুপ্ত, ২৭৯৯ রণবীর মৈত্র।

যাদের তিনটি উত্তর সম্পূর্ণ ঠিক হয়েছে ঃ—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ১৩৩ সর্বানী ভট্টাচার্য, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৩১ অতীশ কুমার রায়, ২৪৬ গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ৩০২ উর্মিমালা ও শর্মিলা ঘোষ, ৩৯১ অমিতাভ, কাজল ও পার্থ নিয়োগী, ৪১৮ অনিরুদ্ধ ও শান্তনু সেন (পদ্যে) ৬৪৪ মধুমিতা ঘটক, ৫২৭ অভিজিৎ, অরিজিৎ ও [illegible]নীতা বিশ্বাস, ১২৫৪ কল্যাণ ঘোষ, ১২৮১ ইলুরানী ভট্টাচার্য, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৫৪২ শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫৯৭ বিচিত্র কুমার গুহ, ১৬০৬ রেবা ও রঞ্জন নাথ, ১৬১৯ অঞ্জন ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭১৮ অনুকণা পাল, ১৭৯০ জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮২১ জয়ন্তিকা সেন, ১৮২৬ শিবানী বসাক, ১৮২৭ অনুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৯২৪ পূর্ণা মজুমদার, ২১৯৪ বনানী রায়, ২২০১ কস্তুরী গুপ্ত, ২২৮২ কল্পনা, সোনালী, অমিতাভ শুভশ্রী ও সবনম্ হোম চৌধুরী, ২৩৩৬ সুস্মিতা চৌধুরী, ২৩৫৬ জয়তী ঘোষ, ২৩৯০ পার্থ কুণ্ডু, ২৪০৪ সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪৫৬ কুণালকুমার রায়, ২৫২৪ সন্ধ্যা বেরা, ২৫৪৪ ভারতী, মণিকা ও সান্ত্বনা রায়চৌধুরী, ২৫৬০ কেতকী ও মহুয়া চৌধুরী, ২৫৬২ ইলা ঘোষ, ২৫৯১ অপরাজিতা কিস্কু, ২৬০০ মঞ্জু সান্যাল, ২৬১১ শুভা বিশ্বাস, ২৬৩৯ রাষ্ট্রী দে, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, ২৬৮৩ অঞ্জন চৌধুরী, ২৭০১ মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭১৭ মধুরা ভট্টাচার্য ২৭৪১ সোনালী করগুপ্ত, ২৭৬১ ঋতা, মিতা ও ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত, ২৮০৯ আনন্দশঙ্কর গুপ্ত, ২৮৫০ শ্যামলী চক্রবর্তী, ২৮৬৮ সোহম্ দাশগুপ্ত, ২৮৮৯ রণজিৎ দে।

যাদের দুইটি উত্তর সম্পূর্ণ ঠিক হয়েছে ঃ—

১২৮ শুক্লা মৈত্র, ২০৭ রঞ্জন কর ২১২ মধুশ্রী চৌধুরী, ১২৮৩ রিতা, রাহুল ও সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, ১৩১৭ ভাস্কর মিত্র, ১৩২০ বিজলী ঘোষ, ১৩৩৬ শ্রীলতা ও স্বাগতা চৌধুরী, ১৪৩৯ পাপড়ি চৌধুরী ১৩৯২ শঙ্কর গুপ্ত ও অনুরাধা সেনগুপ্ত ১৪৯৭ শুভ্রা কুণ্ডু, ১৬৯১ অর্চনা ও ত্রিদিব সাহা, ১৭২৪ অনির্বিৎ রক্ষিত, ১৭৫৪ অরূপ কর, ১৭৫৬ শঙ্করলাল চন্দ্র, ১৭৮১ সুদীপ্তা ও সুচিত্রা পাল, ১৭৮৫ ঋতু ভট্টাচার্য, ১৮৪০ অনুরাধা ঘোষ, ১৯৩২ শান্তনু বসু, ২৩২০ ভাস্কর সেন, ২৩৫৭ অমিয় কুমার রায়, ২৩৮০ সীমা চট্টোপাধ্যায়, ২৫৮০ কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, ২৫৯২ শ্যামশ্রী মুখোপাধ্যায়, ২৬৫৮ রেখা, রুবি ও সিদ্ধার্থ শঙ্কর পাল, ২৭০৪ শুভাশিষ, অমিতাশিষ, ও আশিষ গোস্বামী, ২৭৮৬ প্রীতি মুখোপাধ্যায়, ২৭৮৯ গৌতম গুপ্ত।

টেনিস ঃ

এ বৎসরের উইম্বেলডন টেনিস্ প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া টেনিস খেলায় তাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। গত বৎসরের বিজয়ী রয় এমার্সন (Emerson) এবারও গত বৎসরের রাণার্স কাপ স্টোলেকে পরাজিত করে উপর্যুপরী দু বছর পুরুষদের সিঙ্গলস্ খেতাব জয় করেছেন। এ বৎসরের জয় নিয়ে অস্ট্রেলিয়া গত ১০ বৎসরের মধ্যে মোট ৮ বার পুরুষদের সিঙ্গলস্ জয় করেছে। মেয়েদের সিঙ্গলস্ ও একজন অস্ট্রেলিয়ান মহিলা মার্গারেট স্মিথ জয়লাভ করেছেন।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস্—রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে ফ্রেড ষ্টোলেকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস্ ঃ

কুমারী মার্গারেট স্মিথ অস্ট্রেলিয়া ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে কুমারী মেরিয়া বুনো (ব্রেজিল) কে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস্ ঃ

টনি রোচ ও জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে ফ্লেচার ও বব হিউটকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস্ঃ

মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) এবং বিলি জিম থোকিট (আমেরিকা) ৬-২ ও ৭-৫, এফ, দুর ও জে, লিকরিগকে (ফ্রান্স) কে পরাজিত করে।

মিকস্‌ড ডাবলস্ঃ

কেন ফ্লেচার ও মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ১২-১০ ও ৬-৩ গেমে টনি রোচ ও টেগার্টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ক্রিকেট :

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব টেস্ট ক্যাপটেন ও সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়ালটার হ্যামণ্ড (Harmmond) গত ১লা জুলাই আফ্রিকার ডার্বান সহরে দেহত্যাগ করেছেন। তার মৃত্যুতে ক্রীড়াজগতের একটী অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তিনি প্রথমে পেশাদারী খেলোয়াড় হিসাবে বিলাতের কাউন্টি গ্লস্টার সরকারের হয়ে খেলতে শুরু করেন। ১৯২৮-২৯ সালে তার প্রথম বছরের অস্ট্রেলিয়া সফরে হ্যামণ্ড ৫টী টেস্ট খেলে মোট ৯০৫ রান (গড় ১১৩'১২) সংগ্রহ করে উভয় দেশের ব্যাটিং এর গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। সে বছরের টেস্ট খেলায় তিনি মোট ৪টি সেঞ্চুরী করেন যথা ২৫১, ২০০, ১১৯ নট আউট ও ১৭৭ রান। তিনি ব্যাটিং ছাড়া বলও ভাল করতে পারতেন ও স্লিপে তার মতন ফিল্ডসম্যান কমই হয়েছে। হ্যামণ্ডকে নিঃসন্দেহে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ অল রাউণ্ডার বলা চলে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় মোহনবাগান এখনও অপরাজিত থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। বি. এন. আর দল এ বৎসরের লীগ বিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে গেছে। তাদের খেলা দেখে এখন মনে হচ্ছে তারা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় প্রথম চারটী দলের স্থান নীচে দেওয়া হোল :—

	খেলা	জয়	ড্র	পরা	নং
মোহনবাগান	১৮	১৭	১	৯	৩৫
ইস্টার্ণ রেলওয়ে	১৭	১১	৩	৩	২৫
মহঃ স্পোর্টিং	১৫	১০	৩	২	২৩
ইস্টবেঙ্গল	১২	৯	২	১	২০

পঞ্চম বর্ষ—পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা ভাদ্র—আশ্বিন ১৩৭২ | সেপ্টেম্বর—অক্টোবর ১৯৬৫

মহিষাসুর

উপেন্দ্রকিশোর রায়

একটা ভারী ভয়ঙ্কর অসুর ছিল ; সে মহিষ সাজিয়া বেড়াইত, তাই সকলে তাকে বলিত মহিষাসুর।

দেবতারা কিছুতেই মহিষাসুরকে আঁটিতে পারিতেন না। একশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন ; তাহাতে সে তাঁহাদিগকে হারাইয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজে আসিয়া ইন্দ্র হইল।

দেবতারা তখন আর কি করেন,—তাঁহারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে করিয়া মহাদেব আর বিষ্ণুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, 'হে প্রভু মহিষাসুর ত আমাদের বড়ই দুর্দশা করিয়াছে, আমাদিগকে যুদ্ধে হারাইয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে ; এখন আপনারা যদি আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তবে আমাদের উপায় কি হইবে ?'

অসুরদের অত্যাচারের কথা শুনিয়া শিব ও বিষ্ণুর বড়ই রাগ হইল। সেই রাগে তাঁহাদের আর সকল দেবতাদের শরীর হইতে এমন একটা তেজ বাহির হইল যে সে বড়ই আশ্চর্য ; মনে হইল যেন একটা আগুনের পর্বত আকাশ পাতাল ছাইয়া সকলের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই তেজ জমাট বাঁধিয়া একটি দেবীর মত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া দেবতাদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে মিলিয়া কেহ অস্ত্র, কেহ বল, কেহ বর্ম, কেহ অলঙ্কার আনিয়া তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। হিমালয় বিশাল একটি সিংহ আনিয়া তাঁহার বাহন করিয়া দিলেন।

দেবীর হাজার খানি হাতে দশদিক ছাইয়া গিয়াছে, তাঁহার মুকুট আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে তাঁহার ভারে পৃথিবী বসিয়া পড়িয়াছে, ধনুর শব্দে আকাশ পাতাল কাঁপিতেছে। তিনি যখন হাজার হাতে হাজার অস্ত্র লইয়া গর্জন করিলেন, তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়া উঠিল ; অসুরেরা সেই গর্জন শুনিয়া ছুটিয়া আসিল।

তারপর কি যেমন তেমন যুদ্ধ হইল ? মহিষাসুর নিজে যেমন ভয়ঙ্কর, তাহার এক একটি সেনাপতি ও তেমনি। তাহাদের একটার নাম চিক্ষুর, আর একটার নাম চামর, আরগুলির নাম উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা, বাস্কল, পরিবারিত আর বিড়ালাক্ষ। এই সকল সেনাপতি আর কোটি কোটি অসুর লইয়া মহিষাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিল। সকলে মিলিয়া অস্ত্র যে কত ছুঁড়িল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু সে অস্ত্রে দেবীর কিছুই হইল না।—

তাঁহার এক এক নিশ্বাসে হাজার হাজার ভূত উপস্থিত হইয়া অসুরের দলকে ঠেঙ্গাইয়া ঠিক করিতে লাগিল। দেবীর সিংহ ও আঁচড় কামড় দিয়া তাহাদিগকে কম নাকাল করিল না। আর দেবীর নিজের ত কথাই নাই, তাঁহার হাজার হাতে হাজার অস্ত্র। সে অস্ত্রে তিনি অসুরদিগকে কাটিয়া ফুঁড়িয়া পিষিয়া, পুতিয়া শেষ করিতে লাগিলেন। সেনাপতিগুলির কোনটা দেবীর অস্ত্রের ঘায়ে, কোনটা তাঁহার কীলে আর চাপড়ে, কোনটা সিংহের কামড়ে মারা গেল।

তখন আর মহিষাসুর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে শিং নাড়িয়া, লেজ ঘুরাইয়া গর্জন করিতে করিতে দেবীর ভূতগুলিকে এমন তাড়া করিল যে, তাহারা পালাইতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু বাঁচিতে পারিলে ত পালাইবে ! দেখিতে দেখিতে সে ভূতের দলকে শেষ করিয়া দেবীর সিংহের পানে ছুটিয়াছে তাহার লেজের তাড়ায় সাগর লণ্ডভণ্ড, শিংএর নাড়ায় মেঘ সব খণ্ড খণ্ড হইতেছে, নিশ্বাসের চোটে পাহাড় পর্বত উড়িয়া যাইতেছে। এমন সময় দেবীর পাশ অস্ত্র আসিয়া তাহাকে এমনি বাঁধন বাঁধিল যে আর তাহার নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু অসুরের মায়া, সে কি সহজ কথা ? চোখের পলকে মহিষটা সিংহ হইয়া বাঁধন ছাড়াইয়া আসিল। দেবী তখনই সেই সিংহ কাটিলেন,—অমনি দেখা গেল, আর সিংহ নাই, তাহার জাগায় খড়্গ হাতে একটা মানুষ ক্ষেপিয়া আসিতেছে। মানুষ কাটা যাইতে না যাইতেই কোথা হইতে এক হাতি আসিয়া দেবীর সিংহকে শুঁড় দিয়া জড়াইয়া বসিয়াছে। দেবী খড়্গ দিয়া হাতির শুঁড় কাটিলেন অমনি হাতি আবার মহিষ হইয়া গেল সেটা আবার শিং দিয়া দেবীকে পর্বত ছুঁড়িয়া মারে। দেবী এক লাফে সেই মহিষের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাকে এমনি শূলের ঘা মারিলেন যে তখন অসুর মহাশয়কে সেই মহিষের ভিতর হইতে বাহির হইতেই হইল। কিন্তু তখনও তাহার তেজ কমে নাই,—সে আধা আধি বাহির হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। যাহা হউক যুদ্ধ আর তাহার বেশিক্ষণ করিতে হইল না, কেন না, সেই মুহূর্তেই দেবী খড়্গ দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন ত দেবতাগণের খুব আনন্দ হইবেই। তাঁহারা দেবীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনেক স্তব স্তুতি করিলেন। দেবী তাহাতে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তোমরা কি বর চাও ?'

দেবতাগণ বলিলেন, 'আবার কি বর চাহিব ? মহিষাসুর মরিয়াছে। তাহাতেই আমাদের ঢের হইয়াছে। এখন শুধু এইটুকু বল যে আমাদের আবার যদি বিপদ হয়, তখন ডাকিলে আসিবে।'

দেবী বলিলেন, 'আচ্ছা আমি আসিব।' এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

অসুর যতদিন আছে, ততদিন দেবতাদিগের বিপদ হওয়ার আর ভাবনা কি ?

কাজেই বুঝিতে পার যে দেবীকে শীঘ্রই আবার তাঁহাদের ডাকে আসিতে হইয়াছিল।

এক সৈনিক ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে—হেঁটে হেঁটে তার পা ব্যথা করছে, খিদে পেয়েছে। একটা গ্রামে পৌঁছিয়ে, সে প্রথম যে কুঁড়েঘর পেল, তার দরজায় ঘা দিল। 'ভিতরে এসে বিশ্রাম করতে পারি?' জিজ্ঞাসা করল সৈনিক।

একজন বুড়ি মানুষ দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'এস ভিতরে।'

'বুড়ি ঠাকরুণ, তোমার ঘরে কিছু খাবার আছে?'

বুড়ির ভাঁড়ারে অনেক খাবার ছিল, কিন্তু সে ছিল ভারি কৃপণ, তাই দেখাল যেন সে বড়ই গরীব—'কি আর বলব? কাল থেকে আমি কিছুই খেতে পাইনি।'

'তা', খাওনি যদি, আর কি হবে?' বলে সৈনিক বসল।

খানিক পরে দেখল, বেঞ্চির নীচে একটা হাতল ভাঙ্গা কুড়ুল পড়ে আছে।

'যদি আর কিছুই না থেকে থাকে এ কুড়ুলটা দিয়েই মণ্ড রাঁধা যাবে।'

বুড়ি তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল খানিক; তারপর বল্‌ল, 'কুড়ুল দিয়ে মণ্ড?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা হাঁড়ি আন, দেখবে।'

বুড়ি একটা হাঁড়ি নিয়ে এলে, সৈনিক কুড়ুলখানাকে ধুয়ে হাঁড়ির ভিতরে রাখল, তাতে খানিক জল ঢালল, তারপর হাঁড়িটা চড়িয়ে দিল উনুনে। দেখে, বুড়ির চোখ তো ছানা বড়া!

সৈনিক একটা চামচ দিয়ে হাঁড়ির জিনিষ নেড়েচেড়ে একটুখানি জিভে ঠেকিয়ে বল্‌ল, 'এখনি হয়ে যাবে; আহা, একটু যদি নুন থাকত?'

'আমার কাছে আছে, এই নাও' বলে বুড়ি একটু নুন এনে দিল।

নুন দিয়ে মণ্ড ঘেঁটে ঘেঁটে সৈনিক আবার একটু মুখে দিল, 'এবার একমুঠো কোটা যব হ'লেই ঠিক হ'ত।'

ভাঁড়ার থেকে এক মুঠো যব এনে দিয়ে বুড়ি বল্‌ল, 'এই নাও, ভাল করে যাউ বানাও।'

সৈনিক রাঁধছে তো রাঁধছেই, নাড়ছে তো নাড়ছেই; বুড়ি কেবল তার দিকে চেয়েই আছে। আবার একটু মুখে দিল 'আঃ—চমৎকার খেতে! একটু মাখন হ'লেই একেবারে ঠিক হ'ত।'

বুড়ি একটু মাখনও খুঁজে এনে দিল। মাখনটা দেওয়া হল হাঁড়িতে
'তুমিও একটু খাও ঠাকরুণ?'

তারা দুজনে মিলে খেতে লাগল আর বলতে লাগল—বাঃ বাঃ।
বুড়ি খালি অবাক হয়ে ভাবছে, 'বেশ তো! কুড়ুল থেকে এমন মণ্ড হয় তা তো জানতাম না!'
সৈনিক খাচ্ছে, আর মনে মনে হাসছে।

খা
তা
র
পা
তা

নামের আদর কেন মিলিস্‌
দিনের সকল কাজে ?
পাইস্‌ যদি প্রেমের আদর
রাখিস তাও মাঝে।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১ আশ্বিন
১৩২৯

আঁধারের লীলা আকাশে আলোক-লেখায়,
ছন্দের লীলা অচল মৃদঙ্গে;
অরূপের লীলা রূপের রেখায় রেখায়,
অতলের লীলা চপল তরঙ্গে॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫ চৈত্র
১৩৩২

লীলা।

তোমার লীলা, আমার খেলা,
মেঘের গায়ে বিজুলি লেখা,
নিমেষে নভ, আলোয় আলোময়,
সেই নিমেষে অতুল মেশে,
হৃদয় কোণে, অসীম দেশে,
তোমার সাথে নূতন পরিচয়॥

—॰—

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

চেয়েছ নূতন কথা, নববর্ষে আসে কই?
ভাবিতেছি কথা ছেড়ে কাব্য দিই নয় বই—
বড় কাজে, স্মৃতি তত্ত্ব, সুকৌশলে হয়েছে বই।
এ যাবৎ দেখেছ যেথা দেখিয়ে সে যাবে যবে
জানিয়ে খবরে এই হঠাৎ খাতা দুটি হবে,
তখনো কি লেখা টুকু এ খাতায় জেগে রবে?—
লেখায় নীরব হয়ে অনুস্মরণে কথা কবে?
যা শিখেছি, যা করেছি, যা কিছু কালেতে দিয়ে
পারে নাই কালবাদ আমারে প্রকাশ দিয়া,
ফুটিবে কি কিছু তার ইতস্তত ভিতর দিয়া?

শ্রী কামিনী রায়

৩১শে মার্চ
১৯২৭

১৮ই অক্টোবর।

আজ সকালে সবে ঘুম থেকে উঠে মুখ টুখ ধুয়ে ল্যাবরেটরিতে যাবো, এমন সময় আমার চাকর প্রহ্লাদ এসে বলল, বৈঠকখানায় একটি বাবু দেখা করতে এয়েছেন।'

আমি বললাম, 'নাম জিগ্যেস করেছিস্?'

প্রহ্লাদ বলল, 'আজ্ঞে না। ইংজিরি বললেন। দেখে নেপালি বলে মনে হয়।'

গিয়ে দেখি খয়েরি রং-এর ঝোলা কোট পরা এক ভদ্রলোক—সম্ভবত চীন দেশীয়। আর তাই যদি হয়, তবে চীনা ভিজিটর আমার বাড়িতে এই প্রথম।

আমায় ঘরে ঢুকতে দেখতেই ভদ্রলোক তার সরু বাঁশের ছড়িটা পাশে রেখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমর অবধি ঝুঁকে আমায় অভিবাদন জানালেন। আমি নমস্কার করে তাঁকে বসতে বললাম এবং তাঁর আসার কারণটা জিগ্যেস করলাম।

ভদ্রলোক আমার প্রশ্ন শুনে একেবারে ছেলেমানুষের মত খিলখিল করে হেসে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হে হে হে হে—ইউ ফলগেত, ইউ ফলগেত! ব্যাদ মেমলি, ব্যাদ মেমলি!'

ব্যাড মেমরি? ফরগেট? তবে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আগে কোথাও আলাপ হয়েছিল? আমি কি ভুলে গেছি? আমার স্মরণশক্তি ত এত ক্ষীণ নয়।

আমার অপ্রস্তুত ভাবটা বেশ কিছুক্ষণ উপভোগ ক'রে চীনা ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁর ঝোলা কোটের

পকেট থেকে একটা লাল রঙের কাঠের বল বার ক'রে সেটাকে ডান হাতের দুটো আঙুলের ফাঁকে রেখে আমার নাকের সামনে তিন-চার পাক ঘোরাতেই সেটা সাদা হয়ে গেলো। তারপর আবার একপাক ঘোরাতেই কালো—আর আমারও তৎক্ষণাৎ চার বছর আগের এক সন্ধ্যার ঘটনা পরিষ্কারভাবে মনে পড়ে গেল।

এ যে সেই হংকং শহরের যাদুকর চী-চিং!

চিনতে না-পারার কারণ অবিশ্যি ছিল। প্রথমত চীনেদের পরস্পরের চেহারায় প্রভেদ সামান্যই। তার উপর পরিবেশ আলাদা।—কোথায় হংকং, আর কোথায় গিরিডি!—আর ভদ্রলোকের আজকের পোষাকের সঙ্গে সেদিনের কোন মিল নেই। সেদিন স্টেজে চী-চিং পরেছিলেন একটা সবুজ, লাল আর কালো নক্শা করা ঝলমলে সিল্কের আলখাল্লা। আর তার মাথায় ছিল ডোরাকাটা চোঙা-টুপি।

যাই হোক্, এই এক কাঠের বলের খেলা দেখে আমার মনে সেদিনের সমস্ত ঘটনা বায়স্কোপের ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠল।

আমি তখন যাচ্ছিলাম জাপানের কোবে শহরে পদার্থবিজ্ঞানীদের একটা সম্মেলনে যোগ দিতে। পথে হংকং-এ দু'দিন থেকেছিলাম আমারই এক আমেরিকান বন্ধু প্রোফেসর বেঞ্জামিন হজকিন্স-এর বাড়িতে।

হজকিন্স বৈজ্ঞানিক এবং ষাটের উপর বয়স হলেও ভারি আমুদে লোক। যেদিন পৌঁছলাম, সেদিনই সন্ধ্যায় তিনি আমায় ধরে নিয়ে গেলেন চী-চিং-এর ম্যাজিক দেখাতে।

ম্যাজিক আমার ভালো লাগে তার একটা কারণ হচ্ছে, ম্যাজিকের কারসাজি ধরে ফেলার মধ্যে আমি একটা ছেলেমানুষী আনন্দ পাই। তাছাড়া, কোন নতুন ধরণের ম্যাজিক দেখলে যাদুকরের বুদ্ধির তারিফ করতেও ভালো লাগে। উঁচুদরের যাদুকর মাত্রেরই বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, শরীরতত্ব, মনস্তত্ব—এ সবই তাদের অল্পবিস্তর ঘাঁটতে হয়।

চী-চিং এর নাকি বেশ নাম ডাক আছে, তাই তিনি কী ধরণের যাদু দেখান সেটা জানার একটা আগ্রহ ছিল। হজকিন্স-এর অনুরোধ তাই এড়াতে পারলাম না।

হাত সাফাইয়ের কাজ, আলোছায়ার কারসাজি, যান্ত্রিক ম্যাজিক, রাসায়নিক ভেল্কি এসবই চী-চিং ভালোই দেখালেন। কিন্তু তারপর যখন হিপ্‌নটিজম্ বা সম্মোহনের যাদু দেখাতে আরম্ভ করলেন, তখনই ব্যাপারটা কেমন যেন আপত্তিকর বলে মনে হতে লাগল। সবচেয়ে খারাপ লাগল যখন কতকগুলি নিরীহ গোবেচারা দর্শক বাছাই করে তাদের স্টেজের উপর ডেকে নিয়ে গিয়ে চী-চিং নানান ভাবে তাদের অপদস্থ করতে শুরু করলেন। একটি লোক ত প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে আপেল মনে করে উলের বল চিবোলেন। আরেকজন তার পোষা কুকুর মনে করে বেশ করে একটা চেয়ারের হাতলে হাত বুলোতে লাগলেন। মোহ কাটবার পর দর্শকদের অট্টরোলে এই সব লোকেদের মুখের অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়েছিল।

আমি হজকিন্‌স-কে বললাম, 'আমার ভালো লাগছে না। লোকগুলো কি এইভাবে অপদস্থ হবার জন্য পয়সা দিয়ে ম্যাজিক দেখতে এসেছে?'

হজ্‌কিন্‌স বলল, 'কী উপায় বল? এদের ডাক দিলে এরা যদি স্টেজে যেতে আপত্তি না করে, তাহলে যাদুকরের উপর দোষারোপ করা যায় কী ক'রে?'

আমি সবে একটা উপায়ের কথা ভাবছি, এমন সময় খেয়াল হল দর্শকরা সবাই যেন আমারই দিকে ঘুরে দেখছে। ব্যাপার কী?

হিপ্‌নটাইজ্‌ করার নানারকম চেষ্টা করলেন—প্রোফেসর শঙ্কু ও চী-চিং। পৃঃ ৩৩৬

স্টেজে চোখ পড়তে দেখি চী-চিং হাসি মুখে আমার দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন। চোখাচুখি হতেই চী চিং বললেন, 'আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, একবার স্টেজে আসবেন কী?'

বুঝলাম আমার চেহারা দেখে চী-চিং আমাকেও একজন নিরীহ গোবেচারা বলেই ধরে নিয়েছে। চী-চিংকে শিক্ষা দেবার একটা সুযোগ আপনা থেকেই এসে গেল দেখে আমি খুশি হয়েই স্টেজে উঠে গেলাম।

চী চিং প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমাকে হিপ্‌নটাইজ করার নানারকম চেষ্টা করলেন। চোখের সামনে আলোর লকেট দোলানো, চোখের পাতার উপর আঙুল বুলোন, স্টেজ অন্ধকার করে কেবল নিজের চোখের উপর আলো ফেলে আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে চাওয়া, ফিস্ ফিস্ করে গানের সুরে একঘেঁয়ে ও আবোলতাবোল বকে যাওয়া—এর কোনটাই চী-চিং বাদ দিলেন না। কিন্তু এত করেও তিনি আমার উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন না! আমি যেই সজাগ সেই সজাগই রয়ে গেলাম।

অবশেষে বেগতিক দেখে ঘর্মাক্ত অবস্থায় স্টেজের সামনে এগিয়ে গিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্য করে চাপা বিদ্রূপের সুরে চী-চিং বললেন, 'ভুলটা আমারই। যাকে হিপ্‌নটাইজ করা হবে, তার মস্তিষ্ক বলে বস্তু থাকা চাই। এই ভদ্রলোকের যে সেটি একেবারেই নেই, তা আমার জানা ছিল না।'

দর্শকদের কাছে সেদিনকার মত হয়ত চী-চিংএর মান রক্ষা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর নিজের মনের অবস্থা কী হয়েছিল সেটা জানতে পারিনি, যদিও সেটা অনুমান করা কঠিন নয়।

পরের দিন হংকং ছেড়ে জাপানে চলে যাই।

ফিরতি পথে যখন আবার হংকং-এ নামি, তখন শুনি চী-চিং ম্যাজিক দেখাতে চলে গেছেন অস্ট্রেলিয়া।

তারপর এই চার বছর পরে আমার এই গিরিডির ঘরে তার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ!

কিন্তু তার আসার উদ্দেশ্যটা কী?

আমি প্রশ্ন করার আগে চী-চিংই কথা বললেন।

'ইউ প্লোফেসল সোঁকু?'

উত্তরে জানালাম আমিই সেই ব্যক্তি।

'ইউ সায়াস্তিস্ত্?'

'তাইত মনে হয়।'

'সায়াল্স ইজ্ ম্যাজিক।'

'তা একরকম ম্যাজিকই বটে।'

'অ্যাণ্ড ম্যাজিক ইজ্ সায়াল্স! এঁ? হে হে হে হে!'

চী-চিং বারবার হাসছেন। আমি ক্রমাগত গম্ভীর থাকলে অভদ্রতা হয়, তাই এবার আমি তার হাসিতে যোগ দিলাম।

'ইউ ওয়াল্‌ক্‌ হিয়াল ?' অর্থাৎ, এটা কি তোমার কাজের জায়গা ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তারপর চী-চিংকে নিয়ে গেলাম আমার ল্যাবরেটরি দেখাতে।

আমার আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি, আমার তৈরি ওষুধপত্র, আমার কাজের সরঞ্জাম, চার্ট ইত্যাদি দেখতে দেখতে চী-চিং বারবার বলতে লাগলেন,, 'ওয়াঙ্গাফুল ! ওয়াঙ্গাফুল !'

পাশাপাশি তিনটে বড় বড় বোতলে তরল পদার্থ দেখে চী-চিং বললেন, 'ওয়াতাল ?' আমি হেসে বললাম, 'না, জল নয়। ওগুলো সব মারাত্মক অ্যাসিড।'

'অ্যাসিদ ? ভেলি নাইস, ভেলি নাইস !'

অ্যাসিড কেন 'নাইস' হবে সেটা আমার বোধগম্য হল না।

দেখা শেষ হলে একটা চেয়ারে বসে পকেট থেকে একটা বেগুনী রুমাল বার করে ঘাম মুছে চী-চিং বললেন 'ইউ আল্‌ গ্রেত্‌'। চী-চিং-এর কথার প্রতিবাদ করে আর অযথা বিনয় প্রকাশ করলাম না, কারণ আমি যে 'গ্রেট' সেটা অনেক দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এর অনেক আগেই স্বীকার করেছেন।

'ইয়েস। ইউ আল্‌ গ্রেত। বাত আই অ্যাম গ্রেতাল !'

লোকটা বলে কী ? কোথাকার কোন এক পেশাদার ম্যাজিশিয়ান, অর্থেক সময় লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পয়সা নিচ্ছে—আর সে বলে কিনা আমার চেয়ে 'গ্রেটার' ? কী এমন মহৎ কীর্তি তার রয়েছে যেটা পৃথিবীর আর পাঁচটা পেশাদারী যাদুকরের নেই ?

প্রশ্নটা মনে এলেও, মুখে প্রকাশ করলাম না।

প্রহ্লাদ কিছুক্ষণ আগেই কফি দিয়ে গিয়েছিল। চী-চিং দেখি কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে।

আমিও তার দৃষ্টি অনুসরণ করে উপর দিকে চাইতেই চী চিং বলে উঠলেন, 'লিজাদ'। লিজার্ড—অর্থাৎ সরীসৃপ।

যেটাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলা হল, সেটা হল আমার ল্যাবরেটরির বহুকালের বাসিন্দা একটা টিকটিকি।

জানোয়ারটির বাংলা নাম চী-চিংকে বলতে সে আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

'তিকিতিকি ! হা হা ! ভেলি নাইস ! তিকিতিকি !'

দুই চুমুকে কফিটা শেষ করেই চী-চিং উঠে পড়লেন। তিনি নাকি কলকাতায় ম্যাজিক দেখাবেন সেই রাত্রেই—সুতরাং তাঁর তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। গিরিডি এসেছেন নাকি একমাত্র আমার সঙ্গেই দেখা করতে।

২

চী-চিং চলে যাওয়ার পর অনেক ভেবেও তার আসার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না।

১৯শে অক্টোবর।

আজ দুপুরে আমার ল্যাবেরেটরিতে-কাজ করছি, এমন সময় আমার বেড়াল নিউটন এসে তড়াক করে আমার কাজের টেবিলের উপর উঠে বসল। এ কাজটা নিউটন কক্ষণো করে না। টেবিলের উপরটা আমার গবেষণার নানান যন্ত্রপাতি ওষুধপত্রে ডাঁই হয়ে থাকে। সে আমার বাড়িতে প্রথম আসার কয়েক দিনের মধ্যেই একবার টেবিলে ওঠাতে আমার কাছে ধমক খেয়েছিল। তারপর থেকে আর দ্বিতীয়বার ধমকের প্রয়োজন হয়নি। আজ তাকে এভাবে নিষেধ অগ্রাহ্য করতে দেখে আমি বেশ থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর সামলে নিয়ে কড়া করে কিছু বলতে গিয়ে দেখি সেও চেয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে।

উপরে চেয়ে দেখি কালকের মত আজও টিকটিকিটা সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। নিউটন এ টিকটিকি ঢের দেখেছে এবং কোনদিন কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করেনি। আজ সে পিঠ উঁচিয়ে লোম খাড়া করে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওটাকে দেখছে কেন?

নিউটনকে ধরে নামিয়ে দেবো বলে তার পিঠে হাত দিতেই এমন ফ্যাঁশ করে উঠল যে আমি রীতিমত ভড়কে গেলাম।

টিকটিকিটার মধ্যে এমন কিছু কি সে দেখেছে যেটা মানুষের চোখে ধরা পড়ছে না?

দেরাজ খুলে বাইনোকুলারটার বার করে সেটা দিয়ে টিকটিকিটাকে দেখলাম।

সামান্য একটু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কি? মনে হল, পিঠের উপর লাল চাকা-চাকা দাগটা যেন ছিল না। আর চোখের মধ্যে যে হল্‌দের আভা—সেটাও কি আগে লক্ষ্য করেছি কোন দিন? বোধ হয় না। তবে এটা ঠিক, যে এর আগে কোন দিন বাইনোকুলার দিয়ে এত কাছ থেকে টিকটিকিটাকে দেখার প্রয়োজন হয়নি।

জানোয়ারটাকে নড়তে দেখে চোখ থেকে যন্ত্রটাকে সরিয়ে নিলাম।

টিকটিকিটা সীলিং বেয়ে দেয়ালে এসে নামল। তারপর দেয়াল বেয়ে নেমে এসে সুড়ুৎ করে আমার শিশি বোতলের আলমারিটার পিছনে ঢুকে গেলো।

তাকে আর দেখতে না পেয়েই বোধ হয় নিউটনের উত্তেজনাটা চলে গেলো। সে নিজেই টেবিল থেকে নেমে একটা গর্‌র্‌-গর্‌র্‌ আওয়াজ করতে করতে দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেলো। আমিও টিকটিকির চিন্তা মন থেকে দূর করে আমার গবেষণার কাজ নিয়ে পড়লাম।

আপাতত আমার কাজ হচ্ছে একটি পদার্থ আবিষ্কার করা যেটার ছোট্ট বড়ি পকেটে রাখলেই মানুষ শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা অনুভব করবে। অর্থাৎ একটি 'এয়ার-কণ্ডিশনিং পিল।'

আমার চাকর প্রহ্লাদ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আমার কাজ করছে। সে আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র কখনই ঘাঁটাঘাটি করে না। বাইরের লোকজন কদাচিৎ আমার বাড়িতে এলেও, আমার ল্যাবরেটরিতে কখনই আসে না—এক বৈজ্ঞানিক না হলে, অথবা আমি নিজে না নিয়ে এলে।

আমি যখন ল্যাবরেটরিতে থাকি না, তখন দরজা তালা দিয়ে বন্ধ থাকে। জানালাগুলোও ভিতর দিক থেকে ছিট্‌কিনি লাগানো থাকে।

কাল রাত্রেও দেখে গেছি যে আমার সেই ভীষণ তেজী অ্যাসিডের তিনটি বোতলই প্রায় কানায় কানায় ভর্তি।

আজ সকালে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই দেখি বাঁদিকের—অর্থাৎ কার্বো-ডায়াবলিক অ্যাসিডের বোতলটা প্রায় অর্ধেক খালি।

রাতারাতি যে অ্যাসিড বাষ্প হয়ে উবে যাবে তার কোন সম্ভাবনা নেই। বোতলের গায়ে ফুটো-ফাটাও নেই যে চুঁইয়ে টেবিলে পড়ে শুকিয়ে যাবে। অ্যাসিড্ তবে গেল কোথায়? তিনটি অ্যাসিডের প্রত্যেকটিই এত তেজিয়ান যে সেগুলো নিয়ে কেউ অসতর্ক ভাবে ঘাঁটাঘাটি করলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

আমি বিস্তর মাথা ঘামিয়েও এই রহস্যের কোন কূলকিনারা পেলাম না। অথচ অ্যাসিডের অভাবে আমার এক্সপেরিমেণ্ট চালানো অসম্ভব।

এই অবস্থায় কী করা যায় সেটা ভাবছি এমন সময় একটা মৃদু খচমচ শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে দেখি আমার শিশি বোতলের আলমারির মাথার উপর দিয়ে একটি প্রাণী উঁকি দিচ্ছে।

প্রাণীটি আমারই ল্যাবরেটরির সেই প্রায়-পোষা টিকটিকি, কিন্তু এখন আর তাকে টিকটিকি বলা চলে না, কারণ তার চেহারায় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। চোখের মণিতে এখন আর কালো অংশ বলে কিছুই নেই, সবটাই হল্‌দে এবং সেটা মোটেই স্নিগ্ধ হল্‌দে নয়। বরঞ্চ তাতে কেমন যেন একটা আগুনের ভাঁটার আভাস আছে।

নাকেও একটা প্রভেদ লক্ষ্য করলাম। ফুঁটোগুলো আগের চেয়ে অনেক বড়।

গায়ের রং আগে ছিল হাল্‌কা সবুজ ও হল্‌দে মেশানো। এখন দেখছি সর্বাঙ্গ লাল চাকাচাকায় ভর্তি।

আলমারির পিছনে টিক্‌টিকির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি আমি না জানতাম, তাহলে মনে করতাম এ এক নতুন জাতের সরীসৃপ।

টিকটিকিটা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমারই দিকে তাকিয়ে নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'ফোঁস' বলছি এইজন্যে যে নিশ্বাসের শব্দটা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

আরেকটা কথা বলা হয়নি—টিকটিকিটা লম্বায় আগের চেয়ে কিছু বেশি বলে মনে হল।

আমি তাকিয়ে থাকতেই সেটা আমার দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে টেবিলের দিকে চাইল।

তারপর আলমারির মাথার কোণটাতে এগিয়ে এসে কিছুক্ষণ ওৎ পাতার ভঙ্গীতে চুপ করে থেকে হঠাৎ এক প্রচণ্ড লাফে একেবারে সোজা টেবিলের উপর এসে পড়ল। আমার কাঁচের যন্ত্রপাতি সব ঝন্‌ঝন্ করে উঠল।

আলমারি থেকে টেবিলের দূরত্ব প্রায় দশ হাত; তাই আমার কাছে এই বিরাট লংজাম্প এতই অপ্রত্যাশিত যে আমি কিছুক্ষণের জন্য একেবারে থ মেরে গেলাম।

টেবিলে এসে পড়াতে টিকটিকিটাকে এখন বেশ কাছ থেকেই দেখতে পেলাম। লেজটায়—এক লম্বায় বেড়ে যাওয়া ছাড়া, আর কোন পরিবর্তন হয়নি। পা মাথা চোখ নাক গায়ের রং সবই বদলে গেছে। মাথার উপরটায় দুটো চোখের মাঝখানে লক্ষ্য করলাম একটা ছোট্ট শিং-এর মত কী যেন গজিয়েছে। আর পায়ের নখগুলো যেন অস্বাভাবিক রকম বড় আর তীক্ষ্ণ।

টিকটিকিটা আমার অ্যাসিডের বোতলগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছে।

তারপর দেখলাম মুখটা হাঁ করে সে একটি লক্‌লকে জিভ বার করল। জিভের ডগাটা সাপের জিভের মত বিভক্ত।

এর পরের দৃশ্য এতই অবিশ্বাস্য যে আমার হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কোন উপায়ই রইল না।

টিকটিকিটা তরতর করে এগিয়ে গিয়ে কার্বোডায়াবলিক অ্যাসিডের বোতলটার গা বেয়ে উঠে, পিছনের পা দুটো দিয়ে বোতলের কানাটা আঁকড়ে ধরে সমস্ত শরীরটা বোতলের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে ওই সাংঘাতিক অ্যাসিডের বাকিটুকু চক্‌চক্ করে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল।

খাওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম বোতলের বাইরে দোলায়মান লেজটার চেহারা বদলে গিয়ে বাকি শরীরের সঙ্গে মানানসই হয়ে গেলো, এবং হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ল—'ড্র্যাগন্!'

চীনের ড্র্যাগন!

আমার ঘরের প্রায়-পোষা টিকটিকি আজ ড্র্যাগনের রূপ ধারণ করেছে, আর এই ড্র্যাগনের প্রিয় পানীয় হল আমার ওই মারাত্মক অ্যাসিড!

বৈজ্ঞানিক বলেই বোধ হয় চোখের সামনে এমন একটা আশ্চর্য—প্রায় অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখে, এর পরে আরো কী ঘটতে পারে সেটা জানার একটা প্রচণ্ড কৌতূহল অনুভব করেছিলাম। যা ঘটল তা এই—

টিকটিকিটা অ্যাসিড খেয়ে ড্র্যাগনের রূপ ধরে বোতলের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আয়তনে প্রায় আরো দ্বিগুণ হয়ে গেলো। লক্ষ্য করলাম তার নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাকের ফুটো দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

টিকটিকিটা এবার চলল দ্বিতীয় বোতলের দিকে। এতে আছে নাইট্রোঅ্যানাইহিলিন অ্যাসিড।

বোতলের পিঠটায় সামনের দুপা দিয়ে ভর করে উঠে এক কামড়ে ছিপিটা খুলে ফেলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই টিকটিকিটা আমার সমস্ত নাইট্রোঅ্যানাইহিলিন শেষ করে ফেলল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সাইজ হয়ে দাঁড়াল প্রায় তিন হাত।

দ্বিতীয় বোতল শেষ করে তৃতীয়টির দিকে এগোনর সময় আমার মন বলে উঠল—আর না। এবারে এটাকে সায়েস্তা করার উপায় বার করতে হবে। হলই বা অ্যাসিড-খোর; আমার মত বৈজ্ঞানিকের হাতে কি একে ঘায়েল করার কোন কল নেই?

আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমি ঘরের কোণায় রাখা লোহার সিন্দুকটা থেকে আমার ব্রহ্মাস্ত্র, অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রিক পিস্তলটা বার করলাম। তাগ করে মারলে একটি ৪০০০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক-শক্ যে কোন প্রাণীকে নিঃসন্দেহে ধরাশায়ী করবে। পিস্তলটি আবিষ্কার করার পর আজ পর্যন্ত এটার ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন হয়নি। আজ আমি এর শক্তি পরীক্ষা করব এই ড্র্যাগনের উপর।

ড্র্যাগন তখন সবে আমার ফেরোসোটানিক অ্যাসিডের বোতলের ছিপিটি খুলেছে। আমি অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে পিস্তলটি উঁচিয়ে তার কাঁধের উপর তাগ করে ঘোড়া টিপতেই একটা বিদ্যুতের শিখা তীরের মত গিয়ে লক্ষ্যস্থলে লাগল।

কিন্তু অবাক বিস্ময়ে এবং গভীর আতঙ্কে দেখলাম যে, যে-শকে একটি আস্ত হাতি ভস্ম হয়ে যাবার কথা, সে শক্ এই সাড়ে তিন হাত (ড্র্যাগনটি আয়তনে ক্রমেই বেড়ে চলেছে) প্রাণীর কোনই অনিষ্ট করতে পারল না। সামান্য একটু শিউরে উঠে ড্র্যাগন বোতল ছেড়ে প্রায় দশ সেকেণ্ড তার হলুদ জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি অনুভব করলাম আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে।

তারপর ড্র্যাগনের নাক দিয়ে পড়ল নিশ্বাস, আর নিশ্বাসের সঙ্গে বেরোল রক্তবর্ণ ধোঁয়া। সেই তীব্র ঝাঁঝালো বিষাক্ত ধোঁয়ায় আমার দৃষ্টি ও চেতনা লোপ পেতে শুরু করল।

অজ্ঞান হবার আগের মুহূর্ত অবধি আমি দেখতে পেলাম ড্র্যাগন তার পায়ের আঘাতে ও লেজের আছড়ানিতে আমার টেবিলের সমস্ত যন্ত্রপাতি লণ্ডভণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করছে।

* * *

প্রহ্লাদের গলার আওয়াজে জ্ঞান হল।

'বাবু, বাবু!'

ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি ল্যাবরেটরির চেয়ারে বসে আছি।

প্রহ্লাদ জিভ কেটে বলল, 'অ্যাই ছ্যাখ—আপনি ঘুমিয়ে পড়লে, আমি বুইঝতে পাইনি!'

'কী হয়েছে?'

'সেই ন্যাপালি বাবু। তেনার লাঠিটা ফ্যালে গেলেন যে!'

'লাঠি?'

দরজার দিতে চোখ পড়তে দেখি হাসি মুখে চী-চিং দাঁড়িয়ে আছেন—তার হাতে সেই সরু বাঁশের

'দিস্ তাইম, আই ফলগেত···মাই স্তিক্। হে হে! ভেলি সলি!'

আমার মুখ দিয়ে কেবল বেরোল—'বাট-দি ড্র্যাগন?'

'দাগন? ইউ সী দাগন?'

'আমার সমস্ত যন্ত্রপাতি···'

বলতেও লজ্জা করল—কারণ আমার টেবিলের জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনিই আছে। কিন্তু

অ্যাসিড ?

তিনটি বোতলই যে খালি!

আমি বিস্ফারিত নেত্রে খালি বোতলগুলোর দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় শুনলাম চী-চিং-এর খিলখিল হাসি।

'হি হি হি! এ লিত্‌ল্‌ ম্যাজিক—বাত গ্রেত ম্যাজিক!…ওই যে তোমার ড্র্যাগন।'

চী-চিং কড়িকাঠের দিকে আঙুল দেখালেন।

উপরে চেয়ে দেখি আমার চিরপরিচিত টিকটিকি তার জায়গাতেই রয়েছে।

'অ্যান্দ ইয়োল অ্যাসিদ!'

এবার টেবিলের দিকে চাইতেই চোখের নিমেষে তিনটি খালি বোতল স্বচ্ছ তরল পদার্থে কানা অবধি ভরে উঠল।

চী চিং এবার বাঙালি কায়দায় দুটো হাতের তেলো একত্র করলেন।

'নোমোস্কাল, প্লোফেসাল সোঁকু,'

চী-চিং চলে গেলেন।

প্রহ্লাদ শুনলাম বলছে 'ভাবলাম বেশ সরেস লাঠিখান—কাজে দেবে। ও মা—বাবু এই গেলেন আর এই এলেন। পাঁচ মিনিটও হয়নি।'

* * *

পুনশ্চ। ১৮ অক্টোবর। ড্র্যাগনের ঘটনাটা ডাইরিতে লিখতে গিয়ে দেখি সেটা লেখা হয়ে গেছে—আমারই হাতের লেখায়। এটাও কি তাহলে চী-চিংএর দুর্ধর্ষ ম্যাজিকের একটা নমুনা?

ছোটদের ছড়ার ব্যায়াম

স্বপন বুড়ো

—এক—

এক যে বনের বাঘ
তার বিষম হল রাগ !
চকখড়িটা নিয়ে দেহেই
লাগায় বসে দাগ !
বদ্যি-পুরুত ছুট্টে এলে
বল্লে, তোরা ভাগ্
মাছ-মাংস ছেড়ে এবার
খাবো পালং শাগ ॥

—দুই—

জাম খেতে চাও যদি হয়ো না জামাই—
আম খেতে আপিসেতে কোরো না কামাই !
সজ্‌নের ডাঁটা নিয়ে সাজ্‌বে যদি
খর্‌মুজা সাথে খাও খাট্টা দধি !
কামরাঙা খেতে তব সাধ যদি ভাই
মাছরাঙা হয়ে এসো প্রাণের কানাই ॥

—তিন—

সর্দি হলে সন্ত কেনা রদ্দি কুকুরের
শক্ত করে তপ্ত জলে রাখবে পুকুরের।
সপ্ত দিনে ছাড়বে নাড়ি গিল্‌লে বড়ি যে—।
আচ্ছা করে বাঁধবে তারে শক্ত দড়িতে ॥

—চার—

গরমেতে আই ঢাই গল্ গল্ ঘাম—
তালপাখা নিয়ে আয় তবেই আরাম।
আম খাও জাম খাও, কাঁঠালের কোয়া—
একবাটি ঘন ক্ষীর গেছে ভাই খোয়া।
তবে ভাই শুধু খাও ঘটি-ঘটি জল—
শীতল পাটিতে শুয়ে হও না তরল ॥

—পাঁচ—

দুর্গাপুরের বর্গাদার
চল্‌লো নাকি স্বর্গদ্বার !
কান্না যে খোল-করতালে—
গোল বাধালো হরতালে— !
সবাই ঢালে চিতায় ঘী—
জ্বল্‌ল না যে চিতাই—ছিঃ !

—ছয়—

কাকের বাসায় কোকিল ছানা
কেউ জানে না—কেউ জানে না !
ফুটলো যখন তাহার বোল
কোকিল গানের তুল্‌লো রোল !
কাকরা বলে কী বিশ্রী—
শীগ্রি খাওয়াও ঘী-মিশ্রী !

—সাত—

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেবো মেপে—
আয় বৃষ্টি জোরে—
গয়না দেবো তোরে !
আয় বৃষ্টি নেমে
নইলে মরি ঘেমে !
আয় বৃষ্টি ধীরে—
ভরবো বাটি ক্ষীরে !
আয় বৃষ্টি কাছে—
তবেই পরাণ বাঁচে !
আয় বৃষ্টি আয়—
মেঘ যে ডেকে যায় ॥

শৃগাল-চরিত

গৌরী চৌধুরী

মহিলারোপ্য নগরের ঠিক মাঝখানের বিরাট চত্বরটি ছাড়িয়ে পুবমুখো এগিয়ে গেলে খানিকটা দূরেই আগাগোড়া ধবধবে সাদা যে প্রকাণ্ড প্রাসাদটি চোখে পড়ে, সেটির মালিক নগরের নামকরা শ্রেষ্ঠী বর্ধমান। দু'বছর অন্তর অন্তর বর্ধমানের জাহাজ পণ্যে বোঝাই হয়ে পাল উড়িয়ে দূরদূরান্তরে সমুদ্রে বাণিজ্য করতে যায়। সারা দাক্ষিণাত্য জুড়ে বিশ রকমের কারবারে বর্ধমানের একগুণ টাকা একশগুণ হয়ে ফিরে আসে। মা বাবা স্ত্রী ছেলে মেয়ে দাসদাসী নিয়ে বর্ধমানের সোনার সংসার। অতি সজ্জন মিষ্টভাষী, সদালাপী, বেশভূষায় কোন আড়ম্বর নেই, শুধু উৎসবে-আমোদে দুকানে দুটি হীরে পরেন, লোকে বলে, দাম তার লক্ষ টাকা।

সেবার সমুদ্র থেকে ঘুরে এসে বর্ধমান হঠাৎ অসুখে পড়লেন। ছমাস ভুগে, ছমাস বিশ্রাম করে, যেদিন মনে হল বেশ সেরে উঠেছেন, সেইদিনই রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে বর্ধমান ভাবতে লাগলেন—আর বসে থাকা নয়। যোগাড়যন্তর করে নিয়ে আসছে মাসেই বেরিয়ে পড়তে হবে। এবার যাব মথুরা। উত্তরের দিকটায় আজ পর্যন্ত তো যাওয়াই হয় নি। বেশ বেড়ানও হবে, তীর্থও করা হবে, আর বাণিজ্য তো আছেই।

পরদিন থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। আরও কয়েকজন বন্ধু বণিককে ডেকে পাঠালেন বর্ধমান। মলয়পাহাড়ের সেরা চন্দনকাঠ পঞ্চাশ গাড়ি, পঁচিশ গাড়ি কালাগুরু, দশ গাড়ি এলাচ সাজান হল। লোকজন, পাহারাদার, রসদপত্তর উঠল আরও পাঁচটা গাড়িতে। আর বন্ধুদের নিয়ে বর্ধমান উঠে বসলেন নরম গদিমোড়া, পুরু ছইয়ের তলায় খসখস দিয়ে ঢাকা, রেশমী কাপড়ের ঝালর দেওয়া একটি আনকোরা নতুন গাড়িতে। সিঁদুর-আঁকা পূর্ণঘটে ডাবের শীষ, মাথায় মায়ের দেওয়া গৃহদেবতার প্রসাদী ফুল—শুভদিনে শুভক্ষণে বর্ধমান বেরিয়ে পড়লেন।

গোশালা থেকে বেছে বেছে যে বলদ দুটিকে বর্ধমানের গাড়িতে যোতা হয়েছিল, তাদের নাম সঞ্জীবক আর নন্দক। বিশাল চেহারা, শিঙজোড়া যেন পাথরের তরোয়াল, সাপের মত লেজের তলায় চামরের মত দুলছে কুচকুচে কালো চুল। হাতির মত খায়, ঘোড়ার মত চলে, বর্ধমান যখন আদর করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, তখন চোখ বুজে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

গাড়ির ভেতর আরাম করে শুয়ে বসে বন্ধুরা বলাবলি করতে লাগলেন—গাড়ি তো নয়, যেন পুষ্পক রথ। গরু তো নয় যেন ঐরাবত। সত্যি এমন আরামে এতদিনের পথ কখনো এসেছি বলে মনে পড়ে না। গাড়ির একেবারে সামনের দিকে যিনি বসেছিলেন, তিনি বলে উঠলেন—ঐ তো যমুনা।

অ্যাঁ, বল কি, যমুনা এসে গেল?—বলতে বলতে সকলে একসঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলেন, গাড়োয়ান সামাল সামাল করতে করতে গাড়িটা একটা হেচকি তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াল, কাদায় পা পুঁতে গিয়ে ছটফট করতে লাগল সঞ্জীবক।

বর্ধমান শুকনো মুখে নেমে এলেন। সঞ্জীবকের কাঁধ থেকে জোয়াল খুলে নেওয়া হল। বর্ধমানের দিকে করুণ চোখে তাকাতে তাকাতে সঞ্জীবক কাদার ওপর বসে পড়ল। গাড়োয়ান পরখ করে দেখে বলল—সামনের ডান পাটি একেবারে মচকে গেছে।

—এখন কি হবে?

বর্ধমান বললেন—কি আবার হবে? দু-একদিনের মধ্যেই সঞ্জীব সেরে উঠবে'খন। আমরা এইখানেই একটু অপেক্ষা করি। সঙ্গে খাবারদাবার রয়েছে অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে—ভাবনা কি? ও সেরে না উঠলে নন্দনই বা চলবে কি করে?

—কিন্তু……ওদিকে যে কথা দেওয়া আছে, ঠিক সময়ের মধ্যে পৌঁছতে না পারলে—

—আমরা ঠিক সময়ের অনেক আগেই এসে পড়েছি। দুদিন তিনদিন দেরী হলেও আমাদের কিছু এসে যাবে না। সঞ্জীবককে ফেলে আমি যেতে পারব না। মনে করুন না কেন, পথে দুদিন বিশ্রাম করে নিচ্ছেন?

—তা না হয় মনে করলুম, কিন্তু সামনেই যে গভীর বন, রাত্রে কি হবে?

বর্ধমান একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—অত ভয় থাকলে বাণিজ্য হয় না। মনে সাহস রাখুন। এত লোকজনের মাঝখানে জন্তুজানোয়ার কি করবে? তাদেরও তো প্রাণের মায়া আছে?

বন্ধুরা চুপ করে গেলেন। আস্তে আস্তে দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যে নামল। সারা রাত ধরে বন থেকে প্রাণ-কাঁপানো সব আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল, পাহারাদারেরা আগুন জ্বেলে লাঠি সড়কি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর বর্ধমান অচল অনড় হয়ে সঞ্জীবকের পাশে বসে তার গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

এইভাবে কেটে গেল পর পর তিনটি রাত। চতুর্থ দিন সকালে পাঁচ বন্ধু একসঙ্গে বর্ধমানের কাছে এসে বললেন—দেখুন, আমরা আর থাকতে পারছি না। আজ আমাদের যেতেই হবে।

বর্ধমান কিছু না বলে জলভরা চোখে সঞ্জীবকের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন,। তারপর পাহারাদারদের মধ্যে থেকে চারজন পালোয়ানকে ডেকে বললেন—তোমাদের ভরসায় একে রেখে যাচ্ছি। পালা করে চারজনে চব্বিশঘণ্টা পাহারা দেবে। যেন ভুল না হয়। সেরে উঠলে সঙ্গে করে মথুরায় নিয়ে যাবে, আমি অপেক্ষা করব।

বর্ধমান চলে গেলেন।

চারদিন বাদে মথুরার শ্রেষ্ঠীবন্ধুর বাড়িতে বসে বর্ধমান পাঁচ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতদের সঙ্গে চন্দনকাঠের দর নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন, এমন সময় চার পাহারাদার এসে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে বললে—হুজুর আপনি চলে আসবার দুদিন পরেই সঞ্জীবক বেচারা মারা গেল। আমরা তাকে যমুনার তীরে দাহ করে এসেছি।

বর্ধমান অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল পড়তে লাগল। কয়েকদিন বাদে সঞ্জীবকের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করে, বেচাকেনা শেষ করে দেশে ফিরে এলেন বর্ধমান।

সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করে ভোরের দিকে একটু ঘুম এসেছিল সঞ্জীবকের। হঠাৎ কি একটা আওয়াজে চটকা ভেঙ্গে গিয়ে দেখলে, তার ধারে কাছে কেউ নেই। চমকে উঠে ঘাড় তুলেই সঞ্জীবক দেখতে পেল, অনেক দূরে বনের আড়ালে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে চার পাহারাদার। সঞ্জীবক নড়ল না, চড়ল না, আওয়াজ করল না, চুপচাপ সেইখানে কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল।

একদিন কাটল, দুদিন কাটল,—বাঘ না, সিংহ না, সাপ না, খোপ না, সঞ্জীবক নির্বিঘ্নে ঘুমোতে লাগল যমুনার মিষ্টি হাওয়ায়, নরম কাদার বিছানায়। তিনদিনের দিন ভোরবেলা সঞ্জীবক উঠে দাঁড়াল, আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে মুখে পুরে দিল এক গরস রসালো নরম কচি ঘাস। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে মনের আনন্দে ডেকে উঠল—গাঁ…আ ··আ…আ…আ।

দেখতে দেখতে সাতদিনের মধ্যে সঞ্জীবকের চেহারা হল আগের চেয়েও দুর্ধর্ষ, শিঙ হল গণ্ডারের খড়্গের মত ধারালো, ঢেউ-খেলানো পিঠের ওপর দিয়ে স্বাস্থ্যের আর সৌন্দর্যের জোয়ার বইতে লাগল। এখন সঞ্জীবক সারাদিন ধরে ঘুরে ঘুরে মচর মচর ঘাস খায়, শিঙ দিয়ে ঢুঁ মেরে মেরে উইঢিবির ধুলো ওড়ায়, আর থেকে থেকে আষাঢ়ের মেঘের মত গর্জন করে ওঠে।

সেদিন বনের রাজা পিঙ্গলক দলবল নিয়ে যমুনায় জল খেতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—একটু দূর থেকে ভেসে আসছে প্রলয়ের শাঁখের মত গম্ভীর আওয়াজ। পিঙ্গলকের বুক দুরদুর করে উঠল। যমুনায় না নেমে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে সে আস্তে আস্তে বসে পড়ল। মন্ত্রী-শান্ত্রী, পাত্র-মিত্র, চর-অনুচর—এরাও সব কিছুই না বুঝে একে একে গম্ভীরমুখে বসে পড়ল রাজাকে ঘিরে। আর ঝোপের ওপাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দুই শেয়াল—করটক আর দমনক, পিঙ্গলকের দুই খেদানো মন্ত্রীর ছেলে।

দমনক করটকের কানে কানে চুপি চুপি বললে—ব্যাপার কি ?

করটক বললে—যেতে দাও, যেতে দাও। ব্যাপার জেনে আমাদের লাভ ? একবার তাড়ানি খেয়েছি, এবার কি মারা পড়ব ? চল, খাবার যোগাড় দেখি গে।

দমনক রাগ করে বলল—ঐ খাওয়াটুকুই চিনেছ। একটা কোন বড় হবার ইচ্ছে নেই, উৎসাহ নেই, চেষ্টা নেই।

করটক বলল—কি করতে চাও শুনি ?

—মহারাজ ভয় পেয়েছেন, এমন একটা সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতে আছে ? এগিয়ে তো যাই তারপর কি হয় দেখা যাবে।

—বেশ যাও। আমি কিন্তু যাচ্ছি না। তুমি ঘুরে এস। আমি এইখানে দাঁড়িয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

পিঙ্গলক মাটির দিকে একমনে তাকিয়ে ভাবছিল, কি করা যায়। এমন সময় শুনলে—মহারাজ, আসতে পারি ? চোখ তুলে পিঙ্গলক দেখলে, হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে দমনক। সিংহ খুশি হয়ে বললে—এস, এস, অনেকদিন বাদে দেখা। কি ব্যাপার ? কেমন আছ-টাছ ?

দমনক পা মুড়ে বসে পড়ে বললে—আমাদের আর থাকা। কোনরকমে বেঁচে আছি, এই পর্যন্ত। আপনাকে একটা কথা বলবার ছিল। কথাটা একটু গোপন।

পিঙ্গলক চোখের ইসারায় সবাইকে সরিয়ে দিলে। দমনক আর একটু কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় বললে—জল খেতে গিয়ে ফিরে এলেন যে ?

পিঙ্গলক একটু শুকনো হেসে বললে—ও কিছু না, এমনি। এখনো তেমন তেষ্টা পায়নি, তাই একটু…

দমনক বললে—যদি তেমন গোপনীয় কিছু হয়, তাহলে থাক, আমি শুনতে চাই না।

—না, ব্যাপারটা হচ্ছে · এই…আচ্ছা দমনক, তুমি শুনতে পাচ্ছ দূর থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে ?

—হাঁ, পাচ্ছি। কিন্তু তাতে কি ?

—তাতে এই যে আমি আর এ বনে থাকছি না। আজ দুপুরের ভেতরেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে—

—সে কি ? কেন ?

—যার আওয়াজ শুনেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যাচ্ছে, তার চেহারাটা কি রকম হতে পারে একবার ভেবে দেখেছ ? এই বুড়ো বয়সে বেঘোরে প্রাণটা হারাব ?

দমনক গালের একপাশে হেসে বলল—মহারাজ, শব্দ শুনেই ভয় পেয়ে গেলেন ? আমার মামাতো ভাইয়ের কি হয়েছিল জানেন ? বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল—গুম্ গুম আওয়াজ। প্রথমটা খুব ভয় পেয়ে গেল, তারপর ভাবল—উঁহু, আগে দেখি কিসের শব্দ, তারপর ভয় পাওয়া যাবে'খন। গিয়ে দেখে, ও হরি, একটা যুদ্ধের দামামা মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছে, আর জোর হাওয়ায় দুলতে দুলতে

তার ওপর থেকে থেকে এসে ঘা দিচ্ছে একটা গাছের নিচু ডাল। আমার ভাই হেসে উঠে সেটাকে খুব খানিক তাকধুমাধুম বাজিয়ে তারপর ভাবলে এটাকে খুলে দেখি, ভেতরে নিশ্চয় অনেক মাংস-টাংস পাওয়া যাবে। দাঁত-টাঁত ভেঙ্গে চামড়া কেটে ভাই দেখলে—ভেতরে কিচ্ছু নেই, ঢকঢক করছে!

সিংহ বললে—গল্প তো খুব শোনাচ্ছ। ওদিকে আমার প্রজারা যে ভয়ে আধমরা হয়ে পালাবার যোগাড় করছে।

—ওদের আর দোষ কি বলুন? যেমন দেখবে, তেমনই তো হবে? যাক, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি গিয়ে খোঁজ করে আসছি কিসের শব্দ, কি বৃত্তান্ত। ততক্ষণ একটু ধৈর্য ধরে বসে থাকুন।

—বল কি, তুমি সেখানে যাবে?

—না যাবার কি আছে? আপনার জন্যে না করতে পারি এমন কাজ নেই। সাপের মুখে যেতে বলেন যদি, তাও পারি।

—আচ্ছা। সাবধানে যেয়ো কিন্তু। দমনক চলে গেল। সিংহ বসে বসে ভাবতে লাগলো—কাজটা বোধ হয় ভালো করলুম না। ঝোঁকের মাথায় সব কথা বলে ফেললুম—এখন কি হবে কে জানে?

একটু বাদেই দমনক ফিরে এল—একটু অন্যমনস্ক, ভাবিত ভাবিত মুখ।

পিঙ্গলক বললে—কি? কি খবর? কেমন দেখলে?

দমনক গম্ভীরমুখে বললে—যা দেখলুম, তাতে ভয় হবার কথাই বটে। তবে আপনি যদি বলেন তো তাকে আপনার পায়ের তলায় এনে হাজির করতে পারি এক্ষুণি।

পিঙ্গলক উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তা যদি পার, তাহলে আজ থেকে তুমি আমার মন্ত্রী। শুধু মন্ত্রী কেন, দণ্ডমুণ্ডের সব ভার আজ থেকে তোমার হাতে।

তখন দমনক ছুটতে ছুটতে চলে গেল যমুনার ধারে। উঁচু গলায় হেঁকে বললে—এই ষাঁড়, তোর প্রাণে ভয়-ডর নেই? গাঁক-গাঁক করে চেঁচাচ্ছিস? শীগগির চলে আয়। আমার মনিব পিঙ্গলক তোকে ডাকছেন!

সঞ্জীবক খাওয়া থামিয়ে বলল—পিঙ্গলক, সে আবার কে?

দমনক গর্জন করে বলল—সে নয়, তিনি। এই বনে ঘুরে বেড়াস, গাণ্ডেপিণ্ডে ঘাস খাস, আর বনের রাজা রাজসিংহ পিঙ্গলকের নাম জানিস না?

সঞ্জীবকের মুখ থেকে ঘাসের গরস মাটিতে পড়ে গেল। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে সঞ্জীবক বলল—ভাই, তুমি যে হও আর সে হও, আমায় বাঁচাও।

দমনক চোখের বাঁ-কোণে হেসে বললে—এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা। আচ্ছা, তাহলে এখানে দাঁড়া। আমি আমার মনিবকে বুঝিয়ে আসি।

সঞ্জীবক শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইল। দমনক লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

সিংহের কাছে এসে দমনক বললে—মহারাজ, আলাপ করুন। যে-সে নয়, স্বয়ং শিবের ষাঁড়।

কৈলাস পাহাড় আগাগোড়া বরফে ঢেকে গেছে কিনা, তাই শিব বলেছেন—যাও, তুমি যমুনার তীরে গিয়ে কটা মাস খেয়ে-দেয়ে খেলে-ধুলে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে শরীর সারিয়ে এস। শুঁকে দেখলুম, পিঠের কাছটায় এখনও বাঘছালের গন্ধ।

পিঙ্গলক বললে—আমি তো তোমাকে গোড়া থেকেই বলছি, নিশ্চয় একটা হোমরা চোমরা কেউ। তুমি তো উড়িয়েই দিচ্ছিলে। তারপর? তুমি কি বললে?

—আমি বললুম, আমাদের প্রভু হচ্ছেন দেবী চণ্ডিকার বাহন। কদিনের ছুটি নিয়ে হাওয়া খেতে এসেছেন। ভালোই হল, আপনি এসেছেন। চলুন আমাদের ওখানেই গিয়ে থাকবেন।

—তাতে উনি কি বললেন?

—একটু হেসে বললেন, তা তো থাকব, কিন্তু তোমার প্রভু পিঙ্গলক অভয় দিচ্ছেন তো? কোনদিন মাংস-টাংস কম পড়লে আমাকেই ধরে—

পিঙ্গলক উঠে দাঁড়িয়ে ডান থাবা দিয়ে দমনকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে—তাঁকে গিয়ে বল, আমি তাঁকে অভয় দিচ্ছি। তিনি আমাকে অভয় দিচ্ছেন তো? যাও, আর দেরী করো না, এক্ষুণি গিয়ে তাঁকে নিয়ে এস।

পিঙ্গলকের চোখের আড়ালে গিয়ে দমনক খুব খানিকটা নেচে নিলে, তারপর এক দৌড়ে সঞ্জীবকের কাছে গিয়ে বললে—আর ভয় নেই বন্ধু। সব ব্যবস্থা করে এসেছি। নির্ভয়ে চলে যাও। শুধু একটি কথা—সিংহের বন্ধুত্ব পেয়ে অহঙ্কারে যে ধরাকে সরা জ্ঞান করবে আর আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে, সেটি হবে না। আমার সব কথা তোমাকে মেনে চলতে হবে।

সঞ্জীবক বললে—তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। তুমি শুধু সিংহকে একটু সামলে-সুমলে রেখো। আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করছে।

দমনক বলল ভয়ের কি আছে? আমি তো রয়েছি। এখন চল তো। দেরি দেখলে উনি আবার রেগে যেতে পারেন।

সঞ্জীবকের চোখের সামনে ভেসে উঠল মহিলারোপ্য নগরের বাড়িঘর পথঘাট, নগরের বাইরে গোচারণের মাঠ, প্রাণের বন্ধু নন্দনক, বুড়ো ঠাকুরদা স্থবিরক, গাভী আয়তাক্ষীর শান্ত করুণ দুটি চোখ, আর চলে যাওয়ার মুহূর্তে বর্ধমানের সেই বিষণ্ণ মলিন মুখ। একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে সঞ্জীবক বললে—চল।

সঞ্জীবকের সম্মানে সেদিন পিঙ্গলকের বাড়িতে এক বিরাট্ নিরামিষ ভোজ হল। সিংহ আর ষাঁড় পাশাপাশি বসে একপাতে ঘাস খেল। দমনক মুখের এদিক দিয়ে খেয়ে ওদিক দিয়ে ফেলে দিয়ে বললে—সত্যি, যেমন রঙ্, তেমনি সুগন্ধ, তেমনি সোয়াদ। এবার থেকে তো রোজ এই খেলেই হয়। কেন যে মিছিমিছি—

পিঙ্গলক মিষ্টি হেসে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লে, তারপর ভোজের শেষে উঠে দাঁড়িয়ে দমনক আর করটককে পাশে ডেকে এনে সবাইকার সামনে তাদের মন্ত্রীর পদে বহাল করলে।

একমাস যেতে না যেতে সিংহে আর ষাঁড়ে গলায়-গলায় ভাব হল। দুজনে একসঙ্গে থাকে, বেড়ায়, গল্প করে, ঘুমোয়। করটক দমনক দুই শেয়ালে রাজ্য চালায়, পিঙ্গলক চেয়েও দেখে না।

সিংহ আর ষাঁড়ে গলায় গলায় ভাব হল।

সঞ্জীবকের সঙ্গে দিনরাত থাকতে থাকতে আর তার মুখে ধর্মকথা শুনতে শুনতে শেষকালে পিঙ্গলক শিকার করা পর্যন্ত ছেড়ে দিলে। গলার আওয়াজ অনেকটা ষাঁড়ের মত হয়ে গেল, মাটিতে ঘষে ঘষে থাবা ভোঁতা করে ফেলল, আর মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে লাগল—কি যে এক বোঝা চুল হয়েছে মাথায়, এর চেয়ে একজোড়া শিঙ থাকলে কত কাজ দিত।

একদিন দমনক বলতে গিয়েছিল—মহারাজ, প্রজারা সব না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে। একটা কিছু উপায় না করলে—

পিঙ্গলক ধমকে উঠল—যাও, যাও, এখন বিরক্ত ক'রো না, রামায়ণের গল্প শুনছি। সঞ্জীবক, তারপর ?

ক্ষিদের চোটে সরু হয়ে গিয়ে করটক আর দমনক শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল কি করা যায়। করটক বললে—নিজের হাতে করে আগুন নিয়ে এসেছ, এখন বোঝ।

দমনক বললে—অত ঘাবড়াচ্ছ কেন ? বুদ্ধি তো আর পালিয়ে যায় নি। দাঁড়াও না, ঐ ষাঁড়টার সঙ্গে মহারাজের ঝগড়া না বাধাই, তো আমার নাম দমনক নয়।

করটক বললে—ওসব করতে যেও না হে, বিপদে পড়বে। ষাঁড়টা মোটেই বোকা নয়। আর গায়ের জোর তো তোমার আমার পঞ্চাশগুণ।

—গায়ের জোরে ওর সঙ্গে পেরে উঠব না, সে কথা আমিও জানি। ওকে হারাব বুদ্ধির জোরে।

ক্রমশঃ

য়োরিণ্ডা আর য়োরিঙ্গেল

(গ্রিম-ভাইদের সংগ্রহ থেকে)

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাণ্ড গভীর এক বনের মধ্যে ছিল এক পুরোনো প্রাসাদ। তার মধ্যে থাকত এক বুড়ি—একলা। সে ছিল ডাইনি। দিনের বেলা সে বেড়াল কিংবা পেঁচার রূপ নিত কিন্তু প্রতিরাত্রে সে আবার মানুষ হয়ে যেত। এমনি করে সে বুনো জন্তু পাখিদের ভুলিয়ে এনে ধরে মেরে সিদ্ধ করে খেত। প্রাসাদের একশ পায়ের সীমানার মধ্যে যদি কোনো মানুষ এসে পড়ত সে আটকে যেত মাটিতে। যতক্ষণ না ডাইনি ছেড়ে দেবার মন্ত্র পড়ত ততক্ষণ পর্যন্ত সে নড়তে পারত না। কিন্তু যদি কোনো ভালোমানুষ মেয়ে সেই প্রাসাদের কাছে এসে পড়ত তাহলে ডাইনি তাকে পাখি বানিয়ে খাঁচায় পুরে রেখে দিত। তারপর সেই খাঁচা টাঙিয়ে রেখে দিত প্রাসাদের এক ঘরে। ডাইনির বাড়িতে এমনি হাজার হাজার খাঁচা ছিল—তাদের মধ্যে সুন্দর সুন্দর পাখি।

সেই সময় ছিল একটি মেয়ে য়োরিণ্ডা—সে ছিল পৃথিবীর সব মেয়ের চেয়ে সুন্দরী। তার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল একটি খুব সুন্দর ছেলের—তার নাম য়োরিঙ্গেল। বিয়ের আগে তারা দুজনে একসঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াতো—ভারি ভালো লাগত তাদের। একদিন বেড়াতে বেড়াতে তারা বনের মধ্যে গভীরে গিয়ে পড়েছিল। য়োরিঙ্গেল বললে—সাবধান য়োরিণ্ডা, প্রাসাদটির বেশি কাছে না যাওয়াই ভাল।

ভারি মনোহর সন্ধ্যা। ঘন সবুজ বনের গাছের গুঁড়ির মধ্যে দিয়ে সূর্য-কিরণ নেচে বেড়াচ্ছে। বুড়ো বীচ গাছের মধ্য থেকে করুণ সুরে ডেকে চলেছে ঘুঘু। য়োরিণ্ডা পড়ন্ত রোদে বসে, কেন জানে না, কাঁদতে সুরু করে দিলে। তাই দেখে য়োরিঙ্গেলও চোখের জল ফেলে মনের দুঃখ উজাড় করে দিতে থাকল। তাদের এত দুঃখ হল যে তাদের মনে হল তারা মরতে চলেছে। চারিদিকে তাকিয়ে তারা দেখল যে তাদের পথ হারিয়ে গেছে। কেমন করে যে বাড়ি ফেরা যায় তা আর তারা বুঝতে পারল না। সূর্যের আধখানা তখনও পাহাড়ের উপরে ছিল। বাকি আধখানা অস্ত গেছে।

য়োরিঙ্গেল ঝোপের মধ্যে থেকে উঁকি মেরে দেখল প্রাসাদের প্রাচীন দেয়াল খুব কাছেই। দেখে ভারি ভয় পেয়ে গেল সে। মড়ার মতো সাদা হয়ে গেল তার মুখ।

য়োরিণ্ডা তখন গান গাইছিল—

লাল ঝুঁটি পরে গায় যে আমার পাখি
দুঃখের গাথা করুণ সুরেতে ডাকি।

মরিয়া যাইলে আমার পরাণ সখা

কাঁদিবে যে কত ভেবে মোর কথা—চিক্ চিক্!

য়োরিঙ্গেল য়োরিণ্ডার দিকে তাকালো। কিন্তু সে ততক্ষণে রাত-বুলবুলি হয়ে গিয়ে 'চিক্-চিক্' শব্দে গান গাইছে। কোথা থেকে একটা জ্বলজ্বলে চোখ-ওয়ালা প্যাঁচা এসে তার চারদিকে তিন পাক ঘুরল আর বলল—শূ—হূ—হূ! য়োরিঙ্গেল দেখল সে আর নড়তে পারছে না। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে—হাত নাড়াবার পা নাড়াবার উপায় নেই, কথা কইতে বা চেঁচাতেও পারছে না।

সূর্য ততক্ষণে ডুবে গেছে। প্যাঁচাটা একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল এক কুঁজো বুড়ি—গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে, হলদে তার রং। বড় বড় রক্তবর্ণ চোখ; ধনুকের মতো বাঁকা নাক থুঁৎনি পর্য্যন্ত নোয়ানো। বিড় বিড় করে কি একটা বলে রাত-বুলবুলিটাকে খপ করে ধরে নিয়ে চল্যে গেল। য়োরিঙ্গেল নড়তেও পারল না, একটি কথাও বলতে পারল না; বুলবুলি গেল চলে।

রাত-বুলবুলিটাকে খপ করে ধরে নিয়ে গেল···য়োরিণ্ডা আর য়োরিঙ্গেল।

অনেকক্ষণ পরে বুড়ি ফিরে এল। তারপর ঘ্যানঘ্যানানি সুরে বলল—প্রণাম জানাই জাখিয়েল! খাঁচার উপর যখন চাঁদের আলো পড়বে তখন বন্দীকে খুলে দিও জাখিয়েল!

বলতেই য়োরিঙ্গেল দেখল সে ছাড়া পেয়েছে। ডাইনি বুড়ির সামনে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। হাত জোড় করে বলল, য়োরিণ্ডাকে ফিরিয়ে দিতে। ডাইনি বললে—য়োরিণ্ডাকে তুমি

আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। বলে চলে গেল। য়োরিঙ্গেল কত কাকুতি মিনতি করল, কিন্তু সবই বৃথা। য়োরিঙ্গেল বললে—হায় আমার কি হবে?

শেষে সে সেখান থেকে চলে গিয়ে এক অজানা গ্রামে পৌঁছল। সেখানে রাখাল হয়ে রইল সে অনেকদিন। প্রায়ই সে প্রাসাদের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখত কিন্তু কখনও বেশি কাছে আসত না। তারপর এক রাতে সে স্বপ্ন দেখল যে সে একটি রক্ত-রাঙা ফুল পেয়েছে, যার মাঝখানে মস্ত বড় সুন্দর একটি মুক্তো। সে ফুলটি তুলে প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেই ফুল দিয়ে সে যা ছোঁয় তারই মায়া কেটে যায়। শেষে সে স্বপ্নে দেখল যে এমনি করে সে তার য়োরিণ্ডাকে মুক্ত করলে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সে পর্বত উপত্যকা সর্বত্র খুঁজে বেড়াতে লাগল, কোথায় পাওয়া যায়, ঠিক সেই রকম একটি ফুল। ন-দিন ধরে সে খুঁজল। ন-দিনের দিন ভোরবেলা সে খুঁজে পেল ফুলটি। ফুলের মাঝখানে একটি মস্ত শিশির বিন্দু, প্রকাণ্ড এক মুক্তোর মতো। এই ফুলটি নিয়ে সে না-থেমে দিনরাত চলে শেষে প্রাসাদের কাছে এসে হাজির হল। এবারে প্রাসাদের কাছে এক-শ পায়ের মধ্যে এসে পড়তেও সে অচল হয়ে গেল না। সোজা চলে গেল সে দরজা অবধি।

য়োরিঙ্গেলের আনন্দ আর ধরে না। দরজায় ফুল ছোঁয়াতেই দরজা খুলে গেল। উঠোনের মধ্যে গিয়ে খুঁজতে লাগল পাখির শব্দ কোনদিকে শোনা যায়। অবশেষে সে এক হল্‌-এ এসে উপস্থিত হল; সেখানে ডাইনি দাঁড়িয়ে সাত হাজার পাখিকে খাওয়াচ্ছিল। য়োরিঙ্গেলকে দেখে সে চটে গেল, ভীষণ চটে গেল। তাকে গালাগালি দিতে লাগল, থুতু ছিটতে লাগল তার দিকে; থুতুর সঙ্গে বিষ। য়োরিঙ্গেল কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে খাঁচার মধ্যে তার পাখিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কত শত রাত বুলবুলি সেখানে রয়েছে, তার মধ্যে কেমন করে সে য়োরিণ্ডাকে পাবে?

সে যখন চারিদিকে খুঁজছে, হঠাৎ দেখতে পেল যে বুড়ি চুপি চুপি একটা খাঁচা-সুদ্ধ পাখি সরিয়ে দরজার দিকে পালাচ্ছে। য়োরিঙ্গেল এক লাফে বুড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ফুল দিয়ে ছুয়ে দিল খাঁচাটা আর বুড়িকে। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির জারিজুরি সব শেষ হয়ে গেল। দেখা গেল য়োরিণ্ডা সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে—আগেরই মতো সুন্দরী। য়োরিণ্ডা য়োরিঙ্গেলের গলা জড়িয়ে ধরল।

তারপর য়োরিঙ্গেল সব পাখিকে আবার কুমারী-মেয়ে করে দিল। করে দিয়ে য়োরিণ্ডার সঙ্গে বাড়ি ফিরে গিয়ে তাকে বিয়ে করে বহুকাল সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিলে।

ঘুমিয়ে পড়া রাজপুরীটি

বিভূতিভূষণ সরকার

১

এক তো ছিল
রাজপুত্তুর
রাজপুরীটি
আলো করা
রাজপুত্রের
রূপে।
গুণের কথা
আর—
ধরে নাকো
পাঁচমুখেতে
মোটেই।

একদিন তো
রাজপুত্রের মনে,
জাগলো
বড়ই সাধ,—
যাবেন তিনি
দেশ-বিদেশে।

এই কথা না শুনে,
রাণী ছাড়লেন,
খাওয়া, পরা, ঘুম ;
রাজ্য শুদ্ধু
লোকের মুখ,
বড়ই হ'ল ভারি ;
রাজা কিন্তু হলেন
রাজি।
দিলেন তিনি
হুকুম।—

দলে দলে
সাজ্‌লো
দেশের লোক ;
রাজ অনুচর,
দিলেন কতই।
আন্‌লেন রাণী
সাজিয়ে ডালা
মণি মানিক।
মণি-মানিক
চর-অনুচর
লোক জন আর,
নিলেন নাকো
কুমার।
পরলেন নূতন
জমকালো
তার পোষাক ;
ঝক-ঝকে এক
সু-ধার তরোয়াল—
ঝুলিয়ে দিয়ে
কটি-বাঁধের সাথে,

বেরিয়ে পড়লেন
দেশ-বিদেশের পথে।

২

যেতে—যেতে—যেতে,
পেরিয়ে গিয়ে
পাহাড়, নদী কতই,—
নানান রাজার দেশ,
পৌঁছে গেলেন
হঠাৎ
নিবিড় বনের মাঝে।
থম্‌ থমে সেই
গভীর ঘন বন,
শব্দ কিন্তু
নাইকো কোন খানেই।
বাঘ ভালুকের
হালুম্‌ হুলুম—
নাইকো কোনই
সাড়া ;
বনের পথটি ধরে,
রাজ পুত্তুর
চল্‌তেই
লাগ্‌লেন কেবল।

চল্‌তে—চল্‌তে—হঠাৎ
পড়লো চোখে
রাজপুরী এক বিশাল
সেই বনটির মাঝে।
রাজপুরী তো
এমন ধারা
দেখেন নিত্যো কভু!

রাজপুত্তুর
অবাক !
রাজপুরীটির
ফটক
ছুঁয়েছে যেন
আকাশ !
দুয়ারী ছাড়া ফটক !
চূড়ায় তার
বাজে নাকো
বাজনা কোনই আর !
বন-জঙ্গলে
লতায় পাতায়
জড়ানো ফটক দ্বার !
গাছ-গাছলায়
চৌদিকেতে ভরা !
যেদিক তাকাও,
গহন বনের রাশ !
চুপ চাপ সব
চারপাশেতে
নীরব,—নিথর,
শব্দ সাড়া
নাইকো মোটে কোথাও !

রাজপুরীটির মাঝে,—
রাজপুত্তুর
দেখ্‌লেন গিয়ে,—
দুধে ধোয়া
রাজপুরীটি যেন ;
নাইকো কিন্তু
কোনই মানুষ-জন ;
চুপ্‌ চাপ সব
নিঝুম্‌পুরী সেই
পড়ে নাকো
একটি পাতাও
কোথা ।
নড়ে নাকো
একটি কুটোও
কোথা ।
রাজপুত্তুর
অবাক যেন ;
মনে তার
লাগলো বড়ই তাক !
চৌদিকেতে
ফিরে ঘুরে
দেখেন তিনি
পুরীর মাঝে
এ দিক—ও দিক যেয়ে ।
থমকে গেলেন
একটু খানিই গিয়ে ।
লম্বা, সোজা
আঙিনা এক
চলে গেছে
একটানা যে,

পাশে পাশে তার
দাঁড়িয়ে আছে
হাতি ঘোড়া
সিপাই আর লস্কর ।
রাজপুত্তুর,—
দিলেন কতই হাঁক !
চুপ্‌ চাপ্‌ সব !
ফিরেও নাহি
তাকায় ।
কয়তো নাকো
কোন কথাই তারে ।
অবাক হলেন,
রাজপুত্তুর !
কাছে গিয়ে
দেখেন তাদের
সবাই যেন
পাথর সম
রয়েছে দাঁড়িয়ে !
পড়ে নাকো
চোখের পলক,
নড়ে নাকো
গায়ের একটি চুল !
তখন তিনি
গেলেন পুরীর মাঝে ;
দেখেন গিয়ে
এক কুঠরীর গায়ে
হাজার হাজার
ঢাল, তলোয়ার
তীর ধনুক আর
রয়েছে টাঙ্গানো ।

তলোয়ারটিরে খুলে
রাজপুত্তুর
ধীরে ধীরে
আসলেন বাহিরে।
রাজদরবার—
মস্ত বড় !
ঘিয়ের সোনার প্রদীপ

জ্বল্‌তেছিল
জ্বলজ্বলিয়ে !
চৌদিকেতে
ছড়িয়ে পড়ে আলো
ঝিক্‌-মিক্‌
সব মোতি মাণিক !
রাজা, মন্ত্রি
পাত্র, মিত্র, ভাট
বন্দী আর
সিপাই লস্কর
যে যেখানে ছিল
জমাট পাথর,—
সবাই যে গো !
কারো মুখে
নাইকো কোনই কথা !
নাইকো চোখে
পলক !
রাজার মাথায়
রাজছত্র,—
চামর—দাসীর হাতে
নাইকো সাড়া,
শব্দ নাইকো,
একেবারেই নিঝুম্‌।
আর এক কুঠরীর
মাঝে দেখেন
শত শত প্রদীপ !
জ্বলতেছিল সেথা
একসাথেতে !
ধন-রত্ন
কতই রকম !
কত মানিক !
হীরা কতই
মোতি হাজার হাজার !
সেই কুঠরীর
জিনিস
কিছুই কিন্তু
ছুঁলেন নাকো তিনি !
আর এক
কুঠরীর মাঝে !
সেই না যাওয়া
অমনি হলেন
বিভোর তিনি !
রাজপুত্তুর ভাবেন—
ফুলের সুবাস
কোথা হতে
আসছে ভেসে ?
কুঠরীর সেই
মাঝখানটায় গিয়ে
রাজপুত্তুর দেখেন,
লাখো লাখো
নয়ন ভরা
পদ্ম ফুলের রাশি !
স্বপ্ন দিয়ে
জালটি বুনে
ঢল ঢলে যে
ফাগ ছড়িয়ে
রয়েছে কতই ফুটে !
রাজ পুত্তুর
ধীরে ধীরে
এগিয়ে গেলেন
ফুলের বনের কাছে !
দেখেন গিয়ে
ফুলের বনে
পালঙ্ক এক সোনার !
হীরায় গড়া
ডাঁটগুলি তার
ফুলের মালা
রয়েছে দোলানো !
মালার নীচে
হীরার নালে
সোনার পদ্মফুল !
তার মাঝেতে
স্বপ্নভরা পরীর মতন
রাজকন্যা এক !!

চোখটি বুজে
ঘন ঘুমে বিভোর।
যায় নায়কো তার
হাত পা দেখা!
ঢল ঢলে যে
মুখখানি তার
সোনায় পদ্মের
পাঁপড়ি মাঝে।
মুখে যে তার
রূপের কিরণ
ছড়িয়ে আছে
চৌদিকেতে।
রাজপুত্তুর
ভর দিয়ে সেই
মোতির ঝালর
হীরার ডাঁটে
অবাক হয়ে
দেখেন—আর যে দেখেন
পলকহারা চোখে!

৩

বছরের পর
বছর গেল চলে!
রাজপুত্তুর
দেখেন—কেবল দেখেন
স্বপন্ ভরা চোখে!
দেখার তিয়াস্
মেটে না যে তার!
ঘুমিয়ে আছে
রাজকন্যা,
ঘুম সাগরের
গভীর ঘুমে ডুবে!

হঠাৎ
রাজপুত্রের চোখে
পড়ল
একটি সোনার
কাঠি?
রাজকন্যার শিয়রে রাখা;
ধীরে ধীরে
নিলেন তুলে হাতে;
তুলতে গিয়েই
সোনার কাঠি
পড়ল চোখে
রূপোর কাঠি!
হাতে নিলেন তুলে।
দেখতে দেখতে
আন্‌মনেতে
কেমন যেন কখন
সেই ঘুমিয়ে পড়া
রাজকন্যার
কি যেন বা
মাথায় গেল ছুঁয়ে!
পদ্মবনের পদ্মগুলি
অমনি যেন
উঠলো শিহরিয়া!
দীর্ঘ দিনের
গায়ের আলস
গেল ভেঙ্গে
এক নিমেষে!
গেল খুলে
ঘুমে ছাওয়া
চোখের পাতা দুটি!
চমকে যেন

হঠাৎ রাজার মেয়ে
উঠে বসেন
সোনার পালঙ্কে!
নিমেষেতে
অমনি যেন,
রাজপুরীটির
চৌদিকেতে
উঠলো ডেকে
হাজার হাজার পাখি।

তাদের প্রাণের সুরে
তালে তালে,
মিশিয়ে তাদের তালে!
দুয়ারি দিল
হাঁক দুয়ারে;
হাতি ঘোড়া
উঠানেতে
ছাড়ল জাগার ডাক!
রাজদরবারে,—
জাগেন রাজা
মন্ত্রি জাগেন,
জাগেন মিত্র।
জাগল সবাই
যে যেখানে ছিল।

অনেক কালের
ঘুমের মাঝে
লাগল প্রাণের সাড়া !
রাজপুত্তুর অবাক !
রাজকন্যা অবাক চোখে
থাকেন শুধুই চেয়ে !
রাজা, মন্ত্রি,
জন, পরিজন
সবাই এসে দেখেন,
রাজপুত্তুর !
বল্লেন রাজা,
কী আছে মোর
কি দিব আর ?
মোর রত্নসম
রাজকন্যা
দিলাম তোমার হাতে।
ওগো অচিন্ দেশের
রাজপুত্তুর রাজার !

শতে শতে
হাজার হাজার
দাসী বাঁদী
কুটনো কোটে
বাটনা বাটে !
পঞ্চ পল্লব
ফুলের তোড়া
মঙ্গল ঘট কতই
বসলো পুরীর
দ্বারে দ্বারে।
উঠলো বেজে
শাঁখের ধ্বনি !

ছড়িয়ে পড়ে
হুলুর ধ্বনি
সব আঙ্গিনাময় !
পান সুপারি
দিয়ে যৌতুক
রাজ রাজত্ব
রাজা,—
পরিয়ে পঞ্চমুকুট
দিলেন বিয়ে
রাজকন্যার
রাজপুত্তুরে সাথে।
এমনি করে
কতই বছর
গেল।

৪

দেশ ভ্রমণে গেছেন
রাজার কুমার।
মাথা খুঁড়ে
কাঁদেন রাণী ;
অন্ধ হয়ে গেছেন রাজা,
ভেবে ভেবে, কেঁদে কেঁদে
চোখের জলে

বুক ভাসিয়ে
রাজ্য তাঁহার
আঁধার করা
হাহাকারে
গেছে ভরে
কতই !
গভীর কালো রাতের
আঁধার যেতে যেতে
রাজদুয়ারে
উঠ্লো বেজে
আচম্বিতে
আগমনীর সুর !

চমকে রাণী—
উঠলেন বলে,—কা !
রাজা শুনে,—
বল্লেন,—কে ? কে ?
রাজ্যের যত প্রজা
আনন্দেতে
আসলো ছুটে—
রাজপুত্তুর তাদের
চোখ জুড়ানো ধন !
রাজদুলালী
করে বিয়ে
ফিরেছে রাজার দুলাল
এসেছে আবার
তাদের কাছে।
সোনার ছেলে
সোনার ঘরে।

॥ শেষ ॥

প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। তখনও হাজারিবাগ সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে বাঘের যথেষ্ট উপদ্রব ছিল। কয়েকটি মোটর বাস রেল স্টেশন থেকে সহর অবধি দিনে দুইবার যাতায়াত করত। দুচারজন বড় লোকের শুধু নিজেদের গাড়ি ছিল আর সেই মোটর গাড়ি দেখতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা সব ছুটে আসত, এই রকম সময়কার কথা বলতে বসেছি। বিশ্বম্ভর পাকড়াশী সরিয়ার কাছেই থাকতেন, রেল স্টেশন থেকে কিছু দূরে মস্ত বড় হাতার মধ্যে তাঁর বাংলো বাড়ি। এর বাবা ত্রিভুবন বাবু ছিলেন অভ্রের মস্ত বড় ব্যবসায়ী। বিদেশের সঙ্গে কারবার করে অনেক টাকা করেছিলেন। শিকার করা তাঁর শখ ছিল তবে শখ না বলে বাতিক বলাই ভাল, জীবনের শেষের দিকটা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে শুধু শিকার নিয়েই পড়ে থাকতেন।

বাংলোর বারান্দা আর বৈঠকখানার দেয়াল তাঁর শিকারের প্রমাণে ভরা। হরিণ, বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার, বুনো মহিষ, বুনো বরা, এ সবের মাথা, ছাল চামড়ায় সব দেয়াল চাপা পড়ে রয়েছে। বন্দুকের ঘরে ঢুকলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে, কাঁচের দরজা লাগান আলমারির মধ্যে অত রকম বন্দুকের সারি দেখে মনে হবে ভুল করে কোন মিলিটারী অফিসারের বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি। এ ছাড়া নানারকম দিশী অস্ত্রশস্ত্রও দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে।

শোনা যায় বিশ্বম্ভরবাবু ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বাবার সঙ্গে শিকারে যেতেন আর তাঁর কাছেই শিকারে হাত পাকান। বিশ্বম্ভরবাবুর চেহারা দেখলে অবশ্য সহজে কেউ তাঁকে বাঙ্গালী বলে ভাববে না, প্রায় সাড়ে ছ ফুট লম্বা, প্রকাণ্ড দশাশই চেহারা, এর ওপর আবার তাঁর খাওয়ার বহরের খুবই নাম ডাক ছিল। স্থানীয় সাঁওতালরা ওঁকে বিশবাবু বলে ডাকত আর পাড়ার লোকে বলত বিশজন বাবুর খাবার উনি একলাই খান কি না তাই ওঁর ঐ নামকরণ।

সাঁওতালরা এও বলত যে শিকার করতে গেলে ওঁর কোন ডর নেই কারণ বাঘও ওঁর ঐ চেহারা দেখলে পালিয়ে যাবে। আর মন্দলোকেরা বলত ওঁর সঙ্গে শিকারে গেলে ওঁর সাথীরা নিরাপদ কারণ দশটা বাঘও ওঁকে খেয়ে শেষ করতে পারবে না আর ওঁকে দেখতে পেলে বাঘেরাও হাড় বের করা রোগা জিরজিরে লোকদের দিকে তাকিয়েই দেখবে না।

সরিয়ার স্টেশন মাস্টার সোমপ্রকাশ বাবুর শিকারের খুব শখ তবে তিনি পাখি বা হরিণ ছাড়া অন্য কিছু মারেন না। বলেন মিছ'মিছি প্রাণীহত্যা করাটা ওঁর ভাল লাগে না, যার মাংস খাওয়া যাবে না সে জন্তু শিকার করার কোন মানেই হয় না। এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে বিশ্বম্ভর বাবুর মাঝে মাঝে বেশ তর্কাতর্কি হয় তবে তর্কে হারজিত হবার আগেই বিশ্বম্ভরবাবুর খিদে পেয়ে যায় আর তার পরই খাবার পালা সুরু হয়ে যায়। ভরা পেটে ত আর তর্ক জমে না কাজে কাজেই তর্কটা আরেকদিনের জন্য মুলতুবী থাকে।

হাজারিবাগ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হরদয়াল সিং মাঝে মাঝে আসেন, সেদিন তর্কের আসর খুব জমে ওঠে আর ভুরিভোজের ব্যবস্থা হয়। এই হরদয়ালবাবু অল্পবয়সে ত্রিভুবনবাবুর কাছে শিকারে হাতে খড়ি নিয়েছিলেন। এইদিন সোমপ্রকাশবাবু সহকারী স্টেশন মাষ্টারের উপর সব ভার বুঝিয়ে দিয়ে, হরদয়ালবাবুর সঙ্গে বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়িতেই রাতটা কাটান কারণ খাওয়ার পর ওঁদের দুজনের কারোরই নড়বার ক্ষমতা থাকত না।

প্রথমবার সেদিন হরদয়ালবাবু আর সোমপ্রকাশবাবু বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়িতে খেয়েছিলেন সেদিন হরদয়াল বাবু বলেছিলেন—বিশু, গতজন্মে তুমি নিশ্চয়ই রাক্ষস ছিলে নইলে এই রকম কেউ খেতে পারে সেটা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না, মনে হচ্ছে নিশ্চয় চোখ খারাপ হয়ে গেছে, ডাক্তারকে দিয়ে ভাল করে চোখ দেখাতে হবে। আগেও তোমার খাওয়া দেখেছি তখন ত এমন কিছু খেতে না। এতে বিশ্বম্ভরবাবু বলেন—তখন ত আমি নিতান্ত শিশু ছিলাম আর আপনার তখন বছর কুড়ি বয়স ছিল। তখন আপনার খাওয়া অবাক হয়ে দেখতাম আর ভাবতাম কবে আমি আপনার মতন খেতে পারব। তখন থেকেই আপনাকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলাম। এর উত্তরে হরদয়ালবাবু বলেছিলেন তাহলে তুমি গুরু-মারা বিদ্যাটা ভাল রকম ভাবেই শিখেছ।

মাঝে মাঝে সোমপ্রকাশ বাবু আর হরদয়াল বাবুর সঙ্গে হরদয়াল বাবুর মোটরে করে বিশ্বম্ভরবাবুও শিকারে যেতেন। প্রথমবার এতে বিশ্বম্ভরবাবু খুবই আপত্তি করেছিলেন আর বলেছিলেন—ঐ চড়াই পাখির খাবার সঙ্গে নিলে শিকার হবে কি করে? সমস্তদিন ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে থাকলে অস্ত্র

কিছুর কথা ভাবাই যায় না, খাবারের ব্যবস্থা আমাকে করতে না দিলে আমার খাওয়া একেবারে অসম্ভব। যার সকালবেলার জলখাবার হল ছ, সাত পেয়ালা চা, ডজন খানেক কলা, একটা গোটা পাঁউরুটি টোস্ট, মাখন, জ্যাম, চীজ এই সব মাখিয়ে, তার সঙ্গে গোটা দশেক ডিমের আমলেট আর এই খেয়েও যে খুঁত খুঁত করে ক্ষিদে মেটেনি বলে, তাকে দু তিন বেলা খাওয়াতে গেলে কি পর্বতপ্রমাণ খাবার লাগবে এই কথা ভেবে হরদয়ালবাবু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই সব সময় খাবারের ব্যবস্থা বিশ্বম্ভর বাবুর হাতে, সেজন্য অবশ্য গাড়িটার সঙ্গে একটা ট্রেলার জুড়তে হত সে কথাটা বলা বাহুল্য।

একবার হরদয়ালবাবুর এক ভাইপো তরুণ সিং এসেছিলেন কাকার কাছে বেড়াতে। সে নামকরা শিকারী, অনেক জায়গায় শিকার করেছে, বাঘ শিকারী বলে বেশ খ্যাতিও ছিল। বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়িতে প্রায় রোজই আড্ডা বসে আর শিকারের গল্প হয়। তরুণবাবু প্রায়ই বলেন—আরে মশাই, শুধু গল্পে কি আর পেট ভরে, চলুন একদিন কোডারমার উত্তরের ঐ জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে যাই। শুনেছি ওখানে নাকি একটা বাঘ বড়ই উৎপাত করছে, অনেকগুলো গ্রামের গরু ছাগল শেষ করে এনেছে। বাইরে থেকে শিকারীও নাকি এসেছে বাঘটাকে মারতে। কাকাবাবু লোক পাঠিয়েছেন খবর আনাবার জন্য, তবে কাকাবাবুকে একটা কাজে পাটনা যেতে হচ্ছে সেজন্য উনি থাকতে পারবেন না। ঐ শিকারী আপনি আর আমি এই তিনজনে খবর পেলেই মড়ির কাছে মাচান বেঁধে বসব, কি বলেন।

দুদিন বাদেই বাঘের খবর নিয়ে লোক এল আর ওঁরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লেন। কোডারমা থেকে মাইল দশেক উত্তরে হুড়হুড়ি গ্রাম, সেখানে বাঘটা গোটা চারেক গরু মেরেছে। ওঁদের সঙ্গে সেই খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে আর সঙ্গে রাম আর শ্যাম, বিশ্বম্ভর বাবুর পুরোনো আমলের শিকারী। তবে রামের ওপর রান্নার ভার দেওয়া হয়েছে কারণ সে চমৎকার রান্না করে।

সকাল বেলাতেই বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ি থেকে সকাল বেলার জলযোগ সেরে সকলে বের হলেন। তরুণবাবু এই প্রথম বিশ্বম্ভরবাবুর খাওয়া দেখলেন আর সেই দেখে বললেন—ও মশাই, এই দেশে খাবার দাবার এত আক্রা কেন তা আজ বুঝতে পারলাম। ভাগ্যিস এখানে আপনার দোসর কেউ নেই, থাকলে পর এখানে চিরটাকালের মতন দুর্ভিক্ষ লেগে থাকত।

দুপুর নাগাদ হুড়হুড়ি গ্রামে পৌঁছে, রামের ওপর হুকুম দিয়ে গ্রামের প্রধানকে ডেকে পাঠানো হল। মাতব্বর বুড়ো বুধিরাম মাঝি এসে হাজির হতেই বিশ্বম্ভর বাবু তাকে গ্রামের লাগোয়া মড়িটাকে বেঁধে রেখে, কাছের একটা গাছে বারো ফুট উঁচুতে মাচান বাঁধতে হুকুম দিলেন। তরুণবাবু আপত্তি করে বললেন—আরে অত উঁচুতে কেন, দশ ফুটই যথেষ্ট। তাতে বিশ্বম্ভরবাবু বললেন তরুণবাবু, এখানকার বাঘ সম্বন্ধে আপনার ধারণা নেই, এরা অনায়াসে দশ ফুট লাফাতে পারে।

দুপুরের খাওয়ার পর বিশ্বম্ভরবাবু একটু গড়িয়ে নিয়ে, তাঁর নিত্যিকারের অভ্যাস মতন জলখাবার খেয়ে, রাত্রের খাবার সঙ্গে নিয়ে তরুণ বাবুকে বললেন,—এবার আমি তৈরী, চলুন রওয়ানা হওয়া যাক। সঙ্গের খাবারের বহর দেখে তরুণবাবু আপত্তি করেছিলেন কিন্তু বিশ্বম্ভর বাবুর এক কথা—খিদে পেলে মশাই অন্য সব কাজ মাথায় উঠে যায়।

যথারীতি সন্ধ্যের একটু আগেই সকলে মাচানে উঠে বসলেন। বিশ্বম্ভরবাবু তখনই একটু খেয়ে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু অন্যদের প্রবল আপত্তিতে তা আর হয়ে উঠল না। এতে উনি একটু খুঁত খুঁত করতে লাগলেন, আর বললেন—এ রকম উপোসী থাকতে হবে জানলে আমি কখনই আসতাম না।

অন্ধকার হয়ে আসছে, এমন সময় শিকারীটি তরুণবাবুর গা টিপে একটা দিকে আঙ্গুল দেখালেন। বিশ্বম্ভরবাবু অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে তাকিয়ে যখন বুঝতে পারলেন যে বাঘটা সত্যি সত্যিই ওঁদের দিকে আসছে তখন উনি তরুণ বাবুকে ডেকে বললেন—টাইগার কামিং, গেট রেডি। আর কোথা যায়, মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েই বিরাট এক হুঙ্কার দিয়ে বাঘটা উল্টো দিকে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল।

হাতের শিকার এমন ভাবে ফস্কে যাওয়াতে, তরুণবাবু আর শিকারীটি খুব বিরক্ত হয়ে বিশ্বম্ভর বাবুকে ভয়ানক বকতে আরম্ভ করলেন—আপনি কি রকম শিকারী মশাই, কোথায় একেবারে চুপ করে বসে থাকবেন, না, টাইগার কামিং। আরে মশাই, মানুষের গলা শুনলে কি আর বাঘ সে তল্লাটে থাকে। কোনকালে শিকার করেছেন বলতে পারেন, আমার ত মনে হচ্ছে আপনি এয়ার গান দিয়ে চড়াই পর্যন্ত কোনদিন শিকার করেন নি। আপনার খাওয়ার বহর দেখেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে আপনি জানেন শুধু খেতে, শিকার টিকার জন্মে কখন করেন নি।—এতে বিশ্বম্ভরবাবু আপত্তি করে বলেন—তা, আমি কি করে জানব যে সাঁওতাল দেশের বাঘগুলো পর্যন্ত ইংরাজী শিখে ফেলেছে!

ওঁরা তখন বললেন—বাঘটা পালিয়েছে আর বুঝে গেছে এখানে মানুষ আছে কাজেই আর এখানে বসে থেকে লাভ নেই, বাঘটা আজ আর এমুখো হবে না। এই বিশ্বম্ভরবাবুর জন্য আজকের শিকারটাই মাটি হয়ে গেল। আবার নতুম মড়ি বেঁধে নতুন জায়গায় মাচান বাঁধতে হবে। আবার কখন খবর পাব বাঘটা আবার কোথায় গরু মেরেছে তা কে বলতে পারে। চলুন বিশ্বম্ভরবাবু, আজকের মতন শিকার শেষ।

এর জবাবে বিশ্বম্ভর বাবু বল্লেন—এই রাত বিরেতে হাজারিবাগ জঙ্গলে আমি হাঁটতে রাজী নই, স্বেচ্ছায় কে বাঘের পেটে যেতে চায় বলুন। তারপর আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, না খেয়ে আমি এক পাও হাঁটতে পারব না। আপনারা যদি ইচ্ছা করে বাঘের মুখে যেতে চান তা যেতে পারেন, আমি এই মাচান থেকে আজ রাত্রে নামবই না, সেই কাল সকালে রোদ উঠলে পর মাচান থেকে নামব। আপনারা যদি সত্যিসত্যিই চলে যান তাহলে রামকে কাল সকালের জল খাবারের ভাল রকম ব্যবস্থা করে রাখতে বলবেন, সারা রাত এই মাচানের উপর পড়ে থাকলে খিদেটা একটু বেশি পেতে পারে।

তরুণবাবুরা যখন বুঝতে পারলেন যে বিশ্বম্ভরবাবু সত্যিই মাচান ছাড়বেন না, তখন কি আর করবেন, ওঁকে অনেক সাবধান করে দিয়ে ওঁরা গ্রামের দিকে চলে গেলেন। ওঁরা চলে যাবার পর বিশ্বম্ভরবাবু খেতে বসলেন। গোটা ষাটেক লুচি, ছোলার ডাল, দশটা ডিমের মামলেট, ডজন দেড়েক মাংসের চপ, সেরটাক ক্ষীর আর সঙ্গে এক কাঁদি পাকা কলা খাবার পর এক কুঁজো জল খেয়ে ঢেঁকুর তুলে শুয়ে পড়লেন। গুলিভরা বন্দুকটা পাশে নিয়ে শুয়েছিলেন।

মাচানে ভাল করে শোয়া যাচ্ছিল না, কোন রকম গুটিগুটি মেরে শুয়েছিলেন। প্রায়ই ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল, আর একবার বসে একবার আড়ামোড়া ভেঙ্গে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ছিলেন। এর পরের ঘটনাগুলোর কথা কেউ এতদিন জানতে পারেনি, শুধু আমাকেই বলেছিলেন। তাও হঠাৎ একদিন ওঁর সঙ্গে স্বপ্নদেখার গল্প হচ্ছিল তখন তিনি ঐ শিকারের রাতে মাচানে শুয়ে কি স্বপ্ন দেখেছিলেন সে কথা আমাকে বলেছিলেন। উনি অবশ্য এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে বারণ করেছিলেন, তবে সে এত আগেকার কথা, এখন বললে উনি আর রাগ করবেন না। ছোটদের মাসিক সন্দেশ ত আর বড়রা পড়েন না, তারপর হরদয়ালবাবু, সোমপ্রকাশ বেঁচে নেই আর তরুণবাবু কোথায় আছেন তা কে জানে।

উনি বলেছিলেন যে সে সময় মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখছিলেন আর তারপরই ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল, প্রথমদিককার দেখা স্বপ্নের কথা ওঁর কিছুই মনে নেই। ওঁর খালি মনে আছে যে এই বারে বারে ঘুম ভাঙ্গার জন্য ওঁর খুব বিরক্ত লাগছিল যে কোথায় বাড়িতে নরম গদির ওপর শুয়ে পাখার তলায় আরামে ঘুম দেবেন না ঐ মাচানের ওপর এমন করে হাত পা গুটিয়ে রেখে কোন মতে শুয়ে থাকতে হচ্ছে যে বারেবারে ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে এই ভেবে।

শেষ বার যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন হাত ঘড়িতে দেখলেন সাড়ে তিনটা, তখনও সূর্য উঠতে ঘণ্টা আড়াই বাকি। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে, আরেকবার খাবারের শূন্য বাটিগুলো হাতড়ে দেখে, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়লেন। এইবার যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন সেটার কথাই আমাকে বলে-ছিলেন। বড়ই অদ্ভুত স্বপ্ন সেজন্যই তোমাদের এটা বলতে বসেছি।

উনি বলেছিলেন যে স্বপ্নে দেখলেন বাঘের গর্জনে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে গেছে, বুঝতে পারলেন মাচানটা থর থর করে কাঁপছে। চোখ প্রথমটা বন্ধ রেখেছিলেন কিন্তু এ গর্জনে চোখ খুলে দেখতে চেষ্টা করলেন। তাকিয়ে দেখলেন মাচানটার ওপর দিয়ে একটা বাঘের মাথা দেখা যাচ্ছে, তার সামনের থাবা দুটো মাচানের ওপর। বাঘটা খামচে খামচে মাচানের উপর উঠতে চেষ্টা করছে কিন্তু মাঝে মাঝে পিছলে পড়ছে তখনই ঐ বিকট গর্জন করছে।

খাবারের বাসনপত্র কখন নিচে পড়ে গেছে তা কে জানে। বন্দুকটাও সরতে সরতে প্রায় মাচানের ধারে চলে গেছে, আরেকটু হলেই পড়ে যাবে। এই না দেখে উনি বন্দুকটা বাঁচাবার জন্য ওটার কুঁদো ধরে একটান দিলেন। এদিকে মাচানের ভিতরে ছোট্ট একটা গাছের ডালে বন্দুকের ঘোড়া আটকিয়ে গিয়েছিল কাজে কাজেই বন্দুকে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুটো নলের গুলিই ছুটে গিয়ে একেবারে সোজা বাঘের মাথায় গিয়ে লাগল।

শেষ এক হুঙ্কার দিয়ে বাঘটা মাচান থেকে উল্টে পড়ল, বাঘের নখ মাচানে আটকিয়ে গিয়েছিল কাজেই বাঘটা পড়ার সঙ্গে মাচান টাচান সবসুদ্ধ নিয়ে বিশ্বম্ভরবাবু পড়লেন নিচে একেবারে বাঘটার ঘাড়ে। আর বন্দুকটা ছিটকে পড়ল বেশ কিছুটা দূরে।

এতক্ষণে ওঁর চমক ভাঙ্গল, উনি বুঝতে পারলেন যে ব্যাপারটা মোটেই স্বপ্ন নয়, সবটাই সত্যিকারের ঘটনা। তাড়াতাড়ি উঠে বন্দুকটা তুলে গুলি ভরে নিতে তাঁর দেরী হল না, বাঘটা কিন্তু

আর নড়ল না। এমন কথা ত আর উনি স্বীকার করতে পারেন না, সেজন্য এতদিন একথা কাউকে বলেন নি।

উনি আমাকে এও বলেছিলেন যে ওঁর কপালটা সত্যিই ভাল, নইলে ঐ রকম ছোঁড়া গুলির একটা বাঘের চোখের মধ্যে আর অন্যটা বাঘের ঘাড়ে লেগে শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়েছিল বলে মাটিতে পড়ে যাবার পর বাঘের হাতে ওঁকে কোন চোট পেতে হয় নি বরং সোজা মাটিতে পড়লে যেটুকু চোট পেতেন বাঘের পিঠে পড়াতে সেটুকুও লাগে নি।

এদিকে ঐ বন্দুকের শব্দ হুড়হুড়ি গ্রামের লোকদের কানে গেল আর তারপরই সব চুপচাপ হয়ে গেল। গ্রামের সবার মনে একটা ভয় হল কি জানি কি ঘটল। তরুণবাবু ত ভয়ানক আপশোষ করতে লাগলেন বিশ্বম্ভর বাবুকে ঐ রকম একলা ফেলে আসার জন্য। উনি সবাইকে বললেন—দেখ, এই ভোর রাত্রে নিশ্চয়ই বাঘটা আবার এসেছিল আর বিশ্বম্ভর বাবুর চালচলন দেখে আমার ধারণা যে উনি একেবারে শিকারে অভ্যস্ত নন। নিশ্চয়ই একটা দুর্ঘটনা হয়েছে, চল, আমরা এখুনি দল বেঁধে সেখানে যাই। বিশ্বম্ভরবাবুর কিছু হলে কাকাবাবুর কাছে মুখ দেখাব কি করে।

এই বলে তিনি জঙ্গলে কেরোসিন টিন পেটাতে পেটাতে, সেই মড়ি বাঁধা জায়গার দিকে চললেন। জঙ্গলের ধারে পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বম্ভরবাবুর গলা শোনা গেল—তরুণবাবু, বাঁশ দড়ি সব সঙ্গে করে এনেছেন ত, বাঘটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে না?

তাড়াতাড়ি সকলে এগিয়ে গিয়ে দেখেন বাঘটা একদিকে মরে পড়ে আছে আর বিশ্বম্ভরবাবু একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে তাঁর ঝোলা থেকে কলা বার করছেন আর খাচ্ছেন। ওঁদের দেখেই উনি বলে উঠলেন—সঙ্গে কিছু খাবার এনেছেন ত, আমার বেজায় খিদে পেয়ে গেছে। বিশ্বম্ভরবাবুর কাণ্ড দেখে আর কথা শুনে তরুণবাবুও একেবারে থ, কি অবাক কাণ্ড, লোকটা কেরে—এমন অবস্থাতেও খাবারের কথা ভাবতে পারে।

জন কয়েক লোককে গ্রামে ফেরত পাঠান হল, বাঁশ দড়ি আনবার জন্য। তারা যখন ফিরল তখন সূর্য উঠে গেছে। তরুণবাবু তখন বললেন—চলুন এবার গ্রামে ফিরে চলুন। এতে বিশ্বম্ভরবাবু বললেন—সে কি, এখনও আসল কাজই বাকি পড়ে রয়েছে। এই বলে আবার ঝোলাটার ভিতর হাত ঢুকিয়ে একটা ক্যামেরা বার করে সেটা তরুণবাবুকে দিয়ে, বন্দুকটা হাতে নিয়ে বাঘের পিঠে একটা পা রেখে বললেন—এইবার আমার ছবিটা তুলুন।

ছবি তোলা হল, বাঁশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঘ বেঁধে নিয়ে সকলে গ্রামে ফিরে গেলেন। আশে পাশের সব গ্রাম ভেঙ্গে লোক এসেছে হুড়হুড়ি গ্রামে, বাঘকে আর বাঘ শিকারী বিশ্বম্ভর বাবুকে দেখবার জন্য কিন্তু ওঁর এ সব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সোজা নিজেদের থাকবার জায়গায় এসে হাঁক ছাড়লেন—রাম, তাড়াতাড়ি চা জলখাবার নিয়ে এস, আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

শিবাণী রায়চৌধুরী

ভাই পল্টন·········সেই লোকটার কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়। সেই যে সেই লোকটা গত বছর ক্রিকেটের মাঠে যে আমাদের ঠিক পিছনের সিটটাতে বসত। আপাদমস্তক গরম জামায় ঢেকে আসত। আমরা খালি মুখটা দেখতে পেতাম, দেখতাম তার সারা চোখেমুখে কেমন একটা মিচ্‌কে হাসি মাখানো। যদিও একটু ক্যাব্‌লা ক্যাব্‌লা লাগত। মনে হত বড্ড চেনা-চেনা। ভাবতাম কোথায় জানি দেখেছি। তারপর তুমিও মনে করতে পারলে না, আমিও না। আমাদের আশেপাশের লোকেও ওর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল করে চেয়ে দেখত। তারাও বোধহয় আমাদের মত সাত পাঁচ ভাবত। লোকটা প্রায় তোমারই মত, খেলাটেলা খুব মন দিয়ে দেখত বলে মনে হয় না। সারাদিন সর্দিতে ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ্‌ করত। সঙ্গে একটা পেটমোটা টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে আসত। হাফ-টাইমের সময় দিস্তা দিস্তা লুচি, আলুরদম, ডিম-সেদ্ধ আর শোনপাপ্‌ড়ি ওড়াত। আমি দেখতাম সারাক্ষণ তুমি ঐ টিফিন-কেরিয়ারের দিকে নজর দিচ্ছ। তারপর খেলার শেষে মাঠ থেকে বেরিয়ে আমরা যখন ট্যাক্সির জন্য হিম্‌সিম্ খেতাম, তখন দেখতাম সেই লোকটা একটা পুরোন মডেলের সব্‌জে রঙের ঝরঝরে পালতোলা মোটরে করে গঙ্গার ধারের রাস্তার দিকে মিলিয়ে গেল। যাবার সময় সবার

দিকে চেয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসত। এবার মনে পড়েছে তো কোন লোকটা ?

ক্রিকেটখেলা দেখেই তো তুমি হাজারিবাগে হস্টেলে চলে গেলে। গতবারের পরীক্ষায় খারাপ-খারাপ নম্বর পেয়েছিলে বলেই তো সেজজ্যাঠা তোমাকে আর কোলকাতায় রাখতে সাহস পেলেন না। বললেন : কলকাতায় খালি হুজ্জতি, আজ ক্রিকেট, কাল সার্কাস, পরশু সিনেমা, পন্টাটার এখানে থাকলে আর লেখাপড়া হবে না, গোল্লায় যাবে। তুমি চোখ মুছে, বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে ট্রেনে উঠ্‌লে। আমরাও তোমাকে কানে কানে বললাম : সামনের বছর আমরাও গোল্লায় যাব। তখন আর দুঃখ থাকবে না। সবাই মিলে হাজারিবাগে থাকা যাবে।

তারপর মনের দুঃখে আমি, খোকন, পানু চিড়িখানায় গিয়েছি। গেটের কাছে টিকিটের এক লম্বা লাইন পড়েছে। আমরা সবাই একহাতে পকেট সামলাচ্ছি, আর এক হাতে বাঁদরের ভিজে ছোলা খাচ্ছি। এমন সময় পানুর ঘাড়ের ওপর দিয়ে একটা লম্বা মতন সোয়েটার পরা হাত টিকিট ঘরের ঘুলঘুলিতে এসে পড়ল। ঘড়্‌ঘড়ে গলায় লোকটা বলল : দু'টো, একটা আমার, একটা আমার
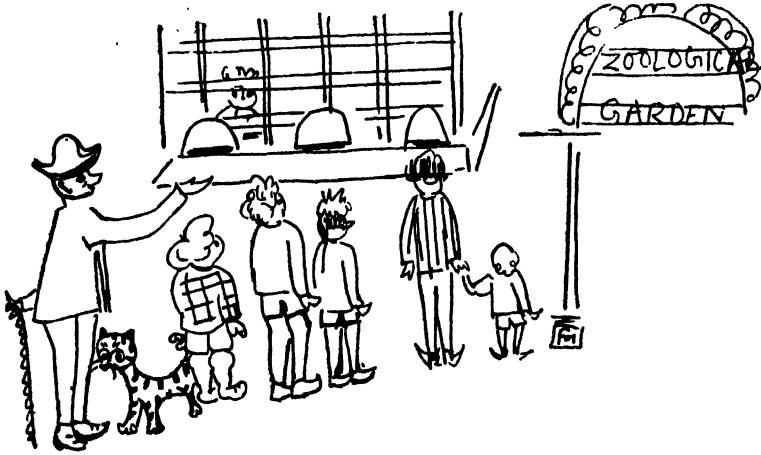
বেড়ালের নাম শুনেই পানুটা চট্‌পট্‌ সরে দাঁড়াল। আমিও ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেই লোকটা ! লোকটা আমাদের দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে বলল : সাম্‌লে খোকারা, সাম্‌লে। চিড়িয়াখানা তো এখুনি উঠে যাচ্ছে না। এদিকে টিকিটওয়ালা বেজায় ঝামেলা জুড়ে দিল। বলল : মশাই, আপনি ঢুকতে পারেন, কিন্তু আপনার বেড়াল ঢুকতে পাবে না। আপনার বেড়ালকে দেখে এখানকার বেড়ালদের প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে উঠতে পারে। তখন ওরা হয়তো খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দেবে। সে অভিমান ভাঙ্গাতে আমরা ঝালাপালা হয়ে যাব মশাই। আর বাঘদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। ওরা মাসিকে দেখে কেঁদেকেটে একসা হবে। তখন কি মশাই, আপনি ওদের থামাবেন ? এমন আবদার রাখতে হলে মশাই, আমাদের ব্যাবসাই তুলে দিতে হবে। টিকিটওয়ালাটা খালি 'মশাই-মশাই' করে লোকটাকে বসিয়ে দিল। লোকটা 'ভোম্বল, ভোম্বল' বলে বার-দুয়েক ডাকল, কান টানল, গায়ে একটু একটু হাত

বুলাল। তারপর দেখি অবাক কাণ্ড! বেড়ালটা ম্যাঁও-ম্যাঁও শব্দ করে হাওয়া হয়ে গেল। আমাদের খুব কাছাকাছি, এ্যাক্কেবারে পানুর গা ঘেঁষে ধোঁয়া ধোঁয়া রঙের গরমজামা-পরা একটা বেড়ালমুখো খোকা দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটার মুখটা বেড়ালের মুখ নয়। মানুষের মুখই একটু বেড়াল-বেড়াল দেখতে। যেমন অনেক ছোটছেলেদের মুখ খরগোশের মতো হয়, অনেক পণ্ডিতদের মুখ শেয়ালের মতো মনে হয়। ঠিক্ তেমনি। পানু ছেলেটার থেকে অনেকটা সরে দাঁড়াল। লোকটা বলল: ভয় কি খোকা। ভাব করে নাও। দিব্যি ছেলে। তোমার মতোই ক্লাশ থ্রিতে পড়ে। খুব ভাল ডাংগুলি খেলে।—পানু আরও সরে এসে প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। বলল: লোকটা কি করে জানলো রে আমি থ্রি-ক্লাশে পড়ি? খোকন বলল,—জাদু জানে বোধ হয়।

ভোম্বলটা খোকা সেজে লোকটার হাত ধরে গুটি গুটি চলেছে। দু ধারে ফেরিওয়ালা দেখে মিনমিনে গলায় বলছে: ছোলা কিনব, কলা কিনব, বাদাম কিনব। এ্যাই আইচ-কিরিম এদিকে! এদিকে! টিকিটওয়ালাতো সব দেখে শুনে হতভম্ব! হাতজোড় করে বলতে লাগল: ও মশাই, নিজের বেড়ালটাকে তো খোকা বানালেন, দয়া করে অন্য জন্তুদের মানুষ বানাবেন না। ওরা বড্ড বেয়াড়া, আপনি তো ওদের নিয়ে বাস করেন নি। জানেন না ওদের রকম সকম। লোকটা বলল: সে দেখা যাবে। আগে টিকিটের পয়সাটা ফেরৎ দিন তো। আমার এসব গোলমাল দেখে ভিতরে এগিয়ে গেলাম। সারাদিন ঘুরলাম, ভোম্বল আর ওর মালিকের পাত্তা পেলাম না। ফিরছি, এমন সময় দেখি সাপের ঘরটার সামনে সেই লোকটা একটা ব্যাঁকা ছড়ি ঘুরিয়ে ভোম্বলকে কি সব বোঝাচ্ছে। ভোম্বলের সেদিকে মন নেই। একমনে আইসক্রিম চাটছে। খোকন আর পানু ওদের দেখছিল। আমি বললাম: তাকাস্ নি, তাকাস্ নি, এক্ষুণি তোদের শূয়োর বানিয়ে ফেলবে। খোকনটা এমন বখা হয়েছে যে আমার মুখের ওপর বলল: তোকে কি বানাবে রে গাধা না গরু?

আমি বললাম: স্পুটনিক কি সাবমেরিন। কিছু না হোক ট্রানজিস্টার রেডিও তো বানাবেই। কথাটা ওদের মনের মত হ'ল না তো, তাই চুপ করে গেল।

অনেকদিন সেই লোকটাকে কোথাও দেখতে পাই নি। এক বছর দু-বছর হবে বোধহয়। মাঝে মাঝে খোকন আর পানু বলত লোকটাকে হাওড়াপুলের নিচে পায়চারি করতে দেখছে, লাইটহাউসের সামনে দেওয়ালের ছবি দেখতে দেখতে হাঁটতে দেখেছে। জানই তো বাজে কথা বলা আমার পছন্দ নয়। সত্যি বলছি আমি কোনদিন সেই লোকটার ছায়াও দেখি নি। কিন্তু গত পরশুদিন যা অসম্ভব জিনিস ঘটে গেল তোমাকে না লিখে আর পারছি না।

বিকেল বেলা পার্কে ফুটবল খেলে বাড়ি ফেরার তোড়জোড় করছি, দেখি সেই লোকটা একটা

বেঞ্চিতে বসে দুজন চশমাপরা লোকের কাছে চেঁচামেঁচি করে গল্প করছে : আপনারা দাদা এই গরমে কাবু হয়ে পড়লেন। মাত্র একশো দশ ডিগ্রী। এতেই কুলপি-মালাই লেমনেড লাগছে। এইজন্য বোধহয় বিদেশভ্রমণ আপনাদের কপালে লেখা নেই। আমি তো সেবার আফ্রিকার পশ্চিম উপকূ ছুটিটা কাটিয়ে আসছি। সে কি সুন্দর জায়গা! গহন অরণ্য, ছোটবেলায় ভূগোল বইতে পড়েছেন তো এমনিতে তো বেজায় গরম। শেষে গরম বাড়তে এমন হল যে ঐ লম্বা চওড়া কঙ্গো নদীটা মাঠ হ গেল। বড় বড় কুমীর আর জলহস্তীরা চারিদিকে হামাগুড়ি দিতে লাগল। বাঘ সিংহরা গরমে অতি
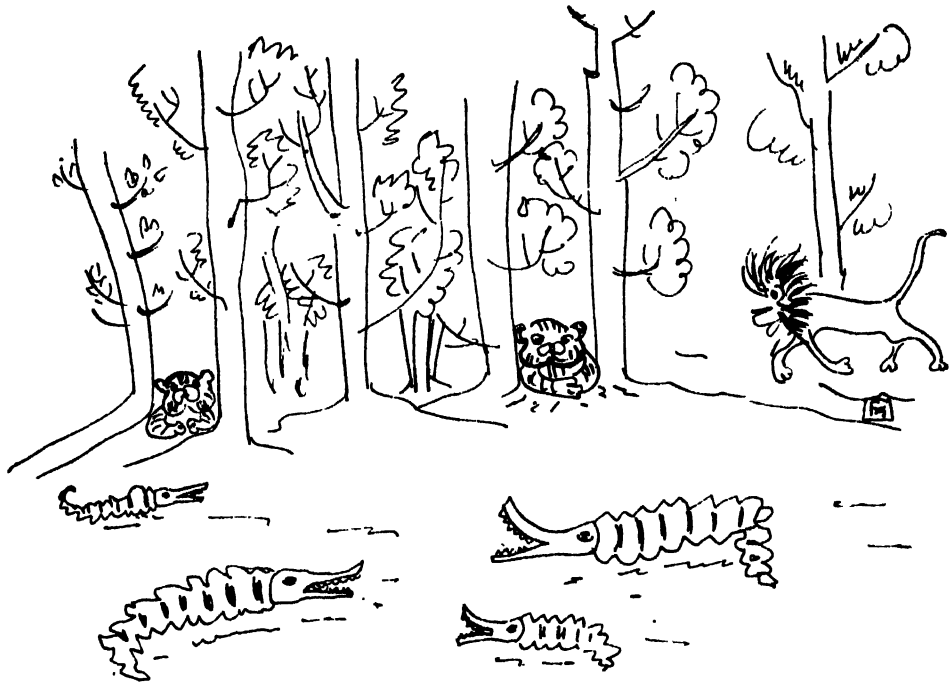
হয়ে বিকট চিৎকার জুড়ে দিল। সে কি দৃশ্য! অমনটি আর কোনো প্রাইজ পাওয়া বিলিতী ছবিতে দেখা যাবে না। আমার তো বেজায় মজা। পাঁচশো ফুট উঁচু একটা আবলুস গাছের মাথায় বসে খে ঘরের মত দেশটাকে দেখছি। তারপর অঝোর ঝরে বৃষ্টি নামল। কঙ্গো নদীটা জলে ভরে উঠল তাতে দেশ বিদেশের নৌকো ভাসল, জাহাজ। আমি তখন গাছ থেকে নেমে এসে জাহাজে চড়ে নিজে দেশে ফিরে এলাম। আসার সময় কাঁচের বাক্স করে একটা ছোট সাইজের কুমীরের বাচ্চা এনেছিলাম জাহাজ থেকে নামার সময় কুমীরটা কিছুতেই ডাঙায় উঠতে চাইল না। ছল্‌ছল্‌ চোখে চেয়ে রইল গাল বেয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ল। কুমীরের চোখে জল, সোজা কথা! আমারও বড্ড কা হ'ল। ওটাকে গঙ্গার জলে ছেড়ে দিয়ে বললাম : ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। আচ্ছা। আ

অনেক হল উঠি এবার।—বলেই লোকটা ছড়ি ঘুরিয়ে উঠে পড়ল। আমি ভাবছি লোকটার পেছনে ধাওয়া করব কি না, এমন সময় দেখি বেঞ্চির ওপর একটা লালরঙের বাঁধানো নোটবুক। সঙ্গে দড়ি বাঁধা একটা ভাঙ্গা পেন্সিল। খাতাটা পেয়েই এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে সোজা পড়ার ঘরে চলে গেলাম। টেবিলল্যাম্প জ্বেলে পড়তে

বসলাম। খাতাটা খুলে দেখি প্রথমপাতায় হিজিবিজি আঁকিবুকি। দ্বিতীয় পাতায় গোটাগোটা অক্ষরে লেখা: নাম—হাস্যলোচন বক্সী, পেশায়-জাদুকর, নেশায়-ভবঘুরে। তারপর এক দুই-তিন করে তার নিজের কথা শুরু হয়েছে।

১। আমার বাবা ছিলেন বিরাট বৈজ্ঞানিক। ঠাকুর্দা ছিলেন গণৎকার আর তাঁর বাবা ছিলেন ঝাড়ফুঁকমন্ত্রের পণ্ডিত। আমার মামারা হলেন সাপ খেলানোর ওস্তাদ। এমন বাড়ির ছেলে হয়ে যে আমি জাদুকর হ'ব এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! জন্মে থেকেই শুনে আসছি এবাড়ির লোকেরা
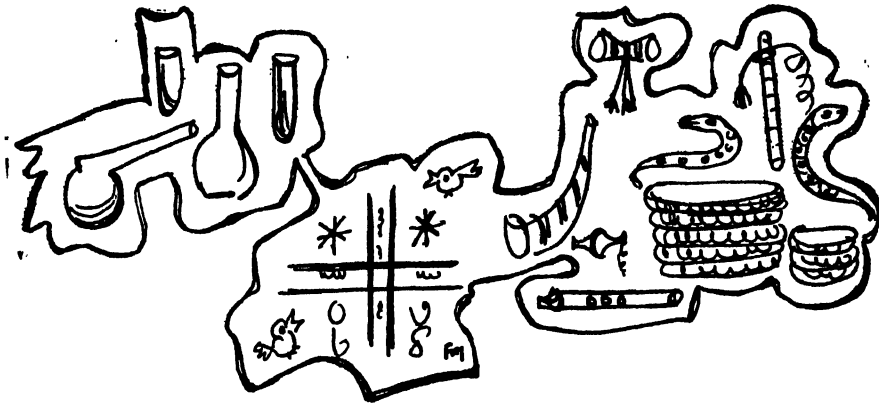
বোতলের লাল জলে ব্যাঙ পুষতে পারে। কারো কান দেখে বলতে পারে যে বোকা না চালাক, আর মন্ত্র পড়ে সমস্ত হিংসুটেদের ঘরের দেয়ালে টিকটিকি বানিয়ে রাখতে পারে।

২। ছোটবেলায় আমার লেখাপড়া বিশেষ কিছুই হল না। তিনবার এনট্র্যান্স পরীক্ষায় ফেল করে কালিম্পং-এ মামাবাড়ি চলে গেলাম। সেখানে এক তিব্বতী সাধুবাবার সঙ্গে আলাপ। তাঁর কাছেই জাদুমন্ত্র শিখলাম। তিন পুরুষের সমস্ত প্রতিভা আমার মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তারপর আমি কালিম্পং-গ্যাংটক-ব্যাংকক-হংকং-হনুলুলু-ম্যানহাটান হয়ে সোজা দক্ষিণ আমেরিকায় চলে গেলাম। মাঝরাস্তায় শ্যামদেশে ঐ বেড়ালটা আমাকে ছাড়তে চাইল না। বলল: তোমার চেলা হয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দেব। তখন ওর নাম ছিল ভিম্বো। আমি সেটা পালটে রাখলাম ভোম্বল—বেশ বাঙালী মত হল।

৩। দক্ষিণ আমেরিকায় খেলাটা বেশ জমে উঠেছিল। শেষ বয়সে ভোম্বলকে নিয়ে দেশে ফিরে এলাম। শুনছি এখানে জাতুকরদের অনেক সুযোগ-সুবিধে।

৪। ভাবছি একটা দল পাকিয়ে খেলাটা আবার শুরু করে দেব। ভোম্বল তো আছেই। আর কয়েকজন ছোটছেলে হলেই চলবে।

৫। তিন-চারটে তুষ্টু ছেলের খোঁজ পেয়েছি। ক্রিকেটের মাঠে, চিড়িয়াখানায়, সিনেমার সামনে যেখানেই আমাকে দেখে সেখানেই আমাকে জুলজুলে চোখে দেখে ঠেলাটা বুঝতে পারবে! অতিরিক্ত কৌতূহল ভাল নয়!

৬। কদিন ধরে ওদের পার্কে ফুটবল খেলতেও দেখছি। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা সেটাই বেশি বিচ্ছু। ভাবছি পানু গোলগাল ছোট বাচ্চাটাকে একটা 'পোর্টেবল' হাতি বানাবো—যাকে চারকুঁজ করে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে। খোকন আর তার চাইতে বড়টাকে মুলতানী গাধা বানাবো। আর সেই ঢ্যাঙা ফরসা ছেলেটা—যেটাকে একদিন মাত্র ক্রিকেট মাঠে দেখেছিলাম, সেটাকে অনেকদিন দেখি না। তাকে দেখলে তার কথা ভাবা যাবে।······

এই পর্যন্ত লিখে লোকটা খাতাটা ফেলে গেছে। সমস্তটা পড়ে আমরা তিনজন পেটব্যথার ভান করে চিলেকোঠার ঘরে ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে আছি। এ অবস্থায় কি করা উচিত তোমার হুক্কেলের বন্ধুদের পরামর্শ নিয়ে জানাবে। ব্যাপার মনে হয় খুবই গা-শিরশিরে রহস্যে ভর্তি। বড়দের জানানো কোনমতেই উচিত হবে না।

ইতি—

তিলাপিয়া মাছ
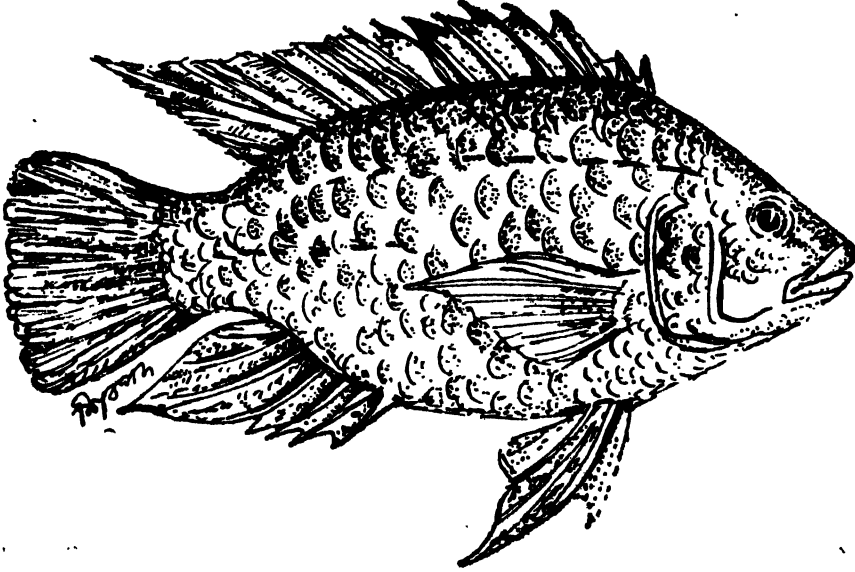
মিহির কুমার ভট্টাচার্য

তিলাপিয়া মাছ তোমরা সকলেই দেখে থাকবে। বাজারে এখন এই মাছটির আমদানী খুব বেশি। এক সময়ে এই মাছের কথা আমাদের দেশের কেউই জানতো না। আমাদের দেশে তিলাপিয়া মাছ যখন প্রথম আসে—তখন এই মাছ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের শেষ ছিল না। অনেকেই এই মাছ ভয়ে খেতো না। কিন্তু এখন তিলাপিয়া মাছ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এবং ভীতি নেই। বাজারে এখন এই মাছের চাহিদা খুব। জ্যান্ত মাছের মধ্যে এরাই এখন সহজলভ্য। তিলাপিয়া মাছের ইতিহাস তোমাদের মধ্যে অনেকেই জান না। এদের জীবন-কাহিনী বেশ বিচিত্র। তোমাদের তিলাপিয়া মাছ সম্বন্ধে এখন কিছু বলছি।

তিলাপিয়া মাছের আর একটি অদ্ভুত নাম আমাদের দেশে চালু আছে—আমেরিকান কৈ। নামটির উৎপত্তি কেমন করে হল—তা বলা শক্ত। কারণ কৈ মাছের সঙ্গে তিলাপিয়া মাছের চেহারার কোন মিল নেই, আর এদের আদি বাসস্থান আমেরিকা নয় এবং আমেরিকা থেকে এরা ভারতবর্ষে আসে নি। স্যাদস বা মেনী মাছ তোমরা দেখে থাকবে—এদের চেহারার সঙ্গে তিলাপিয়া মাছের চেহারার বরং মিল আছে।

কলম্বোর মৎস্য গবেষণা মন্দির থেকে মাদ্রাজের মৎস্য গবেষণা মন্দিরে কতকগুলি জ্যান্ত তিলাপিয়া মাছ পরীক্ষার জন্যে আনা হয়। সেখানে পরীক্ষায় দেখা যায়—আমাদের দেশের

জলবায়ু তিলাপিয়া মাছের চাষের পক্ষে উপযোগী। অন্যান্য রাজ্যেও এই মাছ নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়।

পৃথিবীর যে সব দেশ অনুন্নত, বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ায় জান্তব প্রোটিনের খুব অভাব। আর আমাদের দেহপুষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে জান্তব প্রোটিন। এই অভাব দূর করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা সস্তায় প্রচুর জান্তব প্রোটিন পাওয়া যায় এমন খাদ্যের খোঁজ করতে থাকেন। সব দিক বিবেচনা করে দেখা যায়—তিলাপিয়া মাছ এই উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে উপযোগী। কারণ তিলাপিয়া মাছ থেকে সস্তায় এবং অল্প পরিশ্রমে প্রচুর পরিমাণে জান্তব প্রোটিন পাওয়া সম্ভব।

কবে থেকে যে, মানুষ তিলাপিয়াকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছে তা বলা কঠিন। যতদূর জানা যায়—১৯৩৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার কোন এক হ্রদে সর্বপ্রথম তিলাপিয়া মাছের দেখা পাওয়া যায়। এর আগে নাকি পূর্ব আফ্রিকার মোজাম্বিকের সমুদ্র-উপকূল ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথায়ও তিলাপিয়া মাছ পাওয়া যেত না। ইন্দোনেশিয়ার হ্রদে তিলাপিয়া মাছের সন্ধান পাবার পর বিজ্ঞানীরা এই মাছ সম্বন্ধে কৌতূহলী হন! কিন্তু কেমন করে তিলাপিয়া মাছ তাদের আদিবাসভূমি পূর্ব আফ্রিকার মোজাম্বিক উপকূলবর্তী সমুদ্র থেকে ইন্দোনেশিয়ার হ্রদে উপস্থিত হয়—সে কাহিনী আজও অজ্ঞাত। তারপর এরা নানাভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসতি স্থাপন করেছে।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তিলাপিয়া মাছ খাওয়া খুব বেশি দিনের কথা না হলেও—সুদূর অতীতেও যে, তিলাপিয়া মাছ মানুষের প্রিয় খাদ্য ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে মিশরের সমাধিমন্দিরের দেয়ালে। খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বছরের সেখানকার এক সমাধিমন্দিরের গায়ে তিলাপিয়া নিলোটিকা প্রজাতির এক জোড়া তিলাপিয়া মাছের ছবি আঁকা ছিল। তাঁদের মতে মিশর, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশে তিলাপিয়া মাছ উপাদেয় খাদ্য হিসাবে পরিগণিত। বিভিন্ন প্রজাতির তিলাপিয়া মাছ দেখা যায়। তবে এদের মধ্যে Tilapia mossambica, Tilapia nilotica, Tilapia melanoplura, Tilapia zilli প্রভৃতি বিশেষ পরিচিত। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই Tilapia mossambica বংশবিস্তার করেছে।

ভারতবর্ষ ছাড়াও সুস্বাদু মাছ হিসাবে তিলাপিয়া শ্যামদেশ, আফ্রিকা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, দক্ষিণ আমেরিকা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ক্যামেরুন এবং আরও অনেকদেশে খাদ্যতালিকায় স্থান পেয়েছে। সেসব দেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই মাছের চাষ যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে।

পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে—তিলাপিয়া মাছের চাষে বিশেষ হাঙ্গামা নেই। খাল-বিল, নালা-ডোবা, পুকুর, জলাভূমি প্রভৃতি জলাশয়ে এরা অনায়াসে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। নোনা এবং মিঠা—দু-রকম জলেই এরা জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তিলাপিয়া মাছের বংশবৃদ্ধি খুব ব্যাপক ভাবে হয় এবং দৈহিক বৃদ্ধিও হয় খুব দ্রুতগতিতে। তিলাপিয়া মাছ দীর্ঘজীবী এবং কদাচিৎ এরা রোগাক্রান্ত হয়।

স্ত্রী-তিলাপিয়া বছরে তিন-চার বার একসঙ্গে প্রচুর ডিম পাড়ে। সাধারণতঃ এরা চারমাস বয়স থেকেই ডিম পাড়তে সুরু করে। স্ত্রী-তিলাপিয়ার সন্তান স্নেহ খুব প্রবল। শত্রু খেয়ে ফেলবে এই

আশঙ্কায় এরা ডিম পাড়বার পর ডিমগুলিকে মুখের মধ্যে গলার থলিতে রেখে দেয় এবং কুলকুচা করবার কায়দায় অনবরত নাড়াতে থাকে। কখনও কখনও বাচ্চারা মায়ের মুখ থেকে বেরোয়—কিন্তু ভয় পেলেই আবার মায়ের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আধইঞ্চির মত বড় হবার পর এরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা সুরু করে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে—অনুকূল পরিবেশে একজোড়া তিলাপিয়া মাছ থেকে বছরে দশহাজার তিলাপিয়া মাছ উৎপন্ন হয়েছে। এ থেকেই বুঝতে পারছো—এদের বংশবৃদ্ধির হার কী ব্যাপক! তিলাপিয়া মাছের প্রধান খাদ্য শ্যাওলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ এবং প্লাঙ্ক্‌টন।

সাধারণত: চারমাসের মধ্যেই তিলাপিয়া মাছ খাবার উপযোগী হয়ে ওঠে। বছরখানেকের মধ্যে এদের দৈহিক ওজন দেড়পো, আধসেরের মত হয়। ছোট মাছের তুলনায় বড় মাছ খেতে সুস্বাদু এবং তার পুষ্টিমূল্যও অনেক বেশী। একটা বড় তিলাপিয়া মাছে যে পরিমাণ খাদ্যবস্তু বা মাছ পাওয়া যায়, চার পাঁচটা ছোট তিলাপিয়া মাছ থেকেও সেই পরিমাণ খাদ্যবস্তু বা মাছ পাওয়া যায় না, সেজন্যে ছোটর তুলনায় বড় তিলাপিয়ার চাহিদা খুব বেশি।

মানুষের শক্তি

সুখরঞ্জন রায়

আমি তীরবেগে ছুটি মাটীতে ;
যায় ছ'ঘড়িতে রথ ছ'মাসের পথ
হয়নাক পায়ে হাঁটিতে ;
আগুনে বাষ্পে করেছি ভৃত্য,
জোর তারা মিলে যোগায় নিত্য,
খেয়ে ছুটে দেহ ছুটে যে চিত্ত,
হয়নাক গায়ে খাটিতে ;
আমি তীরবেগে ছুটি মাটীতে।

চলি জলেও অবাধে
আর পাহাড়ের মত ঢেউগুলি যত
দুই ধারে পড়ে লুটিয়া ;
জল কাটি' কাটি' বেগে ছুটি চলি,
উর্মি-মালায় যাই পায়ে দলি',
ডুবায়ে তটিনী সিন্ধু কাকলি
সব বন্ধন টুটিয়া ;
যাই কভু জল-তলে ছুটিয়া

আকাশে মেলিয়া পক্ষ ;
হেম মূক বিস্ময়ে রবি তারাচয়ে
চাহে গো অযুত লক্ষ ;
পদতলে পড়ে থাকে গো ধরণী,
কোথা উড়ে যায় হাওয়ার তরণী,
খেয়ে যাই বাহি' শূন্য-সরণী,
গরবে ধরে এ বক্ষ :
ছুটি আকাশে মেলিয়া পক্ষ।

নভে যে বিজলী-আলো ঝলকে
তারে দিয়ে তার-ফাঁসী ঘরে করি দাসী
জ্বালাই নিবাই পলকে ;
যে বিজলী দেয় গ্রীষ্মের হাওয়া,
বার্তা বহিয়া করে আসা যাওয়া,
লক্ষ যোজন নিমেষেতে ধাওয়া
বাঁধিয়া মর্ত্যে গোলকে
নভে গৃহ-তলে আলো ঝলকে।

জানি গোপন মনের কথাটি ;
যেবা রহস্য ছলে গূঢ় তরুমূলে
যে পুলকে কাঁপে লতাটি ;
যেই সুগোপন সূতায় সূতায়
গ্রহ তারা বাঁধা যেন গো লতায়,
খনিতলে মণি যে মৌন কথায়
আভাসিয়া তুলে ব্যথাটি,
নাহি লুকানো কাহারো কথাটি।

মন ছুটে মোর দূর ভুবনে,
ছুটে জলে আর স্থলে ধরণীর তলে
নভো তারকায় তপনে ;
সাগরের তলে ধায় সে ছুটিয়া,
আকাশের গায়ে পড়ে যে লুটিয়া,
ধেয়ে ছুটে চলে বন্ধ টুটিয়া
লঘু পাখা মেলি পবনে ;
মন ছুটে মোর দূর ভুবনে।

গল্প-সল্প

পৃথিবীতে যে কত রকম রহস্য আছে সে আর বলে বলে শেষ করা যায় না। আগেই বলেছি রহস্য মানে এমন কিছু যার কারণ ভেবে পাওয়া যায় না, বা পুরোপুরি বোঝা যায় না। আসলে ভেতরের ব্যাপার হয়তো খুবই সহজ, কিন্তু সবটা জানা যায় নি বলে অদ্ভুত লাগে।

ক্যানাডার নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে নোভা স্কোসিয়া, তার ওবড়োখেবড়ো দক্ষিণ তীরের কাছেই ছোট একটা দ্বীপ, আকারে অনেকটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো, নাম তার ওক্ আইল্যাণ্ড। ওক আইল্যাণ্ড গভীর রহস্যে মোড়া।

একশো সত্তর বছর আগে, ডেনিয়েল ম্যাক্‌ইন্স্ বলে একজন যোল বছরের ছেলে, ছুটির দিনে নৌকা বেয়ে ওক আইল্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হল, শিকারের যোগ্য জন্তু জানোয়ার যদি কিছু পাওয়া যায় এই আশাতে। ঘুরতে ঘুরতে তার চোখে পড়ল যে দ্বীপের এক মাথায় একটা টিলার ওপর প্রায় বারো ফুট চওড়া এক গর্ত। গর্তের পনেরো ষোল ফুট ওপরে গুঁড়িতে পুরোনো একটা জাহাজের কপিকল ঝুলছে।

দেখেই ডেনিয়েলের বুক ঢিপঢিপ করতে আরম্ভ করেছে; লা হাভ্ বন্দরে যে জলদস্যুদের গুপ্ত-ধনের গল্প শোনা যায়, এও কি তবে তাই?

১৭০১ সালে ক্যাপ্‌টেন কিড নামে একজন বিখ্যাত জলদস্যুর ফাঁসি হয়েছিল, কিন্তু তার অগাধ ধনদৌলতের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। লোকের ধারণা এইখানেই কোথাও সে সব লুকোনো আছে। তাছাড়া ব্ল্যাক্‌বিয়ার্ড কিম্বা হেনরি মর্গ্যান নামের কুখ্যাত ডাকাতরা, কিম্বা সেকালের ইঙ্কা রাজাদের ধন লুট করে এনে স্পেনের দস্যুরাও এখানে লুকিয়ে রেখে থাকতে পারে।

যাই হোক, পরদিন টোনি ভন আর জ্যাক স্মিথ্ বলে দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ডেনিয়েল আবার সেখানে গিয়ে খুঁড়তে শুরু করে দিল। দশ ফুট খুঁড়েই পুরোনো ওক কাঠের একটা মাচা পাওয়া গেল। কুড়ি ফুট নিচে আরেকটা! ত্রিশ ফুট নিচে আরেকটা। চারধারে মাটির দেওয়ালে পরিষ্কার সাবলের দাগ। এদিকে যতই নিচে নামা যায় কাজটা ততই কঠিন হয়ে ওঠে। তিনজন ছেলেমানুষ অত পারবে কেন? শেষ পর্যন্ত তখনকার মতো কাজ বন্ধ করতে হল।

তাই বলে অবিশ্যি হাল ছেড়ে দেওয়া হল না। ডেনিয়েল আর স্মিথ কিছুদিন পরে ওক দ্বীপে বসবাস করতে শুরু করে দিল। কাজ চালাতে হলে পয়সাকড়ির দরকার। ১৮০৪ সালে ওদের কাছে গুপ্তধনের গল্প শুনে সিমিয়ন লিণ্ডস্ বলে একজন ধনী লোক ওদের সঙ্গে কাজে লাগলেন। আবার খোঁড়া আরম্ভ হল।

যতই নামা যায়, দশ ফুট অন্তর একটা করে ওক কাঠের মাচা পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে নারকেল ছোবড়ার পরত। এইভাবে নব্বই ফুট নেমে একটা অদ্ভুত পাথর পাওয়া গেল, তার গায় নানারকম আঁকিবুঁকি কাটা। একজন বিশেষজ্ঞ বললেন আঁচড়গুলোর মানে হচ্ছে—আরো দশ ফুট নিচে দশ লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া যাবে।

আরো তিন ফুট খোঁড়া হলে, খোন্তাটা পাঁচ ফুট ঢুকে গিয়ে ঠক্ করে শক্ত কিসে ঠেকল। লিগুনের মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে এই সেই গুপ্তধন। রাতের মতো কাজ বন্ধ করতে হল, পরদিন সকালে গিয়ে সবাই দেখে গর্তের মধ্যে ষাট ফুট জল দাঁড়িয়েছে! সে জল ছেঁচেও শেষ করা যায় না; যতই তোলে, তক্ষুণি আবার ভরে ওঠে। সে বছরের মতো কাজ বন্ধ করতে হল।

পরের বছর একটা বুদ্ধি করা গেল। পুরোনো গর্ত থেকে কিছু দূরে ১১০ ফুট গভীর আরেকটা গর্ত খুঁড়ে, তারপর সুড়ঙ্গ কেটে আগের গর্তের দিকে এগুনো হল। দুঃখের বিষয় যখন মাত্র দু' তিন ফুট বাকি, দেয়াল ভেঙ্গে হুড়হুড় করে রাশি রাশি জল ঢুকতে লাগল। দেখতে দেখতে নতুন গর্তেও ষাট ফুট জল দাঁড়িয়ে গেল। নোনা জল। নিরাশ হয়ে লিগুস্ সরে পড়ল। অল্প কাল পরে ডেনিয়েল মারা গেল।

ভন আর স্মিথ্ কিন্তু ১৮৪৯ সালে আরেকবার চেষ্টা করল। আটানব্বুই ফুট খুঁড়ে, একটা বর্শা ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বর্শাটা একটু বিশেষ রকমের তার ফলাটা যে পদার্থের মধ্যে দিয়ে যায়, তারি একটু করে নমুনা খুঁড়ে আনে।

বর্শার আগায় উঠে এল খানিকটা কাঠ, তারপর যেন খানিকটা ফাঁকা জায়গা বেরুল, তারপর খানিকটা ধাতু, আবার কাঠ, আবার ফাঁকা, আবার ধাতু, শেষে কাঠ। আর এই সব জিনিসের সঙ্গে সোনার চেনের ছোট্ট একটা টুকরো!

তাই দেখে কারো মনেই সন্দেহ রইল না যে গর্তের নিচে আছে ধাতুর লাইনিং দেওয়া দুটি কাঠের সিন্দুক, একটার উপর একটা বসানো এবং দুটিই নিশ্চয় সোনাদানায় ঠাসা!

কিন্তু সিন্দুক দুটো তোলা যায় কি করে? যেখানেই খোঁড়া যায় নব্বুই পঁচানব্বুই ফুট নামলেই ষাট ফুট করে নোনা জল দাঁড়ায়। এবার লক্ষ্য করা গেল যে জলটা সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে কমে। তার মানে মাটির তলা দিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে যোগ আছে এবং যোগাযোগটা ইচ্ছা করেই করা হয়েছে যাতে কেউ সহজে গুপ্তধন সরাতে না পারে।

অনেক অনুসন্ধান করে যোগাযোগের পথটাকে খোঁজ পাওয়া গেছে। স্মিথের হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে বহুকাল আগে, প্রথম যখন ওরা ওক দ্বীপে এসেছিল, তখন একদিন ভাঁটার সময় সমুদ্রের ধারে বালির উপর দিয়ে গবগব করে জল বয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়তে দেখেছিল। সেইখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে দেখা গেল যে বালির নিচে অনেকখানি জায়গা পাথর দিয়ে বাঁধানো, তার উপর নারকেলের ছোবড়া পাতা। তাছাড়া পাঁচটা বাঁধানো নালাও দেখা গেল যা দিয়ে জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল স্বচ্ছন্দে মাটির নিচে ঢুকে পড়তে পারে। এই ভাবেই যে সমুদ্রের জল গুপ্তধনের গর্ত পাহারা দেয় সে বিষয়ে

কারো মনে সন্দেহ রইল না। আজ পর্যন্ত ঐ গুপ্তধন কেউ বের করতে পারে নি। কতই চেষ্টা কর করা হয়েছে। ডিনামাইট দিয়ে কত পাথর উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় মাটির নিচে অনেক জায়গায় সিন্ধুক লুকোনো আছে। বর্শার আগায় আরো সোনার টুকরো উঠে এসেছে। একবার একট কাগজের কুচিও বেরুল, তাতে খাগের কলম দিয়ে লেখা ভি—আই—এইটুকু পড়া যাচ্ছে। অনেকে বলেন এতে আরো প্রমাণ হচ্ছে যে সোনাদানা ছাড়াও হয়তো তার চেয়েও দামী কাগজপত্র দলিল ইত্যাদিও ওখানে পোঁতা আছে।

প্রায় দু' শো বছরের চেষ্টা আর পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা খরচের পরও কিছুই যে উদ্ধার হয় নি, এই বড় হতাশার কথা। তবু চেষ্টা চলেছে। পেট্রলের সন্ধানেও ওক আইল্যাণ্ডে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। এঞ্জিনিয়াররা আজও বলছেন যে এত বুদ্ধি খাটিয়ে, এত পরিশ্রম করে যে জিনিস লুকোনো হয়েছে তার নিশ্চয়ই অনেক দাম। দুঃখের বিষয় সেটি কেউ পেল তো নাই—ই, উপরন্তু এত ধাঁটাধাঁটি খোঁড়াখুঁড়ির ফলে, মাটি ধ্বসে গিয়ে, জিনিস অনেকখানি সরে গিয়েছে নিশ্চয়ই, এখন তাকে খুঁজে বের করা আরো শক্ত কাজ হয়ে উঠেছে।

দেশ-বেড়ানি ছড়া

যাদুকর—এ, সি, সরকার

টোকিও

ফুজিয়ামা, ফুজিয়ামা
জাপানের পাহাড়ই
চেরীফুল তুলতুল
ফোটে তাতে বাহারী !

অপরূপ তার রূপ
তুলনা যে নাই রে
মনলোভা এত শোভা
কোথা আর পাইরে !

চকচকে টকটকে
রাঙা রবি আকাশে
নানা সুর ভরপুর
জাপানের বাতাসে।

টোকিও ! টোকিও !
রাজধানী তার যে
এর তুল বিলকুল
খুঁজে পাওয়া ভার যে !

হং কং

সাগরের মাঝখানে
শহর যে হং কং
সাজানো গোছানো বাড়ি
নানাবিধ রং চং।
এশিয়ার দেশ এক
ইংরেজ দখলে
চিনাভাষী অধিবাসী
এতে প্রায় সকলে।
আহারে ও বিহারেতে
অনেকেই চীনা তাই,
কী যে খায় কী না খায়
নেই ঠিক ঠিকানাই !

সাপ ব্যাং কত কিছু
নানাবিধ কায়দায়
রেঁধে কিবা না রেঁধেই
এরা সব খায় দায় !
পাহাড় চূড়োয় চড়া,
ঝোলারেল মজাদার
মন জয় করে নেয়
এই খানে সবাকার
যেতে পার এ সহরে
জাহাজে বা বিমানে।
জানি না তো হং কং
কথাটার কী মানে।

সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুর !
সিঙ্গাপুর !
খুব এমন
নয়কো দূর ।
মালয় দেশ
যেথায় শেষ
সেথায় দ্বীপ
সিঙ্গাপুর ।

জিনিস সব
খুব সুলভ,
ফল পাকুর
যে ভরপুর ।
সিঙ্গাপুর !
সিঙ্গাপুর !
নয়তো দূর
সিঙ্গাপুর

সকল যান
নৌ বিমান
সদাই যায়
সিঙ্গাপুর ।
অতীত নাম
সিংহ পুর ।
নয় কো দূর
সিঙ্গাপুর ।

রেঙ্গুন

রেঙ্গুন, রেঙ্গুন, সুন্দরী রেঙ্গুন,
প্যাগেডায় গামেলনান
বাজে সদা টুনটুন !
সুন্দরী রেঙ্গুন !

প্যাগোডায় সোনা মোড়া
মন্দির চূড়োটা
চিকমিক করে রোদে
দেখা যায় পুরোটা !

তথাগত উপাসক
বেশি লোক এখানে ।
ঙাপ্পি ও ভাত খায়,
যে বা থাকে যেখানে ।

রাজধানী বর্মার ।

পুবতীরে রয়েছে এ
বঙ্গোপসাগরের ।

দিল্লী

দিল্লী,—দিল্লী যে
রাজধানী ভারতের,
সারা দেশ জুড়ে নাম
জেনো এই শহরের।
কুতুব মিনার আছে
আছে নানা কেল্লা
যমুনার তীরে তীরে
শহরের জেল্লা।

রাজঘাট, পরিষদ,
চাঁদনীর চক ভাই,
যন্ত্রর মন্তর,
নেই তার তুলনাই!
রাজধানী ভারতের
অপরূপ শহরই,
অতীত দিনের মণি
মুকুতার আকরই!

দার্জিলিং

হিমালয়ের কোলের পরে,
সাজানো ঘর থরে থরে,
শীতে সেথায় তুষার ঝরে,
রেল চলে যায় টি-টিং টিং।
পাহাড় নগর দার্জিলিং!
রবির উদয় বাঘ-পাহাড়ে,
তাহার যে কি রূপ—আহারে,
বলি তাহা বল কাহারে।

শা-জি গুরুং আর জিসিং
বাংলা দেশের দার্জিলিং!
ছাড়ার পরেই শিলিগুড়ি
রেলগাড়ি দেয় হামাগুড়ি
ঐ তো দূরে পাহাড়পুরী,—
মন যে নাচে ধি তিং ধিং
দার্জিলিং!

কলিকাতা

বাংলার রাজধানী
কলিকাতা নগরী।
পাশে বয় গঙ্গার
অবিরাম লহরী।

ট্রাম-বাস গাড়ি-ঘোড়া
চলে পথে অবিরাম,
বড় বড় ইমারত
যে নয়ন অভিরাম।

যাদুঘর, মনুমেণ্ট,
গ্রহগৃহ, ময়দান।
দেখে লোকে গায় এই
নগরীর জয়গান।

গ্যাস জ্বলে রাস্তায়
বিজলীর সঙ্গে,
আলোকের মালা রাতে
দোলে এর অঙ্গে।

শ' তিন বছর আগে
ইংরেজ চার্নক,
গড়েছেন এ শহর,
কত শত দর্শক

দলে দলে আসে যায়
নিত্য এ শহরে
বিরাট আকার এর
লম্বায় ও বহরে।

বো ম্বা ই

ঝোলা বাগান, ভারত-তোরণ, সুভাষ সড়ক, চৌপাটী,
এই নিয়ে তো বোম্বে শহর, এই ভারতের নৌঘাটী।
পশ্চিমেতে আরব-সাগর, পূবে বিশাল ভূখণ্ড,
ঠাণ্ডা-গরম দুইই সমান, নয় কোনটাই প্রচণ্ড।
ছায়াছবির কারখানা এর, শহরতলী বোঝাই যে,
আন্ধেরী বা দাদর গেলে লাগবে না আর খোঁজাই যে।
মারাঠী আর গুজরাতী বাত্ হলেও ভাষা এখানকার
হিন্দী বুলী সবাই বোঝে—সাহেব, বিবি দোকানদার।

মেল বোর্‌ন্

আজব নগর অস্ট্রেলিয়ার
বিরাট শহর মেলবোরন,
সড়ক, মহল, বোঝাই এ যে,
বোঝাই বাগান আর তোরণ।
পাশ দিয়ে বয় মরে নদী
কলকলিয়ে রাত আর দিন,
সাধ যদি যায় পোষাক পরে
আরাম করে সাঁতার দিন!

সারি সারি বোতল-তরু
আজগুবি এর গড়নটা,
গুঁড়ির গঠন বোতল-পানা
কালচে ধুসর বরণটা।
ক্যাঙ্গারু আর ডিঙ্গো শেয়াল,
এমু পাখি, কিউই চাই?
এখানকারই বিশেষ প্রাণী।
অভাব হেথা কিছুই নাই।

কাইরো

কাইরো শহর মিশর দেশের
রাজধানী ও নগর যে,
এদিক ওদিক মরুভূমি
শুকনো বালির সাগর যে।
নীল নদ তো পাশেই বহে
তার জলেতেই বাঁচে প্রাণ,
সবাই বলে মিশরী দেশ
নীল নদেরই মহান দান।

পিরামিডের পাষাণ পুরী
কাইরো থেকে দূর তো নয়,
সুযোগ আছে সেথায় যাবার
কাইরো থেকে সব সময়।
পিরামিড কি জিনিস জানো?
সমাধি সব রাজ-রাজার
পুরোনো সে আজকে থেকে
বছর তিন-বা-চার হাজার!

পাথর গড়া, ত্রিকোণ চূড়ো
'শুকনো মরা' তার মাঝে,
জুড়িয়ে যায় চক্ষু সবার
বাহারে আর তার সাজে!
টুটেন খামেন রাজার কবর,
খুঁড়ে পাওয়া গুপ্ত ধন,
মিউজিয়ামে সেথায় আছে
দেখলে হবে লুব্ধ মন!

রোম-নগরী রাজরাণী,
ইটালীরই রাজধানী !
খুব পুরোনো শহর ভাই,
দেখার জিনিস ভর্তি তাই ।
অলিম্পিকের খেলার মাঠ
খুব পুরোন রাস্তাঘাট
প্যানথেয়ন আর কলো'সাম,
দেশ বিদেশে এদের নাম ।

ভাঙা দেউল, প্রাসাদ সব,
প্রাচীন রোমের কি গৌরব !
আরাম দায়ক জল-হাওয়া
জলপাই খুব যায় পাওয়া ।
নুতন শহর ঝকঝকে,
সড়ক, মহল, তকতকে
টাইবার নদ পাশেই বয়
জল তো বারোমাসেই রয় ।

প্যারী ।
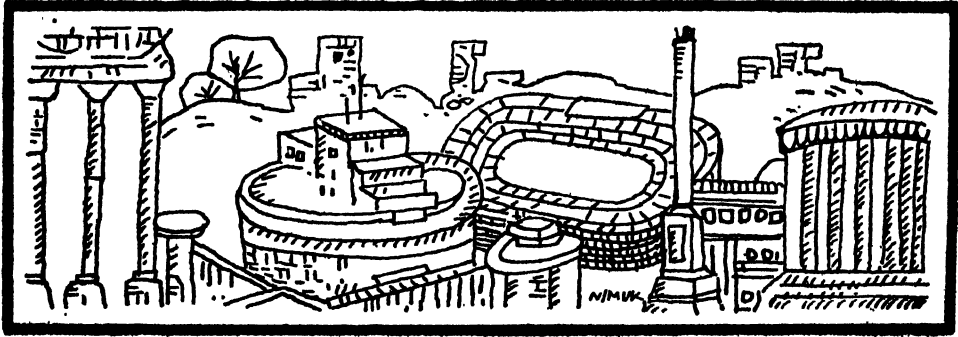
ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী
তুলনা তাহার নাই তো,
নানা দেশ জুড়ে গুণ গান এর
শোনা যায় সদা তাই তো !
এফেল টাওয়ার স্যেন নদী তটে,
মিনার লোহাতে গড়া যে,
এ ছাড়া হাজার মজার জিনিসে
এ প্যারী নগরী ভরা যে !
আর্ক্ দ্য ত্রিয়ফ্, বিজয় তোরণ,
জুড়ি নাই এর ভুবনে ।
নোত্তর দামের গির্জার কথা
জানেন সুধী ও সুজনে ।

মিউজিয়মের সেরা যে ল্যুভ্
পাঠাগার ন্যাশনেল
আছে যে এখানে আরো কত কিছু
পাতাল-পুরীর রেল ।
ভাষা সুমধুর বিনয়েতে ভরা
হাসি-খুশি জনগণ,
অল্প আলাপে সহজেই এরা
জয় করে নেয় মন ।
বন জুঁর বলে স্বাগত জানায়
বন স্যোর বলে রাতে,
অরে ভোঁয়া বলে বিদায় জানায়
হাতটি মিলায় হাতে ।

অস্‌লো

পেঁজা তুলো পেঁজা তুলো,
বরফের গুঁড়ি যে,
ঘাড়ে, পিঠে পড়ে হাড়ে
দেয় সুড়সুড়ি যে।

চারিদিকে কুয়াসার
হাট বুঝি বসলো,
নরওয়ের রাজধানী
শহর যে অসলো।

বারমাস পথে ঘাটে
ছড়াছড়ি বরফের।
শীতকালে শুরু হয়
শী-খেলার পরবের।

শী খেলা যা মজাদার!
দেখে লাগে শিহরণ
দু পায়ে 'তক্তা' বেঁধে
বরফেতে বিচরণ।

নরওয়ে মজার দেশ,
কখনও বা রাত্রে,
রবিমামা দেয় হামা
আকাশের গাত্রে!

'নিশীথ-রবির দেশ'
এক নাম তাই তার
এমন আজব মজা
দুনিয়াতে নাই আর!

মস্কো

মস্কোর ঘণ্টা
দেখ যদি মনটা
ভরে যাবে হর্ষে,

তুলনা কি দেব তার
এমন তো নেই আর
এ ভারতবর্ষে!
রাশিয়ার রাজধানী
শহর যে খানদানী
যেতে হয় হিমালয় পেরিয়ে।
শীতকালে অনুখন
হাড় করে কন্ কন্
মনে হয় যায় জান বেরিয়ে।

এ শহরে সার্কাস্
দেখা যায় বারোমাস
থিয়েটার খুব ভাল বল্‌সয়।

সব কাজ হয় কলে
দেখে সবে কুতুহলে
শহরের চারিদিকে কলময়।
পাতাল-পুরীর রেল
দেখায় যে যাদুখেল
মেত্‌রো তো এর নাম এখানে,
টিকিটটা কেটে নাও,
ভুঁই ফুঁড়ে চলে যাও
যেখানেতে মন যায় সেখানে!

লণ্ডন

লণ্ডন, লণ্ডন !
পথে গাড়ি অগণন,
কি বিশাল আয়তন,
বিলাতের লণ্ডন !

ঢন্‌ঢন্‌ ঢন্‌ঢন্‌
বিগবেন ঢন্‌ঢন্‌
টেম্‌স নদী বহে ধীরে
তার তীরে লণ্ডন !

টেম্‌স্ নদী টেম্‌স্ নদী,
তলা দিয়ে নিরবধি
চলে ট্রেণ চলে ট্রেণ,
দূরে বাজে বিগবেন !

ঢন্‌ঢন্‌ বিগবেন্‌
বিগবেন্‌ ঢন্‌ঢন্‌
শীতকালে খুব শীত
পথে কম লোকজন।

বিগ্‌বেন পেটা ঘড়ি,
পেটা ঘড়ি ঢন্‌ ঢন্‌।
ট্রাফালগারের পার্ক
তাতে থাম নেলসন্‌।

ফুল ফোটে পপি, ডেজী,
ভাষা শুধু ইংরেজী,
এতে সবে কথা কন,
লণ্ডন, লণ্ডন !

নিউ ইয়র্ক

নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক !
সোজা সোজা চওড়া সড়ক
আকাশ ছোঁয়া বাড়ির সারি
দেখে দেখে চক্ষু চড়ক !
নিউ ইয়র্ক !
আমেরিকার বিরাট শহর,
পথে চলে গাড়ির বহর,
সান বাঁধা চওড়া সড়ক !
নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক !
স্বাধীনতার মূর্তি বিশাল,
এক হাতে জ্বলছে মশাল
পায়ের তলে
লুটায় সড়ক
নিউ ইয়র্ক !
কল টিপে ভাই
সব কিছু পাই,
ডাকের টিকিট,
জোয়ান আরক।
নিউ ইয়র্ক !
কলিকাতার
সাঁঝের সময়
এই খানেতে
সকাল যে হয়,
করতে পার
সবাই পরখ !
নিউ ইয়র্ক !
নিউ ইয়র্ক !
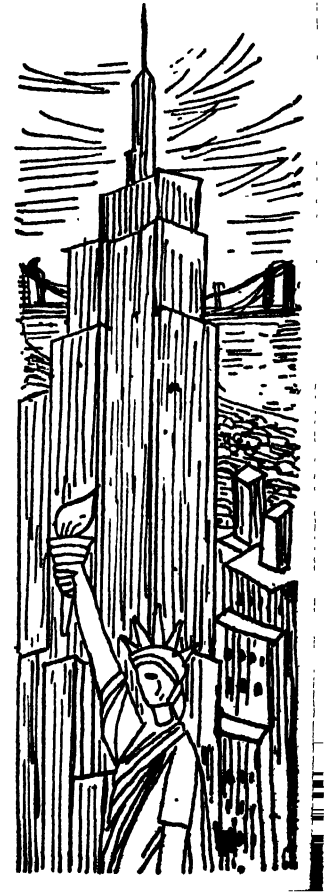
লবাত বড় আদরের ছেলে। এদিকে এক ছেলে, ওদিকে মামা-বাড়িতে মামা মামী, দিদিমা সবাই তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। এত আদরের ছেলের নাম লবাত কেন হল, তা বোঝা কঠিন। লবাত দেখতেও মন্দ নয়। ঘন ভুরু, মোটা ঠোঁট, জ্বলজ্বলে চোখ, ফর্সা রঙ, জন্মের সময় থেকেই ওর এত এত নাম রাখা হয়েছিল, কিন্তু লবাতের বাবা বললে 'কাল স্বপ্ন পেলাম বাবা বক্রেশ্বর চীচকার ক'রে বুলছেন, ছেলাটির নাম রাখ্ গে লবীন চন্দর।'

কিন্তু একটু বড় হবার পর থেকেই তাল পাটালি, বা লবাতের ওপর নাতির টান দেখে তার দাদু বললে 'ওকে লবাত বলে ডাকবি।'

সেই নামই রইল।

কিছুকাল পরেই লবাতের স্বভাবের মিষ্টি গন্ধে কাদাই গ্রাম ম' ম' করতে লাগল। বড়ই দুরন্ত ছেলে, বাতাসের আগে ছোটে। একটু বড় হতেই একদিন সে ভটচাজ পাড়ার পাঠশালায় গেল।

'কে বাবা, লবাত চন্দর, এখানে কি মনে করে?' ভট্‌চাজমশায় লবাতকে মোটেই পছন্দ করেন না। বিশেষ করে ইদানীং ঘনঘনই তাঁর গাছের ডাব চুরি যাচ্ছে, কাউকে কিছু বলতেও পারেন না। ঘোর সন্দেহ, তাঁর নিজের ছেলেটি, আর পাঠশালায় অধিকাংশ ছেলেই লবাতের চেলা।

'আজ্ঞে, আমার বড় পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'তাই না কি? তা বাপু, তোমার দাদুকে গিয়ে বল তবে তোমাদের তাঁতি-পাড়ায় একটা পাঠশালা বসিয়ে দিক! বামুনের ছেলেদের সঙ্গে বসে পড়া শিখবে? সেটি ত' হবার নয়।'

এ কথা শুনে লবাত দাঁত বের ক'রে হেসে বলল 'তবে তর্কচুঞ্চু মশায়ের কাছেই যাই। আপনি সেদিন, বৃত্তি নেবার সময়ে ওঁর নামে সেনবাবুদের মুহুরীর কাছে চুকলি খাচ্ছিলেন, সেটি বলে দিই গে।'

লবাতের ঐ আর একটা ভয়ঙ্কর ক্ষমতা। যা যেখানে শুনবে, সে যদি পথের লোকের কথাবার্তাও হয়, তা হ'লেও সেটি সে আউড়ে যেতে পারে, কথা বুঝুক আর নাই বুঝুক। সবাই বলে ও যদি উঁচু ঘরের ছেলে হত তাহলে লেখাপড়ায় রত্ন হতে পারত।

লবাত দৌড় দিল। 'ও লবাত, যাসনে, শুনে যা!' বলতে বলতে ভট্‌চাজ মশায় ছুটে বেরুলেন বটে কিন্তু ততক্ষণে লবাত হাওয়া।

লেখাপড়া শেখবার ঝোঁক লবাতের এমনি এমনি হয়নি। এই সেদিন শুনেছে বাবার কাছে দাদু দুঃখ করছে 'পয়সা এখন কলকাতায়। নিদেন পক্ষে লেখাপড়া জানলেই এখন সেখানে কোম্ চাক্‌রী। তাঁতের মাকু ঠকঠকিয়ে আর কি হবে? ঘরে ঘরে তাঁতিরা জাত ব্যবসা তুলে দিচ্ছে দেখছ

'এই বয়সে লেখাপড়া! তার চেয়ে দোরে দোরে ঘুরে গামছা বিক্রি করব।'

'যা করবে কর বাপু। বলে দিলাম দিনকাল অতি কঠিন হচ্ছে। কোম্পানীর সায়েবরা কিছু বোঝে না। তারা শুধু বলে লেখাপড়া শেখ, কাজ করে খাও।'

'সব হল ঐ চিতে ডাকাতের জন্যে।'

'তা বটে, কোনমতে বেটাকে আঁটতে পারছে না। অমনি ডাকাতে ডাকাতে না কি সব ছ ছেয়ে গেছে। সায়েবরা বলছে এত এত খরচ করে ডাক বসিয়েই বা কি লাভ হল। এখন যদি ত লোক লেখাপড়া শিখে হরকরার কাজ করত আর ঘনঘন খবর দিত, তাহ'লে আর কোম্পানীর খাজনা নষ্ট হত না।'

এই কথা শুনেই লবাতের ইচ্ছে হল নিমেষে লেখাপড়াটা শিখে হরকরার কাজে লেগে যায়। কারণ আর কিছুই নয়। কাদাই থেকে বেরিয়ে কোম্পানীর গোরস্থানের দিকে যেতে অনেক দিনই পবন হরকরাকে ঝুমঝুম ক'রে ডাক নিয়ে যেতে দেখেছে।

কোম্পানীর হরকরাদের সাজের ঘটা খুব। কেমন ঘোড়া, গায়ে লাল জামা মাথায় আড়াই পাগড়ী, হাতে উঁচু বর্শা, তাতে ঘুঙুর বাঁধা। ঘোড়ার পিঠে চামড়ার থলি, তাতে চিঠিপত্র থাকে। টাকা পয়সা থাকে, তখন হরকরার আগে পেছনে দু'জন বরকন্দাজ যায়।

তাই লবাত সাত তাড়াতাড়ি পাঠশালায় গিয়েছিল। কিন্তু তাঁতির ছেলের লেখাপড়া ক কথায় ভট্‌চাজমশায় আমল দিলেন না বলে তার রাগ হল।

পেছনে, ঘাস জমিতে ভট্‌চাজমশায়ের যে-ক'টা গোরু বাঁধা ছিল সে কটাকে খুঁটো উপড়ে ল তাড়িয়ে দিলে। তারপর সেখান থেকে সিতিকণ্ঠ সেনদের আমবাগানে ঢুকে দেখল গাছের গায়ে ঢ্যারা কাটা। ভবানীচৌরশ বা সাদৌলায় এখনো রঙ ধরে নি।

নবাবদের বোলবোলাও শেষ হয়ে কোম্পানীর লাট নামে না হোক কাজে সর্বেসর্বা হয়েছে দশেক হল। সেনরা ভারী লেখাপড়া জানা লক্ষ্মীমন্ত বংশ। কোম্পানীর আমলে তাদের শ্রী, লবা মা'র ভাষায় 'চচ্চড়িয়ে বাড়ছে।' আমবাগানের ভেতর দিয়ে সুঁড়ি পথ ধরে বেরোতেই নবাব রেশম কুঠি, তুঁতের বাগান। এখন কেমন হতশ্রী চেহারা। অথচ লবাত তার দাদুর কাছে শুনেছে সময়ে মুর্শিদাবাদ, সৈদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, ওদিকে মালদহ সর্বত্র তুঁতের চাষ আর পলু পোকার কুঠি ছি তখন রেশমের চাষ থেকে হাজার হাজার লোক ভাত কাপড় পেত।

লবাত জানে দাদামশায়ের কাছে এখনো উৎকৃষ্ট একখান রেশম আছে। সেটা নাকি দাদুর দ তন্য দাদুর বোনা। আরো জানে দাদামশায়ের ভারী ইচ্ছে সুবিধেমত একবার কোম্পানীর বড়লাট খানখানা দিয়ে সুবিধে আদায় করে নেয়।

ভাবতে ভাবতে রেশম কুঠির জংলা মাঠ, পুরোনো কুঠি, সব পেরিয়ে বাসঝাটিয়ার রাস্তায় সায়েবদের গোরস্থানে পৌঁছে গেল। গোরস্থানের বাইরে দিব্যি বসবার জায়গা, এই বড় বড় গাছ। সেখানে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে লবাত ভাবতে লাগল কতক্ষণে ঝুনঝুন শব্দটা আসে। এই রাস্তা দিয়ে একটু বাদে পবন হরকরা আসবে, রোজই আসে।

আসে, এই গোরস্থানের মালী আর পাহারাদারের সঙ্গে কথা বলে, তামাক খায়। পবনের ভারী দেমাক। কোম্পানীর চাকর ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু, দিব্যি মোটাসোটা একটা কাঠবেড়ালী তুরতুরিয়ে গাছের গায়ে কেমন করে উঠছে তাই দেখতে দেখতে লবাত ভাবল তার দাদামশায় আর বাবা, কারোই বুদ্ধি নেই। হরকরা হওয়া যেন ভারী আরামের কাজ! চিতে ডাকাত ত কোম্পানীর হরকরাদেরও পারলেই মেরে কেটে টাকা লুঠ করে।

তবু, পবন হরকরার কি সাহস! ওকে কেউ মারতে পারে না। মাত্র দুটো বরকন্দাজ সঙ্গে, তোড়াবন্দী টাকা নিয়ে ও কেষ্টনগর থেকে মুর্শিদাবাদ স্বচ্ছন্দে চলে আসে অথচ, ওটাই হ'ল চিতে ডাকাতের আসল ঘাঁটি। এই কেষ্টনগর আর মুর্শিদাবাদের মাঝামাঝি জায়গা। হবে না কেন, এই সব জায়গায়, নবাবদের আমলে কত যে আমবাগান, কুঠি বাড়ি, বাগান বাড়ি, জলটুঙ্গি হয়েছিল তার লেখাজোখা নেই। এখন কি আর সেদিন আছে! পয়সা ত এখন কোম্পানীর হাতে আর কিছু কিছু রাজা জমিদারের হাতে। এ সব জায়গায় ঘোর জঙ্গল। দিনেমানে বাঘ ঘুরছে, সাপ বেড়াচ্ছে, যেমন ঐ রেশমকুঠিতে। চিতে ডাকাত তার দলবল নিয়ে এ সব জায়গায় যে ঘাপটি মেরে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

চিতে ডাকাতের অত্যাচারে এখন সবাই ব্যতিব্যস্ত। লবাতদের ভাবনা নেই, কেননা তাদের ঘরে চুরি করবার মত নেইও কিছু। দাদামশায়ের ঘরে কাঠের সিন্দুকের নিচে পোঁটলার মধ্যে নিমপাতা কর্পূরে জীইয়ে রাখা রেশমের খাসা থানখানার কথা ত' চিতে জানে না।

যেখানে ডাকাতি করে সেখানেই চিতেডাকাত একখানা কাগজে চিতাবাঘের থাবার ছাপ রেখে আসে। সবাই জানে চিতেডাকাত আসলে মহা ফুলবাবু। একবার না কি কাশিমবাজারের রাজবাড়িতে ছড়ি ঘুরিয়ে দিব্যি রাসের মেলা দেখে এসেছিল। রাজবাড়ির প্রসাদও খেয়েছিল। তারপর চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিল 'প্রাসাদের সন্দেশে পিঁপড়ে থাকলে মান্যগণ্য অতিথিদের না দেওয়াই উচিত। চিতুবাবু।'

কাশিমবাজার রাজবাড়িতে রাসের সময়ে মহাধুমধাম হয়। অত লোকের মধ্যে কোন লোকটা চিতুবাবু তা কে বলবে। কিন্তু কোন একটা ঘটনা হলেই যারা পরে গল্প ফেঁদে বসে তারা এসে বললে 'যখনি দেখেছি ইয়া গালপাট্টা, ইয়া মোচ, আর থেকে থেকে হাঁকুর (গর্জন) দিচ্ছে, তখনি জেনেছি ইনি আর কেউ লয়, ইনি চিতুবাবু।'

এইসব ভাবতে ভাবতে লবাত বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ 'বিষ্যুৎবারে সাঁঝের দিকে!' কথাটা শুনে চমকে উঠল। মিটমিট ক'রে চেয়ে বুঝল সে এদিকে আর কথা হচ্ছে গোরস্থানের পাঁচিলের ভেতরে।

আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে সে পাঁচিলের ফোকর দিয়ে দেখতে লাগল। পবন হরকরাই বটে।

একটা চৌকিতে বসে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ক'রে তামাক খাচ্ছে। এদিকে গোরস্থানের মালী আর চৌকিদা তার পায়ের কাছে হাতজোড় ক'রে বসে আছে।

'এবারই শেষ। সায়েবরা সব টের পেয়ে গেছে।'

'আজ্ঞে।'

'এদিকে দুর্লভ রায়, ওদিকে ভ্যান্সিটার্ট সায়েব, দু'জনে এখন হরকরাদের ধরে ধরে জবানবন্দী নিচ্ছে।'

'আজ্ঞে।'

'আমি ত দেখে এলাম ভ্যানসিটার্ট আর লরেন্সসায়েব হবুবাগদীকে ডেকে পাঠিয়েছে রাস্তার দু'দিকে কোথায় কোথায় কুঠি আছে হিসেবটিসেব নিতে।'

'হবুবাগদী নিজেও একসময়ে টেঁটা লেঠেল ছিল। ওর দলটা ভেঙে গেলে কি হবে, সব খবর রাখে।'

'তাই ত এবার লরেন্সসায়েব বললে পবন, বিষ্যুৎবার তোমার সঙ্গে প্রচুর টাকা থাকবে। তুমি চারজন বরকন্দাজ নাও, হবুও সঙ্গে থাকবে।'

'আজ্ঞে।'

'তার মানেটা বুঝতে পারছ? পবন এবার নিকেশ! একেবারে মরতে হবে।'

'তা কেন, সুবিধেমত যদি ওদের বাগিয়ে ফেলা যায়?'

'তাহ'লে একমাত্র হতে পারে বটে! তারপর লালগোলার ওধারে পদ্মা পেরিয়ে পালালে পরে আর ভাবনা কি!'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আপনি বিষুৎবারের জন্যে ভাববেন না। আমরা প্রাণ দিয়ে যা হয়…'

'আরে বোকা প্রাণ যদি দিবি তবে রেশমকুঠির কবরখানায়…'

'সোজা কথা নয় তিন হাজার…'

এই পর্যন্ত শুনেই লবাত হেঁচে ফেলল।

'কে রে!' পবনের গলার হাঁকে একেবারে সব শুদ্ধ কেঁপে উঠল। কবরখানায় যত যত পুরোন কবর ছিল, সে সব ও।

'আজ্ঞে আমি লবাত।'

'বটে! তবে এখানে কেন, অ্যাঁ! আড়িপাতা হচ্ছে! দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!'

গোরস্থানের মালীকে ধমক দিয়ে পবন বললে 'থাম বাপু!'

লবাতকে বললে 'তুই কাদের ছেলে?'

'আজ্ঞে তাঁতিদের।'

'তবে এখানে কেন?'

মহামান্য পবন হরকরাকে আর জীবনেও এমন সামনাসামনি পাবে কিনা তা ত' জানেনা লবাত, তাই কপাল ঠুকে বলে ফেললে।

'আজ্ঞে আপনাকে দেখবার জন্যে।'

'দেখবার জন্যে ? ছেলেটা বলে কি, অ্যাঁ ?'

পবন তার মাথার পাগড়ী আর হাতের বর্শা কাঁপিয়ে হাসল।

'আমাকে দেখে কি হবেটা কি, শুনি ?'

'আজ্ঞে, আমারও হরকরা হবার ইচ্ছে।'

'তাই না কি ? বেশ ভাই, বেশ !' পবন লবাতের ওপর হাতের গুলি টিপেটুপে দেখতে দেখতে বললে 'বুদ্ধিটাত' তোর ভালই আছে, কিন্তু শুধু বুদ্ধিতে কি হরকরা হওয়া যায়রে বাবা ! শরীরে চাই মাংস। রোজ হাঁস খাবি, জানলি ? ফাঁদ পেতে ডাহুক ধরবি, হাঁস ধরবি, মাংস খাবি, আর হ্যাঁ, দশ পঁচিশটা করে বৈঠকী মারবি। তারপর তোকে আমার চেলা করে নেব।'

পবন শরীর কাঁপিয়ে আর একবার হাসল। তারপর লাফিয়ে তার ঘোড়ায় চড়ল।

লবাত, সুখের সাগরে যাকে বলে চিৎ সাঁতার দিতে দিতে ফিরল। চারিপাশে টুলো পণ্ডিতদের বাড়ি, এখানে পাখি ধরে মাংস খাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া কোন কিছু ধরে মেরে খেতে লবাতের গা ঘিনঘিন করে। সে যা হোক। অতবড় একটা লোকের মুখের কথা পাওয়া চারটিখানি কথা নয়। ছেলেদের একবার কাছে পেলে হয়। ভাল করে সে শুনিয়ে দেয় সব।

ছেলেদের সঙ্গে কথা বলবার সময় হল সেই দুপুরে। খাওয়াদাওয়া মিটে গেল ঘরে ঘরে। টোলের পণ্ডিত মশায়রা তর্কচুঞ্চু মশায়ের বড় ঘরের মেঝেতে বসে এই এত তুলোট কাগজে আঁক কষেন, আর চশমা আঁটা চোখ তুলে ঘরের চালের দিকে চেয়ে হিসেব কষেন চন্দ্রগ্রহণ কবে হবে, আগামী বছর বিষ্টি হবে না অজন্মা, এই সব !

কাদাই-এর পণ্ডিতরা, নৈহাটি ভাটপাড়ার পণ্ডিতরা, নবদ্বীপ আর কাটোয়ার পণ্ডিতরা তাঁদের গণনার ফল একত্র ক'রে তবে পাঁজি লেখেন। যাঁদের বুদ্ধি আছে তাঁরা সেইসব পাঁজি শিষ্যদের দিয়ে নকল করিয়ে রাজা জমিদার বা রাজপুরুষদের কাছে বিক্রি করেন। যদিও এ-সব টাকাপয়সা বাগিয়ে নেবার বুদ্ধি পণ্ডিতদের বড়ই কম। কোম্পানীর সাহেবরা ত' কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে পণ্ডিতদের কি খোসামোদটাই না করে। করলে হবে কি ! এমনকি নৈহাটি-ভাটপাড়ার পণ্ডিতরাও যেতে চান না।

কলকাতায় গেলে তাঁদের মন, শরীর কিছুই টেঁকে না। স্বাস্থ্যও খারাপ হয়। সায়েবদের দেওয়া টাকাও নিলে অধর্ম হবে বলে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে চলে আসেন তাঁরা। পাটনাই মাঝিদের নেংটি পরা ছেলেগুলো জলে ডুব দিয়ে টাকা মোহর তুলে নেয়।

নেহাৎ দরকার পড়লে সায়েবরাই পণ্ডিতদের কাছে আসেন।

দুপুরবেলা পণ্ডিতরা ঘনঘন হুঁকো টানতে টানতে আঁক কষতে লাগলেন। তাঁদের গিন্নীরা কর্তাদের বিদায় করে, ছাত্রদের খাইয়ে, নিজেদের ছেলেমেয়ে আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী, এমন কি গরু ছাগলদের

অবধি খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে নিজেরা খেয়ে দেয়ে উঠোনের গাছতলায় গিয়ে বসলেন।

সেখানে তাঁদের পাঠশালাতেও কম ভিড় নয়। ছোট ছোট বউরা মেয়েরা এসে বুড়ীদের কাছে ে মাসে কি কি ব্রত করতে হয়, কেমন করে তিল সুক্তনি রাঁধতে হয়, এ-সব শিখতে লাগল। গিন্নীরা তকলিতে সুতো কাটতে কাটতে, জাঁতিতে সুপুরি কুচোতে কুচোতে গল্প করতে লাগলেন। একেবারে ছোট মেয়েরা বড়দের পান, জল দিতে লাগল, পা টিপে, মাথার পাকা চুল তুলে সেবা করতে লাগল।

লবাতের পাঠশালা সেনেদের আমবাগান।

আমের রাজা কোহিনুর। সেই গাছের ডালে বসে লবাত তার চেলাদের সকালের সব কথা খুলে বললে। ঠিক যা যা কথা হয়েছে সব বলে টলে বললে 'এই বিষ্যুৎবার, আমি ঠিক বুঝতে পারছি একটা কিছু হবে।'

'কি হবে?'

'চিতে ডাকাত পবনকে ধরবে।'

ছেলেদের মধ্যে ভয়ের শিহরণ খেলে গেল।

'তোরা সবাই এক একটি যাচ্ছেতাই। এখন আমাদের কি করতে হবে বল্ ত?'

'তুই-ই বল্!'

লবাত বলতে লাগল। পণ্ডিতদের ছেলেরা শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে তাদের চোখ চড়কগাছ হবার দাখিল।

'কিন্তু অতগুলো লাঠি কোথায় পাবে?'

'কেন তোর বাবা, পঞ্চুর জ্যাঠা, কেলের কাকা, কার ঘরে আঁটি বাঁধা চেত নেই শুনি?'

'তাতে কি চিতে ডাকাত ভয় পাবে?'

'পাবে রে পাবে! ওদের ভড়কি দিয়ে আমরা সুঁড়িপথ ধরে হাওয়া হয়ে যাব। ততক্ষণে পবন হরকরা পালাবে এখন!'

কিন্তু সেখানেই থেমে থাকবে, লবাত সে ছেলে নয়! বাসঝাটিয়ার কাছে সায়েবদের যে নতুন মসলা কুঠি হয়েছে, সেখানকার ক্লারেন্স সায়েবকে সে চেনে। ক্লারেন্স সায়েবের বাপকে তার দাদামশায় চিনত। সেই সুবাদে মাঝে মাঝে তার দাদামশায়ের সঙ্গে সে ওখানে গিয়েছে।

ক্লারেন্স দিব্যি বাংলা বোঝে। লবাত ওকে মাছধরার টোপ তৈরী ক'রে দিয়েছিল দু'বার, সজারু, খরগোস ধরবার ফাঁদ করে দিয়েছিল সাঁওতালদের কাছ থেকে, তারপর থেকে সায়েবদের সঙ্গে ওর চেনা শোনা হয়ে গেছে।

এখন তার কাছেই চলল লবাত। নিজেদের চেত বিছুটির ওপর ভরসা ক'রে এতজনকে নিয়ে যাচ্ছে না সে। সায়েবের কাছে একটা বন্দুক আছে। সায়েব এবং বন্দুকের ওপর লবাতের অসীম ভরসা। পবনের এ বিপদে সাহায্য করলে তবে হয়তো পবন সায়েবদের ব'লে ট'লে তাকে হরকরা ক'রে দেবে। বিপদের সময়ে, লবাত প্রাণ বাঁচালে পবন তাকে কি বলবে লবাত তাই ভাবতে লাগল।

পবন লবাতকে বললে 'হতভাগা যেমন ছুঁচো, তেমনি বজ্জাত। সেদিন কেন নিকেশ করে দিইনি তাই ভাবছি।'

বাসঝাটিয়ায় ক্লারেন্স সায়েবের বাংলার উঠোনে। হবুবাগদী আর তিনজন বরকন্দাজের সাধ্য কি পবনকে ধরে রাখে! পাহাড়ী সাপ যেমন বেতের বাঁধন মটমট করে ভাঙে মনে হল পবনও আষ্টেপিষ্টে দড়ির বাঁধন তেমনি করেই ছিঁড়বে।

পবনকে বাঁধাছাঁদা অবস্থায় দেখে লবাতের কি রকম কষ্ট হচ্ছিল তা বোঝানো যায়না। নেহাৎ বোলতার কামড়ে তার মুখখানা ফুলে ঢোল তাই বোঝা যাচ্ছিল না।

ক্লারেন্স লবাতের পিঠ চাপড়ে বললে 'বাহাদুর ছেলে।'

তারপর ভ্যান্সিটার্ট দুর্লভ রায়, আর বেশ কয়েকজন প্ল্যানটার সায়েব যেখানে বসে জটলা করছিল ক্লারেন্স সেইখানেই গেল।

'নাঃ, ছেলেগুলো না থাকলে আজ আমাদের চিতু ডাকাতকে ধরতে হত না।'

'পবনই যে ডাকাতদলের মাথা, আসলে চিতু রায়, তা কেমন করে বুঝেছিলে?'

আর কেমন করে! পবন যেদিন থেকে নিজেকে অতিরিক্ত চালাক ভাবতে শুরু করলে সেদিনই হল সর্বনাশ।

ভ্যান্সিটার্ট বললে, 'যা চুরি হয় সব হরকরাদের টাকা, অথচ পবনের গায়ে আঁচটি লাগে না। এই দেখেই আমার সন্দেহ হয়। তবে ও যে এত বড় দুঃসাহসী হবে, যে আজকের ডাকাতিটার সময়ে হরুদের মেরে রেখে টাকা নিয়ে লালগোলায় পালাবার মতলব আঁটবে তা কিন্তু আমি বুঝিনি।'

ব্যাগটা ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল।

'আমাদের নাকের ডগায় রেশমকুঠিতে চোরাই মাল রাখবে আর আমাদেরই গোরস্থানের মালী আর চৌকিদারকে ওর দলে রাখবে তাই বা কে ভেবেছিল?'

'অবশ্য, আমরা আসছিলাম পেছন পেছন। সামনে ওরা পৌঁছতে না পৌঁছতে যে ওর সেথোরা লাফিয়ে পড়বে, ওদিক থেকে ছেলেগুলো ওর সেথো-দেরই পেটাবে, আর তুমি শূন্যে বন্দুক দাগবে তাই বা কে ভেবেছিল?'

'তবু কিছু হত না হে, লবাত যদি পবনের চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে ওর উপকার করছে মনে করে

হরুর হাতে না দিত।'

'পবন ও ব্যাগটা ফেলে দেবার চেষ্টাই করেছিল।'

'হ্যাঁ। পবনের সেই ব্যাগেই ছিল এক তাড়া কাগজ, তাতে চিতাবাঘের থাবার ছাপ দেও
ডাকাতিটি করে, কাগজটি রেখে সে সরে পড়ত। লবাত দেখলে চারদিকে সাহেব, বন্দুক ফাটছে,
মধ্যে পবন হরকরার ব্যাগটা গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাই ত ঝাঁপিয়ে সেটা কুলঝোপ থেকে তুলতে গি
বোলতার চাকের মধ্যে পড়ল।'

পবনকে ঘরে বন্দী করা হল। সেই সঙ্গে তার সঙ্গীসাথীদেরও। কান টানলে মাথা আসে ব
ত' কথাই আছে। তা দলের মাথা পবন যখন ধরা পড়ে গেল তখন আর তার সঙ্গীসাথীরা দ
অন্যদের নাম বলবে না কেন? তারা নামধাম সব দিল।

বেশ কয়েকটা ডাকাতির টাকা পুরনো রেলকুঠিতে পাওয়া গেল। সশরীরে চিতাবাঘকে ধরব
জন্যে ভ্যান্সিটার্ট আর দুর্লভ রায়ের খুব নাম হল। এমন কি কোম্পানীর লাট বললে এখন থেকে শা
রক্ষার জন্যে জেলায় জেলায় দেশী পুলিশও রাখা হবে।

আর লবাত?

লবাতের আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, আর সব কথা ঠিক ঠিক ক্লারেন্সকে বলে দেওয়াই কিন্তু ডাকাত ধ
পড়বার মূলে। তাকে সবাই প্রশংসা করলে কি হবে, বোলতার কামড়ে জ্বরে ভুগে ভুগে লবাত এ
টিঙটিঙে গঙ্গাফড়িং হয়ে গেল।

'কোম্পানীর লাট,' হেংস্টিংস সায়েব যখন কানাত ফেলে দরবার করলেন গোরস্থানে
পেছনের মাঠে, ততদিনে লবাত অন্নপথ্য করেছে।

কানাতে যাবার সময়ে ওর দাদামশায় আর বাবা সেই রেশমের থানটাও সঙ্গে নিলে।

'কি লবাত, কোম্পানীর হরকরা হবে!'

মুনশীর প্রশ্ন শুনে সবাই হেসে কুটিপাটি। কিন্তু লাটসাহেব বললেন 'লবাত, আমি খুব খুশি
হয়েছি। এখন আর শুধু শক্তি খাটালেই হবে না। বুদ্ধিও চাই। বুদ্ধির যুগ পড়েছে। বুদ্ধির
জোরেই তুমি এত বড় কাজটা করলে!'

কথাগুলো ত' চমৎকার! কিন্তু পবনের বাঁধাছাঁদা চেহারা মনে পড়লে যে এখনো কান্না পায়।

'তোমার কি হরকরা হবার ইচ্ছে আছে!'

না। লবাত জোরে জোরে মাথা নাড়লে। তারপর রেশমের থানটি এগিয়ে দিয়ে বললে
'দাদামশায়দের তাঁত চলে না কেন? এমন থান দাদামশায়ের বুড়ো কর্তাদাদার বোনা। দাদামশায়
সুতো আর তাঁত পেলে এখনো এ থান বুনতে পারবে।'

'পারেই ত! আর এ-জেলার রেশম তাঁতীদের তাঁত যাতে বন্ধ না হয় তা আমি দেখছি।'

সত্যি দেখবে, না কলকাতায় গিয়ে ভুলে যাবে এ কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলেও সে জিজ্ঞেস
করল না। হাজার হোক লাটসায়েব। যদি রেগে যায়। দাদামশায় বলে লাটসায়েব যার ওপর রাগে,

তার বাস্তুভিটেয় না কি বেগুনচাষ হয়। কে জানে তার মানে কি!

'তুমি কি চাও?'

'আজ্ঞা, টোলে পড়তে চাই।'

'সে কি, হরকরা হতে চাও না?'

'না টোলে পড়তে চাই। ক্ষুদিরামের বাবা আমায় সেদিন হেনস্তা ক'রে তেইড়ে (তাড়িয়ে) দিলে!'

'হোআট! তোমার মত ছেলেকে হেনস্তা?'

রেগে হেস্টিংস বারকয়েক কান আর নাক চুলকোলেন। অমনি নাক চুলকোতে চুলকোতেই ওর মনে বুদ্ধি আসে, আর সেই বুদ্ধির জোরে একদিনের পান্তা-খেকো সায়েব থেকে তিনি বড়লাট হয়েছেন। পান্তা খাওয়ার গল্প সত্যি নাকি লবাতের জানতে ইচ্ছে হল, সাহস হল না।

'তুমি কোম্পানীর মুনশীর কাছে ফার্সী পড়বে, ক্লারেন্সের কাছে ইংরাজী। ইচ্ছে হলে তুমি একদিন মুনশী হবে।'

আর লবাতকে পায় কে! মুনশী নবকৃষ্ণের কোমরে এই মোটা জরির পেটি, মাথায় সাঁচ্চা পাগড়ী। এ সব পেলে হরকরা হতে কে চায়! একগাল হেসে সে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলে।

লবাত আর তার বন্ধুরা সবাই একটা করে নতুন কাপড় আর একহাঁড়ি মিষ্টিও পেলে।

তা ছাড়া ক্লারেন্স নিজে মস্ত একটা সিধে পাঠিয়ে দিলে লবাতদের বাড়ি।

যতসব টুলোপণ্ডিতরা লবাতকে আশীর্বাদ করতে এলেন। এমনকি ভট্টচাজ্জি মশাই পর্যন্ত। মনের খুশিতে লবাতের দাদামশায় একটা গান অবধি বেঁধে ফেললে।

রাত্তিরে অনেকক্ষণ অবধি, যতক্ষণ না পাড়া প্রতিবেশীর কানের পর্দা ফাটে, ততক্ষণ অবধি লবাত আর বন্ধুরা সেই গান গাইলে।

আনন্দের আর সীমা রইল না।

ধীরেন্দ্রলাল ধর
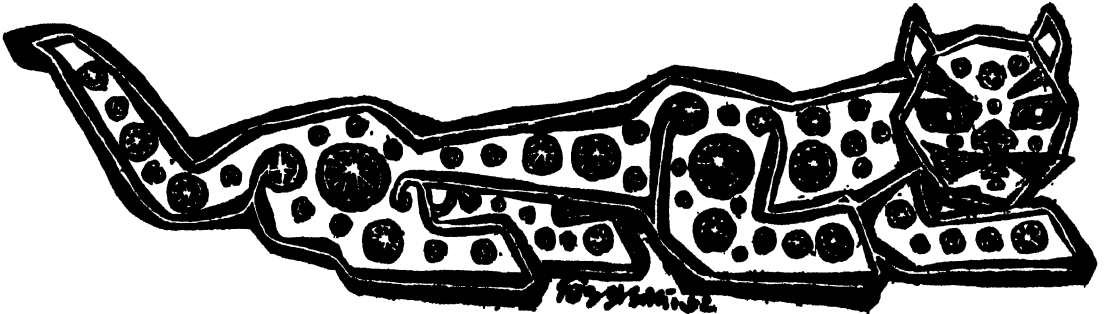
অমিয় গিয়েছিল স্কুলে, পরীক্ষার খবর নিতে। মাস্টারমশায় বললেন—গৌরচাঁদ ফেল করেছে।

—কিসে কিসে ফেল করেছে?—অমিয় জিজ্ঞাসা করলো।

—শুধু অঙ্ক। তাও যদি অঙ্কগুলো কষতো তো একটা কথা থাকতো, অঙ্কের খাতায় ঘুড়ি লাটাইয়ের ছবি এঁকে এসেছে। হেড্‌মাস্টার মশাই দেখে বলেছেন—মাস্টার মশাইদের সঙ্গে ঠাট্টা, এ ছেলের রীতিমত শিক্ষা হওয়া উচিত।

—দুর্বুদ্ধি। নাহলে অঙ্ক আমি সবই শিখিয়েছি।

—সে কথা আর মানবে কে? গার্জেন বলবেন 'ছেলে ফেল করে মাস্টারের দোষে।' দোষ হবে সব তোমারই।

অমিয় তা জানে। আরও জানে যে ছাত্র ফেল করার ফলে তার টিউশনিটি চলে গেল। এখন আবার নতুন টিউশনি একটা জোগাড় করতে না পারলে, তার নিজেরই পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে।

অমিয় জানা চেনা সবাইকেই টিউশনির কথা বলে।

এদিকে তিনচার দিন পরে গৌরের মা ডেকে পাঠালেন। কয়েকটা কঠিন কথা শোনার জন্য তৈরি হয়েই অমিয় তাঁর সামনে হাজির হলো। গৌরের মা বললেন—কদিন ধরে তুমি যে আর পড়াতে আসছ না, বাবা?

—শুনলাম ফেল করেছে।

—ফেল করেছে সে কি তোমার দোষ? পরীক্ষার খাতায় ঘুড়ির ছবি এঁকে এলে কেউ পাস করে? তুমি যেমন পড়াচ্ছিলে পড়াও, কাল থেকে আবার আসতে সুরু কর।

অমিয় মনে মনে খুশি হ'লো। বললো—আচ্ছা।

—তবে বাবা, এবার তোমাকে আরো একটা কাজ করতে হবে। ওর দাদু ঘুড়ি লাটাই দিয়েই ওর মাথাটা খেয়েছে। ওই ঘুড়ি লাটাই না ঘোচাতে পারলে ওর পড়াশুনা হবে না। ওই ঘুড়ি লাটাই ঘোচাতে হবে।

অমিয় চুপ করে রইল।

মা বললেন—তোমাকেই সে কাজ করতে হবে বাবা, তুমি ছাড়া আর কেউ তা পারবে না।

অমিয় বললো—ঘুড়ি ওড়ায় বিকালে, আমি কি করবো?

—সেই কথাই তো বলছি। আজ সন্ধ্যার পর তুমি একবার এসো। গৌর বাড়ি থাকবে না, এক বন্ধুর জন্মদিনে নিমন্ত্রণে যাবে। বাবাও যাবেন দাবা খেলতে। সেই ফাঁকে তুমি এসে বরাবর ছাদের ঘরে চলে যাবে। ঘুড়ি লাটাই যা আছে সব নিয়ে চলে যাবে। কাউকে কিছু বলবে না—আসবে, নেবে, চলে যাবে।

—বেশ, এসে আপনাকে খবর দোব।

—না, না, আমাকে ডাকার দরকার নেই, তুমি আসবে, কাজ সেরে চলে যাবে।

—চাকর যদি দেখে—

—সন্ধ্যার সময় ভোলা বাজার করতে যায়, সে থাকবে না।

—সে তো তাহলে চুরি করা হবে।

—হ্যাঁ, চুরি করাই তো আমি চাই। ঘুড়ি, লাটাই, সুতো—কিছুই থাকবে না।

—আজ থাকবে না, কাল আবার দাদু কিনে দেবেন।

—আবার চুরি হবে। দুচার বার চুরি হলে আর কিনবে না।

—তাহলে বার বার আমায় চুরি করতে হবে?

—এ চুরি যে চুরি নয় বাবা। ছাত্রের মঙ্গলের জন্য এটুকু তোমায় করতেই হবে। ঘুড়ি লাটাই না ঘোচালে ও ছেলের কিছুই হবে না!

এবার অমিয়র মাথায় বুদ্ধি খুলে গেল, বললো—বেশ, আপনি যখন বলছেন তখন চোরই হবো। কিন্তু আপনি তাহলে আমার একটা উপকার করুন।

'—কী?'

—আমার পরীক্ষার ফীয়ের টাকাটা জোগাড় করতে পারিনি, এ মাসের মাইনের সঙ্গে তাহলে আরও গোটা কুড়ি টাকা আপনি আমাকে আগাম দেবেন। সেটা পরের মাসের মাইনে থেকে বাদ যাবে।

—বাদ দেবার দরকার নেই, আমি কুড়ি টাকা তোমায় এমনিই দোব, তুমি আমার ছেলেটাকে মানুষ করে দাও বাবা।

অমিয় বললো—বেশ, আজ সন্ধ্যার পরে আমি আসবো!

সন্ধ্যার পরেই অমিয় গুটি গুটি বেরিয়ে পড়লো।

গৌরের বাড়ির সদর দরজা খোলাই ছিল। বৈঠকখানায় ঢুকে সে একখানি চেয়ারে বসে রইল খানিকক্ষণ। রান্নাঘরে গৌরচাঁদের মাকে দেখা যাচ্ছে। বাড়িতে আর কেউ নেই। তবু বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করতে থাকে।

পরীক্ষার টাকাটা চাই। মরিয়া হয়ে অমিয় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। সামনের সিঁড়ি দিয়ে বরাবর উঠে যায়। দোতলা পার হয়ে ছাদ। সিঁড়ির পাশেই ছাদের একখানি ঘর। ঘরখানি অন্ধকার। অমিয় টর্চ এনেছিল, ঘরের ভিতর আলো ফেললো। ঘরের ভিতরে নানা আজে বাজে জিনিস। সামনে

একটি ভাঙা টেবিলের উপর খানকয়েক ঘুড়ি আর দুটো লাটাই। টর্চটা পকেটে ফেলে, এক হাতে ঘু আর এক হাতে লাটাই নিয়ে অমিয় ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েই মনে হলো কে যেন অন্ধকারে উঠে আসছে। অমিয় তাড়াতা সরে এসে অন্ধকারে দেয়ালের আড়ালে লুকালো।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে উপরে উঠে এলেন দাদু। ছাদের ঘরে ঢুকে অন্ধকারে তিনি কি যে হাতড়াতে লাগলেন। অমিয় দেখলো এই সুযোগ, তাড়াতাড়ি সে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো।

তাড়াতাড়ির বিপদ আছে। লাটাইয়ের ডাঁটিটা বেধে গেল সিঁড়ির দরজায়। দরজা নড়লো শিকলটা বেজে উঠলো ঠুনঠুন করে। চোর-ধরা এলার্মের কাজ হয়ে গেল। দাদু ঘরের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন, বললেন—কে?

আর পালানো যায় না। অমিয়কে সাড়া দিতে হলো, বললো—আমি!

—আমি কে?

—মাস্টার মশাই।

—মাস্টার মশাই এখানে? হাতে কি?

—ঘুড়ি লাটাই।

—ওসব কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—কাকার বাড়িতে। এগুলো থাকলে গৌরের আর পড়াশোনা হবে না।

—তা এমন চোরের মতো অন্ধকারে?

—চুরি করেই নিয়ে পালাচ্ছি, না হলে আপনারা……

—ওঃ, আমাকে বাঁচিয়েছ ভাই—আমিও তাই চুপিচুপি এসেছিলাম ওগুলো সরিয়ে দেবো বলে।

—আপনিই তো সব কিনে দিয়েছেন?

—কিনে দিয়েছি সাধে? ওর বাবা জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়ায়, ছেলেকে রেখে গেছে আমার কাছে। ভাবলাম ছেলেটা পাড়ায় মিশে নষ্ট হয়ে যাবে, বিকাল বেলায় নিজের বাড়িতেই থাক্, তাই এই সব ঘুড়িলাটাই কিনলাম। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় যে সে ঘুড়ির ছবি এঁকে আসবে তা জানবো কেমন করে। তা বাবা তুমি যখন আমার কাজটা শেষ করলে, চল, তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঘুড়িগুলো হাত থেকে নিয়ে দাদু অমিয়র পিছু পিছু নামতে শুরু করলেন। পথে নেমে দাদু বললেন—দেখবেন মাস্টার মশাই, আমার মেয়ে গৌরের মাকে কিছু বলবেন না, ওর ওই একটা ছেলে, ছেলের কোন কষ্ট ও সইতে পারে না।

—না না, আমি কিছু বলবো না—অমিয় আসল ঘটনাটা চেপে গেল।

ইস্কুলবাড়ি পার হয়ে একটু গেলেই অমিয়র বাড়ি। ইস্কুলের সামনে গিয়ে পড়তেই সহসা কে অমিয়র হাত ধরলো। বললো—ওদিকে নয় মাস্টার মশাই, এদিকে আসুন, ইস্কুলে—

অমিয় ও দাছ হকচকিয়ে উঠলো, এ যে গৌরচাঁদ !

গৌরচাঁদ বললো—ইস্কুলে আসুন। হেড স্যারের কাছে এই ঘুড়ি লাটাই সব দিয়ে যাবো, নাকে খৎ দোব, আর ঘুড়ির নাম করবো না। প্রমোশন আমার চাই। এক ক্লাসে আমি হুবছর পড়বো না। চলুন—আপনি বললেই হবে।

দাছ এবার কথা বললেন—তুই কোথায় ছিলি রে গৌর ?

—আমি সব দেখেছি—বলে গৌর অমিয়র হাত ধরলো। বরাবর গিয়ে ঢুকলো ইস্কুলে। হেড মাস্টার মশাই তখনও আপিস ঘরে বসে কি একটা কাজ করছিলেন, গৌর ঘরে ঢুকে বললো—আমরা এসেছি স্যার !
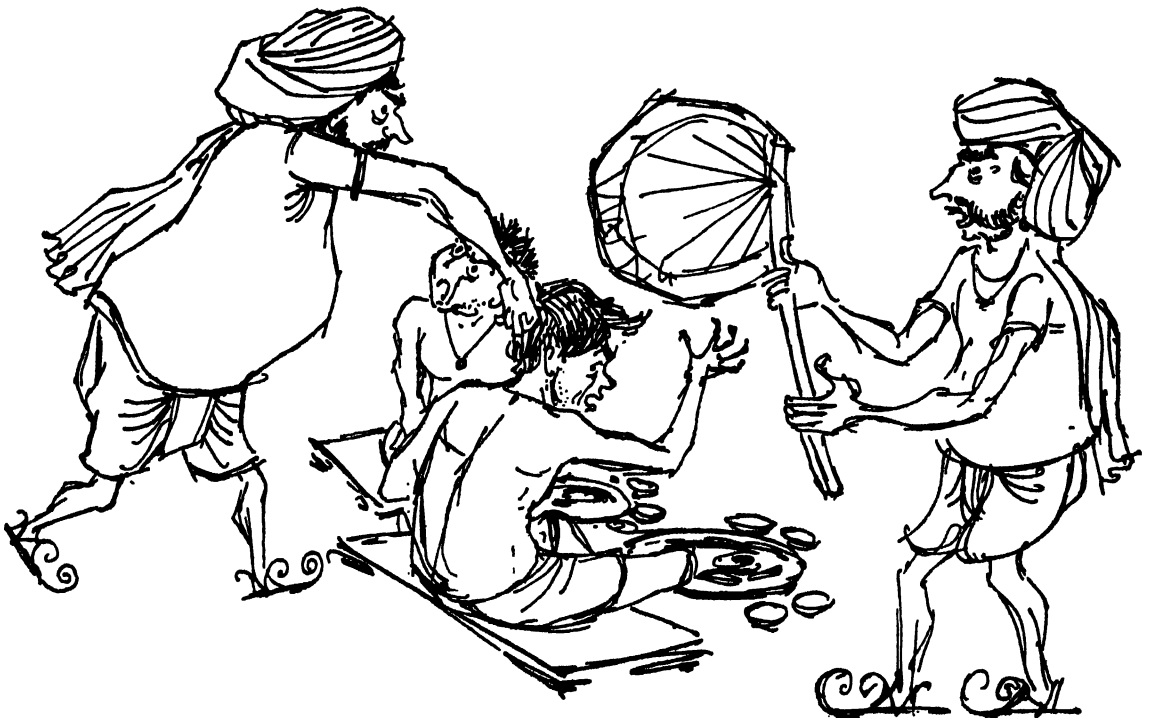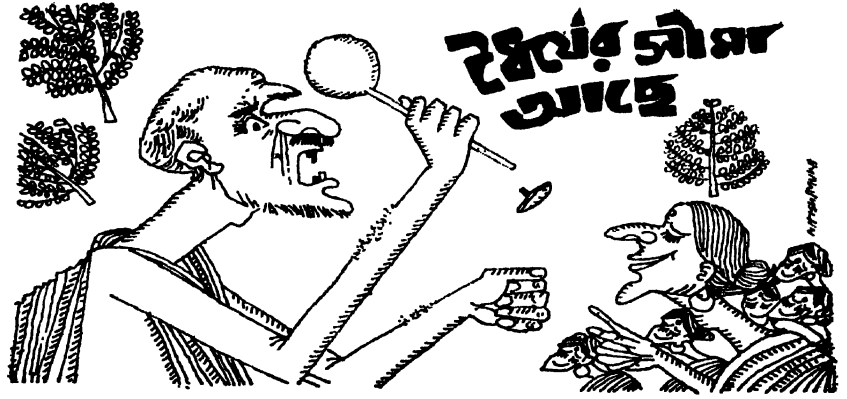
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেকে ব্যয় করি ষাট টাকা আশি নয়া—
কোত্থেকে ছয় বুড়ী এল ঘুরি কাশী-গয়া।
সেই হতে পথে পথে ঘোরে তারা দোরে দোরে ;
শোনাবেই স্মৃতিকথা যাকে তাকে ধরে ধরে।
কোথা কিবা ঘটিল তা বলা চাই দিবারাতি ;
পথে কত জটিলতা, কিবা উট, কিবা হাতী !
মালাইএর কিবা স্বাদ,—পেয়ারা সে কত ভারী—
ষাঁড়গুলো কি ফ্যাসাদ বাধাত—তা শতবারই
গেছে শোনা ঃ কাশী-গয়া শুনে কান ঝালাপালা।
দূরে কেউ দেখা দিলে বলে সবে, 'পালা, পালা।'

সাঁকো-পারে থাকোরাম—লোক কিছু ডাকাবুকো,
ছিপ ফেলে ছিল ব'সে হাতে নিয়ে ডাবাহুঁকো ;
হেনকালে হেনা দিদি চেনালোকে একা দেখি
বসে পাশে, পদীপিসি ঘেঁষে আসে দেখাদেখি।
ঘেরে ক্রমে থাকো রামে গুড়িগুড়ি ছয় বুড়ী ;
শুরু করে কালোজাম পয়সাতে কয় কুড়ি।
কেদারেতে কত সিঁড়ি—করে তারই ব্যাখ্যানা
'ভুলবে না ক্ষীর প্যাঁড়া মুখে দিলে একখানা।'
নড়ছিল ফাৎনাটা,—মাছ এসেছিল ছিপে,

গেল চলে গোলমালে। ক্ষেপে থাকো দিল টিপে
হেনাদির গলা, খেয়ে পদীপিসি হুঁকা-বাড়ি
মাথা ফাটি নিল মাটি। ছেলেবেলা 'চু-কাবাড়ি'
খেলেছিল তিনজনে,—ছুটে বাঁচে খালি তারা।
জলে খেয়ে হাবুডুবু গেল মারা 'কালীতারা'

'ধৈর্যের সীমা আছে'—শুধু বলেছিল 'থাকো'
বিশপাতা রায়ে জজ নিষ্কৃতি দিল না কো।
খেল না সে ক্ষীর প্যাঁড়া, গেল না সে কাশী-গয়া,
তিন খুন দায়ে শুধু থাকোরাম 'ফাঁসি গয়া।'

চুম্বক
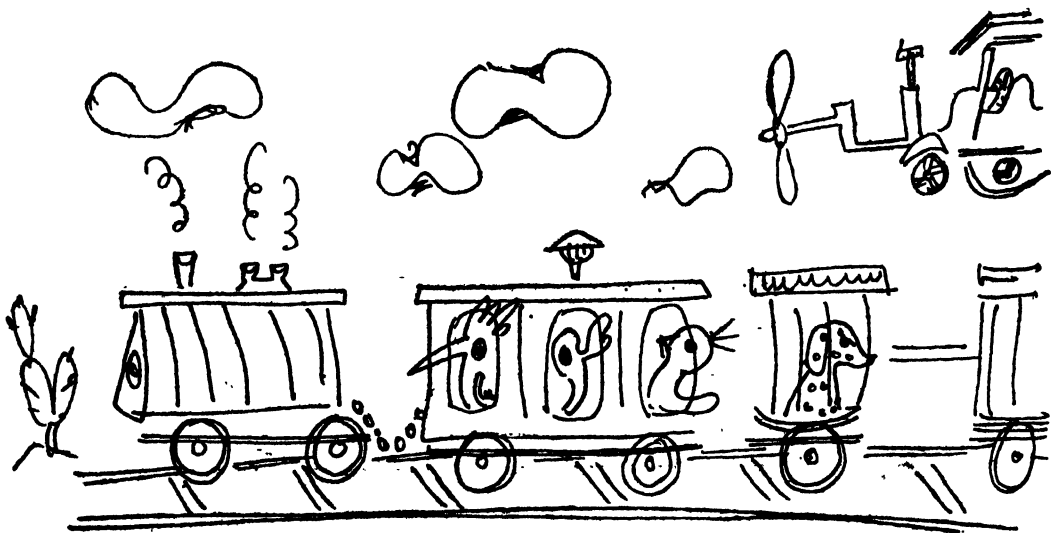
(পিসিমা খোকা নিয়ে বেড়াতে আসছেন বলে মিষ্টি তৈরী হচ্ছে, এই বড় প্যাঁ প্যাঁ পুতুল কে হয়েছে, সবাই তাই নিয়েই মশগুল, তাই ছ বছরের সোনা আর পাঁচ বছরের টিয়া রেগেমেগে একদি ছুপুরে বাড়ি ছেড়ে কালিয়ার বনে পালিয়ে গেল। পথে ঘড়িওলার সঙ্গে দেখা, সে বললে তার কলে মানুষ মাকু বনের মধ্যে আছে কি না খুঁজে দেখতে। রাজকন্যে বিয়ে করতে চায় বলে মাকু ঘড়িওলাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাকে হাসতে কাঁদতে শেখাতে হবে, নইলে রাজকন্যা বিয়ে করা হবে না।

বনের মধ্যে প্রথমেই ঠিক ঘড়িওলা যেমন বলেছিল তেমনি একটা লোকের সঙ্গে দেখা, অমনি তাকে সোনাটিয়া মাকু বলে চিনল। তারপর সার্কাসের সঙ্ আর জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে তারা বটতলা হোটেলে খেয়েদেয়ে বাসন ধোয়া আর পরিবেষণের চাকরি নিল। সার্কাসপার্টির লোকরা বটতলায় খেল অভ্যাস করে, জাতুকর শূন্যে ফাঁস দিয়ে পরীদের রাণীকে নামাল।

সোনাটিয়া হাঁ করে চেয়ে রইল। পরীদের রাণীর গোলাপী মুখে কি সুন্দর কালো কালো চোখ মাথায় সোনালি চুল, পরণে রুপোলি পোষাক, কোমরে জাতুকরের দড়ি জড়ানো। পরীদের রাণী ছু ঘোড়ায় পা রেখে নেচে উঠেছে। সে কি নাচ! সোনাটিয়া হাঁ করে তার নাচ দেখল। আবার রাণীকে নিয়ে দড়ি গাছের মগডালে উঠে গেল।

রাত্রে হোটেল-ওলার জন্মদিনে ভোজ হবে। তারজন্য 'স্বর্গের সুরুয়া' রাঁধতে রাঁধতে তার দাড়ি গোঁপ খুলে হাঁড়িতে পড়ে টগবগ করে ফুটতে লাগল, আর ভিতর থেকে তার চাঁচা-ছোলা হাসিমুখ বেরিয়ে

পড়ল। তাড়াতাড়ি সে আর একজোড়া দাড়ি-গোঁপ ট্যাঁক থেকে বের করে পরে নিল, আর সোনাটিয়াকে সাবধান করে দিল যেন তারা কাউকে এ কথা না বলে !

তুপুরে খাবার সময়ে হন্তদন্ত হয়ে সঙ্ ছুটে এসে বলল 'সর্বনাশ ! বনে পেয়াদা সেঁদিয়েছে !' অমনি হুড়দাড় করে যে-যার গা-ঢাকা দিল, বটতলা ভোঁভা, হোটেল-ওলা সোনাটিয়াকে নিয়ে গেছো ঘরে গুম হল)

পাঁচ

গেছো ঘরে শুধু চুপচাপ বসে থাকা, নিশ্বাস বন্ধ করে, কানছটোকে খাড়া করে। কিছু দেখা যায় না, গাছের পাতার ঘন ঝালর গেছো ঘরকে আড়াল করে নিরাপদে রাখে। সোনাটিয়াও কিছু দেখতে পায় না। খালি মনে হয় নিচে কেউ পট পট মট মট করে হেঁটে বেড়াচ্ছে, ছোঁক ছোঁক করে শুঁকছে। খিদেয় ওদের পেট চোঁ চোঁ করে।

একটু পরে লক্ষ্য করে গেছো ঘরের দেয়াল ঘেঁষে এক পাশে কালো চাদর মুড়ি কে শুয়ে আছে, ভয়ে সোনাটিয়ার হাত পা ঠাণ্ডা হয় ! এই সেই কালিয়ার বনের ভয়ঙ্কর নয় তো, যার গা থেকে বন্দুকের গুলি ঠিকরে পড়ে যায় ? হোটেলওলার হু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে হু'জনে কাঠ হয়ে পড়ে থাকে। হোটেলওলা ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে অভয় দেয়।

গেছো ঘরের কেঠো মেজের ফুটোতে চোখ লাগিয়ে হোটেলওলা দেখে কেউ কোথাও নেই, সব নিরাপদ। কালো মানুষটাকে ঠেলা দিয়ে বলে—

পেছন পেছন রাজ্যের বিপদ টেনে নিয়ে আসিস কেন ?' কালো-কাপড় রেগে যায়, চাদর ফেলে উঠে বসে বলে—

'তা আসব না ? আমি না এলে রোজ রোজ কে তোমার গোঁপ দাড়ি সরবরাহ করবে শুনি ?'

টিয়া বললে—'কেন, সঙ্ করবে। ওতো রোজ পোস্টাপিশে যায় !'

লোকটি চটে গেল। 'রেখে দাও তোমাদের ন্যাকা সঙের কথা। কবে এক টাকা দিয়ে লটারির টিকিট কিনে বসে আছে, তাই দিয়ে নাকি সে বড়লোক হবে ! এদিকে গুণের তার অন্ত নেই। যেই পোস্টমাস্টার ছোট জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে—কই, না তো, খবরের কাগজে লটারির কথা লেখে নি তো ! অমনি ডুকরে কেঁদে পিট্টান দেয় !--ও কি দাদা, হল কি ?'

হোটেলওলা যেন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে গেছোঘরে খোঁজাখুঁজি লাগিয়ে দিল। সোনা বলল, 'কি হারিয়েছে তাই বলই না, টিয়া খুব ভালো খুঁজে দেয়। মামণির চাবি খুঁজে দিয়েছিল।'

টিয়া অমনি ভঁ্যা করে কেঁদে বলল, 'মামণির কাছে যাব। আমার খিদে পেয়েছে।' কান্না দেখে হোটেলওলা আর কালো লোকটা সোনাটিয়াকে কোলে করে নামিয়ে এনে আবার খাবারের বাটির সামনে বসিয়ে দিল। এতক্ষণে সোনাটিয়া চিনতে পারল—ঐ না ঘড়িওলা ! 'এ্যাঁ, ঘড়িওলা, তুমি কেন এলে ? তোমাকে দেখলে কাঁদার কলের জন্য চেপে ধরবে না ?' ঘড়িওলা বললে—'এই, চুপ, চুপ !'

কথাটা অবিশ্যি হোটেলওলার কানে যায় নি, সে নিচে নেমেই আবার কি যেন খুঁজতে অ
করছে! খানিক বাদে ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ল। 'সর্বনাশ হয়েছে,
তার লটারির টিকিটের আধখানা আমাকে রাখতে দিয়েছিল, কানে গুঁজে রেখেছিলাম, কোথায়
গেছে! এখন সেটিকে কিছুতে যদি খেয়ে ফেলে থাকে, তবেই তো গেছি!'

'ও টিয়া, সত্যি খুঁজে দেবে তো?'

টিয়া বলল—'দেব, দেব, খেয়ে দেয়ে, হাত মুখ ধুয়ে, খুঁজে দেব। ঘড়িওলা বনের মধ্যে কেন এ

হোটেলওলা বলল, 'বাঃ, তা আসবে না? ও যে আমার ছোট ভাই, নইলে দাড়ি আনবে
তাছাড়া ওকে কলের পুতুল খুঁজে বেড়াতে হয়, এদিকে নিজের দেখা দেবার জো নেই, তার খাটনি ক
মাঝে মাঝে স্বর্গের সুরুয়া খেয়ে না গেলে পারবে কেন?'

টিয়া বললো 'কিন্তু—কিন্তু'—

সোনা হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল—

'এই, চুপ, চুপ।'

হোটেলওলা আবার উঠে টিকিট খুঁজতে লাগল।

ঘড়িওলা বলল—'আর পারি নে, বলি, তোফা আছ এখানে আমার দাদার আস্তানায়, ম
হদিস্ পেলে? তাছাড়া তোমাদের সঙ্গে বেহারী বলে কে লোকটা এসেছে? আশা করি তার ক
আবার হাঁড়ির কথা ভাঙ্গো নি?'

টিয়া সত্যি কথাই বলল, 'বেহারী আমাদের চাকর, আমাদের বাড়িতে বাসন ধোয়। মা
পেলে কি করবে? হাসিকান্নার কল এনেছ?'

ঘড়িওলা রেগে গেল। 'রাখো তোমাদের হাসিকান্নার কল! তাছাড়া একটু একটু হাসতে প
মাকু, ঠোঁটের কোণের কব্জা খুললেই মুখটা হাসি হাসি দেখায় আর কান্নার কলটল করা আমার কম্ম
আমার পয়সাকড়ি বিদ্যে বুদ্ধি সব গেছে ফুরিয়ে। এবার মাকুকে একবার পেলে হয়, সটান থানায়
দেব। আর ফেরারি হয়ে ঘুরতে ভালো লাগে না। মা'র জন্য মন কেমন করে।'

অমনি টিয়া বলল—'আমারো মামণি, বাপি, আম্মা, ঠামু আর নোনোর জন্যে মন কেমন ক
বলেই ভ্যাঁ করে কান্না জুড়ল। তাই দেখে ঘড়িওলা বেজায় বিরক্ত—'কথায় কথায় অত চোখের
কিসের গা? দামোদর নদী নাকি? এত করে বললাম মাকুকে খুঁজে দাও, হ্যাণ্ডবিল পর্যন্ত দিল
অথচ খোঁজার নামটি নেই!'

টিয়া চটে গিয়ে কান্না থামিয়ে সবে বলেছে, 'মাকু তো—' অমনি সোনা তার ঠ্যাং ধরে
গাছের ডাল থেকে নিচে নামিয়ে আনল, গুঁড়িতে মাথা ঠুকে আলু হল, এবার কান্না থামতে পাঁচ মিনি

কান্না থামলে ঘড়িওলা আবার বললে—মাকুর চালাকি এবার বের কচ্ছি, কতকগুলো চাকা
স্প্রিং আর চকমকি ইত্যাদির তেজ দেখ না। এবার সব যন্ত্রপাতি খুলে আলাদা আলাদা থ
পুরে বাছাধনকে—

হোটেলওলা শেষের কথাগুলি শুনে অবাক হয়ে গেল।

'কেন গো, মাকু না তোমার প্রাণের কলের পুতুল, মানুষ থেকে যার কোনো তফাৎ নেই, অথচ মানুষের চেয়ে যে শতগুণে ভালো, যেমনটি বানিয়েছ তেমনটি করে, আমাদের ছেলেপুলের মতো ত্যাঁদড় নয়—আজ আবার উল্টো কথা শুনি কেন?'

ঘড়িওলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—'এখন আর তা নয়, দাদা, যেমনটি ভেবে বানিয়েছিলাম, এখন আর তা নেই। কলের মধ্যে মধ্যে কি যেন অন্য শক্তি গজিয়ে গেল, মাকু এখন ইচ্ছে মতো চলে বসে আমার বড় একটা তোয়াক্কা রাখে না। আমার প্ল্যান্ মতো যদি চলত এমন বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত কখনো? অবিশ্যি আমিও মোটেই চাই নে যে সে আমাকে খুঁজে পায়, অমনি তো কাঁদার কল করে আর তিষ্ঠুতে দেবে না! নেহাৎ এত দিনে ও তোমরা কেউ তাকে দেখতে পাওনি বলেই বুঝেছি এ বনে সে নেই, তাই দু দণ্ড বসে গল্প করছি! ব্যাটাকে পেলে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ওর গায়ের কোনো দুটুকরো একসঙ্গে রাখব না!' সোনাটিয়া শিউরে উঠল।

হোটেলওয়ালা বলল, 'এত রাগ কিসের?'

'হবে না রাগ? সতেরো বছর ধরে, বাড়িঘর ছেড়ে, মাকে ছেড়ে, মার রান্না ছেড়ে ঘড়ির কারখানায় যে পড়ে রইলাম সেতো শুধু মাকুর জন্যেই। নইলে ম্যানেজার আমাকে উদয়াস্ত খাটিয়ে ঘড়ির ঘরের তাকের নিচে শুতে দিয়েছে আর ছাইপাঁশ খেতে দিয়েছে। তাইতেই আমি সারারাত জেগে থেকে গুদোমে পড়ে থাকা রাজ্যের পুরোনো বিলিতী ঘড়ির কলকব্জা খুলে নিয়ে ওর পেটে পুরতে পেরেছি। ফাল্‌তু পড়ে ছিল যে জিনিস মর্চে ধরে নষ্ট হচ্ছিল, কেউ দেখছিল না, এখন শুনছি তারি দাম নাকি পাঁচ হাজার টাকা! ঐ পাঁচ হাজারের জন্য আমার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। এবার চাবি ফুরুলেই দেব পুতুলটাকে যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে, ধুয়ে খাক্, আমার কি!'

এই বলে ঘড়িওলা দুবার চোখ মুছল। হোটেলওলা বলল,—'অত ভাবনা কিসের বুঝি না। ছ' মাস মাকুর খেলা দেখালে অমনি তোর কত পাঁচ হাজার উঠে আসবে, তখন পাঁচের বদলে সাত হাজার দিয়ে কলকব্জাগুলো কিনে নিতে পারবি।'

ঘড়িওলা হাত পা খুঁড়ে চ্যাঁচাতে লাগল—

'কোন চুলোয় খেলা দেখাবটা শুনি? রঙ্গমঞ্চটা কোথায়? সার্কাসপার্টি নিখোঁজ, অধিকারী ফেরারি, না আছে তাঁবু, না আছে গ্যাসবাতি, পালোয়ানরা সব জন্তুজানোয়ার নিয়ে বনের মধ্যে সেঁদিয়েছেন! ওকথা আর মুখে এনো না, কাপ্তেন,—'

মালিক তাকে কাছে ডেকে বোঝাতে লাগল, এই সুযোগে টিয়ার হাত ধরে পা টিপে টিপে সোনা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মাকুকে সাবধান করে দিতে হবে।

টিয়া বললে 'মাকু যদি কথা না শোনে?'

সোনা গম্ভীর হয়ে গেল, 'মাকুকে বাঘ ধরার ফাঁদে ফেলে দেব আর উঠতেও পারবে না, কেউ খুঁজেও পাবে না।'

টিয়ার কান্না পেল—'আর যদি বেরুতে না পারে? শেষটা যদি খেতে না পেয়ে—

'চুপ, টিয়া, চুপ। ঘড়িওলা চলে গেলে যাদুকর দড়ি দিয়ে মাকুকে তুলে আনবে। ছি, কাঁদে না, আজ না মালিকের জন্মদিন? সঙের লটারি টিকিটের আধখানা খুঁজে দিতে হবে না? আজ যে জানোয়ারদের খেলা হবে, মালিকের জন্মদিন বলে কত রান্নাবান্না হচ্ছে দেখলে না?'

টিয়া ঢোক গিলে বলে, 'বড় গর্তে ফেলবে না ছোট গর্তে ফেলবে? মাকুর লাগবে না?'

সোনার হাসি পায়, 'কলের পুতুলের আবার লাগে নাকি? লাগলে তো লোকরা কাঁদে, মাকুর কাঁদার কলই নেই তো কাঁদবে কি?'

টিয়া বললে 'তা হলে বড় গর্তেই ফেলে দাও, নইলে যদি আবার বেরিয়ে এসে বলে, এই যে আমি মাকু, আমাকে কাঁদার কল দাও!'

সোনা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি মাকুকে কাঁদার কল দেব। মাকু আমাদের জন্য প্যাঁ প্যাঁ পুতুল জাদুকরের কাছ থেকে এনে দেবে আর আমি ওকে কাঁদার কল দেব না?'

টিয়া তো অবাক, 'আছে তোমার কাছে?'

সোনা বুক ফুলিয়ে বললে, 'নেই, কিন্তু বানিয়ে দেব। ওর মুণ্ডু খুলে তার ভেতরে কাঁদার কল বসিয়ে দেব। মাকু তখন তোর মতো ভ্যাঁ—ভ্যাঁ করে কাঁদবে!'

বলতে বলতে সত্যি সত্যি দু জনে বাঘধরার বড় ফাঁদের কাছে এসে গেল। অনেক দিনের পুরোনো ফাঁদ। বনে যখন বসতি ছিল তখন গাঁয়ের লোকরা বাঘ ধরবার জন্য করেছিল। জাদুকর বলেছিল, বাঘ মোটেই নয়, বুনো শুওরে ওদের শস্য খেয়ে ফেলে নষ্ট করত, তাদের ধরবার ফাঁদ এগুলো। মাটিতে দু মানুষ গভীর গর্ত খুঁড়ে, তার ওপরে কাঠকুটো লতা পাতা দিয়ে ঢেকে রাখত, শস্য খেতে এসে তার মধ্যে শুওর পড়ে যেত আর শস্য-খাওয়া ঘুচত। তাই শুনে শুওরের জন্য টিয়া একটু কেঁদেও ছিল।

এখন ফাঁদের মুখটাকে লতা পাতা গজিয়ে ঢেকে রেখেছে না দেখে কেউ পা দিলে ঘপাৎ করে পড়ে যাবে।

তাই যেখানে যেখানে ফাঁদ পাতা, সেখানে হোটেলওলা একটা করে বাঁশের খুঁটি, পুঁতে রেখেছে, লোকে যাতে দেখতে পেয়ে সাবধান হয়। সার্কাসের জানোয়ারদের জন্যই বেশি ভয়।

সোনা একবার এদিকওদিক দেখে নিয়ে, বড় ফাঁদের কিনারা থেকে বাঁশের খুঁটিটা উপড়ে ফেলে দিল। এর মধ্যে মাকুকে ফেলতে হবে; তা হলে আর কেউ তাকে খুঁজে পাবে না যতক্ষণ না সোনা টিয়া দেখিয়ে দেয়। আর ভয় নেই।

টিয়া বললে, 'দিদি, যদি ওর মধ্যে সাপ থাকে, কাঁকড়া বিছে থাকে, মাকুকে যদি কামড়ায়?'

'চুপ, টিয়া, চুপ, কথায় কথায় অত কান্না আবার কি!'

মাকু তো কলের পুতুল, সাপ বিছে ওর কি করবে?

তবু টিয়ার কান্না পায়। সে কেঁদে বললে—'আমি কলের পুতুলকে ভালোবাসি, প্যাঁ প্যাঁ পুতুল

কোথায়, মামণি বাপি কোথায়?'

তাই শুনে সোনাই বা করে কি, দু জনে মহা কান্না জুড়ে দিল। কখন যে বড় চিঠি হাতে করে পেয়াদা এসে হাজির হয়েছে ওরা টেরই পায় নি। পেয়াদা হাঁক দিল, 'ও খুকিরা এ বনে যারা থাকে তারা কোথায় গেল বলতে পারো? সেই ইস্তক খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হচ্ছি, অথচ কারো টিকির দেখা পাই নে। এ চিঠি যথাস্থানে না পৌঁছলে আমার চাকরি থাকবে না। বলি, কথা শুনতে পাচ্ছ?'

পেয়াদা এসেছে ঘড়িওলাকে ধরতে, মাকুকে ধরতে, সার্কাসের লোকদের ধরতে, আর কি সোনা টিয়া সেখানে থাকে! দৌড়, দৌড়! পেয়াদাও সমানে চ্যাঁচাতে লাগল 'শোন, শোন, বটতলায় কারা খাওয়াদাওয়া করে? ও খুকিরা, কথার উত্তর দাও না কেন?'

'দাঁড়াও তোমাদের ধরছি!' এই বলে যেই না পেয়াদা ওদের পেছনে দৌড়েছে, সে কি মড়্‌ মড়্‌ হুড়মুড়! পেয়াদা পড়েছে ফাঁদে।

ক্রমশঃ

(বুদ্ধত্ব লাভ করে অনেক দিন পরে সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তুতে ফিরেছেন। এদিকে তাঁর ছেলে রাহুল তাঁর সংবাদ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তার মা বলে দিয়েছেন বাবা এলেই তাঁর কাছ থেকে পিতৃধন চেয়ে নিবি। এই নিয়ে নাটক।)

[স্থান একটি ফুলে ভরা বাগানের অংশ। সানাইএ বসন্তবাহারের সুর। একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ফুলের গহনা পরে হাত ধরাধরি নাচছে।]

গান

সমবেত কণ্ঠে

আনন্দ আজ সকাল বেলার
আলোর মত
ছড়িয়ে গেল, ভরিয়ে দিলো
আঁধার যত।
তার ছোঁয়ায় ফোটে ফুলের কলি
তার ছন্দে নাচে ভ্রমরগুলি
তার কাঁপন ভোলায় বুকের মাঝে
গভীর ক্ষত।
ওরে আয়রে ছুটে খুশির গানে
যোগ দিতে রে
আয়রে সবাই সবার সুখের
ভাগ নিতে রে

আনন্দ আজ মাঠে ঘাটে
ফোটায় তারা চাঁদের হাটে
তার তালে তালে তাল দিয়ে সুখ
জাগায় কত।

সোমদত্ত—ঐ যে, রাহুল আসছে। কি মজা, কি মজা।

মাধবী—আজ আমরা শাল পিয়ালের বনে হারিয়ে যাওয়ার খেলা খেলব।

চম্পা—না, না, আজ যে মধুমতীর তীরে চড়ুইভাতি হবার কথা।

বিনয়—তোমরা কিচ্ছুই জানোনা। মহারাজ বলে পাঠিয়েছেন আজ মৃগয়ায় যেতে হবে পাখি শিকারে। যার টিপ সব চেয়ে অব্যর্থ হবে, সে পুরস্কার পাবে সোনার মুকুট।

সোমদত্ত—আর তারপরে ঘোড়ায় চড়ে উদ্যান প্রদক্ষিণের প্রতিযোগিতা। পুরস্কার তার জন্যেও আছে। কই—কই ছেলেদের ডাকো তাহলে।

মাধবী—লাভ কি তোমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষায়—রাজকুমারকে কেউ কোনদিন হারাতে পারবে কি?

চম্পা—আর সাদা ঘোড়া গলায় মুক্তোর ঝালর ঢুলিয়ে ঠিক বিদ্যুতের ঝলকের মত ছুটে যায়, তোমরা কত পিছনে পড়ে থাকো।

মাধবী—তার সোনালি পালক গাঁথা তীর যেন আপনা হতেই লক্ষ্যভেদ করে, পুরস্কারের লোভ তোমরা বৃথাই কর।

সোমদত্ত—আমরা ক্ষত্রিয় বংশের ছেলে, হারজিতকে বড় করে দেখি না। চলো, বিনয়, সকলে প্রস্তুত হয়ে নিই।

[রাহুলের প্রবেশ]

কি হয়েছে রাজকুমার এত বিষণ্ণ কেন?

রাহুল—[জোর করে হেসে] কই না তো। মাধবী, চম্পা, তোমরা আজ নতুন গান শোনাবে বলেছিলে।

মাধবী—তুমি শুনবে রাহুল? আমরা তো তোমার জন্যেই রোজ রোজ কবির কাছে গিয়ে নতুন গান শিখে আসি।

গান—দ্বৈত কণ্ঠে

ঘর ছাড়া ঐ মেঘের সাথে
মনটি বেঁধেছি,
পাগলা হাওয়ার একতারাতে
সুরটি সেধেছি।
হারিয়ে যাওয়া পাখির ডানা
চিনিয়ে দিলো কোন অচেনা

দিশা খোঁজার সেই নেশাতেই
আজকে মেতেছি।
ঢেউএর ফেণার উথাল পাথাল
হাসির সাথে
মেলাই মোদের মনের খুশি
আপনা হতে—
বকুল ঝরা পথের ধারে
ফুল কুড়িয়ে সাজি ভরে
খেলা ঘরের আসনখানি
ধূলায় পেতেছি।

(অন্যমনস্ক হয়ে রাহুল চলে গেল)

সোমদত্ত—মহারাজকে এখুনি গিয়ে বলছি, তোমরা রাজকুমারকে উধাও হয়ে হারিয়ে যাওয়ার গান শেখাচ্ছ

বিনয়—জানোনা, আদেশ আছে কেবল আনন্দ, সুখ আর পাওয়ার কথা ছাড়া রাহুলকে কিছু বলা নেই। ওর জন্যে মহারাজ উঁচু পাঁচিলটাকে আরও দশ হাত উচু করে দিয়েছেন, যাতে কোনমতেই ওপারে উঁকি দিয়ে দেখতে না পায়।

মাধবী—আমরা তো এতসব জানিনা ভাই—। কবি বলল—কুমারকে গান শোনাতে হবে, তাই এ প্রাসাদে চলে এসেছি।

চম্পা—পাঁচিলের ওপারে এমন কি আছে, যা দেখতে নেই?

বিনয়—[নিচু গলায়] আছে মানুষের দুঃখ, ব্যথা, চোখের জল। এপারে যত হাসি, ওপারে তত কান্না রাজপথ দিয়ে যারা চলে তারা কি এপারের মানুষের মতন সুখী?

মাধবী—আমি দেখেছি শ্রেষ্ঠী ভগবান দত্তর মেয়ে উৎপলবর্ণা পাগলিনী হয়ে পথে পথে ঘুরছে, সেদিনে ঝড়ে তার বাবা মা ভাই সব মরে গেছে যে—।

চম্পা—আর কিসা গোতমী, আহা, তার বুকের ধন চোখের মাণিক একটিমাত্র ছেলের ভীষণ ব্যামো বাঁচে কি না বাঁচে—।

সোমদত্ত—মহারাজ রাহুলকে এসব কথা জানাতে বারণ করেছেন—। ও যেন কারো চোখের জল কখনো না দেখে। তাই তো আমরা দিনরাত গানে খেলায় ফুর্তিতে মেতে আছি।

চম্পা—কিন্তু কেন?

বিনয়—পরে উত্তর দেব—। এখন চুপ, ঐ রাহুল আসছে। এসো—আমরা সেদিনকার সেই গান গাই—। ওর মন আজ কেন ভাল নেই, কে জানে?

মাধবী— রামধনু রঙ ঝরণা ঝরে
আকাশ থেকে ধুলোর পরে,

সকলে— সেই আলোতে রাঙিয়ে হৃদয়
জাগল বুঝি নিশি ভোরে—।

রাহুল—সোমদত্ত, পিতামহকে জানিয়ে দাও, আজ আমি মৃগয়ায় যাব না—।

সোমদত্ত—যাবেনা ?

রাহুল—বিনয়, তুমি আচার্যকে বল পুঁথির পাতা খুলতে আমার ভালো লাগছে না—। আর শস্ত্র পরীক্ষা তোলা থাক অন্য দিনের জন্য—।

মাধবী—তুমি তা হলে আমাদের কবির কাছে গান শিখবে কুমার ? ডেকে আনব তাকে ?

[রাহুল মাথা নাড়ল]

চম্পা—তাহলে চল মধুমতীর স্রোতের উজানে নৌকো ভাসাই—

রাহুল—[বাঁধানো বেদীতে বসে]—দরজায় এই যে তালাটা ঝুলছে, তার চাবি কার কাছে আছে, তোমরা কি জানো ?

সোমদত্ত—চাবি দিয়ে কি হবে কুমার ?

রাহুল—তালা খুলে আমি বাইরে যেতে চাই—।

সকলে—বাইরে ? না—না, কখনো না, কিছুতে না—।

রাহুল—এক কাজ কর—ঐ যে মালির ছোট্ট মেয়েটি আপন মনে গান গাইছে আর সাজি ভরে ফুল তুলছে —ওকে একবার ডাকো ত—।

সকলে—ওগো ফুলতুলুনি—এদিকে এসো না—। শুনতে পাচ্ছ আমাদের ডাক—।

[ফুলের সাজি হাতে গান গাইতে গাইতে মালতী এল]

মালতীর গান

আমাদের মনের খুশি ফুল হয়ে আজ
ফুটছে বনে,
কনকচাঁপার মিষ্টি সুবাস
ঝরছে মনে,
বাতাস কাঁপে ডালে ডালে
যূঁথি জাতি টগর দোলে
গন্ধরাজের পাপড়ি খোলে।
খুশির সে টানে।

কে ডেকেছে আমায় ? তোমরা কি মালা চাও—। এই দেখ, এ হোল বেলফুলের কুঁড়ির মালা।

মাধবী—দাওনা আমাদের একটি করে। কত দাম দিতে হবে গো ?

মালতী—দাম দিতে হবে না। ফুল কি কেউ দাম দিয়ে কেনে ? ভালোবেসে যে নিতে জানে, সেই

পায়। এই নাও—এই নাও গো—একি, তুমি নেবে না।

রাহুল—নেব, যদি একটা কথা আমাকে বল। তুমি তো ফুলের মালা গেঁথে হাটে বাটে ঘুরে বেড়াও অনেক খবর জানো! দক্ষিণাপথ কোনদিকে বলতে পারো?

মালতী—আমার পথ ঘুরে ফিরে ফুলবাগানের দিকেই যায়, আর পথ তো আমি চিনিনে।

রাহুল—তবে তুমি যাও।

মালতী—[গান গাইতে গাইতে]

আমাদের হাঁসির ছোঁয়া
যে পেল আজ,
হৃদয় বাহির পরেছে তার
ফুলেরই সাজ
বকুল পারুল রক্তজবায়
শ্বেত কমলের মধুর সুধায়
অশোক বনের লতায় পাতায়
সেই তো চেনে।

[মালতী চলে গেল]

রাহুল—তালাটা খুললেই আমি দক্ষিণাপথ খুঁজে বের করব। [হাত দিয়ে টেনে] উঃ, কি ভারি আর শক্ত।

সোমদত্ত—দক্ষিণাপথে কি আছে?

রাহুল—আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, আমার বাবা রাজ্য জয় করতে সেই সুদূর দক্ষিণাপথে চলে গেছেন মা বলেছেন—আমার জন্যে তিনি সাতরাজার ধন মাণিক নিয়ে আসবেন।

মাধবী—তিনি এলে আমাদের সেই মাণিক দেখতে দেবে কুমার?

সোমদত্ত—সে তো পরের কথা। আজকে বর্ষাশেষে আকাশ নীল সমুদ্দুরের মত চক চক করছে সাদা বকের সারি ঠিক মুক্তামালার মত দুলছে—তার বুকে। আজ এসোনা একটা নতুন খেলা খেলি।

সকলে—সেই ভালো, সেই ভালো—

(গান)

নতুন খেলা খেলব সবাই—
সকাল সাঁঝে,
নতুন গানের সুর আমাদের
কণ্ঠে বাজে—
রাতের কালো আঁচল তলে

নতুন দিন যে মুখটি তোলে
নিত্যি নতুন গানের সুরে
হৃদয় মাঝে।
নতুন হল রিক্ত শাখা
—বসন্তেরি হাতে,
নতুন আশায় ভ্রমর দেখ
ফুলের খেলায় মাতে
নতুন সাজে সাজলো ধরা
চোখ জুড়ালো স্বপ্ন ভরা
নতুন তালের ছন্দে হৃদয়
আপনি নাচে—

[সবাই হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেল! রাহুল সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে এলো।]

রাহুল—[আপন মনে] দক্ষিণাপথ, কে জানে সে কতদূর। কেন তিনি ফিরতে দেরী করছেন?

[দ্বারপালের ছেলে সুনন্দর প্রবেশ]

সুনন্দ—কুমার? তুমি এখানে একা?

রাহুল—তুমি তো আমার চেয়ে অনেকখানি বড় সুনন্দ, আচ্ছা, তুমি আমার বাবাকে দেখেছিলে—? রাজ্য জয় করতে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর প্রিয় ঘোড়া চৈত্তকের পিঠে চড়ে বেরিয়েছিলেন, তাই না? প্রকাণ্ড বড় তলোয়ার তাঁর হাতে ঠিক বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠত—। শুনেছি তলোয়ার যুদ্ধে কেউ পারতনা আমার বাবার সঙ্গে—।

সুনন্দ—তখন আমিও খুব ছোট ছিলাম কুমার। এই বাগানে তিনি এলে লুকিয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে দেখতাম—।

রাহুল—কেমন দেখতে আমার বাবা? তোমার মনে আছে, সুনন্দ?

সুনন্দ—একটু একটু মনে পড়ে যেন সূর্যের মত জ্বল জ্বল করত। একদিন হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকলেন, হাতে ছিল নতুন ফোটা পদ্মের কলি—। তুলে দিলেন হাতে। তারপর হাসলেন। আমি অমন হাসি আর কোনদিন দেখতে পেলাম না।

রাহুল—ইস, তোমার কি মজা। আমার কিন্তু কিছুই মনে পড়েনা।

সুনন্দ—তুমি যে তখন একেবারে শিশু—

রাহুল [কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে] আমার একটা উপকার করবে ভাই। এই নগরের দ্বারপাল তোমার বাবা—তার কাছ থেকে লুকিয়ে চাবিটা একবারটি এনে দেবে। তার বদলে যা চাইবে, তাই দেব তোমায়। এই গজমোতির হার, এই মুক্তোর মালা, এই মাণিক বসানো আমার তলোয়ার।

সুনন্দ—[হতবুদ্ধি হয়ে] চাবি, কোন চাবি ?

রাহুল—এই যে দরজায় তালা ঝুলছে। একবারটি খুলে আমি বাইরে বেরিয়ে খুঁজে দেখব দক্ষিণাপথ কোথায়।

সুনন্দ—চাবি হয়তো আমি এনে দিতে পারব। কিন্তু কুমার, বাইরের জগৎ দেখলে কি আর তুমি চিরসুখী হতে পারবে ? তোমার বাবা যে—এই রে, কথায় কথায় কি বলতে কি বলে ফেললাম। দেখো কুমার, তোমার বন্ধুরা আনন্দের লহরী তুলেছে। তুমি ওদের সঙ্গে যোগ দিতে যাবে না ?

রাহুল—কেন আমার কাছে লুকোচ্ছ সুনন্দ। আমার বাবার কথা শুনে আমি এখান থেকে এক পাও যাব না। এমন কি পিতামহ বললেও না।

সুনন্দ—তাহলে তো সর্বনাশ। আচ্ছা, তোমার খুব চুপি চুপি বলি, ভুলেও কাউকে বোলনা যেন। তাহলে মহারাজ হয়তো আমাকে শূলে চড়িয়ে দেবেন।

[রাহুল মাথা নাড়ল] রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তোমারই মত পাঁচিলের এদিকে হাসি, গান আর আনন্দের মাঝখানে বড় হয়েছিলেন। তিনি দুঃখ কাকে বলে জানতেন না।

রাহুল—আমি তো জানি না দুঃখ কি ?

সুনন্দ—মানুষ মাত্রই দুঃখী রাহুল—সে যা চায়, তা কি কখনো পায় ? ভেবে দেখো, তোমার মনেও কত অপূর্ণ সাধ রয়েছে।

রাহুল—[একটু ভেবে] আমার কিন্তু যা চাই, তা পেতে একটুও দেরী হয় না। একমাত্র বাবাকে দেখতে বড় সাধ জাগে। আমার মায়েরও মন কেমন করে সুনন্দ। এক একদিন দূরের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখি নির্জনে তিনি কাঁদছেন। যদি বলি, মা—কি হয়েছে ? কাঁদছ কেন ? অমনি আঁচলে চোখের জল মুছে বলেন—কই বাবা, কিছু তো হয়নি। চেখে কি যেন একটা পড়ল।

সুনন্দ—তবেই তো দেখছ ধনীর প্রাসাদেও দুঃখ লুকিয়ে লুকিয়ে হানা দেয়—ধনরত্ন দাসদাসী কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। যাই হোক, তোমার বাবা একদিন রথে চড়ে নগর ভ্রমণ করতে বেরিয়ে, প্রথমে দেখলেন একজন অসুস্থ মানুষ রোগের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছে। ওকি ? —তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

রাহুল—আমার পিতামহও একদিন অসুস্থ হয়েছিলেন—রাজবৈদ্য তাঁকে দেখতে এসেছিল।

সুনন্দ—এ রোগ ছিল আরও অনেক নিষ্ঠুর—অনেক ভয়ঙ্কর। সিদ্ধার্থ বললেন—মানুষ তাহলে রোগ ব্যাধির বিরুদ্ধে অসহায়। আমার সুন্দর সুঠাম দেহ, তাহলে একদিন ওরকম বীভৎস হয়ে উঠতে পারে ? সারথী সুমন্ত্র কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল।

রাহুল—আমার পিতামহ শুনে কি বললেন ?

সুনন্দ—তিনি আদেশ দিলেন—সিদ্ধার্থ যখন বেরোবেন, তখন পথে যেন কোন দুঃখের দৃশ্য তাঁর চোখে

না পড়ে—নগর কোটাল নতুন কাপড় বিলিয়ে দিল সকলকে, রাজভাণ্ডার খালি করে বিলিয়ে দিল ধনরত্ন, মণি মাণিক্য। সবার আনন্দ যেন আর ধরে না—। কিন্তু সেই জনতার ভিড়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন—

রাহুল—[মন্ত্রমুগ্ধের মত] কি দেখলেন আমার বাবা ?

সুনন্দ—দেখলেন একটি বুড়ো মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে পথ চলেছে। চুল তার শণের নুড়ির মত শাদা, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, সব দাঁত পড়ে গেছে। 'ও কি ?' রাজপুত্র সিদ্ধার্থ আবার চমকে উঠলেন—

সুমন্ত্র বুঝিয়ে বললেন—লোকটি বুড়ো হয়ে গেছে—। সব মানুষই একদিন এরকম বুড়ো হবে ?

রাহুল—তারপর ? [ঘণ্টার শব্দ]

সুনন্দ—ঐ দেখ, কথায় কথায় ঘণ্টা বেজে গেল—। এখন তোমার নাওয়া খাওয়ার সময়—। আমারও পাঠশালায় যেতে হবে যে—।

রাহুল—কিন্তু আমার বাবা তারপর কি দেখলেন কখন বলবে—?

সুনন্দ—বলব বিকেলে। এখন আমি যাই—?

রাহুল—দাঁড়াও দাঁড়াও—শোন—আমার চাবিটা কখন এনে দেবে—?

সুনন্দ—[ফিরে এসে] দরজা খুললে যদি মহারাজ রাগ করেন—?

রাহুল—ইস, আমার উপর রাগ করে কার সাধ্য। জানো, পিতামহ আমাকে নয়নমণি বলে ডাকেন। চাবিটা দাওনা ভাই লক্ষ্মীটি—আমি তোমায় এখুনি এই গজমোতির হার খুলে দেব—

সুনন্দ—না ভাই, ও হার কি আর আমায় সাজে ? চাবি আমি অমনি এনে দিচ্ছি। কিন্তু কথা দাও, একবারের বেশি দুবার তুমি বাইরের দিকে তাকাবেনা।

রাহুল—না, না—না—।

সুনন্দ—আচ্ছা, তবে আমি এই যাব আর আসব—তুমি কিন্তু এখানে থেকো—আর কেউ যেন জানতে না পারে—চাবি আমি লুকিয়ে এনেছি। তাহলে হয়তো আমার বাবার চাকরী চলে যাবে—। [ছুটে চলে গেল]

রাহুল—[নিজের মনে] আজ বাড়িতে সকলের কি হয়েছে কে জানে ? ঠাকুরদা অন্যমনস্ক হয়ে সব ভুলে উল্টোপাল্টা উত্তর দিচ্ছেন, ঠাকুমা কেবল ঘর বার করছেন অধীর হয়ে। মা অবশ্য রোজকার মতই জানলার ধারে বসে, সকালের আলোয় তার মুখটি দেখাচ্ছে যেন শিশির ভেজা পদ্মফুল। অন্যদিন মা চেয়ে থাকে দূরে, অনেক দূরে—যেখানে আকাশ নামতে নামতে মাটির সঙ্গে এক হয়ে গেছে। আজ কিন্তু তার চোখ এই রাজপথের দিকে। কেউ কি আজ আসবে ? [হঠাৎ ফুল ছড়াতে ছড়াতে মাধবী আর চম্পার প্রবেশ।]

মাধবী ও চম্পার গান

আমাদের খেলা দেখে জেগেছে আজ
খেলার সাড়া
নদী তাই চলার খেলায় আপন ভুলে
দিশাহারা—।
খেলার নেশায় প্রজাপতি
ফুলের বনে অবাধ গতি
খেলবে বলে নীল আকাশে
মেঘের তাড়া—।
লাগলো খুশির কাঁপন দেখ পাতায় পাতায়
খেলার হিজিবিজি পাখির গানের খাতায়
আলোয় খেলা লুকোচুরি
সূর্য যেন খেলার ঘুড়ি
খেলার ছলে ফুলের ডালে
হাওয়ার নাড়া—।

[পিছনের অনেক বালক বালিকা দল বেঁধে গানে যোগ দিল]

মাধবী—কুমার, এখানে একা বসে? তাই আমাদের খেলায় আজ তোমাকে খুঁজে পেলাম না।

চম্পা—ইস্ রোদদুরের তাপ লেগে ননীর অঙ্গ যেন গলে পড়ছে। নিয়ে আয়না কেউ সোনার ছাতিটা। সোমদত্ত, কোথায় গেলে ভাই। কুমারকে দাও বনের ফল, ফুলের মধু। কত না জানি খিদে তেষ্টা পেয়েছে।

রাহুল—[সোমদত্তকে পাতায় মোড়া ফল আনতে দেখে] না, না, আমার কিচ্ছু লাগবে না, খেলার সময় পার হয়েছে, তোমরা এবার ঘরে ফের। আমিও আমার মায়ের কাছে যাব—।

মাধবী—সেই ভালো—তখন থেকে একা একা বসে বেচারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। চল—চল, সবাই ফিরে যাই—। আবার বিকেল বেলা আসব। নহবতে এখন সুর ধরেছে, মহারাজের রাজসভা শেষ করে বিশ্রামের ঘরে আসবার সময় হোল তোমার জন্যে সাজি ভরে বনের ফুল তুলে এনেছি।

চম্পা—আর আমি তোমার জন্যে মধুমতীর তীর থেকে এই স্ফটিক পাথরটি খুঁজে এনেছি ভাই। শাদা রঙে আলো পড়ে অভ্রের মত চিক চিক করছে।

(একে একে প্রায় সকলের প্রস্থান)

সোমদত্ত—আরে, ওখানে ঐ মল্লিকা লতার পাশে একটা চাবি পড়ে আছে যে? চাবি এখানে এলো কি করে?

রাহুল—দাও, দাও, চাবি আমাকে দাও, ওটা আমার চাবি। এবারে আমি তালাটা খুলে দেখব বাইরে

কি আছে। কে জানে হয়তো এমন কাউকে খুঁজে পাব, যে বলে দেবে দক্ষিণাপথ কোন দিকে। তারপর মৃগয়ার ছল করে আমি আমার ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাব, আমার বাবাকে ফিরিয়ে আনতে—।

সোমদত্ত—সর্বনাশ—। মহারাজ জানতে পেলে আর রক্ষে থাকবেনা, আমি পালাই।

(প্রস্থান।)

রাহুল—[তালায় চাবি ঘোরাতেই তালা খুলে দেখে] খুলেছে, খুলেছে,—। এইবারে দরজা ধরে টানি—। জোরে, আরও জোরে—। [দরজা খুলে যেতেই বুদ্ধ স্তবের মূর্ছনা শোনা গেল। সুনন্দর প্রবেশ।]

(সমবেত কণ্ঠে স্তব)

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—।

রাহুল—ওরা কারা পথ দিয়ে চলেছে সুনন্দ? গৈরিক বসন পরে হাতজোড় করে গান গাইছে—। আমি এমন মানুষ আগে দেখিনি—।

সুনন্দ—বন্ধ করে দাও, এবারে দোর বন্ধ করে দাও—। কুমার, আমার কথা রাখো—।

রাহুল—[মুখ বাড়িয়ে] ও ভাই পথিক, বলতে পার, কারা এমন ভাবে পথ দিয়ে চলেছে—'কি বললে,' সন্ন্যাসী'—। ওরা কার নাম গান করছে? এ মন্ত্র তো আমি আগে কখনো শুনিনি—। [আবার স্তব গানের রেশ শোনা গেল।] সুনন্দ—দেখ, চেয়ে দেখ, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন একজন, সারা অঙ্গ দিয়ে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে। কি সুন্দর হাসিতে ভরা মুখটি—। পদ্মের পাপড়ির মত বিশাল চোখ দিয়ে কি মধুর ভালোবাসা ঝর্ণার মত ঝরে পড়ছে। সুনন্দ, ঐ দেখ, উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। যাই, একবারটি ওঁর পায়ে এই ফুল কটি দিয়ে আসি।

সুনন্দ— পথের ধুলো যে তোমার পায়ে লাগবে রাহুল। তুমি যেওনা।

রাহুল— কি জানি সুনন্দ, আমার মনে হচ্ছে, উনি আমার খুব আপন জন। [হঠাৎ মুখ তুলে পিছন ফিরে] ঐ দেখো আমার মাও এদিকে তাকিয়ে আছেন, দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে আচ্ছা, আমি মায়ের অনুমতি নিয়ে আসি। তুমি এখানে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকো।

(ছুটে প্রস্থান।)

সুনন্দ— এইবেলা চাবি বন্ধ করে দিই। মহারাজার কানে উঠলে আজ আমাকে অনেক দুঃখ সইতে হবে। ওমা, চাবিটা নিয়ে গেছে দেখছি। তাহলে আর উপায় নেই। [দরজার পাশে বসে] ঐ চোখ দুটো আমারও চেনা লাগছে কেন? স্বপ্নে কি দেখেছি? মধুবনে গাছের ছায়ায় সন্ন্যাসী এসে বসেছেন, মনে হচ্ছে আকাশ থেকে সূর্য নেমে এল বুঝি। সকলে পথের ধুলোয়

লুটিয়ে পড়ে ভক্তি জানাচ্ছে আমিও তবে এখান থেকে একটি প্রণাম জানাই। [নিচু হয়ে প্রণাম করল] সর্বনাশ, পথে বেরিয়েছে মহারাজের পার্শ্বচর উপানন্দ। একি, মহামন্ত্রীও চলেছেন যে ভেট নিয়ে। [মুখ বাড়িয়ে] ও ভাই পথিক, জানো কি কে ঐ সন্ন্যাসী ? [রাহুলের প্রবেশ] বুদ্ধ তথাগত ? [রাহুলকে দেখে] উনি বুদ্ধ তথাগত।

রাহুল— না, উনি আমার বাবা। আমার বাবা ফিরে এসেছেন সুনন্দ। মা বললেন—যাও রাহুল, পিতাকে প্রণাম করে পিতৃধন চেয়ে নিয়ে এসো। আমি যাচ্ছি। সমস্ত পৃথিবী জয় করে বাবা আমার জন্যে কি ধন নিয়ে এসেছেন, তা দেখতে আর তর সইচেনা।

সুনন্দ।—তোমার পিতাই তাহলে পরম জ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হয়েছেন রাহুল। তখন আমার সবটা বলার উপায় ছিল না—এখন শোন। পথে সেই বুড়ো মানুষটিকে দেখে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মনে ভয় ঢুকল—মানুষ তাহলে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধে হার মেনে যায়। তারপর তাঁর চোখে পড়ল একটি মরা মানুষকে নিয়ে চলেছে শোকে কাতর আত্মীয়স্বজন। 'ও কি ?' আবার প্রশ্ন করলেন। সুমন্ত্র বলল—লোকটি মরে গেছে। সব মানুষই একদিন মরে যাবে। মানুষ কি দুঃখী ? ভাবলেন সুখী রাজপুত্র। তারপর এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হোল তাঁর। তাঁর মনে হোল, মানুষের সুখের খোঁজে তাঁকে ঘর ছাড়তে হবে ঐ সন্ন্যাসীর মত। রাহুল, সন্ন্যাসী হয়ে তোমার পিতা বোধহয় মানুষের সুখের হারানো চাবিটি খুঁজে পেয়েছেন।

(সোমদত্তের প্রবেশ)

সোমদত্ত—রাহুল—রাজকুমার—মহারাজ শুদ্ধোদন আকুল হয়ে তোমাকে ডাকছেন। তাঁর কাছে তুমি ফিরে যাও।

রাহুল— [দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে] পিতামহ অসময়ে কেন ডাকছেন আমায় ?

সোমদত্ত—আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি। শুধু দেখলাম, সিংহাসন ছেড়ে তিনি ধুলোয় বসে কাঁদছেন আর বলছেন, একজন আমার বুকে যন্ত্রণার আগুন জ্বালিয়ে ঘর ছাড়ল, এখন আর একজনও কি আমাকে ছেড়ে যাবে! আমি ও পথ দিয়ে ঘরে ফিরছিলাম, আমায় ডেকে বললেন—ওরে, আমার চোখের মণি বুকের ধন রাহুলকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আয়, তাকে বাবার কাছে যেতে দিসনে।

রাহুল— আশ্চর্য—এত বছর বাদে বাবা ফিরে এলেন, আমি একবারটি তাঁকে দেখতেও যাবনা ? তুমি পিতামহকে গিয়ে বুঝিয়ে বোল সোমদত্ত—যে রাহুল তার পিতৃধন চেয়ে আনতে গেছে। আমি চললাম—[সব দ্বিধা ভুলে দরজা দিয়ে রাহুল চলে গেল]

সোমদত্ত—বন্ধ দরজা তুমি তাহলে খুলে দিয়েছ, সুনন্দ—।

সুনন্দ—দরজা বন্ধ করেও রাহুলকে ধরে রাখা যেত না।

সোমদত্ত—ঐ সন্ন্যাসীই বোধহয় রাহুলের পিতা রাজকুমার সিদ্ধার্থ—। দেখ, সুনন্দ, লোকের ভিড় ঠেলে রাহুল কেমন ছুটে চলেছে। মণিরত্ন বসানো মুকুট কোথায় খসে পড়েছে, ছিঁড়ে গেছে গলার

হারখানি ! ওকি, সন্ন্যাসীর উত্তরীয় ধরে রাহুল কি চাইছে অমন আকুল হয়ে—।

সুনন্দ—রাহুল তার পিতৃধন পেয়েছে—বুকে চেপে ধরে সে নিয়ে আসছে এদিকে—। তুমি কি এতদূর থেকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছ সোমদত্ত—রাহুল কি ধন নিয়ে এল—?

সোমদত্ত—আমিও ঠিক বুঝতে পারছিনা—কিন্তু ও এধারেই ফিরে আসছে। মেঘের ফাঁকে উকি মারা চাঁদের মত ওর মুখটি খুশিতে ভরপুর—। [রাহুলের প্রবেশ, হাতে একটি ভিক্ষা পাত্র, মুখে হাসি]

রাহুল—আমি পিতৃধন চেয়ে এনেছি সুনন্দ—। এই ছাখো।

সুনন্দ—[চমকে উঠে] এ যে ভিক্ষাপাত্র—।

রাহুল—আমি বাবার চরণে প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ করে আমার মাথায় তাঁর হাতটি ছোঁয়ালেন—আনন্দে যেন সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। তারপর চিৎকার করে বললাম—বাবা, আমাকে পিতৃধন দাও—। আমার হাতে তখন এই পাত্র তুলে দিয়ে তিনি আবার আমায় আশীর্বাদ জানালেন। তারপর আমি ওদের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র বলতে শিখে নিলাম—

সোমদত্ত—কি সে মন্ত্র রাহুল—? আমাদের শোনাবে ?

রাহুল—(হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে) বুদ্ধই আমার শরণ, আমার শরণান্তর নাই।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

কে, মাধবা, চম্পা। আমি আজ পিতৃধনের উত্তরাধিকার পেয়েছি। তোমরা কবির কাছে আজ আনন্দের গান শিখে এসো।

মাধবী— শিখেছি। চম্পা গান ধর তাহলে—

বুকের মাঝে এলো যে আজ
আনন্দের হিল্লোল—
তোরা আকাশ বাতাস ভরিয়ে তারই
জয়ধ্বনি তোল—'
আজ সূর্য ছড়ায় উষার জ্যোতি
আলোতে হয় তার আরতি
বসন্ত আজ পূজার ফুলে।
লাগালো তার দোল—।
আজ রাত্রি গেল অনেক দূরে
ভরিয়ে ভুবন খুশির সুরে
আজ নতুন দিনের বীণায় বাজে

রাগিনী হিন্দোল।
দু চোখ ভরে যা দেখি আজ
পরেছে কোন আনন্দ সাজ
আজ ব্যথা ভোলার লগ্নে মনের
বন্ধ দুয়ার খোল।

চিড়িয়াখানা কর্‌ব আমি ভাব্‌ছি মনে মনে,
পশুশিকার কর্‌ব ব'লে চ'লে যাব বনে।
সুন্দরবনে পশু থাকে, শুনে আমার অবাক লাগে
মানুষখেকো বিশ্রী ওরা বিশ্রী বনে যাক্‌—
সুন্দরেরাই শুধু সুন্দরবনে থাক।
বনটা কি পূব দখিণে ? ব'লে দিলেই নেব চিনে
ছেলেধরা নেই তো পথে ? ঝুলি কাঁধে ডাইনি ?
ভূত প্রেত বেহ্মদত্যি, পথে ব'সে নেই তো সত্যি ?
বল্‌বে না তো, 'খাবো তোমায় ? সারাদিন খাইনি !'
এদের ছাড়া আর কাউকে ভয় কখনো পাইনি।
চলনা মা দোকান থেকে, নেব বন্দুক ছোট্ট দেখে,
ছোট হ'লেও 'গুড়ম' ক'রে ভাষণ আওয়াজ ক'রবে।
বনের সব পশু পাখি ভয়ের চোটে মরবে।
পশুশালা কর্‌তে হ'লে অঢেল পশু চাই,
উজাড় ক'রে আসব নিয়ে সুন্দরবনটাই।
খাকি প্যাণ্ট্, খাকি জামায়, দেখ্‌বে আমায় কেমন মানায় ?
পরব পুলিশের মতন ভারিক্কি এক বুট্,
'লেফ্‌ট্ রাইট' ক'রে যাব, খট্‌খট্ খট্ খুট্।
বাঘগুলো মা, দুষ্টু বড়, বেজায় বেয়াড়া,
মানুষের গন্ধ পেলেই অম্‌নি করে তাড়া—।
ভাবছো বুঝি পাব ভয় ? আমি তেমন ছেলেই নয়—
বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে ক'রব তাকে তাক্‌—
ভয়ে তখন বনবে ছাগল পেল্লায় সেই বাঘ।
সিংহ নাকি পশুর রাজা ? সত্যি নাকি ? ঠিক ?
বনের মধ্যে দুর্গ তাহার কোথায় ? কোনদিক ?
কেমন দেখতে রাজার রাণী, কোথায় বা তার রাজধানী ?
বিড়াল যেমন 'বাঘের মাসি' এর কি মাসি ব্যাঙ্ ?
বর্ষার জল পেলেই ডাকে ঘ্যাঙর্ ঘ্যাঙর্ ঘ্যাং ?
দুর্গের চারপাশ জোড়া, পরিখা কি আছে খোঁড়া
দুর্গে কত সৈন্য আছে ? কেমন তারা বীর ?
খোঁজ নিয়ে সব ভালো ক'রে ক'র্‌ব যা হয় স্থির।
থাকবে না তো রাজার জানা, এম্‌নি জোরে দেব হানা,

সুরুচি সেনগুপ্ত

খুব সহজে দুর্গটিরে ক'রব আমি জয়
বন্দী হবেন পশুর রাজা সিংহ মহাশয়।
হাতিগুলো ভয় পেলে মা, ব'লব তাদের হেসে
ভয় পাস্ নে, ভয় কি আছে তোদের ?
প্রাণে তোদের মারব নাকো নিয়ে ভালোবেসে,
রেখে দেব চিড়িয়াখানায় মোদের।
তখন তারা সাহস পেয়ে কাছে আসবে ফিরে,
আদর ক'রে শুঁড়ে তাদের হাত বুলাব ধীরে।
ধারালো দু'পাটি দাঁত ল্যাজে কাঁটার সারি
জলের মধ্যে কুমীর মশায় সুখে আছেন ভা-রি ?
টেরটি পাবেন সোনার চাঁদ, গলায় যখন দড়ির ফাঁদ
বসবে এঁটে, চক্ষু দুটো কপাল ছুঁই ছুঁই
পারবেনা ঐ দাঁতের সারি ক'রতে কিছুই।
থপ্‌থপ্‌ থপ্‌ কালো কুচ্‌কুচ্‌ গায়ে লোমের স্তূপ,
তেড়ে আসবে ভালুকচন্দ্র আহা মরি রূপ।
দড়ি দিয়ে বাঁধব তারে, আনব টেনে পথের ধারে
ডুগ্‌ডুগ্‌ডুগ্‌ বাজবে ডুগী নাচবে ভালুক ভাই,
নাচ দেখতে দলে দলে আসবে সব্বাই।
কেউটে, ময়াল শঙ্খচূড় অনেকরকম সাপ—
আনব বানর, বনমানুষ, জেব্‌রা ও জিরাফ
হরেকরকম আনব পাখি উঠবে নানা সুরে ডাকি,
কাঠবিড়ালী ছুটবে জোরে, ছুটব পিছু পিছু
মগডালেতে উঠতে হ'লেও ভয় পাবনা কিছু।
রাঙ্গা চোখ, দুকান খাড়া নরম তুল্‌তুলে,
গোটাকয়েক খরগোসকে আনব কোলে তুলে।
হরিণ ধরব গোটাকতক, গায়ে কত রংএর চটক্—
মাথার উপর সিংএর বাহার দূর্বা খুঁটে খায়,
বড় বড় কালো-চোখে ভয়ে ভয়ে চায়।
এরি মধ্যে যদি মাগো, সন্ধ্যে হয়ে আসে,
সূয্যিমামার শেষ রেখাটি ঝিক্‌মিকিয়ে হাসে
তুমি ব'সে ঘরের দাওয়ায় সন্ধ্যাবেলার মৃদু হাওয়ায়
ভাববে বুঝি খেলে খোকায় বনের পশুই শেষে,
এমন সময় কোলে তোমার ঝাঁপিয়ে পড়ব এসে।

সেদিন যা বিপদেই না পড়েছিলাম ! মনে হলে এখনও যেন হাত পা হিম হয়ে আসে। কালুর হঠকারিতা আর মালুর ভুলো মন সেই কাণ্ডটা ঘটিয়ে ছিল।

অন্ধকার গুহার মধ্য দিয়ে, কালুর হাতের ছোট একটা টর্চের আবছা আলোয়, আমরা চার বন্ধুতে চলেছিলাম। কোথাও গুহাটা এত সরু হয়ে গেছে যে পাশের দেয়ালে গা লেগে যায়, কোথাও বা এত নিচু যে পাথরের ছাদে মাথা ঠেকে যায়। আবার কোথাও মস্তবড় একটা ঘরের মতন দেখা যায়। তার মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে আমরা চলেছি। কোনদিকে চলেছি ? কে জানে, বারবার বেঁকতে বেঁকতে আমাদের একেবারে দিকভ্রম হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে দু'একটা শাখা-পথ আছে, কালু কিন্তু জানে তার মধ্যে কোনটা দিয়ে যেতে হবে, সেই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আমার বেশ ভালই লাগছিল, বেশ একটা রোমাঞ্চকর অথচ উপভোগ্য অনুভূতি হচ্ছিল। বুলু কিন্তু প্রথম থেকেই ভয় পাচ্ছিল। প্রথমে তো সে এই ব্যবস্থায় কিছুতেই রাজি হতে চায়নি। গাইড যখন পাওয়া যায়নি, তখন সে বলেছিল—'তাহলে আজ নাই গেলাম—একা একা যেতে আমার বড্ড ভয় করবে !'

কালু তাকে ধমক দিয়েছিল—'চারজনে আবার একা একা কিরে ? তাছাড়া আমিই তো পথ জানি।'

বুলু আর মুখে আপত্তি জানায় নি, কিন্তু টর্চের মৃদু আলোয় অন্ধকার গুহার মধ্যে কয়েক পা ঢুকেই সে এক চিৎকার দিয়ে আবার বাইরে চলে এসেছিল।—'ও বাবা, ঐ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যেতে হবে ! সে আমি কিছুতেই পারব না।'

কালুর সঙ্গে সঙ্গে এবার আমিও তাকে বকুনি দিলাম। কালু বলল—'তাহলে তুই গুহার মুখের কাছে বাইরে বসে থাক্—আধঘণ্টার মধ্যে আমরা ঘুরে আসছি।'

দিনটা ছিল মেঘলা-মেঘলা—মধ্যে মধ্যে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। গুহার মুখের কাছে নির্জন পাহাড়ে জায়গায় জনমানুষ ছিল না।

বুলু বলল—'ও বাবা, না-না-না—এখানে একা একা বসে থাকলে আমি হার্ট্ ফেল্ করে মরে যাব। তাছাড়া যদি কোনও কিম্বা বাঘ ভালুক

নলিনী দাশ

বেরিয়ে আসে!'—তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কালু বলল। তার কথায় আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম!

চেরাপুঞ্জিতে, লোকালয়ের এত কাছেও বুলুর এত ভয়!

মালু তার হাত ধরে টেনে নিয়ে বলেছিল—'চল্ তুই আমাদের সঙ্গেই যাবি—মনে করবি যেন একটা এ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে চলেছিস। কি জানি এই গুহার মধ্যে সত্যিই হয় তো কোনও রহস্য কোনও গুপ্তধন আছে। আমরা সেটা পেয়ে যাব—'

কালু তার কথার জের টেনে বলল—'কিম্বা কোনও যাদুকর এক রাজপুত্রকে মায়াবলে পাথর বানিয়ে রেখে দিয়েছে, আমরা তাকে উদ্ধার করব! শুরু হলে তো তোর যত আজগুবি কল্পনা!'

এবার বুলু রাজি না হয়ে পারল না। গুহার মধ্য দিয়ে যেতে যেতেও কালু মালুকে ঠাট্টা করছিল।

মালু গাল ফুলিয়ে বলছিল—'সবই বুঝি আজগুবি? এই গুহার মধ্যে কোনও রহস্য থাকতে পারে না বুঝি?'

কালুর হাতের টর্চের আলোটা ক্রমেই মিটমিটে হয়ে আসছিল। তাই সে বলল—'তোর টর্চটা দে তো বুলু!' বুলু বলল 'আমার টর্চটা তো কাল রাত্রে মালুকে দিয়েছিলাম,—দে তো মালু!'

'এই যে দিচ্ছি'—বলে মালু প্রথমে কোটের পকেটে হাত দিল, তারপরে ব্যস্ত হয়ে ব্যাগ, ঝোলা সব হাতড়াতে লাগল। 'তাই তো? টর্চটা গেল কোথায়?' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম—'মনে নেই, কাল রাত্রে তুই তোর নিজের টর্চের ব্যাটারি শেষ করে ফেললি, তারপর বুলুর টর্চ্‌টা নিয়ে গল্পের বইয়ের শেষে কয় লাইন পড়লি!'

মালু বলল—'ঐ যাঃ, তাহলে নিশ্চয় অন্ধকারে বইটা স্যুটকেসে তুলে রাখবার সময়ে ভুল করে টর্চটাও তারই মধ্যে ভরে দিয়েছি।'

কালুর টর্চের অবস্থা তখন সঙ্গীন। ব্যস্ত হয়ে সে আমাকে বলল—'বাড়তি ব্যাটারি আছে না, টুলু?'

আমি বললাম—'সেও তো স্যুটকেসে আছে—সঙ্গে নিয়ে আসার কথা তো বলিস নি। আর আমার টর্চটা তো শিলঙে থাকতেই খারাপ হয়ে গেছে।' চিন্তিতভাবে কালু বলল, 'তাহলে বরঞ্চ আমরা আরো ভিতরে নাই গেলাম, এখান থেকেই ফিরি।' তার কথা শেষ হতে না হতেই তার টর্চটা হঠাৎ একেবারে নিভে গেল আর আমরা ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে পড়লাম। বুলু একটা মৃদু আর্তনাদ করে আমাকে ধরল, তার হাত বরফের মতন ঠাণ্ডা! মালু অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে কালুর ঘাড়ে পড়ল আর দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। কালুর টর্চটা ছিটকে কোথায় যেন পড়ে গেল (অবশ্য, আপাততঃ সেটা থাকলেও আমাদের কোনও লাভ ছিল না।)

এবারে আমিও একটু ভয় পেয়েছিলাম। ঘোর অন্ধকারে আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। ডাকাডাকি করে যখন পরস্পরের কাছাকাছি এলাম আর গভীর অন্ধকারের মধ্যেও একটু সাহস পেলাম, তখন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসলাম এবার কি করা যায়।

কালু বলল—'চল্, আমরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে আস্তে আস্তে এগোই।'

আমি বললাম—'কোন দিকে এগোবি? অন্ধকারেও কি তুই ঠিক পথ চিনে আমাদের নিয়ে যেতে পারবি?'

কালু স্বীকার করল যে আচমকা হোঁচট খেয়ে পড়ে তারও একটু দিকভ্রম্ হয়ে গেছে—কোনদিক থেকে এলাম আর কোন দিকে যাচ্ছিলাম সেটা সম্বন্ধে সেও নিশ্চিত নয়, হাতড়ে হাতড়ে আন্দাজে যেতে হবে।'

মালু বলল—'তার চেয়ে— আমরা এখানেই বসে গল্পসল্প করি—আবার যখন একদল টুরিস্ট্ বেড়াতে আসবে তখন তাদের সঙ্গে জুটে বেরোন যাবে।'

আমি বললাম—'এই বাদলা দিনে যদি কেউ না আসে?'

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বুলু বলে উঠল—'দেখ ঐ দিকে কি রকম একটা অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে না? নিশ্চয় ওটাই গুহার মুখের দিক!'

অন্ধকারে অনেকক্ষণ থাকার ফলে আমরা কিছুটা অভ্যস্থ হয়ে এসেছিলাম। সবাই সেইদিকে একটু আলো দেখতে পেলাম, বরঞ্চ একে বলা উচিত আলোর আভাস। কিন্তু আমার কিনা ভারি সাবধানী স্বভাব—আমি সন্দেহের সঙ্গে বললাম—'কিন্তু, গুহার মুখের কাছে থেকে অনেকটা ভিতরে চলে এসেছিলাম না? অত দূর থেকে কি বাইরের আলো দেখা যেতে পারে?' কালু কিন্তু ততক্ষণে বিনা বাক্যব্যয়ে রওনা হয়ে পড়েছে—এবার বলল, 'চল্ না দেখি ওখানে কি আছে।' অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আমরা যতই এগোতে লাগলাম আলোটা ততই স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। হঠাৎ একটা মোড় ঘুরেই দিনের আলো দেখতে পেলাম—মাথার উপরে মস্ত বড় একটা ফাঁক, অনেক উঁচুতে গাছপালা দেখা যাচ্ছে, পাখির গানও শোনা যাচ্ছে। আকাশ মেঘে ঢেকে আছে, কিন্তু বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে গেছে।

কালু বলল—'তাই তো—এই জায়গাটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। টুরিস্টরা এই পর্যন্তই আসে, এরপর গুহাটা কোনদিকে কত দূর গেছে কেউ জানে না। কেউ কেউ অবশ্য এতদূরও আসে না, গুহার মুখের কাছে একটু দেখেই ফিরে যায়।' 'আমরাও তাই গেলে পারতাম!' কাতর স্বরে বলল বুলু। কিন্তু এখন আর সে কথা ভেবে লাভ কি? দিনের আলো, গাছের পাতা আর পাখির গানে কিছুক্ষণের জন্য আমরা সবাই বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

আমি হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললাম—'ওরে বাবা, নটা তো এখানেই বাজল! নটার মধ্যে না আমাদের বাড়ি ফিরবার কথা ছিল? তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে না সাইলেন্ট্ রিভার দেখতে যাবার কথা? কাল যদি সত্যিই শিলঙ ফিরে যাই, তাহলে তো আর সময় নাই।'

কালু বলল—'তাই তো বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে, চল্ না আমরা অন্ধকারের মধ্য দিয়েই আস্তে আস্তে বেরোবার চেষ্টা করি।'

বুলু বলল—'আমাকে কেটে ফেললেও আমি আলো ছাড়া ও-পথে যেতে পারবো না!'

আমিও ভয় পাচ্ছিলাম—'ভুল করে যদি কোনও শাখা-পথে ঢুকে পড়ি?'

মালু বলে উঠল—'তাহলে একটা বেশ নতুন এ্যাডভেঞ্চার হবে—আমরা হয়তো একটা নতুন দেশই আবিষ্কার করে ফেলব, যেখানে কেউ আগে যায় নি—' কিন্তু বুলু এই সম্ভাবনায় আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল। কালু মালুর কাঁধদুটো ধরে মৃদু একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল—'রাখ্ তোর হয়তো আর যদি, একটা এমন বুদ্ধি ভেবে বার কর্ যেটাকে সত্যি কাজে লাগানো যেতে পারে।'

মালু বলল—'আচ্ছা, আমরা ওপর দিয়ে বেরোতে পারি না? বেশ পাহাড়ের একটা নতুন দিকও দেখা হবে।'

আমি হেসে বললাম—'ডানা মেলে উড়বি বুঝি?'

কালু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাথার উপরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল—'ঐ গাছটার গোড়ায় যদি আমার দড়ির মইটা বাঁধতে পারতাম!'

কিন্তু, কোথায় সে মই, আর বাঁধবেই বা কি করে? এখানে গুহাটা এত উঁচু যে আমরা চারজনে এ-ওর মাথায় দাঁড়ালেও তার ছাদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আর দেয়ালগুলি এত খাড়া যে তাই বেয়ে একমাত্র টিকটিকি ছাড়া, কোনও প্রাণীর পক্ষে ওঠা সম্ভবপর নয়! দেয়ালের গায়ে দুদিকে আরো দুটো সুড়ঙ্গ আছে। কিন্তু সেগুলোর মুখ একটু সরু আর অনেকটা উঁচুতে। কালু বলছিল যে তার খুব ইচ্ছা করে ঐ সব সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকে দেখে আসবে কত দূর পর্যন্ত সেটা গেছে।

বুলু বলল—'ও বাবা, আমি তো হাজারটা টর্চ্ সঙ্গে নিয়েও ঐ অচেনা পথে যেতে রাজি নই!'

'তাহলে চেনা পথেই ফিরে চল্'—কালু বুলুকে বুঝিয়ে শুনিয়ে হাত ধরে আবার গুহার পথে দুচার-পা এগোল।

মালু আরো খানিকটা এগিয়ে গেল—ডেকে জিজ্ঞাসা করল—'গুহাটা যে দুভাগ হয়ে গেছে—ডানদিকে যাব না বাঁদিকে?'

'দুটো মুখ আবার এক হয়ে গেছে'—ডেকে বলেছিল কালু। কিন্তু, কে তার কথা শোনে! গুহা দু' ভাগ হবার নাম শুনে বুলু তার হাত ছাড়িয়ে আবার সেই ঘরের মতন খোলা জায়গাটায় পালিয়ে গিয়েছিল।

অগত্যা আমাদের সবাইকেই ফিরে আসতে হল। কালু বুলুকে বকতে লাগল।

বুলু কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল—'আমি কি করব বল্? ডাক্তার যে বলেছেন আমার ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে—কখনও কোনও অন্ধকার বা বন্ধ জায়গায় যাওয়া উচিত নয়! আমি তো প্রথম থেকেই আসতে চাইনি—কেন তোরা আমাকে জোর করে নিয়ে এলি?'

বুলু গুহা দেখতে যাবার নাম শুনে বাড়িতেই বসে থাকতে চেয়েছিল, আমরাই ওকে বুঝিয়ে রাজি করিয়ে নিয়ে এসেছিলাম! কিন্তু সেকথাও এখন ভেবে লাভ নেই।

আমাদের সকলেরই দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে ততক্ষণে। অন্যদিন কিছু রসদ সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোই, কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি ফিরবার কথা ছিল বলে কিছুই প্রায় সঙ্গে আনিনি। সকলের পকেট ও ব্যাগ ঝেড়ে ঝুড়ে বেরোল কয়েকটা টফি, কিছু চিনে বাদাম, ছোট এক ঠোঙা (একটু মিইয়ে যাওয়া)

ডালমুট, ক'টা বিস্কুট, দেড়খানা ছোট কেক্ আর পৌনে-দুখানা আপেল (মালু একটার থেকে কয়েক কামড় খেয়ে ফেলেছিল) ভাগাভাগি করে চারজনে তাই খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করলাম। এবার ? এবার কি করা যাবে ?

মালু অনেকক্ষণ চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসেছিল, কি যেন ভাবছিল।

হঠাৎ সে বলে উঠল—'আমার কিন্তু মনে হয় যে এই গুহার মধ্যেই অনেক রহস্য লুকোন আছে। কত কি এখানে ঘটেছে, ঘটবে, হয় তো বা এখনই ঘটতে চলেছে—'

কালু তাকে ঠাট্টা করে একটা কড়া জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল, কারণ ঠিক তখনই শুনতে পেলাম যে একটি মেয়ে গুহার ভিতর থেকে ভীতস্বরে চিৎকার করে উঠল।

কালু তো সেই মুহূর্তেই অনুসন্ধান করতে ছুটেছিল, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিলাম—'ব্যাপার কি না বুঝে এভাবে ছুটে যাস না—।'

এবার আমরা একটা গম্ভীর মোটা গলার আওয়াজ পেলাম, আবার অন্য একটি লোকের গলা, কিন্তু কারো একটাও কথা বুঝতে পারলাম না।

আবার মেয়ের কণ্ঠস্বর—বোধ হয় সেই মেয়েটিরই।

মালু উত্তেজিত ভাবে ফিস ফিস করে বলে উঠল—'ওকি, ও কার গলা! ও কার গলার আওয়াজ ?'

আমার কাছেও কণ্ঠস্বরটা চেনা চেনা বোধ হয়েছিল, কিন্তু ভাল করে বুঝতে পারলাম না।

তারা বোধ হয় আমাদের কাছাকাছি এসে পড়েছিল, কারণ গুহার মধ্যে থেকে তাদের মশালের আলোর আভাস পাচ্ছিলাম, গলার আওয়াজও ক্রমে আরো স্পষ্ট হচ্ছিল।

মেয়েটির কথা বোঝা গেল না, কিন্তু কথা শেষ হতে না হতেই কে-যেন বিকট স্বরে 'হা-হা হা-হা' করে এমন হেসে উঠল যে কালু পর্যন্ত থমকে গেল।

ভয়ের চোটে বুলুর মুখ শাদা হয়ে গিয়েছিল আর উত্তেজনায় মালু ঠকঠক করে কাঁপছিল।

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল—'এই তো সুযোগ! এই নির্জন জায়গায় যদি আজ ভবলীলা সাঙ্গ করে দিই ?'

তাকে বাধা দিয়ে আবার কে যেন সন্ত্রস্তভাবে বলল—'আরে চুপ, চুপ—কে কোথা দিয়ে শুনতে পাবে!' কি সাংঘাতিক সব কথাবার্তা ? কে এরা ? কি করতে চায় ? কোন গুণ্ডাদলের পাল্লায় পড়লাম নাকি ? কি দুঃসাহসী মেয়ে আমাদের কালু! আমি তার হাত দুটো শক্ত করে ধরে না রাখলে সে বোধ হয় একাই, শুধু হাতে, ঐ অচেনা মেয়েটিকে গুণ্ডার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য অন্ধকার গুহার ভিতর ছুটে যেত! ওরা কতজন আছে কে জানে, হয়তো বা অস্ত্রশস্ত্রও থাকবে ওদের সঙ্গে। সত্যিই যদি ওরা গুণ্ডা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কটি স্কুলের মেয়ে শুধু হাতে ওদের সঙ্গে কি করে এঁটে উঠতে পারব ?

মেয়েটির গলার আওয়াজ আর শুনতে পেলাম না। সে কি ওদের হাত এড়িয়ে নিরাপদে বাইরে

বেরিয়ে গেছে ? না কি—? সেই বিশ্রী সম্ভাবনাটা ভাবতেও আমাদের খারাপ লাগছিল। বুলু ভয়ে ভয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল—'লোকগুলি যদি আমাদের দিকেই আসে তাহলে কি হবে ?'

আমাদের সকলের মনেই এই আশঙ্কা জাগছিল। তবু কালু মুখে সাহস দেখিয়ে বলল—'দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাক্, ওরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত আছে, আমাদের দিকে নজর দেবার ওদের সময় নেই।'

লোকগুলি কিন্তু আমাদের দিকে এলনা, তাদের পায়ের শব্দ আর মশালের আলো ক্রমে দূরে যেতে আর অস্পষ্ট হতে লাগল। প্রথমে আমরা সবাই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। পরক্ষণেই কালু ব্যস্ত হয়ে, ফিসফিস করে বলল—'শিগগির !—তাড়াতাড়ি ওদের পিছন পিছন চল্। ওরা যাতে আমাদের দেখতে না পায় এই ভাবে, একটু দূরত্ব রেখে রেখে আমরা ওদের মশালের আলোর সাহায্যে বেরিয়ে যেতে পারব।'

সত্যি! নতুন পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের মূল বিপদের কথাই ভুলতে বসেছিলাম! গুণ্ডাদলের পিছন পিছন যেতে যতই ভয় লাগুক না কেন, আমরা সবাই মনে মনে স্বীকার করলাম যে এছাড়া আর আমাদের গুহার বাইরে বেরোবার অন্য কোনও উপায় নাই !

মেয়েটির গলার আওয়াজ আর পেলাম না। অন্য লোকগুলি চাপা-গলায় কথা বলতে বলতে এগচ্ছিল—কি বলছিল বুঝতে পারছিলাম না! তারা কি সত্যিই মেয়েটির বিরুদ্ধে কোনও সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র করছিল ? বোঝা গেল না।

যতই আমরা গুহার মুখের কাছে আসছিলাম, ততই কালুর সাহস বাড়ছিল, সে একটু একটু করে লোকগুলির কাছাকাছি যাচ্ছিল। তারা গুহার বাইরে বেরোতে না বেরোতেই কালু দৌড়ে গুহার মুখের কাছে চলে গেল, তার ঠিক পিছন পিছন মালু। বুলু আর আমিও একটু পরেই গুহা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। দূরে রাস্তায় দেখতে পেলাম একটি ছাইরঙের গরম স্যুট পরা, লম্বা চওড়া, লোক একটা কালো গাড়িতে চড়ছে, কালো চশমা পরা আর গলায় মাফলার জড়ানো থাকাতে তার মুখটা ভাল করে দেখা গেল না। আরো একটি কালো, দারুণ ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারার লোক ছিল, তার মুখ দেখতে পাই নি। গাড়ির ভিতর ছিল একটি মহিলা আর আরো একটি কি দুটি ভদ্রলোক। আমরা ভাল করে গুহা থেকে বেরোতে না বেরোতেই গাড়িটা শোঁ করে বেরিয়ে চলে গেল। মহিলাটির মুখ দেখতে পেলাম না কেবল বাসন্তী রঙের সিলকের সাড়ির একটু আভাস পেলাম।

মালু কিন্তু হঠাৎ—'দিদি, দিদি, অণিমাদি' বলে ডেকে গাড়ির দিকে ছুটে চলল।

কালু বলল—'ভাগ! এর মধ্যে আবার দিদিকে পেলি কোথায় ? তুই আজকাল বড় বেশি কল্পনা করছিস!'

মালু এবার কেঁদেই ফেলল—'তোরা অণিমাদিকে চিনলি না ? আমি তো গুহার মধ্যে তাঁর গলার আওয়াজ শুনেই চিনে ফেলেছি! ওই সাড়িটাই তো দাদু ওঁকে গত জন্মদিনে দিয়েছিলেন।'

কালু আবার বলল—'মেয়ের চোখ নয় যেন মোসমাই জলপ্রপাত! ওরকম সাড়ি কি দুনিয়ায় ঐ একটিই আছে ? থাম্ দেখি এখন—একটু ভাবতে দে!'

আমি বললাম—'মহিলাটি অণিমাদি হোন আর নাই হোন, লোকগুলি গুণ্ডা কিনা সেটা জানা দরকার। ওদের কাছে কোনও অস্ত্রশস্ত্র দেখেছিলি ?'

বুলু ভীতভাবে বলল—'হাতে কিছু দেখিনি, কিন্তু ওদের পকেটে নিশ্চয় ছোরা আর পিস্তল আছে !'

আমি বললাম—'তাছাড়া, ওরকম অদ্ভুত অদ্ভুত কথাই বা ওরা বলছিল কেন ? ভাল স্যুটই পরুক আর বড় গাড়িই হাঁকাক, ওদের কথাবার্তা তো ভদ্রলোকের মতন নয় !'

কালু বলল—'সেই জন্যই তো আমাদের উচিত ওদের পিছু নেওয়া।'

বুলু এই কথায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেল—'নানা—ওসব কিছুতে দরকার নেই ! তার চেয়ে চল্ আমরা থানায় খবর দিই, কিম্বা বাড়ি গিয়ে মাসিমা-মেসোমশাইকে সব কথা খুলে বলি !'

মালু হেসে ফেলল !—আমি বললাম 'কি বলবি শুনি ? বলবি যে ক'টি অজানা লোক, একটি অচেনা মেয়েকে ভয় দেখাচ্ছিল, আর তারপর একটা অচেনা গাড়িতে চড়ে কোথায় যেন চলে গেল ? সবাই তাহলে আমাদের পাগল বলবে না ?'

কালুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল—'আগে আমরা ওদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করি তারপরে যাওয়া যাবে পুলিশের কাছে। গাড়িটা কোন দিকে গেল লক্ষ্য করেছিলি ?'

আমাদের মনে হয়েছিল যেন গাড়িটা বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে গেল, আমরাও তাই সেই দিকে পা-চালিয়ে চললাম। এখন কিন্তু আর তেমন ভয় করছিল না—যদি বা লোকগুলির কাছে ছোরা আর পিস্তল থাকে, লোকালয়ের কাছাকাছি নিশ্চয় তারা কিছু করতে সাহস করবে না।

বাস্ স্ট্যাণ্ডের কাছে একটি ফলের দোকানে গিয়ে কালু চারটে আপেল কিনল—দাম দিতে দিতে গল্পচ্ছলে জিজ্ঞাসা করল—'আমার এক দিদি একটা কালো রঙের গাড়িতে এই দিকেই আসছিলেন—দেখেছো কি ?'

ফলওয়ালা বলল—'কি জানি, কতই কালো মোটর তো সারাদিন চলছে—লক্ষ্য করিনি।'

এরপরে আমরা এক চিনাবাদামওয়ালার কাছে কিছু বাদাম নিলাম। তাকেও কালু ঐ একই প্রশ্ন করল, কিন্তু এখানেও সদুত্তর পেল না।

তারপরে আমরা ঢুকলাম একটা ছোটখাট চায়ের দোকানে।

একটি বাচ্চা ছেলে হন্তদন্ত হয়ে চা দিচ্ছিল আর একটি পেট মোটা লোক (বোধহয় দোকানদার) রাস্তার দিকে চেয়ে গোঁফ মোচড়াচ্ছিল।

কালুর কথার জবাবে সে কেমন যেন ধূর্তভাবে কালুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—'সেই কালো গাড়িতে আপনাদের কি দরকার ?'

কালু আবার তার 'দিদির' নাম করতে যাচ্ছিল, আমি তাকে ইসারা করে সাংকেতিক ভাষায় বললাম—'সাসারামের বরকন্দাজ ধানবাদেতে নমস্কার !'

কালু জবাব দিল—'আরামবাগের গেলাসে ইষ্টক বোলবোলা ঝাড়সুগুডায় গেরস্তের ছেলেপুলে !'

দোকানের ছোকরাটি বারবার আমাদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছিল—দোকানদার তাকে এক ধমক দিল—'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন পচা, কাজ কর্ম নেই ?'

ব্যস্ত হয়ে ছোকরা আবার ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল।

—হঠাৎ মালু চাপাগলায় বলে উঠল—'ঐরাবতের তোষাখানায় ওরাংওটাং রামছাগল !'

দোকানের ভিতর থেকে দুটি লোক বেরিয়ে আসছিল, প্রথমে তারা হকচকিয়ে আমাদের পাশে থমকে দাঁড়াল, তারপরে হনহনিয়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল ! আমাদের সাংকেতিক ভাষা শুনেই কি তারা ঘাবড়ে গেল ? নাকি তাদের থমকাবার আরো গুরুতর কোনও গোপন কারণ আছে ?

আমাদের সাংকেতিক ভাষাটা খুবই সোজা। প্রত্যেক কথার প্রথম অক্ষরগুলি ভেবে দেখলেই অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু, যে এই সংকেত না জানে তার কাছে এই সব কথাবার্তাকে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এই লোকগুলি কি সত্যিই তারাই ? ছাই রঙের স্যুটপরা লোকটির মুখ আগের বার ভাল করে দেখতে পাই নি। কালো, রোগা, লম্বা, ঝাঁকড়াচুল অন্য লোকটি কি তখন ওদের সঙ্গে ছিল না, না আগেই গাড়িতে গিয়ে বসেছিল ? সর্দার গুণ্ডাটি কোথায় গেল ? (মানে, আমরা যাকে সর্দার বলে ভেবে নিয়েছি) মহিলাটিই বা কোথায় এখন ?

লোকেদের মনে সন্দেহ না জাগিয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরাও দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বেশ কিছুটা দূরে একটা কালো এ্যাম্বাসাডার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল,—মনে হল সেই গাড়িটাই।

গুণ্ডা-চেহারার লোকটিকে দেখে স্পষ্টই চিনলাম। মহিলাটিও বসেছিলেন ভিতরে, তবে তাঁর মুখ আমরা ভাল করে দেখতে পাবার আগেই সেই ছাই-রঙের স্যুট পরা আর রোগা-লম্বা ঝাঁকড়াচুল লোকদুটি গাড়িতে উঠে বসল, আর গাড়িটা আবার আমাদের বোকা বানিয়ে চলে গেল ! কোন দিকে গেল সেটা অবশ্য এবার স্পষ্টই দেখলাম, কিন্তু

ঐরাবতের তোষাখানায় ওরাংওটাং রামছাগল

পায়ে হেঁটে কি আর মোটরের পিছু নেওয়া যায় ?

'গাড়ির নম্বর লক্ষ্য করেছিলি ?'—জিজ্ঞাসা করলাম।

কালু উত্তর করল—'গৌহাটির গাড়ি—৫-২ কত যেন—শেষের নম্বর দুটো ভাল করে বুঝতে পারলাম না।'

কথা বলতে বলতে যেই আমরা পথের একটা বাঁক পেরিয়েছি, অমনি হঠাৎ ধুপধাপ শব্দে তাকিয়ে দেখি দোকানের সেই ছোকরাটি হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আসছে, আর হন্তদন্ত হয়ে আমাদের ডাকছে !

আমরা থেমে তার দিকে তাকাতেই সে তড়বড় করে বলতে লাগল—'হেই দিদি, তোমরা সেই সোন্দর-মতন দিদিমণিকে খুঁজছ না ? সেই দিদিই তো আমাকে একটা কাগজে মোড়া বিলিতি মেঠাই দিয়েছিল।'

কালু বলল—'বাঃ, তুমি তো ভারি চালাক ছেলে—তুমি যদি আমাদের দিদির খবর দিতে পার তাহলে আমরা তোমাকে দুটো বিলিতি মেঠাই দেব।' আনন্দে ছেলেটির চোখদুটো চক চক করে উঠল।

মালু জিজ্ঞাসা করল— 'দিদিমণির নাম কি পচা ?'

পচা মাথা চুলকিয়ে বলল—'নাম তো আমি জানিনি দিদি, কিন্তু মালিক সব জানে—'

'মালিক জানে ? তাহলে আমাদের বলল না কেন ?'

'হ্যাঁ দিদি, মালিক সব জানে ! তেনাদের বাড়িতে যে রামসিং পাহারাদারি করে সে তো মালিকের দোস্ত্ !—হুই যে বাগান-ওয়ালা বড় লালবাড়িটা'

'পচা—প—চা—আ—'

দূর থেকে মালিকের ডাক শুনেই পচা চুপ করে গেল, তারপর মালুর হাত থেকে দুখানা টফি নিয়েই একছুটে আবার দোকানের দিকে ফিরে যেতে যেতে বলে গেল—'আমি সব খবর দোব। আপনারাও খুব ভাল—'

বুলু ফিস ফিস করে বললে—'আমার ভয় করছে—আর এখানে আসিস না ! দোকানদারটা ওদের চর নাকিরে ?'

কালু কঠিনস্বরে উত্তর দিল—'সম্ভবতঃই, কিন্তু সেই জন্যই তো আমাদের এখানে আবার আসতে হবে।'

আমি বললাম—'একবার তো বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া করতে হয়, নাহলে তোর মাসিমা মেসোমশাই চিন্তা করবেন—'

কালু বলল—'চল্ সেইদিকেই যাই, পচার কথায় মনে হল যে সেই লাল বাড়িটা ওই পথেই পড়বে।'

পচার বর্ণনা যদিও মোটেই স্পষ্ট ছিল না, তবু আমাদের সেই বাড়িটা খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধা

হয় নি, কারণ ওদিকে বাগান-ওয়ালা লাল বাড়ি ঐ একটা মাত্রই ছিল। বাড়ির দরজা-জানালা সব বন্ধ, ছিল, কেবল গ্যারেজটা ছিল খোলা এবং খালি।

বুলু ভয়ে বাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, ভিতরে ঢুকতে রাজি হল না, অগত্যা তাকে সাহস দেবার জন্য, আমাকেও দাঁড়াতে হল। কালু আর মালু বাড়ির কাছে গিয়ে বারবার কড়া নাড়তে লাগল, কিন্তু কারো কোনও সাড়াশব্দ পেল না। কি ব্যাপার? আমরা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি।

এমন সময়ে বাগানের পিছন দিক থেকে চোখ মুছতে মুছতে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এল বেলাতেও তার রাতের ঘুম ভাঙেনি, না এত সকালেই তার দিবানিদ্রা শুরু হয়ে গেছে ঠিক বুঝে পারলাম না! জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সেই হল বাড়ির দারোয়ান (চায়ের দোকানের মালিকে দোস্ত) রাম সিং। অগত্যা সেই আধঘুমন্ত রাম সিংকেই জেরা শুরু করলাম আর তার ফলে কিছু সংবাদও সংগ্রহ করতে পারলাম—

(১) এই বাড়িটা সাধারণতঃ তালা বন্ধই থাকে।

(২) বাড়ির মালিক শিলঙ না গৌহাটি কোথায় যেন থাকেন—রামসিং ভাল করে জানে না।

(৩) গতকাল বিকালে তিনটি ভদ্রলোক ও এক মহিলা একটা কালো রঙের মোটর নিয়ে এসেছেন।

(৪) মালিকের চিঠি পেয়ে রাম সিং তাঁদের ঘর খুলে দিয়েছে, খাবার-দাবার জোগাড় করে দিয়েছে।

(৫) আজ সকাল থেকে তাঁরা মোটর নিয়ে ঘুরছেন অনেক খাবার তৈরি করে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন।

(৬) চেরাপুঞ্জি ছেড়ে তাঁরা চলে যান নি, কারণ তাঁদের মালপত্র সব এখানেই রয়েছে।

এঁরা কারা? কোথা থেকে এসেছেন? কতদিন থাকবেন? এরপরে কোথায় যাবেন?

এ সব প্রশ্নের কোনও উত্তরই রাম সিং দিতে পারল না—সে নিজেই নতুন কাজে লেগেছে, এদের কাউকে কোনও দিন দেখেনি, বাড়ির মালিককেই মাত্র একবার দেখেছে!

এবার আমরা বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। সকাল নটার বদলে বেলা একটা বাজিয়ে আমাদের ফিরতে দেখে মাসিমা বকুনি দেবেন বলে আশঙ্কা করছিলাম। কিন্তু সে বিষয়ে ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন ছিল। হঠাৎ এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যাবার দরকার হওয়াতে মাসিমা কাঞ্ছির কাছে আমাদের খাবার-দাবার ব্যবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে সকাল-সকাল বেরিয়ে গেছেন। ওদিকে কাঞ্ছি সেই সুযোগে, আমাদের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে, নিজের ঘরে লম্বা এক ঘুম লাগিয়েছে!

আমরা তার ঘুম না ভাঙিয়ে, স্টোভ জেলে খিচুড়ি মাংস গরম করলাম। কোনও মতে একটু মুখ-হাত ধুয়ে এসে খেতে বসেই ভাল করে বুঝতে পারলাম কি ক্ষিদেটাই না পেয়েছিল! খিচুড়ি, চপ, মাংস—যা যা ছিল, সব শেষ করে ফেললাম,। কালু চার বাটি পায়স বার করল, তাও খেয়ে ফেললাম!

একটিন কুচো নিমকি আর বড় একখানা কেকও ছিল, (বোধ হয় আমাদের বিকেলের খাবার জন্য)—কালুর নির্দেশ-মতন সেগুলি আমরা আমাদের সঙ্গের ঝোলাতে পুরে নিলাম। কালু স্যুটকেস্ খুলে বুলুর টর্চ্ আর দুটো বাড়তি ব্যাটারি নিতে ভুলল না। আবার ঝোলার মধ্যে ভরে সে ক্যামেরা, ম্যাগনিফাইং গ্লাস ও দূরবীন নিল। দুখানা ছুরি আর, মস্ত বড় একখানা লাঠিও সঙ্গে নিল। বুলু তো ভয়ে অস্থির—'ও বাবা—তুই কি মারামারি করবি! আমাদেরই ছুরি কেড়ে নিয়েই যদি ওরা আমাদের মারে!'

কাঞ্চি ঘুমথেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে যতক্ষণে এসেছে, তখন আমরা আবার বেরোবার জন্য প্রস্তুত। তাকে বলে দিলাম যে আমাদের ফিরতে হয় তো একটু সন্ধ্যা হবে, মাসিমা যেন চিন্তা না করেন।

'এবার কোথায় যাব?' জিজ্ঞাসা করল মালু।

কালু বলল—'ছাখ্, ওরা কোনদিকে গেছে সেটা সঠিক জানবার যখন কোনও উপায় নাই, তখন আমাদের যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে কোন্ কোন্ দিকে ওরা যেতে পারে—'

আমি বললাম—'এটুকু তো বোঝা গেছে যে ওরা আসলে যে রকম চরিত্রের লোকই হোক আর যে মতলবেই এসে থাকুক, বাইরে ওরা টুরিস্ট্ ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

কালু খুশি হয়ে বলল—'বাঃ, চমৎকার, এই ভাবেই আমাদের চিন্তা করতে হবে—বলে যা—'

মালু বলল—'তা হলে আমাদের এখন ভেবে দেখতে হবে ট্যুরিস্ট্রা সাধারণতঃ কোথায় কোথায় যায়'—

বুলু বলল—'কোথায় আবার যাবে—আমরা নিজেরা যেখানে যেখানে যাব প্ল্যান করছি—যেমন ঐ গুহাগুলি সাইলেণ্ট্ রিভার্. মোসমাই ফল্স্—'

কালু ততক্ষণে রওনা হবার জন্য পা বাড়িয়েছে—'মোসমাই তো আর হেঁটে যাওয়া যায় না, চল্ আমরা সাইলেণ্ট্ রিভারের দিকেই চলি। ওদের দেখা যদি নাও বা পাই, অন্ততঃ সেই সুন্দর নদীটা তো তোদের দেখা হবে।'

এই নদীটা চেরাপুঞ্জির একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য। উপত্যকার মধ্য দিয়ে কুলকুল করে বয়ে এসে নদীটি নিঃশব্দে একটা পাহাড়ে গুহার মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পাহাড়ের অন্য পাশ দিয়ে, অনেক দূরে, বেরিয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। কিন্তু এখান থেকে সেটা বোঝা যায় না বলে নদীটাকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়। এই জন্যই এই সাইলেণ্ট্ রিভারের বিষয়ে নানারকম গল্প শোনা যায়। চেরাপুঞ্জির গুহার কোনও শাখার সঙ্গে নাকি ভিতর ভিতর এই নদীর যোগ আছে। কোন দুর্দান্ত ডাকাত নাকি পুলিশের তাড়া খেয়ে গুহার মধ্যে ঢুকেছিল, পুলিশে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পায়নি, কিন্তু অন্য লোকে তাকে এই নদীর জল থেকে উঠে আসতে দেখেছে।

নদীর রহস্যের কথা আলোচনা করতে করতে আমরা কিছুক্ষণের জন্য আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়ে ভুলেই গিয়েছিলাম।

পাথর থেকে পাথরে লাফাতে লাফাতে নদীর জলের সঙ্গে সঙ্গে গুহার দিকে চলেছিলাম। কালু আর মালু এগিয়ে গিয়েছিল, বুলু আর আমি ছিলাম একটু পিছনে। হঠাৎ কালু ডেকে জিজ্ঞাসা করল—'এভারেস্টের রাত্রিবাস ইচ্ছাপূর্বক কিম্বদন্তী তাসমানিয়ার রামছাগল?'

এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা সে এমন গম্ভীর ভাবে বলতে থাকে, হাসি চাপা মুস্কিল হয়ে পড়ে!

রোগা লম্বা ঝাঁকড়াচুল আর হাসি-খুশি ছাই-রঙা-স্যুট ভদ্রলোক দুটিকে চিনতে আমাদের একটুও অসুবিধা হল না। গল্প করতে করতে তারা নদীর ধার দিয়ে গুহার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছিল। আমাদের দেখে একটু থমকে দাঁড়াল, ঝাঁকড়া চুল ছাই-রঙা স্যুটকে কি যেন বলল, তারপর তারা লম্বা পা চালিয়ে রাস্তার দিকে চলে গেল।

আমি বললাম—'তাস্‌মানিয়ার রামছাগলের ইচ্ছাকে তোষামোদ।'

বুলু জিজ্ঞাসা করল—'মহেঞ্জদারোতে হিমালয়-লাহেরিয়াসরাই—কোনারক—থানকুনি?'

তার কথা শেষ হতে না হতেই মালু, সাংকেতিক ভাষা ভুলে গিয়ে, চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—'ঐযে, ঐযে—ঐ—ঐ—' বলেই রাস্তার দিকে ছুটতে আরম্ভ করল। একটা ঝোপের পিছনে সেই কালো গাড়িটাই দাঁড়িয়েছিল, আমরা আগে লক্ষ্য করিনি। আমাদের কি করা উচিত বুঝে দেখবার আগেই লোক দুটি গিয়ে গাড়িতে চড়ল—আর গাড়িটা তক্ষুনি স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। এত তাড়াতাড়ি সমস্ত ব্যাপারটা ঘটলো যে কালু খেয়াল করে দূরবীন বার করতে পারলোনা। ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে গাড়িটা যখন বড় রাস্তা দিয়ে গেল তখন আমরা সেই গুণ্ডাটির পাশে বসে থাকা অণিমাদিকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ইনি যদি অণিমাদি না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের চোখকে আর জীবনে কখনও বিশ্বাস করতে পারব না। অবিকল সেই চোখ-মুখ, চুল, চেহারা, গায়ের রঙ—এমন কি চুল বাঁধার ধরণ আর বাসন্তীরঙের ঐ সিল্কের সাড়িটা পর্যন্ত ঠিক অণিমাদির মতন। কিন্তু, ইনি যদি অণিমাদি হন, তাহলে আমাদের কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ চেরাপুঞ্জিতে এসেছেন কেন আর এই গুণ্ডাদের সঙ্গেই বা ঘুরছেন কেন? মণিকাদিই বা কোথায়? অণিমাদি একা কেন?

দুবার একটু কাছ থেকে দেখবার ফলে আমাদের ছাই-রঙা স্যুট আর ঝাঁকড়া চুল লোক দুটি গুণ্ডা কিনা সে সম্বন্ধে মনে খটকা লেগেছে। তাদের চেহারা, কথাবার্তা সবই বেশ ভদ্রলোকের মতন (অবশ্য তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।)

কিন্তু—ঐ ষণ্ডা-মার্কা কালো লোকটিকে দেখলেই তো গুণ্ডা বলে মনে হয়! সে গুহার মধ্যে ওরকম সাংঘাতিক কথাবার্তাই বা বলেছিল কেন?

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে কথাগুলি সেই বলেছিল। তাছাড়া অন্যদের গলার স্বর অন্যরকম। এখনই বা সব সময়ে অণিমাদিকে পাহারা দিয়ে সে পাশে পাশে ঘুরছে কেন? তবে কি সত্যিই তার কোনও খারাপ মতলব আছে? গুহার মধ্যে কোনও কারণে কাজ হাঁসিল করতে পারেনি তাই আবার সুযোগ খুঁজছে?

মালু মন খারাপ করে একটা পাথরে বসে পড়েছিল।

কিন্তু, কালু দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে বলল—'এবার আমারও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে ইনিই অণিমাদি। এখন আমাদের উচিত সোজা ওঁদের বাড়ি গিয়ে দেখা করা। অণিমাদিকে ওদের কাছ থেকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসতে হবে আজই, আর একদিনও দেরী করা উচিত হবে না।'

যতই পা চালিয়ে যাই না কেন, সাইলেণ্ট্ রিভারের ধার থেকে সেই বাগানবাড়িটার কাছে আসতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগল। দূর থেকে যেই বাগানবাড়িটা দেখা গেল তখনই লক্ষ্য করলাম যে কালো গাড়িটা বাড়ির ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আর রাম সিং ঘর থেকে বাক্স-বিছানা এনে ক্যারিয়ারে বোঝাই করছে।

কাতরভাবে মালু বলে উঠল—'ও কালু—ওরা যে পালিয়ে যাচ্ছে, চেরাপুঞ্জি ছেড়ে যে চলে যাচ্ছে!' কালু বিনা বাক্যব্যয়ে দৌড়তে সুরু করল, আমরাও তার পিছন পিছন ছুটলাম।

কিন্তু প্রাণপণে ছুটলে হবে কি? আমরা বাড়িতে পৌঁছবার অনেক আগেই গাড়িটা ফটক দিয়ে বেরিয়ে বাস্ স্ট্যাণ্ডের দিকে চলে গেল। এবারেও অণিমাদি আমাদের দেখতে পেলেন না, কারণ তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

যতক্ষণ আমরা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পৌঁছলাম, তখন রামসিং ফটক বন্ধ করছে। আমাদের দেখে সে বিশ পাটি দাঁত বের করে বলল—'বাবুরা তো চলে গেলেন, দিদি!'

'দুপুরে আমাদের বলনি কেন সে কথা?'

'আমি নিজেই কি জানতাম যে বলব? বেড়িয়ে ফিরে এসেই বাবুর সে কি তাড়া—বাক্স তোল্! বিছানা বাঁধ্!—চা-টা কিছু চাই না—দেরী হয়ে যাবে—খাবার দাবার সময় নাই।'

'কোথায় গেলেন ওঁরা।' জিজ্ঞাসা করল কালু।

কিন্তু রামসিং আমাদের আর কোন খবরই দিতে পারল না।

ওদের এইভাবে চেরাপুঞ্জি ছেড়ে হঠাৎ চলে যাওয়াটাই বিশেষ সন্দেহজনক নয় কি? আমরা ওদের পিছু নিয়েছি দেখেই কি ওরা পালাল? ওরা যদি সাধারণ ভাল লোকই হবে, তাহলে পালাবে কেন?

কালু বলল—'চল্, আবার বাস্ স্ট্যাণ্ডে যাই, ওদের ধরতে না পারি, অন্ততঃ কিছুটা খবর হয়ত পাব।'

—নিশ্চয় অণিমাদিরা বাস্ স্ট্যাণ্ডের কাছে চা খেতে বা তেল নিতে একটু দেরী করেছিলেন। পায় হেঁটেও আমরা যখন পৌঁছলাম তখন দেখতে পেলাম যে দূরে ঐ কালো গাড়িটা শিলঙের রাস্তায় চলে যাচ্ছে। আর দেখতে পেলাম পচাকে। একগাল হেসে সে আমাদের একটা আধুলি দেখিয়ে বলল—'সোন্দর দিদিরা শিলঙ্ চলে গেলেন, আমাকে এইটে দিয়ে গেলেন।'

বাস্ স্ট্যাণ্ড্ থেকে কিছুটা দূরে একটা নির্জন জায়গায় বসে আমরা কেক আর নিমকির সদ্গতি করতে করতে আলোচনা করতে লাগলাম এবার কি করা যেতে পারে। আমাদেরও তো কাল সকালে শিলঙ্ ফিরে যাবার কথা। মাসিমা অবশ্য বারবার করে বলছেন আরো কিছুদিন থেকে যেতে; আমরাও

ভেবেছিলাম যদি মোস্‌মাই দেখবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে থেকেই যাব, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কালই ফিরে যাওয়া স্থির করলাম।

তারপরে কি করব? এরা কারা? শিলঙে এরা কোথায় উঠবে? কতদিন থাকবে? এসব কথা না জেনে কি আমরা আর এদের খোঁজ করতে পারব?

কালু বলল—'তবু একবার চেষ্টা করে তো দেখব।'

সারাদিন আমরা এত ছুটোছুটি আর হাঁটাহাঁটি করেছি কিন্তু, উত্তেজনার বশে, একটুও ক্লান্ত বোধ করিনি। এখন মনে হচ্ছিল যেন পা দুটো আর চলতে চাচ্ছে না। সন্ধ্যার পর যখন বাড়ি এসে পৌঁছালাম তখন মাসিমা আর মেসোমশাই দুজনেই এসে গেছেন আর চা খেতে বসেছেন। আমাদের দেখে তাঁরা আবার চা করতে বললেন। খেতে খেতে কথাবার্তা বলতে লাগলাম।

আমরা কালই শিলঙ্ ফিরে যেতে চাই শুনে কালুর মেসোমশাই বললেন—'সেকি! তোমাদের এত তাড়া কিসের? আমি তো এ দু'দিন একদম সময় করে উঠতে পারিনি, ভেবেছিলাম যে পরশু রবিবার তোমাদের মোসমাই জলপ্রপাত দেখতে নিয়ে যাব।

কিন্তু, এমন লোভনীয় প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করে আমরা একবাক্যে বললাম যে আমরা কালই শিলঙ্ ফিরে যেতে চাই। কেন যে আমাদের এত তাড়া সেটা অবশ্য বোঝাতে পারলাম না। কিন্তু কিছুতেই আর কিছুদিন থাকতে রাজি হলাম না। অগত্যা মাসিমা আমাদের পরদিন ফিরবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

এবার কালু মেসোমশাইকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আমরা তাঁর মনে কোনও সন্দেহ না জাগিয়ে, ঐ লালবাড়িটা সম্বন্ধে যতটা সম্ভব জানতে চাইলাম। শুনলাম যে ওটা গৌহাটির এক মিস্টার মজুমদারের বাড়ি। শিলঙেও তাঁর এই ধরণের একটা বাড়ি আছে। তাঁরা কিন্তু শিলঙ্ বা চেরাপুঞ্জিতে বেশি আসেন না—বাড়ি দুটো সাধারণতঃ তালাবন্ধই থাকে, মধ্যে মধ্যে তাঁদের বন্ধুবান্ধব দুচার জন এসে কিছুদিন থেকে যায়। এখন কারা এসেছিলেন? এ বিষয়ে মেসোমশাই কিছু বলতে পারলেন না।

আমাদের এই এ্যাডভেঞ্চারের কথা ভাল করে বুঝতে হলে গোড়ার কথাটা কিছুটা জানা দরকার। কালু-মালু বুলু আর টুলু আমরা এই চারবন্ধু কাঞ্চনপুরের কাছে একটা খুব ভাল স্কুলে হোস্টেলে থেকে পড়ি। অন্য মেয়েরা আমাদের নাম দিয়েছে 'গণ্ডালু'। আমরা নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করতে ভালবাসি। আমাদের অনুসন্ধানের ফলে সত্যিই দু একটা বড় বড় রহস্যের উদ্ঘটন হয়েছিল বলে আমরা 'গোয়েন্দা-গণ্ডালু' নামে সমস্ত স্কুলে বিখ্যাত হয়ে পড়েছি। অণিমাদি আর মণিকাদি অবশ্য আসলে আমাদের দিদি নন্, এই স্কুলেরই টিচার তাঁরা। স্কুলের পাশের মস্তবড় জমিদার বাড়িতে যে দাদু থাকেন তিনিও আসলে আমাদের দাদু নন, অণিমাদিরই দাদু। কিন্তু প্রথমে দাদুর হারাণো নাতনী অণিমাদিকে খুঁজে পাবার সম্বন্ধে আবার পরে তাঁদের ধনরত্ন উদ্ধারের ব্যাপারে আমাদের গোয়েন্দাগিরি খুব কাজে লেগেছিল। সেই

থেকে আমরা ওদের বাড়ির মেয়ের মতন হয়ে গেছি।

অণিমাদির নিজের ইতিহাস ভারি অদ্ভুত, ঠিক একটা রোমাঞ্চকর গল্পের মতন। ওঁর বাবা বর্মার একজন খুব ধনী, হীরেমুক্তোর কারবারি ছিলেন, কিন্তু মহাযুদ্ধের সময়ে ধনসম্পত্তি ছেড়েছুড়ে তাঁরা এক-বস্ত্রে হাঁটাপথে বর্মা থেকে পালাতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। নানা বিপদের মধ্যে তাঁরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

অণিমাদি তখন খুব ছোট ছিলেন। এক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে তিনি নিরাপদে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর বাবা-মা ভাই-বোন কারো খবর না পাওয়া যাওয়াতে তিনি তাঁদের বাড়িতেই মেয়ের মতন মানুষ হয়েছিলেন আর লেখাপড়া শিখেছিলেন। শেষে, কাঞ্চনপুর স্কুলে কাজ নিয়ে এসে মণিকাদির আর আমাদের সাহায্যে দাদুর খোঁজ পান। পরে আবার আমাদেরই গোয়েন্দাগিরির ফলে কিছু কিছু হীরে-মুক্তো খুঁজে পান,—যা তাঁদের পুরোন কর্মচারী রঙ্গলালদা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। অণিমাদির বাবা পথে মারা যাবার সময়ে এগুলি রঙ্গলালদার কাছে দিয়েছিলেন।*

ছোট ছোট ছুটিতে প্রায়ই আমরা দাদুর বাড়ি থাকি। এখনও মাঝে মাঝে অণিমাদির কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়।

এবার ছুটিতে কিন্তু আমরা মালুর বাবা-মার সঙ্গে শিলঙে বেড়াতে এসেছিলাম তারপর কয়েকদিনের মত কালুর মাসির বাড়ি চেরাপুঞ্জি এসেছি। অণিমাদি আর মণিকাদিও ছুটির মধ্যে কয়েকদিন মালুদের বাড়ি এসে ঘুরে যাবেন এই রকম কথা আছে, মালুর বাবা-মা তাঁদের বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করেছেন। কাজেই চেরাপুঞ্জির ব্যাপারে আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না যে মণিকাদিকে ফেলে অণিমাদি একাই বা এলেন কেন, আর শিলঙে মালুদের বাড়ি না গিয়ে চেরাপুঞ্জিতে এরকম সন্দেহজনক লোকদের সঙ্গেই বা ঘুরছেন কেন?

শিলঙে ফিরে এসে, স্নান-খাওয়া সেরে আমরা চারবন্ধু এই সব বিষয়েই আলোচনা করছিলাম।

বুলু হঠাৎ ফস করে বলল—'আচ্ছা, অণিমাদি না হয়ে ইনি যদি সেই তিনি হন?'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'তিনি আবার কিনি'?

বুলু বলল—'বা রে, মনে নেই? অণিমাদি যখন প্রথম আমাদের স্কুলে এলেন, তখন হাসি বলেছিল যে তাঁকে শিলঙে অনেকবার দেখেছে! অণিমাদিকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন যে তিনি জীবনে কোনওদিন শিলঙ্ যান নি'

কালু বলল—'ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে রে। অণিমাদির মতন দেখতে একটি মেয়ে শিলঙে আছে শুনে দিদি ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু হাসি ভাল করে বলতেই পারে নি সেই মেয়েটি কে।'

আমারও সব কথা মনে পড়ে গেল। অণিমাদি অনেক লোককে দিয়ে শিলঙে খোঁজ করিয়েছিলেন, কিন্তু, কেউই তাঁকে সন্ধান দিতে পারেনি। এটা কি সম্ভব যে প্রায় ছ'বছর পরে আমরা সেই মহিলারই দেখা পেলাম? অনাত্মীয় দুটি মানুষের মধ্যে এতখানি সাদৃশ্য থাকাও কি সম্ভব?

* গোয়েন্দা গণ্ডালু—সন্দেশ শ্রাবণ ১৩৬৮, জমিদারবাড়ির রহস্য—সন্দেশ শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭১।

মালু কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল, 'কি যে সব বাজে কথা বলিস তোরা—দিদির মতন দেখতে অন্য মহিলা হ'তে যাবে কেন, ঐ তো দিদিই, এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহই নাই।'

কালু বলল—'উনি অণিমাদিই হোন বা সেই অচেনা মহিলাই হোন, তাঁকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে আবার।'

মালুর বাবা-মার মনে সন্দেহ না জাগিয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মালুর মা বারবার করে বলে দিলেন যেন অন্ধকার হবার আগেই ফিরে আসি।

আমাদের কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। শিলঙ্ মস্ত বড় আর ছড়ানো সহর। কত যে কালো রঙের গাড়ি রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে, আবার তার মধ্যে গৌহাটির গাড়িই যে কয় ডজন, কে জানে! অণিমাদিরা সত্যিই শিলঙে আছেন না অন্য কোথাও চলে গেছেন সেটা আমরা জানি না, আর শিলঙে থাকলেও তাঁরা মজুমদারদের বাড়িই উঠেছেন, না অন্য কোথাও আছেন, তাও জানি না।

কালু বলল—'এর মধ্যে যে কোনওটাই সম্ভব ধরে নিয়ে আমাদের এক একটা সূত্র ধরে অনুসন্ধান করতে হবে।'

মালু বলল—'আপাততঃ আমরা তো একটাই মাত্র সূত্রের সন্ধান পেয়েছি—সুতরাং সেখান থেকেই কাজ সুরু করা যাক। গৌহাটি-রোডের উপর মজুমদারদের সেই লাল বাড়িটার খোঁজ করা যাক।'

বাড়িটা অবশ্য একটু দূরে, আমাদের অনেকটা পথ হাঁটতে হল, কিন্তু বাড়ি খুঁজে পেতে একটুও মুস্কিল হল না, কারণ মজুমদারদের দুটো বাড়ি অবিকল একরকম দেখতে! সোজা সেই বাড়িতে ঢুকে আমরা যেই কড়া নেড়েছি অমনি—'কৌন হ্যায়'—হাঁক দিয়ে এক লম্বা-চওড়া দারোয়ান-জাতীয় জীব বেরিয়ে এল!

তার চেহারা দেখেই তো বুলু প্রায় পালাবার মতলব করছিল লোকটি মোটেই রামসিংএর মতন হাসিখুশি নয়, কোনও কথাও সে বলতে চায় না। 'কেউ বাড়ি নেই' বলেই সে এক কথায় আমাদের হাঁকিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল তবে, কালুর সঙ্গে এঁটে ওঠা তো আর অত সহজ নয়, জেরা করে করে সে এইটুকু বার করতে পারল যে (১) একজন মহিলা আর তিনজন ভদ্রলোক একটা কালো গাড়ি চড়ে কাল রাত্রে এসে সত্যিই এখানে উঠেছেন (২) তাঁরা কে তা সে জানে না, কারণ সে নিজেও পুরোন লোক নয় (৩) তবে এর আগেও তাঁদের মধ্যে দুজন একবার এসে থেকে গেছেন, (৪) সকালে অনেক খাবার সঙ্গে নিয়ে তাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছেন, কখন ফিরবেন জানা নেই। (৫) কাল কখন তাঁরা বাড়ি থাকবেন তাও জানা নেই। কি আর করা যাবে? কিছুক্ষণ আমরা এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করলাম, লাল বাড়িটার উপর নজর রাখলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত যখন তাঁদের ফিরবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বাড়ির দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হলাম।

মালু একটি চিঠি লিখে রেখে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু কালু তাকে বাধা দিয়ে বলল—'মোটেও লেখালিখির মধ্যে যাব না, কারণ, ব্যাপারটা জটিল কিনা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। কাল যত সকালে পারি আসব আর সোজাসুজি এসে বাড়িতে ঢুকে হানা দেব।'

পরদিন আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু চা জলখাবার খেয়ে আমরা যখন বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময়ে মালুর নামে একটা টেলিগ্রাম এল—'বারোটার সময়ে শিলঙ্ পৌঁছাচ্ছি—বাস স্টেশনে উপস্থিত থেকো—মণিকাদি।'

মালুর মা খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি ওঁদের জন্য ঘর ঠিক করতে আর খাবার দাবার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মালুর বাবা মালুকে বললেন—'তাই তো রে, ওঁরা বেছে বেছে আজকেই এসে পৌঁছচ্ছেন, আজ তো আমি আগেই একটা কাজের ভার নিয়ে ফেলেছি—স্টেশনে তো যেতে পারবো না। অবশ্য মালপত্র আনবার জন্য লোক পাঠাব।'

মালু তাকে ভরসা দিয়ে বলল—'তাতে কি হয়েছে বাবা, আমরাই ওঁদের নিয়ে আসব গিয়ে, তুমি কিছু চিন্তা করো না।'

নিজেদের ঘরের মধ্যে বসে আমরা নিজেরাই কিন্তু মহা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা যে কি সেটা এবার ভাল করে বোঝা দরকার। সত্যিই যদি অণিমাদি আগেই অন্য বন্ধুদের সঙ্গে শিলঙ চলে এসে থাকেন, তাহলে তো এখন আসবেন একা মণিকাদি—

বুলু বলল—'এতে প্রমাণ হল যে শিলঙে যিনি আছেন তিনি অণিমাদি নন।'

মালু গাল ফুলিয়ে বলল—'আমরা সবাই দেখলাম, উনি অণিমাদি, তবু তুই এখনও বলবি অণিমাদি নন?'

'তাহলে এই টেলিগ্রামটার মানে কি?' জিজ্ঞাসা করলাম।

মালু একটু চিন্তা করে বলল—'হয়তো আমাদের ঠকাবার জন্য কেউ মিথ্যা টেলিগ্রাম করছে!'

'সে কি কথা? শুধু শুধু আমাদের কে আবার মিথ্যা টেলিগ্রাম করবে?'

মালু উত্তেজিত হয়ে বলল—'এমন যদি হয়ে থাকে যে সেই গুণ্ডারাই এই টেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে? হয়তো আজ সকালেই তাদের কোন বিশেষ পরিকল্পনা আছে—তারা চায় না যে আজও আমরা তাদের পিছু নিই।'

আমি হেসে ফেললাম—'সে কি রে? তারা রয়েছে শিলঙে আর এই টেলিগ্রাম এসেছে কলকাতা থেকে।'

মালু বলল—'কেন? সে রকম করা যায় না বুঝি? হয়তো কলকাতায় ওদের কোনও সহকারী আছে, তাকে দিয়ে এই টেলিগ্রাম করিয়েছে?'

কালু বলল—'থাম্ দেখি তোরা—সবই করা যায়, কিন্তু করা যে হয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং এখন আমাদের হাতে-নাতে সব ব্যাপারটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। গৌহাটি রোডের বাড়িটায় গিয়েও হানা দিতে হবে আবার বাস্‌স্ট্যাণ্ডেও সময় মতন যেতে হবে।'

মালুর মা ডেকে বললেন—'তোরা এত তাড়াহুড়ো করছিস কেন মালু? গৌহাটির বাস্ আসবে তো সেই বেলা বারোটায়, বরঞ্চ তার চেয়ে দেরীও হতে পারে—তাহলে—'

পাছে মা তাকে কিছু কাজের ভার দিয়ে বসেন তাই মালু ব্যস্ত হয়ে বলল—'আমাদের এখন বড্ড

তাড়া আছে মা, একটা জায়গায় একটু বেড়িয়ে তারপর ঠিক সময়ে বাস্ স্ট্যাণ্ডে যাব।'

যাই হোক, এবারে তাড়াতাড়ি আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এত তাড়াহুড়ো করেও কিন্তু অণিমাদিদের আমরা ধরতে পারলাম না। দারোয়ানের কাছে শুনলাম যে 'এইমাত্র' তাঁরা সব বেরিয়ে গেছেন ?

'কোথায় গেছেন ?'

'কে জানে—হয়তো কাছে পিঠে, আবার হয়তো বা অনেক দূরে।'

'কখন ফিরবেন ?'

'তাও জানি না।'

দারোয়ানটি কেমন যেন, কথাই বলতে চায় না। অগত্যা আমরা কি করি, হতাশ হয়েই বেরিয়ে পড়লাম। এখনও গৌহাটির বাস্ আসতে বেশ কিছুটা দেরী আছে, আমরা ধীরে সুস্থে আবার শহরের দিকে ফিরে চললাম।

হঠাৎ মালু উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল—'ঐ যে—ঐ যে—ঐ তো সেই গাড়িটা !'

সত্যিই রাস্তার ধারে সেই কালো এ্যাম্বাসাডার গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু তাতে কোনও লোক ছিল না। যদিও আমরা কাল গাড়ির নম্বরটা ভাল করে দেখতে পাইনি, তবু এটাই যে সেই গাড়ি সে বিষয়ে আমাদের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাছাড়া কাছে গিয়ে দেখলাম যে সীটের উপর যে মাফলারটা রাখা আছে সেটা প্রথম দিন সেই ছাই-রঙা স্যুট পরা ভদ্রলোকের গলায় ছিল। কিন্তু, গাড়ির লোকেরা গেল কোথায় ? আমরা খুব ভাল করে চারদিকে দেখলাম, কালু একটা ছোট টিলার উপর চড়ে তার ছোট দূরবীন বার করে দেখল, তবুও কোথাও কারো পাত্তা পাওয়া গেল না।

তখন কালু আবার বলল—'ছাখ্, চোখে যখন দেখতে পাচ্ছি না, তখন আমাদের ভেবে বের করতে হবে যে এখানে গাড়ি রেখে ওঁরা কোথায় কোথায় যেতে পারেন।'

মালু বলল—'বাঃ, এখান থেকে তো অনেক জায়গায়ই যাওয়া যায়। ঐ দিকে গেলে একটু দূরে বিশপ ফল্‌স্—এই দিকে গেলে পড়বে বিডন ফল্‌স্। আবার বিডন্ ফল্‌স্ ছাড়িয়ে এইদিক দিয়ে তো সেভ্‌ন্ ফল্‌স্ দেখতেও যাওয়া যায়।'

কালু একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর বলল, 'তাহলে হয় এই সব জায়গাই আমাদের খুঁজে দেখতে হবে, আর না হলে এই গাড়ির কাছেই বসে ওঁদের ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

আমি বললাম—'ঘড়ির দিকে দেখেছিস ? এখন সোজা বাস্ স্ট্যাণ্ডে গেলেই তো প্রায় বারোটা বাজবে।

মালু বলল—'ততক্ষণে যদি ওরা ফিরে এসে আবার অন্য কোথাও চলে যায় ? একেবারে যদি শিলঙ্ ছেড়ে চলে যায় ? কিম্বা যদি আজই, এখনই, ওরা সাংঘাতিক কিছু কাণ্ড করে ?'

কালু দু এক মিনিট ভেবেই মনস্থির করে ফেলল—'ওদেরও আমরা ছাড়তে পারি না, আবার বাস্ স্ট্যাণ্ডেও সময় মতন না গিয়ে পারি না। এক কাজ কর্—আমি আর মালু এখানে থাকি, টুলু আর

বুলু বাস্ স্ট্যাণ্ডে যা !'

বুলু আপত্তি জানাল—'বা রে, আমাদের দুজনের মধ্যে কেউই তো বাস্ স্ট্যাণ্ড চিনি না, কি ভাবে সেখান থেকে মালুদের বাড়ি যেতে হবে তাও ভাল করে জানি না !'

মালু বলল—'তাছাড়া আমাদের বাড়িতেই যখন মণিকাদি আসছেন, আর আমাকেই যখন টেলিগ্রাম করেছেন, তখন আমারই উচিত বাস্ স্ট্যাণ্ডে যাওয়া। তোরা বরঞ্চ হয় এখানেই থাক, নয়তো চট্ করে একবার বিডন্ ফল্সের দিকে ঘুরে আয়—ঐ তো সামনেই রাস্তা—'

কালু খুশি হয়ে বলল—'সেই ভাল। মালু আর আমি মণিকাদির মালপত্র বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে ওঁকে সঙ্গে নিয়েই আবার এখানে ফিরে আসব। তোরা যদি বিড্ন্ ফল্সে অণিমাদির দেখা পাস্ তো ভাল কথা, নইলে মণিকাদিকে নিয়েই বিশপ্ ফলসের দিকে যাওয়া যাবে।' আমাদের মনে হচ্ছিল যে মণিকাদি একলা আসছেন আর অণিমাদি এখানেই আছেন।

মালু বাস্ স্ট্যাণ্ডের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আবার বলল—'দিদিকে অন্য কোথাও চলে যেতে দিবি না কিন্তু। মণিকাদিকে সঙ্গে করে আনলে আর অণিমাদি আমাদের হাত এড়াতে পারবেন না, একেবারে দুজনকে নিয়ে বাড়ি ফিরব। মা-বাবাও তো সেই রকমই আশা করছেন।' কালু মালু চলে গেল।

বুলু প্রথমটা বড় রাস্তা ছেড়ে অণিমাদিদের সন্ধানে যেতে রাজি হচ্ছিল না। ওদিকে আমার মনে ভয় হচ্ছিল অণিমাদিরা যদি বিড্ন্ ফল্স্ হয়ে আবার অন্য দিকে চলে যান ? বুলুকে বুঝিয়ে বললাম—'চল্ না, কাছেই তো—একটু এগিয়ে দেখে আসি। না হয় ওদের বেশি কাছে যাব না, আপাততঃ একটু দূর থেকেই চোখে চোখে রাখব, কালু-মালু মণিকাদিকে নিয়ে ফিরলে সবাই এক সঙ্গে কাছে যাওয়া যাবে।'

আস্তে আস্তে বুলু আর আমি বড় রাস্তার পুলের ওপর থেকে নেমে, নদীর ধারের রেলিঙ্ দেওয়া সরু রাস্তা দিয়ে বিডন্ ফলসের দিকে চলেছি আর মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে চারিদিকে ভাল করে দেখে নিচ্ছি এক একবার। বাপ্ রে, কি সাংঘাতিক তোড়ে চলেছে নদীর জল ! সাদা সাদা ফেনা হয়ে, গর্জন করতে করতে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। একটু দূরে গিয়ে সমস্ত জল এক লাফে একেবারে কয়েক শ' ফিট নিচে পড়েছে। কি যে সুন্দর দৃশ্য এই জলপ্রপাতের সেটা আমার পক্ষে ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে চলেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম—ও কি ? একেবারে প্রপাতের মুখের কাছে, রেলিঙে ভর দিয়ে, জলের দিকে মুখ করে কে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ? অণিমাদিই না ? যদিও আমরা তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবু ঠিকই বুঝেছিলাম যে ইনিই অণিমাদি। হয়তো আমরা তাঁর নাম ধরে ডেকে উঠতাম, হয়তো বা ছুটে তাঁর কাছে চলে যেতাম। কিন্তু তারপরেই যা দেখতে পেলাম তাতে ভয়ে আমাদের গায়ের রক্ত জল গেল, হাত-পা আড়ষ্ট, হিম হয়ে এল ! আমরা দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে চেরাপুঞ্জির সেই গুণ্ডা লোকটি অণিমাদির পিছন

দিক থেকে নিঃশব্দে, বাঘের মত গুঁড়ি মেরে তাঁর দিকে এগোচ্ছে। কেন? কি মতলব? ভাবতেও আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। দিদি কিন্তু কিছুই জানতে পারেন নি, নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে জল-প্রপাতের শোভা দেখছিলেন। অন্য সঙ্গীরা কোথায় গেল? সেই ছাই-রঙা স্যুট পরা ভদ্রলোক আর সেই রোগা লম্বা ঝাঁকড়াচুল ছেলেটিকে দেখে আমাদের বেশ ভালই লেগেছিল, তাদের কিন্তু ধারে কাছে দেখতে পেলাম না। হয়তো তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই গুণ্ডাটা নিজের সাংঘাতিক মতলবটি কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করছে!

কালু থাকলে কি করত? ছুটে গিয়ে অণিমাদিকে সাহায্য করত? চেঁচিয়ে লোক জড় করত? এই জায়গাটা একেবারে নির্জন হলেও এটা লোকালয় থেকে তো বেশি দূরে নয়, চিৎকার করলেই লোক এসে যেত নাকি?

আমরা কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। বুলুর মুখ শাদা হয়ে গিয়েছিল, হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছিল। আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না, এগিয়ে যাবার ইচ্ছা থাকলেও, নড়বার শক্তি ছিল না। এই ভাবে কতক্ষণ কাটল কে জানে? হয়তো মাত্র কয়েকটি সেকেণ্ড, কিন্তু আমাদের কাছে মনে হল সেটা যেন অনাদি, অনন্ত কাল! একটা চাপা উত্তেজনার সঙ্গে গুণ্ডাটি হঠাৎ বলে উঠল—'এই তো সুযোগ! এই নির্জন জায়গায় যদি আজ ভবলীলা সাঙ্গ করে দিই?'

অণিমাদি হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে ভীতভাবে চিৎকার করে উঠলেন—লোকটি তখন বিকট স্বরে হাসতে লাগল—'হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ'!

এত আতঙ্কের মধ্যেও হঠাৎ আমার মনে হল—'কি আশ্চর্য! ঠিক এইরকম ঘটনা আগে কোথাও ঘটেছে না? ঠিক এই হাসি, ঠিক এই চিৎকার, ও এই কথা আগে শুনেছি না? কোথায়?

আমাদের ভীষণভাবে চমকিয়ে দিয়ে আমাদের ঠিক পিছন থেকে কারা যেন তক্ষুনি হাততালি দিয়ে উঠল। কে যেন হাসতে হাসতে বলে উঠল—'বাঃ! বাঃ! নির্মল, চমৎকার! চমৎকার! কিন্তু কয়েকবার তুমি গুণ্ডার ভূমিকায় অভিনয় করে সোনার মেডেল পেয়েছ আর দর্শকদের হাততালি পেয়েছ বলে স্থান-কাল পাত্র-নির্বিশেষে সব সময়ই সেই ভূমিকা অভিনয় করে যেতে হবে নাকি? ছেলেমানুষ দর্শকেরা যদি মূর্ছা যায় তাহলে কি হবে?'

তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দেখি যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সেই ছাই-রঙা-স্যুট-পরা ভদ্রলোক আর রোগা লম্বা ছেলেটি ভীষণ হাসছে। সামনে তাকিয়ে দেখি যে অণিমাদিও হাসছেন, এমন কি গুণ্ডাটিও এমন অমায়িক ভাবে হাসছে যে আর তাকে গুণ্ডা বলে মনে হচ্ছে না!

আমাদের ভয় ততক্ষণে ভেঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু আমরা এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারছিলাম না।

কিন্তু একটা বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই আমাদের আবার নতুন করে বিস্মিত হবার পালা! দূর থেকে মালুর গলা শুনতে পেলাম—'টুলু-বুলু—কোথায় তোরা? তাড়াতাড়ি আয়, অণিমাদি আর মণিকাদি এসে গেছেন যে!'

সে আবার কি ? ঐ তো আমাদের সামনে অণিমাদি দাঁড়িয়ে হাসছেন ! ওমা—পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কালু-মালু আর মণিকাদির সঙ্গেও অণিমাদি হাসতে হাসতে আসছেন।

বুলু আর আমি দুই দিকে দুই অণিমাদিকে দেখে বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে একবার এঁর দিকে তাকাচ্ছি, আবার ওঁর দিকে তাকাচ্ছি।

তাঁরা কিন্তু প্রথমে পরস্পরকে দেখতে পাননি।

কালু আমাদের ধমক দিয়ে বলল—'গাধার মতন দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? এগিয়ে আয় না !'

তবু আমাদের এগোতে না দেখে তারা নিজেরাই এগিয়ে এল, পর মুহূর্তেই এক সঙ্গে দুইটি অণিমাদিকে দেখে সবাই আমাদেরই মতন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল—কালু, মালু অণিমাদি ছাই-রঙা-স্যুট পরা, রোগা লম্বা আর ষণ্ডা-গুণ্ডা লোকগুলি, আর দুই অণিমাদি নিজেরা, সবাই—হাঁ করে তাকিয়ে রইল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

কিভাবে যে ওদের সকলের সঙ্গে আমাদের সকলের আলাপ পরিচয় হল, কি যে কথাবার্তা হল তা আর এখন আমাদের মনেই পড়ে না !

প্রথম দিন থেকেই নতুন অণিমাদিকে আমাদের ভারি ভাল লেগেছিল, পরে শুনলাম যে তাঁর নাম হল অসীমাদি। গুণ্ডামতন চেহারার নির্মলদা ছাই-রঙা-স্যুট পরা বিমলদা আর অসীমাদি হলেন গৌহাটির মজুমদারদের ছেলেমেয়ে আর রোগা লম্বা অনিলদা ওঁদেরই মাসতুতো ভাই। ওঁরা বাড়িশুদ্ধ সকলেই দারুণ মিশুক আর ফুর্তিবাজ। ওঁরা আর আমরা মিলে মস্ত দল করে শিলঙের যত জলপ্রপাত ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য জায়গা তো দেখলামই, আবার একবার চেরাপুঞ্জিতেও ঘুরে এলাম। বিমলদা আর অনিলদা প্রথমদিন থেকেই আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা জুড়লেন, আর নির্মলদার তো কথাই নেই, আমাদের দেখলেই তাঁর যত গুণ্ডার পার্ট আবৃত্তি করবার শখ হত !

বাকি ছুটিটা যে আমরা কি আনন্দেই কাটালাম সে আর কি বলব !

অণিমাদি আর অসীমাদির মধ্যে সাদৃশ্যটা কিন্তু সত্যিই ভারি অদ্ভুত। দুজন মানুষের মধ্যে যে এরকম সাদৃশ্য থাকতে পারে, এ আমরা নিজেদের চক্ষে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। দুজনকে একসঙ্গে দেখার অল্পক্ষণ পরেই কালু একটা সুযোগে আমাদের একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল—দ্যাখ্, এতটা মিল থাকা কিন্তু বাস্তবিকই খুব আশ্চর্য ! রীতিমতন অস্বাভাবিক। অসীমা-দিকেই যে হাসি দুবছর আগে শিলঙে দেখেছিল আর অণিমাদি যখন প্রথম এলেন তখন তাঁকে এঁর সঙ্গেই ভুল করেছিল, এটা অবশ্য বোঝা গেল। কিন্তু, তাতে তো মূলরহস্যের কোনও কিনারা হল না।

মালু হঠাৎ ফস্ করে বলে উঠল—আচ্ছা, অসীমাদি যদি অণিমাদির যমজ বোন হয়ে থাকেন, তাহলে তো এরকম সাদৃশ্য থাকাটাই স্বাভাবিক !

আমি বললাম—'ভাগ্, অণিমাদির যমজ বোন আবার আসবে কোথা থেকে ?'

মালু বলল—'যমজ বোন না হোন, যদি এমনি বোন হয়ে থাকেন ? বোনে-বোনেও তো অনেক

সময়ে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। সেই যে অণিমাদির ছোট বোনটি বর্মা থেকে ফেরার পথে হারিয়ে গিয়েছিল—'বুলু অবাক হয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল—'ওমা সে তো ছোট্ট বোন! অসীমাদি তো কত বড়!'

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

মালু বলল—'বারে, তখন অণিমাদি নিজেও তো ছোট মেয়ে ছিলেন। ২২।২৩ বছর পরে কেবল অণিমাদিই বুঝি বড় হবেন, আর ছোট্ট বোনটি তেমনি ছোট্টই থাকবে?'

আমরা সকলেই জানতাম যে বর্মা থেকে হাঁটা পথে পালিয়ে আসবার সময়ে অণিমাদি দলছাড়া হয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন আর শেষে এক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে নিরাপদে ফিরেছিলেন। বহু খোঁজ খবর করেও যখন বাড়ির আর কারো কোনও খবর পাওয়া যায়নি তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে আর কেউ বেঁচে নেই।

অনেকদিন পরে পুরোন কর্মচারী রঙ্গলালদার কাছে ওঁদের বাবার মৃত্যু সংবাদ জানা গিয়েছিল, কিন্তু আর কারো কোনও খবর পাওয়া যায় নি।

তবু আমি বললাম—'কিন্তু, অসীমাদি, বিমলদা আর নির্মলদা তো তিন ভাই বোন, তাঁরা তো গৌহাটির সেই মিস্টার মজুমদারের ছেলেমেয়ে। তবে কি করে অসীমাদি সেই হারানো বোন হবেন?'

অনেকক্ষণ কালু কোনও কথা বলেনি, এখন সে গম্ভীর ভাবে বলল—দ্যাখ্, মালুর কথাগুলো কিন্তু উড়িয়ে দেবার মতন নয়। সত্যিই অসীমাদি মিস্টার মজুমদারের মেয়ে, না কি তাঁদের পালিতা মেয়ে, এটা আমাদের অনুসন্ধান করে দেখা দরকার! একটা মজা লক্ষ্য করেছিস? অসীমাদি আর অণিমাদি দেখতে এত একরকম যে আমরা পর্যন্ত ভুল করেছিলাম। আবার বিমলদার সঙ্গেও এঁদের চেহারার মিল আছে, কিন্তু নির্মলদার সঙ্গে কারো বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নেই!

মালু উল্লসিত হয়ে বলে উঠল—'তাহলে নিশ্চয় বিমলদা অণিমাদির সেই হারানো ভাই! ওঃ—কি মজা! এক অণিমাদিকে খুঁজে পেয়েই দাদুর কত আনন্দ হয়েছিল। এখন আরো দুটি নাতি-নাতনী পেলে তো আনন্দে একেবারে আটখানা হয়ে যাবেন!'

মালুকে সাবধান করে দিয়ে আমরা বলেছিলাম—এখনই অত লাফাস না। এ সব অনুমান সত্যি কিনা সেটা আগে প্রমাণ হতে দে!

কিন্তু মিস্টার আর মিসেস্ মজুমদার যেদিন গৌহাটি থেকে এসে গেলেন, সেদিন তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়েই আমাদের মনে হল যে আর কোনও প্রমাণেরই দরকার নেই। আমরা সকলেই তখন মালুর মতন উত্তেজিত হয়ে পড়লাম! এঁদের দুজনেরই দেখলাম লম্বা-চওড়া চেহারা, দুজনের সঙ্গেই লম্বা চওড়া নির্মলদার মুখের আশ্চর্য সাদৃশ্য, কিন্তু অসীমাদি বা বিমলদার সঙ্গে কারো একটুও মিল নেই! শুধু আমরা না, উপস্থিত সকলেই এটা লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন মিস্টার মজুমদার সব কথা খুলে বললেন, তখন সকলেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে যেমন আশ্চর্য হলেন, তেমনি আনন্দিত হলেন।

মহাযুদ্ধের আগে মজুমদারও বর্মায় থাকতেন, কিন্তু অন্য সহরে—তাঁরা অণিমাদিদের চিনতেন না। হাঁটা পথে দেশে ফিরবার সময়ে অণিমাদিরা সবাই যখন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, তখন ছোট্ট দুটি খোকাখুকু, (অসীমাদি আর বিমলদাকে) মিস্টার মজুমদার খুঁজে পান। ওঁদের মা পথের কষ্টে মারা গিয়েছিলেন, ওঁরা এত ছোট ছিলেন যে নিজেদের নামটুকু কেবল বলতে পেরেছিলেন, পরিচয় বা ঠিকানা কিছুই জানাতে পারেন নি। তবু মিস্টার মজুমদার অনেক অনুসন্ধান করেছিলেন, কিন্তু কারো খোঁজ না পেয়ে খোকা-খুকু দুটিকে নিজের ছেলের সঙ্গে, ছেলেমেয়ের মতন মানুষ করেছিলেন।

এত বছর ধরে অসীমাদি আর বিমলদা ওঁদের ছেলেমেয়েই হয়ে গিয়েছিলেন, আসল ঘটনা তাঁরা ভুলেই গিয়েছিলেন—এতদিন পরে অণিমাদির সঙ্গে অসীমাদির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করে মিস্টার মজুমদার সেই পুরোন ইতিহাস খুলে বললেন।

এ যে একটা গল্পের মতন—এ রকম কি সত্যিই হতে পারে? আমরা সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতন এই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনছিলাম।

শেষে মিসেস বড়ুয়া যখন তাঁর বাক্স থেকে, বহু পুরাতন, সযত্নে তুলে রাখা, ছোট্ট ছোট্ট জামা কাপড় কয়টিও বার করে দেখালেন তখন অণিমাদি আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন—'ও কি? এ যে রেঙ্গুনের সেই দোকান থেকে কেনা জামা? এ তো আমারই বোন অসীমার জামা—ঐ দেখুন আমাদের মার হাতে লেখা নাম রয়েছে!' অসীমাদি আর বিমলদার বিষয়ে আরো কতগুলি কথা অণিমাদি বললেন যাতে আর কোনও সন্দেহই বাকি রইল না।

বাস্তবিকই অণিমাদিদের জীবনের ইতিহাস যেন এক রহস্য উপন্যাসের মতন অদ্ভুত, আর তার সঙ্গে আমরা, মানে গণ্ডালুদল, যে-ভাবে জড়িয়ে পড়েছি, সেটাও কিছু কম অদ্ভুত নয়!

মণিকাদি বলে উঠলেন—'সাবাস, গোয়েন্দা-গণ্ডালু, সাবাস! সাবাস!! তোমরা যদি অমন ছিনে জোঁকের মতন অসীমাদের পিছনে লেগে না থাকতে, তাহলে জীবনে কোনওদিন আমরা তাদের সন্ধান পেতাম কিনা কে জানে!'

তালপুকুরে

(একাঙ্ক নাটক)

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

কৈফিয়ৎ—অপূর্ব এক চাটনি এটা,
না মিষ্টি, না টক।
চেখে দেখ কেমন লাগে
পাঠিকা, পাঠক।

পরিচিতি—

হাসি মাসি—তালপুকুরের গিন্নী হাঁস।

গেঁড়ি, গুগলি, শামুক—হাসি মাসির তিন দুষ্টু ছানা।

ছিঁচকে—বাদুড় বনের ছিঁচকে শেয়াল।

ম্যাও মহারাজ—জেলেদের আদুরে হুলো।

বাক্য বাগীশ—কচুবনের কোলা ব্যাঙ।'

কৌ-কৌ—তালগাছের কুঁড়ে কাক।

টরে টক্কা—তালগাছের টিকটিকি।

হুতুম—সজনে গাছের কোটরে পেঁচা।

ভুলো—জেলে পাড়ার পুলিশ কুকুর।

স্থান—তালপুকুর। কাল—দিনদুপুর।

হাসি মাসি—
(চান সেরে, পাখা নেড়ে গা ঝেড়ে)

প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক পা,
আর যে পারিনা,
আমার পোড়া কপাল খানা,
বেজায় পাজি তিনটে ছানা,
শোনেই না তো কোন মানা,
একটু চোখের আড়াল হতেই,
উধাও ওরা, যাঃ!
কোথায় গেলি দুষ্টু গুলো,
প্যাঁক্, প্যাঁক, প্যাঁক পা।

গেঁড়ি—
(দূরের এক কাশের বনে, গা ডুবিয়ে, আপন মনে)

প্যাঁকই, প্যাঁকই, পি,
এই দেখনা একটা কেমন
গুগলি তুলেছি,
আরো কিছু ধরি,
রাঁধবো যে চচ্চড়ি,
লঙ্কাবাটা, আদা, পেঁয়াজ, রসুন দেব তাতে,
তোয়াজ করে মেখে খাব, গরম গরম ভাতে।
প্যাকই, প্যাঁকই, পি,
এর মধ্যেই গোটা একুশ পাকড়ে ফেলেছি।

গুগলি—(পায়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে—
জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে)
প্যাঁকক, প্যাঁকক, পাগ।
আমায় দিবি ভাগ।
কালকে তোকে কামড়ে ছিলাম,
করিস নেকো রাগ।
দেব ঘুঁড়ি, দেব সুতো।
জামা, মোজা, টুপি জুতো।
প্যাঁকক, প্যাঁকক, পিস।
খাবার সময় কিন্তু আমায়
চচ্চড়িটা দিস্।

শামুক—(গেঁড়ির পিঠে রেখে হাত
ঘাড়টা ক'রে একটু কাৎ)
প্যাঁকম, প্যাঁকম, পো,
আমায় দিবি তো?
সেদিন আমি রাগের ঝোঁকে
আঁচড়ে দিয়েছিলাম তোকে,
লেগেছিল আঘাত চোখে,
আহারে চুক্চুক।
সেই ঘটনা ভাবলে পরেই
দুঃখে ভরে বুক।
এই দেখ্না চোখে কেমন,
আসছে ফেটে জল,
প্যাঁকম প্যাঁকম, গেঁড়ি ভায়া
ভাগ দিবিতো বল?

গেঁড়ি—(ঝোপের থেকে বাড়িয়ে গলা,
আঙুল তুলে, দেখিয়ে কলা)
প্যাঁকই, প্যাঁকই, পাট
ভাগ দেবনা, বয়েই গেছে
এখান থেকে কাট।

পাজি, ছুঁচো বিদ্ঘুটে যম।
মেরে আমায় করিস জখম।
যখন তখন জিভ দেখাস,
কোন মুখেতে, খাবার চাস?
প্যাঁকই, প্যাঁকই, পাক,
কত ভাল বাসিস আমায়,
জানাই আছে, থাক।

গুগ্‌লি ও শামুক,—
(রেগে গিয়ে, গাল ফুলিয়ে
সমস্বরে হৈ, চৈ ক'রে)
প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক পান,
বটে বটে এমন কথা
বেল্লিক শয়তান।
মারব তোকে গলা টিপে,
ফেলব গায়ে তেলের পিপে।
চোখে দেব গরম শিক।
ঠোঁটখানা তোর ভাঙ্গব ঠিক।
এক খাবলে, খপাং করে
খাবলে নোব কান।
হংস কুলের কলঙ্ক তুই,
প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক, পান।
(দুজনে মিলে যুক্তি ক'রে
গেঁড়ির গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।)

হুতুম—(কোটর থেকে বেজায় হেঁকে)
হুতুম, থুম, থুম।
লেগে যা, লেগে যা, নারদ, নারদ
লাগ, দুমাদুম দুম।
এতক্ষণে জমল পাড়া,
ছিল যে নিঃঝুম।
ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ফটাস, ফটাস
কুঁড়ে কাকের ঘুম।

হুথুম, থুম, থুম।
টরে-টক্কা—
(তরতরিয়ে পালিয়ে গিয়ে)
টিক, টিক, টিক, টিক,
লড়াইখানা বাঁধবে, আগেই
বুঝেছিলাম ঠিক।
হাসি মাসি এবার গিয়ে
ভুলোয় খবর দিক,
টিক, টিক, টিক, টিক।
বাক্য বাগীশ—(গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে,
গলা ঝেড়ে একটু কেশে)
গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গা,
থামো, থামো ওহে বালক,
লড়াই কোরো না।
বাপরে বাপ,
কি লাফ, ঝাঁপ!
যুদ্ধ করা দারুণ পাপ,
এই পাপেতে নরকে বাস,
এ আর কে না জানে।
কি বোঝাব, ওদের বল,
নিচ্ছে কথা কানে?
ধর্ম উপদেশের বাণী
চোরা কি আর মানে?
গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গাঁক
আমার কথা না শোনে তো
জাঁহান্নমেই যাক।
কৌ, কৌ—(কোনমতে চোখ খুলে,
গোটা তিন হাই তুলে)
কাকই, কাকই, কোল,
দিন দুপুরে জ্বালা দেখি,
কিসের হট্টগোল?
একটু খানি শান্তিতে
যেই গিয়েছি ঘুম দিতে,
কানের কাছে অমনি কারা,
পিটছে রে ঢাকঢোল?
কি সব্বোনাশ, হচ্ছে লড়াই!
হরি, হরিবোল।
কাকা, কাকা, কিয়ে,
সর্ষের তেল দেড় বাটিটাক
নাকে টেনে নিয়ে,
আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ি,
কানে আঙ্গুল দিয়ে।
ছিঁচকে—(তাল পুকুরের একটা পাড়ে
হোগলা বনের অন্ধকারে)
হুক্কা, হুয়া, হা,
কেয়া মজা, কেয়া মজা
তাইরে নাইরে না।
করছে লড়াই হাসের ছানা,
আঁচড়ে এবং ঝাপটে ডানা।
অনেক দিনের থেকেই আমার
বেজায় আছে লোভ।
চুরি করার তাল পাইনে,
তাইতো মনে ক্ষোভ।
হাসি মাসি সর্বদা যে,
থাকে কাছে, কাছে।
ওর সামনে মুখ দেখালে,
আর রক্ষে আছে?
মাসি এখন লড়াই দেখে,
আনতে গেছে ভুলোয় ডেকে,
ভুলো আসার আগেই আমি,
তিনটে ছানা নিয়ে,
মজা ক'রে চিবিয়ে খাব

বাছুড় বাগান গিয়ে
হুক্কা, হুয়া, হাফ
ভাল করে তাকটা করি, দেব এবার লাফ।
ম্যাও মহারাজ—(বাঁশ বাগানের পাশে
লুকিয়ে ঝোপের ঘাসে)
মেঁয়াও, মেঁয়াও, মল,
ঝরছে জিভে জল,
তিনটে কচি, হাঁসের ছানা,
ঘাড় মটকে এক, একখানা
রক্ত খাব পেটটি ভরে
লাফ দেব ঠিক, গায়ের জোরে
মিঁয়াও, মিঁয়াও, মি,
হেঁইয়ো জোয়ান, এক, ছুই তিন
লম্ফ দিয়েছি।

(ছিঁচকে এবং ম্যাও মহারাজ একই সাথে
দিল লাফ। ছুটোর মাথায় ঠক্‌ঠকাঠক্‌ ধাক্কা
লাগে, বাপরে বাপ)
ছিঁচকে—(ডিগবাজী খেয়ে পড়ে
চোখেতে জল ঝ'রে)
হুক্কা, হুয়া, হাই,
মাথায় কিসের লাগল আঘাত
পড়ে গেলাম ভাই।
বন্‌ বন্‌, বন্‌, মুণ্ডু ঘোরে
কে আছো গো বাঁচাও মোরে
পাঁকে দারুণ আটকে গেছি
উঠতে পারি না।
হুক্কা, হুয়া, হুক্কা, হুয়া,
হুক্কা, হুয়া হা।

ম্যাও মহারাজ—(কাদাতে চিৎপাত
কপালে দেয় হাত)
ম্যাঁও, ম্যাঁও, ম্যাঁও, ম্যাঁক
ওরে দাদা, আমার দিকেও
কেউ তাকিয়ে দ্যাখ্‌
রক্ত ঝরে, কপাল ফাটা
পায়ে আবার বিঁধলো কাঁটা,
চেষ্টা করেও আমি যে আর
চলতে পারিনে,
মিঁয়ও, মিঁয়াও, ম্যাঁও, ম্যাও, ম্যাঁও
মে য়াও, মেঁয়াও মে।
(শেয়াল এবং বেড়াল খানার
গলার আওয়াজ পেয়ে
তিনটে ছানা লড়াই ফেলে
পালিয়ে গেল ধেয়ে
হাসি মাসি এসে হাজির ভুলোয় নিয়ে সাথে।
ভুলোর মাথায় লাল পাগড়ি মোটা লাঠি হাতে)
হাসি মাসি—(খুব ঘাবড়ে গিয়ে
গালেতে হাত দিয়ে)
প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক, পাস,
এইতো ছিল, কোথায় গেল,
একি, সব্বোনাশ!
ভুলো—(গোঁফে দিয়ে চাড়া
লাঠি ক'রে খাড়া)
ভৌ, ভৌ, ভৌ, ভিক,
ভয় পেওনা যেখানে থাক,
আনবো ধরে ঠিক।
ছিঁচকে—(মুখ খানা ফ্যাকাসে,
হাত ছুটো জোড় করে চোখ তোলে আকাশে)
হুক্কা, হুয়া, হুক
কাঁপছে ভয়ে বুক।
বাঁচাও এবার ওগো ঠাকুর
দয়াল, ভগবান।

কালিঘাটে জোড়া পাঁঠা
করব বলিদান !
ম্যাও মহারাজ—(পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে
চলতে গিয়ে আবার পড়ে)
মিঁয়াউ, মিঁয়াউ, মা
আর যে বাঁচিনা।
ভুলো ব্যাটা এসে গেছে,
ধরলো বুঝি টুঁটি।
পায়ে আমার ফুটল কাঁটা
কেমন করে ছুটি !
ভুলো—(জ্ঞানীর মত ফুলিয়ে মাথা,
গুটিয়ে নিয়ে জামার হাতা)
ভৌ, ভৌ, ভৌ, ভল,
ব্যাপারখানা এবার মাসি
একেবারে জল।
ঐ দেখনা ছুটো পাজি
তোমার ছানায় ধরতো আজি,
ধর্মের কল বাতাস নাড়ায়
খুব বেঁচেছে ওরা।
ছিঁচকে দেখি আটকে কাদায়
ম্যাও মহারাজ খোঁড়া
চল্, শয়তান
তুই মস্তান
এবার শ্রীঘর চল।
এমন ওষুধ দেব তোদের
ফেলবি চোখের জল।
দাগী চোরের শাস্তি কঠিন
ভৌ, ভৌ, ভৌ, ভল।

বিঃ দ্রঃ—নাটকটি অভিনয় করতে গেলে 'সন্দেশ' পত্রিকা মারফৎ লেখকের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।

গল্প লেখার গল্প

অসিত গুপ্ত

ছোটরা হচ্ছে সবচেয়ে পুরণো। একথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। গাছ-পালা, প্রকৃতি যেমন ছোটরাও তেমনি অনেকদিনের পুরণো।

এই মানুষ যতদিনের, মানুষের গল্পও ততদিনের। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরণো গল্প যেটা অর্থাৎ মানুষ কি ক'রে তৈরি হ'ল, সে গল্প সব জায়গায় এক ঈশ্বর নিজের শরীর থেকে মানুষ তৈরি করলেন। বাইবেলের ঈশ্বর, আমাদের ব্রহ্মা কেউ আর একা একা থাকতে পারছিলেন না, খুব কষ্ট হচ্ছিল তাঁদের। তাই তাঁরা মাটি-জল, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত এইসব বানিয়ে তার মধ্যে দিলেন ছেড়ে জীব-জন্তুদের।

এর মধ্যে সবচেয়ে সেরা জীব হচ্ছে মানুষ, কেননা তারা ভাবতে পারে, ভাবকে কাজে পরিণত করতে পারে, আবার মনে মনেই তারা সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে যায়। তাই মানুষ তার মন নামের সোনার পাত্রটি যে সব গল্প দিয়ে ভরিয়ে রাখে তা'তে সবার আগে ছিল তার বাবার গল্প অর্থাৎ ঈশ্বরের আর তার প্রথম প্রতিবেশী বন্ধু'র অর্থাৎ কিনা জীব-জন্তুদের গল্প।

একেবারে গোড়ায় গোড়ায় মানুষ পাথরের বুকে, পাহাড়ের গায়ে, কাদা-মাটির 'পরে খোদাই ক'রে, ছড়ি দিয়ে ছবি এঁকে নিজেদের মন খোলসা করত। আর এগুলোর সব কিছুই শুধু মজাদার গল্প ছিল না ; নিজেদের দরকারে এগুলো গড়ে উঠত—একই সঙ্গে প্রয়োজন, শিক্ষা দেওয়া, ভাব বিনিময় এবং কল্পনা সবই গায়ে গা লাগিয়ে থাকত।

গল্পের সবচেয়ে গোড়াকার জিনিস হচ্ছে কল্পনা। আমাদের দেশে এই কল্পনার আরম্ভ হয়েছে ধর গিয়ে সেই অনার্যদের সময় থেকে। যাকে বলা হয় সিন্ধু সভ্যতা। নানারকম মুদ্রায় অনার্যরা ছবি দিয়ে লিখত। ছবি দিয়ে লেখা এই অক্ষরগুলির সব মানে এখনো হয়ত আবিষ্কার করা যায়নি কিন্তু প্রায় শ' চারেক চিহ্নের রকমসকম ধরা পড়েছে। এই লেখাগুলো সাধারণত ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হ'ত, কখনো বা এর উল্টোটা। তাছাড়া অনার্যরা মুদ্রার গায়ে ষাঁড়, হাতি, বাঘ, গণ্ডার ইত্যাদির ছবি আঁকত ; তাদের লড়াইয়ের, তাদের বিচরণ করার। মানুষেয় নানা অঙ্গভঙ্গীরও ছবি খোদাই করা থাকত তা'তে। আর থাকত দেব দেবীর মূর্তি।

এইরকম ক'রে বিকাশ হ'ল কল্পনার।

তারপর আর্যরা যখন বাইরে থেকে এসে ঘোর লড়াই ক'রে অনার্যদের হারিয়ে দিয়ে নিজেদের উন্নত সভ্যতা তৈরি করলে তখন তাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হ'ল ঋগ্বেদ। এই ঋগ্বেদেও ঈশ্বর বন্দনার ফাঁকে ফাঁকে গল্প, আপনি ধরা পড়েছে। যখন ধর মহা বলশালী ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্তের ভীষণ লড়াই বেধেছে। বৃত্ত হ'ল গিয়ে দুর্দান্ত অসুর, পাজীর পাঝাড়া একেবারে। অনাবৃষ্টি লাগিয়ে দিয়ে

মজা দেখে। অনেকরকম ভেল্কিবাজী জানে। ইন্দ্র তাঁর লাল হাত দিয়ে বাজ ছুঁড়ে মারলেন তাঁর শত্রুর দিকে। ভয়ংকর শব্দে আকাশে শত শত লোহার ফলার মতো সেই বাজ ফেটে পড়ল। গোঁ গোঁ করতে করতে বৃত্ত ব্যাটা কুপোকাৎ। তার শরীরের চাপে আকাশ-মাটি একেবারে কেঁপে ওঠে। এইভাবে পথের কাঁটা দূর হওয়াতে মেঘেরা তখন দলে দলে তাদের ভাঁড়ার ঘরের দরজা খুলে দিতে থাকে। অমনি নদী ফেঁপে ওঠে, সাগর ফুলে ওঠে। হাওয়া বয়, বৃষ্টির তীর ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। চাষীরা আনন্দে ডগমগ হয়। তাদের ন্যাড়া শস্যক্ষেত একধারে কাতর হয়ে পড়েছিল; এবার তা আর থাকবে না। শীগ্‌গিরই ধানের মঞ্জরীতে ঢেউ খেলে উঠবে। ওদিকে তখন খুব ধুমধাম—হৈ হৈ প'ড়ে গেছে, ইন্দ্র জিতেছেন; সমবয়স্ক দেবতারা সব তাঁকে কলবল ক'রে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বয়স্করা আশীর্বাদ করছেন। এমন কি ব্যাঙেরা, যারা নাকি এতক্ষণ এক জায়গায় পড়েছিল গোঁজ হয়ে, তারা অবধি জলের ধারে সকলের সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে আনন্দে মকমক করতে থাকে।

গল্পের দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ, তারপরে পারস্য। আমাদের ভারতের গল্প কত—পুরাণ, তারপর রয়েছে পঞ্চতন্ত্র। তখন তো বড়দের গল্প আর ছোটদের গল্প ব'লে আলাদা কিছু ছিল না, সব একরকম হ'ত। হয়ত তখনকার ঠাকুমা-দিদিমারা এখনকার মতোই তাঁদের নাতি-নাতনীদের গল্প শোনাতেন শীতের মিটমিটে আলোয় আর ঝুপঝুপে বর্ষার সন্ধ্যায় চালভাজা কিংবা মুড়ি চিবুতে চিবুতে। ওরই মধ্যে যেগুলো ছোটদের উপযুক্ত সেগুলোকেই হয়তো তাঁরা বেছে নিতেন। সবচেয়ে পুরনো জাতকের গল্প হচ্ছে জগতের সব গল্পের প্রথমে. আর তারপরে পঞ্চতন্ত্র। লোকজন, জীবজন্তুর, নানা বোকামি, চালাকি, অসাধুতা, সাধুতা, নিয়ে লেখা জাতকের গল্পই বল আর পঞ্চতন্ত্র-ই বল, গল্পকে গল্পও হ'ত আবার সেই সঙ্গে তাতে থাকত নীতিকথা, উপদেশ অর্থাৎ কিনা গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেওয়া।

সেকালের সভ্যজগতে এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারত, একদেশের গল্প আরেক দেশে ভ্রমণ করতে পারত অনায়াসে। এখনকার মত এটা আমার, ওটা তোমার এ রকম ভাব ছিল না। অত কথা কি, আমাদের সংস্কৃতে যে পিতর, মাতর বা বাবা, মা ডাক তা সবদেশেই একটু হেরফেরে প্রায় একরকম। যেমন ধর, লাটিনে পেটার, মেটার, ইংরিজীতে ফাদার, মাদার, জর্মানীতে ফেটার মাটার। অতএব ভারতবর্ষের জাতকের এবং পঞ্চতন্ত্রের অনেক গল্পের সঙ্গেই যে ঈশপের গল্পের কিংবা পরে ডেনমার্কের কবি ও গল্পলেখক হ্যানস ক্রীশ্চিয়ান, অ্যাণ্ডারসন এবং জর্মান দেশের লেখক গ্রীম্ ভাইদের গল্পের মিল থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

জাতকের সেই যে জাম খাওয়ার গল্প যাতে নাকি এক বোকা কাককে এক ধূর্ত শেয়াল খুব গুল-তাপ্পি মেরে প্রচুর জাম বাগিয়েছিল, সেই গল্পটা বেড়াতে বেড়াতে দিব্যি চলে গিয়েছে ঈশপ-এর ফেব্‌ল-এ। জাতকের কতক কতক গল্প আছে আবার পঞ্চতন্ত্রে। শোনা যায় বাইবেলের পরেই সবচেয়ে যে-বই বেশি অনুবাদ হয়েছে পৃথিবীতে, তা হ'ল পঞ্চতন্ত্র। সুতরাং জাতকের বা পঞ্চতন্ত্রের বহু গল্পই যে দেশবিদেশে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।

'অস্তি ভাগীরথী তীরে বিশালঃ শাল্মলীতরু' বললেই আমাদের মনে পড়ে পঞ্চতন্ত্রের কথা।

পঞ্চতন্ত্র প্রথম ভ্রমণ করতে যায় পারস্য দেশে। সেখান থেকে হাতবদল হ'তে হ'তে দেশ-বিদেশে চলে যায় এবং গল্পগুলি নানা জায়গায় কখনো আস্ত কখনো টুকরোভাবে ছড়িয়ে পড়ে। জাতক বা পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে ঈশপ নামে গ্রীক দেশের একটি লোকের নাম জড়িয়ে আছে। শোনা যায় সাবোস দ্বীপের দুই প্রভুর ক্রীতদাস ছিলেন ঈশপ। ঈশপের বুদ্ধির দৌড় দেখে খুশি হয়ে তাঁর প্রভুরা তাঁকে মুক্তি দেন। তাঁর নিজের সম্বন্ধেই নানা গল্প প্রচলিত আছে। একবার নাকি এক রাজাকে প্রজারা সিংহাসন থেকে হঠাতে চাইছিল, ঈশপ সেকথা জানতে পেরে মস্ত এক জায়গায় সব লোককে জড় করে একটি গল্প বলতে থাকেন—'ব্যাঙেরা এক রাজা চাইছে।' ঐ এক গল্পের চোটেই রাজা নাকি সে যাত্রা বেঁচে যান। আরেকবার, আগুন দরকার একটু ঈশপের। তিনি গেছেন পাড়ার একটি লোকের কাছে আগুন ধার করতে। লণ্ঠনে ক'রে আগুন নিয়ে ফিরে আসছেন এমন সময় একজন পথচারী তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ মশাই, আপনি দিনমানে লণ্ঠন নিয়ে কি খুঁজছেন?' ঈশপ তার উত্তরে বলেন, 'এমন একজন লোককে যে নিজের চরকায় তেল দেয়।'

যাই হোক্‌গে ঈশপের 'প্রায় আড়াই শ' গল্পের এক চতুর্থাংশ যে ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ করা এইরকম একটা আন্দাজ করেছেন বিদেশী পণ্ডিতরা। তার মধ্যে গোটা তের গল্প জাতক অথবা পঞ্চতন্ত্রের।

দেশ-দেশান্তরে মানুষ যখনই যাচ্ছে, তখনি তার সঙ্গে সঙ্গে গেছে তার আচার ব্যবহার, তার জামাকাপড় পরা, খাওয়া দাওয়ার ধরনধারন, আর তার গল্প। সুতরাং কোনটা কি ক'রে এসেছে, কিভাবে কার যঙ্গে মিশেছে এর চুলচেরা বিচার করা শক্ত। তাই ঈশপের গল্প যখন চীন দেশে অনুবাদ হয়ে বেরিয়েছিল, তখন নাকি চীন দেশের লোকেরা ভীষণ অবাক হয়ে যায় এবং পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে স্বদেশে তার প্রচার বন্ধ ক'রে দেন। কেননা তাঁদের ধারণা হয় গল্পগুলি আসলে তাঁদেরই এবং তাঁদেরই কেউ লিখেছেন। নইলে অত মিল হয় কি করে!

পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা হচ্ছেন বিষ্ণুশর্মা আর কথাসরিৎ সাগরের সোমদেব। কথাসরিৎ সাগর বয়সে পঞ্চতন্ত্রের চেয়ে ছোট হলেও গায়ে-গতরে কিন্তু অনেক বড়—প্রায় জাতকের সমান সমান। এতেই আছে বেতাল পঞ্চবিংশতি, শুক-শারীর গল্প, যে সব গল্প তোমরা সবাই জান। কথাসরিৎ সাগরের কতক কতক গল্প; সেগুলো বেশীর ভাগই বড়দের মতো, আরব্যোপন্যাসেও পাওয়া যায়।

গল্পের সাগর কথাসরিৎসাগর, সুতরাং হরেকরকম গল্পের সঙ্গে কিছু মজাদার গল্পও আছে। একটি গল্প বলি। দুই বোবা শিষ্যের গল্প। এক গুরু তাঁর দুই শিষ্য নিয়ে আশ্রমে বাস করতেন। গুরু তাদের শেখান আক্কেল দেন আর তারা গুরুর পদসেবা করে; দু' জনে দু' পায়ে তেল মাখায়। ডান পায়ে তেল মাখায় যে শিষ্যটি সে একদিন নেই, কোথায় যেন গিয়েছে। গুরু ঠাকুর তাঁর অন্য শিষ্যটিকে বললেন বাঁ পা ছেড়ে ডান পায়ে তেল মাখাতে। বাঁয়া শিষ্যটি বেঁকে বসল। বললে, না, ও পায়ে আমার গুরুভাই তেল মাখায়, আমি ও পায়ে মাখাব না।

গুরুও তেমনি নাছোড়বান্দা, খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। গুরুর একগুঁয়েমি দেখে শিষ্যেরও

গেল গোঁ চেপে। সে একটা পাথর দিয়ে দিলে গুরুর ডান পা-টা গুঁড়িয়ে। গুরু অমনি—গেলুম রে মলুম রে, করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন সেই ডান শিষ্য এল ফিরে। সব বৃত্তান্ত শুনে সেও অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল বাঁয়া শিষ্যের ওপর। এত বড় কথা, আমার পা কিনা ও দিয়েছে ভেঙে! আচ্ছা, আমিও দিচ্ছি ওর পা খানা ভেঙে। এই না বলে পাথরটা কুড়িয়ে নিয়ে ডান শিষ্য দিলে তার গুরুর বাঁ পা খানা গুঁড়িয়ে। দুই উপযুক্ত শিষ্যের কাছে দুই ঠ্যাঙ হারিয়ে গুরু বুক চাপড়ে হায় হায় করতে লাগলেন!

রোগীর উপবাস

যোগীন মজুমদার

বেশি কিছু খেয়োনাকো
বলেছেন ডাক্তার
ভয়ে ভয়ে আছি তাই
যে রকম রাগ তার !
ভজুয়াটা দিয়ে গেলো
সেরটাক ঘুগুনি
গল্পেতে গল্পেতে
পাত হ'ল শূন্যি ।
মনে মনে ভাবলুম
খাবনা গো কিচ্ছু,
সস্তটা রোগা হোক
তবু খাঁটি বিচ্ছু ।
বলে 'দাদু,—পাতে খাব'
জুড়ে দিল বায়না
একই কথা বার বার
কাণে কিছু যায় না
অবশেষে খেতে হ'ল
ভাজা থেকে চাটনি !
ভাবলুম,—সয়ে যাবে
করে নেব খাটনি ।
সন্ধ্যেটা না যেতেই
এলো বিশু পাত্তর
খেলো লুচি সন্দেশ
দুই কুড়ি মাত্তর ।
ভদ্রতা খাতিরেতে
খেতে হ'ল সাথে তার ।

রাত্তিরে উপবাস—
দেবো ঠিক এইবার।
গ্যাঁট হয়ে বসে আছি
রাতে ঠিক উপবাস,
কোত্থেকে মতি এসে
করে দিল সব ফাঁস।
ঘরে আজ পূজো আছে
যেও দাদা একবার
'যাবো না' কি বলা চলে
ঘাড়ে মাথা কটা কার?
যেতে হ'ল শেষকালে
আয়োজন সুবিশাল
যা হবার হয়ে গেছে,
উপবাসী র'ব কাল!
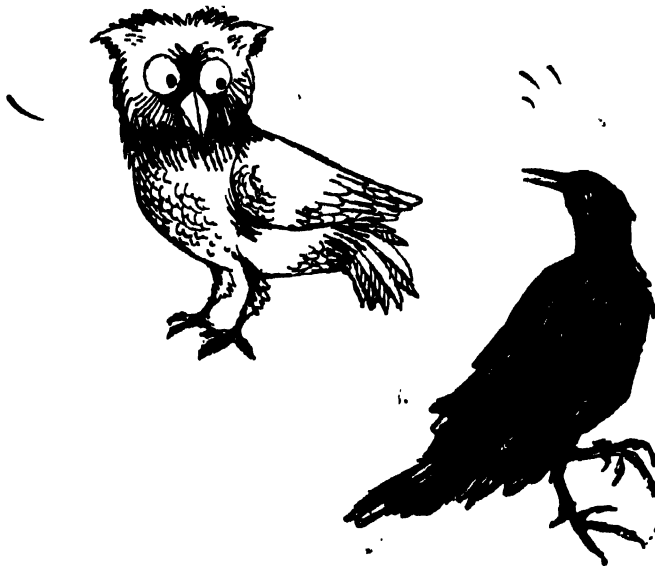
একটি আশ্চর্য ছেলের কথা

ঢং—ঢং—ঢং ঢং— !

তিনটার সময়ে ঘণ্টা বেজে স্কুল ছুটি হতেই কলরব করতে করতে বেরিয়ে পড়ল ছেলের দল। কেউ সোজা বাড়ির দিকে ছুটল, কেউ গল্প করতে করতে ধীর পায়ে চলল, আবার কেউ বা সঙ্গীদের সঙ্গে একটু খেলে নিল আগে। সিমলা পাহাড়ের বিখ্যাত এই স্কুলটি একটু নিচের দিকে, অধিকাংশ ছেলেকেই ২।১ মাইল পথ হেঁটে বাড়ি যেতে হয়।

ছোট একটি দশ বছরের ছেলে কিন্তু ছুটি হতেই সোজা চড়াই পথে উঠে চলল। বন্ধুরা খেলতে ডাকলে সে একটু মিষ্টি হাসল, কিন্তু দাঁড়াল না। ক্ষিদে পেয়েছিল বৈকি, কিন্তু তবু সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল না। পাঁচ মাইলের উপর চড়াই পথ ভাঙতে হবে তাকে। মধ্যে মধ্যে দারুণ শ্রান্তি এসেছিল, কিন্তু তবু সে থামল না, পিঠে বইয়ের ঝোলা নিয়ে আর ছোট দুটি হাতে ছাতাটি শক্ত করে ধরে সে যখন সঞ্জৌলি এসে পৌছল তখন মিলিটারি হাসপাতালের ঘড়িতে ঠিক পৌনে পাঁচটা। হাসপাতালের একটা ছোট কামরার দরজায় যখন ছেলেটি এসে দাঁড়াল ক্ষিদেয় আর পরিশ্রমে শুকনো তার মুখে তখন ফুটে উঠেছে সাফল্যের হাসি।

হাসি ছড়িয়ে পড়ল আর একজনের মুখেও। ছেলেটির বাবা মিলিটারি ডাক্তার, কিন্তু একটা জিপ দুর্ঘটনায় সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে তিনি এখন নিজেই রোগী হয়ে প্ল্যাস্টারে মুড়ে শুয়ে আছেন।

আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তিনি উৎকণ্ঠাও অনুভব করেন ;—সারাদিন স্কুল করার পর না খেয়ে, না বিশ্রাম করে, রোজ রোজ এতখানি পথ পাহাড় ভেঙ্গে এলে ছেলের শরীর ভেঙ্গে পড়বে না? পড়াশুনার খুব ক্ষতি হবে না তার ?

ডাক্তার বন্ধুরাও নিষেধ করেন। দরকার কি রোজ রোজ আসার ? কেবল ছুটির দিনে এলেই তো পারে ছেলেটি।

ছেলেটির সংকল্প কিন্তু অচল, অটল। মুখে মৃদু মৃদু হাসে আর মনে মনে ভাবে যে সারাদিনের পর একমাত্র ছেলের হাসি মুখটি একেবারে না দেখতে পারলে বাবা এই দারুণ রোগযন্ত্রণা সহ্য করবেন কেমন করে ? তাই রোজই সে আসে। সারাদিন খাওয়া হয় নি। হাসপাতালে পৌছেই সে পেট ভরে খেয়ে নেয় আগে। বাপের সঙ্গে কিছুটা হাসি গল্প আর খুচরো খবরের আদান প্রদান চলে। তারপর বাপের পাশে বসে স্কুলের পড়া তৈরি করে। রাত্রে যখন সে মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফেরে তখন ক্লান্তিতে আর ঘুমে তার দুই চোখের পাতা প্রায় বুজে এসেছে।

এই ভাবেই চলেছে দিনের পরে দিন।

একদিন শুরু হল প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি। দোকান পাট বন্ধ হয়ে গেল, পথে লোক চলাচল থেমে গেল। বাবা মনে ভাবেন আজ আর ছেলে আসবে না। আবার একটু চিন্তিতও হয়ে পড়েন, কি জানি, যদি সে ঝড় বৃষ্টির বহর বুঝতে না পেরে রওনা হয়ে থাকে, তাহলে পথেই কোথাও তাকে আশ্রয় নিতে হবে।

পৌনে পাঁচটা বাজল। ক্রমে পাঁচটাও বাজল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, আজ নিশ্চয় সে সোজা বাড়ি ফিরে গেছে। আবার মনে মনে একটু বেদনাও বোধ হল, যার জন্য সারাদিন পথ চেয়ে থাকেন সেই প্রিয় হাসি মুখটি দেখতে পাবেন আরো ২৪ ঘণ্টা পর!

এমন সময়ে তাঁর কামরার দরজায় দেখা দিল ছোট একটি মূর্তি, নগ্নশির, ছিন্ন-পাদুকা, আপাদমস্তক আর্দ্র, কিন্তু ঠাণ্ডায় নীল হয়ে যাওয়া মুখে দিগ্বিজয়ীর হাসি!

আনন্দ আর উৎকণ্ঠার দ্বন্দ্ব লাগে বাপ মায়ের মনে—আগে জামা খোল, গা মোছ, বাপের একখানা মস্ত বড় জামাই না হয় পর, তাঁরই বিছানায় কম্বলের তলায় ঢুকে গরম হয়ে নাও!

ছেলেটি তখনও হাসছে।

—ছাতা কি হল?

—কত বড় বড় শিলা পড়ছিল—কাপড়টা আগে ছিঁড়ে গেল, তারপর যখন ডাণ্ডাটাও ভেঙ্গে গেল, তখন ছাতাটা ফেলে দিলাম।

—আর জুতো?

—সেতো পাথরে লেগে একেবারে ছিঁড়ে গেছে!

—এমন দুর্যোগের দিনে কি আসতে হয় বাবা?

—ছেলেটি মুখ লুকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে, কিছু বলে না।

—যদি সাংঘাতিক অসুখ করে?

—দেখে নিও, কিছু হবে না।

আশ্চর্য—সত্যিই তার কিছুই হল না।

সাড়ে চার মাস তার বাবা ছিলেন হাসপাতালে, ঝড় জল অগ্রাহ্য করে প্রতিদিন সে স্কুলের পর সোজা এল তাঁর কাছে।

—তোমার পড়াশুনার যে বড্ড ক্ষতি হচ্ছে?

—না, বাবা, দেখে নিও, কোনও ক্ষতি হয় নি।

—আশ্চর্য! পরীক্ষার ফল বেরোলে সত্যি সত্যিই দেখা গেল যে প্রতিবারের মতন এবারেও ছেলেটি তার প্রথম স্থান অক্ষুন্ন রেখেছে!

এই আশ্চর্য মেধাবী, দৃঢ়চিত্ত ও পিতৃভক্ত ছেলেটির নাম আনন্দ। সার্থক নাম তার। যারই সংস্পর্শে সে এসেছিল, সবাইকেই আনন্দ দিতে পেরেছিল।

বড়ই দুঃখের কথা যে সেই আনন্দ আজ আর এই পৃথিবীতে নেই, মাত্র এগার বৎসর বয়সে অকস্মাৎ সর্পাঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে। তার ছোট্ট জীবনে যে তাকে এতটুকুও চিনেছিল সেই তার প্রতিভা আর স্বভাবচরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, আবার সেই তার আকস্মিক পরলোকগমনে মর্মাহত হয়েছিল। আনন্দ ছিল সন্দেশের একটি গ্রাহক, তাই তার বাবা তার আশ্চর্য সুন্দর জীবনের এই ঘটনার কথা আমাদের জানিয়েছেন অন্য গ্রাহক গ্রাহিকাদের কাছে তুলে ধরবার মত।

ইন্দ্রজিৎ রায় তাঁর বাইরের ঘরে বসে ভাবছিলেন : কী করা যায় ? হঠাৎ স্ত্রী মারা গেছেন—একটি মাত্র ছেলে শঙ্কর রইলো একা—; তাকে দেখাশুনা করবে কে ? স্ত্রী—উর্মিলা যে এমন করে হঠাৎ মারা যাবেন সে কথা কেউ ভাবে নি। দিব্যি সুন্দর স্বাস্থ্য। এমন হাসি খুশি মানুষ—। হঠাৎ যে তার কি হলো—কোন ডাক্তারই তা ঠিক মত বলতে পারলেন না। ইন্দ্রজিৎ রায় বসে বসে একাই ভাবছিলেন। এমন ভাবনার অন্ধকারে রাত দিনই তাঁর কেটে যায়।

বাবাকে ঘরে একা দেখে ছুটে শঙ্কর এলো ঘরে : বাবা আমি একটা ঘোড়া কিনবো !

ঘোড়া ? ঘোড়া দিয়ে কী হবে ? ইন্দ্রজিৎ রায় অবাক হলেন।

কেন চড়বো—বেড়াব টগবগ করে। পিসিমা বলেছেন তোমার নাকি একটা সুন্দর আরবী ঘোড়া ছিল—কেমন টক টকে তার গায়ের রং, তেমনি তেজী। তুমি যখন সেটাতে চড়ে টগ বগ করে বেড়াতে তখন তোমাকে ঠিক নাকি সাহেবদের মত লাগতো।

: তা হোক। সে সব অনেক দিনের কথা তখন আমার বয়স কম ছিল কি না তাই। এখন আমি ও সব ছেড়ে দিয়েছি—বুড়ো হয়ে যাচ্ছি তো, আর কাজের চাপও বড্ড বেশি পড়ে গেছে। এই তো এখুনি

বেরুতে হবে মহাল দেখতে।—কাজের কি আর অন্ত আছে—শঙ্কর তোমার পিসিমাকে একবার ডাকতো দেখি, একটু জরুরী কথা আছে—

পিসিমা—বলে শঙ্কর দৌড়োতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই একটি প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকলেন। পরনে সাদা থান। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। একটু মোটার দিকেই চেহারাটা, কিন্তু ভারি প্রশান্ত, ভারি স্নেহময়ী, মায়ের মতই চেহারা। শঙ্করের বাবা ইন্দ্রজিৎ রায়ের সঙ্গে চেহারার খুব মিল আছে। এক নজরেই ভাইবোন বলে চেনা যায়।

পিসিমা ইন্দ্রজিৎ রায়ের দিদি—। শঙ্করের মা মারা গেলেন। কে বাড়ি ঘর দেখে—কে শঙ্করকে দেখে, তাই দিদির ওপর সব ভার চাপিয়ে দিলেন ইন্দ্রজিৎ রায়। ওঁরও কেউ নেই একটি ছেলে দশ বছর বয়সে মারা গেছে। তাই শঙ্করকে মায়ের মতই বুকে তুলে নিলেন তিনি। আর শঙ্করও যেন হারানো মা ফিরে পেল পিসিমার মধ্যে।

পিসিমাকে দেখে শঙ্কর ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো : তুমি তো এখুনি বাবার ঘোড়ার গল্প বলছিলে —সেই আরবী ঘোড়া—কেমন টগবগ করে চলে। বলে শঙ্কর খানিকটা টগবগ করে চলে দেখালো। তারপর ছুটে এসে পিসিমার বুকের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে : আমাকে একটা আরবী ঘোড়া দাও পিসিমা।

শোনো ছেলের কথা। ঘোড়া দিয়ে কী হবে বল্ তো ?

কেন চড়বো টগবগ করে বাবার মত।

তা আর নয়! এই টুকু ছেলে কি ঘোড়ায় চড়ে ? পড়ে শেষে হাড় গোড় ভাঙ্‌বে।

না কিছুতেই আমার হাড় গোড় ভাঙবে না আমি ঘোড়ায় চড়বো।

আচ্ছা চড়িস্। এখন যা তো ওদিকে। আমি তোর বাবার সঙ্গে একটু কথা বলি।

না—যাব না—আগে ঘোড়া দাও।

পরে হবে এখন খেতে যাও—। খাবার নিয়ে বসে আছে ঝি।

না যাব না তুমি চল।—বলেই পিসিমাকে টানতে লাগলো শঙ্কর।

তুমি যাও দিদি তোমার ছেলে নিয়ে। কথা পরে হবে। ও বড় দুষ্টুমি করছে।

চল বাবা যেতে বলেছে—; বলেই পিসিমাকে এক রকম টেনেই নিয়ে গেল শঙ্কর।

ইন্দ্রজিৎ রায় হাসলেন। দিদি আসবার পর শঙ্কর আর মার জন্যে কাঁদে না তত বেশি। পিসিমাকে পেয়ে অনেকটা সে মার কথা ভুলতে পেরেছে। আর পুত্রহারা পিসিমাও যেন সমস্ত মাতৃ স্নেহ দিয়ে বুকে তুলে নিয়েছেন শঙ্করকে। নিজের হারানো ছেলেকে যেন খুঁজে পেয়েছেন শঙ্করের মধ্যে। এত বড় বাড়িতে শঙ্করের কোন বন্ধু ছিল না। পিসিমাকে পেয়ে যেন তার নিঃসঙ্গতা অনেকখানি কেটেছে। সারা দিন সে পিসিমার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে পায়ে ফেরে। গল্প শোনে—কত রূপকথার গল্প, কত ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প, কত রাক্ষস খোক্কসের কাহিনী। কেমন করে রাজপুত্র হাড়ের পাহাড় কড়ির পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পাশাবতীর রাজ্যে গেল চলে। কেমন করে রাক্ষসদের মেয়ে

রাজকন্যাকে উদ্ধার করলো।

আবার কখনও ইন্দ্রজিৎ রায়ের ছোটবেলার দুষ্টুমির গল্প শোনে পিসিমার কাছে। কেমন ওরা ছোটবেলায় নষ্টচন্দ্র করতো সে গল্প ; কেমন করে স্কুল পালিয়ে দুপুর রোদে মাছ বলে ব্যাঙাচি ধরেছিলেন কোঁচার কাপড় জালের মত বিছিয়ে ; তারপর যখন বেলা বাড়তে লাগলো, রোদ চড়তে লাগলো—ইন্দ্রজিতের আর দেখা নেই। পিসিমা চোখ বড় বড় করে চলে গেলেন : আমরা তো ভেবে আর বাঁচি না—শেষে দেখি শেষ বেলায় ভিজে খানিকটা কি কোঁচড়ে করে এনেছে। কী আছে কোঁচড়ে দেখি ? পিসিমা একমুখ প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন : ওমা মাছ কোথায়, দেখি কি দিব্যি লেজওয়ালা এক কোঁচড় ব্যাঙাচি লাফাচ্ছে। মা তো ঠাস করে ইন্দ্রর গালে—! শঙ্কর হো-হো করে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো : মা মণি বাবাকে মারতেন ?

: হ্যাঁ—মারতেন বৈকি দোষ করলে কিন্তু সেদিন মেরেই চমকে উঠলেন ওমা একি—গা ভর্তি যে জ্বর। সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে আর জল ঘেঁটে ঘেঁটে ওর জ্বর এসে গেছে।

: তারপর—?

: তারপর আর কী—ডাক ডাক্তার—; ডাক ডাক্তার। তিনদিন ধরে বিছানায় শুইয়ে রাখা হলো—। তারপর জ্বর ছাড়লো।

: আমি মাছ ধরবো পিসিমা—

: আচ্ছা ধরিস এখন—

: না এখুনি ধরবো—

বারে এখুনি ধরা যায় নাকি ? তার কত ব্যবস্থা করতে হয়। ছিপ চাই, চার চাই। আর এ সব না থাকলে মাছ উঠবে না, তোমার বাবার মত ব্যাঙাচি উঠবে।

শঙ্কর বেশ ঘাবড়ে গিয়ে বললে : কবে সব ঠিক করে দেবে।

: কাল—

: ঠিক তো—ঠিক—!

: হবে রে হবে।

শঙ্করের যেমন জেদ তেমনি বায়না। সব সময় কিছু না কিছু সে বায়না করছেই করছে। কিছু বললে সে শুনবে না—। যেন মনে হয় তার কোন ইচ্ছের ওপর কারুর বাধা দেওয়া চলবে না। ইন্দ্রজিৎ রায় বুঝতে পেরেছিলেন এর ফল আদৌ ভালো হবে না। শঙ্কর পড়াশুনা করে না—করতে তার ভালো-লাগে না। স্কুলে সে যায় না। কিছুতেই হাজার মারপিট করেও পাঠান যায় না। স্কুলে গেলে নিয়ম এবং বাঁধাবাঁধি তার মোটেই পছন্দ হয় না।

সবই তো অভ্যাসের ব্যাপার। পড়াশুনা করাটাও অভ্যাস। কিছু ভালো লাগে না। কিছুই করতে গা লাগে না। এই করে করে শঙ্করের মাথা মোটা হয়ে যাচ্ছে। সারাদিন আর কি করবে—শুধু খাই খাই। এবং পিসিমার তদ্বিরে সেটা খুব ভালো ভাবেই চলছে। সুতরাং খেতে খেতে

সে যেমন পেটুক হয়ে যাচ্ছে তেমনি মোটা হয়ে যাচ্ছে। আর দেহের ওজন দেখে লোকে 'কোন দোকানের রেশন খান' জিজ্ঞেস করছে।

ইন্দ্রজিৎ রায়ের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। যদি তিনি কখনও একটু শাসন করতে যান অমনি পিসিমা ছুটে এসে কেঁদে ভাসিয়ে দেন: আহা ও আমার বংশের একমাত্র ছেলে—শিবরাত্রের সলতে। মা মরা ছেলে। ও যদি পড়াশুনা নাই করে—তাতেই বা কি এসে যায়? তাই বলে কি পড়া পড়া করে ওকে মেরে ফেলবে?

: শাসন করলে কি মেরে ফেলা হয়? ইন্দ্রজিৎ রায় গম্ভীর হয়ে যান। মহামূর্খ আর নিরেট বোকা হয়ে যাচ্ছে—ওর ভবিষ্যৎ—

: এত কথা আমি বুঝি নে বাপু—তুমি আমায় কাশীতে পাঠিয়ে দাও।—দিদি চরম রায় দিয়ে দেন, ইন্দ্রজিৎ কাঁচুমাচু হয়ে সামনে থেকে সরে যান।

কদিন ভাইয়ে বোনে একটু মন কষাকষি চলে। তারপর আবার যে কে সেই। শঙ্কর কখনও অসম্ভব সব খাবার বায়না করছে, কখনও জঙ্গলে গিয়ে শেয়ালের বাচ্চা ধরে আনছে তাকে খাঁচায় রেখে পুষবে বলে, কখনও বা কুকুরের ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে দিয়ে মজা দেখছে, কখনও প্যাঁচার বাচ্চা ধরে তাকে দাঁড়ে বসিয়ে নামতা পড়াচ্ছে। দিন কাটছে বেশ এই ভাবে। কেউ পড়তেও বলে না। স্কুলে যেতে বলে না। কেউ শাসনও করে না। একেবারে অবাধ স্বাধীনতা।

সেদিন সোমবার। সকাল থেকেই একটু একটু বিষ্টি পড়ছে। পিসিমা বারান্দায় বসে তরকারি কাটছেন আর শঙ্কর বসে বসে কাঠি দিয়ে একটা বেগুন ফুটো করছে আর সমানে একটানা ঘ্যান ঘ্যান করছে: পিসিমা খিচুড়ি খাব—

: খাস এখন—

: আর সঙ্গে বেগুনী ফুলুরী—

: আচ্ছা—বেশ।

বাড়ির পুরোনো চাকর রেমো এসে খবর দিলে: পিসিমা দাদাবাবুকে বাবু একটু ডাকছেন।

: কে এসেছে রে রেমো? শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলো।

: তোমার মাস্টারমশাই—তোমাকে পড়াবেন।

: মাস্টার মশায় এই বিষ্টির মধ্যে? শঙ্কর চমকে উঠলো।

: হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। বিষ্টির মধ্যেই দিব্যি ছাতা মাথায় দিয়ে এসেছেন। গায়ে কোট। যেমন তেলতাগড়া তেমনি তেনার মেজাজ তিরিক্ষি—একবার এসো না দেখবে।—বাবু কিন্তু ডাকছেন তোমাকে দাদাবাবু।

: আমি পড়বো না। তুই যা—

রেমোর বয়েস বেশি নয়। শঙ্করের চেয়ে কিছু বড়। ওর বাবাও এই বাড়িতে কাজ করেছে বুড়ো বয়স পর্যন্ত। কাজেই রেমো শঙ্করের প্রায় খেলার সাথীর মতনই থাকে এ বাড়িতে।

: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করছে। যা—যা বলছি।

রেমো বেশ মজা পেয়ে গেল : যা বললেই যাব নাকি, গেলেই হলো। চলো শিগগির, বাবু ডাকছেন। পিসিমা দেখুন। দাদাবাবু কিন্তু যাচ্ছে না। বাবু কিন্তু রাগ করবেন।

: যা বাবা ইন্দ্র শেষে রাগ করবে। বাবার কথা শুনতে হয়। পিসিমা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন।

: আমি পড়বো না পিসিমা—শঙ্কর সোজা জানিয়ে দিলে!

: না পড়িস না পড়বি। যা শুনে আয় বাবা ডাকছেন কেন।

পিসিমা হাত ধরে শঙ্করকে উঠিয়ে দিলেন। আর রেমো একটা চোখের ভঙ্গি করে শঙ্করের পেছনে পেছনে চলতে লাগলো, মুখে তার দুষ্টুমির হাসি।

দরজার কাছে গিয়ে শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইলো। ঘরে ঢুকলো না। রেমো বললে : বাবু, দাদাবাবু—

: ঘরে আয় শঙ্কর— ; ইন্দ্রজিৎ রায় একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন। শঙ্কর ঘরে ঢুকলো।

: শঙ্কর তোমার মাস্টারমশায় উনি, প্রণাম করো।—ইন্দ্রজিৎ রায় আদেশ করলেন।

খানিকটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শঙ্কর। তারপর ধপ করে প্রণাম করে পালিয়ে যাচ্ছিল। ইন্দ্রজিৎ রায় খপ করে ওর হাত চেপে ধরলেন : যাচ্ছিস কোথায়? আজ থেকেই তুই পড়া শুরু করবি। মাস্টারমশায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন : যান আপনি রেমোর সঙ্গে ও আপনাকে শঙ্করের পড়ার ঘরে নিয়ে যাবে।

মাস্টারমশায় ঘরে গিয়ে বসলেন। আর ইন্দ্রজিৎ রায় ছেলেকে পাখি পড়া করে বোঝাতে লাগলেন : লক্ষ্মীবাবা আমার, মন দিয়ে পড়বে। মাস্টারমশায় যা বলবেন শুনবে। ওঁকে বিরক্ত করবে না। আর, নিয়মিত স্কুলে যাবে এবার থেকে। যাও লক্ষ্মী ছেলে হয়ে—

: বই সব হারিয়ে গেছে—

: আচ্ছা আজ যাও কাল আমি সব কিনে দেব—। যাও তাড়াতাড়ি যাও, উনি একা একা বসে আছেন।

মাস্টারমশায় বসে আছেন তো বসেই আছেন। চা এলো—খাবার এলো—কিন্তু ছাত্রের দেখা নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে যখন মাস্টারমশায় উঠবো উঠবো করছেন তখন পিসিমা এসে ঘরের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

: আমি শঙ্করের পিসিমা।

: ওঃ—। তটস্থ হয়ে প্রণাম করলেন মাস্টার। আশীর্বাদ করে পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন : তুমিই শঙ্করের মাস্টারমশায়? এত ছেলেমানুষ? তা নাম কি বাবা তোমার?

: অনুপম বসু মল্লিক।

: বাড়ি কোথায়?

: শ্যামবাজার— ; সংক্ষেপেই উত্তর দিলো অনুপম।

: বাড়িতে কে কে আছেন ? বাবা মা ?

: হ্যাঁ সবাই আছেন। আমরা দু ভাই আর দু বোন। কিন্তু পিসিমা, শঙ্কর আজ পড়বে না ?

: আজ ওর পড়তে ঠিক ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ এলে কিনা তুমি ! কাল থেকে ও ঠিক পড়বে।—আজ—ওকে ছেড়ে দাও বাবা—

: আচ্ছা তবে থাক আজ। আমি আসি তবে। কাল কিন্তু যেন ও পড়ার জন্যে বইপত্র নিয়ে তৈরি হয়েই থাকে। আমি ঠিক সময় আসবো।

: সে সব আমি কাল ঠিক করে দেব। তুমি কিছু ভেবো না অনুপম। তা হলে আজ—

পিসিমাকে আবার প্রণাম করে অনুপম বিদায় নিলো।

অনুপম বেরিয়ে গিয়ে সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। খানিকটা হেঁটে এসে একটা বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো অনুপম। বড়লোকের আদুরে ছেলে, তার ওপর মা মরা, পিসিমার কাছে মানুষ। একে যে পড়ানো যাবে এমন তো বোধ হয় না। অন্তত: পিসিমার যে রকম প্রশ্রয়, তাতে মনটা অনুপমের চটেই গেল। তবু দেখা যাক কালকের দিনটা। অনুপম মনে মনে ভাবলো কালকের দিনটা সে একবার চেষ্টা করে দেখবে। যদি এই ব্যাপার চলে, তবে আর আসবে না। অনর্থক সময় নষ্ট করবার মত উৎসাহ তার নেই।

পরের দিন অনুপম এসে ঘরে ঢুকতেই শঙ্কর পালাচ্ছিল হাত ভর্তি আঠা নিয়ে। রেমো তাকে ধরে আনলো। দু হাত ভর্তি আঠা—ঘর ভর্তি ঘুড়ি জোড়ার কাগজ মনে হলো এতক্ষণ সে ঘুড়িই মেরামত করছিল অনুপমকে আসতে দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছিলো। একগাল হেসে রেমো বললো।

: বসুন ম্যাষ্টারবাবু, দাদাবাবু যে পালাবে বাবু তা জানতেন তাই আমাকে দরজায় পাহারা থাকতে বলেছেন। আপনার কোন ভয় নেই আমি কিছুতেই দাদাবাবুকে পালাতে দেব না।

মনে মনে প্রচণ্ড চটেছিল শঙ্কর, দাঁতে দাঁত কিড়মিড় করে আঠা হাতে রেমোর দিকে সে চড় তুললো।

: তোমার বই কোথায় নিয়ে এস হাত ধুয়ে— ; চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে অনুপম বললেন যথাসম্ভব মধুর স্বরে।

: বই নেই—শঙ্কর উত্তর দিলো !

: সে কি হলো ? তোমার বাবা যে বললেন : সব আছে ?

: হ্যাঁ ছিল তো ! এখন আমি সব ছিঁড়ে ঘুড়ি জুড়েছি।

: বেশ— ! শুনে সুখী হলাম। তা এখন কী করবে ?

: একটা গল্প শুনবো— ; গল্প বলুন না একটা !

: গল্প ? অনুপম খানিকটা চুপ করে রইলো। কি যেন চিন্তা করলো খানিকক্ষণ তারপর বললে : একটি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি ভারি গরীবের ছেলে ছিলেন কিন্তু খুব ভালো ছেলে ছিলেন।

তাঁর পড়াশুনোয় এমন—

: হুঁ! ফাঁকি দিয়ে পড়ার কথা বলা হচ্ছে? আমি বুঝি কিছু বুঝি না। আমি কিছুতেই ওসব গল্প শুনবো না—ভূতের গল্প বলুন—ডাইনীবুড়ি—রাক্ষস খোক্ষসের গল্প বলুন।

: ডাইনী বুড়ির গল্প, রাক্ষস খোক্ষসের গল্প আমি জানি না। অনুপম গম্ভীর হয়ে বললো।

: তবে কী জানেন? এবারে শঙ্কর পেনসিলটা কামড়াতে লাগলো।

: পড়ার কথা ছাড়া আমি অন্য কথা জানি না। বলেই শঙ্করের মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অনুপম। তার চোখের দৃষ্টিতে আর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যার জন্যে শঙ্কর চমকে খানিকটা চুপ করে রইলো। সে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে, তারপর হাতের কাছের খাতাটা কুটি কুটি করে ছিঁড়লো। তারপর হঠাৎ নজরে পড়লো জানালায় একটা কাক এসে বসেছে। তৎক্ষণাৎ হাতের পেনসিলটা ছুঁড়ে মারলো কাকটাকে। কিন্তু কাকটা লাফ দিয়ে উড়ে এসে আবার অন্য জানালাটায় বসলো। কি যেন ভাবলো খানিকক্ষণ, তারপর অনুপমের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল: আপনার দাঁত-গুলো অত বড় বড় কেন?

: জানি না—

: বলুননা মাস্টার মশায়? বলুন না? আপনার নাকটা কেন কাকের ঠোঁটের মত?

অনুপম স্তব্ধ হয়ে নিজের রূপ বর্ণনা শুনতে লাগলো।

তারপর চুলগুলো অমন ব্রাসের মতন কেন? কদম ছাঁট দেন বুঝি? শঙ্কর আবার যেন কী বলতে চাচ্ছিল। অনুপম বাধা দিয়ে একটা চাপা গর্জন করে বললে: তাহলে তুমি পড়বে না।—অনুপমের চোখ দিয়ে তখন আগুন ঝরছিল।

: আপনার জামায় কী গন্ধ—বাবা:! কাচেন না কেন? শঙ্কর নাক সিঁটকোবার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাশি সিক্কার চড় এসে শঙ্করের গালে পড়লো এবং তৎক্ষণাৎ অনুপমের অন্তর্ধান। সে চপেটাঘাত সহযোগে পলায়নের জন্য প্রস্তুত হয়েই এ কাজ করেছিল। তাই এতক্ষণ ধৈর্য ধরে সে মনকে প্রস্তুত করছিল। কিন্তু শঙ্করের এ অভিজ্ঞতা প্রথম, কাজেই খানিকটা সে হতভম্ব হয়ে বসে রইলো, তার পরেই একটা প্রচণ্ড চিৎকার দিলো: মেরে ফেললে,—মেরে ফেললে আমাকে।

পিসিমা মাস্টারমশায়ের জন্যেই খাবার সাজিয়েছিলেন পড়ি মরি করে ছুটে এলেন: কি হলো বাবা—কি হলো। ওমা সত্যিই তো মেরে ফেলেছে—। গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে। লোকটা কি ডাকাত। যেমন চোয়াড়ে চেহারা তেমনি গুণ। ওকে দেখে আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল ও খুনে। কতবার বললাম ইন্দ্র ওসব আজে বাজে লোক দিয়ে কি ছেলে পড়ানো হয়! ওকে রাখিস না। তা আমার কথা কী শুনলে—এখন দেখুক কি করবে।

শঙ্কর আরো চেঁচাতে লাগলো—দাপাতে লাগলো। মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। যেন তাকে খুন করে ফেলেছে কেউ। তার সঙ্গে পিসিমা কোরাস ধরলেন।

রেমো বাইরের ঘরে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ রায়কে খবর দিলো: পিসিমা ডাকছেন। দাদাবাবুকে

মেরেছেন মাস্টারমশায়। দাদাবাবুর জন্যে ডাক্তার ডাকতে বলছেন পিসিমা। একটু আসুন—

ইন্দ্রজিৎ রায় এলেন। পিসিমার খেদ—শঙ্করের চিৎকার—রেমোর আস্ফালন—চাকর বাকরদের ছুটোছুটির মধ্যে শুধু স্থির হয়ে ছবির মত দাঁড়িয়ে খুব ভালো করে দেখলেন শঙ্করকে। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

(২)

শঙ্কর সাত দিনের মত বিছানা নিলো। বড়লোকের নন্দদুলাল—একটা চড়ের ধকল সামলানো সোজা কথা! ডাক্তার এসে ওষুধ দিলেন। পিসিমার পরিচর্যা চলতে লাগলো। ভালো ভালো খাওয়া দাওয়া হতে লাগলো। এমনি করে একটি মাস কেটে গেল। পড়াশুনার নামও কেউ করে না। শঙ্করের আনন্দের আর অবধি নেই। মনে মনে ভাবছে আর বুঝি তার বিপদ আসবে না।

কিন্তু একটি সুপ্রভাতে আবার ডাক পড়লো শঙ্করের তার বাবার ঘরে। রেমো এসে বললে: চল দাদাবাবু তোমার নতুন ম্যাষ্টার এসেছে। বাবু খবর পাট্যেছে।

শঙ্কর চমকে উঠলো। ভেবেছিল আপদ বিদায় হলো, কিন্তু এ আবার কী! আবার নূতন উৎপাত এসে হাজির হলো যে। কিন্তু বাবা এবার একটু কড়া ভাবেই বললেন: যাও শঙ্কর তোমার মাস্টারমশায়কে নিয়ে যাও। কোনো গোলমাল করো না মন দিয়ে পড়ো, কেমন?

শঙ্কর শুধু একবার চোখটা ট্যারা করে তাকালো। তারপর ছুটে পড়ার ঘরের দিকে চলে গেল। রেমোই মাস্টারমশায়কে ঘরে নিয়ে পৌঁছে দিলো। মাস্টারমশায় দেখলেন শঙ্কর একপাশে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

: এসো বোসো। গম্ভীর স্বরে বললেন মাস্টার মশায়। তার গলার স্বর ও হাবভাব দেখে মনে হলো ইন্দ্রজিৎবাবু তাঁকে আগেই কিছু বলে দিয়েছেন। কাজেই মাস্টারমশায়ের ভাব গতিকের মধ্যে যেন প্রথম থেকেই একটু কড়া শাসনের সুর আছে বলেই মনে হলো সুতরাং শঙ্কর স্থির হয়ে এসে বসলো। কিন্তু চোখের দৃষ্টি বেশ চঞ্চল।

: তোমার নাম কী খোকা?

: শঙ্কর।

: শঙ্কর, বাঃ বেশ নাম। কিন্তু অমন করে গুরুজনদের কথার জবাব দিতে হয় না। বলতে হয় শ্রীশঙ্কর রায়।

: উঁ।

: তোমার কী বই পড়তে ভালো লাগে? মাস্টারমশায় জানতে চাইলেন।

: কিছু না—একটুও না।

: কিছুই পড়তে ভালো লাগে না? না—না। তা কি হয়? কিছু পড়তে নিশ্চয়ই ভালো লাগে। আচ্ছা শোনো—আজ কী পড়বে বলো। তোমার বই কোথায়?

ঃ আজ থাক মাস্টারমশায়। আপনি বরং কাল সকালে আসবেন। কাল আমি বইপত্তর সব খোঁজ করে রাখবো, তখন পড়বো। আজ কান কট্ কট্ করছে।

ঃ কান কট্ কট্ করছে—? কেন?

ঃ শুধু শুধু—আবার কেন?

ঃ মানে—?

ঠিক এমনি সময় চা আর খাবার হাতে পিসিমা এসে ঘরে ঢুকলেন এবং শঙ্করকে বাঁচালেন বলা চলে। খাবারের প্লেটটা সামনে রেখে বললেন ঃ খাও বাবা খাও। আজ পড়া থাক কাল সকাল থেকেই শুরু হবে, কাল বৃহস্পতিবারও আছে। সেই ভালো হবে। কি বলো?

ঃ আচ্ছা—

একটু দেখে শুনে পড়িও বাবা। ছেলেটা মা-মরা—আর ওই তো রোগা। মাস্টারমশায় একবার শঙ্করের দিকে তাকালেন, সে তখন আরশোলার গোঁফে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল।

ওকে আমি নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বলেই মনে করি, বলেই কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছলেন—। ওকে পেয়ে আমি পুত্রশোক ভুলেছি। এর আগে যে মাস্টারমশায় এসেছিলেন তিনি এমন চোয়াড়ে আর বদরাগী যে কী বলবো। ছেলেপুলে তো দুষ্টুমি করবেই। এইতো দুষ্টুমির বয়েস তাই বলে কী এমন করে মারতে হবে যে ও মরে যাবে? একদিন কী একটু দুষ্টুমি করেছে আর সেই গোঁয়ার মাস্টার এমন মেরেছিলেন যে ছেলে একেবারে অজ্ঞান! তারপর ডাক ডাক্তার—ডাক বদ্যি! একমাস পর ছেলে সুস্থ হলো। শাসন করতে গিয়ে যদি মেরেই ফেলা যায় তবে আর তার পড়াশুনার দরকার কী বলো তো বাবা।

ঃ তা তো বটেই—

ঃ তুমি বুদ্ধিমান ছেলে সবই তো বুঝতে পারছো—

ঃ মাস্টারমশায় খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন ঃ আজ আমি যাই পিসিমা কাল সকালেই বরং আসবো। বলেই মাস্টারমশায় হন-হন করে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা।

মাস্টারমশায়ের আসবার সময় হয়ে গেছে। শঙ্কর জানালা দিয়ে দেখলে গোয়ালা গরু দোয়াচ্ছে। শঙ্কর কী যেন ভাবলো। তারপর খানিকটা মাথা চুলকে নিয়ে একখানা খাতা হাতে করে যেখানে গোয়ালা গরু দোয়াচ্ছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। হাতে খাতাটা খুলে নিয়ে বললে ঃ এই গরু, তোর নামে আমি অনেক কথা লিখেছি, শোন্। আর খুব মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝে বল এ সব কথা তোর পছন্দ হয় কিনা।

শঙ্কর খাতা খুলে পড়তে লাগলো ঃ গরু বড় ভালো জীব। উহার এক পাটি দাঁত আছে আর এক পাটি ডাক্তার বাবুকে দিয়ে বাঁধাইয়া দিতে হইবে।

ঃ পিসিমা দেখুন, দাদাবাবু কী করছে, গরু দোয়াতে দিচ্ছে না—ভারি গোলমাল লাগিয়েছে।—

গোয়ালা গরুর হয়ে প্রতিবাদ জানালো। ঘরের ভেতর থেকে পিসিমা সাড়া দিলেন : ছিঃ বাবা, দুষ্টুমি করতে নেই।

: গরুর চারটি পা, দুটি কান, দুটি চোখ আছে। চোখের দৃষ্টি দেখলে মনে হয় একজোড়া চশমা চোখে ছিল এখুনি খুলে রেখে এসেছে। একটি দীর্ঘ লেজ আছে—তা দিয়ে সে মাছি তাড়াত ও গোয়ালাকে মাঝে মাঝে মারত।

: ও পিসিমা—গোয়ালার গলায় কান্না।

: গোয়ালা তোমার গরুর গলায় ছোট ছোট বালিশ বাঁধা কেন? শঙ্কর জিজ্ঞেস করলো। দড়ি দিয়ে বালিশ বেঁধে দিলে বুঝি ভালো হয়?

: দাদাবাবু তুমি যাও। নইলে নতুন গরু ক্ষেপে গিয়ে লাথি দিয়ে বালতি উলটে দেবে।

: দিগ্‌গে। আমি যখন এত কষ্ট করে ওর সম্বন্ধে একটা গল্প লিখেছি তখন ওকে শোনাবই শোনাব।—ওর মতামতটা আমার খুব দরকার।

কিন্তু শোনানো হলো না। দরজায় মাস্টার মশায় এসে দাঁড়ালেন—চলো শঙ্কর পড়বে।

: যাচ্ছি মাস্টারমশায় আপনি যান,আমি এক্ষুনি আসছি। মাস্টারমশায় ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আজ ঘরটি একটু বিশেষ ধরনের সাজানো। সব বন্ধ জানালা খোলা। মাস্টারমশায় এসে চেয়ারে বসলেন। চারিদিকে একবার তাকালেন। ঘরটি বেশ সুন্দর। জানালা দিয়ে বাগান দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ছাত্রের আর দেখা নেই। মাস্টার মশাই ঘড়ি দেখতে লাগলেন ঘন ঘন।

হঠাৎ যেন মনে হলো পটাং করে একটা ঢিল পড়ার শব্দ। আর হাঁড়ি ফাটার মত একটা আওয়াজ হলো।

আর দেখতে না দেখতে বোঁ বোঁ—শব্দে ঘর মুখর হয়ে উঠলো আকাশ যেন কালো করে হাজার হাজার ভিমরুল ছুটে এলো ঘরের মধ্যে।

মাস্টারমশায় এক মিনিটে কি যেন ভেবে নিলেন। বয়স এবং দূরদর্শিতার জন্যে বিদ্যুৎবেগে তিনি অনুমান করে নিলেন এবং এক লাফে সদর দরজা দিয়ে একশো মিটার রেসের ঘোড়ার মত ছুটলেন এবং মুহূর্তে দিগন্তে বিলীন হলেন, ভবিষ্যতে যে কখনও আসবেন এমন মনে হলো না। দূরে দেখা গেল একটি শাখামৃগবৎ মূর্তি বত্রিশ পাটি দন্ত বিকাশ করে হাসছে আর এক পায়ে নৃত্য করছে।

দিন বয়ে চললো, শঙ্করের দিনগুলো আরো বেশি আনন্দ মুখর হয়ে উঠলো। কারণ বাবা আর শিগগির কোন মাস্টার মশায় খুঁজে পাবেন না এমন অবস্থা ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে শঙ্করের খ্যাতি। ইন্দ্রজিৎ রায়ের পুত্রের শিক্ষক একমাত্র বায়না দিয়েই তৈরি করান ছাড়া আর উপায় নেই এমন কথাও দু চারবার ইন্দ্রজিৎ রায়ের কানে গেছে। কিন্তু চোখের ওপর ছেলেটা খারাপ হয়ে যাবে—তাই বা কেমন করে হয়। বাবার মন তো বোঝে না, তিনি কিছুতেই ছেড়ে দেন না—আবার লোক খোঁজেন। কিন্তু মেলা একেবারেই দুষ্কর।

শঙ্কর সারাদিন মাঠে মাঠে পাখি ধরে, খেলা করে বেড়ায়। এখন সে সদাপ্রসন্ন থাকে। কারু সঙ্গেই কোনো বিরোধ নেই—যত অনর্থ শুধু পড়তে বললেই। পিসিমার কাছে নিত্য নানা খাবারের বায়না করছে আর পিসিমা হাস্য মুখে তা জুগিয়ে যাচ্ছেন। শঙ্করের দেহের স্ফীতি জয়ঢাক থেকে প্রায় মাদলে পরিণত হচ্ছে।

সবই ঠিক চলছে কিন্তু ইন্দ্রজিৎ রায়ের চিন্তায় আর চোখে ঘুম নেই। চোখের ওপর দিয়ে শঙ্কর ঘোরা ফেরা করে তিনি তাকিয়ে দেখেন আর ভাবেন কী করে ওকে মানুষ করা যায়।

চাকররা নালিশ করে : বাবু দুপুর বেলা কেউ হাঁ করে ঘুমলেই শঙ্কর আমের আঁটি ধীরে মুখের মধ্যে দিয়ে দেন—। গায়ে পিঁপড়ে ছেড়ে দেন চিনি ছড়িয়ে—।

ইন্দ্রজিৎ রায় যেন ভাবতে ভাবতে পাথর হয়ে যান। কোন কথার উত্তর যেন তাঁর মুখে জোগায় না।

কিন্তু দিন কাটতে থাকে এমনটি করেই ইন্দ্রজিৎ রায়ের।

তিন

একদিন বিকেলে ঘরের মধ্যে যখন পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখন একটা কালো ছায়া অলস ভাবে তাকিয়ার ওপর ঠেস দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসে আছেন।

বুড়ো নায়েব মাথা চুলকোতে চুলকোতে ঘরে ঢুকলো : কর্তাবাবুর শরীর কি খারাপ আজকে।

: নাঃ—! সংক্ষেপে উত্তর দিলেন ইন্দ্রজিৎ রায়।

: তাহলে মনটা বোধ হয় ভালো নেই—; বিনীত সুরে বললেন নায়েব মশায়।

: হুঁ। ছেলেটা তো মানুষ হলো না, কী করি বলো তো? সবই আমার অদৃষ্ট। একটা মাস্টার পর্যন্ত টিকলো না। যে আসে সেই পালায় এখন উপায় কী?

: তাই তো!—

: একটা মাস্টার জোগাড় করে দিতে পার হে—

: দেখি বাবু; চেষ্টা করি—। যদি পাই নিশ্চয়ই এনে দেব। খোকাবাবু আমারও তো পর নয় আমাদের চোখের মণি। কিন্তু কর্তাবাবু একটা কথা যদি অভয় দেন তো বলি।

: বল—বল না। কর্তাবাবু বললেন।

: দাদাবাবুকে মাস্টার দিতে ভয় করে। কে আসবে, কী তাকে করে বসবে দাদাবাবু। তারপর আমি গরীব মানুষ আপনার আশ্রয়ে আছি—আমার চাকরী যাবে। তখন আমি না খেয়ে মরবো। তা ছাড়া বাবু—, কেউ আসতে—

: বুঝেছি, দ্বিধা কেন, বলে ফেল। কেউ আসতে চায় না। সে আমিও জানি। আর আসতে চাইবেই বা কেন? শঙ্কর লোকের সঙ্গে যে ব্যবহার করে তাতে কেউ যদি না আসতে চায় তাতে

আমার রাগ করবার কী আছে। সব জেনেও বাপ-মার প্রাণ প্রবোধ মানে না। তাই বলে রাখি দেখ যদি কাউকে পাও—

: যদি আমার কোন আত্মীয়কে এনে দিই আর—

: দাও না। যদি পড়াতে না পারে তা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে কিছু বলবো না। আর তার জন্যে তোমার চাকরীও যাবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার চাকরীর ভয় নেই।—

বাড়ির পথে যেতে যেতে নায়েব ভাবলেন: কী করা যায়? যে ধরনের ছেলে, আলালের ঘরের দুলাল, তাতে তাকে যে কেউ পড়াতে পারবে এমন মনে হয় না। কিন্তু ভুলে কর্তার কাছে কথাটা পেড়ে ফেলে ভারি কাঁচা কাজ হয়ে গেছে। সারা পথ নায়েবমশায়ের সে কি অস্বস্তি।

বাড়ি গেলেন বটে নায়েবমশায়, তিন দিন আর তাঁর দেখা নেই। এদিকে দিনরাত ধরে সমানে ভাবতেই লাগলেন নায়েবমশায়: কী করা যায়? খাওয়া নেই' দাওয়া নেই—শান্তি নেই, ঘুম নেই।

শেষে ভাগনে হীরালালকে ডেকে বলবেন ভাবলেন কিন্তু তার আগে হীরালালই জিজ্ঞেস করলো: মামা, তোমার কী হলো বলো তো, খাচ্ছনা ঘুমোচ্ছ না? ব্যাপার কী বলো তো?

আরে তোকে কী বলবো। কর্তাবাবুর কাছে দাদাবাবুর মাস্টার ঠিক করে দেব বলে এসেছি। আজ তিনদিন ধরে খোঁজ করছি; কারুকে রাজী করাতে পারছি না। দু একজন চেনা লোক আছে বটে তবে তাদের কাছে কথাটা পাড়তেই তারা তো তেড়ে আমাকে মারতে আসে। বলবো কী এক ভদ্রলোক তো আমায় এমন গালাগালি করলে যে আমি পালাতে পথ পাই না। আবার তারই এক গুণ্ডা ভাই কাল তার দাদার কাছে সব খবর পেয়ে আস্তিন গুটিয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে: আর যদি কোন দিন এ সব প্রস্তাব নিয়ে এ পাড়ায় আসবেন তাহলে আমরা আপনাকে আড়ং ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দেব। আমারই এক মাসতুতো ভাইকে একবার এই জমিদারের ছেলেকে পড়াতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভিমরুল না বোলতা লেলিয়ে দিয়েছিলেন আমার মনে নেই সে কথা?

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম সে অপমানের শোধ ওরা আমার ওপর দিয়ে তুলে নেবে।

নায়েবমশায় খানিক্ষণ গালে হাত দিয়ে নীরবে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। আর হীরালাল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে গভীরভাবে ভাবতে লাগলো। এখন কী করা যায়?

খানিকক্ষণ ভেবে কি যেন একটা ফিকির মাথায় এলো তার: আচ্ছা মামা আমি যদি কর্তার ছেলেকে পড়াতে যাই।

যেন কারুর মৃত্যুর খবর শুনলেন ঠিক এমনি ভাবেই চমকে উঠলেন নায়েবমশায়: না-না। ও সবে কাজ নেই। যে বিচ্ছু ছেলে, আর যা তার পিসিমা একেবারে সেই ভুবনের মাসির মত পিসি। তবে তফাৎ হচ্ছে, শেষে ভুবন সব বুঝে মাসির কান কেটে নিয়েছিল এখানে শঙ্কর কোন দিনই কিছু বুঝবে না। সে চিরদিনই পিসির আদরের দুলাল হয়েই থাকবে। আচ্ছা ছেলে বাবা! কোন মাস্টারের গায়ে সাপ ছেড়ে দেয় কারু মাথায় ঢিল মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়, কারু গায়ে বোলতা কিংবা ভিমরুল লেলিয়ে দেয়—। এই তো চলেছে অনাসৃষ্টি ব্যাপার! না না ও সবে কাজ

নেই। তোমার প্রাণ যাবে আর আমার মান যাবে। আমরা যেমন সুখে দুঃখে আছি, তেমনি ভালো। আমাদের আর টিউশনির দরকার নেই।

: দেখিই না একবার গিয়ে। আমি ওকে কিছুটি বলবো না। আর তোমার কাছে শুনে যা বুঝলাম তাতে মনে হচ্ছে ওকে পড়াশুনার কথা না বললে আর কোন গোলমালই হবে না। সুতরাং আমি পড়াশুনা সংক্রান্ত কোন কথা ভুলেও বলবো না। ওর যা ইচ্ছে তাই করবে, আমি কোন বাধা দেব না। আমি ওকে নিয়ে খেলবো, সিনেমায় নিয়ে যাব, থিয়েটার দেখাবো—। ইস্কুলের পথও মাড়াতে দেব না। দেখো তুমি মামা, ও ছেলে আমাকে আর ছাড়তে চাইবে না। তোমার কোন চিন্তা নেই মামা। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। আমি হাজার বিরক্ত হলেও ওকে কিছু বলবো না গায়ে হাত দেওয়া তো দূরের কথা। তুমি কি আমায় বোকা ভাবো মামা যে ওর গায়ে হাত দিয়ে আমি প্রাণ হারাব?

নায়েবমশায় বললেন: না-না দরকার নেই; ও সব গোখরো সাপের ল্যাজ দিয়ে কাণ চুলকোনো।

: আচ্ছা তুমি একবার দেখই না।—যাই না দুদিন, যদি ভালো না লাগে ছেড়ে দেব।

: যদি কিছু গণ্ডগোল হয়—?

: হবে কেন? তবে তুমি বলেই দিয়ো—আমি পড়াবার চেষ্টা করবো নানা ভাবে—কিন্তু যদি ও না পড়ে, ভুলে যায়, বা ফেল করে তার জন্য আমায় মোটেই দোষ দেওয়া চলবে না।

: দেখি চিন্তা করে? নায়েব মশায় ভাবতে লাগলেন।

পরের দিন সকালে মামা ভাবছেন ভাগনেকে নিয়ে যাবেন কিনা কিন্তু আগের থেকেই হীরালাল তৈরিই হয়ে রয়েছে সুতরাং যেতেই হলো। মা কালীর ফটোতে প্রণাম করে মামা ভাগনে বেরিয়ে পড়লেন।

· বৈঠকখানাতেই বসেছিলেন ইন্দ্রজিৎ রায়। সহাস্যে বললেন: আসুন নায়েবমশায় আসুন। এই বুঝি শঙ্করের মাস্টারমশায়?

বিনীত ভাবে হাত জোড় করে নায়েবমশায় বললেন: আজ্ঞে।

: বাঃ বেশ খাসা চেহারাটি তো—তোমার নাম কী?

: শ্রীহীরালাল ঘোষ। কিন্তু আসল পরিচয়টি গোপন করলো হীরালাল।

: বস—বস এই চেয়ারে। বসুন নায়েবমশায়।

হীরালাল আর নায়েব মশায় কিন্তু দাঁড়িয়েই কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

: বেশ—বেশ। তা আমার ছেলে কিন্তু খুব দুষ্টু, তুমি শুনেছ তো সব?

: আজ্ঞে হাঁ, সব শুনেছি। কথা কি জানেন, ছেলেপিলে দুষ্টুমি একটু করেই। তাকে শুধরে নেওয়াই তো শিক্ষকের কাজ।

ইন্দ্রজিৎ খুশি হয়ে গড়গড়া টানতে লাগলেন। বললেন: কিন্তু শঙ্কর একটু বেশিমাত্রায় বেয়াড়া।

: ও ঠিক হয়ে যাবে। তবে সময় লাগবে। প্রথমবারেই যদি পাশ করাতে না পারি, অপরাধ নেবেন না।

হীরালালের স্পষ্টকথায় কাজের মানুষ ইন্দ্রজিৎ আরো খুশি হলেন বললেন : না, নিশ্চয়ই না। বেশ, তুমি তাহলে আজ থেকেই পড়াতে পারো। যা রেমো তুই ওঁকে দাদাবাবুর পড়ার ঘরে নিয়ে যা।

একটু বাঁকা হাসি খেলে গেলো রেমোর মুখে। হীরালালের দিকে তাকিয়ে বললে : আসুন মাস্টারমশায়। আমার সঙ্গে আসুন আমি আপনাকে দাদাবাবুর পড়ার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি এখন—

হীরালাল এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালো। ঘরখানার দিকে একবার চাইলো। ঘর খালি। সেখানে কেউ নেই। হীরলাল একবার এদিক ওদিক চাইলো। ঘরের ভেতর অসংখ্য ছেঁড়া ঘুড়ি—তাতে অঙ্কের বইয়ের পাতা দিয়ে সযত্নে পটি দেওয়া হয়েছে বাংলা বই খাটের তলায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে —আর তার ছবিগুলোয় শঙ্কর মনের আনন্দে দাড়ি গোঁফ এঁকেছে। পরে শ্লেট দেখেই বোঝা গেল, তা দিয়ে পেরেক ঠোকার কাজ চলে। সুতরাং এ ঘরে যে কখনও সরস্বতীর রাজহাঁসের পালকও উড়ে এসে পড়েনি এ কথা বুঝতে কিছুমাত্র দেরী হয় না।

হীরালাল চেয়ারে গুম হয়ে বসে কিছুক্ষণ নিজের কর্ম পদ্ধতির কথা চিন্তা করে নিলে।

আর রেমো তখন দাঁত বের করে মিটমিট করে হাসছিলো হীরালালের দিকে চেয়ে। একবার রেমোর দিকে চোখ পড়তেই সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল হীরালালের। তবু আত্মগোপন করে বললে : শঙ্কর কোথায়?

: ও—ওই যে—হোথায়; ওদিকে পেয়ারা গাছে।

: ওঃ। তা, আমায় ওখানে নিয়ে যেতে পার?

: হ্যাঁ, চলনা বাবু ওই তো হোথা দাদাবাবু কত পেয়ারা খাচ্ছে।

হীরালাল গাছের তলায় গিয়ে একটা মোটা ডাল হাত দিয়ে নামিয়ে এনে বললে : এস শঙ্কর গাছ থেকে নেমে এস। আমি তোমাকে ভালো ভালো পেয়ারা পেড়ে দিচ্ছি।

: না, তুমি পড়াতে এসেছ আমি নামবো না। নামলেই তুমি আমাকে ধরে নিয়ে জোর করে পড়াবে।—আমি জানি তুমি আমাকে পড়াতে এসেছ—কিছুতেই নামবো না।

আমি তোমাকে মোটেই পড়াবো না!

: এসো দাদাবাবু বাবু তোমাকে পড়তে বলেছে। নেমে এসো।

: পেয়ারা ছুঁড়ে তোর নাক ভেঙ্গে দেব। যা ভাগ্ এখান থেকে।

: আমি তোমাকে মোটেই পড়াবো না কথা দিচ্ছি। এসো, আমরা আজ পেয়ারাই পাড়ি।

শঙ্কর গাছ থেকে নেমে এলো। ধীরে ধীরে মাস্টার মশাইর দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলো। মাস্টার মশাইকে যেন সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। আবার মনে মনে একটু আশ্চর্যও হচ্ছে সে —এ আবার কোন ধরনের লোক যে তাকে পড়তে বলছে না! হীরালালের ভাবগতিক দেখে সে বেশ খানিকক্ষণ হকচকিয়ে রইলো।

তারপর ধীরে ধীরে হীরালালের ব্যবহারে, কথাবার্তায় তার যেন কেন হীরালালকে খুব ভালো লাগলো। তাকে পড়ার কথা না বলার জন্যে সহজেই হীরালালের সঙ্গে তার ভারি ভাব জমে উঠলো। তারা এক সঙ্গে বাগানে খেলে বেড়ায়, পুকুরে সাঁতার কাটে, মাছ ধরে। খেলার মরশুমে গুরু শিষ্য খেলার মাঠে খেলা দেখতে যায়। মাঝে মাঝে দুজনে সিনেমাতেও যায়। ইস্কুলে যাবার কথা বা পড়ার ধার দিয়েও হীরালাল নেই। পিসিমার আনন্দ আর ধরে না। দু হাত ভরে খাবার তৈরী করে খাওয়াতে লাগলেন হীরালালকে। আজ চন্দ্রপুলি কাল মোহনবাঁশী—পরশু চুষি পিঠে। আরো কত কী!

কেউ তাকে পড়তেও বলে না—কেউ তাকে ইস্কুলে যাবার জন্যে পীড়নও করে না—ভারি মজা!

আজ শঙ্কর মাস্টারমশায় বলতে অজ্ঞান। এক দিন যদি হীরালাল না এলো শঙ্কর ছটফট করতে থাকে। একদিন যদি ওর আসতে দেরী হয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। আর ব্যস্ত হয়ে বার বার পিসিমাকে জিজ্ঞেস করে: মাস্টারমশায় কখন আসবেন।

ইন্দ্রজিৎ রায়ও যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। দিনগুলো তাঁর বেশ কাটছিলো। এখন শঙ্কর নিয়মিত স্কুলে যায় নিজের ইচ্ছেতেই।

কিন্তু এত চেষ্টা করেও পরীক্ষায় পাশ করাতে পারলো না হীরালাল শঙ্করকে। পরীক্ষার কয়েক মাস আগে থেকে অবশ্য সে পড়াচ্ছে। তা হলে কী হবে। শঙ্কর তো মন দিয়ে পড়ে না মোটেই। কিছুতেই তার মন বসাতে পারে না হীরালাল। তাই ফেল সে করবেই—হীরালাল জানতো সে কথা।

নিজের অদৃষ্টের কথা ভেবে বিমর্ষ হয়ে গেল সে, বহু গল্প করে কথা বলে অনেক যত্ন করেও সে শঙ্করকে পরীক্ষায় তরাতে পারলো না।

এতদিন ধরে হীরালাল কত জিনিস পিসিমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে—পিসিমা খুশি হয়েই দিয়েছেন। কত জিনিস ইন্দ্রজিৎ রায় খুশি হয়েই দিয়েছেন—যদি মানুষ হয় ছেলেটা যদি পাশ করে।

কিন্তু আজ? ইন্দ্রজিৎ রায় যেন ভেঙ্গে পড়লেন নিরাশায়। সব বুঝেও তিনি যেন কিছুই বুঝতে চান না। শঙ্কর যথা নিয়মে স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করেছে—এ যেন তার অদৃষ্ট লিপি—দেয়ালের লিখন যেন তিনি কী এক আশ্চর্য কথা পড়ে পড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছেন। আর ঘন অন্ধকারের মধ্যে একা একা খোলা জানালার ভেতর দিয়ে অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন তাঁর একমাত্র বংশধর কী মসীকৃষ্ণ পরিণতির, কী অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে অনিবার্য গতিতে।

আকাশ কালোয় কালো। কখনও কখনও এক আধটা বাদুড় ডানার ছায়া মেলে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে। আকাশে অসংখ্য তারার মালার থেকে এক একটা তারা ঝরে ঝরে—ছিটকে ছিটকে পড়ছে।

তখনও আকাশে দূরের কালো গাছপালা গুলো দুলে উঠছে। ঐ অন্ধকার আকাশের মতই ত অদৃষ্ট। চোখ দিয়ে তাঁর দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

(চার)

হীরালাল আসার ফলে সাময়িক ভাবে যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল শঙ্করের মধ্যে কাজে কর্মে—খেলায় ধুলোয় যেন সে একটু সুধীর হয়ে উঠেছিল। একদিন যদি হীরালাল না আসতে শঙ্কর অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতো হীরালালের জন্যে। মাঝে মাঝে মনে হতো ও বুঝি হীরালালকে বে পছন্দ করে—ভালোবাসে।

: মাস্টারমশায় তোমার কাপড় এত ময়লা কেন ?

: একটু মাথা চুলকে হীরালাল বললো— ; তাড়াতাড়ি এসেছি কি না তাই বদলাতে ভু গেছি।—

: না—তোমার আর কাপড় নেই !

: কে বললে ?

: আমি বলছি তুমি লজ্জা করছো।—

: আরে না-না !

: হ্যাঁ—পিসিমা—ও পিসিমা মাস্টারমশার কাপড় নেই দেখ ময়লা কাপড় পরে এসেছে—আ লজ্জায় কেমন বলছে—না, না।

: কাপড় নেই বাবা—তা সে কথা বলতে দোষ কী ? শঙ্কর তো তোমার নিজের ভাই। আ ও তোমাকে যেমন ভালোবাসে তাতে তোমার ওর কাছে লজ্জা করবার কী আছে ? আচ্ছা আমি যাচ্ছি তোমরা পড়।

পড়িয়ে বেরিয়ে যাবার সময় পিসিমা হীরালালের হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন।

: কী পিসিমা ?—হীরালাল বিস্মিত হলো।

: কেন বাবা, তোমার কাপড় —নাও, নইলে আমি ভারি কষ্ট পাবো। অগত্যা নিতেই হলে হীরালালকে।

বৈঠকখানায় বসে বসে ইন্দ্রজিৎ রায় দেখতেন সন্ধ্যা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, ঘরের ভিতরে কোনায় কোনায় ছায়া ঘন হচ্ছে। আর নিজের জীবনের কথা মনে পড়ছে। বয়স তো বেড়েই চলেছে ছেলেটা যদি মানুষ হয় তবেই সব রক্ষে, নইলে এতবড় বিষয়-ব্যবসা-জমিদারী, সবই নষ্ট হয়ে যাবে শঙ্করের মনে স্নেহ দয়া মায়া তো আছে। ও তো মানুষকে ভালোবাসতে জানে। তবে কেন ওর পড়া শুনায় এত অবহেলা। বুদ্ধি আছে প্রচুর—কিন্তু সে বুদ্ধি কী কাজে ওর লাগবে ?

কি হে ইন্দ্রজিৎ অন্ধকারে কী ভাবছো বসে বসে !—বাল্যবন্ধু মিস্টার মুখার্জি এসে ঘরে ঢুকলেন।

ভাববো আবার কী ! একটা ছেলে, তাকেও মানুষ করতে পারলাম না। এ গ্লানি কি সহজে যাবার ?

: তুমি এত বিচলিত হয়ে পড়ছো কেন ভাই। সবার বুদ্ধি কি এক বয়সে খোলে। এখন ওকে যা দেখছো পরে হয়তো একেবারে বদলে যাবে।

: হয়তো যাবে, কিন্তু তখন আর আমি বেঁচে থাকব না—ইন্দ্রজিৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

: এবারও ফেল করলো। একটি মাস্টার পেয়েছিলাম ; হীরালাল ছেলেটির নাম। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি ব্যবহার। শঙ্করও ওকে খুব ভালোবাসতো, আমার এসব দেখে মনে ভারি আশা হলো হয়তো ওর স্বভাব এবার বদলে যাবে। কিন্তু দেখলাম হীরালাল ওর সঙ্গে কেবল খেলাধুলো করে আর ঘুরে বেড়ায়। পড়বার কথা শুনলেই ছেলে ব্যাজার হয়। অথচ পরীক্ষা এসে যাচ্ছে—আমি টিপে দিলাম হীরালালকে। একটু একটু পড়াবার চেষ্টা কর, পাশ করলে তোমাকে আমি পুরস্কার দেব। কিন্তু কী বলতো সলিসিটার ভায়া, পড়ার কথা বললেই ছেলে ক্ষেপে ওঠে।

: আরে ও সব কিছু নয়—সলিসিটার মুখার্জি বললেন।

: কিছু নয় ? ছেলেটা গোল্লায় যাচ্ছে, তুমি বলছ কিছু নয় ?

: শুধরে যাবে।

: না যাবে না।—ইন্দ্রজিৎ আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : ওকে দিয়ে আমার আর কোনো আশা নেই।

অনেকক্ষণ ধরে ঘরের ভেতরটা স্তব্ধ হয়ে রইলো রেমো বাতি দিয়ে গেল, তারপর সলিসিটার বন্ধুকে চা-জলখাবার দিয়ে গেল।

কিন্তু ঘরের বিষণ্ণতা কাটলো না। সত্যিই ইন্দ্রজিৎ রায় এবার একেবারে মুসড়ে পড়েছেন। প্রিয় বাল্যবন্ধুর এতো প্রবোধেও তাঁর মনের মেঘ কাটছে না —একমাত্র বংশধর এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে তা তিনি কখনও ভাবতেও পারেননি। কিন্তু কী হবে আর ভেবে, সবই নিয়তি। আজ উর্মিলা বেঁচে থাকলে হয়তো কত কাঁদতো সে।

: কি ভাবছো ভাই ? সলিসিটার জিজ্ঞেস করলেন। চমকে উঠলেন ইন্দ্রজিৎ। যেন চিন্তার সমুদ্রে তিনি তলিয়ে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে যেন আচমকা ফিরে এলেন।

: আমি উইল করবো মুখার্জি।—বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে কথাটা বললেন ইন্দ্রজিৎ।

: পাগল হয়ে গেলে নাকি ? তোমার এমন কী বয়স হয়েছে যে এখুনি উইল করতে হবে ?

: উইল করবার কী কোন বয়স আছে ? না উইল করলেই আমি মরছি ? তবে করে রাখা ভালো।

: না—না। এখন কোনো দরকার নেই। পরে দেখা যাবে।

: কিছুই বলা যায় না ভাই।—ইন্দ্রজিৎ জবাব দিলেন : কেউ বলতে পারে না কখন হঠাৎ তাকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে।

: তুমি খামোকা এত বাজে কথা ভাবছোই বা কেন ? আজ তোমার হয়েছে কী ?

: বাজে কথা নয় ভাই, আমার মন বলছে, এটা করে রাখা ভালো, কখন কী হয় কিছু বলা যায়

না। তা ছাড়া আমাকে শিগ্‌গীর মহালে যেতে হবে। যাওয়ার আগেই আমি সব সেরে ফেলতে চাই তুমি সব গুছিয়ে রেখো, আমি তোমার ওপরেই ভার দিলাম সব করবার।

ছাড়বে না যখন, তাই হবে। কিন্তু আমি বলছিলাম এ-সবের কোনো দরকার ছিল না—মুখার্জি উঠে পড়লেন : আজ উঠি, একটু কাজ আছে।

আমার কথাটা মনে রেখো কিন্তু। আমি অনেক ভেবে ওটা ঠিক করেছি।

: আচ্ছা দেখছি। কাল পরশুর ভেতরে ব্যবস্থা করব একটা।

মুখার্জি চলে গেলেন আর ইন্দ্রজিৎ রায় একা ঘরে বসে বসে কত কী ভাবতে লাগলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ—তাঁর সম্পত্তি, তাঁর সংসার আর সকলের ওপরে একটা নিদারুণ রক্তঝরা ক্ষতের মতো শঙ্কর কী হবে ওর ?

ভাবতে চানও না, কিন্তু ভাবতে না চাইলেই কী না ভেবে থাকা যায়। ভাবনাগুলো অক্টোপাসের মত শত পাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে তাঁকে। কিন্তু না—উইল করতেই হবে, না করে কোনো উপায় নেই।

রাতে খেতে বসে ভাতগুলো নাড়াচাড়া করেই উঠে গেলেন। পাশে বসে দিদি দেখলেন শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে একটি কথাও বললেন না। আজ যেন তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গেছে ইন্দ্রজিৎ রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

দিন সাতেক পর একদিন সকালে উঠে ইন্দ্রজিৎ রায় বললেন : ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলো আমি এখুনি বেরুবো।

: ফিরবি কখন ? দিদি জিজ্ঞেস করলেন।

: একটু দেরী হবে, জরুরী কাজ আছে।—থম থম করছে ইন্দ্রজিৎ রায়ের মুখখানা।

আর কিছু বললেন না তিনি।

: আচ্ছা, একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করিস। শঙ্কর আবার বায়না ধরেছে দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে যাবে।

: ওঃ ! ইন্দ্রজিৎ একবার নিঃশব্দে ছেলের দিকে তাকালেন কেবল।

: কোথায় যাবে বাবা ? শঙ্কর বাবার কাছে এসে দাঁড়ালো।

: কাজে! ইন্দ্রজিৎ রায় কারুর সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

বেলা যখন প্রায় দুটো ; শঙ্কর তখন বাগানে খেলা করছে বাড়ির পোষা কুকুরটার সঙ্গে। পিসিমা সবে খেতে বসেছেন। হঠাৎ শোনা গেল বাড়ির সামনে প্রচণ্ড গোলমাল। রেমো চিৎকার করে কাঁদছে। নায়েব মশায় হাহাকার করে কাঁদছেন। খাওয়া ফেলে ছুটে যেতেই বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন পিসিমা।—লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে—সবাই ধরাধরি করে ইন্দ্রজিৎ রায়ের প্রাণহীন দেহ গাড়ি থেকে ধীরে ধীরে নামিয়ে বারান্দায় শোয়াচ্ছে।

বাড়ি ফেরবার পথে গাড়িতেই হার্টফেল করেছেন ইন্দ্রজিৎ রায়।

(পাঁচ)

সুখের সংসারে দুর্দিনের ছায়া নামলো।

কাজকর্ম মিটে গেল। সলিসিটর মুখার্জি এলেন। সাক্ষী সাবুদ এলো। ইন্দ্র রায়ের উইল বেরুলো লোহার সিন্দুক থেকে। পড়া হলো।

শ্বেতপাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে সব শুনলেন পিসিমা দাঁড়িয়ে। উইল পড়া শেষ হলো। পিসিমা কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো শঙ্করের মার অয়েল পেনটিংটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর শঙ্করের হাত ধরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সর্বনাশা উইল করে গেছেন ইন্দ্রজিৎ রায়। তাঁর মনে মনে কী এই ছিল? চোদ্দ বছরের শঙ্করকে তিনি একটি কানা কড়িও দিয়ে যান নি। কারবার দিয়ে গেছেন ভাগনেদের, পৈতৃক বাড়িখানা দিয়েছেন এক ভাইপোকে—, আর একখানা বাড়ি একটি শিশু কল্যাণ আশ্রমকে—, ব্যাঙ্কের একলাখ টাকা একটি অনাথ আশ্রমকে। পিসিমার জন্য সামান্য কিছু গ্রাসাচ্ছাদন—; আর শঙ্কর? কিছুই নেই তার জন্যে?

* * * *

অবিশ্বাস্য। সবাই বললে অবিশ্বাস্য, এ হতে পারে না একমাত্র বংশধর, আদরের দুলাল, তার জন্যে এ ব্যবস্থা হতেই পারে না। সলিসিটার মুখার্জি কঠিন মুখে বললেনঃ এই ব্যবস্থাই উইলের।

সবাই বললেঃ ইন্দ্রজিৎ রায়ের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নইলে এ কখনও সম্ভব? একমাত্র ছেলেকে কেউ এভাবে বঞ্চিত করতে পারে?

কিন্তু কোন উপায় নেই। যথা সময়ে এসে ভাইপোরা বাড়ি দখল করলো। তারপর শুরু হলো অত্যাচার। পিসিমা আর শঙ্কর তাদের চোখের বালি। বাড়ির ঝি চাকরের মত রাখে—সব সময় উপদ্রব চালায় আর দূর দূর করে। অবশেষে পিসিমা আর সহ্য করতে পারলেন না। ধনীর দুলালের হাত ধরে পথে নামলেন। যে কখনও এক পা হাঁটেনি তাকে ভাসতে হলো অনিশ্চয়ের সমুদ্রে।

শঙ্করের হাত ধরে পথে নেমে পড়লেন পিসিমা। চারদিকেই শুধু মাথা আর মাথা। অগাধ জনসমুদ্র চলেছে পথ বেয়ে। কত লোক—সবাই চলেছে হন হন করে, কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। সবাই কাজে ব্যস্ত। গাড়ি চলেছে, লরি চলেছে রিক্সা চলেছে—; ট্রাম চলেছে ঝনঝনিয়ে, মানুষ চলেছে

তার পাশে পাশে হনহনিয়ে—এরই মাঝখানে একপাশে শঙ্করের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন পিসিমা। পথে তো এমন করে নামেন নি কখনও। দু চোখে ভয়—বিস্ময় আর ব্যথা। কি করবেন, কোথায় যাবেন, জানেন না শঙ্কর কাঁদছে—ক্ষিদেয় নয়—, ভয়ে নয়—কি যেন ঘটে গেছে তার জীবনে; সে যেন না বুঝে এবং আংশিক বুঝে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেছে।

ঃ কি রে বাপু! চোখে দেখতে পান না নাকি? গায়ের ওপর এসে পড়ছেন যে?—এক ভদ্রলোক পিসিমার উদ্দেশ্যে কটুক্তি করলো।

ঃ বাবা—আমি—দেখতে পাইনি।

দেখতে পাইনি—লোকটা ভেংচে উঠলো : দিলেন আমার প্যাণ্টের ভাঁজ ভেঙ্গে। দেখতেই যদি পান না—এক জোড়া চশমা লাগান চোখে।—ভদ্রলোক দৃষ্টি দিয়ে যেন ভস্ম করে দিতে চাইলেন পিসিমাকে।

আবার ওরা এগুতে লাগলো একটু একটু করে।

: গুটি গুটি আসছে দেখ ছেলের হাত ধরে, এখুনি ভিক্ষে চাইবে! ও চেহারা আর বুড়ো দেখে ভুলোনা, ওরা বড় সাংঘাতিক।

: না—বাবা আমি ভিখারী নই—ভিক্ষে চাইবো না তোমার কোন ভয় নেই। আজ অবস্থগুণে পথে নেমেছি এমনি আমার অদৃষ্ট কোন দিনই না।

: বুঝেছি মা, আপনার চেহারাই বড় ঘরের মেয়ের মত। কিছু যদি সাহায্য করতে হয় বলুন, আমি করবো যথাসাধ্য।

বাবা, আমায় যদি সস্তায় একখানা ঘর ঠিক করে দাও তবে বড় ভালো হয়। বেশি ভাড়া তো দিতে পারবো না।

: অল্প ভাড়ায় তো বস্তী ছাড়া ঘর পাওয়া যাবে না মা।

: দাও তাই ঠিক করে—অন্তত একটা মাথা গোঁজার জায়গা তো নিশ্চয়ই দরকার—

আচ্ছা চলুন। আমি দিচ্ছি ঠিক করে।—ভদ্রলোক সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। কী নোংরা পথ—সরু গলি, অন্ধকার, দুর্গন্ধে ভরা। পিসিমা ভয়ে ভয়ে চলতে লাগলেন আর শঙ্কর?

সে বেঁকে বসলো। এ গলির বাড়িতে যাব না। যেমন ময়লা, তেমনি অন্ধকার।

: চল্ বাবা—একটা জায়গা তো চাই মাথা গোঁজবার।

: এর ভেতরে মাথা গুঁজতে পারবো না।—কিছুতেই না—

: ছিঃ—বাবা এমনি করে না। জানিস তো আমরা এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছি। একটা জায়গা ঠিক করে পরে অন্য জায়গায় চলে যাব।

: কি, দাঁড়ালেন কেন আপনারা? ভদ্রলোক ভুরু কোঁচকালো : আপনাদের উপকার করতে যাওয়াই দেখছি আমার ভুল হয়েছে।—

: আমায় ক্ষমা কর বাবা—ওর কথা তুমি শুনো না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তুমি ঘর ঠিক করে দাও বাবা!—তুমি আমার আর জন্মের ছেলে, নইলে এমন করে সাহায্য করতে কেউ আসে?

এই যে আমরা এসে পড়েছি—এই ঘর। হেরম্ববাবু—এই ঘরটা এঁতে দিতে পারেন? আমার পরিচিত এরা—ভাল ঘরের মেয়ে। কোন অসুবিধা হবে না ভাড়া নিয়ে।

: বেশ—এস—মা এস।

পিসিমা ঘরে ঢুকলেন শঙ্করকে নিয়ে।

: কি বলে যে আশীর্বাদ করবো তোমাকে বাবা—শুধু বলি সুখী হও—কৃতী হও বাবা আজ

তুমি আমার যে উপকার করলে। তা আর কী বলবো।

: আচ্ছা যাই মা—

: আচ্ছা বাবা, এসো।—মাঝে মাঝে যদি সময় সুযোগ হয় খোঁজ নিও।

: নিশ্চয়ই নিব।—

ভদ্রলোকটি চলে গেলেন। পিসিমা এবার ঘরখানার দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

অপ্রসন্ন শঙ্কর ঘরের ভেতর বসে পড়েছে। যেমন ছোট, তেমনি স্যাঁৎসেঁতে। জানালা নেই, দরজাটুকুই সম্বল। তবু পিসিমা সব গুছিয়ে নিলেন। কাঁদলে তো চলবে না। সমুদ্রের ঢেউ দেখে হাল ছেড়ে দিলে গতি হবে কী! যেমন করেই হোক তিনি কূলে ওঠবার একটা আপ্রাণ চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন।

ঠিক করলেন, যতদিন পারেন শঙ্করের গায়ে আঁচড়টিও লাগতে দেবেন না। সঙ্গে কিছু গয়না এনেছিলেন। তারই একখানা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গলির মোড়ে এলেন।

বাঃ, একটা স্যাঁকরার দোকান তো আছে সামনেই। গয়নাটি দোকানে বিক্রি করে এলেন পিসিমা আর শঙ্করের জন্যে কিছু খাবার, কিছু চাল ডাল কিনে আনলেন।

শঙ্কর কখনও কারু জন্যে ভাববার শিক্ষা পায়নি। কারুর দুঃখে দুঃখ পেতেও শেখেনি। অত্যন্ত আদরে আর আব্দারে, এত বড় হয়ে নিজের সব শুভ বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসে আছে সে।

সুতরাং খানিকটা খাবার খেয়েই সে গলির মোড়ে এসে দাঁড়ালো।—এবং দু-একটি মস্তানের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল তার।

: কি হে দোস্ত—এই ঘরে এলে বুঝি?

: হ্যাঁ—।

: তারপর—এই হেবো, দেখ মাইরী—ওর জামার কাটটা কিন্তু বেশ।

: হ্যাঁ—কোথা থেকে কাটানো হয়েছে।

: ওটা পুরোনো জামা—

: অ—!

: চলো না একটু ঘুরে আসি—যাবে?

: চলো—

পিসিমা দাঁড়িয়ে দেখলেন দরজার সামনে, একদল ছেলের সঙ্গে শঙ্কর বেরিয়ে গেল।

নিরুপায় পিসিমা পাশের ঘরের ভদ্রলোককে বললেন: আমার একটা উনুন আর কিছু বাজার করে এনে দেবে বাবা?

: আমার যে মা অফিস আছে এখন।—

: নইলে না খেয়ে আজ থাকতে হবে! বলেই চোখের জল মুছলেন: আমার জন্যে কোন চিন্তা নেই কিন্তু মা মরা ছেলেটার কথাই ভাবছি—

: আচ্ছা দিন—দিন। দেখি কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কি না!

ছয়

বাজার এলো। পিসিমা যথাসাধ্য রান্না করলেন কিন্তু শঙ্করের পাত্তা নেই। সারাদিনের ক্লান্তি—চিন্তা, অবসাদ—সেই সঙ্গে ক্ষিদে তেষ্টায় ম্লান হয়ে মেজেতে আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন।

: পিসিমা ওঠো, খেতে দাও—শঙ্কর ফিরেছে।

: আমার শরীরটা ভালো নেই—তুই এতো দেরী করে এলি? আয়, হাত পা ধুয়ে খেতে বোস।

শঙ্কর হাত পা ধুয়ে খেতে বসলো। রান্না আগের মতোই পঞ্চ ব্যঞ্জন, সঙ্গে দুধ মিষ্টি।

: দুধ, বড্ড জল—আর মিষ্টিটা বড় পচা—শঙ্কর ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা। একবার সেদিকে তাকিয়ে পিসিমা কোনমতে চোখের জল গোপন করে খেয়ে উঠলেন।

কদিন কাটলো—মাস কাটলো বছর ঘুরতে চললো—এখন শঙ্কর এ জীবনে বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছে। এখন আর কোন কষ্ট হয় না তার—বড় দ্রুত সে এদের গ্রহণ করেছে। একাত্ম হয়ে গেছে।

: শঙ্কর?—

: কে? আমি ভোঁদা—চল।

: কোথায়?

: সিনেমার টিকিট কাটতে হবে, লাইনে দাঁড়াবো।—কাল নতুন হিন্দী বই রিলিজ করছে।—

: দাঁড়া, আসি।—

: পিসিমা ও পিসিমা—শঙ্কর চেঁচাতে লাগলো।

রাস্তার কলে জল ভরছিলেন পিসিমা: আসছি, সাড়া দিলেন তিনি।

: এসো শিগগির—কাজ আছে।

বালতি আধখানা ভরেই ঘরে এলেন পিসিমা: কি রে—কি হলো।

: দেখ, জামাটা বড্ড ময়লা হয়ে গেছে—আর একটা ভালো সিল্কের জামা চাই। আর ঘড়িটার দামটা আজ চুকিয়ে দেবে বলেছিলে।

: আজ তো বিষ্যুৎবার—আজ টাকা পাওয়া যাবে না, কাল দেব।—কিন্তু এতো সকালে কোথায় চললি।

: দশটা টাকা বের করতো—সিনেমার টিকিট কাটতে হবে।

: শঙ্কর—আমি আর পারি না—

: পার না ছেড়ে দাও,—তোমার হাতে টাকা আছে আমি জানি।

: শঙ্কর তোকে আমি আগের মত সুখে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছি, তুই কি কিছুই বুঝবি না কখনও ?—

: শঙ্কর আমি যাচ্ছি—বাইরের থেকে ডাক এলো।

: দাও—দাও—ওরা চলে গেল।

: আমার নেই আর— ; পিসিমা জবাব দিলেন।

: নেই—বেশ! বলেই কুলুঙ্গীতে রাখা ছোট্ট বাক্সোটা থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে ছুটে বেরিয়ে যেতেই পিতৃবন্ধু সলিসিটার মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে একটা প্রবল ধাক্কা লাগলো।

নির্বাক বিস্ময়ে একবার তার সিল্কের জামা—একবার ট্রাউজার এবং একবার ঘড়ি ও টেরির দিকে তাকিয়ে তিনি মৌনী হয়ে রইলেন আর শঙ্কর একবার বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। মুখার্জি ধীরপদে ঘরের মধ্যে এসে দেখলেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পিসিমা কাঁদছেন। একটু দাঁড়ালেন তিনি ঘরের ভেতর, কী যেন ভাবলেন তারপর দ্রুতপদে পিসিমার অজ্ঞাতেই বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে গলির মোড়ে হল্লা করতে করতে ফিরলো শঙ্কর। তার জামা-কাপড় ছেঁড়া, সে কাপ্তেনদের সঙ্গে মারামারি করে ফিরেছে।

রান্না করতে করতে পিসিমা একবার তাকালেন : এ কি রে! তোর সব জামা কাপড় ছেঁড়া—

: ভোঁদাটা মারলে--শুধুশুধুই। আমিও ছাড়লাম না, দিলাম এক জুজুৎসু—কিন্তু কোত্থেকে ওর ছোট ভাইটা এসে আমার জামা টামা ছিঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

: ওগুলো ছেড়ে কাপড়টা পর—পিসিমা সংক্ষেপে বললেন।

: ও কাপড়টা পরবো না। বড্ড ময়লা—

: আমার আজ বড্ড জ্বর এসেছে, বাবা। আমি তো আজ আর কাপড় কাচতে পারছি না—কোন রকমে দুটি সেদ্দভাত—

: মানে—ভাতে ভাত? খাব না। তুমি আমাকে পেয়েছ কী?

: আমার বাজারে যাবার শক্তি নেই বাবা।

: শক্তি নেই, শুয়ে থাকো। মাছ ছাড়া আমি খেতো পারবো না। ও সব পিণ্ডি—

: তুই কি কিছুই বুঝবি না শঙ্কর?

: বুঝতে আমি চাই না ও সব বাজে কথা। দাও দেখি দুটো টাকা, আমি হোটেলে খেয়ে নেব।

: আমার কাছে আর কিছু নেই—ছ্যাখ্ বাক্সো। আজ এক বছর ধরে আমার যথাসর্বস্ব বিক্রি করে তোকে প্রাণপণে ভালো করে রাখবার চেষ্টা করেছি। এখন আমি কপর্দকশূন্য। মাত্র পনেরটা টাকা আছে ঘর ভাড়া, কালই দিতে হবে—

: বেশ, তার থেকেই দুটো টাকা দাও।

: তারপর?

: তারপর আমি কি জানি?

: শঙ্কর তুই এতো স্বার্থপর ? আমার গায়ে জ্বর দেখেও তোর মায়া হয় না রে ?

: মানে ? টাকা দেবে না ?

: যা ইচ্ছে তোর তাই কর।

: টাকা না দিলে আর বাড়িতেই আসবো না—শুনে রাখ।

: বাঃ—চমৎকার !—দরজায় সলিসিটার মুখার্জি দাঁড়িয়ে। কথাটা তিনিই বললেন।

: আমি যাচ্ছি পিসিমা, বলেই দৌড়ে চলে গেল শঙ্কর আর পিসিমা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কিছুক্ষণ মুখার্জির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

: যাচ্ছিলাম এই পথ দিয়ে, খবর নিয়ে গেলাম।

: ও, একটা কথা ছিল—পিসিমা যেন কী বলতে চাইছেন কিন্তু সঙ্কোচ হচ্ছে যেন তাঁর।

কি বুঝলেন সলিসিটার মুখার্জি, তিনিই জানেন। দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন : আচ্ছা, আজ আসি। আজ আমার কাজ আছে একটু।

পিসিমার কথা আর বলা হলো না তিনি শুধু পথের দিকেই তাকিয়ে রইলেন।

শ্রাবণের সন্ধ্যা। অঝোরে বিষ্টি নেমেছে। পিসিমা একা ঘরে শুয়ে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কাপড় নেই, তাই রাগ করে আজ দুদিন শঙ্কর বাড়িতে আসে না। পিসিমার যা সঙ্গতি ছিল সবই গেছে, এখন আর কোন উপায় নেই। কী যে করবেন ভাবছেন। এতদিন একবেলা খেয়ে শঙ্করকে খাইয়েছেন কিন্তু ওর স্বার্থপরতা দিন দিনই বেড়ে চলেছে--বড় যেন বেশি নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। কিন্তু পিসিমা ওকে শাসন করতে পারেন না। আর করলেও তাতে কোন ফল হয় না। আজকাল তো প্রায়ই বাড়িই আসে না। ভোঁদাদের ওখানেই থাকে।

: পিসিমা—একটু বার্লি এনেছি।

: লিলির মা, তুমি কেন কষ্ট করে আমার জন্যে এসব করো মা ? আমার এখন মরণ ভালো।

: ছিঃ মা, ও কথা বলে না। তুমি খাও তো। একটু লেবু দেব ? তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারি না।

তুমি আমার কেবল ঋণই বাড়াও মা—। আমার যদি এত উপকারই করলে, তবে একটু বিষ দাও এনে—পিসিমা কেঁদে ফেললেন হাউ-হাউ করে।

ছিঃ পিসিমা, এতো ভেঙে পড়লে কি চলে ?—খাও, নইলে আমার ভারি কষ্ট হবে।

পিসিমা বার্লিটা খেলেন। এবার একটু সুস্থ হলেন যেন।

: কী ছিলাম, কী হলাম।—

: সব দিন কি সমান যায় মা ?

: তা তো যায় না, কিন্তু আমি যে আর পারি না। হাতে পয়সা নেই। এক বেলা খাই—কখনও তাও না। তার ওপর জ্বরে ধরেছে। শঙ্কর যে ভেসে গেল লিলির মা—এ দুঃখ তো আমার মরলেও যাবে না।

: তুমি বিঁড়ি বাঁধবে পিসিমা ? ঘরে বসেই বাঁধবে, আমি সব জোগাড় করে দেব। ওরাই নিয়ে যাবে।

: আমি যে জানি না।

: আমি দেখিয়ে দেব। বেশি অসুবিধে হবে না।—লিলির মা বললে।

: বেশ, তাই করবো।

প্রথম প্রথম কতগুলো খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এখন বেশ হচ্ছে। কিছু পয়সাও ঘরে আসছে শুনে শঙ্কর এসে হাজির ; আমার কাপড় ?

: দাঁড়া দিচ্ছি—বলেই এক জোড়া ধুতি বের করে দিলেন পিসিমা।

: তা হলে তো তোমার হাতে বেশ টাকা জমেছে পিসিমা।

: না বাবা—পিসিমা কেঁদে ফেললেন : বিড়িওলার কাছে কুড়ি টাকা ধার করে কিনেছি বাবা।

: রাখো-রাখো—। এখন দাও ত চার আনা পয়সা, একটু চা খাই।

: শঙ্কর—যাও নিয়ে। কিন্তু আজ তাহলে আমার খাওয়া হবে না।

: এক বেলা না খেলে কী হয় ?—তোমার তো উপোস করা অভ্যেস আছে—আমার আবার চা না খেলে মাথা ধরে।

: তাই নাকি ?—সলিসিটার মুখার্জি আবার এসে দাঁড়িয়েছেন। শঙ্করকে উদ্দেশ করে বললেন তিনি। মুখুজ্জে মশাই, আপনি আমার ভাইএর বাল্যবন্ধু—আমার আত্মীয়ের মত। আমি আর এ কষ্ট সইতে পারছি না—আমায় পঞ্চাশ টাকা ধার দেবেন—বললেন পিসিমা

: আমি পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, শঙ্করের কথাটা কাণে যেতেই ঘরে ঢুকলাম। মহাজনী ব্যবসা আমি করি না। আমাকে মাপ করবেন।

মুখার্জি ভারি জুতোর শব্দ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর জ্বরে, ক্লান্তিতে পিসিমা কান্নার সাগরে যেন ডুবে গেলেন। এত করে বুঝি তিনি বহুদিন কাঁদেন নি। একদিকে দুর্বল শরীর, জ্বরের ক্লান্তি, অনাহার—আর যেন পারছেন না তিনি। মনোবেদনায় কাতর পিসিমা ভাবেন : মানুষকে দুঃখে না পড়লে চেনা যায় না। এই মুখার্জিকেই না একদিন কত বড় হিতৈষী বলে মনে হয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা গেল তাঁর প্রকৃত রূপটা কী ?

আজ দুদিন থেকে প্রবল জ্বর। বিড়ি বেঁধে টাকাটা শোধ দেবার কথা ছিল কিন্তু তিনি কিছুতেই যেন আর পেরে উঠলেন না। কালই সকালে লোকটা আসবে টাকা নিতে। অনেকবার ঘুরিয়েছেন—যে বদমেজাজী লোকটা, এবার নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড করে ছাড়বে। পিসিমার আর চোখে ঘুম এলো না।

সত্যিই সকাল বেলা লোকটা এলো।

: কই গো মাঠাকরুণ—আজ আর টাকাটা না নিয়ে উঠবো না।

: বাবা—

ও সব শুনবো না। মুখে তো মধু ঝরে, এদিকে তো ভারি ছোটলোক। মানুষের টাক দাও না

আমার জ্বর বাবা, নইলে ঠিক দিতাম—

ঠিক দিতাম—তোমার দেবার ইচ্ছে নেই— । তা বললেই হয় ! যত সব ছোট লোকের পাল্লায় পড়েছি আমি আগেই বুঝেছি গলায় গামছা না দিলে বেরুবে না।

বাবা—আমি দেব তোমার টাকা—

এটি আবার কে— । শঙ্কর ঘরে ঢুকছে।

আমার ভাইপো।

বাঃ ! হাতে ঘড়ি—সিল্কের জামা—জুতো—আর তার পিসিমার ধার শোধ দিতে পারে না ?

দাও তো বাছাধন ঘড়িখানা খুলে—বলেই শঙ্করের হাত চেপে ধরলো। ঘাড়ের ওপর একটা তীব্র রদ্দা মেরে বললে : নে বলাই ওর ঘড়ি আর সিল্কের জামা খুলে। জোচ্চোর ! যাদের খেটে খাবার মুরোদ নেই—তাদের এত বাবুগিরির শখ কেন ?

গায়ের জামা, হাত থেকে ঘড়ি কেড়ে নিয়ে বেশ করে দু ঘা শঙ্করের পিঠে বসিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল।

শঙ্কর এত দিন পর নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—দরজায় ভোঁদা-পচার দল দাঁত বের করে হাসছে আর টিটকিরি দিচ্ছে। আর ঘরের মধ্যে মেজেতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে থাকলেন পিসিমা—জ্বরে আর অপমানে তিনি জর্জরিত।

(সাত)

: বেশ রদ্দা খানা ঝেড়ে দিলে। —

: খুব লাগেনি তো ?—

: আহা—অমন সাধের ঘড়ি খানা !

: মাইরী—সিলকের পাঞ্জাবীটা বেড়ে ছিল !

শঙ্কর ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর চলে গেল। সমস্ত শরীরে যেন হঠাৎ কে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে ! সত্যিই তো, যাদের খেটে খাবার মুরোদ নেই—তাদের এত বাবুগিরির শখ কেন ! পিসিমা মাটিতে পড়ে আছেন অজ্ঞান হয়ে। মুখে চোখে জল এনে দিলো শঙ্কর। কিন্তু জ্ঞান ফিরলেও জ্বরের ঘোরে সারা রাত বেহুঁস হয়ে পড়ে রইলেন পিসিমা। আর শঙ্কর ?

কী হলো ওর ?—

সারা রাত ও জেগে রইলো আর সারা ঘর পায়চারী করতে লাগলো। লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে যেন তার আত্মদর্শন হল হঠাৎ। বাবার কথা মনে পড়ে গেল—কত চেষ্টা তিনি করেছেন ওর জন্যে। পিসিমার দিকে তাকিয়ে তার চোখে জল এলো ! সারা দেহ মন গ্লানিতে ভরে গেছে। কী

ছিল কী হয়েছে—আজ কোথা থেকে একজন গোঁয়ার বিঁড়িওয়ালা তার ঘড়ি জামা খুলে নিলো—পিসিমাকে অপমান করলো, তার গায়ে হাত তুললো। সারারাত ধরে শুধু বাবা-মার আর পিসিমার কথা ঘুরে ঘুরে মনে পড়তে লাগলো শঙ্করের।

গ্লানিতে তার মন ছেয়ে গেছে। নিজের চুলগুলো নিজের হাতে ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে।

সকাল বেলায় যখন সূর্য উঠলো সেই প্রভাতসূর্যের আলোর ধারায় স্নান করে শঙ্করের নবজন্ম হলো।

প্রতিজ্ঞা করলো নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে সে। সে চাকরী করবে। নতুন করে জীবন আরম্ভ করবে।

নতুন করে জীবন আরম্ভ করবে, কিন্তু কী করে চাকরী করবে? কে তাকে চাকরী দেবে? ক্লাশ সেভেনে ছবার ফেল করা ছেলেকে কে পুছবে আজকালকার দিনে? তবু চেষ্টা করবে শঙ্কর। জীবন তাকে আবার শুরু করতেই হবে—চাকরী তাকে একটা জোগাড় করতেই হবে—। অনেকগুলো দিন নষ্ট হয়ে গেছে তার—: অনেক অপচয় হয়ে গেছে; কিন্তু এখনও সব নষ্ট হয়নি, এখনও ফেরবার সময় আছে। মনে বারবার একটা কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠতে লাগলো শঙ্করের—কবিগুরু বলেছেন—'মন যখন জাগবে তখনই প্রভাত।' জীবনে কোথায় কোন অপচয় নেই—কত বোঝাতেন বাবা। কত উপদেশ দিতেন। কিন্তু কেন তখন মন সাড়া দিল না। কেন— ? কেন— ?

পিসিমার মাথায় হাত রাখলো শঙ্কর—। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—কিন্তু, তার মধ্যেও যেন তিনি ভূত দেখলেন—চমকে উঠলেন। এ কার ছোঁয়া?

: পিসিমা—আমায় ক্ষমা কর।

ছ হাতে বুকের মধ্যে ছোট ছেলেটির মত তাকে তুলে নিলেন পিসিমা—কান্নার ধারাশ্রাবণ নামলো পিসিমার চোখে— : ওরে—ওরে ইন্দ্র, দেখে যা তোর শঙ্করকে। ওরে বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়—তুই দেখলি না রে—

: আশীর্বাদ কর পিসিমা— আমি মানুষ হবো। কিন্তু তার আগে—তুমি ভালো হয়ে ওঠো।

: আমার আশীর্বাদ কি চাইতে হবে বাবা? তুই ছাড়া আমার আর কে আছে—। আমি—আমি এবার ভালো হয়ে উঠবো—বাঁচবো বাবা, আমি এবার সুস্থ হয়ে উঠবো।

নিজের ছু-একটা দামী কাপড়-জামা ভোঁদার কাছে বেচে দিলো শঙ্কর।

: কি রে—তোর কি হলো রাতারাতি?—

: যা হয় দে ভাই। আর এই নতুন ধুতিটা—আমি পরিনি বললেই হয়। তোর খুব পছন্দ ছিল, দিস যা হয় দাম। অমনিই দিতাম ভাই কিন্তু আমার পিসিমার বড় জ্বর—ওষুধ আনতে হবে।

পিসিমাকে খাইয়ে—ওষুধ দিয়ে, শঙ্কর বেরুলো কাজের খোঁজে। কোথায় যাবে সে?

একটা অফিসের সামনে অনেক লোক ঢুকছে দেখে শঙ্করও ঢুকে পড়লো।

: কি চাই— ?

: একটা চাকরীর জন্যে এসেছি।

: নাম ?

: শঙ্কর রায়।

ভদ্রলোক একবার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করলেন শঙ্করের।

: পড়াশুনো— ?

মাথা নামালো শঙ্কর : ক্লাশ সেভেন।

: গেট আউট—। খোলা দরজা রয়েছে, বেরিয়ে যাও।

আমাদের এখানে বেয়ারা দরকার নেই।

পথে নেমে পড়লো শঙ্কর। প্রথম অভিজ্ঞতা—তিক্ত তিক্ত অপমান—এমন মুখোমুখি আর কখনও সে সহ্য করে নি। ভারি মনে লাগলো। দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামলো। না—সময় থাকতে সে কিছুই করেনি, তার ফল তো তাকে পেতেই হবে।

ধীরে ধীরে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলো শঙ্কর।

কত লোক স্নান করছে। কত লোক পুজো করছে। সবাই ব্যস্ত, কিন্তু তাদের জীবনের সঙ্গে তার মিল কোথায় ? গ্লানি আর দুঃখে মন ভরে গেছে। ওপারে কলের সারি, বাড়িঘর আকাশ ছোঁয়া, চিমনি-গুলো থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আর শান্ত গঙ্গার ওপর দিয়ে চলেছে নৌকো স্টীমার—

সবাই ব্যস্ত।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। রোদ চড়ছে। শঙ্কর উঠে পড়লো। না আর সে সময় নষ্ট করবে না। পিসিমাকে দেখতে হবে। বাড়ির দিকে ফিরে চলল শঙ্কর—

: পিসিমা— ? কেমন আছ— ?

: ভালো—। তোর জন্যে দুটি ভাত রাঁধছি। আর—

: না—আর কিছু করতে হবে না—তুমি রাখ তো। আমি তোমার মাথাটা একটু ধুয়ে দিই—

পিসিমাকে ধরেই নিতে হলো শঙ্করের। এত দুর্বল—এত দিনের অনাহারযন্ত্রণা, জ্বর গ্লানিতে তাঁর শরীর যেন ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু মনে কি পেয়েছেন পিসিমা—তাঁর মুখের হাসি ফিরে এসেছে।

: বাঃ— ; মিস্টার মুখার্জি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। দু' চোখকে যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না : শঙ্কর নাকি ? না অন্য কেউ ?—কি ব্যাপার ?—যাদু-টাদু হলো নাকি ?

: বসুন কাকাবাবু—

: মুখার্জি চমকে উঠলেন। এ সম্ভাষণ তাঁর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

: না—বসবো না। পিসিমা কেমন আছেন ?

: আজ একটু ভাল।

: ঠিক আছে। আচ্ছা, আজ তবে চললুম। বিস্মিত দৃষ্টি ফেলে বেরিয়ে গেলেন মুখার্জি ; এ দৃশ্য তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারেন নি একেবারে।

আবার একটা অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো শঙ্কর।

ভেতরে যেতেই দারোয়ান পথ আটকালো।

: কি চাই— ?

: একটা চাকরী— ?

: আরে ভাই—উ কি গাছের ফল যে তুমি ইচ্ছে করলে পেড়ে খাবে, যাও—যাও। ওধার যাও। এত ময়লা কাপড় এমন ময়লা চুল, সাহেবের গুসা হোবে।

সাহেবের গুসা হওয়া কিছুতেই ঠিক নয়। কাজেই বেরিয়ে যেতেই হলো। রাস্তা দিয়ে নেমে আসতেই দেখলে প্রচণ্ড গোলমাল।

একটি ছোট মেয়ের গলার থেকে হার ছিঁড়ে নিয়ে যেতেই ধরা পড়েছে তারই বয়সী এক পটেকমার। তার ওপর চলেছে কিল-চড়বর্ষণ এবং যখন তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে গেছে তখন তাকে একটা লাথি দিয়ে নর্দমার মধ্যে ফেলে দিয়েছে সবাই।

: আহা মরে গেল বুঝি।—শঙ্কর বললে।

: কে বাবা তুমি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির—ওর দলের কিনা কে জানে। দে ওকে আড়ং ধোলাই দিয়ে।

দু হাত জোড় করে শঙ্কর বললে, আমি ওর কেউ নই ভাই, আমায় ক্ষমা করো তোমরা—

: দূর হ—বলেই তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো একটা লোক ভিড়ের মধ্যে থেকে।

নিদারুণ হতাশা চারিদিকে। এদিকে পিসিমারও জ্বর ছাড়ছে না কিছুতে, বাড়ি ভাড়াও বাকি পড়ে যাচ্ছে, কী করা যায়। কিছুতেই চিন্তা করতে পারছে না।

একদিন ভোঁদা বললে : একটা ফ্যাক্টরি আছে, তার সামনে সকালে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কাজ পাওয়া যায়।

সকালে উঠেই শঙ্কর পিসিমাকে বললে : পিসিমা একবার চেষ্টা করবো ?

: যা—দেখ। পিসিমার শরীরটা আজ একটু ভালো।

সকালে উঠে সামান্য বাজার করে দিয়েই শঙ্কর বেরিয়ে গেল চাকরীর সন্ধানে।

গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা দারোয়ান বললে, কী চাই ? : এখানে নাকি কাজ পাওয়া যায় দাঁড়িয়ে থাকলেই।

: কে বললে ?

: আমার এক বন্ধু—।

: গেটে দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে দেব।

: কেন আমি তো কোন দোষ করিনি—

: বাজে কথা বলবার জায়গা পাও নি !—যাও—।

শঙ্কর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো।

পিসিমা রাঁধছিলেন।

মিঃ মুখার্জি এসে দাঁড়ালেন।

: কেমন আছেন পিসিমা ?

: আজ ভালো—

গলায় একটা আওয়াজ করে ঘরে ঢুকলো বাড়িওলা।

: পিসিমা, দু মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে—আর তো পারা যায় না। তোমরা বড় ভা লোক, ভদ্রলোকের মেয়ে—পথে বা বের করে দি কি করে। কিন্তু, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখার্জি একব লোকটার একবার পিসিমার মুখের দিকে চাইছেন দেখে বাড়িওলা তাঁর দিকে তাকিয়েই শুরু করলো কিন্তু আমিও ছাপোষা লোক বাবু—আমার চলে কী করে বলুন। দু মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি—আমার তো এ-ই জীবিকা।

: শঙ্কর আজ সকালেই আবার কাজের খোঁজে গেছে বাবা, জানো তো সকালে উঠে ছেলে মুখে একটু জলও দেয় নি আমায় একটু বাজার করে দিয়েই ছুটেছে। ও চাকরী পেলেই সব শোধ ক দেব। আমাকে তো জানো বাবা আমি কারুর টাকা বাকি রাখি না—

: তা—জানি মা—তা জানি। তোমরা ভদ্রলোকের মেয়ে। ছেলেটা যে ভাবে চাকরী চাকর করে ঘুরছে, দেখলে মায়া হয়। তোমরা—নইলে অন্য লোক হলে কবে বের করে দিতাম।

বুড়ো ধীরে চলে গেল।

মুখার্জি ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নিদারুণ হতাশা নিয়ে ফিরে এলো শঙ্কর। ভালো হতে চাইলেই তো হওয়া যায় না। তার পথে অনেক বাধা। শঙ্কর কী যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ঘরের মধ্যে নেমে আসছে। চারিদিকে যেন কারা ঘেরাফেরা করছে মনে হয়। গলির ওপারে রাস্তার ওপর এক এক করে গ্যাসের আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে গেল রোজকার মতো বুড়ো লোকটা। পিসিমা লণ্ঠন জ্বাললেন। যেন অন্ধকারটা চমকে উঠলো।

: বাবা, আর না ঘুরে একটা কাজ কর্ না।

: কি বলো ? শঙ্কর বললে।

: রাস্তার টেলিফোন থেকে মুখুজ্জে মশাইকে একটা টেলিফোন কর না ? উনি কোন সুবিধে করে দিতে পারেন কিনা।

: উনি তো প্রায়ই আসেন। আমাদের এত দেখছেন, কই কখনও তো একবার মুখ ফুটে বলেন না যে কোন উপকার করবেন।

: সত্যি—ইন্দ্রের বন্ধু, আমাদের এমন আত্মীয়ের মত, তার এই ব্যবহার ! যাক্‌গে বল্ তো একবার, যদি করে—

: আচ্ছা করবো—তুমি যখন বলছো করবো, কিন্তু কোন ফল হবে না জেনো।

: না হোক—তবু একবার দেখ।

আশা না করতে চাইলে কি হবে আশা তো মানুষকে ছাড়ে না। সারারাত ধরে শঙ্কর স্বপ্ন দেখলো মুখার্জি তাকে একটা চাকরী দিয়েছেন। পিসিমাকে নিয়ে সে একটা ভালো ঘর ভাড়া করে চলে যাচ্ছে।

একটা পাবলিক টেলিফোনে ফোন করতে গেল শঙ্কর। ঘরে কেউ নেই—টেলিফোন করেই সে বেরিয়ে এলো। মুখার্জিকে পাওয়া গেল না, কিন্তু বেরুতেই এক ভদ্রলোক তার হাত চেপে ধরলো।

: আমার মানি ব্যাগটা ছিল এখানেই। আমি ফোনে পয়সা দিয়ে মনে হচ্ছে এই খানেই রেখে গেছি। তারপরই আপনি এসেছেন এই ঘরে—সুতরাং—

: আপনি আমার পকেট দেখুন।

: ও সব বুঝি না—বের করে দিন।

: আরে? নিলে তো বের করবো। নইলে কোত্থেকে দেব।

: আলবাৎ নিয়েছ—

: কোন প্রমাণ আছে?—শঙ্কর একটু রেগেই উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকা মুটে থেকে ভদ্রলোক পর্যন্ত ঘিরে ধরলো দুজনকে।

কেউ বললে : পকেট সার্চ কর! কেউ বললে ধোলাই দাও। কেউ বললে—পকেটমার—! কেউ আবার বললে : উনিই যে নিয়েছেন তার কী প্রমাণ!

অবশেষে পুলিশের হাতে শঙ্করকে জনসাধারণ সঁপে দিলো।

: আপনাদের থানায় যেতে হবে :—

শঙ্কর বললে : বেশ চলুন—

শঙ্কর থানায় গেল। ডাইরি হলো, কিন্তু আশ্চর্য দারোগা ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার বাবার নাম কী বলো তো?

: ইন্দ্রজিৎ রায়।

একটু হাসলেন দারোগা।

: তোমার নাম?

: শঙ্কর রায়—

: হুঁ—। পেন্‌সিলটা চিবোতে লাগলেন ও-সি। হেসে বললেন, উনি চুরি করতেই পারেন না—। আমি ওঁকে—ওঁর বাবাকে ছোট বেলা থেকে চিনি। শঙ্কর, তুমি যেতে পারো।

এবার শঙ্কর কেঁদে ফেললো : আমি বলছি, সত্যি আমি নিই নি—। উনি সবার সামনে আমাকে সার্চ করে দেখলেন, তারপর বাকি সবাইও খুঁজে দেখলো। আর আমি তো ঘর থেকে বেরোইনি পর্যন্ত। লুকোবোই বা কোথায়? উনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। বুড়ো মানুষ, আমি কি বলবো বলুন—কি বলবো। আপনি আমার সম্মান রক্ষা করলেন—কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তা বুঝতে পারছি না।

কিন্তু কনস্টেবল যেন কী ভাবছিল, হঠাৎ বললে : বুড়োবাবু তোমার হাতের থলেটা দেখি।

: ওতে গম আছে।

: থাক, আপনি ঢালুন—

হঠাৎ মেজেতে থলির গম ঢালা হতেই ঠক করে মানি ব্যাগটা পড়লো। আর হৈ হৈ ক উঠলো সবাই : ছি-ছি-ছি! নিজে এই কাণ্ড করে অন্যকে চোর ধরা! বুড়োর তখন কাঁদব অবস্থা—শঙ্করের হাত ধরে বার বার মাপ চাইতে লাগলেন।

শঙ্কর বাড়ি ফিরে গেল। সবাই তো খারাপ নয়! কত ভালো লোক আছে সংসারে—কি এতদিন চোখ খুলে কেন দেখেনি ও।

পিসিমার কাছে সব বলতেই তিনি কেঁদে ফেললেন : ভগবান আছেন বাবা এবার তিনি ম য়ে মুখ তুলে তাকাবেন।

সন্ধ্যাবেলায় বাড়িওয়ালা এসে হাঁক ছাড়লো : শঙ্কর, শঙ্কর আছো?

: বলুন।

: একটা খবর পেলাম। তিলজলায় একটা ওষুধের কারখানা আছে সেখানে তুমি একা কাজ পেতে পার।

: অনেক চেষ্টা করেছি, হয় না তো কোথাও!

: না—হবে এখানে। আমি কথা বলে এসেছি। তবে বড় ছোট কাজ, শিশি বোতল ধু হবে, লেবেল মারতে হবে—একেবারে বলতে গেলে বেয়ারার কাজ। করবে?

: নিশ্চয়ই করবো—পেলেই করবো।

কোন কাজই ছোট নয় এ কথা শঙ্কর বুঝতে পেরেছে। অনেক দুঃখে আজ সে বুঝে এ কথা।

সকালবেলা শঙ্কর যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। মুখার্জি সাহেব এলেন।

: একবার দেখতে এলাম—কেমন আছেন পিসিমা?

: ভালো। বসুন, একটু কথা আছে। আমার কথা না ভাবেন, ইন্দ্রনাথ রায়ের ছেলে কথা একটু ভাবুন। ও একটা বেয়ারার কাজ করতে চলেছে,—আপনার কাছে কাল টেলিফো করতে গিয়ে যা অপদস্থ হয়েছে কী বলবো!—পিসিমা ব্যাপারটা সব জানিয়ে বললেন : আপনি যদি ওকে একটু সাহায্য করেন!

শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন সলিসিটার মুখার্জি : শঙ্কর তুমি যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছ—যাও! Self help is the best help! আচ্ছা, আজ আমি আসি পিসিমা।

দাঁত কড়মড় করতে লাগলেন পিসিমা : কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে আসে কেন লোকটা। আর ওকে ঢুকতে দিস না শঙ্কর—যত সব তামাসা দেখে। মজা পেয়েছে সে?

: আমি যাই পিসিমা। তুমি আশীর্বাদ করো—। আজ আমাদের ভারি শুভদিন, তুমি

আজ আর কারুর ওপর রাগ করো না।

: জয়ী হও বাবা—চোখের জলে বুক ভাসিয়ে পিসিমা বলেন : বিজয়ী হও।

(আট)

বিরাট ল্যাবরেটরি।

খুঁজতে একটুও কষ্ট হলো না শঙ্করের। ভেতরে ঢুকে অবশ্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। বড়বাবু এলেন, সঙ্গে এলো মোহন—বড় কাজ করে সে। অল্প বয়স। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মিষ্টি ব্যবহার, শঙ্কর নমস্কার করে দাঁড়াল।

: নাম কি তোমার ?

: শঙ্কর রায়—আমার কথা—

: হ্যাঁ—হ্যাঁ তোমার কথা অবশ্য বলে গেছেন। কোথাও কাজ টাজ করেছ এর আগে ?

: না—স্যার—

: বেশ তো ছেলেটি—নিয়ে নিন—পারবে মনে হচ্ছে।

: তাই হবে—কবে থেকে কাজে লাগতে পারো ?

: আজই—এখুনি—

: very good—এই তো চাই। মোহন বললো।

: যাও লেগে যাও—বড়বাবু তো বললেনই। খেয়ে এসেছ ?

: হ্যাঁ আমি তৈরি হয়েই এসেছি—

আনন্দ আর আশায় দুলে উঠলো শঙ্করের মন। সারাদিনের না খাওয়ার গ্লানি সে ভুলে গেল। সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে সে কাজ করতে লাগলো।

শঙ্করের যেন সত্যিই নবজন্ম হয়েছে। একাগ্র হয়ে সে কাজ করে, তার ওপর সবাই খুশি। মোহন তো তাকে খুবই ভালোবাসে। সব সময় সাহায্য করে, পরামর্শ দেয়। কাজে মেতে উঠেছে শঙ্কর। সংসারেও আর কষ্ট নেই। পিসিমা ভারি খুশি হয়েছেন। বাড়িওয়ালার টাকা প্রথম মাইনে পেয়েই চুকিয়ে দিয়েছেন পিসিমা। এক মুখ হেসে বাড়িওয়ালা বলেছে : আপনার ছেলের তো কারখানায় খুব সুখ্যাতি শুনলাম। সবাই বলছে : এমন ছেলে আর হয় না। পিসিমার গর্বে বুক ফুলে ওঠে।

শঙ্কর যেন ঘড়ির কাঁটা। দশটায় গেট খুললেই সে সবার আগে কারখানায় ঢোকে। আর সবার পরে সে বাড়ি যায়। যেমন কাজে যত্ন তেমনি তার শেখবার চেষ্টা। জল-ঝড় বিষ্টিতেও তার কখনও কামাই নেই— ; সবাই বলে : আপনার কি ভাই লোহার শরীর ?

দুবছর কেটে গেছে।

শঙ্কর মোহনের পাশে পাশে থাকে। মোহনের শঙ্কর ছাড়া আর এক দণ্ডও চলে না। আশ্চর্য—

এত বুদ্ধি ওর ! মোহন যখন কাজ করে শঙ্কর পাশে দাঁড়িয়ে সর্বদা জিজ্ঞেস করে : মোহনদা, এটা কী হলো—ওটা কেন হচ্ছে ?

মোহন ওকে খুব ভালোবাসে। সর্বদাই বুঝিয়ে দেয় সব। এখন ল্যাবরেটরিতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট শঙ্কর।

এখন আর সে সেই নন্দদুলাল শঙ্কর রায় নেই—অনেক চালাক, অনেক স্মার্ট হয়েছে সে।

: মোহনদা, এটা তুমি কী করছো ?—এখন মোহনকে সে 'তুমি' বলেই ডাকে।

: এটা পরীক্ষা করছি—।

: এর ফল কী হবে— ?

: যদি বের করতে পারি একটা নতুন ধরণের ওষুধ তৈরি হবে, কোম্পানির নাম হবে, লোকের উপকার হবে।

: মোহনদা, বাবা কত চেষ্টা করেছিলেন লেখাপড়া শেখাবার জন্যে—আমি তখন কিছুতেই শিখলাম না। লেখাপড়া যেন আমার কাছে বিষের মতো ছিল। এখন কষ্ট হয়, কেন এমন করলাম ? কেন লেখাপড়া শিখলাম না ?

: তা সত্যি, লেখাপড়া জানলে তুমি খুব উন্নতি করতে পারতে। তোমার যেমন বুদ্ধি তেমনি একাগ্রতা।

: আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল মোহনদা !—

: জীবন কি কখনও নষ্ট হয় ভাই ? তুমি চেষ্টা করো এখনও পড়াশুনো করতে পার। লেখা-পড়ার কি কোন বয়স আছে ?

: আমি আবার পড়াশুনা আরম্ভ করবো মোহনদা। তুমি আমায় সাহায্য করবে ?

: নিশ্চয়ই, কেন করবো না ? তোমার যখন যা দরকার হবে তখনই আমাকে জিজ্ঞাসা করবে।

: বাড়ি ফেরবার পথে আমি বই কিনে নেব, তুমি আমাকে একটা লিস্ট্ করে দাও।

: আজ নয় শঙ্কর। পরে আমি তোমাকে বেশ ভেবে চিন্তে একটা লিস্ট্ তৈরি করে দেব।

: কবে পাব লিস্ট্টা ? শঙ্কর সাগ্রহে জানতে চাইলো।

: কাল—অবশ্যই কাল পাবে।

পরদিন সকাল থেকে আকাশ কালো করে বিষ্টি নেমেছে। পথে জল দাঁড়িয়েছে। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে। পিসিমার হাজার বারণ সত্ত্বেও পথে নেমে পড়েছে শঙ্কর। তাকে কাজে কামাই দিলে চলবে না—কোন মতেই চলবে না।

হাঁটতে হাঁটতেই চলেছে শঙ্কর। রাস্তা জলে জলময়—কোথাও কোথাও জল কম, কোথাও আবার খুব বেশি। মাঝে মাঝে এক আধটা বাস যাচ্ছে—কিন্তু তাতে লোকের যেরকম ভীড়, ওঠার কোন উপায় নেই।

অগত্যা আবার হাঁটতে লাগল শঙ্কর।

আর পারা যাচ্ছে না। পথের এক ধারে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ভারি হয়রাণ হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে ডাকলো: শঙ্কর— ?

মোহন গাড়ি করে যাচ্ছে অফিসে, তাকে পেছন থেকে ডাকলো।

: এসো উঠে এস—

: না—আমি বাসেই যাব। কারুর কাছে বেশি করে হাত বাড়াতে ভয় করে শঙ্করের—বেশি অন্তরঙ্গ হতে দ্বিধা হয়—যদি বেশি পেতে গিয়ে সবই হারাতে হয়— ; মনের ভেতরের ভয়ের ছায়া যেন কিছুতেই যেতে চায় না।

আরে এসো—এসো: মোহন বললে: এই জল বিষ্টির মধ্যে শিভাল্‌রি না হয় নাই করলে—।

শঙ্কর উঠে এলো।

গাড়ি কারখানার গেটে ঢুকলো। দুজনে ওপরে উঠে গেল। অন্যেরা প্রায় কেউই আসেনি। আর আসবেই বা কি করে ? চারিদিকে জল থৈ-থৈ করছে।

মোহন নিজের ল্যাবরেটরিতে দুটো চাবি করেছে একটি সর্বদাই নিজের কাছে রাখে। পকেট থেকে চাবি খুলে ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ কোথা থেকে শঙ্কর এসে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো মোহনের গায়ের ওপর আর টাল সামলাতে না পেরে মোহন একেবারে মাটির ওপর পড়ে গেল। হঠাৎ ভীষণ যেন আত্মসম্মানে লাগলো মোহনের; উঠেই সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে—। গলার স্বর অসম্ভব গম্ভীর করে বললো: বড্ড আস্কারা দিয়েছি তোমাকে এতো দিন। নিজের ভায়ের মতো দেখেছি—তুমি আমার গায়ে হাত তুললে যে ?

হাঁপাচ্ছিল যেন শঙ্কর। হঠাৎ যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। কে যেন একটা শক্ত পাথর দিয়ে মাথায় মেরেছে ওর।

: তোমাকে আমি পুলিশে দেব।—মোহন গর্জে উঠলো।

: কিন্তু এত উত্তেজিত না হয়ে আমার একটা কথা শোন। এখুনি তোমার নিশ্চিত মৃত্যু হতো। তার থেকে আজ আমি তোমাকে বাঁচালাম। আর তুমি আমাকে যে ভাষায় কথা বললে তার থেকে প্রমাণ হলো তুমি শুধু মুখে আমাকে ভাই বল মনে মনে তোমার নিম্নতম কর্মচারী মনে কর।

: মানে ? মোহন বিস্মিত হলো।

: নিজের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে বলে আর কী অন্য কিছু তোমার ভাববার সময় ছিল! দরজার ওপর দিয়ে গ্যাস বেরুচ্ছে, দেখছ না ? দেখ গ্যাস পাইপের মুখ বেয়ারা খুলে রেখে গেছে ভুলে—তোমার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, এখুনি সর্বনাশ হতো। আমাকে না বকে এর প্রতিকার করো।—

মোহন বুকে জড়িয়ে ধরলো শঙ্করকে: সত্যিই তুমি আমার ভাই!—

ধীরে ধীরে বিষ্টি থেমে এলো। এখন সবাই আসছে ধীরে ধীরে। কারখানা এখন প্রায় সরগরম হয়ে উঠেছে। বাইরের জানালা দিয়ে বিষ্টি ভেজা হাওয়া আসছে—দেবদারু গাছগুলোর পাতা দুলছে। শঙ্করের মনে পড়েছে নিজেদের বাড়ির কথা—যেন প্রাসাদ। কতগুলো তার মহল।

বাবা বসতেন বাইরের ঘরে। কি সুন্দর সাজানো সে ঘর—। মেহগিনি কাঠের খাট—তোষক জাজিম। বাবা শোবার ঘরটায় শুধু খাট রাখতেন, আর মার এক ছড়া সাদা-ফুলের-মালা-পরা ছবি। বাইরের ঘরে আলমারি, চেয়ার টেবিল সাজানো—। টেবিলে ফুল। কত লোক আসতো যেত। বাবা রবিবারে কারুকে ফেরাতেন না। সবাইকে ভিক্ষা দিতেন।

ঠাকুর দালানে ছিল গৃহদেবতা কালীর মূর্তি। পুজো হতো রোজ। ঠাকুর দালানে জগমোহনের পায়রা চরে বেড়াতো।

পিসিমা? হ্যাঁ পিসিমা থাকতেন ভেতর বাড়িতে—তার চার পাশেই বাগান। কত ফুল—কত ফল—কত পাখির মেলা সেখানে। আর এখন?—

: শঙ্কর তোমার বইএর লিস্ট এনেছি।—কি ভাবছো?

: মোহনদা, তুমি আমার ভাবনার কথা জিজ্ঞেস করো না। কত কি আকাশ পাতালই তো লোকে ভাবে। কিন্তু তুমি যদি আমাকে একটু একটু না পড়াও, তা হলে তো হবে না।

: নিশ্চয়ই পড়াবো—

: তবে আজ এখন থেকেই আমি লেগে যাবো, আর সময় নষ্ট করবো না।

: বেশ তাই হবে।—

: কী ভাবে পড়বো—কোনটা আগে পড়বো বলো।

: বেশ তো চলো আমার ঘরে। এই বইটাই প্রথমে ধরো। তুমি হয়তো প্রথমে পড়ে কিছুই বুঝবে না, তবু চেষ্টা করো। যা না বোঝো আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

শঙ্কর পড়াশুনো শুরু করলো কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

যে শঙ্কর পড়ার নামে দশ মাইল দূরে পালাতো আর ইন্দ্রজিৎ রায়ের এতো চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতো, সেই শঙ্কর যেন পড়ার নামে পাগল। সুযোগ পেলেই পড়ছে আর পড়ছে।

কিন্তু সহকর্মীরা? তুমি কাউকে হিংসা করো না বা গণ্ডগোল পছন্দ করো না; নিজের উন্নতি করবার জন্য তুমি পণ করেছ; কিন্তু তাতে যে অন্যলোক তোমায় হিংসে করবে না বা তোমার সঙ্গে অকারণে গণ্ডগোল বাধাবে না কিংবা নিজের কোন ক্ষতি না হলেও তোমার ভালো কাজে বাধা দেবে না, একথা কে হলপ করে বলতে পারে!

: শঙ্কর তো খুব পণ্ডিত হয়ে গেল!—একজন বললে।

: আর তার উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না—আর একজন ফোড়ন কাটলো। শঙ্কর শুধু হাসলো—। জানে এ অক্ষমের ঈর্ষা।

কিন্তু আঘাত দিতে এসে যারা উপেক্ষা পায়, প্রায়ই দেখা যায় তাদের রাগ ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে।

একদিন সবাই মিলে পরামর্শ করলো, যেদিন কেমিস্ট মোহন আসবে না সেদিন ওকে অপমান করাবে ম্যানেজারকে দিয়ে। কাজেই তার জন্যে আগে থেকেই ক্ষেত্র তৈরি করা দরকার।

ম্যানেজার যখন কাজে ব্যস্ত, তখন সুধীর বলে এক পুরোনো কর্মচারী গিয়ে বললে : বাবু শঙ্কর আজকাল একেবারে কাজ করে না।—

: যাও এখন, বাজে নালিশ আমি শুনতে চাই না।

শঙ্করের ওপরে সবারই খুব বিশ্বাস। কাজেই সে যে কাজ করে না একথা কেউ শুনতে চায় না সহজে—ম্যানেজার তো নয়ই। শঙ্করের ওপর তাঁর ধারণা খুব ভালো।

কিন্তু যারা নীচ তারা জানে ধীরে ধীরে কী করে মানুষের মনে সন্দেহ জাগাতে হয়।

কাজেই কদিন পর আবার আর একজন একই নালিশ করলো : শঙ্করবাবু যত পুরোনো হচ্ছে ততই কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। ওর কাজ আর আমরা করতে পারবো না।

: করো না—আমি দেখবো। ম্যানেজার রেগে উঠলেন।

: দেখলে তো হয়ই বাবু—

: নিশ্চয়ই দেখবো—। তোমরা আর ওর কাজ করো না।

: না—করলে কি করে হবে বাবু? মোহনবাবু—

: মোহন বুঝি তোমাদের কিছু বলে?

: না—আ—আ—

: ও বুঝেছি সব—। —হুঁ মোহন বড্ড বাড়াবাড়ি করছে।

: আপনি যেন কিছু বলবেন না ওকে, তা হলে—

: জানি তাতে তোমাদের অসুবিধা হবে। আচ্ছা—একদিন আমাকে দেখাতে পার?

: নিশ্চয়—আমরা আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।

: বেশ—। তাই হবে।

শঙ্কর খুবই দ্রুত এগোচ্ছে। তার মেধা, বুদ্ধি আর প্রতিভা দেখে মোহন ভাবে—এ ছেলে না পড়ে কী করে থাকতো। আশ্চর্য—যে পড়া দিচ্ছে মোহন, অসাধারণ পরিশ্রমে তাই তৈরি করে ফেলছে শঙ্কর।

আর এরই মাঝে মাঝে সহকর্মীরা সুযোগের অনুসন্ধান করে ফিরছে কি ভাবে চাক্ষুষ প্রমাণ দেবে যে শঙ্কর পড়াশুনায় মন দিয়ে কাজে অমনোযোগী হচ্ছে।

আজ মোহন কাজে আসেনি, একটু সর্দিজ্বর হয়েছে। শঙ্কর যথারীতি কাজে এসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়ছে এবং সেই একটি সুযোগ অনুসন্ধান করে ফিরছে সুধীর।

ম্যানেজারের মেজাজটা অত্যন্ত কড়া। হঠাৎ রেগে যাওয়া তাঁর একটা স্বভাব এবং অত্যন্ত রেগে গেলে তাঁর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সেই রাগের মুহূর্তে যদি এই দৃশ্যটি ওকে দেখান যায়, তা হলে খুবই ফল পাওয়া যাবে। কাজেই সুধীর সুযোগ খুঁজে বেড়াতে লাগলো ম্যানেজারের ঘরের চার পাশে।

হঠাৎ ম্যানেজারের প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল। যে ছোকরা বেয়ারা চা দেয় সে চায়ে চিনি দেয়নি বলে ভদ্রলোক চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলেছেন।

আর সেই মুহূর্তেই সুধীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ঃ দেখবেন আসুন বাবু—সবাই খেটে মরছে আর শঙ্কর এক কোণায় আপন মনে বই পড়ে চলেছে।

সত্যিই শঙ্কর আপন মনে বই পড়ে চলেছে। একেই চটে ছিলেন ম্যানেজার, তার ওপর ক্রমাগত নালিশে নালিশে মনটা খানিকটা বিরূপই হয়েছিল শঙ্করের ওপর। কাজেই ওকে পড়তে দেখে একেবারে তেলে বেগুনে আগুন হয়ে জ্বলে উঠলেন ম্যানেজার।

ঃ শঙ্কর।

চমকে দাড়িয়ে পড়ল শঙ্কর।

ঃ এটা লাইব্রেরী না কারখানা, আমি তা জানতে চাই।

ঃ আজ মোহনদা আসেননি, তাই—

ঃ মোহন না এলে কি কাজ কর্ম সব বসে থাকবে! তোমার সাহস তো কম নয়। যদি তুমি এভাবে কাজের ক্ষতি করতে থাকো তা হলে তোমাকে আমি রাখতে পারব না—এ কথা আমি তোমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলাম।—

ঃ আমি আর এখানে পড়বো না—আমায় ক্ষমা করুন।

ঃ আচ্ছা, দেখা যাবে এখন।

ম্যানেজার চলে গেলেন।

সবই বুঝতে পারলো শঙ্কর। এও প্রকৃতির প্রতিশোধ। এক সময়ে বাবা এত চেষ্টা করেছেন, অথচ কিছুতেই পড়েনি সে। আর আজ এই পড়ার জন্যই তাকে অপমান সহ্য করতে হলো। হঠাৎ চোখে জল এসে পড়লো শঙ্করের। সে যদি একটু ভালো হতো, একটু মন দিয়ে পড়াশুনা করতো, তা হলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি মারা যেতেন না বাবা—হঠাৎ যেন মনে হতে লাগলো সেই যেন তার বাবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বাবার আত্মাকে সুখী করতে হবে। পড়া ছাড়লে চলবে না। পড়তেই হবে তাকে, বড় হতে হবে, বাবার সাধ পূর্ণ করতেই হবে। না—রাগ করে পড়া ছাড়লে চলবে না। কিছুতেই না।

বিপদ বাধা ঠেলেই তো তাকে চলতে হবে। এই তার অদৃষ্ট। বাবার আশীর্বাদ আছে, পিসিমার শুভকামনা আছে, জয়ী হবে সে, এ বিশ্বাস তার আছে।

বাড়ি যাবার পথে সে মোমবাতি কিনে নিয়ে চললো। এখানে পড়বে না সে, বাড়িতেই পড়বে।

শঙ্কর রাত জেগে পড়া শুরু করে দিলো। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলো মোহন।

পিসিমা আনন্দে কেঁদে আকুল হলেন, ভগবান এবার তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। ইন্দ্র দেখলো না, তার ছেলে আজ পড়াশুনোর জন্যে পাগল হয়েছে—পিসিমা শুধু উদ্দেশ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

(নয়)

পড়াশুনো এবং একাগ্রতা, তার সঙ্গে মোহনের যত্নে শঙ্কর এখন ল্যাবরেটরির কাজে অপরিহার্য। তাকে না হলে এখন একদিন আর চলে না।

মোহনের কাজের বেশির ভাগই করে দেয় শঙ্কর। একদিন মোহন কাজ করছিল, তাকে সাহায্য করছিল শঙ্কর। কিছুদিন ধরেই সে মোহনের এই কাজটা লক্ষ্য করছে। সেদিন একটু পরে, অন্য ব্যাপারে মোহন একটু বেরিয়ে যেতেই শঙ্কর কাজটা চালিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই শঙ্করের মনে হলো, যেন এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা অন্য পথে যাচ্ছে। ইচ্ছে করেই সে· দু-একটা কেমিক্যাল এদিক-ওদিক করল, আরো কিছুক্ষণ পরীক্ষা চালালো—আশায় আনন্দে তার বুক কাঁপছে। তারপরেই সে পাগলের মতো লাফাতে শুরু করে দিলো।

ঃ একি—একি শঙ্কর কী হলো—মোহন ছুটে এলো। ছুটে এলো অন্যান্য কর্মীরা।

ঃ মোহনদা, আমি একটা নতুন ওষুধ বের করেছি আজ বহুদিনের চেষ্টায়। পরীক্ষা করে দেখেছি—আমার ধারণাই ঠিক।

সবার সামনে পরীক্ষাটা করে দেখালো শঙ্কর।

দুহাতে ওকে বুকে তুলে নিলো মোহন ঃ আজ তুমি সার্থক, শঙ্কর।

খবর পেয়ে ম্যানেজার ছুটে এলেন।

ঃ এ ছোকরার মধ্যে যে এত প্রতিভা আছে, আগে তো কখনো বুঝিনি। এখানে সারাদিন ধরে পড়াশুনা করতো তাতে কাজে ক্ষতি হচ্ছে ভেবে আমি ওকে অপমানই করেছি। কিছু মনে করো না শঙ্কর তুমি আমার কারখানার গৌরব।

শঙ্কর ছুটে যায় পিসিমার কাছে ঃ পিসিমা আমি একটা নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছি। কারখানার সবাই আমাকে কত ভালো বলছে।

পিসিমা দুহাত দিয়ে কাছে টেনে নিলেন শঙ্করকে ঃ হবেই তো! তোর মতো ভালো ছেলের দিকে ভগবান মুখ তুলে চাইবেন না তো কার দিকে চাইবেন! শুধু ইন্দ্রই দেখলো না। সারারাত আনন্দে ছটফট করল শঙ্কর, ঘুমুতে পারল না।

পরদিন সকালবেলা শঙ্কর যথা নিয়মে কাজে গেল কিন্তু ঘরে মোহন নেই। তার গায়ের অ্যাপ্রন পড়ে আছে দেখে শঙ্কর বুঝলো মোহন এসেছে। কোথাও বেরিয়ে গেছে ভেবে শঙ্কর নিজের কাজে মন দিলো।

মোহন ভারি দুঃখিত হয়ে ঘরে ঢুকলো ঃ তোমার কিছু মাইনে বাড়াবার জন্যে ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি তোমার প্রতিভার কথা সবই স্বীকার করেন, কিন্তু মাইনে এক পয়সাও বাড়াতে চান না। আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে শঙ্কর। কী করবো, আমার তো করবার কিছু নেই।

ঃ তাতে কী হয়েছে মোহনদা, তুমি দুঃখ করো না। আমার সবই তোমার জন্যে।

ঃ ওসব কথা বলে নিজেকে আর ছোট করতে পারবে না শঙ্কর। প্রতিভা সবার এক বয়সে প্রকাশ পায় না। তোমার ইস্পাতে মরচে পড়ে গিয়েছিল, তোমার যত্নে আবার তাতে ধার উঠেছে।

যাই হোক, কাজটার জন্যে ওঁরা তোমাকে ভালো একটা রিওয়ার্ড দেবেন।

: ওদের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে হঠাৎ জিনিসটা আবিষ্কার হয়ে পড়েছে—ওতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। রিওয়ার্ড আমি চাই না।

: কেন ?—মোহন অবাক হয়ে গেল।

: না—ও ওদেরই। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কোরো, আমি যেন আরো ভালো কাজ করে দেশের সেবা করতে পারি।

: সেতো নিশ্চয়। সে আশীর্বাদ তো সব সময়েই তোমাকে করছি। কিন্তু যা তোমার পাওনা, তা ওরা দেবে না কেন ?

: আমার পাওনা মাইনে। সে তো ওঁরা দেন। তাছাড়া দুঃসময়ে আমাকে আশ্রয় দিয়ে যা উপকার ওঁরা করেছেন, সে ঋণ কি আমি জীবনে শোধ করতে পারব, মোহন দা ?

: তুমি সত্যিই অসাধারণ।

: আমি একেবারে সাধারণ—তোমার ভাই।

: তোমার জন্যে আমি গর্বিত শঙ্কর—তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ—

: শঙ্কর মোহনের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলো।

আজ সারাদিন ধরে বিষ্টি হচ্ছে টিপ্ টিপ্ করে। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া দিচ্ছে। শঙ্করের শরীরটা ভালো নেই, পিসিমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। পিসিমা মাথায় হাত বুলোচ্ছেন আর দুজনে কথা বলছেন।

: সামনের মাসে পিসিমা আমরা বাড়িটা বদলাবো।

: কেন, এখানে তোর কি অসুবিধা হচ্ছে !

: অসুবিধা কিছু হচ্ছে না—তবে ঘরটা বড় অন্ধকার। হাওয়া বাতাস আসে না। তোমার শরীরটাও খুব খারাপ হয়ে গেছে। আর তোমাকে আমি এ ঘরে রাখবো না।

: শঙ্কর, আগে হাতে কিছু টাকা জমুক, তারপর যাবো। আর এ বস্তির লোকেরা বড় গরীব বটে তবু এদের প্রাণ আছে। এরা নিজেরা দুঃখ পেয়েছে বলে অন্যের দুঃখ বোঝে আমার এদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ওরা আমাদের দুঃখের দিনে আশ্রয় দিয়েছে।

: আমি কী এ সব অস্বীকার করছি ? তবু তোমাকে আর এভাবে আমি কষ্ট দিতে পারব না। অনেক দুঃখই তো তুমি পেয়েছ।

: আমার আর কোন কষ্ট নেই শঙ্কর, আমি আজ পূর্ণ। আজকে আমার মত সুখী কে ?

রাত বারোটা।

দরজায় কারা যেন এসে দাঁড়ালো। জোরে কড়া নাড়লো।

: আমাদের দরজায় না ? পিসিমা বললেন।

: তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এত রাতে ?—কি ব্যাপার ? শঙ্কর উঠে দরজা খুলে দিলো। কারখানা থেকে লোক এসেছে।

: ম্যানেজার সাহেব এখুনি যেতে বললেন।

: এখুনি—? এতো রাতে ?

: এখুনি।

: বাইরে বিষ্টি পড়ছে—ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে, যাব কি করে।

পিসিমা উঠে এলেন : কাল গেলে হয় না বাবা ? এত রাত, তার ওপর এমন দুর্যোগ।

: না—ম্যানেজারবাবুর হুকুম, খুব দরকারি কাজ—এখুনি যেতে হবে।

শঙ্কর পিসিমার মুখের দিকে তাকালো। সেখানেও মেঘ নেমে এসেছে। কিন্তু যাবে কী করে—? পিসিমা বললেন : বিষ্টি পড়ছে যে। তারপর ট্রাম-বাস সবই তো বন্ধ হয়ে গেছে।

: আমরা গাড়ি এনেছি।

যাবার এত তাড়া ? শঙ্করের মনে যেন কেমন সন্দেহ হলো।

: আচ্ছা, একটু দাঁড়াও। আমি আসছি এখুনি।

ঘরের ভেতর যেতেই পিসিমা বললেন : আমার কিন্তু ভালো বলে মনে হচ্ছে না শঙ্কর। কোনো বিপদ-আপদে পড়বি না তো বাবা ?

: তুমি কিছু ভেবো না পিসিমা—ভগবান আছেন, তোমার কোন ভয় নেই। তাছাড়া ওরা গাড়ি নিয়ে এসেছে, কারখানার চেনা লোক, না গেলে হয়তো গোলমাল হবে। যদি সকালে ন-টা দশটায় আমি ফিরে না আসি তাহলে খবর দিও পুলিশে। আমার কারখানার ঠিকানা, ফোন নম্বর সব দিয়ে দিলাম। দেখি না কী করে। হয় তো কিছু ভালোও হতে পারে।

: তাই যেন হয়—পিসিমা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন ;—আমার বড় দুঃখের কপাল, তাই বাতাসের শব্দে যে আমার বুক কাঁপে, বাবা !

: বলেছি তো, তুমি ভেবো না—আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না।

শঙ্কর তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠলো।

গাড়ি ছুটে চললো। দুপাশে ঘুমন্ত কলকাতা—বিদ্যুতের আলোয় বৃষ্টিতে ভিজছে। দেখতে দেখতে সহর পেরুল, শুরু হলো মাঠ। তখন অন্ধকার—মাঝে মাঝে জোনাকীর ঝাঁক যেন কাকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে। আর পাশে পাশে কালো কালো গাছের শ্রেণী। দিনের আলোর চেনা পথ দুর্যোগের রাতে যেন এক ভুতুড়ে রূপ ধরেছে। গাড়ি কারখানার মধ্যে ঢুকলো দ্রুত বেগে। সশব্দে গেট বন্ধ হয়ে গেল।

সমস্ত কারখানা অন্ধকারে ডুবে আছে। শুধু ওপর তলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে। সেইটেই ম্যানেজারের অফিস।

: এসো—এসো শঙ্কর। তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি।

ঘরের মধ্যে পায়চারী করছেন চিন্তিত ভাবে ম্যানেজারবাবু। হাত দুটো তাঁর পেছনে—আর কেউ কোথাও নেই।

বোসো—বোসো। চা খাবে ?—

না—এত রাতে চা খাব না।

খাবার খাবে কিছু ?—সরবৎ-টরবৎ ?

না—এই ঠাণ্ডায় কিছুই খাব না। আমায় মাপ করুন।

আচ্ছা, বোসো তবে।

এত রাতে কেন ডেকে আনলেন স্যার ?

আরে এত ব্যস্ত কেন ? সেই কথাই তো বলবো। আগে স্থির হও, তারপর বলছি। এত তাড়াহুড়ো করলে কী হয় ?

শঙ্কর বসলো। ম্যানেজার আবার ঘরের ভেতরে এক পাক ঘুরে এসে শুরু করলেন :

: শোনো শঙ্কর—; আমি তোমাকে কোথা থেকে চাকরী দিয়ে এনেছি তা তোমার খুব ভালোই মনে আছে।

: আপনার উপকারের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

: তোমাকে সব রকমের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছি। তুমি পথে পথে ঘুরছিলে আমার জন্যে বেঁচে গেছ।

: আমি অকৃতজ্ঞ নই—সে ঋণ আমি সব সময়েই স্বীকার করি।

: তাহলে তুমি আমার আর একটু সাহায্য কর।—আমি তাতে আন্তরিক খুশি হবো।

: বলুন স্যার। আমি যথাসাধ্য করবো।

: কথা দিচ্ছ ?—ম্যানেজারবাবু গম্ভীর হলেন।

: আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে নিশ্চয়ই করবো—আর যদি আমার ক্ষমতার বাইরে হয় তাহলে কি করে করবো বলুন ?

: আমি অসম্ভব কাজের কথা কেনই বা বলবো।—

: তাহলে বলুন।

: তুমি করবে কথা দিচ্ছ তো ?

: আগে বলুন। পারলে নিশ্চয়ই করবো।

: আমরা গোপনে একটা জাল ওষুধের ব্যবসা চালাচ্ছি। দারুণ লাভ। তোমাকে আমায় সাহায্য করতে হবে। মোহনকে আমি বিশ্বাস করি না। সে সব ফাঁস করে দেবে। তোমার বুদ্ধি আছে—চরিত্রে জোর আছে, তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর তবে আমি কারো সাহায্য চাই না।

শঙ্কর চুপ করে রইলো—যেন মাথায় ওর বাজ পড়েছে।

: টাকার কথা ভাবছো ?—এই নাও এখুনি হাজার টাকা—এটা তোমাকে আমি পুরস্কার হিসেবে

দিচ্ছি। মাসে মাসে নিয়মিত মাইনে ছাড়া তোমাকে দুশো টাকা করে দেব আমি—

তবু শঙ্কর নীরব।

: আরো বেশি চাও? এতে তোমার মন ভরলো না? বেশ, পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেব।

শঙ্কর কাঁপছিল।

: তোমাকে আমি পরে আরো বেশি দেব—পাঁচশো সাতশো হাজারে তুলে দেব—দেখি আগে ব্যবসা কেমন চলে!—এত ভাববার কি আছে হে? লেগে পড়ো তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। ছিলে পথের ভিখিরি, রাজপ্রাসাদের মালিক হবে—গাড়ি হবে—

আগুনের মতো জ্বলে উঠলো শঙ্কর—আমায় লোভ দেখাচ্ছেন স্যার? টাকার জন্যে ওষুধের নামে মানুষকে বিষ খাওয়াবো, আমি কি এতই নীচ? বাড়ি—গাড়ি আমি চাই না—আপনার টাকা আপনি তুলে নিন—আমি চিরকাল বস্তিতেই থাকবো, খেটে, সৎপথে থেকে, নুন ভাত খাব, তবু পাপের টাকা স্পর্শও করবো না।

: বটে?—চাল দিয়ে কিছু বেশি নিতে চাও ছোকরা? বলো কত চাও?—

: আমাকে মাফ করুন। আমি কিছুই চাই না। আমায় বাড়ি যেতে দিন।

: চিন্তা করে দেখ শঙ্কর।—ম্যানেজারের চোখে আগুন জ্বলল।

: চিন্তা আমি করে দেখেছি স্যার। কদিন আগেই বস্তির পাঁচ বছরের ছেলে ভুলুয়া মরে গেল, টাইফয়েড হয়েছিল। ডাক্তার বললেন; কিছু ভয় নেই—টাইফয়েডে আজ কাল আর কেউ মরে না, সিওর ওষুধ আছে। ইনজেকসন্ হলো—কোন ফল হলো না, পদ্মফুলের মতো ভুলুয়া চির-দিনের মত ঘুমিয়ে গেল। ডাক্তার পর্যন্ত কেঁদে ফেললেন, স্যার। বললেন, জাল—জাল ওষুধ, নইলে এ রুগী কিছুতেই মরতে পারে না। আমি আবার সেই পাপ করবো! লাখ—লাখ ভুলুয়া মরে যাবে—ঝরে যাবে! আমায় মাফ করুন স্যার, বাসায় পৌঁছে দিন, আমি এসব পারবো না।

: দেখছি সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।—ম্যানেজার শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন।

: আজ যে পাপের কথা বলছেন আপনি, কাল তো সেই ভেজাল ওষুধে আমার পিসিমাও মরতে পারেন—আপনার ঘরের ছেলেমেয়েও মরতে পারে। তুচ্ছ স্বার্থের জন্যে দেশের লাখো লাখো লোকের জীবন নিয়ে ছিনি মিনি খেলতে আপনার বিবেকে বাধে না পর্যন্ত?

: বটে—?

: ভুল লোককে আপনি বেছেছেন—আমি এ জিনিস কিছুতেই হতে দেব না। পুলিশে খবর দিয়ে আপনাদের পাপচক্র ভেঙ্গে দেব।

: এ যে দেখছি একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

: অপমান করবেন না স্যার—আমি গরীব হতে পারি কিন্তু খুনী নই, পাপী নই। আমায় ছেড়ে দিন—আমি এখুনি চলে যাব। ভিক্ষে করে খাই তাও ভালো আর আপনার সংস্পর্শে থাকবো না।

হঠাৎ টেবিলে একটা টোকা পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে দুই গুণ্ডা দুহাতে দুই পিস্তল নিয়ে দরজায় দাঁড়ালো।

: এবার—এবার রাজি তো ?—ম্যানেজারের মুখ নিষ্ঠুর হাসিতে ভরে উঠল। বুক ফুলিয়ে শঙ্কর দাঁড়ালো।

: না—কিছুতেই না।—

: রাজি হও, নইলে প্রাণ যাবে।

: যাক্—প্রাণ দেব তবু মিথ্যার সঙ্গে রফা নেই।

: এই রাতে যদি তোমাকে এই নির্জন কারখানায় মেরে পুঁতে ফেলি কাক পক্ষীও টের পাবে না। আর যদি রাজি হও—লাখ লাখ টাকা পাবে—দেখ ভেবে, কী করতে চাও ?

: আমাকে আর পরীক্ষা করবেন না—খুনই করুন।

: তাই করবো—পথের কাঁটা আমি রাখবো না।—রক্তচক্ষে ম্যানেজার বললেন, এখনও বলো—আমার কথায় রাজি —?

: না—না—না! কখনই না, জীবনেও না। দেশের লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা আমি কিছুতেই করতে পারবো না।—

: কিছুতেই বাঁচতে চাও না মূর্খ ?—

: না—অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে নয়।

: তবে তৈরি হও—

: আমি তৈরি—। একটা অনুরোধ, আমার মৃতদেহ যেন পিসিমা দেখতে না পান, তিনি সইতে পারবেন না।

: আমি পুঁতে ফেলবো এখানে।—তৈরি ?

: হ্যাঁ—

কিন্তু কি হয়ে গেল হঠাৎ, শঙ্কর সিংহের মতো গর্জন করে লাফ দিয়ে পড়লো একটা গুণ্ডার ওপর। জানোয়ারের মতো মরবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। লড়ে প্রাণ দেবে। মরতে যখন হবেই তখন আর ভয় কি ?

তবু একটা শেষ চেষ্টা—একটা মরণ কামড়—

দুম করে একটা শব্দ হলো।—

দরজা ঠেলে ঢুকলেন সলিসিটার মিস্টার মুখার্জি।

: আরে ছাড়ো—ছাড়ো! কর কি, শঙ্কর কর কি!—মুখে তাঁর হাসি।

চমকে পেছনে ফিরে তাকালো শঙ্কর : কাকাবাবু—আপনি ?

: কি করি বলো আসতেই হলো তোমার জন্যে। একেবারে মারমুখো হয়েছ, করি কি, বলো। শোন শঙ্কর, তোমার দুঃখের দীক্ষা এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কারখানার মালিক মিস্টার

চৌধুরী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার অনুরোধেই এখানে তোমার চাকরী হয়েছে এবং তোমার সঙ্গে আজ তিন বছর ধরে তিনি এই ভাবে অভিনয় করে যাচ্ছেন আমার বিশেষ অনুরোধে! আজ তার শেষ অঙ্কের অভিনয় শেষ হলো। আজ ছিল তোমার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা; তুমি তাতেও জয়ী হয়েছ। আর শোনো—তোমার বাবা আরো একখানি উইলে তোমার জন্যে আরো পাঁচলাখ টাকা এবং একখানা নূতন বাড়ি রেখে গেছেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই সে উইল এতদিন গোপন রাখা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর্যন্ত এই উইল সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে—একথা তিনি বলে গিয়েছিলেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন, তা আজ সফল হয়েছে। তিনবছর দুঃখের আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়েছ তুমি। এবার এই সততা আর উদ্যম নিয়ে তুমি সফল জীবনের পথে অগ্রসর হও। যখন তোমাদের দুঃখ দেখেছি, সাহায্য করিনি, তখন আমাকে তোমরা ভারি নিষ্ঠুর মনে করেছ। কিন্তু তখন যদি আমি সাহায্য করতাম তাহলে আজ তুমি এ শক্তি কিছুতেই পেতে না—; নিজের বলে তুমি যা অর্জন করেছ তাই তোমার অমূল্য সম্পদ। তুমি জয়ী হও, এই আশীর্বাদ করি।

অভিভূত শঙ্কর মিস্টার মুখার্জির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো।
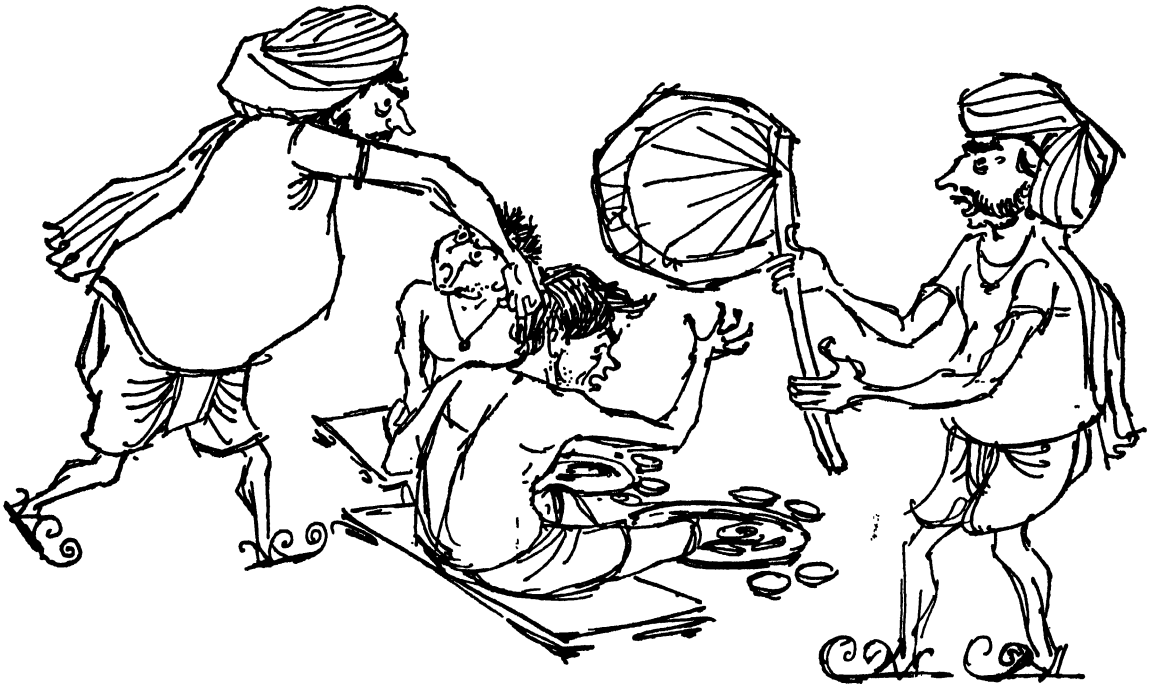
কাঠের গুঁড়ি

নরেন্দ্র দেব

কাঠের গুঁড়ি! কাঠের গুঁড়ি! শুকনো কেন আজ?
শাখায় শাখায় ফুল ফোটাবার ফুরিয়েছে কি কাজ?
তোমার দশা দেখে আমার আসছে চোখে জল,
শুক্‌নো ডালে আবার তোমার ধরবে না কি ফল?
যখন ছিলে সতেজ তাজা, কেউতো এতো খেটে
নেয়নি তুলে কাঠের বোঝা কুড়ুল দিয়ে কেটে?
আজ কে তোমার সর্বশরীর শুকিয়ে গেছে বুঝে,
কী আগ্রহে মুচ্‌ড়ে ভেঙে উপ্‌ড়ে তোলে খুঁজে।
জানো কি ভাই, কেন তোমায় আনছে ওরা ঘরে?
উনুন জ্বেলে আগুন করে পুড়িয়ে দেবে পরে।
ওদের হবে রান্না কতো তোমায় করে ছাই,
এর চাইতে নিষ্ঠুরতা কোথায় খুঁজে পাই?

কাঠের গুঁড়ি! কাঠের গুঁড়ি! শুকনো তুমি দেখে,
চক্ষে আমার অশ্রু যেন বন্যা আসে ডেকে!
যখন ছিলে সবুজ কাঁচ', ছোঁয়নি এসে কেউ
আজকে দেখি তোমার পিছে লেগেছে সব ফেউ!
জীবন্ত গাছ সবার কাছে ঠেকতো যেন বাজে,
শুকনো দেখে নে যায় কেটে লাগবে বুঝে কাজে।
ভাবছি আমরা রূপ যৌবন থাকতে কেন পাই,
সবার আদর, সবার সোহাগ, কিন্তু, তরু ভাই!
দিন কাটতো তোমার একা গাঁয়ের একটি পাশে,
ফল ফুল সব ফুরিয়ে গেলে কে আর কাছে আসে?
আমি যখন শুকিয়ে যাবো, নামবে জরা দেহে,
নড়বড়ে এই বুড়োটাকে রাখবে ঘরে কে হে?

আবার রাসমণি

বাণী রায়

আমার নাম রুবি।

আপনারা সকলেই আমার ইতিহাস জানেন, নয় কি ?

আমি মা-বাবার এক মেয়ে। একজন রক্তচোষা ঝি-এর হাতে পড়েছিলাম—যাকে 'ভ্যাম্‌পায়ার ওম্যান' (Vampire Woman) বলা হয়।

সেই ঝি টা আঠারো নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে সর্বপ্রথম হানা দিয়েছিল, আমি যখন কলেজে ঢুকেছি। তার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম অতিকষ্টে। তারপর গেলাম হাজারিবাগ রোডে চারবছর পরে। সেখানেও বেনেগিন্নীর ঝি সেজে রাসমণি আমার রক্ত চুষতে এসেছিল।

দ্বিতীয় বার রাসমণির হাত থেকে প্রাণটা আমার বাঁচল! কিন্তু মন কাল করে এক বাজপাখি ভয় পাখনা মেলে জেগে থাকে : রাসমণি এখনও বেঁচে আছে!

হাজারিবাগ রোড থেকে সেবারে কলকাতায় ফিরে গোটা তিনটি মাস বিছানায় পড়েছিলাম। একরাত্রে শয়তানী রাসমণির আক্রমণে জীবন রক্ষা পেলেও শরীর ভেঙে পড়েছিল। ক্রমাগত ভয় পেয়ে পেয়ে দেহপাত হয়ে গিয়েছিল।

বাবা ডাক্তার লাগিয়ে হাত যোড় করে বললেন, যা যা বলুন সবই করা হবে, শুধু হাওয়া বদল বাদে! ওটি চলবে না।

প্রায় একবছর লাগল আমার সুস্থ হয়ে উঠতে! রাত্রে কেঁপে কেঁপে উঠতাম! ঘুম হত না! খেতে পারতাম না! অনেক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পরে আমার দেহমন স্বাভাবিক হল!

এর মধ্যে সুশান্ত লেখাপড়া শেষ করে চাকরি নিয়েছে! কেতকী বি. এ পাশ করেছে, বি. টি. পড়ছে! খুড়তুতো ভাই মুকুল ও মনীশ দুজনেই বিদেশ চলে গেছে! একজন ডাক্তারী পড়তে, অন্যজন এঞ্জিনিয়ারিং! আমার সব চেয়ে ছোট ভাই শোভন বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে চলেছে!

আর আমি? রাসমণির ঘটনায় আমি দুবার পড়ায় ভাঙ্গ দেওয়াতে বেশ দেরি করে এম. এ পাশ করেছি! মনে জোর এনে লেখাপড়াটা আমার শেষ করতে হয়েছিল!

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ছেড়ে আমরা বালিগঞ্জে রাসমণির ঘটনার পরেই চলে এসেছিলাম। এখন কলকাতার বাসিন্দাই হয়ে গেছি আমরা! দেশ থেকে অবশ্য নিয়মিত টাকাকড়ি আসে জমিদারী থেকে; সেখানে কাকা কাকিমা দেখাশোনায় আছেন!

প্রথমে ইউনিভার্সিটি যেতাম ভয়ে ভয়ে! বাড়ির গাড়িতে সরকারমশাই পৌঁছে দিতেন রোজ রোজ! তারপর ভয় কমে গেলে শেষের বছরটা একাই যাতায়াত করতাম!

ক্রমে ক্রমে জীবনে সাহস ও উৎসাহ ফিরে এল আবার!

দেখলাম পৃথিবী কত উজ্জ্বল। সকলে কি আনন্দে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে স্বাধীন ভাবে। আমার মত একটা ভয়ের তাড়া খেয়ে কেউ পালিয়ে নেই।

কলেজ স্ট্রীটের দোকানগুলোয় কত আনন্দ, কত উৎসব! মেয়ে, ছেলে নদীর স্রোতের মতই ভেসে চলেছে আনন্দের টানে। চারদিকের জীবনে উৎসাহ!

কবে আমার কি ঘটেছিল, একটা ঘৃণ্য, রক্তচোষা স্ত্রীলোক আমার রক্ত চুষে খাবার আশায় দু'দুবার যে আমার পিছু নিয়েছিল, সে কথা কি মনে করে বসে থাকতে হবে ঘরে দোর দিয়ে, খিল লাগিয়ে? সে তো ব্যর্থ হয়েছেই। আর কেন? এতদিনে মরেই গেছে রাসমণি। সুশান্ত গুলি লাগিয়েছিল ওর পায়ের গোড়ালী ঘেঁষে। লেগেছিল। রক্তের দাগও ছিল পথের খানিকদূর পর্যন্ত। গুলি খেয়েই মরে গেছে ও।

শেষে কলকাতার এক কলেজে কাজ নিলাম। জীবনটা বেশ চমৎকার কেটে যেতে লাগল। পৃথিবীর কোথাও যে ভয় থাকতে পারে ভুলেই গেলাম।

সেবার শীতের ছুটি। এমন সময়ে এক সাহিত্য সম্মেলনে হঠাৎ ডেলিগেট হয়ে গেলাম। দেশবিদেশ দেখার ইচ্ছা চিরদিনই ছিল। মধ্যে ভয়ের তাড়া খেয়ে পারতাম না কোথাও যেতে স্বচ্ছন্দে। কিন্তু সে তো বহুদিন আগের কথা। এম. এ. পাশ করে স্বাধীন চাকরি নিয়ে আমার যেন সাহসটা ফিরে এল। দিব্যি স্বাধীন কাজকর্ম করছি। অতগুলো টাকা মাস মাস হাতে পাচ্ছি! ফলে জীবনে শখ মাথা তুলল। এখান-ওখান বেড়াতে শুরু করলাম নিজের পয়সায়।

সরকার মশাই এখন অতিশয় বুড়ো হয়ে দেশে চলে গিয়েছেন। যাবার আগে একটি উপদেশ আমাকে দিয়ে গিয়েছেন:—

'রুবি মা, সাবধানের বিনাশ নেই।'

তাই সাবধান হতে ভুলতাম না প্রায়ই, কিন্তু হাসি পেত আমার পূর্ব জীবনের ভয়ের স্মৃতি মনে পড়ে।

যাহোক, দল বেঁধে আমরা চারটি অধ্যাপিকা রওনা হলাম দক্ষিণ ভারতে সাহিত্যসম্মেলনে ডেলিগেট হয়ে। এদিকে পূর্বে কেউ আসিনি। আশেপাশে যতটা পারি দেখে নেব স্থির করেই গেলাম।

প্রথম তিন দিন চলল সম্মেলন বড় শহরে। আমরা খুবই ব্যস্ত রইলাম এ তিনটি দিন। তারপর ডেলিগেটের ক্যাম্প বন্ধ হওয়ায় আমরা একটা ছোটখাটো হোটেল খুঁজে নিলাম। এখানে কয়েকদিন থেকে শহরটা দেখে নেব।

তারপর পাশের শহরগুলোও যতটা পারি দেখব।

বন্ধুরা বলল, 'ভাল হোটেল পেতে হলে আগে ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। এখন যা পেয়েছি, এতেই থাকতে হবে।'

ছোট-গলির মধ্যে একটা দোতলা বাড়ি। পাশে খানিকটা দূরে শহরের যত আবর্জনা ঢালা হচ্ছে। বাড়িটার মধ্যে অবশ্য যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখা হয়েছে। সামনে ছোট একফালি লনও আছে। একটা

ঘর পেলাম। তিনজনের যোগ্য ঘরে আর একটি চৌকি ঢুকিয়ে তাকে চারজনের মত করে দিয়েছে। পুরো নিরামিষ হোটেল, দক্ষিণ ভারতের সাধারণ চটিশ্রেণীর হোটেলগুলোর মতই।

সাদা-কাপড়-পাতা একটা টেবিল, দুখানা শক্ত চেয়ার ঘরে ছিল। আমরা ঠিক করলাম কোনমতে কটা দিন এখানেই খাবার আনিয়ে খেয়ে কাটিয়ে দেব।

মোটামুটি একটা আস্তানা ঠিক করে শান্তি হল। গলিটা বড় ছোট, এই যা অসুবিধা। পাড়াটাও আর একটু পরিষ্কার হ'লে ভাল হত। গলির শেষে খানিকটা খোলা জায়গা আবর্জনা ফেলে ভরিয়ে রাখা। নিশ্চয় ময়লাফেলার গাড়ি কোন এক সময়ে এগুলো নিয়ে যায়। জায়গাটার ওপাশ দিয়ে সরু পায়ে-চলা রাস্তাটা কোথায় গেছে কে জানে?

আমরা শহরটা দেখবার আশায় গলি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তায় এলাম। এখানে ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায়। একখানা গাড়ি ভাড়া করে আমরা ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম।

শহর মন্দ নয়, কিন্তু বড় নির্জন। সাহিত্যসম্মেলনটি এখানে বসবার একমাত্র কারণ এখানকার রাজা প্রচুর অর্থ দিয়েছেন সাহায্যকল্পে। একদল লোক আছে হুজুগে। তারা দক্ষিণ ভারত দেখার লোভে এখানে সভা করতে রাজি হয়েছে। নইলে দল বেঁধে আসার মত নয় স্থানটি।

যাই হোক, এসেই যখন পড়েছি, তখন ভাল করেই বেড়িয়ে ফিরব।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, জায়গাটি ভরা ভিখিরি। 'এখানে এত ভিখিরি কেন?' নন্দা, আমাদের ইংরেজি অধ্যাপিকা, জিজ্ঞাসা করল?

'এ সমস্ত জায়গার লোকেরা বড় গরীব। খেতে পায় না। তাই ভিক্ষে করে বেড়ায়।' বাংলার অধ্যাপিকা মীরা উত্তর দিল।

রেবা সোমকে আমরা ঠাট্টা করে 'ভীমভবানী' বলতাম। সে দেহচর্চার ভার পেয়েছিল কলেজে।

রেবা বলে উঠল, 'একবার আমি এখানে বসলে লোকগুলোকে কাজ করাতাম। ভিক্ষে করে বেড়ানো চলত না।'

আমরা হেসে উঠলাম।

'তুমি বসে যাও এখানে, ভীম ভবানী। একটা ভাল মত সার্কাসের দল খোল। বুকে হাতি তোল। পিঠে লোহা ভাঙো।'

রেবা বলল, 'পারি না নাকি আমি? বুকে হাতি তুলতে না পারলেও আমি দাঁত দিয়ে কতটা ওজন তুলছি আজকাল, দেখছ না? একটু-একটু করে অভ্যাস করছি। ধীরে ধীরে সমস্ত হবে। কেবল মেয়েদের ড্রিল আর খেলা নিয়ে থাকলে আমার চলবে না! নিজের শরীরগঠনে মন দিতে হবে। বাঙালী মেয়ের বদনাম আছে, তারা দুর্বল। আমি দেখিয়ে দেব। শরীরের বলে ভীমভবানী না হতে পারলেও দাঁতের জোরে পারব।' পাত্‌লা ছিপছিপে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্‌ট্রেস্‌ রেবা একসারি ঝক্‌ঝকে দাঁত দেখিয়ে হেসে উঠল।

ছেলেবেলা থেকেই রেবার দাঁতে ভয়ানক জোর। সে তাই সারাদিন দাঁতের তোয়াজ নিয়েই

থাকে। সকালে উঠেই আর যা হোক না হোক দাঁত মাজবার গরম জল চাই।

হীরের মত ঝক্‌ঝকে দাঁত রেবার। দাঁতে ধার ঠিক হীরের মতই। অনেক দিন সে আমাদের কাছে দাঁতের কত জোর হতে পারে দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছে।

দাঁত নিয়ে রেবার মাতামাতি দেখে আমরা অবশ্য যথেষ্ট হাসিঠাট্টা করেছি। হাতপায়ে জোর হয় মানুষের, শরীরে শক্তি হয়। কিন্তু, দাঁত কি করে, শক্ত-সমর্থ হলেই বা অমন স্থান নিতে পারে?

রেবাকে দেখে সাধারণ বাঙালী ঘরের ছোটখাটো একটা মেয়ে বলেই মনে হয়, যেমনটি আমরা পথেঘাটে দেখতে পাই রোজই। দাঁতের শক্তির জন্যই আমরা তাকে 'ভীমভবানী' বলতাম।

শহরটি মোটামুটি দেখে নিয়ে আমরা এলাম চটিটায় ফিরে। বলে-কয়ে ঘরে খাবার পাওয়া গেল। কাঁধ-উঁচু পিতলের থালায় দোসা, ইডলি, চাটনি। বাটীতে সম্বর, রসম, দহিবড়া। একটা করে অমৃতি।

যাই হোক, আমাদের মাছভাত খাওয়া মুখে নূতন ধরনের খাদ্য খারাপ লাগলেও নূতনত্বের আশায় আমরা খেয়ে গেলাম। খাওয়া দাওয়ার পরে সকলে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। কয়েকদিন যাবৎ অতিরিক্ত ঘোরাঘুরি হওয়াতে সকলেই ক্লান্ত ছিলাম।

ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে শাড়ি বদলে নিতে নিতে ঘরে বিকেলের জলযোগ দিয়ে গেল। কফি ও পাকোড়া।

কফির পরে ঠিক হল স্টেশনে গিয়ে ট্রেন দেখে সীট রিজার্ভ করা হবে সাত দিন পরে। এই সাত দিনে এই শহরটিকে কেন্দ্র করে মোটরবাসে পাশের শহরগুলো দেখে নেব। বাসের ভাড়াও সস্তা, যাতায়াতের অসুবিধা নেই। আমাদের কুলিয়ে যাবে।

প্রোগ্রাম ঠিক হওয়ার পরে সকলেই শান্তি পেলাম। নন্দা একটা দোকানে জামার কাপড় দেখে এসেছে, সে সেখানে যেতে চাইল। আমিও ঠিক করলাম কেতকীর জন্য জামার একটা কাপড় কিনব। অন্য দুইজন গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি দেখতে চায়। ঠিক হল ওদের মন্দিরে নামিয়ে কাপড়চোপড় কিনে আমরা মন্দিরেই ফিরে আসব।

গাড়ি করে গেলাম বেরিয়ে। রেবা ও মীরাকে মন্দিরে নামিয়ে নন্দার সঙ্গে কাপড়ের দোকানে গেলাম। একটা কিনতে দশটা কিনে ফেলা হল। ফলে খুবই দেরি হয়ে গেল।

নন্দা বলল, 'ওরা যা চটে আছে। এক সঙ্গে বসে আরতি দেখব, প্রসাদ খাবো, কথা ছিল। এতক্ষণে ক্ষেপে রয়েছে।'

আমি বললাম, 'আরতি না দেখি ঠাকুর দেখেছি তো। আহা, কিবা প্রসাদ। শুকনো নারকেলের টুক্‌রো আর কিসমিস। তার চেয়ে চল, কিছু ভাল মিঠাই কিনে নিয়ে যাই বাজার থেকে। ওরা মিষ্টি পেলে রাগ ভুলে যাবে। যা ব্যবস্থা দেখছি খাবারের হোটেলে।'

অনেক মিষ্টি কিনে আমরা মন্দিরে গেলাম। তখন আরতির ভিড় নেই। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছড়িয়ে লোকজনেরা। বেশির ভাগ মাদ্রাজী লোক। তারা কেমন শক্ত শক্ত অক্ষরে কথা বলে জটলা

করছে। দু' চারজন ট্যুরিস্টও আছে। রাত্রি প্রায় আটটা।

শহরের বড় রাস্তার উপর মন্দিরটা হলেও পাশের সরু গলি পথেও আর একটা বড় ফটক। এই শহরটার বিশেষত্ব এর সরু সরু গলিগুলো। দক্ষিণ ভারতের পথঘাট বড় বড় চওড়া, ঝরঝরে পরিষ্কার। কিন্তু এই শহরটায় সবই উৎকট।

গলিগুলোর মধ্যে ভাঙাচোরা বস্তিবাড়িও দেখা যায়। ইচ্ছা করলে শতশত চোর ডাকাত খুনে লুকিয়ে থাকতে পারে। হয়তো বা থাকেও। দেখার জিনিসও বেশি নেই। গোবিন্দজীর মন্দির তার মধ্যে একটা বস্তু। এখানে নাকি কঠিন কঠিন রোগের ঔষধ মিলে যায়। সেইজন্যে নানা জায়গা থেকে লোকজন ধন্না দিতে আসে।

মন্দিরের চত্বর ভরে গেছে রোগী ও ভিখিরির দলে। অনেক ধরণের রোগী আছে। ছোঁয়াচে রোগ যাদের, তাদের স্থান পাশের গলির মধ্যে। গোবিন্দজীকে ওখান থেকেও দেখা যায়।

রেবা ও মীরাকে সম্মুখে দেখলাম না। কাজেই খুঁজতে হল। নন্দা বলল, 'চলে যায়নি তো আমাদের দেরি দেখে?' আমি বললাম, 'কিন্তু কথা ছিল তো যত দেরিই হোক আমাদের, ওরা অপেক্ষা করবে। নুতন শহরে সন্ধ্যার পরে দল বেঁধে না গেলে বিপদ ঘটতে পারে, মেয়েদের বেলায়।'

নন্দা টিপ্পনী কাটল, 'আর, রাস্তাঘাটের ছিরি দেখলে হয়ে যায়!'

রাস্তাঘাট তো এ কদিন দেখাই হয়নি। আমরা সভা আর বক্তৃতা নিয়েই ছিলাম। এখন শহর দেখতে বেরিয়ে থাণ্ডারস্ট্রাক্। এমন একটা জায়গায় আসে কেউ? কোনমতে পাশের শহর দুটো আর পাহাড়টা দেখে নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি, বাবা! দক্ষিণ ভারতে কত না কত ভাল জায়গা। অবশেষে কিনা এলাম এখানে?'

আমি বললাম, 'আর দেখাশোনা পয়সায় কুলোনো চাই তো। গোবিন্দজীর মন্দিরে শুনি বিনে পয়সায় থাকতে, খেতে দেয়। তেমন-তেমন বিপদে যদি পড়ি তো এসে এখানেই আস্তানা গেড়ে বসা যাবে। কিন্তু, ওরা গেল কোথায়? রেবা আবার যা রাগী! দেরি দেখে চটে চলে গেল না তো? ওর ভয়-ডর নেই। মীরাকে টেনে নিয়ে গেছে বোধ হয়।'

নন্দা বলল, 'আবার রাগের মাথায় আমাদের ওপর দাঁতের জোরের না পরখ করে!'

আমরা হাসতে হাসতে কিন্তু একটু চিন্তিত ভাবে প্রকাণ্ড মন্দিরটার চারদিকে তন্ন তন্ন খুঁজতে শুরু করলাম।

একজন পূজারী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আসছিলেন এধারে। আমাদের এমন করে খুঁজতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে ছেলেপিলে হারিয়েছে না কি?'

এখানে লোকেরা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলতেও পারে ও বুঝতে পারে। অথচ হিন্দি জানে না। আমরাও ইংরেজি বোঝাবার জন্য থেমে থেমে বলে কাজ চালালাম।

পূজারী বল্লেন, 'কিছুদিন হ'ল মন্দির থেকে বড্ড ছোট ছেলেমেয়ে চুরি যাচ্ছে। এত বড় মন্দির, এত লোকজন, যে ছেলেধরাকে ধরাও শক্ত। তাই আমরা নিজেরা যাত্রীদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিই।'

'ছেলেধরা ধরা পড়ে না?'

আমাদের প্রশ্নে পূজারী বল্লেন, 'ধরা পড়লে তো একটা গ্যাংকেই ধরে ফেলতে পারতাম।'

'ছেলেগুলোকে ফিরে পাওয়া যায় না?'

'না। তবে হ্যাঁ, দু' একটির মৃতদেহ পাওয়া গেছে।'

আমরা শিউরে উঠলাম 'তবে ছেলেধরা বলছেন কেন? এ তো ডাকাত! গয়নাগাঁটি কেড়ে মেরে ফেলেছে, ছেলেটি ধরিয়ে দিতে পারে ভেবে।'

পূজারীর ভাঙা ইংরেজিতে কথা চালাতে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি কথা না বাড়িয়ে সরে পড়লেন।

গায়ের মধ্যে ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল। এত জায়গায় গেছি, দেশবিদেশে বেড়িয়েছি, কই, আমার কখনও তো এই রকম মনোভাব হয়নি?

গা যেন ভয়ে ভারি হয়ে আসছে, পা যেন উঠছে না। কেমন একটা চাপা-অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আকাশে বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

এদিকে সরে আসায় গোবিন্দজীর মন্দিরের ঝক্‌ঝকে উঁচু চক্রচিহ্নের ওপরে দেখলাম রাত্রির আকাশের তারা জ্বলছে একটি দপ্‌দপ্‌! লাল হয়ে উঠেছে যেন আকাশটা। তারা চমকে চমকে কাঁপছে ভয়ে।

চমকানো আর কাঁপা তারা যেন বলে দিতে চায়, আমিই তোমার অশুভ নক্ষত্র, রুবি। তোমার ভাগ্য সেজে আজ এখানে টেনে এনেছি।

জীবনে বহু ভয়ের পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে হয়েছে আমাকে। জোর করে নতুন মানুষ হতে হয়েছে। তাই মনকে শক্ত করে ভয়টা ঝেড়ে উঠতে হল আমাকে আজ।

যাই হোক দেখলাম গলির দিকে মুখের কাছে রেবা, মীরা দাঁড়িয়ে।

আমরা ডাকলাম, 'ওখানে কেন নোংরার মধ্যে? এদিকে এস।'

মীরা ছুটে এল, 'বাবা, এতক্ষণে আসা হল! পয়সাকড়ির ব্যাগটা পর্য্যন্ত নিয়ে গেছ ভুল করে? আমাদের কাছে একটি পয়সাও নেই।'

'কেন? প্রণামী দেবে বুঝি?'

'না ভাই, পাথরের দেবতাকে প্রণামী দিয়ে কি করব, যখন চারপাশে এতগুলো মানুষ না খেয়ে মরছে? একটা বাঙালী বুড়ো ভিখিরি দেখলাম। গোবিন্দজীর নাম ডাক শুনে এখানে কিছুদিন হল এসে রয়েছে। বেচারীকে কিছু দিতাম।'

'কি রোগ ওর?'

'এই গলিটায় সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগী থাকে। ওর অবশ্য কুষ্ঠ নয়, শ্বেতী।'

ততক্ষণে রেবাও এগিয়ে এসেছে। মীরা বলল, 'ওই যে দেখ ভিখিরিটা। আমরা 'রুবি এখনও এল না, রুবির কি হল?' বলছিলাম দেখে যেচে এসে কথা বলল। বুড়ো মানুষটা, রোগে, অভাবে কঙ্কালসার হয়ে গেছে। দেশের লোককে এতদূরে দেখে ভারি খুশি হল। এই যে দেখ, এই যে!'

দেখলাম ধুতির ওপর মোটা চাদর জড়ানো এক বুড়ো অতিকষ্টে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ-মাথা-গলা সমস্ত জড়ানো মোটা চাদরে। শুধু চোখ দুটো বাইরে। ক্ষিধেয় বা রোগে যাতেই হোক, চোখ দুটো জ্বলছে। এতদূর থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মীরা আমাদের হাতের ব্যাগ খুলে কিছু পয়সা বা'র করে নিল।

দয়াময়ী রেবা বলল, 'তোমরা কত খাবার এনেছ কিনে। এর থেকে কিছু দিই। বেচারী মাদ্রাজী ছত্রে পেট পুরে খেতে পায় কি না কে জানে?'

রেবা প্রসাদ পেয়েছিল একটা মাটীর সিঁদুর মাখা সরায়। সে প্রসাদী ফুল রুমালে বেঁধে সরায় চারটে মিষ্টি দিয়ে বুড়োটার হাতে দিয়ে এল। আমরা নোংরা গলির দিকে এগোলাম না।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে। গাড়ি কাছাকাছি দেখতে পেলাম না, যদিও রাস্তা এখনও লোকজনে ভরা।

নন্দা বলল, 'হোটেল এখান থেকে বেশ দূরে। হেঁটে যাওয়া চলবে না।'

রেবা বলল, 'না না। সোজা রাস্তা ধরে গেলে দূর বটে, কিন্তু মন্দিরের পেছনের রাস্তা দিয়ে গেলে খুবই কাছে। রাস্তাটা পড়েছে আবার হোটেলের গলির আবর্জনা ফেলার পতিত জায়গাটায়।'

আমি বললাম, 'তুমি আবার এমন ভূগোল শিখলে কোথা থেকে?'

রেবা উত্তর দিল, 'আমি মীরাকে বলছিলাম রুবিরা এখনও এল না। হোটেলে ফিরব কি করে বেশি রাত হলে? তাই শুনে ওই ভিখিরিটা বল্লে, কেন মা, হোটেল তো এক পা, এই রাস্তাটা দিয়ে গেলে।'

আমি বললাম, 'ভিখিরিটার সঙ্গে অনেক গল্প করেছ দেখছি। রেবা অপ্রতিভ হল, 'মানে, আমরা কথা বলছিলাম কি না, ও কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই শুনেছে। আহা, লোকটিকে দেখলে মায়া হয়। নড়্‌বড়ে শরীরটা, নড়াচড়ায় কষ্ট। গলাটা ভাঙা-চাপা। রোগে বসে গেছে বোধ হয়। পুরুষ কি মেয়ে বুঝতেই কষ্ট হয়। বুঝতে পারা শক্ত।'

আমরা ধীরে ধীরে আধো অন্ধকারে পা টিপে টিপে গলি ধরে চলতে লাগলাম। রাস্তা সত্যিই অল্প, কিন্তু পথঘাট ভাল জানা না থাকায় আমাদের সময় লাগল আবর্জনা ফেলা জায়গায় পৌঁছতে।

মীরা নাকে কাপড় টেনে বলল, 'উহু-হুঁ! দেখছ ছোট ছোট মরা জন্তু পর্যন্ত পড়ে আছে। এখানে ধাঙড়ও নেই?'

নন্দা বলল, 'বিদেশ বিভূঁই, অত খুঁ-খুঁৎ করলে চলে নাকি?'

রেবা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। অবাক হয়ে আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখাল, 'দেখ, দেখ!'

দেখলাম সেই সরাভর্তি মিষ্টি পড়ে আছে। সিঁদুর মাখা প্রসাদী সরা, ভুল হওয়ার উপায় নেই। সেই সব মিষ্টান্ন—বালুসাই, পেঁড়া, অমৃতি, কুমড়োর মেঠাই!

'কি আশ্চর্য! খাবারগুলো এভাবে নষ্ট করল কেন? ভারি অসভ্য তো।'

মীরা বলল, 'হয়তো রোগে মিষ্টি খাওয়া বারণ। রেবা যখন দিচ্ছিল তখন কেমন অদ্ভুত ভাবে

রেবার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। চোখ দুটো যেন জ্বলছিল।'

রেবা বলল, 'আহা, গরীব মানুষ। কত আশা করে রোগ ভাল হবে বলে এখানে গোবিন্দজী মন্দিরে পড়ে আছে। ভালমন্দ খাবার দেখে লোভে চোখ জ্বলছিল। ঠোঁট চাটছিল ঘন-ঘন।'

'তাহলে ফেলে দেবে কেন?'

'ফেলে হয়তো দেয়নি। এখানেই রেখে গেছে কোথাও। মন্দির থেকে জায়গাটা এত কাছে যে ঘনঘন যাতায়াত করছে।'

'এমন নোংরা জায়গায় কেউ খাবার রাখে? ফেলেই দিয়েছে। কিন্তু কোথায় গেল ও?' নন্দা এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল।

একধারে পাহাড় সমান উঁচু আবর্জনা। তারি আড়ালে বুড়ো হয়তো গেছে মনে করে আমরা চলে এলাম। কিন্তু আমার কেমন কেমন লাগতে লাগল!

পরের দিন ভোরের ট্রেনে আমরা পাশের শহরে একটি পাহাড় দেখতে গেলাম। সেদিন রাত্রিটা ওখানেই কাটিয়ে পরের দিন ফিরলাম।

আজকের প্রোগ্রাম মোটর বাসে নারকেলের আবাদ দেখতে যাওয়া। এটা ট্যুরিস্ট সিজন। টিকেট পাওয়া যাবে না ভেবে আগেই টিকেট কাটা হয়েছে।

কিন্তু সকলের যাবার অবস্থা নেই। পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়াতে রেবার পা-টা জখম হয়েছে। চলাফেরা করতে সে পারছে না। আমিও জ্বর নিয়ে ফিরেছি। অতটা উঁচু পাহাড়ে জিদ করে উঠতে যাওয়া ভুল হয়ে গিয়েছিল।

আমরা নন্দা-মীরাকে জোর করেই বেড়াতে পাঠালাম। 'টিকেট কাটা হয়েছে। সবাই বসে থাকার মানে হয় না। হোটেলে একরাত আমরা দু'জনে বেশ কাটিয়ে দেব। কাল ভোরেই তো ফিরছ তোমরা।'

ওরা ইতস্তত করতে লাগল, 'রুবির জ্বর। বিদেশে কখনও দলছাড়া হতে নেই। কার ভরসায় রেখে যাব?'

আমি বললাম, 'কেন, ভীমভবানীর ভরসায় রেখে যাও।'

রেবা কাৎরাতে কাৎরাতে বলল, 'আর ভীমভবানীর ভরসা নেই। পা'খানা তো গেছেই, ডান হাতটাও নাড়াতে পারছি না। তবে ম্যানেজারটি বড় ভাল। ডাক্তার ডেকে আনলেন। কতবার খবর নিচ্ছেন। তোমরা চলে যাও। ভয় নেই কোন।'

মীরা বলল, 'আহা, ম্যানেজারের পোষা কুকুর দু'টোর একটা এমন ভাবে মারা গেল। তবুও উনি কত করছেন!'

ম্যানেজারের পোষা একটা কুকুর আবর্জনার গাদার পাশে সকাল থেকে মরে পড়ে আছে। গায়ে কামড়ের দাগ। অন্য কুকুরদের সঙ্গে অসম যুদ্ধে তার প্রাণ গেছে বোঝা যায়।

যাই হোক, নন্দা-মীরা অনিচ্ছায়ও অবশেষে চলে গেল। আমরা সারাদিন দুজনে ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়েই কাটালাম আর গজগজ্ করতে লাগলাম বিদেশে এসে অসুখ হয়ে পড়ার ক্ষোভে।

সন্ধ্যার দিকে আমার জ্বর ছেড়ে গেল বটে, কিন্তু শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ল যে, মাথাও তুলতে পারিনা। রেবার অবস্থাও তথৈবচ।

রাত্রে তাড়াতাড়ি দুধপাঁউরুটি খেয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। বাইরে ঘন অন্ধকার। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।

রেবা একবার ঘুমের ঘোরে বলল, 'বাথরুমের দরজাটা বন্ধ আছে তো?'

পাশের বাথরুমে জমাদারের যাতায়াতের উদ্দেশ্যে একটা বাইরের দিকে দ্বার ছিল। ঘরের সঙ্গে লাগানো বাথরুম।

আমি বললাম, 'একবার দেখে এলে হত না? সাবধান হওয়া ভাল।'

কিন্তু উঠে যেয়ে দেখবে কে? শরীরের এমন অবস্থায় নড়াচড়া সম্ভব নয়।

পরস্পরকে অনুরোধ উপরোধ করতে করতে আমরা ঘুমিয়েই পড়লাম।

ঘুম ভেঙে গেল। আমার ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ মাঝরাত্রে। অনেক রাত্রির বিভীষিকা দক্ষিণ ভারতের সুদূর কোনে এই শহরটার বুকে ফিরে এল। হাজারিবাগ রোডের সেই ভয়াবহ রাত্রির একটা লাইন টেনে কে যেন যোগ করে দিল আজ এই মাদ্রাজী রাত্রে।

গোঁ-গো আওয়াজ করছে রেবা। হাত-পা তার মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা খাটের সঙ্গে। নড়বার উপায় নেই একচুল। মুখে তার একগাদা কাপড় গোঁজা। চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। মুখ লাল, কপালের শিরা দড়ির মত শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে। মাথার কাছের ছোট খোলা জানালা দিয়ে আকাশের আলো আসছে, তাইতে দেখা গেল।

আমার অবস্থা?

আমার হাতপা বাঁধা নয়, মুখে কাপড় গোঁজা নয়! কিন্তু লোহার মত শীর্ণ একটা হাতের শক্ত পাতা মুখ চেপে আছে। চোঙার মত সরু মুখ, টক্‌টকে ঠোঁট আর দাঁতের সার! আবার রাসমণি!

বাঘ যেমন শিকার চেপে বসে তেমনি রাসমণি আমাকে চেপে বসেছে। শাদা-শাদা পোড়া দাগে ভরা মুখখানা। জলন্ত চোখ কোটরে দপদপ করে অন্ধকারে জ্বলছে।

অনেকটা রোগা হয়ে গেছে রাসমণি বুড়ো বয়সে। কিন্তু মানুষের রক্ত খেয়ে, প্রাণীর রক্ত খেয়ে যার দিন কাটে তার দেহে মানুষখেকো বাঘের শক্তি! আমার কিছুই করবার নেই।

দাঁতে দাঁত পিষে রাসমণি চাপা গলায় বলল, 'তোর ভাই আমাকে খোঁড়া করে দিয়েছে এবার শোধ নেব। ভেবেছিলি মরে গেছি, না? কেমন জব্দ! বুড়ো ভিখিরি সেজে গা-মুখ ঢেকে ভাঙা গলায় কথা বলে ধোঁকা দিয়েছি। দু'দুবার তুই আমার মুখের গ্রাস থেকে পালিয়ে বেঁচেছিস। এবার তোকে কে বাঁচাবে? তোর রক্তের স্বাদ আমার মুখে লেগে আছে! তোকে শেষ করে তোর বন্ধুটাকে ধরব! ওটার রক্তও মন্দ হবে না!'

রেবা আবার গোঁ-গোঁ করে উঠল। আমার আর নড়বার শক্তি নেই! দুর্বল দেহে রাসমণির আক্রমণের বিরুদ্ধে কুটোর মতো ভেসে গেলাম। রেবার হাত-পা মচকানো, তার ওপর শক্ত বাঁধন। তাই বুঝি কষ্টে গোঁ-গোঁ করছে ও?

অতিকষ্টে চোখ ঘুরিয়ে তাকালাম। গভীর রাত্রে দরজা বন্ধ ঘরে ঘরে। তাই রাসমণি রসিয়ে রসিয়ে শিকারে দাঁত বসাবে। রক্তচোষার হাত থেকে মুক্তির আজ কোনও পথ নেই।

রেবা ওর চোখের সাহায্যে কি যেন বলতে চায়। চোখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নীচের দিকে দেখাতে চেষ্টা করছে। আমার মত ভয় সে পায়নি ঠিকই। কিন্তু রাসমণিকে তো ও চেনে না!

ভ্যাম্পায়ার রাসমণি ধারালো দাঁতে পৈশাচিক হাসি হাসছে। আমাদের রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই জেনে ওর রক্তলোভ উগ্র হলেও ও রয়ে-সয়ে চেখে চেখে রক্ত চুষে নেবে, বুঝলাম!

নিঃশ্বাস আমার বন্ধ হয়ে আসছে! এখনি অজ্ঞান হয়ে পড়ব! ভয়ানক ভাবে বিদেশে এখনই দুই বন্ধুর জীবন শেষ হয়ে যাবে! কেউ নেই যে বাঁচাতে পারে।

রেবা যেন অসহিষ্ণু হয়ে আবার গোঁ গোঁ করে উঠল। কিছু সে করতে বলছে।

হ্যাঁ, বুঝলাম। আমার তো এদিককার হাতটা খালি আছে। রাসমণি হাঁটু চেপে ওপরের দিকটা ধরলেও কনুই থেকে ডান হাতখানা খালি।

প্রাণপণ চেষ্টায় হাতখানা ভাঙ্গার মত করে বেঁকিয়ে এক ঝটকায় রেবার মুখে-গোঁজা কাপড়ের তাল খুলে দিলাম ফেলে।

এক মিনিট মাত্র সময় কাটল।

গগনভেদী চীৎকারে রাসমণি লাফিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। রেবার মুখে তার দুইটি হাতের আঙুল কাটা। রক্তে বিছানা ভেসে যাচ্ছে! আমাদের রক্ত নয়—রাসমণির রক্ত এবার!

চারদিক থেকে সাড়া জেগে উঠল। করিডরে আলো জ্বালা ও আমাদের ঘরে ধাক্কা পড়ার আগেই রাসমণি লাফিয়ে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাথরুম দিয়ে বার হয়ে গেল। এতক্ষণে বুঝলাম যে জমাদারের দরজা আমাদের মনের ভুলে খোলা রেখে আমরা শুয়েছিলাম। সেই পথে রক্তচোষা ঘরে ঢুকেছে!

রাসমণির কাহিনী বিচিত্র!

পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সে বাংলা ছেড়ে বিহার গিয়েছিল। আবার সেই ভয়ে সুদূর মাদ্রাজে পালিয়ে এসেছিল। গোবিন্দজীর মন্দিরে রোগী ও ভিখিরির ভিড়ে নিজের গায়ের সাদা দাগ, খোঁড়া পা নিয়ে দিব্য লুকিয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে যাত্রীদের ছেলেমেয়ে চুরি করে নিজের রক্তপিপাসা মেটাত।

হোটেলের আবর্জনার মধ্যে ওর আস্তানা করেছিল রাসমণি। এখানে লোকজন কমই আসত! আবর্জনার পাহাড় জমে আড়ালও হয়েছিল। কুকুর বেড়াল ধরে ধরে এখানে বসেই রক্ত চুষে খেত; তারপর মৃত দেহগুলো ফেলে রেখে যেত। রাসমণি রক্তচোষা, মাংসাশী নয় কি না! এখানে আবর্জনার

গাদায় মরা জীবজন্তু কারুর চোখে পড়ত না। ম্যানেজারের কুকুরটিকেও রাসমণি গ্রাস করেছিল। আমাকে এতদিন পরে দেখে ওর রক্তচোষার ইচ্ছা উগ্র হয়ে উঠেছিল। আমাদের গতিবিধির ওপর চোখ রেখে এই আবর্জনার গাদায় লুকিয়ে রাসমণি সুযোগ খুঁজছিল। মন্দির থেকে অতি অল্প সময়ে এখানে ও চলে আসতে পারত।

সেদিন মিষ্টিগুলো ফেলে দিয়েছিল রাসমণি? মিষ্টান্ন দিয়ে ও কি করবে? অমৃত যোগালেও তাতে ওর অরুচি হত। ওর খাদ্য একটিই—রক্ত! মানুষের রক্ত পেলেই সবচেয়ে ভাল।

এই ভ্যামপায়ারগুলোর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। সুযোগ খুঁজে খুঁজে কাজ হাঁসিল করা রাসমণির পক্ষে অতি সহজ ছিল।

কিন্তু, কি করে বারবার তিনবার আবার ভাগ্য আমাকে ডেকে ওর হাতের মুঠোয় তুলে দিয়েছিল? রাসমণি অস্বাভাবিক বুদ্ধিবলে বোধ হয় বুঝেছিল ভবিষ্যতে আমি কোনদিন আমি এখানে আসব। তাই ওঁৎ পেতে অপেক্ষায় ছিল।

এতক্ষণে একটি দল আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে রাসমণির পেছনে গেছে।

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভয়ে কাঁপছি আমার প্রাণরক্ষাকর্ত্রী বন্ধু ভীমভবানী রেবার পাশে বসে। এমন সময়ে দলটি খবর নিয়ে ফিরে এল রাসমণির।

সত্যি সত্যি এবার রাসমণি শেষ হয়ে গেছে। খোঁড়া পা নিয়ে ছুটে পালাতে পারেনি। আবর্জনার গাদায় হোঁচট খেয়ে পড়েছিল। ম্যানেজারের আর একটি কুকুর ছিল। সেই বুলডগ সঙ্গে সঙ্গে টুঁটি কাঁমড়ে ঝুলে পড়েছে। তার সঙ্গীটির মৃত্যুর কারণ বলে সে কুকুরের ঘ্রাণশক্তি দ্বারা রাসমণিকেই বুঝে নিয়েছিল। রাসমণির মৃত্যুর বহু পরে জোর করে রাসমণির ছিন্ন গলার নল থেকে তার দাঁত ছাড়াতে হয়েছে।

অন্যের গলার নলী ছেঁড়া যার ব্যবসা, সে অবশেষে কুকুরের কামড়ে নিজের গলা ছিঁড়ে প্রাণ দিল!

এবার আমার গল্প শেষ হয়ে গেছে। এবার তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোও।

রাসমণি আর নেই।

চুম্বক

বদ্রীবাবুর বাপ-মা মরা একমাত্র ভাইপো কম্বলের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার সংবাদ পেয়ে টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল ও প্যালারাম তাকে খুঁজে দেবার প্রস্তাব আনল।

জানা গেল এক নামকরা কুস্তিগীর মাস্টার রাখবার পরেই কম্বল নিরুদ্দেশ হয়েছে এবং বদ্রীবাবুর ধারণা সে চাঁদে গেছে। একটা কাগজে সে চাঁদের কথা লিখে রেখে গেছে।—

চাঁদ, চাঁদনি চক্রধর। চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর।
নিরাকার মোষের দল। ছলাছল খালের জল।
ত্রিভুবন থর থর চাঁদে চড়্—চাঁদে চড়্।

ক্যাবলা বলল যে ঐ কথাগুলোর নিশ্চয় একটা মানে আছে!

ক্যাবলার কথায় চারজনে চাঁদনির বাজারে গিয়ে সামনেই দেখে একটি ছোট সাইনবোর্ড—বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা:—'শ্রীচক্রধর সামন্ত। মৎস ধরিবার সর্বপ্রকার সরঞ্জাম বিক্রেতা। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।'

বানান ভুল উপেক্ষা করে তারা চারজনে হাঁ করে সাইনবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল!

॥ ৪ ॥

সাইনবোর্ডে যতই বানান ভুল থাক, মানে 'মৎস'-ই লিখুক আর 'পরিক্ষা'ই চালিয়ে দিক্, আসল ব্যাপার হল : এটা চাঁদনির বাজার আর চক্রধর সামন্তের দোকান একেবারে সামনেই রয়েছে। অর্থাৎ কবিতাটার প্রথম দু লাইনের এখানেই পাওয়া যাচ্ছে যে।

হাবুল বললে, 'টেনিদা, অখন কী করন যাইবো?'

ক্যাব্লা বললে, 'করবার কাজ তো একটাই রয়েছে। অর্থাৎ এখন সোজা ওখানে গিয়ে চক্রধর সামন্তের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'দেখা করে কী বলবি?'

টেনিদা পেছন থেকে আমার মাথায় টুক করে একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলে : 'চক্রধর সামন্তকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে লুচি-পোলাও খাইয়ে দিবি। দেখা করে কী আবার বলব? পরিষ্কার জানতে চাইব, এই কবিতাটির মানে কী, আর শ্রীমান কম্বল কোথায় আছেন।'

ক্যাব্লা ছুটে গিয়ে বললে, 'হুঁ, তাহলেই সব কাজ চমৎকার ভাবে পণ্ড হতে পারবে। কম্বলকে যদি এরাই কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকে, সঙ্গে সঙ্গেই হুঁসিয়ার হয়ে যাবে। হয়তো কম্বলকে আমরা আর কোনোদিন খুঁজেই বের করতে পারব না।'

হাবুল বললে, 'না পাইলেই বা কী হইবো। সেই পোলাখান না? সে হইল গিয়া এক নম্বরের বিচ্ছু। তারে ধইরা যদি কেউ চান্দে চালান কইর‍্যা দেয়, দুই দিনে চান্দের গলা দিয়াও কান্দন বাইরাইবো!'

টেনিদা ধমকে বললে, 'তুই থাম্। কম্বল যত অখাদ্য ছেলেই হোক, তার কাকার কাছে আমরা তাকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য, মানে ডিউটি-বাউণ্ড। তারপর বদ্রীবাবু পিটিয়ে কম্বলের ধুলো ওড়ান কি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েই পড়ুন, সে তিনিই বুঝবেন। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ বকবক করব আমরা? কিছু একটা করতে তো হবে।'

ক্যাব্লা বললে, 'আলবৎ করতে হবে। চলো, আমবা মাছধরার ছিপ-সুতো এই সব খোঁজ করিগে।'

আমি চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে প্রতিবাদ করে বললুম, 'আমি কিন্তু ছিপ সুতো নিয়ে বাড়ি যাব না। মেজদা তাহলে আমার কান কেটে নেবে।'

'তোর কান কেটে নেওয়াই উচিত'—চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে কটকটিয়ে তাকালো ক্যাবলা : 'আরে বোকারাম, ছিপ-সুতো কিনছে কে? আমরা এটা-ওটা বলে হালচাল বুঝে নেব।'

টেনিদা খুব মুরব্বির মতো বললে, 'প্যালা আর হাব্লাকে নিয়েই মুশ্কিল। এ দুটোর তো মাথা নয়—যেন এক জোড়া খাজা-কাঁটাল। কী বলতে কী বলবে আর সব মাটি হয়ে যাবে। শোন্, তোরা দুজন একেবারে চুপ করে থাকবি, বুঝেছিস? যা বলবার আমরাই বলব—মানে আমি আর ক্যাবলা। মনে থাকবে?'

আমরা গোঁজ হয়ে ঘাড় নাড়লুম। মনে থাকবে বই কি। এদিকে কিন্তু ভীষণ রাগ হচ্ছিল টেনিদার ওপর। বলতে ইচ্ছা করছিল, আমাদের মাথা নয় খাঁজা কাটাল, আর তোমার? পণ্ডিত মশাই বলতেন না, 'বৎস টেনিরাম, ওরফে ভজহরি, জগদীশ্বর কি তোমার স্কন্ধের উপর মস্তকের বদলে একটি গোময়ের হাঁড়ি বসাইয়া দিয়াছেন?' রাগ হলেই তাঁর মুখ দিয়ে সাধুভাষা বেরিয়ে আসত।

সে যাই হোক, আমরা তো চক্রধর সামন্তের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখানে আঠারো-উনিশ বছরের একটা ছেলে খাকী হ্যাফপ্যান্ট্ আর হাত-কাটা গেঞ্জী পরে, একটা শালপাতার ঠোঙা থেকে তেলে ভাজা খাচ্ছিল।

আমাদের দেখেই বেগুনী চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করলে, 'কী চাই?'

ক্যাবলা বললে, 'আমরা ছিপ কিনব।'

'ওই তো রয়েছে, পছন্দ করুন না'—বলে সে এবার একটা আলুর চপে কামড় বসালো। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ছিপ বিক্রী করার চাইতে তেলে ভাজাতেই মনোযোগ তার বেশি।

'আপনিই বুঝি চক্রধরবাবু?'—টেনিদা ভারী নরম-নরম গলায় ভাব করবার মতো করে জানতে চাইল।

'আমি চক্রধরবাবু হতে যাব কেন?'—আলুর চপের ভেতরে একটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলে বিচ্ছিরি মুখ করল ছেলেটা।

'তিনি তো আমার মামা।'

ক্যাব্লা বললে, 'ঠিক-ঠিক। তাই চক্রধর বাবুর মুখের সঙ্গে আপনার মুখের মিল আছে! ভাগ্নে বলেই।'

ভাগ্নে এবার চটে উঠল, শুনে আলুর চপের মতোই ঘোরালো হয়ে উঠল তার মুখ। খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে বললে, 'কী—কার মুখের সঙ্গে মিল আছে বললেন? চক্রধরের? সে সাত পুরুষে আমার মামা হতে যাবে কেন? গাঁয়ের লোকে তাকে মামা বলে—আমিও বলি। আমার মুখ তার মতো ভীমরুলের চাকের মতো? আমার কপালে তার মতো আঁব আছে? আমার রং তার মতো কটকটে কালো? আমার নাকের তলায় একটা ঝোল্লা গোঁফ দেখতে পাচ্ছেন?'

ক্যাব্লার মতো চট্পটে ছেলেও কি রকম ঘাবড়ে গেল এবার। বার দুই বিষম খেলো।

'মানে—এই ইয়ে—'

'ইয়ে-টিয়ে নেই। ছিপ কিনতে এসেছেন কিনুন, নইলে ঝাঁ করে সরে পড়ুন এখান থেকে। খামোকা যা তা বলে মেজাজ খারাপ করে দেবেন না স্যার!'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই।'—টেনিদা মাথা নাড়ল: 'ওর কথা ছেড়ে দিন মশাই, ওটা কী বলে ইয়ে—মানে নেহাৎ নাবালক। আপনার মুখখানা—মানে—ঠিক চাঁদের মতো—অর্থাৎ কিনা চন্দ্রকান্ত বাবুও বলা যায় আপনাকে।

'আমার নাম হলধর জানা।'—বলেই সে হঠাৎ কি রকম চমকে উঠল: 'কী নাম বললেন?

চন্দ্রকান্ত ?'

টেনিদা ফস করে বলে বসল : 'নিশ্চয় চন্দ্রকান্ত। এমন কি আপনার টিকোলো নাক দেখে নাকেশ্বর বলতেও ইচ্ছে করছে।'

'কী বললেন ? নাকেশ্বর ? চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর ?'—হলধর জানা তেলে ভাজার ঠোঙাটা মুড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ঃ 'আপনারা যান। ছিপ বিক্রী হবে না। দোকান বন্ধ।'

ক্যাব্‌লা বললে, 'দোকান বন্ধ !'

'হাঁ, বন্ধ।'—হলধর কি রকম বিড়বিড় করতে লাগল : 'আজকে বিষুদ্‌বার না ? বিষুদ্‌বারে আমাদের দোকান বন্ধ থাকে।'

'মোটেই না, আজকে মঙ্গলবার'—আমি প্রতিবাদ করলুম

'হোক মঙ্গলবার'—হলধার কাঁচা উচ্ছে চিবুনোর মতো মুখ করে বললে, 'আমরা মঙ্গলবারেও দোকান বন্ধ করে রাখি।'—বলেই সে ঘটাং ঘটাং করে আমাদের নাকের সামনেই ঝাঁপ বন্ধ করে দিলে। তারপর একটা ফুটোর ভেতর দিয়ে নাক বের করে বললে, 'অন্য দোকানে গিয়ে ছিপ কিনুন, এখানে সুবিধে হবে না।'

ব্যাস, হলধরের সঙ্গে আলাপ এখানেই খতম। হলধর জানাকে আর জানা হল না—তার আগেই ঝাঁপের আড়ালে সে ভ্যানিস্‌ড্।

সে তো ভ্যানিস্‌ড—কিন্তু আমাদের মাথার ভেতরে একেবারে চক্কর লাগিয়ে দিলে যাকে বলে। পচা চীনে বাদাম চিবুলে যে-রকম লাগে, ঠিক সেই রকম বোকা-বোকা হয়ে আমরা এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

টেনিদা মাথা চুলকে বললে, 'ক্যাবলা—এবার ?'

ক্যাব্‌লা বললে, 'হুঁ। এখন চলো, কোথাও গিয়ে একটু চা খাই। সেখানে বসে প্ল্যান ঠিক করা যাবে।'

কাছেই চায়ের দোকান ছিল একটা, নিরিবিলি কেবিনও পাওয়া গেল। ক্যাব্‌লাই চা আর কেক আনতে বলে দিলে। এ-সব ব্যাপারে চিরকাল পয়সা-টয়সা ও-ই দেয়, আমাদের ভাববার কিছু ছিল না।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, 'ব্যাপারটা খুব মেফিস্টোফিলিস বলে মনে হচ্ছে। মানে সংঘাতিক। এত সাংঘাতিক যে পুঁদিচ্চেরীও বলা যেতে পারে।'

হাবুল এতক্ষণ পরে মুখ খুলল : 'হ, সৈত্য কইছ।'

'চন্দ্রকান্ত আর নাকেশ্বর শুনেই হলধর কি রকম লাফিয়ে উঠল দেখেছ ?'—আমি বললুম, 'তা হলে ছড়াটার দ্বিতীয় লাইনেরও একটা মানে আছে।'

'সব কিছুরই মানে আছে—বেশ গভীর মানে।'—ক্যাব্‌লা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'এখন তো দেখছি ছড়াটার মানে বুঝতে পারলেই কম্বলেরও হদিশ পাওয়া যাবে।'

টেনিদা এক কামড়েই নিজের কেকটাকে প্রায় শেষ করে ফেলল। আমিও চট্ করে আমার আধখানা মুখে পুরে দিলুম, পাছে ও পাশ থেকে আমার প্লেটেও হাত বাড়ায়। টেনিদা আড় চো সেটা দেখল, তারপর ব্যাজার হয়ে বললে, 'কিন্তু পটলডাঙার কম্বল কী করে যে চাঁদনির বাজারে এ আর চক্রধরের সঙ্গে জুটলই বা কিভাবে, সেইটেই বোঝা যাচ্ছে না।'

'সেটা বুঝলে তো সবই বোঝা যেত।'—ক্যাবলা ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল 'ভেবেছিলুম, কম্বলের পালানোটা কিছুই নয়—এখন দেখছি বদ্রীবাবুই ঠিক বলেছিলেন। কম্বল চাঁ হয়তো যায়নি, কিন্তু যে রহস্যময় চাঁদোয়ার তলায় সে ঘাপটি মেরে বসে আছে সে-ও খুব সোজা জায় নয়। ওয়েল, টেনিদা।'

'ইয়েস ক্যাবলা।'

'চলো, আমরা চারজনে চারিদিক থেকে চক্রধরের দোকানের ওপর নজর রাখি। আমাদে তাড়াবার জন্যেই হলধর দোকান বন্ধ করছিল, আবার নিশ্চয় ঝাঁপ খুলবে। দেখতে হবে ঝোল্ গোঁফ আর কপালে আঁব নিয়ে কট্‌কটে কালো চক্রধর আসে কিনা কিংবা লম্বা নাক নিয়ে চন্দ্রকা দেখা দেয় কিনা। কিন্তু টেক কেয়ার—সব্বাইকেই একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে—হলধ যাতে কাউকে দেখতে না পায়।'

'ছল ছল খালের জল'—

আমরা সবাই রাজী হয়ে গেলুম।

ক্যাবলা পরীক্ষায় স্কলারশিপ পাওয়াতে ওর বাবা ওকে একটা হাত ঘড়ি কি দিয়েছিলেন। সেটার দিকে তাকিয়ে ক্যাবল বললে, 'এখন সাড়ে চারটে। পড়াশুনো সময় নষ্ট না করেও আমরা আরো দে ঘণ্টা থাকতে পারি এখানে। কে জানে হয়তো আজকেই কোনো একটা ক্লু পে যেতে পারি কম্বলের। ফ্রেণ্ডস্—নাউ টু অ্যাকশ্যন—এবার কাজে লাগা যেতে পারে।'

চাঁদনির বাজারে এদিক-ওদিক লুকিয়ে থাকা কিছু শক্ত কাজ নয়। আমরাও পাকা গোয়েন্দার মতো চারদিকে চারটে জায়গা বেছে নিয়ে চক্রধরের দোকানের দিকে ঠায় চেয়ে রইলুম। টেনিদা আর ক্যাব্‌লাকে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ঠিক আমার মুখোমুখি একটা লোহার দোকানের আড়াল থেকে

মাঝে মাঝে কচ্ছপের মতো গলা বের করছিল হাবুল।

দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি, চক্রধরের দোকানের ঝাঁপ আর খোলে না। চোখ টনটন করতে লাগল, পা ব্যথা হয়ে গেল। এমন সময়, হঠাৎ—পেছন থেকে আমার কাঁধে কে যেন টুক টুক করে দুটো টোকা মারল।

চমকে তাকিয়েই দেখি, ছিটের শার্ট গায়ে, ঢ্যাঙা তালগাছের মতো চেহারা, নাকের নিচে মাছিমার্কা গোঁফ, বেশ ওস্তাদ চেহারার লোক একজন। মিটমিট করে হেসে বললে, 'ছল ছল খালের জল'—তাই না?'

আমি এত অবাক হয়ে গেলুম যে মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না।

লোকটা বলল, 'তা হলে হলধরকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করা কেন? কাল বেলা তিনটের সময় তেরো নম্বর শেয়ালপুকুর রোডে গেলেই তো হয়।'

বলে আমার পিঠে টকটক ক'রে আবার গোটা দুই টোকা দিয়ে, টুক করে কোনদিকে সরে পড়ল যেন।

—ক্রমশঃ

সব্‌বোনাশ !

আশাপূর্ণা দেবী

গাড়ির শব্দে বারান্দা থেকে পাতিহাঁসের মত গলাটা বাড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দেখে নিয়েই পিঙ্কি চীৎকার করে উঠল, 'ওমা ; পাঁউরুটি মাসি !!'

আহ্লাদে পিঙ্কির চুলগুলো সোনালী আর মুখটা রূপোলী হয়ে উঠল। আর এমন হুদ্দাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল যে, নেমেই ধাক্কা নানকুর সঙ্গে। নানকুও উঠছিল কিনা হুড়মুড়িয়ে।

অন্যদিন হলে অবশ্য এই ধাক্কার ফলে খুনোখুনি হয়ে যেত, কিন্তু আজ নানকু সে দিকে গেল না, চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'পিঙ্কি সব্‌বোনাশ ! পাঁউরুটি মাসি !'

পাঁউরুটি মাসি ওদের প্রাণের দেবী, ছুটি ছাটায় যখনই কলকাতায় চলে আসে পাঁউরুটি মাসি, পিঙ্কি নানকু আহ্লাদের সাগরে ভাসে।

কারণ ?

কারণ ফুলো ফুলো গোলগাল পাঁউরুটি মাসির গুণের যে তুলনা নেই ! পাঁউরুটি মাসি গান গায় সুন্দর, কথা বলে মিষ্টি, গল্প বলে অপূর্ব ! আর সর্বদাই যেন হাসি খুশির খনি।

তা ছাড়া পাঁউরুটি মাসি এলে—মা ?

মা তো একেবারে অন্য মানুষ !

সারা বছরে আর কবে মা এমন আহ্লাদের পাহাড়, আর উদারতার অবতার হয়ে ওঠেন ?

পাঁউরুটি মাসি থাকাকালীন অবস্থায় কত কীই না বাগিয়ে নেওয়া যায় ! যা চাও,—মা শ্রেফ কল্পতরু ! হাসবেন আর বলবেন, 'দেখছিস তো পাঁউরুটি, কি রকম চাঁদচাওয়া আবদার আমার ছেলেমেয়ের !···ধরেছ যখন তোমরা ছাড়বে না জানি। এই নাও টাকা।'

অথচ অন্য সময় ?

অন্য সময় রেগে রেগে বলবেন, 'চাঁদচাওয়া আবদার, ছেলেমেয়ের ! টাকা যেন গাছে ফলে !'

মানে ?

মানে হচ্ছে, মা, অর্থাৎ পাঁউরুটি মাসির রাঙাদি, চান তাঁদের দুই মাসতুতো বোনের অনর্গল গল্পের মধ্যে কোনো ব্যাঘাত এসে না নাক গলায় ! অতএব পিঙ্কি নানকু জিনিস চাইলে জিনিস, পড়ায় ছুটি চাইলে ছুটি, যা খুশি করতে চাইলে যা খুশির অনুমতি।

এই পাঁউরুটি মাসির আবির্ভাবে 'সব্‌বোনাশ !'

পিঙ্কির সোনালী-হয়ে-ওঠা চুল কালো হয়ে গেল, সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠল। পিঙ্কি দাঁড়িয়ে পড়ে চোখ পাকিয়ে বললো, 'সব্‌বোনাশ মানে কী রে দাদা ?'

'সব্বোনাশ মানে সব্বোনাশ ! মানে আজই এক্ষুণি পটকাকাকু আসছে !'

সিঁড়িতে বসে পড়ে পিঙ্কিও বলল, 'সব্বোনাশ !'

পটকাকাকুও ওদের প্রাণের ঠাকুর, তার সরু লম্বা খটখটে হাড়ে হাজার ভেল্কি ! পটকা-কাকু ঘড়ি গুঁড়িয়ে আস্ত করা, নোট উড়িয়ে ঘুড়িধরা, ইত্যাদি করে একশো রকম ম্যাজিক জানে, পটকাকাকু পঞ্চাশ প্রাণীর ডাক ডাকতে পারে, আর স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন ভুবনের খবর নির্ভুল বলতে পারে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেরও পারে।

তাছাড়া পটকাকাকু এলেই তো বাবা করুণাপারাবার, মহত্তের অবতার !

নিজে ডেকে ডেকে বলবেন, 'পিঙ্কি নানকু তোমরা আজ কোন দিকে বেড়াতে যেতে চাও বল। আমি গাড়ি রেখে যাচ্ছি। আচ্ছা পটকাকেই বোলো তার যেদিকে ইচ্ছে ! পেট্রলের টাকা রেখে গেলাম রে পটকা, বেশ পেটঠেশে তেল ভরে নিবি।'

এই পেটঠাশার ব্যাপারের লক্ষ্যটা যে বাবার পিসতুতো ভাই পটকা, পিঙ্কি নানকু উপলক্ষ্য মাত্র, তা' কি আর বোঝে না ওরা ? কিন্তু বুঝে ক্ষতি কি ? ওদের ত হু হু করা বাতাস চোখে মুখে লাগিয়ে মাইলের পর মাইল গাড়ি চড়ার সুখটা জোটে।

আবার নিজেও পটকাকাকু কম নাকি ?

পটকা কাকু মানেই সার্কাস, সিনেমা, খেলাদেখা, ইত্যাদি করে রাজ্যির আমোদ।

আর পটকা কাকুর অনারে রান্নাঘরে রোজ উৎসব।

অথচ পিঙ্কি বলল, 'পটকা কাকু ? সব্বোনাশ !'

মানে কি ?

মানে তা'হলে খুলেই বলতে হয়। মানে হচ্ছে পাঁউরুটি মাসি যেমন মার প্রাণের পুতুল, পটকা কাকু তেমনি বাবার প্রাণের মাণিক ! কাজেই পাঁউরুটি মাসি এলে মার মনে হয় তেমন যত্ন হচ্ছে না, বাবা মোটেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। আর পটকা কাকু এলেই বাবার মনে হয় তেমন যত্ন হচ্ছে না, মা মোটেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

অতএব ?

অতএব ওঁদের কেউ একজন এলেই বাবাতে আর মাতে রোজ ধুন্ধুমার বাধে।

পাঁউরুটি মাসি এক মাস থাকলে বাবা যদি ঊনত্রিশ দিন গাড়ি দান করেও একটা দিন বিশেষ কাজে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান, মা আক্ষেপ করে বলেন, 'এবারে আর পাঁউরুটিকে নিয়েই বেড়ানোই হল না ! অথচ কত জায়গায় নিয়ে যাব ভেবেছিলাম—'

আর পটকা কাকু দু' মাস থাকলে মা যদি উনষাট দিন 'ভোজপর্ব' চালিয়ে একটা দিনও শুধু সাদাসিধে ডাল ভাত রাঁধেন, বাবা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, 'এবারে আর পটকাকে তেমন জুৎ করে খাওয়ান দাওয়ানো হল না ! অথচ পটকা খেতে টেতে ভালবাসে—'

কথাটা অবিশ্যি সত্যি।

পিঙ্কি নানকু জানে সে কথা। বরং আড়ালে তারা অবাক হয়ে গবেষণা করে—পটকা কাকুর ওই সরু লম্বা দেহটার মধ্যে এত খাবার-দাবার ঢোকে কোথায়, আশ্রয় নেয় কোথায়! কুড়িটা লুচি, বারোটা ফ্রাই, ষোলটা চপ্, একসের মাংস, গোটা আষ্টেক রাজভোগ, বড় একবাটি পায়েস এক সঙ্গে পেটের মধ্যে চালান করে দিয়েও, পটকা কাকু যখন দাঁড়িয়ে ওঠে, দেখতে পাওয়া যাবে যেখানকার পেট সেখানে!

সেই পেটে পিঠে এক, হাড় আর চামড়া।

এত মাল যায় কোথায়?

ভেবেছে ওরা অনেক দিন। সারা গায়ে ছড়িয়ে গেলেও তো গায়ে একটু মাংস লাগবে?

পিঙ্কির বাবাও সেই কথাই বলেন, 'যত্ন আত্তি পেলে তো গায়ে একটু মাংস লাগতো! বারো-মাস মেসে পড়ে থাকে। যত্ন পায় না! নিজের বোনটি যখন আসে, তখন তো বেশ তিনদিনেই পাঁউরুটিকে ফুলিয়ে তুলোর গাঁট্ করে তুলতে পারে।'

ব্যস!

বুঝতেই পারছো?

আর মার রাগ হবারই কথা। পাঁউরুটি মাসি কোনোদিন তিনটের বেশি লুচি খেতে পারেন না, আধখানা ছাড়া একখানা চপ্ খায় না, আর মিষ্টি? সে তো দেখলেই চোখ বোজে!

তবে বাবা বিশ্বাস করেন না। বাবা বলেন, 'হুঁঃ! হলেই হল! তা'হলে বলতে হবে গ্যাস-বেলুনের মত বাতাস পাম্প করা হয় ওকে!'

কাজেই—নারদ! নারদ!

কিন্তু সে তো এক একজনের জন্যে।

এক সঙ্গে দুজন হলে?

এক সঙ্গে দু'জন হলে যে কী হবে, বা হতে পারে, অথবা হওয়া সম্ভব, তা আন্দাজ করতে না পেরে ওরা দু'জনেই বলে, 'সব্বোনাশ!'

তারপর অবশ্য ছুটে বাইরে বেরিয়ে যায় দুজনেই, কারণ আর একটা গাড়ির শব্দ হয়ে গেছে ততক্ষণে।

বাবা চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ি ঢোকেন, এই শুনছো, পটকু এসেছে! ইস, কতদিন পরে যে এলি পটকু!

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন 'ও মা পাঁউরুটি তুই? ওরে বাবারে কী মজারে! উঃ কত দিন যে দেখিনি তোকে পাঁউরুটি!'

পাঁউরুটি মাসি আর পটকাকাকু দু'জনেই একসঙ্গে মাকে আর বাবাকে প্রণাম করেন, কিন্তু ততক্ষণে তো শুরু হয়ে গেছে ধুন্ধুমার!

'পাঁউরুটির দিকে তুমি তাকালে না যে বড়?'

মা বললেন রেগে রেগে।

বাবাও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, তুমিও পটকার দিকেও তাকাওনি !'

'ও বেচারী বারোমাস হোস্টেলে পড়ে থাকে। এতদিন পরে দিদির কাছে এল, ওর দিকে আগে তাকাব না ?'

'ও বেচারাও বারোমাস মেসে পড়ে থাকে, এতদিন পরে দাদার কাছে এল, ওর দিকে আগে তাকাব না ?'

'সারাক্ষণ তো তুমি এখন ভাইকে নিয়েই মত্ত থাকবে, আমার বোনটার যত্ন হচ্ছে কিনা, বেড়াতে পাচ্ছে কিনা, সিনেমা দেখল কিনা, এসব খোঁজই করবে না !'

'তুমিও সারাক্ষণ বোন নিয়ে মত্ত থাকবে, আমার ভাইটা খেতে পেল কিনা, শুতে পেল কিনা, তার জামা কাপড় শুকোলো কিনা খোঁজই করবে না !'

'তা মত্ত থাকবো না ? জানো পাঁউরুটি আমার থেকে দশ বছরের ছোট ছোট্টবোনটি !'

'তা মত্ত থাকবার রাইট আছে, পটকাও আমার থেকে বারো বছরের ছোট ছোট্ট ভাইটি !'

'আহা !' 'আহা ! কত যে আদরের ও আমার !'

দু'জনেই নিশ্বাস ফেললেন।

সেই অবসরে পটকা কাকু বলে উঠলো, 'সুটকেশটা কোথায় রাখবো বৌদি ?'

আর পাঁউরুটি মাসি বলে উঠল, ট্যাক্সিড্রাইভার কত নিল জামাইবাবু ?'

পিঙ্কিদের মা এবার ষাট্ ষাট করে ছুটে এলেন, 'ওমা তুমি নিজে সুটকেশটা বইছো পটকা ঠাকুরপো ! ছি ছি, রাখো রাখো ওইখানেই রাখো !'

নানকুদের বাবা বলে উঠলেন, 'আহা আহা তোকে আর ট্যাক্সিভাড়া নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না পাঁউরুটি, থাম ! চুপ কর !'

তখনকার মত অবশ্য কিঞ্চিৎ সন্ধি হল। কারণ মা ওদের জন্যে চা জলখাবার আনতে গেলেন, আর বাবা ওদের জন্যে চাকরকে বকাবকি করতে গেলেন।

কিন্তু সে আর কতটুকু ?

সন্ধি তো এক্ষুণি বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, জানা কথা !

নানকু আর পিঙ্কির দিকে এতক্ষণে তাকালো পাঁউরুটি মাসি ! হেসে ফেলে বললো, 'জামাইবাবু কী ঝগড়াটে !''

পটকাকাকুও এতক্ষণ পরে তাকালো ওদের দিকে হেসে বললো, 'বৌদি কী রাগী !'

তারপর নিজেরা তাকিয়ে বললো, 'আমাদের নিয়ে তাহলে এখন নারদ নারদ চলবে কি বল ?'

তা চললোই।

উঠতে বসতে খেতে বেড়াতে বাবা বলছেন, 'পটকার কথা তুমি ভাবছই না !' আর মা বলছেন, 'পাঁউরুটির কথা তুমি মনের কোণেও আনছোনা !'

বাবা যদি গাড়ি রেখে যান, মা বলেন নির্ঘাৎ ভাইয়ের জন্যে রেখে গেছেন, তোমাদের আর কাজ নেই পাঁউরুটি !'

যদি গাড়ি নিয়ে যান, মা বলে বেড়ান, 'নির্ঘাৎ পাঁউরুটির জন্যে ! পাছে আমি ওকে নিয়ে বেড়াতে যাই !'

মা যেদিন রান্না ঘরে ভাল ভাল সব আইটেম করেন, বাবা তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে ব 'বুঝতে পেরেছি নিজের বোনের জন্যে ! তা নইলে এত ভাল মন্দর ব্যবস্থা !'

যেদিন একটু ঝাড়া ঝাপটা রাঁধান, বাবা ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলেন, 'বুঝতে বাকি নেই, আ ভাইয়ের জন্যে ! পাছে সে একটু খায় দায়—'

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনে ক্ষমা চেয়ে নেন 'পটকা ঠাকুরপো, তুমি কিছু মনে কোরনা ভাই, তো দাদার একচোখোমির দোষেই মন্দ হচ্ছি আমি !'

'পাউরুটি ভাই তুই কিছু মনে করিস না, তোর দিদির একচোখোমির দোষেই অভদ্র হতে হ আমায় ।'

.ব্যস্ আবার লেগে গেল 'তুলোরাম খেলারাম !'

কিন্তু এদিকে পিঙ্কি আর নানকুর এবারের পুজোর ছুটিটাই গুবলেট ! ওরা না পাচ্ছে পটকাকা কাছে পড়ে থাকতে, না পাচ্ছে পাঁউরুটি মাসির কাছেই বসে থাকতে ।

পাঁউরুটি মাসির স্কুলের ছাত্রীরা যে কী বেদম রামবোকা, এ গল্পতো কোনোই হল না এবা আর পটকাকাকুর কলেজের ছাত্ররা যে কী সাংঘাতিক বিচ্ছু চালাক, সে গল্পও থলে চাপা ।

এদিকে পাঁউরুটি মাসি ডেকে ডেকে বলে, 'এবার আর তোরা গল্প শুনতে আসিস না কেন পিঙ্কি নানকু ? কাকা এসেছে বলে বুঝি সাপের পা দেখেছিস ? মাসিকে আর চিনতেই পারছিস না ?'

অতএব এসে বসে পড়তে হয় ওদের । পটকাকাকু যে নতুন ম্যাজিক দেখাবে বলেছিল, যাও হয় না সেদিকে ।

ওদিকে পটকাকাকু ডেকে ডেকে বলে 'এবার বুঝি মাসিকে পেয়ে দিনে তারা দেখেছিস তোরা ? কাকুকে আর চিনতেই পাচ্ছিস না !'

কাজে কাজেই এসে বসে পড়তে হয় ওদের ।

অথচ ম্যাজিকে মন বসে না । ওদিকে ভূতের গল্প পড়ে আছে । কাজেই কেবলই মনে হয় কী যেন হারাচ্ছি, কী যেন হারাচ্ছি !

পাঁউরুটি মাসি বলে 'তোমার ছেলে মেয়ে এবার বদলে গেছে রাঙাদি ! সে জেল্লা নেই, সে হাসি নেই ।'

পটকাকাকু বলে 'তোমার ছেলে মেয়ে এবার বদলে গেছে নতুনদা, সে উৎসাহ নেই, সে স্ফুর্তি নেই ।'

পিঙ্কি আর নানকু মনের দুঃখে মনে মনে বলে, 'তোমরাই করেছ এটি । তোমরাই ঘুচিয়েছ

মামাদের জেল্লা, হাসি, স্ফূর্তি, উৎসাহ! না বলে কয়ে একই ছুটিতে দু'জনে এসে ইহকাল পরকাল খেয়েছ মামাদের!

'এর একটা প্রতিকার করতে হবে।' বলল পিঙ্কি।

নানকু হতাশ গলায় বলল, 'এবারে আর উপায় কোথা? ছুটিতো শেষ হয়ে এল! দু'জনকেই এবার 'মা সত্যপীরের দিব্যি দিয়ে পায়ে ধরতে হবে, যেন আর বিনে নোটিশে দু'জনে একদিনে এসে হাজির হয় না!'

পিঙ্কি আরো হতাশ গলায় বলে, 'সেতো পরে! এবারে আর তাহলে কোনো আশাই নেই?'

'না!'

'বেশ চল তবে বলিগে। পটকাকাকু যদি পুজোর ছুটিতে, তো পাঁউরুটি মাসি গরমের ছুটিতে আর পাঁউরুটি মাসি যদি পুজোর ছুটিতে তো পটকাকাকু গরমের ছুটিতে! তিনসত্যি করিয়ে নিইগে।'

হঠাৎ চমকে ওঠে নানকু, 'তা হলে তো এটাও করা যেত রে পিঙ্কি, দুপুরে যদি পাঁউরুটি মাসির গল্প, তো সন্ধ্যেয় পটকাকাকুর, আর পঠকাকাকুর যদি—'

'আহা ভারী তো বললি, পিঙ্কি ঝামরে ওঠে 'দুজনকেই যে আমাদের সকাল সন্ধ্যে দুপুর সর্বদা পেতে ইচ্ছে করে!'

'তা হলে?'

'তা হলে একটা কাজ করলে হয়—'

কি হয় তা আর শোনা হল না নানকুর।

শুনতে পেল শুরু হয়ে গেছে ওদিকে নারদ নারদ।

মা বলছেন, 'তুমিই বল পটকা ঠাকুরপো, তোমাকে আমি অগ্রাহ্য করছি? অবহেলা করছি? সুখ সুবিধে দেখছিনা?'

বাবা বলছেন, 'তুইই একবার বল পাঁউরুটি, আমি তোকে অগ্রাহ্য করি, অবহেলা করি? কষ্ট—অকষ্ট দেখিনা।'

কে কি বলত কে জানে, মা বলে উঠলেন, 'আগে পটকা ঠাকুরপো বলবে!'

বাবা বলে উঠলেন, 'আগে পাঁউরুটি বলবে।'

'না! আগে পটকা ঠাকুরপো—'

'না, আগে পাঁউরুটি—'

'কক্ষনো না! আগে ঠাকুরপো—'

'আলবাৎ না, আগে পাঁউরুটি—'

'আগে পট—'

'আগে পাঁউ—'

'ভাল হবে না বাপু—'

'ভাল হবে না বলছি—'

হঠাৎ পাঁউরুটি মাসি আর পটকা কাকু দু'জনেই ওঁদের রাঙাদি আর নতুনদা, বৌদি আর জামাই বাবুর গলার ওপরে গলা চড়িয়ে উদাত্ত স্বরে বলে ওঠেন, 'নতুনদা, তোমাদের এই ঝগড়া কস্মিনকালেও থামবে বলে মনে হয় না। তার কারণ ঝগড়াতেই তোমাদের আহ্লাদ, ঝগড়াতেই তোমাদের ক্ষিধে বৃদ্ধি। কিন্তু যেহেতু আমরা দু'জনই এই ঝগড়ার উপলক্ষ্য তখন তোমরা যতই আমাদের লজ্জিত হতে বারণ করো, হবোই লজ্জিত! হচ্ছিও। অতএব—'

পাঁউরুটি মাসির মিহি গলা আর এককাঠি চড়লো, 'অতএব আমরাই এটা মিটিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করবো ঠিক করেছি। আর বেশি দেরীও করবো না। সামনের এই পূর্ণিমাতেই—'

পিঙ্কি চুপিচুপি বলে, 'পূর্ণিমার দিন ঝগড়া থামলে, আর কখনো বুঝি ঝগড়া হয় না দাদা?'

'নিশ্চয়! তাও জানিসনে বোকা?' নানকু ও চুপিচুপি বলে, 'পূর্ণিমা মানে তো পুরোপুরি? তার মানেই পুরোপুরি মিটে যাবে!'

কিন্তু পিঙ্কির বাবাও পিঙ্কির মতই বোকাটে গলায় বলে ওঠেন 'ঝগড়া থামানোর জন্যে আবার দিনস্থির করতে হয়? তা তো জানিনা। পূর্ণিমার দিন বুঝি—'

'হ্যাঁ শুভদিন—' পটকা কাকু লজ্জা লজ্জা গলায় বলে ওঠে, ওই দিনটাই আমরা বিয়ের জন্যে ঠিক করেছি!'

মা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বিয়ের ঠিক করেছ? কার বিয়ের ঠিক করেছ?'

পাঁউরুটি মাসি আঁচলটা টেনে মুখ ঢাকে, আর পটকা কাকু রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলে, 'এই আমার আর পাঁউরুটির?'

'অ্যাঁ।'

'অ্যাঁ।'

'সত্যি।'

'সত্যি।'

'কি আর করা। এ ছাড়া তো তোমাদের ঝগড়া থামাবার উপায় দেখছি না—'

মা পটকা কাকুকে কথা শেষ করতে দেন না, বিষম উল্লাসে বলে ওঠেন, 'আমার বোনের বিয়েতে বেশি ঘটা করতে হবে তা 'বলে দিচ্ছি!'

বাবা প্রবল প্রতাপে বলে ওঠেন 'আমার ভাইয়ের বিয়েতে এক ইঞ্চি কম হবেনা তা বলে দিচ্ছি!'

'তোমার শাসন চলবে না—'

'তোমার আবদার কমাতে হবে—'

'সব মার্কেটিং আমি করবো—'

'তার মানে নিজের বোনের কোলে ঝোল টানবে—'

ওরা আর শোনে না!

ওরা এ ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে।

একই দুঃখে দুঃখী দুই ভাইবোন!

নানকু একসময় নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ও সব পূর্ণিমা ফুর্ণিমা বাজে! প্রেম চিরকাল চলবে!…তার মানে প্রতিকারের কোনো আশা নেই। তার মানে এর পর থেকে সব ছুটিই গুব্লেট! যখনি আসবে, দুজনে একই সঙ্গে আসবে।'…

'দাদা!'

পিঙ্কি ডুকরে উঠে বলে, 'তা হলে কী হবে?'

'হবে আবার কী! কিচ্ছু হবে না। সব্বোনাশের পর নতুন আর কিছু হয় নাকি!'
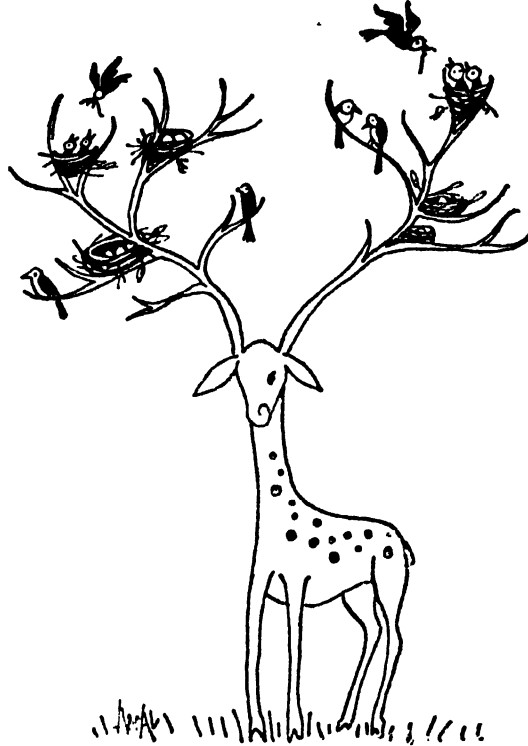
মুরারি মোহন বিট

(রূপকথা)

এক ধোপা ছিল। আর তার ছিল একটি ছেলে। ছেলেটির বয়স তখন বছর পনেরো। ছেলে ছাড়া ধোপার আপনার বলতে ত্রিসংসারে আর কেউ ছিল না। পরের কাপড়-চোপড় কেচে কোনও রকমে নিজের আর ছেলের ভরণ-পোষণ চালাত সে।

উঁহু, ধোপার একটি গাধা ছিল। গাধাটিকেও সে সন্তানের মতই লালন-পালন করত। কাজেই তার জন্যেও ধোপার কিছু অর্থব্যয় হত বৈকি!

দিন যায়—

একদিন ধোপার খুব কঠিন ব্যারাম হল। যা সামান্য কিছু পুঁজিপাটা ছিল, তাই দিয়েই ধোপার ছেলে বদ্যি ডেকে বাপের চিকিৎসা করাল। কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়—ধোপার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল।

ধোপা নিজেও বুঝল সে আর বাঁচবে না। তাই ছেলেকে কাছে ডেকে বলল,—বাবা, আমি তো আর বাঁচব না, তা—তোর জন্যে কিছু রেখেও যেতে পারলাম না···এই ঘরখানা রইল, আর গাধাটা রইল। এই বয়সে তুই তো কাপড়-চোপড় কাচতে পারবি নে—গাধাটার পিঠে করে পরের মোট বয়ে কিছু কিছু রোজগার করতে পারবি—তাতেই কোনরকমে চলে যাবে। আর গাধাটাকে যেন অযত্ন করিস্ নে বাবা—

এই বলে ধোপা তো মরে গেল, আর ধোপার ছেলে পড়ল ভীষণ ভাবনায়—ঘরে একটা কড়ি পর্যন্ত নেই! বাবার সৎকার করবেই বা কি করে? শেষ পর্যন্ত পরের দুয়ারে দুয়ারে অনেক ঘোরাঘুরি করে, অনেক খোসামোদ তোষামোদ করে কোনরকমে বাপের সৎকার সমাধা করল।

এরপর থেকে পেটের জ্বালায় প্রতিদিন গাধাটাকে সঙ্গে নিয়ে ধোপার ছেলে পথে পথে ঘুরতে লাগল। কপালে দু-একটা কাজও জুটতে লাগল। এখান থেকে সেখানে ভারী মোট নিয়ে

কপালে দু'একটা কাজও জুটতে লাগল।

যাওয়ার কাজ। যা সামান্য কিছু রুজি-রোজগার হতে লাগল, তাতে নিজে আধপেটা খেয়ে আর গাধাটাকে ভরপেটা খাইয়ে তার দিন কাটতে লাগল।

বাপের কথা তার মনে আছে, গাধার যেন অযত্ন না হয়। আর অযত্ন করবেই বা কেন? তার নিজেরও তো বিবেক-বুদ্ধি আছে! যার জন্যে তার অন্নের সংস্থান হচ্ছে, তার অযত্ন করলে কি চলে?

এমনি ভাবে দিন কাটতে কাটতে একদিন ধোপার ছেলে ভীষণ মুস্কিলে পড়ে গেল। সারাদিন ঘুরেও তার কিচ্ছু রোজগার হল না।

ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পড়েছিল নগরের বাইরের একটা বনের ধারে। ক্লান্ত দেহটাকে সে তখন আর টেনে নিয়ে যেতে পারছিল না। সেই বনের ধারেই সে বসে পড়ল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

আর রোজগারের কোন আশা-ভরসাও নেই। আজ নির্ঘাৎ উপবাসে কাটাতে হবে! নিজের জন্যে তো তার ভাবনা হচ্ছে না—গাধাটার কপালে এক মুঠো দানা জুটবে না, এই ভাবনাতেই ধোপার ছেলের চোখে জল এসে গেল।

রাতের কালো অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল, তখন হুঁস হল তার। ইস্, রাত হয়ে গেছে যে! বনের ধারে সে বসে রয়েছে একা—বাড়ি থেকে চলে এসেছে বহুদূর! এখন বাড়ি ফিরতে গেলেও

মাঝরাত হয়ে যাবে। তাছাড়া বাড়ি গিয়েই বা সে করবে কি? খাওয়া তো ভাগ্যে নেই, শুধু শুতে যাওয়া? সে তো যেখানে হয় একজায়গায় শুয়ে পড়লেই হল!

এই ভেবে ধোপার ছেলে উঠল।

খানিকদূর গিয়ে একটা বড় গৃহস্থবাড়ি পেয়ে তার বাইরের বারান্দায় শুয়ে পড়ল, আর গাধাটাকে সেই বারান্দায় একটা থামের সঙ্গে বেঁধে রাখল। শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে গাধাটার গায়ে হাত বুলিয়ে খুব আদর করল। গাধাটাও নানা ভাব-ভঙ্গি করে বোঝাল যে, সে আনন্দেই আছে—অনাহারে থাকার জন্য তার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

এক সময় ধোপার ছেলে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল, একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী তাকে বলছে, আমি তোর দুঃখু দূর করব। তুই যে বনের ধারে বসে ছিলি, সেই বনের মধ্যে একটা ভাঙা শিব মন্দির আছে। আজই রাত্রে ঐ মন্দিরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা কর।

ধোপার ছেলের ঘুম ভেঙে গেল। তখন অনেক রাত। চারদিকে অন্ধকারে ঘুটঘুট করছে। গাধাটাকে নিয়ে সে আবার বনের দিকে রওনা দিল।

বনের ধারে গিয়ে খুব ভয় ভয় করতে লাগল তার। বাপ্‌রে, কি ভীষণ বন রে বাবা! কি অন্ধকার! বনের মধ্যে কত যে জন্তু-জানোয়ার আছে, তাই-বা কে জানে! তা থাক্—ভাগ্যটাকে একবার যাচাই করেই দেখা যাক না কি হয়? এই ধরনের সাধু-সন্ন্যাসীদের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়! আর যদি জন্তু-জানোয়ারের হাতে প্রাণ যায়—তা যাক। এই তুচ্ছ প্রাণটা গেলেই বা ক্ষতি কি? উপোস করে থাকার চেয়ে বাঘের পেটে যাওয়া অনেক ভালো!

এইসব কথা ভেবে-চিন্তে সাহসে ভর করে সে বনের মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে তার একটা আলো পর্যন্ত নেই। তার ওপর খুব ঘন ঝোপ-জঙ্গল। বনের মধ্যে দিয়ে যেতে খুব কষ্ট হতে লাগল। তবু সে গাধাটাকে নিয়ে চলতে লাগল।

বনের মাঝামাঝি গিয়ে ধোপার ছেলে সত্যি-সত্যিই একটা পুরনো মন্দির দেখতে পেল। দেখে তার কি যে আনন্দ! ভাবলো, তবে কি তার স্বপ্ন সত্যি হবে? তবে কি তার দুঃখ দূর হবে? সে আরও দেখতে পেল, মন্দিরের মধ্যে মিটি মিটি প্রদীপের আলো জ্বলছে।

মন্দিরের ওপর গিয়ে উঠল। অমনি কা'র বাজখাঁই কণ্ঠস্বর শুনে তার পেটের পিলে চমকে উঠল। কে যে তাকে জিজ্ঞেস করল—কে রে তুই?

লোকটাকে দেখতে না পেয়ে ধোপার ছেলে খুব ঘাবড়ে গেল বটে, কিন্তু মনে সাহস এনে বলল,—আমি ধোপার ছেলে।

মন্দিরের ভেতর থেকে একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বেরিয়ে এসে তার দিকে কটমট করে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করল,—কি চাস্ তুই?

ধোপার ছেলে তো ভয়েই আড়ষ্ট! কী জবাব দেবে, তা সহসা ভেবে উঠতে পারল না। তার কপাল দিয়ে বিন্ বিন্ করে ঘাম বেরুতে লাগল। অনেক কষ্টে জবাব দিল—আমি ধোপার ছেলে, খুব

গরীব—সারাদিন কিছু খাইনি।

সন্ন্যাসী বললেন,—আচ্ছা, এই নে, তোকে এই টিয়াপাখিটা দিচ্ছি—পাখিটাকে ঘরে রেখে দিবি—কিছু খেতে দিবি নে, বুঝলি? যা···চলে যা···

এই বলে সন্ন্যাসী তাকে খাঁচা সমেত একটা টিয়াপাখি দিয়ে চলে গেলেন।

ধোপার ছেলে ভাবল, এ আবার কি? একটা অসহায় জীবকে ঘরে নিয়ে গিয়ে অনাহারে রাখ্‌বে, আর তাতেই তার ভাগ্য ফিরবে? এও কখনো হয়?

নাঃ, তার কপালই মন্দ!

ধোপার ছেলে কি আর করে! সাত-পাঁচ ভেবে সে সেই রাত দুপুরেই খাঁচাটা নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

পাখিটা একটা দিন চুপ করে রইল। তারপর থেকে এমন চ্যাঁচাতে লাগল যে, ধোপার ছেলে অস্থির হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল যে পাখিটা খিদেয় চ্যাঁচাচ্ছে। পাখিটাকে খেতে দেওয়ার জন্যে তার মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সন্ন্যাসীর কথা মনে হওয়ায় সে নিজেকে সংযত করল। ভাবল, দেখাই যাক্ না শেষ পর্যন্ত কি হয়?

কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। পাখিটা ক্রমশঃ এত চ্যাঁচাতে লাগল যে, তার রাত্রের নিদ্রা পর্যন্ত দূর হয়ে গেল। এ আবার কি ফ্যাসাদ। অনিদ্রার জন্য নয়—পাখির ক্ষুধার কথা ভেবেই সে এত বেশি চঞ্চল হয়ে উঠল যে, তিন দিনের দিন দুপুর রাতে উঠেই ছোলা ভিজিয়ে তাকে খেতে দিল। দরকার নেই তার বড়লোক হ'য়ে। একটা নিরীহ জীব খিদেয় কষ্ট পাবে তার সামনে—এ তার পক্ষে অসহ্য!

কিন্তু অবাক কাণ্ড! পাখিটা যেই ছোলায় মুখ দিয়েছে অমনি মরে গেল। ধোপার ছেলে তো একেবারে হতভম্ব।

পরদিন রাতে ধোপার ছেলে আবার সেই বনের মধ্যে মন্দিরে গিয়ে হাজির হলো। সন্ন্যাসী রেগে-মেগে বললেন,—দূর হয়ে যা হতভাগা, পাখিটাকে মেরে ফেলবার জন্যে তোকে দিয়েছিলাম?

ধোপার ছেলে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল,—মাপ করুন ঠাকুর, আমি তা বুঝতে পারি নি। পাখিটা খিদের জ্বালায় খুব চ্যাঁচাচ্ছিল কিনা তাই···

সন্ন্যাসী খেঁকিয়ে উঠলেন,—প্রাণে অত দয়া-মায়া থাকলে কি বড় লোক হওয়া যায় হতভাগা, মনকে শক্ত করবি, তবে বড়লোক হতে পারবি।

ধোপার ছেলে বলল,—তাই করব ঠাকুর, এবারকার মত মাপ করুন। আর একটা পাখি দিন···

সন্ন্যাসী বললেন,—আর পাখি নেই, পাখিটাকে যদি রাখতে পারতিস্ তাহলে রাজা হয়ে যেতিস্। এই ফুলগাছটা এবার নিয়ে যা। একটা পাত্রে শুকনো বালি দিয়ে গাছটা পুঁতে রাখবি। গাছটা রেখে দিবি ঘরের মধ্যে—যেন কোনদিন রোদ না লাগে; আর গাছের গোড়ায় এক ফোঁটাও জল দিবিনে। দু-চার দিন পরে খুব সুন্দর ফুল ফুটবে—সে ফুলের ঘ্রাণ নিবি না বুঝলি?

ধোপার ছেলে বলল,—আজ্ঞে হ্যাঁ বুঝলাম। গাছটা বালিতে পুঁত্‌ব, জল দেব না, রোদ লাগাব না, ফুলের ঘ্রাণ নেব না।

—যা চলে যা, এতেই তোর ভাগ্য ফিরবে। তুই নেহাৎ ছেলেমানুষ বলে তোকে আর একটা সুযোগ দিচ্ছি।

ধোপার ছেলে ফিরে এল।

সন্ন্যাসীর কথামত বালিতে গাছটা পুঁতে ঘরের এক কোণে রেখে দিল। পাঁচদিন পরে সুন্দর একটা ফুল ফুটলো। ফুলটাতে বারো রঙের বারোটা পাঁপড়ি! এমন সুন্দর ফুল ধোপার ছেলে জীবনে কোনদিন দেখে নি। এমন সুন্দর ফুল, না জামি তার গন্ধ কেমন! কিন্তু ধোপার ছেলে ঘ্রাণ নেয় না।

তেমনি কষ্টেই তার দিন কাটছে। ফুল গাছটা থেকে যে কি ভাবে সে বড়লোক হবে তা তার মাথায় আসছে না।

এখন হয়েছে কি, ওদেশের যিনি রাজা, তাঁর খুব ফুলের শখ। তাঁর বাগানে এত রকমের ফুলগাছ আছে যে তা বলবার নয়। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত ফুলগাছ সংগ্রহ করে বাগানে লাগিয়েছেন। ফুলের জৌলুসে বাগান আলোয় আলো হয়ে থাকে।—

একদিন তিনি সারা দেশময় ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, যারা যারা তাঁকে নতুন নতুন ফুলগাছ সংগ্রহ করে দিতে পারবে, তাঁদের প্রতি গাছের জন্য একশত করে স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হবে।

ধোপার ছেলে একথা শুনেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সে নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীর গাছটা রাজামশাইকে দিয়ে একশো স্বর্ণমুদ্রা লাভ করতে পারবে। সেই টাকা দিয়ে সে অনেকটা উর্বর জমি কিনতে পারবে··· তারপর তাতে শস্য-ফসল উৎপাদন করে নিজের আহারের জন্যে রেখে খানিকটা বিক্রি করে দেবে··· এই ভাবে সে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারবে।

পাত্র সমেত ফুলগাছটা গাধার পিঠে চাপিয়ে ধোপার ছেলে রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হল। রাজামশাই তো ফুলের সৌন্দর্য দেখেই হাত বাড়িয়ে গাছটাকে টেনে নিলেন এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন,—বাঃ, কী সুন্দর ফুল! এ রকম ফুল আমি জীবনে দেখি নি, এরকম ফুলের কথাও শুনিনি কখনো!

তারপর খাজাঞ্চীকে আদেশ দিলেন,—ঐ বালকটিকে দুইশত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হোক্।

ধোপার ছেলে বলল,—রাজামশাই, এবার ঐ ফুলের কথা কিছু বলছি শুনুন। আমি যাঁর কাছ থেকে গাছটি পেয়েছি, তিনি আমাকে বার বার বলে দিয়েছেন যে, এই গাছে যেন কোনদিন রোদ না লাগে এবং কোনোদিন যেন জল দেওয়া না হয়—এ গাছ শুকনো বালিতে বেঁচে থাকবে।

রাজামশাই অবাক হয়ে বললেন,—তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ; আর এই ফুলের ঘ্রাণ যেন কোনদিন নেবেন না!

রাজামশাই হেসে বললেন,—যত সব গাঁজাখুরি কথা বলছ যে বালক! বলে তিনি ফুলের ঘ্রাণ নিলেন।

অমনি—

মানসচক্ষে তিনি এক ভীষণ দৃশ্য দেখতে পেলেন। দেখলেন, তাঁর রাজ্যের সীমান্ত বরাবর প্রচুর বিদেশী সৈন্যের সমাবেশ হয়েছে। তাদের হাতে সব ঢাল-তলোয়ার ঝকমক্ করছে!

আশ্চর্য! এ কি সত্যি!

রাজামশাই আপন মনেই বলে উঠলেন,—আশ্চর্য! এ কি সত্যি?

প্রধান অমাত্য সে কথা শুনে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—কি মহারাজ?

রাজামশাই বললেন,—আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, প্রচুর বিদেশী সৈন্য আমার রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। যদি এ সত্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে, এ ফুলের তুলনা নেই—এ অতি অদ্ভুত ফুল!

তারপর ধোপার ছেলের দিকে চেয়ে বললেন,—শোন বালক, তুমি এখন দুইশত স্বর্ণমুদ্রা নিয়েই বাড়ি যাও। ফুলের যে অদ্ভুত গুণের পরিচয় আমি পাচ্ছি, তা যদি সত্য হয়, অর্থাৎ সীমান্তে যদি সত্যই সৈন্যের সমাবেশ হয়ে থাকে, তাহলে আমি তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দেব।

অতঃপর রাজামশাই দুই সহস্র সশস্ত্র সৈন্য পাঠালেন সীমান্ত অভিমুখে। গিয়ে তারা দেখল, বাস্তবিকই ভিন্‌রাজ্যের সৈন্যরা রাজ্য আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তারা প্রবল প্রতাপে বিদেশী সৈন্যদের বিতাড়িত করে সে সংবাদ এনে রাজামশাইকে জানাল।

রাজামশাই ফুলের গুণে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তবে একটা বিষয়ে তিনি বড়ই ভাবনায় পড়ে গেলেন। ফুলটাই বা কত দিন গাছে থাকবে, আর গাছটাই বা বিনা জলে কতদিন বেঁচে থাকবে? জল না দিলে কখনো গাছ বাঁচে? এই ভেবে তিনি খানিকটা জল গাছের গোড়ায় ঢেলে দিলেন। অমনি অবাক কাণ্ড! সমস্ত গাছটা খাঁটি রুপোর হয়ে গেল আর ফুলটা হল সোনার!

রাজামশাই ভাবলেন, এই রে! ফুলের গুণ নষ্ট হয়ে গেল না তো? তিনি আবার শুঁকলেন ফুলটা। অমনি মানসচক্ষে দেখতে পেলেন, পরাজিত বিদেশী সৈন্যেরা তাঁবু গুটিয়ে প্রস্থান করছে।

রাজামশায়ের আনন্দ আর ধরে না। ফুলের গুণও নষ্ট হল না, আবার ফুলটাও অক্ষয় হয়ে রইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালেন ধোপার ছেলেকে। তাকে তিনি পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন ছোট একটি সুন্দর বাড়ি দান করলেন। এছাড়া আরও একটি কাজ করলেন। রাজবাড়ির রজকের

একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। তার সঙ্গে ধোপার ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন মহা ধুমধামের সঙ্গে। ধোপার ছেলে সেই বাড়িতে পরম সুখে বসবাস করতে লাগল বউকে নিয়ে।

রাজামশাইও ঐ ফুলের দৌলতে আর কোনদিন কোন বিপদ আপদের সম্মুখীন হন নি। ঐ ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে তিনি পূর্বেই সমস্ত বিপদের খবর জানতে পারতেন বলে উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন।
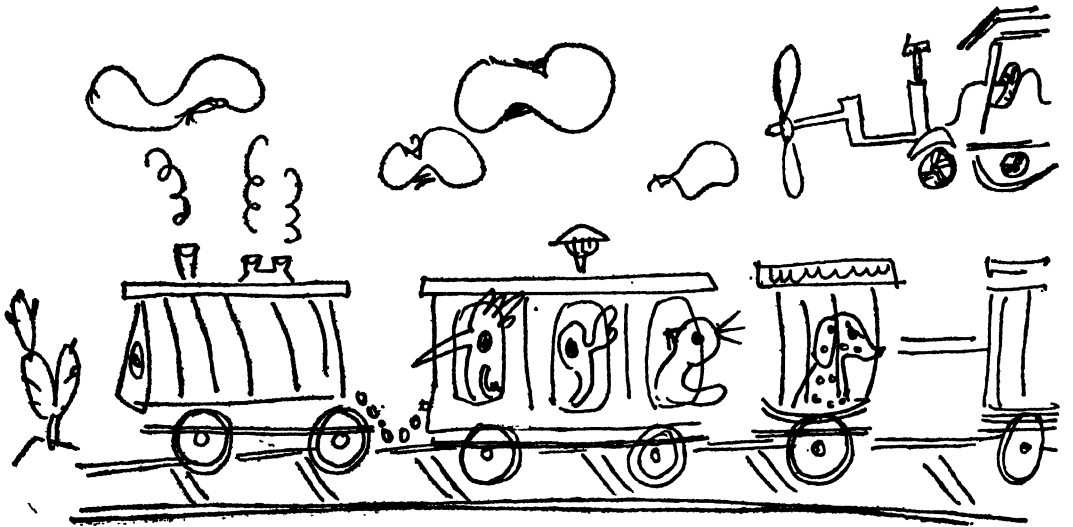
ধাঁধার উত্তর

১। ল ২। বুড়ো আঙুল।

৩। বাগানে, বা-গানে ; শিকারে শিকা-রে ; কলম (গাছের), কলম (লেখার) ; না-চাই, নাচাই ; পাতাতে (ক্রিয়া), পাতাতে (বি: কলাগাছের পাতা)

৪। বিপুল-বিক্রম কবি, আনন্দ-নন্দন পালোয়ান, স্বদেশ রঞ্জন চিত্রকর এবং ললিত-সুন্দর সমাজ-সেবক। সুতরাং স্বদেশ-রঞ্জন (চিত্রকর) আনন্দ নন্দনের (পালোয়ানের) খুড়ো, এবং ললিত সুন্দরের (সমাজসেবক) ভাই।

কেউ কেউ এদের মধ্যে মাসতুতো, খুড়তুতো বা অন্য কোনও ভাই সম্পর্ক বার করে অন্য উত্তর দিয়েছে। কিন্তু, আপন ভাই হওয়া যখন সম্ভব, তখন সেগুলোকে ঠিক বলে ধরলাম না।

উত্তর দাতাদের নাম

সবকয়টি ঠিক উত্তর—১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ৭০৭ মন্দিরা দেব, ৮৬৩ অরুন্ধতী ও অগ্নিমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ৮৬৯ উদয়ন কুমার মুখোপাধ্যায়, ১০৭১ শিবাজী বসু ১০৯৭ ঝুমকা সেন ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৫৮৮ শিঞ্জিতা সেন, ১৭৫৯ শমীন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ১৭৬৫ মিলন ভট্টাচার্য, ২১৯১ মুকুর দাশগুপ্ত (পদ্যে) ২২৭৮ মালা, চন্দন, ও দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার। ২৩০৫ অরূপ দত্তগুপ্ত, ২৫৭৪ অপরাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬২১ শুভা বিশ্বাস, ২৭২৮ লেখনী ও তন্ত্রী মুখোপাধ্যায়, ২৭৩০ প্রদীপ দত্ত, ২৭৬১ ঋতা, মিতা ও ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত, ২৭৭৬ অভিজিৎ সেনগুপ্ত,

তিনটি উত্তর ঠিক—১ দীপঙ্কর বসু, ৩২ মধুচ্ছন্দা ফৌজদার, ১৩৬ শ্রীকুমার রক্ষিত, ১৬৬ শিবাজী ও বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, ২২৭ দীপা ও কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য ৬৮৩ চৈতালী সেন, ৭৬৪ শান্তনু দে, ৮০৯ অমিতাভ গোস্বামী, ৯৪৮ লক্ষ্মী, দেবাশিস, গৌতম, গোপা ও সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৪ কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, ১৪৩৮ শীলা রায়, ১৫৭০ মন্দাকান্তা মৈত্রেয়ী, ১৬১৩ ভারতী ও অভিজিৎ দে, ১৭৩৮ সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৭৮৮ পলাশবরণ পাল, ১৮২১ জয়ন্তিকা সেন, ২১০২ সায়ন চট্টোপাধ্যায়, ২১৬১ কাজল দত্ত, ২১৬৮ বুলতান, টুসটুস ও পমপম রায়, ২১৯৪ বনানী রায়, ২২৮৮ দেবপ্রসাদ গুপ্ত, ২৩০১ তপতী ভট্টাচার্য্য, ২৪৬৭ পার্থমিত্রা ঘোষ, ২৪৬৯ অভিজিৎ গুহ, ২৪৮২ তাপস কুমার সেন ২৫৪৭ মৈত্রেয়ী ও প্রসেনজিৎ বসু, ২৫৬০ কেতকী চৌধুরী, ২৫৬২ ইলা ঘোষ, ২৬৭৫ শর্মিলা দত্ত, ২৬৯৭ প্রতাপ চক্রবর্তী, ২৭৭৩ মৌসুমী ও মৌটুম্পা সেন, ২৭৮৯ গৌতম গুপ্ত, ২৮০৯ আনন্দশঙ্কর গুপ্ত, ২৮৬৮ সোহম্ দাশগুপ্ত।

দুটি উত্তর সম্পূর্ণ ঠিক—৭ সুচিত্রা ঘোষ, ১৫ বনশ্রী দাশ, ১৩৩ সর্বাণী ভট্টাচার্য্য, ১৫৮ রীণা ও রীতা গুপ্ত, ৩০২ উর্মিমালা ও শর্মিলা ঘোষ, ৮৫৮ দেবকুমার ও দেবাশিষ লাহিড়ী, ৯৮৩ জ্যোতির্ময়

মজুমদার, ১০১৬ প্রণতি দত্ত, ১১২৮ অমিতাভ দত্ত, ১২৮৩ রিতা রাহুল ও সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, ১৩১৭ ভাস্কর মিত্র, ১৩২০ বিজলী ঘোষ, ১৫১৭ কিশলয় নন্দী, ১৬০৬ রেবা ও রঞ্জন নাথ, ১৬১৯ অঞ্জন ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭০৬ বন্দন হালদার, ১৭২৪ অনির্বিৎ রফিৎ, ১৮১৩ অপরাজিতা বসু, ১৮২৪ স্মৃতিলেখা গুহ, ১৮৪০ অনুরাধা ঘোষ, ২২৪২ বাপ্পারায়, ২৩৯০ পার্থ কুণ্ডু, ২৪১০ ঋত্বিক সান্যাল, ২৬০০ মঞ্জু সান্যাল, ২৬০৫ পুতুল, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু ও সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, ২৬৮৩ অঞ্জন চৌধুরী, ২৭০১ ম বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৩৬ রজত কিরীট ঘোষ, ২৭৯০ মিতা মুখোপাধ্যায়, ২৮৫০ শ্যামলী চক্রবর্তী।

বহুরূপী স্কুল

(সুবিমল রায়)

কোন এক গ্রামে আছে মজার ইস্কুল,
এক-তলা নীল বাড়ি, থামগুলো স্থূল।
পাড়ার ডাক্তার এসে ফটকে বসেন,
মিষ্টি বড়ি ছেলেদের মুখে গুঁজে দেন।
হেডমাস্টার চকডাস্টার এনে দেন ক্লাসে।
রেজিস্টারের খাতা হাতে ইন্‌স্পেক্টর আসে।
ছেলেদের মেসো পিসে এসে দলে দলে,
শেখান কতই ভাষা কানে কথা ব'লে।
দারোয়ান তেড়ে গান শেখায় কতই,
ছেলেদের হয় সেটা মনের মতই।
স্কুলের দপ্তরী এসে ড্রয়িং শেখায়,
এতে সে ওস্তাদ বড়, বেশ বোঝা যায়।
ইস্কুলের সবজান্তা পুরাতন ভৃত্য
বড় পোক্ত দিতে শিক্ষা ব্রতচারী নৃত্য।
ঝাড়ুদার ইস্কুলের ঘড়ি রাখে ঠিক,
তাই দেখে দুষ্টু ছেলে হাসে ফিক্ ফিক্।
কেরাণী-মশাই এসে অঙ্ক দিয়ে যান।
হেড পণ্ডিত হকি খেলে হন হয়রান।
ড্রিল-মাস্টার ঘড়ি দেখে ঘণ্টাটা বাজান,
বড় সুন্দর শব্দ সেটা, শোনো পেতে কান।

ছুটির ঘণ্টাটা শুধু ছেলেরা বাজায়,
এই ঘণ্টা বেশ কিছু আগে বেজে যায়।
ছেলেদের নামগুলো কেমন কেমন,
যত লাগে চেনা-চেনা অচেনা তেমন।
বাবা চাঁদ, টংলাল, রাজা খাঁ, ঠ্যাঙাড়ে,
চাচাতুয়া, ডিগবাজ, তাজারু, বাঘাড়ে।
এ-রকম কত নাম নূতন, নূতন,
চেহারাও সাদাসিধা নামেরি মতন।
পুলিসেরা স্কুলে ঢুকে ইতি উতি চায়,
পানের পিকের দাগ ধুয়ে দিয়ে যায়।
পিয়নেরা ইস্কুলেতে আসে চিঠি দিতে,
সুগন্ধ মাখায় সব চিঠিতে চিঠিতে।
ছেলেদের ফুটবল ম্যাচের রেফারী
জেতাদের খেতে দেন খেজুর সুপারি।
তবু এই ইস্কুলেতে বেশি নাই ফাঁকি,
ভাল ব্যবস্থার কথা রয়ে গেছে বাকী।
হাতের লেখাটা ভাল ক'রেই লেখায়,
ছোট ছোট দরকারী কাজও শেখায়।
পড়াবার ফিকিরটা আছে তলে তলে,
নইলে তো ছেলেগুলো যেত রসাতলে।

শব্দছক-প্রতিযোগিতা

১ ক	র	২ তা	৩ ল		৪	৫		৬	৭
		৮		৯				১০	
১১	১২			১৩			১৪		
	১৫				১৬				
১৭				১৮					১৯
২০			২১		২২	২৩		২৪	
২৫		২৬		২৭		২৮			
		২৯							
		৩০			৩১		৩২		৩৩
৩৪				৩৫					

নাম……………… বয়স……………… গ্রাঃ সং………………

ঠিকানা………………………………

উপরের ছকটা লক্ষ্য করে দেখ—পাশাপাশি ও উপর থেকে নিচে অনেকগুলি শব্দ বসাবার খোপ রয়েছে। কোন নম্বরের ঘরে (পাশাপাশি বা উপর নিচ) কি কি শব্দ বসবে তার প্রত্যেকটির সূত্রও দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম সূত্রটির (পাশাপাশি—১) উত্তরের শব্দটা ছকের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তোমরা বাকি সূত্রগুলি দেখে দেখে অন্যসব শব্দগুলো বার করে ফেল।

(১) উত্তরের শব্দগুলি সূত্রের সঙ্গে ঠিক ঠিক মেলা চাই (উদাহরণ দেখ)

(২) চলন্তিকায় পাওয়া যায় না এ রকম অপ্রচলিত শব্দ দিলে চলবে না।

(৩) যাদের বয়স ১৭র কম, কেবলমাত্র সেই গ্রাহকেরাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।

(৪) ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।

(৫) শব্দছকটি ভর্তি করে, কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে নাম, গ্রাহক সংখ্যা, বয়স ও ঠিকানা-সহ পাঠিয়ে দাও।
(৬) যারা গ্রাহক সংখ্যা পাওনি তারা লেখ 'নতুন গ্রাহক'।
(৭) যারা আশ্বিন পর্যন্ত গ্রাহক, তারা ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে বাকি চাঁদা পাঠিয়ে দাও।
(৮) যারা গ্রাহক নও তারা ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে চাঁদা পাঠিয়ে কার্তিক মাস থেকে গ্রাহক হয়ে যাও।
(৯) ১৫৲, ১০৲ ও ৫৲ টাকার তিনটি পুরস্কার আছে।

সূত্র

পাশাপাশি

১] এক-দুই দাও দেখি খাজনা
তিন-চার পাও তবে ফল
এক-দুই-তিন-চার বাজনা
এক-চার খুলে পাবে জল।

৪] 'আহা আহা বেচারা'—
কীবা কথা এ ছাড়া?

৮] এক-দুই দেয় দেখ শস্য
দুই-তিন-বাঁধে গাঁটছড়া
সব মিলে পাইবে অবশ্য
জাঁদরেল মক্কেল কড়া।

১০] কুক্কুটের মুণ্ড করে নাশ
পাবে ললাটের দু'পাশ।

১১] ভেঙে গেল হাড় বুঝি? পড়ে নাকি রক্ত?
উত্তর নয় মোটে শক্ত।

১৩] সন্ধানী বোঝ শব্দমূল্য
বাঁ-যোগে লম্ফঝম্প
সো-যোগে বুঝিবে ভ্রাতৃতুল্য
চা-যোগে কমিবে কম্প।

১৪] বসবার খাটে বখাটে বাদ
সর্বজনের সাধ।

১৫] এক-দুই ভার তোলহ স্কন্ধে
দুই-তিন নাচে অমর ছন্দে
এক-তিন চলে সপ্তপদীতে
এক-দুই-তিন ভ্রমিছে নদীতে।

১৬] কেষ্ট বিষ্টু পেটে দড়ি
নদী চলে তড়বড়ি'

১৭] সাদা সিধে উত্তর
বুঝে ফেল সত্বর।

১৮] সোজা কথা বলি শোন, নাও পরামর্শ,
বিপরীতে সব শেষ, শমনের স্পর্শ।

২০] দুই কাটারি মারলে পরে
অগ্রজরূপ আপনি ধরে।

২২] রাজা বাদশার ছা
দাবা জানব না?

২৫] হক্ কথা তোরে বলি ভাই—
'আসে নাই।'

২৮] লম্বা সাহেব পায়েতে গয়না
আরে বাবা, এযে খাড়াই রয়না!

২৯] ডিগবাজি খেয়ে বলে খালাসী
'নহি আমি পদ্মের বিলাসী।'

৩০] ছুই পাশেতে নিয়ে বাত
প্রতিদ্বন্দ্বী কুপকাত।

৩২] মধ্যবাদে বাক্যব্যয়
সর্বশুদ্ধ বৈদ্য দেয়।

৩৪] পুষ্পদল রূপ ধরি'
চরণ পঠন করি।

৩৫] মহড়ার ইংরিজি
জানা আছে, ভেরি ইজি।

উপর-নিচ

১। শেষ হল ইস্কুল
এবার দেখ পড়তে গেলেই পিছনে লাঙুল।

২। তাল হজম হ'লে পরে
প্রাসাদ গড়ি মর্মরে।

৩। রাঘব পুত্র
সোজা এ-সূত্র।

৪। কার বাড়ি ?
বা'র বাড়ি।

৫। মস্তকের অন্তভাগ ফেলে
অতিকায় শব্দ এক মেলে।

৬। গমগম সভা রাজা উজীরে
তার মাঝে উত্তর খুঁজিরে।

৭। শোন শহরবাসী
আগেই যদি সাপ দেখালে,
হেথায় কেন আসি ?

৯। মানুষের বত্রিশ, ছুইখানা হস্তির,
মিলে যাবে উত্তর, হয়োনাকো অস্থির।

১২। সাবধান ! তীক্ষ্ণ মধ্যে
বরদা আসীনা পদ্মে।

১৪। মোহনবাগান সঙ্গে এলেন ঠিক,
শেষ ছুটোতে মারব আমি কিক্।

১৭। সরের মধ্যে মার্কামারা
ব্যবসায়ী এ কেমনধারা ?

১৯। কোলে আছে কাটারি
মতলব জেনো মাটি কাটারই।

২১। কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং
সাহেব-সে কয় আছি,
ছুই হুজুরের মাঝখানে এক
ইংরিজি মৌমাছি।

২৩। কাজখানা হয় যদি শিলনোড়া আনি
এর সাথে মিল দিতে আছে রাজধানী

২৪। খাশা দেখ কাংসের পাত্র
রাখে বুঝি ফল্গু একমাত্র ?

২৬। গুজব গেজে শোনা
এইখানেতে ভূতের আনাগোনা।

২৭। জেনো রেখো সন্ধানী মিত্র
উত্তরে আছে বৈচিত্র্য।

৩১। উল্টা হস্ত
ভুলটা মস্ত।

৩২। কহ, সামর্থ্য,
গোলক অর্থ।

৩৩। ডাক নাম কেষ্ট,
শোনেনা বাঁশীর স্বর, এমনই অদেষ্ট !

With
the compliments of :
The Imperial Tobacco Company
of India Limited

ঘোঁৎ শব্দ করিয়া সম্মতি জানাইল।

আশ্চর্য দ্বীপ

পঞ্চম বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা

কার্ত্তিক ১৩৭২ । নভেম্বর ১৯৬৫

খাতার পাতা

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

গ্রামোফোনের চাকতিখানার নানা রেখার ফাঁকে
সুরের পাখি, গুটিয়ে ডানা, লুকিয়ে যেমন থাকে।
তেমনি তোমার খাতার পাতার হিজিবিজির রেখায়,
আমার গানের মৌন-তানের সুরের লিপি ঘুমায়।
যদি সে ঘুম ভাঙ্‌তে পার খুলে যাবে কান
শুনবে তখন জড়ের ফাঁকে পরমাণুর গান।

খাতার পাতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সোনার কাঠি চাই না, যাতে মরারা হবে জ্যান্ত,
আকাশে চাঁদ ধরার নেই বায়না।
বাঁচার সুখ বুঝব কিসে, শুধুই এই ধ্যান ত,
নিজের মুখ দেখার চাই আয়না।

শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের সৌজন্যে।

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে অবরুদ্ধ রিচমণ্ড সহর হইতে পাঁচটি অসমসাহসী ব্যক্তি বেলুনে চড়িয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করেন—তাঁহারা হইলেন প্রতিভাশালী এঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্‌টেন সাইরাস্‌ হার্ডিং, তাঁহার প্রভুভক্ত ভৃত্য নেব্‌, বিখ্যাত সাংবাদিক গিডিয়ন স্পিলেট, সুদক্ষ নাবিক পেন্‌ক্রফট ও তাহার প্রাক্তন প্রভুপুত্র, মাতৃপিতৃহীন বালক হারবার্ট। হার্ডিংএর কুকুর টপও সঙ্গে ছিল।

প্রচণ্ড ঝটিকার প্রকোপে তাঁহারা বহুকষ্টে একবস্ত্রে ও রিক্তহস্তে প্রশান্ত মহাসাগরের এক নির্জন দ্বীপে অবতরণ করিয়া রক্ষা পান। প্রথমে হার্ডিংএর খোঁজ পাওয়া যায়নি; ডাঙ্গা হইতে আধ মাইল দূরে তিনি ভাসিয়া যান। পরে খুঁজিতে খুঁজিতে এক গহ্বরের মধ্যে তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেল। সেখানে তিনি আসিলেন কিরূপে ?

দ্বীপের মাঝখানে এক আগ্নেয় পর্বত, দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড বন, উত্তর ভাগটি বালুপূর্ণ, পূর্বদিকে সমুদ্র হইতে কিছুটা উঁচুতে একটা হ্রদ। ইঁহারা সকলেই আমেরিকার লোক, সুতরাং আমেরিকার প্রসিদ্ধ নামগুলি লইয়া দ্বীপের বিভিন্ন স্থানের নামকরণ করিলেন। দ্বীপটির নাম হইল লিঙ্কন দ্বীপ।

সমস্ত কাজই ইঁহাদিগকে একেবারে গোড়া হইতে শুরু করিতে হইল ? দারুণ পরিশ্রম করিয়া ও বুদ্ধি খাটাইয়া ক্রমে তীর-ধনুক, মাটির বাসন, ইঁট, লোহা, স্টিল ও তাহা হইতে নানা যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল।

লেকের ধারে ঘুরিতে ঘুরিতে টপ একদিন প্রকাণ্ড ডুগং জাতীয় জলজন্তুকে তাড়া করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর টপকে কোনও অদৃশ্য শক্তি ছিটকাইয়া ফেলিল। ডুগংটির মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিল, তাহার গলায় একটা সাংঘাতিক গভীর ক্ষত। কিসে তাহাকে মারিল ?

সাইরাস হার্ডিং বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে লেকের একধারের পাথর উড়াইয়া দেওয়াতে সেই পথে প্রচণ্ড বেগে জল বাহির হইতে লাগিল। পূর্বেকার নির্গমন পথের বিরাট গহ্বরটি জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। সাইরাস হার্ডিং এইখানে নিজেদের বাসস্থান করিলেন। সমুদ্রের দিকে জানালা দরজা ফুটাইলেন, দড়ির সিঁড়ির সাহায্যে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, পূর্বেকার গহ্বরের মুখটি বুজাইয়া দিলেন। স্থানটির নাম দিলেন গ্র্যানিট হাউস।

এইভাবে ক্রমে তাঁহাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ হইতে লাগিল কিন্তু নানা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিতে লাগিল, যাহার কোন মীমাংসা হইল না।

একদিন একটা শূকরের বাচ্চার মাংস খাইতে খাইতে তাহার পেটের মধ্যে একটা বন্দুকের গুলি পাওয়া গেল! একটি বন্দী কচ্ছপ রহস্যজনকভাবে মুক্তি পাইল! অথচ কোথাও মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেল না। বালির মধ্যে দুইটি পিঁপার সঙ্গে বাঁধা একটা সিন্দুক তাঁহারা পাইলেন। সিন্দুকটি বই, পোষাক অস্ত্র, যন্ত্র ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল। কিন্তু নূতন ঝকঝকে জিনিসগুলিতে কোন নির্মাতার নাম ছিল না!

সকলে স্থির করিলেন যে সাবধানে থাকিতে হইবে এবং সমস্ত দ্বীপটি ভালভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। একটি ক্যানো প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা মার্সি নদী ধরিয়া দ্বীপের পশ্চিমভাগে চলিলেন।

পথে বহু মূল্যবান গাছপালা ও শাকসব্জী পাওয়া গেল। হিংস্র এবং অহিংসক বহুবিধ জানোয়ার দেখা গেল। অবশেষে একটা উঁচু গাছের মাথায় তাঁহাদের সেই ছিন্ন বেলুনটিও পাওয়া গেল। এই কাপড়ে বহু বস্ত্র, চাদর, এমন কি নৌকার পালও হইবে।

মার্সি নদীর উৎসের কাছে ক্যানো বাঁধিয়া দ্বীপবাসিগণ স্থলপথে সমস্ত দ্বীপটি ঘুরিয়া আবার গ্র্যানিট হাউসের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিলেন। এখন পুনরায় নদী পার হইবেন কিরূপে? পেনক্রফট কাঠ কাটিয়া ভেলা বানাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের নৌকাটি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া উপস্থিত! তাহার বাঁধন-দড়ি কিভাবে কাটিল?

যাহা হউক। সকলে নৌকা করিয়া নদী পার হইলেন। তখন গভীর রাত্রি। গ্র্যানিট হাউসের নিকটে গিয়া তাঁহারা অন্ধকারে সিঁড়িটি খুঁজিতে লাগিলেন।

কি আশ্চর্য—সিঁড়ি ত নাই! কি সর্বনাশ!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সাইরাস হার্ডিং গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মুখে কথাটি নাই। সঙ্গীরা অন্ধকারে পাহাড়ের গায়ে হাতড়াইতে লাগিল—যদি বা বাতাসে সিঁড়িটাকে সরাইয়া ফেলিয়া থাকে! বাতাস সিঁড়িটাকে মাটিতেও ফেলিয়া দিতে পারে ত? সে জন্য মাটিতেও সন্ধান করা হইল। কিন্তু কোথায় সিঁড়ি? সেটা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! বাতাসের ঝাপটায় সিঁড়িটা যদি মধ্যপথে রোয়াকের উপর উঠিয়া থাকে? কিন্তু অন্ধকারে সেটা জানিবার উপায় নাই।

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'লিঙ্কন দ্বীপে একি অদ্ভুত ঘটনা সব হতে আরম্ভ করেছে, এযে আক্কেল গুড়ুম করে দিল!'

স্পিলেট বলিলেন—'এটাকে আর অদ্ভুত ঘটনা বলছ কেন? আমাদের অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ এসে

গ্র্যানিট হাউস দখল করে সিঁড়িটি টেনে উপরে তুলে নিয়েছে। বাস্ জলবৎ তরলম্! এর মধ্যে আর অদ্ভুতটা কি আছে?'

পেনক্রফট বলিল—'অন্য কেউ ব্যক্তিটি কে?'

স্পিলেট বলিলেন—'শূয়রকে যে গুলি করেছিল, সে। তা না হলে আর কে হবে?'

এই কথার পর পেন্‌ক্রফ্‌ট গাল ফাটাইয়া চিৎকার করিয়া বলিল—'এই! কে আমাদের বাড়িতে এসে চোরের মত ঢুকেছ—উত্তর দাও!'

সে ক্রমাগতই এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল—কেহই উত্তর দিল না। কিন্তু একবার মনে হইল যেন চাপাগলায় গ্র্যানিট হাউসের মধ্যে কে হাসিল!

এরূপ ঘটনা ঘটিলে কাহার বুদ্ধি ঠিক থাকে? যাত্রীদল এই দ্বীপে সাত মাস যাবৎ বাস করিতেছেন, তাহার মধ্যে এরূপ অদ্ভুত ঘটনা আর হয় নাই! সকলে গ্র্যানিট হাউসের নিচেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন কি কর্তব্য? কর্তব্য স্থির করা সহজ নয়!

যাহা হউক, অনেক চিন্তার পর হার্ডিং বলিলেন—'আমার মতে, ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন আর উপায় নাই। সকাল বেলা ভাল করে দেখে শুনে, যা উচিত মনে হয় করা যাবে। এখন চল, চিমনীতে যাই। খাওয়া দাওয়া না হোক বাকি রাতটা আরামে ঘুমিয়ে নিতে পারব।

হার্ডিংএর পরামর্শ মত কাজ করাই স্থির হইল। টপকে গ্র্যানিট হাউসের নিচে প্রহরী রাখিয়া সকলে চিমনীতে গেলেন। কিন্তু সে রাত্রি কাহারও নিদ্রা হইয়াছিল বলিলে, সত্য কথা হইবে না। রাত্রি প্রভাত হইলেই এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ বাহির করিতে হইবে, এই ভাবনা কাহাকেও ঘুমাইতে দিল না। গ্র্যানিট হাউস শুধু বাসস্থান নয়। সেখানেই যাত্রীদের সর্বস্ব,—খাদ্য, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, গুলিবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, সমস্তই সেখানে রহিয়াছে। কোথাকার কে-না-কে আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিবে, এটা বড় গুরুতর বিষয়! ইহা অপেক্ষা দুর্ভাবনার কারণ আর কিছু হইতে পারে না। ঘুম ত কাহারও চক্ষে আসিল না, অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে এক একজন উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে লাগিলেন টপ ভাল করিয়া পাহারা দিতেছে কিনা। কেবলমাত্র হার্ডিং তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্যবলে চুপ করিয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অত্যধিক মনের বল থাকা সত্ত্বেও হার্ডিংকে এই ঘটনায় বিচলিত করিল। তিনি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া চুপি চুপি স্পিলেটের সঙ্গে এই ঘটনাটির সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা সমস্তই এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার নিকট মস্তক অবনত করিল। পেন্‌ক্রফ্‌ট রাগিয়াই অস্থির—'কেউ নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছে। বাছাধনকে একবার ধরতে পারলে মজাটা দেখিয়ে দিব।'

পূর্বাকাশে প্রভাতের আলোক দেখিবামাত্র যাত্রীদল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গ্র্যানিট হাউসের নিচে গিয়া উপস্থিত। গ্র্যানিট হাউসের জানালা-টানালা বন্ধ করিয়া যাত্রীদল অনুসন্ধান কার্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। সে সমস্ত তেমনিই বন্ধ রহিয়াছে। বাড়ির দরজাটিও বন্ধ করা হইয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই বন্ধ দরজা এখন খোলা!! কেন? তাহা হইলে নিশ্চয়ই কেহ না কেহ গ্র্যানিট হাউসে ঢুকিয়াছে!

রাত্রির অন্ধকারে যাহা দেখা যায় নাই, সূর্যের আলোকে সে সব দেখিতে পাওয়া গেল। সিঁড়ির উপরের অংশটুকু ঠিক পূর্বের মতই ঝুলিতেছে; কিন্তু মধ্যপথের রোয়াকের উপর হইতে মাটি পর্যন্ত যে অংশটুকু, তাহা টানিয়া রোয়াকের উপর তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যাহারা ঢুকিয়াছে তাহারা হঠাৎ আক্রান্ত হইবার ভয়ে এই কার্যটি করিয়াছে।

সিঁড়ির ঐ অংশটুকু কি করিয়া নামান যায়? হারবার্ট বহু চিন্তার পর এক বুদ্ধি বাহির করিল।—তীরের পিছনে সরু লম্বা দড়ি বাঁধিয়া সেই তীর ছুঁড়িয়া শেষ ধাপের ভিতর দিয়া গলাইয়া দিবে। তারপর সেই দড়ি টানিয়া সিড়ির নিচের অংশ নামাইয়া লইবে।

চিমনী হইতে তীর ধনুক আনিয়া, একটা তীরের সহিত হারবার্ট সরু দড়ি বাঁধিল। তারপর অব্যর্থ সন্ধানে সেই তীর একটা ধাপের ভিতর দিয়া গলাইয়া দিল। হার্ডিং স্পিলেট, পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্‌ পিছনে সরিয়া গেলেন, জানালায় আসিয়া কেহ উকি মারে কিনা দেখিবার জন্য।

স্পিলেট দরজা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক প্রস্তুত রাখিলেন।

ইহার পর হারবার্ট দড়ি ধরিয়া সবেমাত্র টান দিয়াছে অমনি বিদ্যুৎবেগে একখানি হাত দরজা দিয়া বাহির হইল। এবং চক্ষের নিমেষে টান দিয়া সিঁড়িটাকে গ্র্যানিট হাউসের ভিতর লইয়া গেল!

পেন্‌ক্রফ্‌ট চেঁচাইয়া উঠিল—'হতভাগা পাজি! একটা গুলি যখন বসাব তখন মজাটা টের পাবে!'

নেব্‌ বলিল—'কাকে বলছ? ওটা কার হাত?'

'কার হাত দেখতে পেলে না? বাঁদরের হাত! ওরাং ওটাং, বেবুন, গরিলা এর কোনটা তা বলতে পারব না, কিন্তু এটা যে বাঁদরের হাত সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। আমাদের অনুপস্থিতিতে বাঁদর এসে গ্র্যানিট হাউসে ঢুকেছে!

পেন্‌ক্রফ্‌টের এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনটা বানর তখনই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দিয়াছে! সেই মুহূর্তেই পেন্‌ক্রফ্‌টও একটাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছাড়িয়া দিল। দুইটা বানর পলায়ন করিল, কিন্তু একটা গুলি খাইয়া নিচে পড়িয়া গেল। বেশ বড় সাইজের বানর, সেটাকে দেখিয়া হারবার্ট বলিল 'ওরাং ওটাং'।

স্পিলেট বলিলেন—'হারবার্ট! তুমি তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত থাক। আবার জানালায় উকি মারলেই তীর চালাবে।'

কিন্তু, বানর অত্যন্ত চালাক। একটায় গুলি খাইয়াছে দেখিয়া আর কি তাহারা জানালার ধারে আসে! যাহা হউক, হারবার্ট আবার তীরের সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া ছাড়িল। তীর সিঁড়ির উপরের অংশের একটা ধাপের মধ্য দিয়া গলিয়া আসিল বটে, কিন্তু টান দিবামাত্র দড়ি ছিঁড়িয়া গেল! তখন আর উপায় কি?

হার্ডিং বলিলেন—'তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। সামান্য কতগুলো বাঁদর, এরা কতক্ষণ আর জ্বালাতন করবে?'

কিন্তু জ্বালাতন নিতান্ত কম সময় ধরিয়া করিল না। ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে একটা নাক কখনও একটা হাত জানলা দিয়া দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে গুলিও চলিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অবশেষে হার্ডিং বলিলেন—'এক কাজ করা যাক—চল আমরা লুকিয়ে থাকি। বাঁদরগুলো ভাববে আমরা চলে গিয়েছি, আর তখনই জানালায় উঁকি মারবে। স্পিলেট আর হারবার্ট এই পাথরটার আড়ালে লুকিয়ে থাকুক, জানালায় কিছু দেখা গেলেই গুলি করবে।

স্পিলেট ও হারবার্ট দুইজন বন্দুক লইয়া লুকাইয়া রহিলেন। হার্ডিং পেন্‌ক্রফ্‌ট ও নেব্‌কে লইয়া বনে গেলেন শিকার করিতে। আধঘণ্টা পরে কতগুলি পায়রা শিকার করিয়া তাঁহারা ফিরিলেন। পায়রা রোস্ট করা হইল। স্পিলেট ও হারবার্ট টপকে পাহারায় রাখিয়া আসিয়া কিছু আহার করিয়া আবার ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপে আরো দুটি ঘণ্টা কাটিল, তবু অবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না।

স্পিলেট নিতান্ত অস্থির হইয়া বলিলেন—'এ যে বড় মুস্কিলের ব্যাপার হল দেখছি! আর এই মুস্কিলের আসান হবার ও ত উপায় দেখছি না!'

তখন হার্ডিং বলিলেন,—'চল, পুরাতন পথটা দিয়া গহ্বরে ঢুকবার চেষ্টা করি।'

বাস্তবিক, গ্র্যানিট হাউসে ঢুকিয়া বানরগুলিকে তাড়াইতে হইলে লেকের পাশের সেই পুরাতন পথ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে গ্র্যানিট হাউসে যাওয়া যাইবে না। পথের মুখটা অবশ্য সিমেণ্ট দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেটাকে খুলিয়া লইতে হইবে।

তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে! যাত্রীদল টপকে পাহারায় রাখিয়া কুড়াল, কোদাল প্রভৃতি লইয়া রওয়ানা হইলেন; মার্সি নদীর বাঁ পাড় ধরিয়া প্রসপেক্ট হাইটে উঠিতে হইবে। তাঁহারা সবেমাত্র হাত পঞ্চাশ গিয়াছেন, এমন সময়ে টপ ভীষণ ডাকিয়া উঠিল! সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া চলিলেন। গ্র্যানিট হাউসের নিকট আসিয়া দেখিলেন অবস্থার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কোন অজ্ঞাত কারণে ভয় পাইয়া বানরের দল পলাইবার চেষ্টা করিতেছে! ব্যস্ততার দরুণ তাহারা ভুলিয়াই গিয়াছে সিঁড়িটার কথা, নতুবা সিঁড়ি নামাইয়া দিয়া সহজেই সেই পথে পলায়ন করিতে পারিত!

তাহা না করিয়া বানরগুলি এ-জানালা হইতে সে জানালায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং উঁকি মারিতে লাগিল। এদিকে যাত্রীদল সুযোগ বুঝিয়া গুলি চালাইতে আরম্ভ করিলেন! কয়েকটা বানর, দারুণ চিৎকার করিয়া গ্র্যানিট হাউসের ভিতরেই পড়িল, কয়েকটা গুলি খাইয়া নিচে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মনে হইল যেন আর একটা বানরও গ্র্যানিট হাউসের মধ্যে জীবিত নাই।

এই সময়ে যাত্রীদল দেখিলেন—সিঁড়িটা রোয়াকের উপর দিয়া পিছলাইয়া মাটিতে পড়িয়াছে!

পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিলেন—'বাঃ, এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার!'

হার্ডিং বলিলেন—'সত্যি পেন্‌ক্রফ্‌ট, সিঁড়িটা কে ফেলে দিল?'

এই কথা বলিয়াই হার্ডিং সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিলেন। অন্যেরাও তাঁহার পিছনে চলিল। ঘরের মেঝেতে নামিয়া, চারিদিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। ঘরের মধ্যে কেহই নাই—ভাঁড়ার ঘরেও নাই। ভাঁড়ার ঘরটি তেমনই আছে, বানর-দল সেটির কোন জিনিসে হাত দেয় নাই।

পেন্‌ক্রফ্‌ট তখন বলিল—'কে সে ভদ্রলোক দয়া করে সিঁড়িটা নামিয়ে দিয়েছিলেন?'

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ এক চিৎকার শুনিতে পাওয়া গেল। মুহূর্ত মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ওরাং ওটাং এবং তাহার পিছনে পিছনে নেব আসিয়া ঘরে উপস্থিত। ওরাংওটং প্যাসেজের মধ্যে লুকাইয়া ছিল!

পেন্‌ক্রফ্‌টের হাতে ছিল কুড়াল। কুড়ালের আঘাতে সে ওরাংটাকে মারিতে যাইবে, এমন সময়ে হার্ডিং বাধা দিয়া বলিলেন—'পেন্‌ক্রফ্‌ট, ওটাকে মেরো না, আমার বিশ্বাস, এই ওরাংটাই সিঁড়ি নামিয়ে দিয়েছিল।' তখন সকলে মিলিয়া, অনেক চেষ্টার পর, ওরাংটাকে মাটিতে ফেলিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন।

পেনক্রফ্‌ট বলিল—'এখন এটাকে কি করা যাবে?'

হারবার্ট বলিল—'এটাকে আমাদের চাকর করব।' হারবার্ট এ কথা তামাসা করিয়া বলে নাই। সে জানিত ওরাংওটাং অতি বুদ্ধিমান জন্তু। ইহার দ্বারা অনেক কাজ করান যাইবে। যাত্রীদল ওরাংটার নিকটে গিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ওরাং গরিলার মত রাগীও নয়, আবার বেবুনের মত বোকাও নয়। তাহাদের বুদ্ধি প্রায় মানুষের মত। অনেক পরিবারে ওরাংওটাংকে ঘর ঝাঁট দেওয়া, জুতা পরিষ্কার করা, টেবিল্‌ বয়ের কাজ করা—এমন কি চাকরদের

সঙ্গে মিলিয়া মদ্যপান করিতে পর্যন্ত দেখা গিয়াছে।

ওরাং ওটাংটা প্রকাণ্ড বড়—প্রায় ছয় ফুট উঁচু। বুকটি বিশাল চওড়া, শরীরটা দেখিলে মনে হয় অসাধারণ বলবান।

নেব্ সাইরাস্ হার্ডিংকে জিজ্ঞাসা করিল—'এটাকে কি সত্যি চাকর করা হবে?'

হার্ডিং বলিলেন—'হ্যাঁ নেব্! কিন্তু দেখো, যেন একে হিংসা করো না!'

পেন্‌ক্রফ্‌ট ওরাংটার নিকটে গিয়া বলিল—'কিরে, আমাদের কাছে থাকবি? ক্যাপ্‌টেনের চাকরি করবি?'

একটী 'ঘোঁৎ'—মত শব্দ করিয়া ওরাং তাহার সম্মতি জানাইল।

তখন পেন্‌ক্রফ্‌টের অনুরোধে ওরাংটার নাম রাখা হইল 'জাপ'।

এইরূপে মাস্টার জাপ গ্র্যানিট হাউসের দলভুক্ত হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গ্র্যানিট হাউস আবার দ্বীপবাসিগণের অধিকারে আসিয়াছে। কোন অজ্ঞাত কারণে ভীত হইয়া বানরের দল পলায়ন করিয়াছিল। ভয়ের কারণটি কি এবং সেটা কোন দিক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই—ব্যাপারটি ভারি অদ্ভুত। যাহা হউক, হঠাৎ ভয় পাওয়াটাই বানরগণের পলায়নের একমাত্র কারণ বলিয়া দ্বীপবাসিগণ মনে করিয়া লইলেন।

দিনের বেলায় বানরগুলির মৃতদেহ বনে লইয়া গিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হইল। তারপর সকলে মিলিয়া গ্র্যানিট হাউসের জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলেন। বানরেরা কোন জিনিস নষ্ট করে নাই, শুধু উলোট্ পালট্ করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল। নেব্ স্টোভ জ্বালিয়া রান্না করিলে সকলে তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। আহারের সময় জাপও বাদ পড়িল না। পেনক্রফ্‌ট তাহার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিল। পায়ের বাঁধন আরো বশ মানিলে পরে খুলিয়া দেওয়া হইবে।

আহারের পর সাইরাস হার্ডিং সকলকে লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সর্বাপেক্ষা জরুরি কাজটি হইল, মার্সি নদীর উপরে একটা পোল বানান। এই কাজটি শেষ হইলে, নদীর অপর পারে দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে যাতায়াতের খুব সুবিধা হইবে। দ্বিতীয় জরুরি কাজটি হইল, মার্সি নদীর অপর পারে মুশ্‌মন এবং অন্য যে সব লোমওয়ালা জন্তু ধরা হইবে, তাহাদিগের থাকিবার জন্য একটি জায়গা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়া প্রস্তুত করা।

দ্বীপবাসিগণের পোষাকের ব্যবস্থা না করিলেই চলিবে না। উপরোক্ত দুইটি কাজ শেষ হইলেই পোষাকের ভাবনা দূর হয়। পোলটি প্রস্তুত হইবামাত্র, বেলুনটিকে গ্র্যানিট হাউসে আনিতে পারিলেই সাধারণ কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা হইবে। তারপর খোঁয়াড়ের লোমওয়ালা জন্তুর পশম দিয়া হইবে শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা।

হার্ডিংএর ইচ্ছা খোঁয়াড়টাকে রেড ক্রীকের উৎপত্তি স্থানের নিকটে কোথাও প্রস্তুত করা হয়। সেখানে প্রচুর ঘাস, জন্তুগুলির খাদ্যের কষ্ট হইবে না। প্রসপেক্ট হাইট হইতে সেখানে যাইবার একটা পথও হইয়াছে; ভবিষ্যতে সেখানে গাড়ি যাওয়া মুস্কিল হইবে না—হয় ত বা গাড়ি টানিবার উপযুক্ত কোন জন্তুও ধরিতে পারা যাইবে। পাখি রাখিবার স্থানটি গ্র্যানিট হাউসের নিকট হইলেই ভাল, নেব ইচ্ছা করিলেই রান্নার

সময়ে সহজে পাখি ধরিয়া আনিতে পারিবে। গ্র্যানিট হাউসে যাইবার পুরাতন পথটির মুখের কাছে, লেকের কিনারায়, সে স্থান প্রস্তুত করা ঠিক হইল।

পরদিন, ৩রা নভেম্বর, দ্বীপবাসিগণ হাতুড়ি বাটালি, কুড়াল, করাৎ প্রভৃতি যন্ত্রপাতি লইয়া মার্সি নদীর তীরে গেলেন; সর্বপ্রথমে পোল প্রস্তুত করিতে হইবে। যাইবার পূর্বে পেন্‌ক্রফ্‌ট বলিল—'আচ্ছা আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে মাস্টার জাপ যদি সিঁড়িটা উপরে টেনে তুলে ফেলে?

তখন হার্ডিংএর কথায় সিঁড়ির নিচের ধাপটা মাটিতে খোঁটা পুঁতিয়া তাহার সঙ্গে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

সকলে মার্সিনদীর বাঁ পাড় ধরিয়া নদীর একটা বাঁকের কাছে আসিলেন। এই স্থানটি পোল বানাইবার পক্ষে উপযুক্ত বোধ হইল। এখান হইতে বেলুন বন্দর প্রায় সাড়ে তিন মাইল। বেলুন বন্দর পর্যন্ত গাড়ি চলিবার উপযুক্ত পথ প্রস্তুত করা মুস্কিল হইবে না। এই পথ প্রস্তুত হইলে গ্র্যানিট হাউস্ হইতে দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে যাতায়াত করার খুবই সুবিধা হইবে।

গ্র্যানিট হাউস্, চিমনী, পাখির বাড়ি এবং চাষের জন্য উপত্যকার উপরের যে অংশটিকে ব্যবহার করা হইবে, এইসব স্থানগুলিকে জন্তুর উপদ্রব হইতে নিরাপদ করা দরকার। প্লেটোর তিনদিকেই নদী, ঝরনা প্রভৃতি কোন না কোন রকম জলের স্বাভাবিক বাধা আছে। প্লেটোর পশ্চিম ধারটি মার্সি নদীর একটি বাঁক এবং লেক গ্রাণ্টের দক্ষিণ বাঁকের মধ্যে। এই জায়গাটা প্রায় এক মাইল। এই পথে নূতন শত্রু প্লেটোতে আসিতে পারে।

এই পথটি বন্ধ করা খুবই সহজ—মার্সি নদী ও লেকগ্রাণ্টের মধ্যখানে চওড়া খাল কাটিয়া দিলেই পথটা বন্ধ হইয়া যাইবে।

হার্ডিং বলিলেন—'তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রসপেক্ট হাইট প্রায় একটা দ্বীপের মতই হলো। যাতায়াতের পথ হবে মার্সিনদীর পোলটা, পূর্বপ্রপাতের উপরে ও নিচে যে দুটি পোল বাসান হয়েছে সে দুটি এবং যে খাল কাটা হবে, তার উপরে যে পোল বানান হবে, সেই পোলটা। এখন এই পোলগুলিকে ইচ্ছামতন তুলে রাখার ব্যবস্থা করতে পারলেই আর প্রস্‌পেক্ট হাইটে কোন শত্রু আসতে পারবে না।'

যন্ত্রপাতির অভাব নাই, কাঠও যথেষ্ট আছে, তার উপর এঞ্জিনিয়ার স্বয়ং সাইরাস্ হার্ডিং। সকলে মিলিয়া পোল বানাইবার কাজে লাগিয়া গেলেন। আকাশ পরিষ্কার উজ্জ্বল—সকলে কার্যস্থলেই আহারাদি করিতেন, কেবল রাত্রে শুইতে যাইতেন গ্র্যানিট হাউসে।

মাস্টার জাপ ক্রমেই বশ মানিতেছে, সে তাহার নূতন মনিবদের কাজকর্ম সমস্তই খুব মনোযোগের সহিত দেখে—যেন সমস্তই বুঝিয়া লইবার ইচ্ছাটা তাহার মনে প্রবল। টপের সঙ্গে সব সময়েই খেলা করে, দুইজনে খুব ভাব হইয়াছে। যাহা হউক, তবু সাবধান থাকা ভাল, তাই পেন্‌ক্রফ্‌ট জাপকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিল না। প্লেটোতে আসিবার পথগুলি উত্তমরূপে বন্ধ করা হইলে পর তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

নভেম্বর মাসের ২০এ তারিখে পোলের কাজ শেষ হইল। পোলের মধ্যখানের প্রায় কুড়ি ফুট অংশটি ইচ্ছামত তুলিয়া ও নামাইয়া রাখা যায়। সুতরাং ওপারের জন্তু এপারে আসাটা আবশ্যক-মত একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারা যাইবে। এখন সকলের চিন্তা হইল যত শীঘ্র সম্ভব বেলুনের কেস্‌টি আনিয়া নিরাপদ স্থানে রাখা। এ কাজের জন্য বেলুন-বন্দরে গাড়ি লইয়া যাওয়া দরকার এবং গাড়ির জন্য, ঝোপজঙ্গল ভাঙ্গিয়া, একটা প্রশস্ত পথ করাও প্রয়োজন। এই কাজে অনেক সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে নেব্ ও পেন্‌ক্রফ্‌ট গিয়া

দেখিয়া আসিল যে সেই গহ্বরে বেলুনটা বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। সুতরাং স্থির হইল উপস্থিত প্রসপেক্ট্ হাইটের কাজকর্মই চলিতে থাকিবে।

প্রস্‌পেক্ট্ হাইটে জমি প্রস্তুতও করিতে হইবে, শাক্‌সব্‌জি এবং শস্য বপন করিবার জন্য। যথা সময়ে জমি প্রস্তুত হইল। জমির চারিদিকে মজবুত বেড়া দেওয়া হইল উঁচু এবং ডগা-চোঁখা কাঠ দিয়া। এই বেড়া পার হইয়া আসিয়া কোন জন্তু জমির শস্য নষ্ট করিতে পারিবে না। পাখির জন্য ব্যবস্থা হইল অন্যরূপ। পেন্‌ক্রফ্‌ট ক্ষেত্রের মধ্যে সুন্দর কাকতাড়ুয়া বানাইয়া দিল, এগুলি দেখিলেই পাখি ভয়ে পলায়ন করিবে।

২১এ নভেম্বর সাইরাস হার্ডিং মার্সিনদী এবং লেক গ্রাণ্টের মধ্যখানে খাল কাটিবার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। এখানের জমিতে উপরে ৩।৪ ফুট মাটি ও তার নিচে শক্ত গ্র্যানিট, সুতরাং ঐ স্থানের মাটি উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না।

হার্ডিং আবার নাইট্রোগ্লিসারিন প্রস্তুত করিলেন; তাহার সাহায্যে মাটি উড়াইয়া দিয়া, পনের দিনের মধ্যেই বারফুট চওড়া এবং ছয়ফুট গভীর খাল কাটা হইল। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি এই সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গেল। এখন প্রস্‌পেক্ট্ হাইটের চারিদিকেই জল, বাহিরের কোনরকম অত্যাচার উপদ্রবের আর কোন আশঙ্কা নাই।

ডিসেম্বর মাসে গরম পড়িল ভীষণ। এই গরমের মধ্যেও দ্বীপবাসিগণ কাজ বন্ধ করিলেন না। তাঁহারা পাখির বাড়ি প্রস্তুত করিবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য প্লেটো নিরাপদ করার সঙ্গে সঙ্গে জাপ তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াছে। স্বাধীনতা পাইয়া সে পলায়নের চেষ্টা করিল না, সে ইচ্ছাও তাহার দেখা গেল না। জাপ খুব বলবান, চটপটে, কিন্তু তবুও খুব শান্তশিষ্ট। ইতিমধ্যেই সে কাঠের বোঝা, পাথরের বোঝা বহিয়া আনিতে শিখিয়াছে।

পাখির বাড়িটি হইল গ্রাণ্ট লেকের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে। তাহার চারিদিকে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা। ভিন্ন ভিন্ন পাখির জন্য ডালপালার তৈরি ছোট ছোট ঘর, ঘরগুলির মধ্যে পার্টিশন দেওয়া! এই বাড়ির প্রথম অধিবাসী হইল দুইটি 'টিনামু' পাখি। অল্পদিনের মধ্যেই কতগুলি ছানা হইয়া ইহাদের পরিবার বৃদ্ধি পাইল। তারপর আসিল ছয়টি হাঁস, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া লেকের তীরে চরিয়া বেড়াইত। পেলিকান, মাছরাঙ্গা, জলমোরগ, ইহারা নিজেরাই পাখির বাড়ির নিকট আসিতে লাগিল। ক্রমে, দিনকতক ঝগড়া-ঝাঁটির পর, পাখির বাড়ির অধিবাসীদিগের সঙ্গে ভাব করিয়া, তাহারাও সেখানেই বাসা করিল।

সাইরাস্ হার্ডিং এক কোণে পায়রার খোপ বানাইয়া দিলেন। সেখানে প্রতিদিন দলেদলে পাহাড়ে কবুতর আসিতে লাগিল। পায়রাগুলি দিনের বেলায় চরিয়া বেড়াইত এবং রাত্রে এই নূতন বাড়িটিতে দল বাঁধিয়া চলিয়া আসিত। ক্রমে তাহারা ঠিক পোষা পায়রার মত হইয়া গেল।

এখন বেলুনের কেস্‌টিকে আনিয়া, তাহার কাপড় কাটিয়া সকলের জন্য পোষাক প্রস্তুত করিতে হইবে। টানা গাড়িটা ছিল বেজায় ভারি, সেটাকে অনেকটা হালকা করা হইল। গাড়ি টানিবার একটা ব্যবস্থা হইলে খুইই ভাল হয়। দ্বীপে ঘোড়া, গরু কিম্বা গাধা জাতীয় কোনও জন্তু পাওয়া গেলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু এসব জন্তু কি লিঙ্কন দ্বীপে আছে?

একদিন, সেটা ছিল ২৩ ডিসেম্বর, হঠাৎ শুনিতে পাওয়া গেল নেব্ এবং টপ্ দুইজনে চেঁচামেচি করিতেছে। তখন অন্য সকলে চিমনাতে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন যে সুন্দর এবং বড় সাইজের দুটি জন্তু, পোল খোলা পাইয়া প্লেটোতে আসিয়া ঢুকিয়াছে। জন্তু দুটি দেখিতে ঘোড়ার মতও বটে, আবার

কতকটা গাধারও মত। ভারি সুন্দর, ধূসর রঙ, পা গুলি এবং লেজটা সাদা, মাথায় ও গলায় কাল কাল ডোরা। বেশ নিশ্চিন্তভাবে তাহারা আসিতে লাগিল, মানুষ দেখিয়া একটুও ভয় পাইল না।

জন্তুগুলিকে দেখিয়া হারবার্ট বলিল—'এ যে ওনাগা।'

জেব্রা এবং কোনাগার মিশ্রণ।

নেব্ বলিল—'তার চাইতে বল না কেন গাধা।'

'গাধার মত লম্বা কান নাই যে এগুলির। আর দেখছ না, এদের গড়ন গাধার চেয়ে কত সুন্দর।'

পেন্‌ক্রফট বলিল—'গাধাই বল ঘোড়াই বল, এগুলি যেমন করে হোক ধরতেই হবে।'

এই বলিয়া পেনক্রফট ঘাসের মধ্য দিয়া গুঁড়ি মারিয়া ক্রীক্ গ্লিসারিনের দিকে চলিল, যেখানে খালটি কাটা হইয়াছে তাহার পোলটির দিকে। এই পোল খোলা পাইয়াই জন্তু ছুটি প্লেটোতে ঢুকিয়াছিল। পেন্‌ক্রফট চুপি চুপি গিয়া পোল বন্ধ করিয়া দিল। আর কোথায় যাইবে? ওনাগা ছুটি প্লেটোতে আটকা পড়িয়া গেল।

এখন প্রশ্ন হইল, জন্তু ছুটিকে তাড়াহুড়ো করিয়া ধরিয়া, জবরদস্তি করিয়া পোষ মানানটা কি উচিত হইবে? কখনই নয়। স্থির হইল, প্লেটোতে ঘাসের অভাব নাই, দিন কয়েক স্বাধীনভাবে চরিয়া বেড়াইয়া জন্তু ছুটির ভয় ভাঙ্গিয়া যাউক। হার্ডিং পাখির বাড়ির নিকটেই একটা আস্তাবল বানাইয়া দিলেন, সেটার মধ্যে খাদ্য রাখিয়া দেওয়া হইল।

ওনাগা ছুটি নিশ্চিন্ত ভাবে চরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ তাহাদিগের নিকট যাইতেন না, পাছে ভয় পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে তাহাদের পলায়নের ইচ্ছা দেখা যাইত। উন্মুক্ত বনে, অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া যাহাদের থাকিবার অভ্যাস, প্লেটোতে হাজার সুখে থাকিলেও তাহাদের তৃপ্তি হইবে কেন? চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিত জায়গাটি জলে ঘেরা, কোন দিকে পলায়ন করিবার পথ নাই। তখন ডাকাডাকি করিয়া ঘাসের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইত এবং মধ্যে মধ্যে একদৃষ্টে বনের দিকে চাহিয়া থাকিত।

এদিকে পেন্‌ক্রফট গাছের ছালের দড়ি পাকাইয়া ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম যথাসম্ভব প্রস্তুত করিল। বেলুন বন্দর পর্যন্ত রাস্তাও তৈরী হইল। পেন্‌ক্রফ্‌ট নানারকমে তোয়াজ করিয়া ক্রমে জন্তু দুইটিকে অনেকটা বাধ্য করিল; তাহার হাত হইতে খাবার খাইত। কিন্তু, তবু তাহাদিগকে গাড়িতে জুতিবার প্রথম চেষ্টা পণ্ড হইয়া গেল। গাড়িতে জুতিবামাত্র সে যা হুড়াহুড়ি লাফালাফি! যাহা হউক, অবশেষে তাহারা বশ মানিল।

একদিন পেন্‌ক্রফ্‌ট ওনাগা জুতিয়া গাড়ি লইয়া আসিয়া উপস্থিত। তখন সকলে বেলুন বন্দরে রওয়ানা হইলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট গাড়িতে চড়িল না। ওনাগা ছুটির মাথার কাছে কাছে থাকিয়া, হাঁটিয়া চলিল।

পথে দারুণ ঝাঁকানি ভিন্ন আর কোন অসুবিধা হইল না। পথটা ত আর স্টিম রোলার দিয়া প্রস্তুত নয়। পাথুরে পথ, ঝাঁকুনি ত হইবেই! যাহা হউক, বেলুনের আবরণটি বোঝাই করিয়া লইয়া, রাত্রি আটটার সময়ে, ওনাগা-টানা গাড়ি নিরাপদে গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিল। ক্রমশঃ

মেক্সিকো দেশের রূপকথা।

মেক্সিকো দেশের বন-বাদাড়ে থাকে সেই ক্ষুদে ডুয়েণ্ডেরা। সবাই তাদের দেখতে পায়না, কারণ সবাই তো বিশ্বাস করে না যে সত্যিই তারা আছে; যারা বিশ্বাস করে, শুধু তারাই তাদের দেখতে পায়। সব দেশেই তারা থাকে, একেক দেশে একেক নাম তাদের, কিন্তু আকৃতি প্রকৃতি তাদের সব জায়গাতেই একই রকম—মাথায় চূড়োওয়ালা রঙ্গিন টুপী, মাত্র একফুট লম্বা, দাড়িওয়ালা ক্ষুদে বুড়ো—স্বভাবটি কিন্তু মোটেই বুড়োটে নয়, ছোট ছেলেদের মতই চঞ্চল আর দুষ্টুমী ভরা; মিছিমিছি মানুষকে নাকাল করে ভারি আমোদ পায় তারা! মেক্সিকোদেশে তাদের নাম, 'ডুয়েণ্ডে।'

কুয়াউট্‌লা শহরের কাছে, সুন্দর একটা ঝোপ্‌বনের মধ্যে থাকতো ডুয়েণ্ডে ডোনেটো, আর তার বারোটি ভাই। চুপিচুপি শহরে ঢুকে, নানারকম উৎপাত করতো তারা—মুরগী-ঘরের দরজা খুলে মুরগীগুলোকে ছেড়ে দিত, নিভানো বাতিগুলো জ্বেলে দিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিত, বই-খাতা লুকিয়ে রেখে ইস্কুলে যাবার দেরী করে দিত। আবার মঝে মাঝে ভাল কাজ করে, তারা লোকের উপকারও করত।

একদিন ডোনেটো তার ভাইদের সঙ্গে জঙ্গলে খেলা করছে, হঠাৎ যেন কান্নার শব্দ শুনতে পেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে, গাছতলায় ঘাসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে, ফুলে-ফুলে ফুঁপিয়ে-

ফুঁপিয়ে কাঁদছে, ছোট্ট একটি ছেলে। ছুটে তার কাছে গিয়ে ডোনেটো বলল 'আরে, হ'ল কী? হ'ল কী? এত কান্না কিসের?'

ছেলেটি উঠে বসে, চোখ মুছে চারদিকে তাকিয়ে, জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি? কোথায় তুমি?'

'এই যে আমি! আমার নাম ডোনেটো—তোমার নাম লোরেঞ্জো, না?'

তখন লোরেঞ্জো দেখতে পেল যে তার সামনেই একটা পাথরের উপরে বসে হাসছে একটা ক্ষুদে বুড়ো! সে অবাক হয়ে বল্‌ল, 'ওমা! তুমি বুঝি ডুয়েণ্ডে?'

'ঠিক বলেছো! এখন বল দেখি, অমন করে কাঁদছিলে কিসের জন্যে? কান্না শুনতে আমার ভারি বিশ্রী লাগে—তার চেয়ে হাসি তো ঢের ভাল।'

লোরেঞ্জো বলল, 'আমি আমার মায়ের জন্য কাঁদছিলাম,—মা আমাকে একটুও ভালবাসে না; অন্য ছেলেদের মায়েরা তাদের কত ভালবাসে—' বল্‌তে বল্‌তে আবার তার কান্না এসে গেল!

'রসো, রসো, তোমার মায়ের নাম 'স্যারিটা,' না? আর বাবার নাম তো 'জুয়ান্'?'

'কি করে জানলে?'

'আরে, আমরা সব জানি, সবাইয়ের খবর রাখি—একশ' বছর ধরে এই শহরের পাশেই রয়েছি তো? তা' তোমার মা'টি হচ্ছে বেজায় কুঁড়ে মানুষ, ছেলেবেলা থেকেই ঐ রকম! কিন্তু, আমার তো বিশ্বাস ছিল যে সে তার ছেলেকে খুব ভালবাসে। তুমি কী করে বুঝলে যে মা তোমাকে ভালবাসে না? তোমাকে মা মারে? মিছিমিছি বকে?'

'ন্-না, তা নয়, তবে এই দেখনা—আমার জামাকাপড় কীরকম ছেঁড়া, ময়লা—স্কুলে গেলে ছেলেরা আমাকে ঠাট্টা করে; তাদের মায়েরা কেমন তাদের ছেঁড়া জামা সেলাই করে, কেচে পরিষ্কার করে দেয়! তাছাড়া, স্কুল থেকে ফিরে প্রায়ই দেখি যে মা রান্না চড়াতে ভুলেই গিয়েছে! শুখ্‌নো টর্টিলা (মোটা হাতরুটি) খেয়ে থাকতে হয়; কিম্বা, রান্না শেষ হ'তে অনেক রাত হয়ে যায়, সকালে উঠতে দেরী হয়ে যায়, পড়া শেখা হয়না—টিচারের কাছে বকুনী খেতে হয়।'

'হুঁম্‌ম্! আর কী করে তোমার মা?'

'মা কখনো ঘরদোর ঝাঁট্-পাট্ করে না। বাড়ি এমন নোংরা হয়ে থাকে যে অন্য ছেলেরা এলে, আমার লজ্জা করে—তাদের বাড়ি ঘর কেমন পরিষ্কার, আর গোছানো!'

'হুঁম্‌ম্‌ম্! আর কী করে তোমার মা?'

'সন্ধ্যার সময় কাজ থেকে ফিরে বাবা যখন দেখে যে রান্না চড়েনি, ঘরদোর নোংরা, তখন মাঝে মাঝে বাবা রেগে যায়—মা'র সঙ্গে ঝগড়া হয়—তখন আমার এমন কান্না পায়!'

'হু্ ম্-ম্-ম্! হুঁ-ম্ ম্-ম্!!' বলে, ডোনেটো গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। তারপর, এমনি হাসতে আরম্ভ করল যে, তার সেই বারোটি ভাই চারদিক থেকে ছুটে এল—সবাই মিলে, হা-হা-হা-হা, হো-হো-হো-হো, হি-হি-হি-হি, হেসেই কুটিপাটি! দেখাদেখি লোরেঞ্জোও হোহো করে হেসে উঠল।

ডোনেটো বলল, 'দেখ লোরেঞ্জো, তোমার মায়ের আর কিচ্ছু দোষ নাই, শুধু তার কুঁড়ে স্বভাবটিই

যত নষ্টের গোড়া ঐ কুঁড়েমির জন্যই তোমাদের যত কষ্ট! তা কী বল ভাইসব, লোরেঞ্জোকে তার মনের মতন খুব ভাল একটি নতুন মা এনে দেব নাকি?'

লোরেঞ্জো ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না-না আমার মা খুব ভাল, মাকে আমি খু-উব ভালবাসি! নতুন মা আমি চাই না—আমি শুধু চাই যে মাও আমাকে খুব ভালবাসুক, অন্য ছেলেদের মায়েদের মতন আমাকে যত্ন করুক, আমার ছেড়া প্যাণ্ট সেলাই করে, কেচে দিক্।'

'আচ্ছা, তাহলে ওর মায়ের কুঁড়েমি রোগেরই চিকিৎসা করা যাক্; কী বল, ভাইসব?'

অমনি সেই এক ডজন্ ডুয়েণ্ডে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁ-হাঁ, সে খুব ভাল হবে। ভা-রি মজা হবে।'

'তাহলে লোরেঞ্জো, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যাও, আমরা সব ঠিক্‌ঠাক্ করে দিচ্ছি; কিন্তু দোহাই তোমার, অমন কান্না আর কেঁদো না! লক্ষীছেলেদের কান্না আমরা মোটেই সইতে পারি না।'

'কী করে জানলে, যে আমি লক্ষী ছেলে?'

'বা-রে-বাঃ! লক্ষী নাহলে কী আর আমাদের কেউ দেখতে পায়?' বলে, আবার তারা হাসতে আরম্ভ করল, গাছে গাছে সে হাসির প্রতিধ্বনি উঠে, ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে, কাঁপতে কাঁপতে, হাওয়ার শব্দের সঙ্গে মিশে গেল—তারা নিজেরাও হঠাৎ হাওয়া হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল!

পরদিন সকালে চোখ মেলে লোরেঞ্জো দেখল, সেই নোংরা ঘর বাড়ি, তেমনিই অগোছালো জিনিসপত্র! ডুয়েণ্ডেদের কথা তার মনে পড়ল, ভাবল যে 'হয়তো স্বপ্ন দেখেছিলাম।' বিছানা ছেড়ে উঠে, সে তার ছেঁড়া প্যাণ্টটা পরল—দুটো প্যাণ্টের মধ্যে এটা তবু পরা যায়, অন্যটার তো পিছন-দিক্‌টা খাবলা হয়ে উড়েই গিয়েছে—পরাই যায় না!

রান্নাঘর থেকে ঘটর ঘটর বাসন নাড়ার শব্দ আসছে, তার বাবা কফি তৈরী করছে; বাবাকে সে জিজ্ঞাসা করল 'কাল আমি ডুয়েণ্ডের স্বপ্ন দেখেছি, হ্যাঁ বাবা, ডুয়েণ্ডে কি সত্যিই আছে?'

'না বাবা, ওসব বানানো গল্প—লোকের কল্পনা। তবে, সত্যিই থাকলে কিন্তু মন্দ হ'ত না, দুয়েকটা ডুয়েণ্ডেকে ধরে এনে কিছু কাজ করিয়ে নেওয়া যেত—ঘরদোর যা নোংরা হয়েছে! এখন যাও তো বাবা, রুটিওয়ালার দোকান থেকে কয়েকটা 'বান্' (ছোট ছোট মিষ্টি রুটি) নিয়ে এসো তো—ঘরে কিছু নেই যে কফির সঙ্গে খাব।'

হঠাৎ লোরেঞ্জোর মনে হল, জানালার সামনে দিয়ে যেন একসারি সবুজ টুপীর ডগা ছুটে গেল! সে ভাবল, 'ও কিছু নয়, রাত্রে ডুয়েণ্ডের স্বপ্ন দেখেছি কিনা, তাই অমন চোখের ভুল হয়েছে।' বাবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সে চলে গেল রুটিওয়ালার দোকানে।

এদিকে ডোনেটো তার বারোভাইকে নিয়ে স্যারিটার ঘরে ঢুকে কী কাণ্ডই না বাধিয়ে দিয়েছে—! বেচারা দিব্য আরামে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, ফস্ করে ডোনেটো তার লেপটা টেনে নিল, তার দুই ভাই কাতুকুতু দিয়ে স্যারিটার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল, অন্য দু'ভাই দুইপা ধরে তাকে খাট থেকে নামিয়ে দিল,

আরও দুজনে, সেই দুই পায়ে দুপাটি চটি পরিয়ে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে, হাই তুলে, চোখ রগড়িয়ে, গা মোড়ামুড়ি দিয়ে আবার স্যারিটা বসতে যাচ্ছিল- কিন্তু ডোনেটো তার পিঠে এমন এক ঠেলা মারল যে ঘুমের ঘোর তার একেবারে ছুটে গেল। স্যারিটা তো আর ভুয়েণ্ডেদের দেখতে পাচ্ছে না, সে ভাবল, 'বারে! কোনোদিন সকালে উঠতেই পারি না, আজ কেমন চট করে ঘুম ভেঙ্গে গেল! যাক্, উঠেই যখন পড়েছি, দেখি গিয়ে, এতক্ষণে বোধহয় জুয়ান্ কফি তৈরী করেছে—একপেয়ালা গরম কফি খেয়ে নিয়ে, আবার এক ঘুম দেওয়া যাবে!'

রাত্রে পরবার ঝোল্লা পোষাকটার উপরেই একটা শাল জড়িয়ে নিয়ে, উস্কোখুস্কো চুলে, সে ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল, ডোনেটো আল্না থেকে নতুন গাউনটা নিয়ে তার একহাতে ধরিয়ে দিল আরেক ভাই চিরুণীটা এনে তার অন্য হাতে গুঁজে দিল—কলের পুতুলের মতই স্যারিটা কাপড় ছেড়ে, চুল আঁচড়িয়ে পরিষ্কার হয়ে, কফি খেতে গেল। রান্নাঘরে ঢুকতেই, ডোনেটো তার একহাতে ফ্রাইপ্যান্‌টা ধরিয়ে দিল, অন্যভাই আরেক হাতে ডিমের টুক্‌রীটা দিল। জুয়ান তাকে দেখে মহাখুশি হয়ে বল্‌ল 'আজ তো খুব শিগ্‌গীর উঠে পড়েছ! ও, ডিমের অম্‌লেট্ করবে বুঝি? বাঃ-বাঃ খাসা হবে!' স্যারিটা তো বুঝতেই পারছে না, কী করে কী হচ্ছে, তবু জুয়ানের উৎসাহ দেখে, সে আর কিছু না বলে অম্‌লেট্ বানাতে বসে গেল।

লোরেঞ্জো গরম বান্ নিয়ে এসে দেখল, যে তার বাবা মা হাসিমুখে খাবার টেবলে বসে আছে—মা একেবারে ফিট্‌ফাট্ পরিষ্কার—আর, ডিম ভাজার সুগন্ধে রান্নাঘরটা ভুর্‌ভুর্ করছে! খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে, লোরেঞ্জো স্কুলে চলে গেল, জুয়ান্ কাজে চলে গেল, আর স্যারিটা এঁটো বাসনগুলো কলতলায় রেখে, ভাবল 'এবার একটু আরামে বসা যাক্—ওগুলো পরে ধুলেই হবে।' তখুনি দুষ্টু ডোনেটো করল কী, টুক্ করে কলটা খুলে দিল—ঝর্‌ঝর্ করে জলপড়ার শব্দ শুনে, স্যারিটা যেই কল বন্ধ করতে ছুটে এল, অমনি সে তার হাতে বাসনধোওয়া ন্যাতাটা আর সাবানটা দিয়ে দিল—স্যারিটাও কী হ'ল বুঝতে না পেরেই বাসন ক'টা ধুয়ে ফেলল।

তারপর ঘরে গিয়ে, একটা গল্পের বই নিয়ে যেই না সে আরাম-চেয়ারে বসতে যাবে, অমনি এক ভাই চেয়ারটাকে উল্টে দিল আর ডোনেটো কুশন্‌টাকে তুলে স্যারিটার মুখের উপরেই ঝেড়ে দিল। সাতজন্মে তো ঝাড়া হয় না, যত ধুলো গিয়ে স্যারিটার নাক মুখে ঢুকল, হাঁচ্‌তে হাঁচ্‌তে সে বলল, 'মাগো! এত ধুলো জমেছে, কিছুই টের পাইনি! কিন্তু, অমন ভারি চেয়ারটা হঠাৎ এমন উল্টে গেল কী করে?' চেয়ারটাকে সোজা করে, কুশনটাকে ঝেড়ে পেতে, সে বই নিয়ে আবার বসতে যাবে, কিন্তু, এ কী! তার হাতে তো বই নেই, রয়েছে ঝাঁটাটা!

'যাক্, ভুলে যখন ঝাঁটাটা হাতে নিয়েছি, তখন ঝাঁট্ দেওয়া সেরেই ফেলি!' বলে, স্যারিটা ঝাঁট দিতে আরম্ভ করল। ততক্ষণে কাজের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে, সারা বাড়িটা সে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করল। তারপর ঝাঁটা রাখতে গিয়ে, সে দেখল যে রান্নাঘরে একটা পালক ছাড়ানো মুরগী রাখা আছে। 'ও মা, কখন আবার মুরগীটা কাট্‌লাম? এই যে কেট্‌লীতে গরমজল চড়ান রয়েছে,

আলুও রয়েছে একটুক্‌রী, রাতের রান্নাটা তাহলে চড়িয়েই দিই,' বলে সে আলু ছাড়াতে বসল।

ঘরদোর পরিষ্কার করে, রান্না সেরে, স্যারিটার মনটা ভারি খুশি হয়ে গেল—ভাবল, 'সারা সকাল কত কাজই করলাম, এবার বসে বইটা শেষ করা যাক্।' বসতে গিয়ে দেখে, তার হাতে রয়েছে বইয়ের বদলে সেলাইয়ের বাস্কেট আর কোলের উপরে রয়েছে, লোরেঞ্জোর সেই ছেঁড়া প্যান্ট্‌টা! 'মাগো, প্যান্ট্‌টা যে একেবারেই গিয়েছে! কবে থেকে ভাবছি সেলাই করি, তা আর হয়েই ওঠেনা?' বলে, সে প্যান্টে তালি লাগাতে বসে গেল—মনটা তার আজ এত ভাল লাগছে যে, সেলাই করতে করতে সে গুন্‌ গুন্‌ গান জুড়ে দিল।

বিকাল বেলায় লোরেঞ্জো যখন স্কুল থেকে ফিরল, সন্ধ্যার সময় জুয়ান্‌ যখন কাজ থেকে ফিরল, তারা দেখল যে বাড়িঘর পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্‌ করছে, আর রান্না যা হয়েছে, একেবারে চমৎকার। লোরেঞ্জো দেখল, তার ছেঁড়া প্যান্টটা মেরামত হয়ে আলনাতে ঝুলছে।

জুয়ান খুশি হয়ে বল্‌ল, 'আজ সারাদিন কত কাজ করেছ, স্যারিটা! আজ কেউ অতিথি আসছে নাকি?' 'কই, না তো? আজ কেমন ইচ্ছা হ'ল, তাই এসব করে ফেল্লাম' হেসে বলল স্যারিটা।

পরদিন শনিবার, লোরেঞ্জোর স্কুল ছুটি; স্যারিটা ভাবল, 'কাল সারাদিন তো কাজ করলাম, আজ আর কিচ্ছু করব না—অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোব।' কিন্তু ভোর না হতেই সেই ডুয়েণ্ডের দল এসে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল! উঠে পরিষ্কার হয়ে স্যারিটা খাবার তৈরি করল, তিনজনে বেশ হাসিগল্প করে সেই খাবার খেল। লোরেঞ্জো মনে মনে বল্‌ল, 'এম্নিই যেন রোজ হয়, ঝগড়াঝাঁটি আর যেন কোনও দিন না হয়!'

এঁটো বাসনগুলো কলতলায় রেখে, স্যারিটা লোরেঞ্জোর হাতে পয়সা দিয়ে বলল, 'আমি একটু বারান্দায় বসে বিশ্রাম করি, এক্ষুনি রাস্তা দিয়ে বিস্কুটওয়ালা হেঁকে যাবে, তুমি তার কাছ থেকে সেই কুর্‌কুরে মিষ্টি বিস্কুট কিনে বারান্দায় নিয়ে এসো—দুজনে মিলে খাবো।' লোরেঞ্জো বিস্কুট কিনে এনে দেখল, তার মা তো বারান্দায় নাই—কলতলায় বাসন ধুচ্ছে! বাসন ধোওয়া সেরে, বারান্দায় এসে স্যারিটা টেবলে রাখা বিস্কুটের দিকে হাত বাড়ালো—কিন্তু হাতে বিস্কুট না তুলে, তুল্‌ল ঝাড়নখানা—বলল, 'ঝাড়পোঁছটা সেরেই, বিস্কুট খাব।' ঝাড়পোঁছ সেরে, মা বলল 'ঝাড়নটা রেখেই, আসছি,' কিন্তু ঝাড়ন রাখতেই, ঝাঁটাটা যেন আপনা হতে তার হাতে উঠে এল,

লোরেঞ্জো অবাক হয়ে বলল, 'আবার ঝাঁটা হাতে নিলে কেন মা? বিস্কুট খাবে না?'

'শোন ছেলের কথা! ঝাঁটা আবার কেন হাতে নেয় লোকে? ঘর ঝাঁট দিতে হবে না?'

ঝাঁট দেওয়া শেষ করে, ঝাঁটাটা ঘরের কোনে রাখতে গিয়েই স্যারিটা দেখল, তাদের তিনজনের যত ময়লা কাপড় সব এক টব্‌ ভর্তি সাবান জলে ভিজানো রয়েছে! লোরেঞ্জো অবাক হয়ে বলল 'এগুলো আবার কী?' 'কী আবার! একগাদা কাপড় ময়লা হয়ে রয়েছে, সেগুলো কাচ্‌তে হবে না?' বলেই দমাদ্দম্‌ কাপড়গুলো পিটে, ঝপাঝপ্‌ কলের জলে ধুয়ে, চট্‌পট্‌ সেগুলোকে নিংড়িয়ে, দড়িতে টাঙ্গিয়ে দিল স্যারিটা।

অবাক হয়ে লোরেঞ্জো সব চেয়ে দেখছে, আর ভাবছে, 'মায়ের আজ হ'ল কী! আচ্ছা, মা যখন এত কাজই করছে, তখন তো—' হঠাৎ ছুটে গিয়ে সে তার অন্য প্যাণ্টটা নিয়ে এল। মা তখন সবে কাজ সেরে চেয়ারে বসেছে, তার হাতে প্যাণ্ট্‌টা দিয়ে, সে বলল 'মা, আমার অমন ছেঁড়া প্যাণ্টটা তুমি কী সুন্দর মেরামত করে দিয়েছ, এটাও একটু সেলাই করে দেও না? এটা বেশী ছেঁড়েনি এই এখানে একটু—' বলতে না বলতেই, তাকের উপর থেকে সেলাইয়ের বাস্কেট্‌টা টুক্ করে মা'র কোলে এসে গেল; মা তো অবাক্!

লোরেঞ্জো কিন্তু ব্যাপার সবই বুঝতে পারল, কারণ, সে এবার নিজের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেল যে, ডোনেটো তাক থেকে বাক্সটা পেড়ে, মায়ের কোলে রেখে দিল, তারপর মায়ের চেয়ারের পিঠের উপর চড়ে বসে তার দিকে চোখ টিপে হাসল। মা ও হেসে ব'লল, 'কী মজার কাণ্ড দেখ! সবে আমি ভাবছিলাম তোমারও প্যাণ্টটাও সেলাই করে দিই, অমনি তুমি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই, প্যাণ্ট এনে হাজির করলে! ভারি মজা তো?'

লোরেঞ্জো বসে বিস্কুট খাচ্ছে; আর মায়ের দিকে চেয়ে দেখছে—মা সেলাই করতে করতেই মাঝে মাঝে বিস্কুট নিয়ে খাচ্ছে আর মায়ের মাথার কাছে, চেয়ারের পিঠে বসে ডোনেটো তার কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে—এত আস্তে আস্তে বলছে, যে, মা ভাবছে ওগুলো বুঝি তার নিজেরই মনের কথা—

'লোরেঞ্জো ভারি লক্ষী ছেলে!'

'এমন ভাল আর সুন্দর ছেলে আর কারো নেই!'

'কিন্তু, ওর কাপড়চোপড় একেবারে ছেঁড়া আর ময়লা হয়ে রয়েছে!'

'ঘরদোর পরিষ্কার করা হয়েছে, কিন্তু ছেলেকে পরিষ্কার করা হয়নি—ওকে আরো ভাল করে যত্ন করা উচিত।'

হঠাৎ কী ভেবে ম্যারিটা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল, ছোটমেয়ের মত আহ্লাদে নেচে উঠে বল্‌ল—'লোরেঞ্জো, ছুট্টে যাও তো, এই পাঁচটা টাকা দিয়ে, দোকান থেকে সেই সুন্দর নীল কাপড়টা দু'গজ কিনে আনতো—তোমাকে একটা নতুন পোষাক তৈরি করে দিই! তোমার বাবা বলেছেন আজ রাত্রে আমাদের মেলা দেখতে নিয়ে যাবেন, সারাদিনে তোমার জন্য নতুন জামা সেলাই করে ফেলতে পারবো!'

লাফিয়ে উঠে লোরেঞ্জো তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে, দুই গালে দুটো চুমো খেল, তারপর ফিস্ ফিস্ করে ডোনেটোকে বলল, 'থ্যাঙ্ক্ ইউ!' ডোনেটো চোখ পিট্‌পিট্ করে মুচ্‌কি হেসে টুপ করে চেয়ার থেকে টেবলে লাফিয়ে পড়ল; তাড়াতাড়ি দুহাতে দুমুঠো বিস্কুট তুলে নিয়ে, সে জানালা দিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেল—এক নিমেষের জন্য জানালার সামনে একসারি সবুজ টুপী দেখা দিয়েই কোথায় মিলিয়ে গেল, ঠিক যেন এক ঝাঁক্ সবুজ পাখি উড়ে গেল!

মাকে লোরেঞ্জো জিজ্ঞাসা করল, 'মা, তোমার কী মনে হয়, ডুয়েণ্ডে সত্যিই আছে?'

'ডুয়েণ্ডে ? নারে পাগ্‌লা, ও সব কথা ভাববারই সময় নেই আমার কত কাজ পড়ে রয়েছে এখন ও—রান্না বান্না, ঘর গোছানো, কত কী—'

'আমার কিন্তু মনে হয় মা, ওরা সত্যিই আছে !'

'হ্যাঁ, ছোট ছেলেরা তাই মনে করে ! বড়দের কত কাজ, তাদের কি ওসব ভাববার সময় আছে ? এখন দৌড়ে যাও বাবা, খুব চট্‌ করে দোকান থেকে কাপড়টা কিনে আনো দেখি—নাহ'লে, সেলাই করে উঠবার সময় পাব না !'

টাকা নিয়ে, লোরেঞ্জো আহ্লাদে নাচতে নাচ্‌তে তাদের সেই চেনা দোকানে চল্‌ল—মা ও জানে না বাবা ও জানে না, শুধু লোরেঞ্জোই সেই আশ্চর্য গোপন কথাটি জানে, যে, ডুয়েণ্ডেরা সত্যিসত্যিই আছে !

উমা দেবী

ঐ ছেলেটি একটুখানি বাজিয়ে নিচ্ছে বাঁশী
চুলগুলি তার এলোমেলো মুখটি হাসি হাসি।
দোকানগুলি সারে সারে
মেলা আছে পথের ধারে
'দো-দো আনা'-র হরেক রকম নানান-রঙা মাল,
ছেলেরা সব খুশিতে বানচাল—
কেউ বা ছুটে যাচ্ছে বাড়ি,
পয়সা আনতে তাড়াতাড়ি—
কেউ বা বলে—'ত্ব-পয়সাতে কোনটা হবে বলো ?'-
হাতগুলি সব সামনে মেলা কালো এবং ধলো।

এরি মধ্যে ঐ ছেলেটা বেজায় খুশি-খুশি
ছোট্টবোনের কথা ভেবে ভাবছে নেবে চুষি—
খালি হাতে যায় কি কেনা—
—'এই সরে যা—জায়গা দেনা'—
এগিয়ে এসে সামনে বসে চাটুজ্জেদের কাশী।
উঠলো না সে—সরে গিয়ে
কালো-কোলো হাত বাড়িয়ে
তুলে নিল প্ল্যাসৃটিকের এক টুকটুকে লাল বাঁশী।
গোলেমালে এই ফাঁকে সে
ভয়ে ভয়ে একটু হেসে
বাজিয়ে নিচ্ছে মনের সাধে মুখটি হাসি-হাসি।

বাজিয়ে নিল বাঁশী—
মনের ভিতর কান্না রেখে মুখটি হাসি-হাসি।

কিনতে ওতো চায়না কিছু—
গরীব ওরা—বেজায় নিচু,
গেঞ্জি ছেঁড়া—রঙ-চটা এক প্যাণ্ট রয়েছে পরে—
ও শুধু চায় সব কিছুকেই দেখতে দু'চোখ ভরে।
একটু শুধু ছোঁবে হাতে—
সেই জানে ওর কি সুখ তাতে!
রাত্রি হ'লে ছেঁড়া কাঁথায় স্বপ্ন দেখে শুয়ে
রাশি রাশি শাদা তারার ফুল ঝরেছে ভুঁয়ে

বাজিয়ে নেবে বাঁশী—
যারা কিছুই চায়না এবং পায়না তবু মুখটি হাসি-হাসি।
ওদের জন্যে থরে থরে
ভোজ্য রবে ঘরে ঘরে—
জ্বলবে আলো—রইবে না আর কেউতো উপবাসী।
মনের আলো উঠবে জ্বলে—রইবে না কেউ স্নেহের উপবাসী।
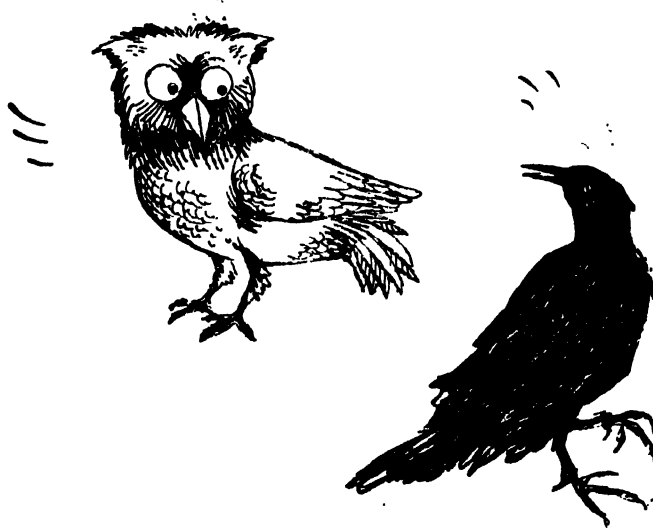
গৌরী চৌধুরী

দমনক বলল—শোননি সেই কাকের কেউটে মারার গল্প ?

করটক বললে—কই, শুনিনি তো ?

দমনক বলতে আরম্ভ করল—

এক বটগাছের পাশের দিকের নিরিবিলি ডালে ছিল একজোড়া কাকের বাসা। আর গাছের লায় এক সরু লম্বা কোটরে থাকত এক কেউটে। কাক-বৌ যতবার ডিম পাড়ে, ততবারই কেউটে সে ডিমগুলি চেঁচেমুছে খেয়ে চলে যায়। কাক-বৌ কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়ল, কাক রাগে ফুলতে াগল, কিন্তু কেউটের কাছে কি করবে তারা ?

সেবার শীতের শেষে আবার যখন ডিম পাড়বার সময় হল, তখন কাক-বৌ বললে—চল, অন্য কাথাও যাই। কাক বললে—তা না হয় গেলুম। কিন্তু কেউটেটাকে কোন শাস্তি না দিয়েই চলে াব ? তা হবে না। চল, শেয়ালবন্ধুর কাছে যাই। সে নিশ্চয় কোন একটা উপায় বাৎলে দেবে।

বৌ বললে—বেশ বলেছ। একথাটা এ্যাদ্দিন মনে হয় নি কেন বল তো ?

দুজনে মিলে তক্ষুণি উড়ে গেল দুশ গজ দূরে কন্ধকাটার মাঠে কাঁকালিতলায় শেয়ালের বাড়ি। শয়াল বাড়ি ছিল না। ফিরে এসে বন্ধু পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললে—কি ব্যাপার ? কতক্ষণ ? ছলেমেয়েরা সব কই ?

শুনে কাক-বৌয়ের চোখ জলে ভরে গেল। ধরা গলার কাক বললে—ডিম ফুটে বেরোবারই সব ময় পেল না। কোত্থেকে আর—

শেয়াল বললে—বল কি ? ঠিকমত তা পড়ে নি, নাকি—

কাক বললে—সে সব কিছু নয়। বাড়ির তলায় থাকে সাক্ষাৎ যম। ডিম হবার দু-তিনদিনের ধ্যেই সব শেষ করে দেয়। সেই জন্যেই তোমার কাছে আসা। বল তো ভাই, কি করা যায় ?

শেয়াল বললে—বটে, জিভ একেবারে সক্‌সক্‌ করছে। আর বেশি দেরী নেই, ওর হয়ে এসেছে। ঠিক সেই বকটার মত দশা হবে ওর, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

কাক আর কাক-বৌ একসঙ্গে বলে উঠল—বকের আবার কি হয়েছিল, বল না ভাই, শুনেও আনন্দ।

শেয়াল বলল—তোমাদের বলব না তো বলব কাকে? শোন তাহলে—

উমনো গাঁয়ের পারে ঝুমনো বটের ধারে এক প্রকাণ্ড ঝিল। দিনের বেলা সূর্যের আলোয় ঝিলের জল তরোয়ালের ফলার মত চক্‌চক্‌ করে, রাত্তিরেতে চাঁদের আলোয় সোনার শাড়ির মত ঝলমল করে। সেই ঝিলে থাকে সাপ ব্যাঙ্‌, শুশুক শামুক, তিনশো কাঁকড়া, চাকা চাঁদা লাল নীল মিশমিশে বাঘা সঙ্গীন-ওলা আলো-জ্বলা হাজার হাজার মাছ, আর সবচেয়ে তলায় ঝুপসি গাছের ঝোপে একজোড়া ধব্‌ধবে সাদা শঙ্খ আর শঙ্খিনী।

ঝিলের দক্ষিণ পাড়ে একটু এগিয়ে কুসুম গাছের ডালে এক বকের বাসা। হাড় প্যাঁটপ্যাঁট রোগে বছরখানেক আগে বকের বৌ অক্কা পেয়েছে, পঁচিশ ছেলে বৌ নিয়ে ইদেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়, কাকের মুখেও বুড়ো বাপের খোঁজ নেয় না, মেয়েরাও যে যার সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, ইচ্ছে থাকলেও সময় হয় না। বকের চোখে ছানি, পায়ে বাত, ডানার পালক হল্‌হল্‌, ঠোঁট টন্‌টন্‌, পিঠ কন্‌কন্‌, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনরকমে ভরদুপুরে ঝিলের ধারে আসে, অনেকক্ষণ ঝিমিয়ে তারপর মাছ ধরতে গিয়ে জলের ওপর মুখ থুবড়ে উল্টে পড়ে, মাছ হেসে ঘুরে পাখনা ফরফরিয়ে চলে যায়। কোনরকমে দুটো একটা ভ্যাসকা ভেতো বোকাসোকা জুলজুলে পোকা ধরে পিত্তিরক্ষে করে আবার বাসায় ফিরে আসে বক।

এইভাবে কয়েকমাস কেটে যাওয়ার পর একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বক দেখল—সে গা হাত পা নাড়তেই পারছে না। পেটে খিল, চোখে অন্ধকার. বক ভাবল—আমার বোধহয় হয়ে এল। খানিকক্ষণ শুয়ে থাকার পর বকের মনে হল—নাঃ, বোধহয় ক্ষিদের চোটেই এইরকম হচ্ছে। কতদিন যে পেট ভরে খাইনি। অথচ ছেলেমেয়েদের মুখে-মাছ, উঠতি-পালক, এমন কি বিয়ের ভোজে পর্যন্ত সব মাছ ঐ ঝিল থেকে নিজে ঠোঁটে করে এনেছি। তখন বগবগিয়ে চলতাম, লাঠির মত দাঁড়াতাম, তীরের মত ছোঁ মারতাম। কোথায় গেল সেইসব দিন! কিন্তু সে ভেবে চুপচাপ বসে থাকলে তো চলবে না। বাবা বলতেন—বাল্যকালে মায়ের আঁচল, যৌবনেতে নিজের পা, বৃদ্ধকালে বুদ্ধি নিয়ে যথা ইচ্ছা তথা যা। যাই, আজ বুদ্ধি খাটিয়ে দেখি, কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা।

এই ভেবে বক আস্তে আস্তে ঝিলের ধারে এসে তুঁত গাছের ভাঙ্গা গুঁড়িটায় হেলান দিয়ে বেশ গুছিয়ে বসে কাঁদতে আরম্ভ করল।

কান্না তো কান্না, যে-সে কান্না নয়, একেবারে কান্নার সাগর। প্রথমে ঠোঁট কাঁপিয়ে তারপর ঠোঁট ফুলিয়ে, তারপর ডাক ছেড়ে চোখের জলের বান ডাকিয়ে বক কাঁদতে লাগলো। জলের সঙ্গে গা মিশিয়ে ভোরের হাওয়ায় বেড়াতে বেরিয়েছিল একজোড়া ফিনফিনে। বকের কান্না দেখে প্রথমে চোখ গোল করে, তারপর মুচকি হেসে নিচের দিকে মুখ করে রিনরিনে গলায় বললে—ওগো,

তোমরা সব দেখে যাও, দাদু কাঁদছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজার গলায় অ্যাঁ? বল কি? সে কি হে? কিব্-ব্যাপার?—বলতে বলতে ওপরে উঠে এল থুথুরে বুড়ো শুশুক থেকে আরম্ভ করে সবে-জন্মানো কচি ব্যাঙাচিটি পর্যন্ত ঝিলের সকলে। কেবল ঝিলের তলায় ঝুপসি গাছের ঝোপে ধবধবে সাদা শঙ্খ আর শঙ্খিনী ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে ফিরতে বললে—বেশ ঢেউ দিচ্ছে তো। সমুদ্রে এলুম বোধহয়।

এক পা মাটিতে, আর পা দুমড়ে নিয়ে একবার এচোখে একবার ওচোখে—বক তখনও হৈ হৈ হো হো আহ্ আহ্ করে কেঁদে চলেছে। আর সকলে ভিড় করে জলের ওপর শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। কান্নার আওয়াজে আশপাশের পাখির বাসায় ছানারা উঠে পড়েছে, গিন্নীরা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলছে—সাত সকালে এ আবার কি ঝামেলা রে বাবা, আর গুবরে পোকা সকালের খাবার আনতে বেরোবার মুখে ব্যাপার দেখে বাসার দরজাতেই ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষকালে নীলচে কালচেকে ঠেলা দিয়ে বললে—আর দাঁড়িয়ে কি হবে? চল্, যাই, লেজ ব্যথা করছে। ব্যাঙাচিরা ঠেলে ঠুলে ওরই মধ্যে তিরতির খেলবার জায়গা করে নিলে। সোনালীরা পাঁচবন্ধু পাখনা জড়াজড়ি করে এ ওর ওপর দিয়ে উঁকি মারবার চেষ্টা করতে করতে বলল—এত যে দেখবার কি আছে বুঝি না। এর চেয়ে রোদে পিঠ পেতে আঁশ চকচকালে কাজ দিত। এমন সময়—

সকলে অবাক হয়ে দেখল, কাঁকড়া গুষ্ঠীর নামকরা ডানপিটে তরুণ সন্দংশ জোড়া জোড়া পা ফেলে এগিয়ে চলেছে পাড়ের দিকে। বন্ধুরা 'করিস্ কি, করিস্ কি' বলে আটজনে আটটা পা ধরে ফেলতেই তাদের এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে আর্ধেক গা জলে, আর্ধেক ডাঙায় সন্দংশ গলা তুলে বললে—'এই যে শুনছেন?'

বক চোখ বুজিয়ে যেমন কাঁদছিল তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বললে—কি? আমায় বলছ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাকেই। কি হয়েছে বলুন তো আপনার? এত কান্না কিসের?

এক চোখের কান্না থামিয়ে বক বললে—কাঁদছি কি আর সাধে? শুনলে তোমরাও কাঁদতে আরম্ভ করবে।

—বলেন কি? আপনার একার কান্নার চোটেই আমাদের কাজকর্ম্ম সব মাথায় উঠেছে। এরপর আমরা কাঁদতে আরম্ভ করলে তো—। যাক, কি হয়েছে বলেই ফেলুন না।

একবার এপা, একবার ওপা দিয়ে দুই চোখের বাঁ ডান ওপর নিচ সব মুছে নিয়ে গলা ঝেড়ে বক বললে—আমাদের দৈবজ্ঞঠাকুরের মুখে শুনলুম, বারো বছর ধরে এ তল্লাটে নাকি আর বৃষ্টি-টিষ্টি হবে না। এ ঝিল শুকিয়ে খট্‌খটে ডাঙা হয়ে যাবে। যাদের সঙ্গে এত বছর মিলেমিশে বড় হলুম, একবেলাও যাদের না দেখে থাকতে পারি না, প্রাণ আনচান করে, সেই তাদের চোখের সামনে তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে দেখতে হবে? হায় ভগবান্, এও কপালে লেখা ছিল—

বলতে বলতে বক একেবারে হু হু করে কেঁদে উঠল। ঝিলের বাসিন্দাদের কারো মুখে আর

কথা নেই। সব চুপচাপ। পাতাটি পড়লে শোনা যায়। অনেকক্ষণ বাদে ও পাশ থেকে শুশুকবুড়ো বলল—তাহলে উপায় ?

—উপায় এখান থেকে আট ক্রোশ দূরে কোদালমারি গাঁয়ের ধারে সদাইবারি দীঘি। সেখানে কোনরকমে একবার গিয়ে পড়তে পারলে আর ভয় নেই।

মোটা সোটা গেরেস্তারী গুঁফো মাছ এগিয়ে এসে বলল—এ তো আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন, কাকা। ডাঙ্গার ওপর দিয়ে আমরা অতদুর যাব কি করে ? পাখি নই যে উড়ে যাব, মানুষ নই যে হেঁটে যাব। একমাত্র ব্যাঙ্‌ ট্যাঙ্‌ কয়েকজন ভাগ্যবান ছাড়া—

বক নড়ে চড়ে বসে বললে—সে কথা কি আর না ভেবেছি ? যারা নিজেরা পারবে না, তাদের আমিই পিঠে করে

'ওরে বাবারে'—বলে মাছেরা সব পিছ-সাঁতার কেটে শুশনি শাকের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল।

বক এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে মধুর হেসে বললে—বড্ড ভয়কাতুরে তো তোমরা। আজ ছমাস ধরে দেখছ তো আমায়, ভুলেও কখনও একটি মাছও মুখে তুলেছি ? গুরুর বারণ না ?

ঝিলের সবচেয়ে পুরোন বাসিন্দে চিংড়ি-বুড়ো দাড়ি নেড়ে আপন মনে বললে—উঁহু, ভালো ঠেকছে না। ছমাস ধরে পাওনি, তাই খাও নি। তার আগে কত বচ্ছর ধরে দেখছি তোমায়। এমন দিন যায় নি যেদিন এবেলা ওবেলা ঝিলের অন্ততঃ পাঁচ-সাত ঘরে কান্নার রোল না উঠেছে।

সব চুপচাপ দেখে বক বললে—ঠিক আছে, যেতে হবে না তোমাদের, সব শুকিয়ে মর। তখন যেন আবার বলতে এস না।—বলে বক পেছন ফিরতেই—

এক ঝাঁক সবুজ মাছ একসঙ্গে বলে উঠলো—দাদু, আমরা যাব, আমাদের নিয়ে চলুন। সঙ্গে সঙ্গে 'আমরাও, আমরাও' বলতে বলতে তাদের পেছনে এসে দাঁড়াল ঝাঁকে ঝাঁকে বেগুনী কমলা আকাশী চকচকে ঝকঝকে হাজার হাজার মাছ। বক সব্বাইকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে কি একটা হিসেব কষে নিয়ে বললে—দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত ব্যস্ত হলে কি চলে ? নিয়ে তো আমি যাবই। তবে কি না সেদিন যোগাভ্যাস করতে গিয়ে বেকায়দায় লেগে গিয়ে পিঠের একজায়গায় হাড়টা মুট করে ভেঙে গেল। একে বুড়ো হয়েছি, তায় ভাঙা পিঠ। তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না। বড় হলে একজন আর ছোট হলে দুজন—কেমন ?

মাছেরা বললে—তাতে কি হয়েছে ? তাতে কি হয়েছে ? এই বয়েসে এই শরীরে আপনি যে আমাদের বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন, এই তো যথেষ্ট। কেউ কেউ তো কেবল কাজ নেই কম্ম নেই চুপচাপ বসে থাকেন আর অন্যের কাজে বাগড়া দেন—

বলে চিংড়ির দিকে আড়চোখে তাকালে সকলে।

বক বললে—তাহলে আজ কে কে যাবে, তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

লালচোখ সাদা মাছ বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—কি? যাবে নাকি?

বৌ বললে—হ্যাঁ, মন্দ কি।

লালচোখের মা ছেলে-বৌকে পেটভরে খাইয়ে দিলে, তারপর ছেলের কানে কানে চুপি চুপি বললে—আমাদের জন্যে নিরিবিলি দেখে বাসা খুঁজে রাখিস্। আর জলে জলে ভেসে বেড়ানো ভাল লাগে না।

ছেলে বললে—আচ্ছা মা।

বক জলের ওপর উপুড় হয়ে পিঠ পেতে দিল। লালচোখ বৌকে নিয়ে হাসি হাসি মুখে তার ওপর উঠে বসল। সকলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বক শোঁ করে উড়ে গেল।

পরদিন সকালে বক এল মুখে একগোছা শ্যাওলা নিয়ে। ঠোঁটের একূলে ওকূলে হাসি। চোখের তারা নাচ নাচন্ত, বক হেঁকে বললে—কই গো লালচোখের মা, এই নাও, বৌ তোমার তত্ত্ব পাঠিয়েছে। বেশ বৌটি বাপু তোমার। ছেলের চেয়ে ঢের সরেস। ছেলেও তোমার ফেলনা নয়। তা ঘরে তোমার খাউন্তী-দাউন্তী ভালোই। এই না হলে আর গিন্নী? আজ কে যাবে?

পেটমোটা ফুলো মাছ এক মুখ মিষ্টি-পোকা চিবোতে চিবোতে বলল—আজ আমি।

তুমি একা? বেশ বেশ—বলে বক জলে নেমে পিঠ ছড়িয়ে দাঁড়াল। ফুলো লাফিয়ে উঠে বসল। বক উড়ল।

তার পরদিন গেল লালচোখের মা-বাবা, তারপর দিন খলসেরা দুই ভাই, তারপরদিন খয়রাচাঁদা, তারপর…তারপর…। একসপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর আটদিনের দিন সকালে এসে বক বললে—ওরা তোমাদের যাওয়ার জন্যে বড্ড তাড়া দিচ্ছে। বলছে, এমন চমৎকার জায়গা, ওদের সব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন! নইলে ভালো লাগছে না! আমারও মনে হচ্ছে যেন গায়ে বেশ জোর পেয়েছি। সত্যি, পরের কাজ করতে এত আনন্দ, কে জানত। তা তোমরা সকালে দুজন বিকেলে দুজন করে চল।

মাছেরা বললে—তাহলে তো ভালই হয়। কিন্তু আপনার কষ্ট হবে না তো?

বক বললে—কি যে বল।

একমাস, দুমাস, তিনমাস যাওয়ার পর বক বললে—মৎস্যাশন করে করে এ্যাদ্দিনে মনে হচ্ছে যেন সেই আগের জোর ফিরে পেয়েছি। এখন আমি তোমাদের সকালে, দুপুরে বিকেলে, রাত্তিরে—চারবার করে নিয়ে যেতে পারি। উঃ, বাঁচালে আমায় তোমরা।

মাছেরা বললে—আমরা আপনাকে বাঁচালুম, না আপনি আমাদের বাঁচালেন? সত্যি আপনি না থাকলে—

বক বললে—ঐ হল আর কি।

ছ মাস কেটে গেল। হেমন্ত শীত বসন্ত একে একে চলে গিয়ে গ্রীষ্ম এল। পর পর পনের দিন বৃষ্টি পড়ল না। জলে টান ধরল। সন্দংশ-র বুকটা কেমন যেন দুরদুর করে উঠল। সত্যিই কি অনাবৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল? সারারাত গুম হয়ে বসে বসে সন্দংশ ভাবল। তারপর দিন বক আসতেই

তার কাছে গিয়ে বলল—আচ্ছা, মামা, আপনি বোধ হয় মাছ খুব ভালো বাসেন, তাই না?

বক চমকে উঠে বললে—কেন? তা…না…ম্—কি ব্যাপার বল তো?

সন্দংশ মুখ ভার করে বললে—ব্যাপার আর কি? কথাটা হচ্ছে, আমিই প্রথম গিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করলুম, জিগ্যেস করে করে অনাবৃষ্টির কথাটা বার করলুম। অথচ আমাকে তো আর পাত্তাই দেন না। মাছই প্রাণ, মাছই ধ্যান। বাঁচবার ইচ্ছে তো আমাদেরও হয়?

বক একগাল হেসে বললে—ও, এই কথা? তা আজই চল না তুমি? আমার তো মনে হচ্ছে, মাছেদের চেয়ে তোমাকেই বোধহয় বেশি ভালোবেসে ফেলব। মাছেদের সঙ্গে মাখামাখি করে সারা গায়ে কেমন যেন আঁশটে গন্ধ হয়ে গেছে। তুমি চটপট তৈরি হয়ে নাও। আমি এখুনি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। দেখবে, কি চমৎকার জায়গা—

কালো পাথরের ধারে সাদা পাথরের চূড়ো।
মিলেমিশে রয়েছে সবাই ছেলেমেয়ে বুড়ো॥
চারটি বেলা পাথর বেয়ে লাল ঝরণার জল।
এঁকেবেঁকে গড়িয়ে পড়ে, কে কে যাবি চল্॥

সন্দংশ বললে—বাঃ, চমৎকার জায়গা তো। তৈরি হবার আর কি আছে? আদি সর্বদাই তৈরি। আপনি চলুন।

পিঠের ওপর সন্দংশকে বসিয়ে বক উড়ল আকাশে। যেতে যেতে ঝিল আর দেখা গেল না, সর্ষেক্ষেত পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে এক পোড়োভিটের কাছ বরাবর বক নামল। সন্দংশ বললে—মামা, এখানে নামলেন যে? সদাইবারি দীঘি আর কদ্দূর? মাঝখানে জিরিয়ে নেবেন বুঝি?

বক বললে—তুমি বাপু বড্ড বকর বক কর, একটু চুপ করে থাক দিকিনি। একটু বাদেই দেখতে পাবে, কেন নেমেছি।

কয়েক পা এগোতেই সন্দংশ দেখল, একপাশে একটা বড়সড় কালো পাথর পড়ে রয়েছে, পাথরের গায়ে শুকনো রক্তের দাগ, পাশেই মাছের কাঁটার একটি প্রকাণ্ড স্তূপ। সন্দংশের কেমন যেন মনে হল, বললে—মামা ওটা কি?

বক বলল—কি আবার? ঐ পাথরটায় প্রথমে আছড়ে আছড়ে মারি। তারপর মাসটুকু খেয়ে কাঁটাটা ফেলে দিই পাশে। কাঁটা আবার কেউ খায় নাকি? আজকে ঐ কাঁটার সঙ্গে তোমার খোলা-গুলোও যোগ হবে। আর বকিও না বাপু। বকলে আবার আমার ক্ষিদে বাড়ে। এখন পিঠ থেকে নাম দিকি নি—বলে বক ডানা ঝাড়া দিয়েই অাঁ অাঁ অাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল—

দুই দাঁড়া বাগিয়ে সন্দংশ প্রাণপণে চেপে ধরেছে বকের গলা। চাপতে চাপতে চাপতে চাপতে কট করে কেটে গেল গলা। মুণ্ডু আলাদা হয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল বক।

কাক বলে উঠলো—বেশ হয়েছে। দুচক্ষে দেখতে পারি না বকগুলোকে, একটু রং ফর্সা বলে দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। ঐ তো গলা, ঐ তো ঠ্যাং আর ঐ তো চলন। যাক, এখন কেউটেটার

কি ব্যবস্থা করা যায়, তাড়াতাড়ি বল ভাই, এক্ষুণি আবার সন্ধে হয়ে যাবে, বাসায় ফিরতে পারব না।

শেয়াল বললে—কিছু না, সহরে গিয়ে একটু দেখে শুনে কোন বড়লোকের বাড়ি থেকে একটা সোনার হার তুলে নিয়ে এসে কেউটের বাসায় ফেলে দাও, তারপর বসে বসে দেখ কি হয়। কেউটে মরলে একদিন ছানাপোনা নিয়ে আমার বাসায় নেমন্তন্ন খেয়ে যেয়ো।

কাক আর কাকবৌ কুলকুল করে হেসে উঠল।

পরের দিন দুজনে মিলে গেল সহরের রাজার বাড়ি। বাইরের বাগানে বকুল গাছের ডালে বসে কাক বলল—অন্তঃপুরের দিকটায় আমি আর যাব না। তুমি গিয়ে দেখে এস কিছু পাওটাও কিনা।

কাক-বৌ অন্তঃপুরের বাগানে গিয়ে দেখল—রাজবাড়ির মেয়েরা পুকুরঘাটে গয়না-টয়না খুলে রেখে সাঁতার কাটছে। কাক বৌ নিঃশব্দে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে পদ্মরাগের মধ্যমণি দেওয়া রাজকন্যার জন্মদিনে পাওয়া নতুন চিকচিকে সোনার হারটি তুলে আকাশে দৌড় দিল। রাজকন্যার সখী চন্দনতেল নেবার জন্যে পেছন ফিরেই দেখতে পেয়ে হৈ হৈ ধর্ ধর্ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিসোঁটা নিয়ে লোক ছুটল পেছন পেছন। কাক-বৌ দৌড়কে দৌড়তে এসে কেউটের কোটরের ওপর ঝুপ করে হারটি ফেলে দিয়ে পেছনের আমড়া গাছে লুকিয়ে পড়ল।

রাজার লোকজন এসে দেখল, কোটরের বাইরে হারের একটুখানি দুলছে, আর ভেতরে—ফণা মেলে বসে রয়েছে এক কেউটে!

খুঁচিয়ে কেউটেকে মেরে, পুড়িয়ে হার নিয়ে চলে গেল রাজার লোক। কাক আর কাক-বৌ বটের নিচু ডালে বসে বললে—কাক্ কাঃ, বাঁচা গেল।

ক্রমশঃ
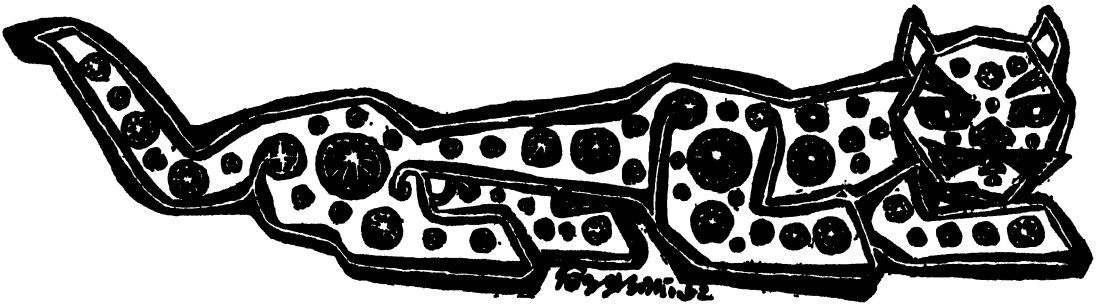
উপেনটি বাইস্কোপ

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

ছোটপিসিমা বড়ি কোথায়? পিশ্‌শাশুড়ি বড়ি কোথায়? হেঁদোখেঁদো বড়ি কোথায়? লকেট বকেট বড়ি? কোথায় আছে কেউ কি জানো, নইলে কেঁদে মরি।

মনে হচ্ছে পদ্য করে বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছি তোমাদের, কিন্তু বিশ্বাস করো সারা বাড়িতে আজ একটা কথাই: বড়ি কোথায় বড়ি, কেউ কি জানো কোথায় আছে, নইলে কেঁদে মরি!

তাইতো বড়ি কোথায়? আহা সেজপিসিমার অমন নধরকান্তি বড়ি। সেরেফ হাপুস। হলুদ রঙের মটর ডালের বড়িগুলো যখন বারান্দায় রোদ্দুর মুড়ি দিয়ে শীত পোহাচ্ছিল, জানলার কার্নিসে একপায়ে দাঁড়ানো ঠোঁটকাটা কাকটার দুচোখ জুলজুল করছিল লোভে, রান্নাঘরের নিচু চালের ওপর থেকে বড়িগুলোর দিকে চোখ রেখে লেজ নাড়াচ্ছিল বাঘের মাসি বাঘিনী আর বাগানের গাবগাছটার গা বেয়ে ওঠানামা করছিল লেজফোলানো তিড়িংচন্দ্রবিড়িং তখন কেউ কি জানতো এমন হবে? কেউ জানেনা। কেউ দেখেনি। আহা, কোথায় গেল অমন বড়ি। মটর বড়ি, মসুর বড়ি, ছাঁচি লাউয়ের কলাই বড়ি, শাদা বড়ি, হলুদ বড়ি, লাল বড়ি, সবুজ বড়ি, নানারঙের বড়ির সারি কোথায় গেল? কোথায় গেল সেই তো কথা। খোঁজ খোঁজ কোথায় গেল, হেথায় হোথায়, এদিক সেদিক। রান্নাঘরে, ঠাকুরঘরে, ছাদের ঘরে, কোণের ঘরে।

কিন্তু না, বড়ি কোথাও নেই!

* * *

রান্নাঘরের দাওয়া ধরে যে ঘরেই উঁকি মারে ভন্তুর চোখে খালি এক ছবি। দাঁতে মিশি বড়পিসি ছোটকাকীমাকে ফিস ফিস করে বলছেন, নয়ন আর যাই করো, দক্ষিণের কোণের ঘরে যেওনি। তোমাকে তো এত ভালবাসেন তিনি, একবার যেওনা আজ। আশ্চর্য, ভন্তু পিটপিটিয়ে দেখলো নয়নকাকীর কি খিল খিল হাসি। মনে হচ্ছে হাসির ফোয়ারা বইছে ঘরে। ভয়ে আর উত্তেজনায় ভন্তুর সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। দক্ষিণের কোণের ঘর, ভন্তু ভাবতে লাগলো, কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। এদিকে সারা বাড়িতে ওই একটা কথাই···বড়ি কোথায় বড়ি। তবে কি সেজ পিসিমার বড়িগুলো নয়নকাকীই সরিয়ে ফেলেছে। আর তাই বুঝি বড়পিসিমা ফিস ফিস করে বলছিলেন, আর যাই করো, দক্ষিণের ঘরে যেওনি। দক্ষিণের কোণের ঘর। আরে তাইতো, ভন্তুর মনে পড়ছে ও ঘরেই তো সেজপিসিমা থাকেন। শুধু সেজপিসিমা থাকেন বললে ভুল হবে সেজপিসিমা অ্যাণ্ড কম্পানিরা থাকেন।

অ্যাণ্ড কম্পানি?

হাঁ, অ্যাণ্ড কম্পানি ছাড়া আবার কি। তিনটে কাবুলে বেড়াল, ছ ডজন আমসত্ত্ব (ভাবতে গিয়ে ভন্তুর জিভে জল), তিনকৌটো গন্ধ মশলা, চারকৌটো কাশ্মীর পেয়ারা, দু ডজন মর্তমান, এক হাঁড়ি নলেন গুড়ের সন্দেশ, আর দু কিলো রাবড়ি (আহা, আহা)!

ছোটকাকীর ঘর পেরিয়ে নিমগাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল ভন্তু। নিমগাছের গা বেয়ে পাশাপাশি যে দুখানা ঘর উঠেছে তার একটাতে থাকেন রাঙামামী আর একটাতে গোটা চারেক গিনিপিগ। রাঙামামী যখন রাঙামামার ওপর রাগ করে বাপের বাড়ি যান তখন পালানকাকা গিনিপিগগুলোকে ও ঘরে রেখে আসেন। আর রাঙামামী আসার ঠিক আগের দিনেই গিনিপিগগুলো চালান হয়ে যায় অন্য ঘরে।

চমচম বলেছে গিনিপিগগুলো নাকি আসলে গিনিপিগ নয়, ওগুলো লালনীল মাছ। বিকেলের পর একটু অন্ধকার হয়ে এলেই জানলা দিয়ে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায় পালানকাকার ঘরখানা ম্যাজিকের মত একটা মস্ত একুইরিয়াম হয়ে গেছে। আর সেই একুইরিয়ামের সবজে জল, শ্যাওলা-গুড়ির মাঝখানে একদল ধাড়ি ধাড়ি মাছ পিক পিক শব্দ করে নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে।

বাগানে লেবুগাছের ডালে থোকা থোকা ফুল। মিষ্টি একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। বার বার কাঁঠাল গাছের ডাল থেকে তিড়িং চন্দ্র বিড়িংদের ওঠানামার শব্দ আসছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ভন্তু সেজপিসিমার ঘরের কাছে এগোতেই তার চোখদুটো গোল্লা হয়ে গেল। সে দেখলো, অবাক হয়ে দেখলো,

সেজপিসিমার কি ভেউ ভেউ কান্না!

সেজপিসিমার কি ভেউ ভেউ করে কান্না। হবেই না বা কেন, সেজপিসিমার অমন নধরকান্তি বড়িগুলো

শেষ পর্যন্ত গাছের মাথায়। না, চোখের ভুল নয়, ভন্তু পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আমবাগানের গাছগুলোর মাথায় মাথায় লাল নীল বড়ির নিশানা। আর লম্বা ফজলি গাছটার মগডালে বসে দাঁত দেখাচ্ছেন কে? কে জানো না? তিনি হলেন লেজওয়ালা এক শ্রীহনুমান।

[নয়নকাকীর ঘর থেকে বুলা আর পালুর কোরাস শোনা যাচ্ছে :]

উপেনটি বাইস্কোপ

টুং টাং তেইস্কোপ ॥

আমি যাঁদের দেখেছি

আভা মিত্র

ছোটবেলায় আমি যাঁদের দেখেছি, তাঁদের কয়েকজনের কথা বলছি।

প্রতি রবিবার সকালে আমাদের বাড়িতে সাহিত্যের আসর বসত। সে আসরে দেখেছি সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে। তিনি 'সাহিত্য' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। খুব লম্বা এবং বেশ চওড়া লোক ছিলেন। এত বেশী লম্বা মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর নস্য নেবার অভ্যাস ছিল। একটি ছোট কাঠের কৌটো সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকত। সেই কৌটোটি ভাল করে দেখবার আমার খুব ইচ্ছা হত। কিন্তু সাহসের অভাবে কোনদিন দেখা হয় নি।

শুধু রবিবার নয়, প্রত্যহ অতি ভোরে তিনি আমাদের বাড়ি চলে আসতেন এবং জাজিম তাকিয়া দেওয়া জোড়া তক্তার বিছানার অর্ধেকটা নিয়ে শুয়ে থাকতেন।

তিনি খুব ভাল সমালোচক ছিলেন।

তিনি কে, জান কি? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছেই থাকতেন। তাঁর সম্বন্ধে শোনো একটা গল্প বলি—তিনি যখন তোমাদের মত ছোট ছিলেন, তখন অসম্ভব দুরন্ত ছিলেন। বাড়িতে বা স্কুলে তাঁর দৌরাত্ম্যে সকলে অস্থির হয়ে পড়ত। পূর্বকালে স্কুলে খাবার জলের জন্য জালা থাকত। তিনি দুষ্টামি করলে মাষ্টার মহাশয়রা তাঁকে ভয় দেখাতেন। ওই জালার মধ্যে পুরে দেওয়া হবে। দু'চার দিনেই তাঁর ভয় চলে গিয়েছিল। একদিন দুষ্টামি করছেন; তাঁকে ধরে জালার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে, তিনি হঠাৎ পা দিয়ে জালাটায় দিয়েছেন ধাক্কা। জালা ভেঙে তখন শুধু জল!

তোমরা কি ওই রকম লক্ষ্মী ছেলে? আজ সমাজপতি মহাশয় ইহলোকে নেই।

দেখেছি পুরাতন-প্রসঙ্গ লেখক বিপিন গুপ্ত মহাশয়কে। পাতলা মানুষ, মুখে বসন্তের দাগ ছিল। খুব পান খেতেন। তাঁর জন্য পান রাখা থাকত। তিনি এসেই আমাকে ডাকতেন, এস্রাজ বাজনা শুনবার জন্য। আসরে আমাকে বাজনা বাজাতে হ'ত। সেই ফাঁকে ফাঁকে আমি নানা কথা শুনতাম। এ ভিন্ন বিদেশের মন্ত্রীসভা হতে সে সময়ের দেশী বিদেশী নানা সাহিত্যের আলোচনা চলত। বহু দিন বিপিনবাবু লোকান্তরিত হয়েছেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি 'বন্দেমাতরম' কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি আমার দিদিকে বড়মা এবং আমাকে ছোটমা বলতেন। ছোট্ট মানুষ বড় দাড়ি এবং তাঁর অপেক্ষা এক বড় লাঠি হাতে থাকত। সেই লাঠির মাথাটা তিনি আমাদের গলায় দিয়ে টানতেন। কিন্তু আমরা যদি পিছু হটতে আরম্ভ করতাম, তা'হলে তিনি নিজেই গড়গড় করে আমাদের সঙ্গে চলে আসতেন।

স্বদেশী আন্দোলনে তাঁকে দণ্ড দেওয়া হয়। যখন তিনি ছাড়া পেয়ে প্রথমেই আমাদের বাড়ি

আসেন, তখন তাঁর হাতে মস্ত নখ, বড় দাড়ি ও বড় চুল ছিল। সে সময় আমাদের খুব মজা লেগেছিল। সেই দিন তাঁর একখানি ছবি তোলা হয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমাদের কাছে বড় বেদনাদায়ক হয়েছিল।

অরবিন্দ ঘোষ। তখনও তিনি 'শ্রী' অরবিন্দ হননি। তিনি বন্দেমাতরম কাগজের সম্পাদক ছিলেন। স্বদেশের মুক্তির জন্য, তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখতেন, তা যেমনি জ্ঞানগর্ভ, তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। লেখার জন্য তিনি ইংরাজ সরকারের বিরাগভাজন হন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি বিলাতে বড় হয়েছিলেন এবং সেইখানেই আই, সি, এস, পরীক্ষা দেন। পরে ভারতবর্ষে আসেন এবং মাতৃভূমির সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। শেষ জীবনে তিনি ঋষি অরবিন্দ। পণ্ডিচেরীতে তিনি দেহরক্ষা করেন।

পণ্ডিচেরীতে তাঁর যে আশ্রম আছে সে আশ্রমে সকলের কাজের জন্য, শিক্ষার জন্য বহু ব্যবস্থা আছে। স্কুল, চাষ, হাঁস, মুরগী পালন করা, বই বাঁধাই, সেলাই প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য গঠনের জন্য ব্যায়াম এবং খেলা সে তো আছেই।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। সাহিত্যেও তার কিছু কিছু দান আছে। পরম সুপুরুষ ছিলেন। কীর্তন গান করতে পারতেন খুব ভাল। তাঁর সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে।

যতিনাথ বসু। বহু বিদ্যায় তিনি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছবি আঁকতে পারতেন, গান করতে পারতেন। তাঁর রেকর্ডের একটি গান ছিল—'বিশ্বরাজ হে, কেন ডাক!' আকাশ-তত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর লেখা 'আর্যাবর্ত' মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল! দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন! দীর্ঘ দিন হ'ল তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ লেখা আর্যাবর্তে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাচর্চায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল! বহুদিন পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

যাঁদের কথা লিখলাম, তাঁরা জীবনে প্রত্যেকে বড় হয়েছিলেন এবং তাঁরা আমার প্রণম্য।

তোমরাও বড় হবে। বিদ্যা বুদ্ধি গুণে তোমরা বিশ্ব সভায় আসন লাভ করবে সেই আশায় কয়েকজন মহৎ ব্যক্তির পরিচয় দিলাম।

ঘুমভাঙা-রাত

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

ঘুম-ঘুম গাছ-পালা,
ছায়া কালো-কালো·
মাঝ-রাত—ঘরে জ্বলে
টিম্‌টিম্ আলো।
ফিস্ ফিস্ কথা কয়
কারা আশে-পাশে,
খিক্ খিক্ ক'রে খ্যাঁক্—
শিয়ালেরা হাসে।
মাকড়্সা জুল্‌জুল্
চোখে চেয়ে থাকে,
মিটমিটে জুজুবুড়ী
মনে হয় তাকে!
নিম গাছে পেঁচা ডাকে
বিচ্ছিরি সুরে,
টিক্‌টিক্ ঘড়িটার
কাঁটা যায় ঘুরে॥
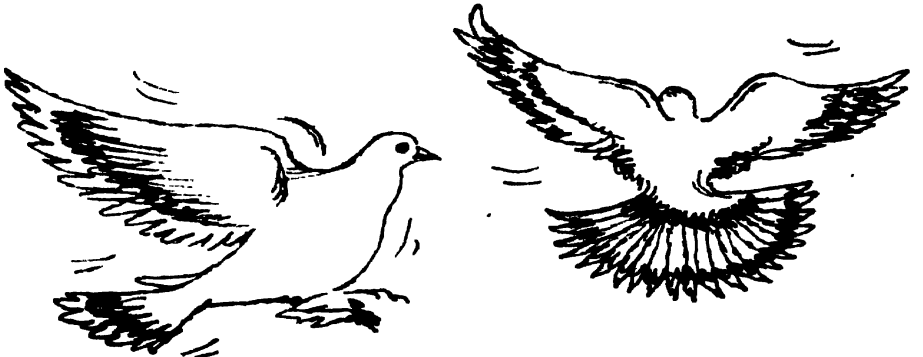
প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তর

কাঠঠোকরা কাঠুরিয়া ও আমি

জীবন সর্দার

আবার দূরের এক গাছের মাথা থেকে শব্দটা ভেসে এল—খট্ খট্ ট ট ট ট। চড়াক।

যে দিক থেকে শব্দটা আসছিল, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। একটি শুকনো কাঠি পায়ের চাপে ভেঙ্গে গেল। শব্দ হল মট্। গাছের মাথার সেই শব্দটাও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল।

সকাল থেকে দুপুর অবধি সারা বনে কারো দেখা মেলেনি যাকে ঐ শব্দটার কারণ জিগগেস করতে পারি। বনের পথে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম এবার ঘরে ফিরে যাই।

আবার শব্দ হল—খট্। খট্। খট্। এবার বেশ জোরে গাছের গোড়ার দিক থেকে এল।

খুব সাবধানে এবার এগোলাম। পথের বাঁক ঘুরতেই দেখি—এক কাঠুরিয়া। পড়ে থাকা এক শাল গাছকে টুকরো করছে। কাঠুরিয়ার কাছে গিয়ে, কেটে ফেলে রাখা গাছের গুঁড়িটাতে বসলাম আমাকে দেখে সে গাছ কাটা বন্ধ করলে। কুঠারটিকে গাছে হেলিয়ে রেখে, আমার পাশে বসে জিগগেস করলে, এখানে কি করতে এসেছি।

অমরকন্টক বিন্ধ্যপর্বতে একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা। তীর্থস্থানও বটে। সমস্ত শহরটাই বনে ঘেরা। নর্মদা আর শোন নদীর উৎস এখানে। অনেক কারণে এখানে আসা যায়, কিন্তু তাকে কি করে বোঝাতে পারি যে পথের বাঁক, মাটির গন্ধ আর গাছের ছায়ার খোঁজে আমি এখানে এসেছি। শুধু বললাম, ঐ শব্দটা শুনে এসেছি। ও কাঠফোঁড়া! একটুও অবাক হল না সে।

আরে আপনারা যাকে কাঠঠোকরা বলেন, আমরা তাকে কাঠফোঁড়া বলি।

কাঠঠোকরা যে গাছ ফুঁড়ছে আপনারা তার কিছু করেন না। ফুঁড়ে ফুঁড়ে গাছ নষ্ট করে দেবে।

আরে, নান্ না। কাঠফোঁড়া গাছের কোন ক্ষতি করে না। ও পাখিটা গাছ ঠুকে ঠুকে গাছের গায়ে যত পোকা থাকে সব খেয়ে নেয়। ওর জিভটা এমন, যে, গাছের গায়ের গর্ত থেকে পোকা-মাকড় আর তার 'ডিম-উম' সব বের করে খেয়ে নিতে পারে।

ও আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে ভেবে আমার ভারি রাগ হল। বললাম, কাঠঠোকরা গাছ ঠোকরায় তাতে যদি গাছের ক্ষতি না হয়, তবে আপনি যে গাছ কাটছেন, তাতেও ত' গাছের ক্ষতি হয় না।

পাহাড়ের সরল লোক আমার ঠাট্টা বুঝলে না। সরল হাসি হেসে বললে, ঠিক বলেছেন।

আমার বোকাপনা মুখের দিকে চেয়ে সে একটু হাসলে। বললে, আপনি সহরের লোক ব্যাপারটা ভাল বুঝবেন না আমি যে গাছটা কাটলাম, দেখেছেন ওর পাতাগুলো কেমন হলুদ হলুদ হয়ে গেছে। গাছটার অসুখ হয়েছে। বনের মধ্যে এমন গাছ না রাখাই ভাল।

গাছেরও অসুখ হয়, এমন কথা আগে শুনিনি। কাঠুরিয়া গাছের ডাক্তার না হোক, অনেক গাছ কেটে কেটে; গাছের নাড়ি-নক্ষত্র জেনেছে। তাই জিগগেস করলাম, গাছের আবার কি অসুখ হয়?

আমার কথা শেষ হ'ল না, কাঠুরিয়ার হাসিতে বন কেঁপে উঠল। হাসি থামিয়ে বললে, গাছের সর্দি কাশি হয় না বটে, তবে বেশি ঠাণ্ডায় বা গরমে গাছ মারা যেতে পারে। কিন্তু সব চেয়ে ভয় ছোঁয়াচে রোগের। গাছের গায়ে ছাতা পড়ে, শ্যাওলা ধরে, গাছের বাকলের তলায় পোকা কিলবিল করে। তাতে গাছের পাতা ঝরে যায়, ডাল শুকিয়ে যায়, তারপর একদিন গাছটি কাত হয়ে পড়ে। এই রোগে বনের একেক জাতের গাছ সাফ হয়ে যায়।

ছোঁয়াচে রোগ বড় সর্বনেশে। কিন্তু জল-হাওয়ার রোগ কম যায় না। কোনবার বৃষ্টি কম হলে, গরম বেশি হলে, মাটিতে জল কমে যায়। গাছের জলে টান পড়ে। জল নেই তাই ছোট শেকড় শুকিয়ে ওঠে, পাতার রং পাল্টে যায়, অসময়ে ঝরে পড়ে।

আচ্ছা, আপনি যে সকাল থেকে বনটা ঘুরেছেন আপনার চেনা কোন কোন জাতের গাছ বেশি দেখলেন? আমাকে সে প্রশ্ন করলে। সবই শাল, কিছু আমলকী আর হরিতকী। বললুম।

এবার যান সুন্দরবনে, দেখে আসুন সেখানে এই জাতের গাছ কয়টা দেখতে পান! একদম না। জলহাওয়ার সাথে সব গাছেরই এমন যোগাযোগ যে যেখানটিতে যেমন মানায় তেমনি হবে। তবে, জলহাওয়ার জন্যে গাছের যে অসুখ করে তা' ছোঁয়াচে নয়। একটির অসুখ হলে একটিরই হবে।

তাকে কথা বলা বন্ধ করতে হল। একটা কাঠঠোকরা কোথা থেকে উড়ে এসে কাছের একটা গাছের ডালে বসল। দু' পায়ের আঙ্গুলে ডালটি আঁকড়ে, লেজে ভর দিয়ে, ডালটির উপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে, চার পাশ ঘুরে ঘুরে ঠকাঠক্ ঠোঁট ঠুকতে লেগে গেল। কোথাও সে থামে, গর্ত থেকে কিছু বার করে খায় আবার নিজের কাজে মন দেয়।

কাঠুরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আহা এই কচি বয়সের গাছটাতে পোকা ধরল!

এই গাছটাকে আমি হতে দেখেছি। তাছাড়া, গাছের বয়স জানবার আমি অন্য উপায় জানি।

আমাকে কিছু বলতে হল না। নিজে থেকেই সে বললে, আমরা যখন কাঠ চিরি, তখন কাঠের গায়ে দাগ দেখে বয়স বুঝি। গাছের সুখ দুখের কথাও বুঝি।

লম্বালম্বি কাঠ চিরলে দাগ দেখি তীরের ফলার মত, পাশাপাশি চিরলে দেখি গোল দাগ। দাগ থাকে পরতে পরতে, একটার পর একটা। যতটা দাগ তত বয়স।

বছর বছর খেয়ে দেয়ে গাছ যত বাড়বে, পরতে পরতে তত দাগ পড়বে। কোন বছর গাছের বাড়-বাড়ন্ত ভাল না হলে, দাগ ঠিকমত পড়বে না। মাটি থেকে রস ভাল মিলল না, পাতা অকালে ঝরে গেল, কিম্বা গাছের কোন অসুখ হল, তবে গাছের বাড় ভাল হয় না। দাগটিও থাকে পুরোনো দাগের কাছাকাছি।

আমি সবজান্তার ঢং এ বললাম, বুঝেছি, দাগগুলোর দূরত্ব দেখে বোঝা যায়, কোন বছর কতখানি সে বেড়েছে। কতখানি বড় হয়েছে তা' দেখেই বলা যাবে সে বছর তার কেমন খাওয়া মিলেছে।

কাঠুরিয়া আমার বুদ্ধির তারিফ করে বললে, ঠিক বলেছেন। আমি একবার একটা গাছ কেটেছিলাম, তার গায়ে পোড়া দাগ ছিল। এখানকার 'বন-আপিসের' এক বাবু পোড়া দাগের উপর বছরের দাগগুলো গুনে বলে দিয়েছিলেন এগার বছর আগে এই বনে একবার আগুনে ঐ গাছটি পুড়েছিল।

পথে চলতে চলতে আমি জিগগেস করলাম, বনের এত গাছ কে লাগাল?

কে লাগাবে, আপনিই হয়েছে। এই যে আমি গাছটা কেটে ফেললাম, শেকড় শুদ্ধ তার মাটি উঠে এসেছে। সেই নরম মাটিতে কাঠবেড়ালী কোন গাছের ফল লুকিয়ে রাখবে। সময়ে তা থেকে নতুন গাছ হবে। শুধু কাঠবেড়ালী কেন, কত পাখি, পশু, এমনকি হাওয়া, বনের গাছের চাষের কাজ করে। 'বন-আপিসের' বাবুরা এ খবর জানেন। কোথাও তারা পুরোনো গাছ কেটে নতুন গাছ লাগান, কোথাও গাছের কাছেই গাছের চাষের ভার ছেড়ে দেন।

নতুন-পাঠশালা

চেম্বুর, বম্বেতে ৬ষ্ঠ প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালা গড়ে উঠেছে উৎসাহী প্রকৃতি-পড়ুয়া দীপঙ্কর সান্যালের চেষ্টায়। ঐ এলাকার গাছপালা পশুপাখির বিবরণ, সব পড়ুয়াদের জন্যে, ধীরে ধীরে খোঁজ নিয়ে তারা জানাবে।

নতুন-পড়ুয়া

বোম্বাই—বিমান বসু (১১২), দেবকুমার চক্রবর্তী (১১৩), কার্তিক সান্যাল (১১৪), শুভেন্দ্র সেনগুপ্ত (১১৫), শুভঙ্কর সান্যাল (১১৬)। **কলকাতা**—কাঞ্চন সেনগুপ্ত (১১৭)।
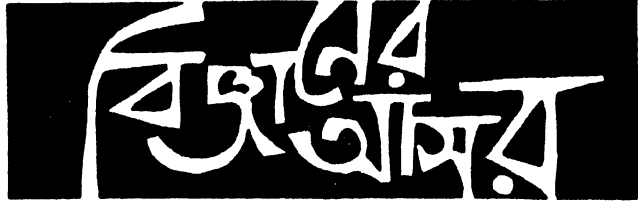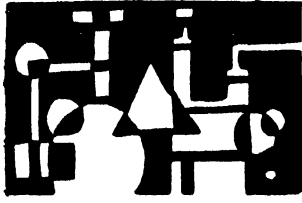
“ওরা কাজ করে আনন্দে”

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

ওদের কাজের বিরাম নেই। দিন রাত হাসিমুখেই কাজ করে চলেছে। কেউ কেউ তো সারাজীবনে বিশ্রামই পায়না এক মুহূর্তের জন্য।

আগেই বলেছি, (বিজ্ঞানের আসর—সন্দেশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২) ছোট, বড়, মাঝারি প্রায় পাঁচশো পেশী (Muscle) আছে আমাদের দেহে, আমরা যে সমস্ত ‘কাজ’ করি তা করে আমাদের শরীরের বিভিন্ন পেশীরা। তাদের মধ্যে একদলকে আমরা ইচ্ছেমত খাটাই তাদের বলে ঐচ্ছিক পেশী। আর একদল খাটে তাদের নিজেদের ইচ্ছেয়, এদের বলে অনৈচ্ছিক পেশী। এই দু’রকম পেশী ছাড়াও এক ধরণের বিশেষ পেশী থাকে হৃৎপিণ্ডে (Heart) যাদের নাম কার্ডিয়াক মাস্‌ল (Cardiac Muscle), এদের ধর্ম (Property) ও কাজ করার ধরন-ধারন সম্পূর্ণ আলাদা।

পেশীরা সাধারণতঃ দল বেঁধে কাজ করতেই ভালোবাসে, এক এক দল, এক এক রকম কাজ করে, এদের কাজ করার পদ্ধতিও বড় সুন্দর। বিভিন্ন পেশীর দল (Group of Muscles) পরস্পারের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়েছে, কি ভাবে তারা কাজ করবে, এবং তার জন্য কতকগুলো নিয়ম কানুনও ঠিক আছে। নিয়মের বাইরে তারা কখনই যায় না।

প্রথমেই বলি ঐচ্ছিক পেশীদের (Voluntary Muscles) কাজকর্মের কথা। বিভিন্ন অঙ্গ চালনা, কথা বলা ইত্যাদি কাজ করে ঐচ্ছিক পেশীরা। এখানে একটা কথা বলার আছে, কাজগুলো ঐচ্ছিক পেশীরা করে বটে, তবে বাইরে তার প্রকাশ করে সন্ধিরা (Joints) অর্থাৎ একদল ঐচ্ছিক পেশী যখন বিশেষ কোন কাজ করতে চায় তখন তারা কাজটি করায় নিকটবর্তী কোন সন্ধিকে দিয়ে। ধরো খোকা নাড়ু খাচ্ছে, খেতে গেলে তাকে হাত মুড়ে মুখের কাছে তুলতে হবে। এই হাত মুড়োনোর কাজটা, একদল পেশী কনুইএর সন্ধি অর্থাৎ এলবো-জয়েন্ট (Elbow Joint) কে দিয়ে করাচ্ছে। এই পেশীদল যারা হাত বা পা মোড়ায় তাদের বলে ফ্লেক্সর্‌স্ (Flexors)। ঠিক এর বিপরীত পেশীচালন (Muscular Movement) অর্থাৎ হাত পা টান, টান করে যে পেশীসমষ্টি তাদের বলে এক্সটেন্‌সর্‌স্ (Extensors)। হাতের বেলায় Flexors থাকে সামনের দিকে ও Extensors থাকে পিছনের দিকে।

কিন্তু পায়ের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ Flexors থাকে পিছনে ও Extensors থাকে সামনে। হাতে ও পায়ে আরো অনেক রকমের পেশী সঞ্চালন ক্রিয়া সাধিত হয়, তাদের মধ্যে প্রধান সঞ্চালন গুলোর নাম, এডাকসন (Adduction), অ্যাবডাকসন (Abduction) ও সারকামডাকসন (Circumduction)।

দূর থেকে হাত বা পা দেহের কাছে নিয়ে আসার নাম Adduction। দেহের কাছ থেকে হাত বা পা দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াকে বলে Abduction, এবং হাত বা পা বোঁ, বোঁ করে ঘোরানোর নাম Circumduction। তৃতীয় ক্রিয়া অর্থাৎ Circumduction হাতের ক্ষেত্রে আমরা সবাই দেখাতে পারি কিন্তু পায়ের বেলায় সার্কাসের লোক, যারা জিমন্যাসটিক দেখায় তারা ছাড়া ঐ ক্রিয়াটি আর কেউ দেখাতে পারবে না। উপরিউক্ত ক্রিয়া ছাড়াও হাতের পেশীদের আরও দুটি বিশেষ সঞ্চালন ক্রিয়া আছে। এই দু'টির নাম প্রনেসন (Pronation) ও সুপাইনেসন (Supination), হাত পেতে পয়সা চাইবার সময় আমাদের হাতে যে অবস্থায় থাকে তার নাম Supination ঠিক এর বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ হাতের চেটো উল্টে দেওয়ার নাম প্রনেসন (Pronation)। এইসব কাজকর্মের বেলায় ঐচ্ছিক পেশীরা নিজেদের মধ্যে বেশ একটা সুন্দর বোঝাপড়া করে নিয়েছে। এদের একদল যখন কাজ করে তার বিপরীত দল তখন বিশ্রাম নেয়। অর্থাৎ ফ্লেক্সররা (Flexors) যখন কাজে ব্যস্ত, এক্সটেনসররা (Extensors) তখন বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছে।

শিল্পী যখন গান করেন তখন তাঁর গলার মধ্যে বিশেষ একটি যন্ত্র কাজ করে এই যন্ত্রটির নাম (Vocal Cord), শুনলে আশ্চর্য হবে, এই যন্ত্রটিও বিভিন্ন পেশী দিয়ে তৈরি।

আমাদের শরীরের মধ্যে দু'খানা ফুসফুস আছে, এদের ইংরেজী নাম লাংস (Lungs)। এরা থাকে বুকের খাঁচায়। এরা দিনরাত্তির সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে। আর সেইজন্যেই আমাদের শ্বাসকার্য (Respiration) চলছে। এই শ্বাসকার্যও করাচ্ছে একদল পেশী তাদের বলে মাস্‌ল্‌স্‌ অব রেসপিরেসন (Muscles of respiration)। অবশ্য শ্বাসকার্যের প্রধান নায়ক হলো একটি বিশেষ পেশী, নাম তার ডায়াফ্রাম (Diaphragm)। সে থাকে ঠিক বুক ও পেটের মাঝখানে। লালচে রঙের মোটা পর্দার মতো দেখতে তাকে, আকৃতি গম্বুজের মতো (Dome Shaped)।

কথাবার্তার প্রধান অঙ্গ হলো জিভ (Tongue)। এই জিভটাও একটা পেশী সমষ্টি। মোট নয় (৯) খানা পেশী আছে জিভে। এদের মধ্যে একটি পেশী, যে জিভটাকে, জিভ ভেংচানোর সময় বাইরে বার করে দেয় তার নাম জিনিওগ্লসাস (Genioglossus)। আর কাজ ফুরোলে আর একটি পেশী তাকে টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়, এর নাম স্টাইলোগ্লসাস (Styloglossus)

এইবার ঐচ্ছিক পেশীরা (Voluntary muscles) কি ভাবে কাজ করে সেই কথাই বলি। এদের কাজ করার সঙ্গে ফুটবল খেলার তুলনা করা যেতে পারে। ধরা যাক দু'দলের মধ্যে ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে। প্রথম দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড বল নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিপরীত দিকের গোলের দিকে। যাতে সেণ্টার ফরোয়ার্ড গোলটা দিতে পারে সেইজন্যে তার সঙ্গে একটা সাহায্যকারী দলও চলেছে।

কিন্তু বিপরীত পক্ষ খুব বাধা দিচ্ছে যাতে গোল না হয়। একদল পেশী যখন কোন একটা কাজ করতে চায় তখন তাদের মধ্যেও এই তিন রকমের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। ধরা যাক একজন ভারী বাটখারা তুলবে। একটা পেশী প্রথমে বাটখারা তোলার কাজ শুরু করলো। যাতে সে বাটখারাটা তুলতে পারে সেইজন্য কতকগুলো পেশী তাকে সাহায্য করতে লাগলো। আর একদল পেশী করলো কি, যাতে সে বাটখারাটা তুলতে না পারে তারজন্য বাধা দিতে শুরু করলো। যে পেশী প্রথম কাজ শুরু করে তাকে বলে প্রাইম মুভার (Prime Mover), তার সাহায্যকারী দলটার নাম সিনারজিস্টস (Synergists) আর যারা বাধা দেয় তাদের বলে অ্যান্টাগনিস্টস (Antagonists)।

ঐচ্ছিক পেশীর পর এবার আসি অনৈচ্ছিক পেশীদের (Involuntary Muscles) কথায়। আমাদের দেহে অনৈচ্ছিক পেশীদের ক্রিয়াও অনেক। এখানে, দু'একটা প্রধান কাজের কথা বলবো।

হৃৎপিণ্ড (Heart), আমাদের প্রাণীদেহের অন্যতম অপরিহার্য, (বিজ্ঞানের ভাষায় ভাইটাল —Vital) অঙ্গ। এই হৃৎপিণ্ড দিন রাত্তির পাম্পের কাজ করে রক্ত-সঞ্চালন তন্ত্র (Circulatory System) চালু রাখছে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে মানুষের হৃৎপিণ্ড একবার সঙ্কুচিত হ'লে যতখানি শক্তির ব্যয় হয়, ঐ শক্তিকে (Energy) কাজে লাগালে প্রায় একসের ওজনের কোন জিনিসকে দুই ফুট (২) অবধি উঁচুতে তোলা যায়। হৃৎপিণ্ডের এই সংকোচন ও প্রসারণের কাজ করছে বিশেষ এক ধরণের পেশী যার নাম কার্ডিয়াক মাসল (Cardiac Muscle)।

আমাদের ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য যেখানে গিয়ে জমা হয় তার নাম পাকস্থলী (Stomach)। এই পাকস্থলী ও একটি পেশীর তৈরি থলি (Muscular bag) ছাড়া আর কিছু নয়, পাকস্থলী থেকে খাদ্যদ্রব্য যায় ক্ষুদ্রান্ত্রে (Small intestines)। সেখানে খাদ্যের সারবস্তু গ্রহণ করার পর খাদ্য যায় বৃহদান্ত্রে (Large intestines) তারপর মলভাণ্ড বা রেকটামে (Rectum)—এইখানে মলের অতিরিক্ত জল শোষিত (Absorbed) হয়। এইরূপে খাদ্য পরিপাক তন্ত্র (Digestive System) চালু থাকে। ঐ সব ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদান্ত্র ও মলভাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন পেশীর দ্বারা তৈরি ও ওদের কাজকর্ম করায় বিভিন্ন পেশী। শুধু পরিপাক তন্ত্র কেন, খাদ্য গ্রহণ থেকে শুরু করে অসার পদার্থ ত্যাগ করা অবধি সমস্ত কাজই তো করছে বিভিন্ন ইচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশী।

পেশীর প্রধান কাজ আমাদের প্রয়োজনে শরীরের বিভিন্ন অংশের সঞ্চালন করা। মনের ভাব প্রকাশ করতেও পেশীর প্রয়োজন। বিশেষ করে মুখমণ্ডলের পেশীরা (Muscles of the face) এই কাজের প্রধান নায়ক, ঐ জন্যে ওদের ভাবপ্রকাশের পেশী (Muscles of Expression) বলা হয়।

পেশীর অনেক কাজ ও উপকারিতা। এদের কাজকর্মের কথা ঠিকমত লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবে আর একটা কথা না বলেও পারছি না যে, শক্ত হাড়ের উপর সুঠাম পেশীর বিন্যাস মানবদেহের শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রধান উপাদান।

বিঃ দ্রঃ—এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে জানিও—সন্দেশের ঠিকানায়—সু. চ.

ভ্রম সংশোধন।—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২।

১। পাতা ১৬২, লাইন ২২ আছে, ইরেজলার, হবে—ইররেগুলার (Irregular),

২। পাতা ১৬৪, লাইন ৯ আছে, চর্বি এবং আমাদের দেহ গঠিত হয় অসংখ্য কোষ (Cell) হয়ে। হবে—আমাদের দেহ গঠিত হয় অসংখ্য কোষ (Cell)

প্রশ্নের উত্তর—যেমন করে মূর্তি গড়ে, বিজ্ঞানের আসর—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

উর্মিমালা ঘোষ—গ্রাহক নং এন ৩২০

প্রশ্ন—আমাদের শরীরে যে Cellগুলো আছে, সেগুলো কোথায় আছে? ঐ Cellগুলো কি জীবন্ত? ও গুলো মরে গেলে কি Paralysis হয়?

উত্তর—হাজার হাজার ইঁট দিয়ে যেমন বাড়ি তৈরি হয়, তেমনি আমাদের দেহ, দেহের প্রতিটি অংশ, তৈরি হয় অগুনতি কোষের (Cell) সমন্বয়ে। কোষ জীবন্ত। এরা রক্তের থেকে অম্লজান (Oxygen) গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। দেহের কোন অংশে যদি রক্ত চলাচল বন্ধ হয় তা হলে সেই অংশটুকুর কোষগুলি মরে গিয়ে পচে যেতে পারে ইংরেজীতে যার নাম গ্যাঙরিণ (Gangrene)। Paralysis হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের রোগ।

প্রশ্ন—রক্ত কি, কি দিয়ে তৈরি? Bone marrow কি রক্ত তৈরিতে সহায়তা করে?

উত্তর—রক্তের শতকরা ৫৫ ভাগই হ'ল তরল পদার্থ যাকে ইংরেজীতে প্লাজমা (Plasma) বলা হয়। প্লাজমা ছাড়া শতকরা ৪৫ ভাগ হল বিভিন্ন কোষ (Cells)। এই কোষগুলিকে রক্ত-কণিকা বা ব্লাড-করপাসল্‌স্ (Blood Corpuscles) বলা হয়। তিন রকমের রক্ত কণিকা আছে, লোহিত কণিকা (R. B. C), শ্বেত কণিকা (W. B. C) ও প্লেটলেটস (Platelets)।

রক্তের প্লাজমার উপাদানের শতকরা ৯১ থেকে ৯২ ভাগই হল জল। কঠিন পদার্থ ৮ থেকে ৯ ভাগ মাত্র। কঠিন পদার্থের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধাতু যথা, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস। তাছাড়া আছে বিভিন্ন জাতের প্রোটিন (Protein), ফ্যাট (Fat) কার্বহাইড্রেট (Corbohydrate)—এ ছাড়াও আরও কিছু পদার্থ থাকে যাদের কালারিং ম্যাটার (Colouring matter) বলা হয়। এরা প্লাজমাকে রঙীন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্লাজমার রঙ হলুদ (Yellow) কিন্তু রক্তের রঙ লাল। লোহিত কণিকা (R.B.C.) রক্তের লাল রঙএর জন্য দায়ী।

Bone Morrow রক্তের লোহিত কণিকা, লৌহ ঘটিত যৌগ হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) ও শ্বেত কণিকা (W.B.C.) তৈরি করে।

প্রশ্ন—আমাদের পায়ের পাতার হাড়গুলো কি এতই শক্ত যে আমাদের শরীরের পুরো ভার বইতে পারে?

উত্তর—পায়ের পাতার হাড়গুলো, কতকগুলি পেশী (Muscle), সন্ধি-বন্ধনী (Ligament) ইত্যাদি সহযোগে একাধিক স্থিতি স্থাপক (Elastic), খিলান (Arch) তৈরি করে। আমাদের দেহের যাবতীয় ভার বহন করে এই পায়ের পাতার খিলানগুলি (Arch of the foot) এবং আমাদের চলাফেরার সহায়তাও করে এরা।

দেশের সাথী

সুকুমার বসু

হে ভগবান এমন ছেলে
   দাওগো মোদের দেশে,
দুঃখ অভাব রাখবেনা যে
   ধরায় নেমে এসে।
রবির মত দীপ্তি যাহার
   চাঁদের হাসি মুখে
যে দাঁড়াবে সবার পাশে
   সকল সুখে দুখে।
থামবে সাগর ভয়েতে যার
   শুনবে ঝড়ে ডাক
এমন ছেলেই জন্ম নিয়ে
   থাকনা বেঁচে থাক,
গাইবে পাহাড় গুণ যাহার
   বাসবে নদী ভালো
এমন ছেলে জন্মে করুক
   দেশটি মোদের আলো,
সেই তো রবে সারা জীবন
   হয়ে দেশের সাথী
দেশের কাজে দশের মাঝে
   জাগবে দিবা রাতি।

(সন্দীপ রায়। বয়স ১১। গ্রাহক—২)

সূর্যোদয়

বাঁশরী রায়—গ্রাহক নং ১৭৫২

বয়স ৯
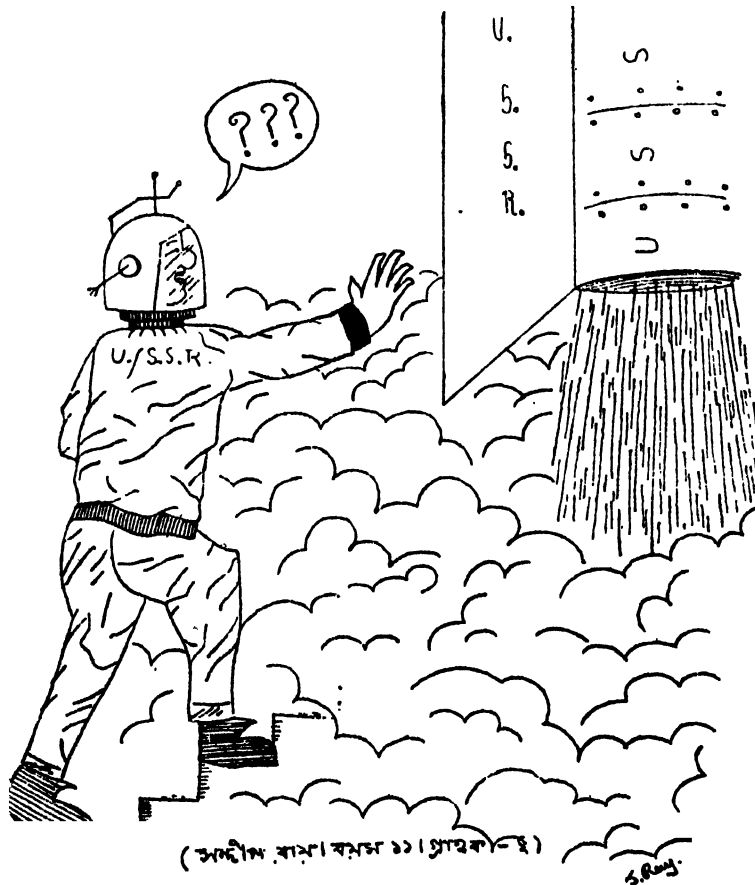
আঁধার এখন পালিয়ে গেল
রাত্রি হোলো শেষ
কাকের ডাকে উঠলো জেগে
ঘুমে ভরা দেশ।
নীল আকাশে ধরলে বুঝি
লাল আলোরই রেখা
অরুণকুমার নীল আকাশে
এবার দিল দেখা॥

পলাশী ভ্রমন

সুবীর কিশোর চক্রবর্তী—গ্রাহক নং (এন ৫৪৪) বয়স—৮

গত বড়দিনের ছুটিতে আমরা ঠিক করলাম যে কৃষ্ণনগর থেকে পলাশী দেখতে যাবো। আমি, ছোড়দি, মা, বাবা আর মনি (মাসী) যাব ঠিক হল। সঙ্গে আমাদের ডাক্তার কাকু কাকিমাকে নিলাম। একদিন আমরা ভোরে উঠে রওনা হলাম পলাশীর দিকে।

গাড়ি ছাড়লো। আস্তে আস্তে আমরা অনেক গ্রাম পার হয়ে গেলাম। পুরানো দিনের একটা যুদ্ধের মাঠ দেখতে পাব বলে আনন্দে হৈ চৈ শুরু করলাম গাড়িতেই। এরই মধ্যে আমাদের গাড়ি থামল এবং আমরা দেখলাম যে আমাদের সামনে বিরাট এক মনুমেণ্ট, তার গায়ে যুদ্ধের সাল খোদাই করা—২৭শে জুন, ১৭৫৭ সাল। মনুমেণ্টের দুই পাশে দুটি ছোট কামান। এ গুলি পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। চারদিকে মাঠ রয়েছে। এই হচ্ছে বিখ্যাত পলাশীর মাঠ, যেখানে লর্ড ক্লাইভ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌলাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আর বিশেষ কিছু চিহ্ন নেই সেই দিনের। এই মনুমেণ্টের একপাশে রয়েছে সরকারী ডাকবাংলো। সেখানে পলাশী যুদ্ধের একটি মডেল্ করা রয়েছে—ছোট ছোট তাঁবু পড়েছে ইংরাজ আর নবাবের সৈন্যের। কোন তাঁবু বীর মোহনলালের, কোনটি ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রের আবার কোনোটি রবার্ট ক্লাইভের।

ইংরাজদের মাত্র তিনটি তাঁবু দেখতে পেলাম। বিরাট নবাব ফৌজের কাছে ঐ সামান্য ইংরাজ যুদ্ধে জিতেছে কি করে তাই ভেবে খুব অবাক হচ্ছিলাম। এই মডেলটি দেখে মনে হচ্ছিল যেন চোখের সামনে পলাশীর যুদ্ধের সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। ঐ তো তাঁবু গুলির পাশে সেই আম বাগান। মডেল দেখা শেষ কোরে বাইরে মাঠের মধ্যে সে সব বাগানের খোঁজ করলাম। কিন্তু এখন আর তার চিহ্নও নেই।

তারপরে আমরা একটি গাছতলায় বসে আমাদের খাওয়া শেষ করলাম। কিছুক্ষণ চারিদিকে ঘুরে বেড়াবার পর আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। ওখানে একটা চিনির কল আছে। কিন্তু সেটা আর দেখা হয়নি। ফিরবার পথে পুরানো দিনের কথা মনে হচ্ছিল বারে বারে।

সকাল-বেলার ছন্দটা

গার্গী কর, গ্রাহিকা নং—২৩২৫, বয়স—১২ বৎসর

মন্দ না এই সকাল-বেলা পাখির ডাকের ছন্দটা
বৃষ্টি ভেজা মাটির থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধটা।
রৌদ্রহীন এই মেঘে ঢাকা ঝাপসা দিনের রূপটিতে,
কোকিল ডাকে কুহু কুহু কলাগাছে চুপটিতে।
বাঁশের পাতায় হাওয়ার দোলায়, মিষ্টি মধুর ঝুমঝুমি
ধানের ক্ষেতের শীষের মাথা মাটিরে যে যায় চুমি।

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা দেখে মনে ঢেউ লাগে,
পদ্যে-গানে নতুন করে ছন্দ যেন ঐ জাগে।
লাগছে ভাল বুলবুলির এই গানে গানে সুর আনা
লাগে ভাল বৃষ্টি যখন আকাশ পারে দেয় হানা।
কখন রবি ঝিলিক মারে, কখন আসে বৃষ্টিতো ;
ভগবানের ইন্দ্রজালে আচ্ছা মজার সৃষ্টিতো।

সুস্মিতা মজুমদার—গ্রাহক নং ২১৯০—বয়স—১৩

শরৎ

অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়

গ্রাহক নং—৮৬৩

বয়স ৮ বৎসর

শরৎ তুমি পরেছ আজিকে
মেঘের মালা।
হাতে নিয়েছ ফুলে ভরা
সোনার ডালা॥
নেমে এসেছ ধরণীর বুকে,
দেখ আমাদের চোখে
আর মুখে
কি যে আছে ভরি
পুলক লহরি !!
পুজো যে দ্বারে এলো,
(তোমায়) দেখেই
বোঝা গেলো ;
তুমি এসে বলে দিলে
তারি ঠিকানা,
তোমার সাথে হয়ে গেলো
মোদের চেনাজানা।
আমার মনে পুলক জাগে
তোমায় দেখে আজি,
চারিদিকে উঠল বুঝি
পুজোর বাজনা বাজি॥

মাটির দোকানদার

সংঘমিত্রা রায়, বয়স—১২, গ্রাহক নং—৪৭২

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে মামার বাড়ী কৃষ্ণনগরে বেড়াতে গিয়েছি। শুনলাম সেখানে নাকি বারোদোলের মেলা ১ মাস ধরে হবে।

মেলাটি আরম্ভ হবার ছুই একদিন পরে আমরা মেলা দেখতে গেলাম। রাজবাড়ির বিরাট চক ঘিরে মেলা বসেছে। কিন্তু একটা মাত্র দোকান চকের বারাণ্ডার উপর খুব সুন্দর সুন্দর মনোহারী জিনিস দিয়ে সাজান। আর তার কিছুটা দূরে একজন পুলিস বসে আছে। দোকানদার পিছন ফিরে একটা পুতুলের উপর হাত রেখে কি যেন ভাবছে। তখন আমরা সেখানে গিয়ে জিনিস দেখে দোকানদারকে দাম জিগেস করলাম।

কিন্তু সে ফিরে তাকায়ওনা, দাম ও বলেনা। অবাক লাগল, যে বিক্রি করার জন্য দোকান খুলেছে সে কি খদ্দের ফিরিয়ে দিতে পারে, হঠাৎ দেখলাম পুলিসটা আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে। তখন ভাল করে তাকে দেখতে গিয়ে দেখি যে সে মাটির ! মাটির দোকানদার কি করে সাড়া দেবে ? আমরা কি রকম ঠকলাম বল ত ? তোমরা এই গল্প বড়দের কাছে করো না যেন, তাঁরা ভাববেন আমি খুব বোকা।

গ্রাহকদের পাঠান ধাঁধা

অভিজিৎ দে, গ্রাহক নং—১৬১৩ বয়স—১২

(১)

প্রথম—দ্বিতীয়ে আমি সর্বজনাদৃতা,
প্রথম—তৃতীয়ে আমি ইতিহাস—খ্যাতা,
শেষ ত্রি-অক্ষরে আমি প্রাণীদের যম,
তৃতীয়—পঞ্চমে আমি নৃত্য অনুপম।
পণ্ডিতে আমারে জানে বিখ্যাত নাটক,
কি নাম আমার বল, চতুর পাঠক।

(২)

কৃত্তিবাসী রামায়ণে খ্যাত মহাবীর,
পশুহাতে ভূমে তার লোটাইল শির,
প্রথম—দ্বিতীয়ে হয় আশ্রয় সবার,
তৃতীয়ে—প্রথমে হয় বিষ্ণু অবতার,
শেষ—ত্রি-অক্ষরে তার পিতার মতন,
দ্বিতীয়—তৃতীয়ে হয় অমূল্য রতন,
প্রথম—পঞ্চমে হয় অতি গুরু ভার,
সুধীর পাঠক কর তার সারোদ্ধার।

পার্থ কুণ্ড, গ্রাহক নং—২৩৯০

তিন অক্ষরে নাম তার, নামটি মনে নাই,
উল্টো কিংবা সোজা লেখ, একই জিনিস পাই,
একটি কথা চুপি চুপি জানিয়ে রাখি ভাই,
ঐটি নিয়ে রোজ বাগানে কাজ করতে যাই !

অঞ্জন প্রকাশ সেনগুপ্ত, গ্রাহক নং—২৭০২

(১) কোনখানে ঘর বাড়ি চাওয়া হচ্ছে ?
(২) কোথায় গেলে গ্রাম সাফ্ করার আদেশ শুনতে হয় ?
(৩) কোনখানে বড় সাপ নেই ?
(৪) কোন দেশের অধিবাসীর বিচার প্রয়োজন ?
(৫) কোন জঙ্গল কুৎসিত নয় ?
(৬) কোন দেশ সবুজ ?
(৭) কালোবাজার ছাড়াই কোথায় কালোবাজার ?
(৮) কোন জায়গা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ?

চুম্বক

(পিসিমা খোকা নিয়ে বেড়াতে আসছেন বলে মিষ্টি তৈরি হচ্ছে, এই বড় প্যাঁ প্যাঁ পুতুল কেনা হচ্ছে, সবাই তাই নিয়ে মশগুল তাই ছ'বছরের সোনা আর পাঁচবছরের টিয়া রেগেমেগে বাড়ি ছেড়ে কালিয়ার বনে পালিয়ে গেল। পথে ঘড়িওলার সঙ্গে দেখা, সে বললে তার কলের মানুষ মাকু বনের মধ্যে আছে কিনা খুঁজে দেখতে। রাজকন্যা বিয়ে করতে চায় বলে মাকু ঘড়িওলাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাকে হাসার কাঁদার কল দিতে হবে! নইলে বিয়ে করা হবে না। বনের মধ্যে মাকুর সঙ্গে দেখা। তারপর সার্কাসের সঙ্ আর জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে তারা বটতলার হোটেলে গেল আর সেখানে বাসন ধোয়া আর পরিবেষণের চাকরি নিল। পাছে মাকুকে সবাই চিনে ফেলে তাই তার নাম দিল বেহারী।

সার্কাস-পার্টির লোকেরা বটতলায় খেলা অভ্যাস করে। যাত্বকর শূন্যে ফাঁস দিয়ে পরীদের রাণীকে নামাল!

রাত্রে হোটেলওলার জন্মদিনের ভোজ হবে। তুপুরে খাবার সময়ে হন্তদন্ত হয়ে সঙ্ এসে বলল—সর্বনাশ বনে পেয়াদা সেঁদিয়েছে! ভয়ে সকলে গা ঢাকা দিল।

এমন সময়ে ঘড়িওলা এসে হাজির—সোনাটিয়া শুনল যে সে হোটেলওলার ভাই।

মাকুর উপরে চটে গেছে ঘড়িওলা, তাকে ধরতে পারলে নাকি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে দেবে! সোনাটিয়া শুনে শিউরে উঠল—তাহলে তো মাকুকে সাবধান করে দিতে হবে!

মাকুকে খুঁজতে বেরিয়ে তারা হঠাৎ পেয়াদার দেখা পেল। আর কি তারা সেখানে থাকে? দৌড়! দৌড়! ছুটতে ছুটতেই তারা হুড়মুড় শব্দ পেল, পেয়াদা পড়েছে বাঘ ধরবার ফাঁদে!

(ছয়)

সোনা আর সেখানে দাঁড়াল না, টিয়ার হাত ধরে ঘাসজমির দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। টিয়াকে নিয়েই মুস্কিল, ও খালি দাঁড়াতে চায়, খালি বলে, 'ওর পায়ের ছাল উঠে যায় নি তো? আইডিন দিতে হবে না?'

ওকথা ভাবলে সোনারও কান্না পায়, তাই আর থামা নয়, পথ ছেড়ে বনের মধ্যে দিয়ে দৌড়তে থাকে। থেকে থেকে মুখের সামনে দু হাত তুলে চোঙা বানিয়ে ডাকে—'মাকু—উ—উ—উ' টিয়াও ডাকে—'মাকু রে—এ—এ'; কেউ সাড়া দেয় না। বনটা যেন আরো ঘন হয়ে উঠে।

দৌড়তে দৌড়তে হাঁপ ধরে, জল তেষ্টা পায়, থামতে হয়। অমনি কানে ঝিম ঝিম শব্দ হয়, গাছের পাতার মধ্যে বাতাস শোঁ—শোঁ করে, ডালের উপর থেকে কি যেন ছোট জানোয়ার চিঁড়িক-চিড়িক শব্দ করে, যেন হিক্কা তুলছে। টিয়ার হাত ধরে গাছতলা থেকে, পায়ে চলার পথে টেনে এনে সোনা বলে—'তক্ষক সাপ, ভারি বিষাক্ত।' বলেই, টিয়ার মুখ চেপে ধরে, তাই তার আর কান্না জোড়া হয় না। সোনা তার কানের কাছে বলে—

'গ্যাখ্, গ্যাখ, টিয়া, ঐ গ্যাখ্।' টিয়া অবাক হয়ে দেখে, মস্ত একটা ছুঁচোর মতো জানোয়ার আরো বড় একটা ব্যাঙের ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে চলেছে, ব্যাঙটা মাটির ওপরে হিঁচড়ে চলেছে, কি রকম একটা চিঁ-চিঁ শব্দ করছে। পথের ধার থেকে একটা ছোট শুকনো ডাল তুলে সোনা কিছু বলবার আগেই, দিয়েছে টিয়া ছুঁচোর মাথায় এক বাড়ি! ব্যাঙ ছেড়ে পত্রপাঠ ছুঁচোর পলায়ন।

ব্যাঙটা ভারি অবাক হয়ে গেছে বোঝা গেল। একটুক্ষণ চোখ পিটপিট করতে করতে কামড়ানো ঠ্যাংটাকে নিজের মুখে পুরে চুষে নিল। তারপর তিড়িং করে চার লাফে অদৃশ্য। সোনা টিয়াও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ঐ যাঃ! মাকুর কথা যে আরেকটু হলেই ওরা ভুলে যাচ্ছিল। ঘড়িওলা কি নিষ্ঠুর, মাকুকে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলে খুলে থলেয় পুরে দোকানদারকে ফিরিয়ে দেবে! কক্ষনো না। মুখ তুলে সোনাটিয়া আবার ডাক দেয়—'মাকু—উ—উ—উ—উ!' গাছের ওপর থেকে কানে আসে ক্র—র—র—ক্রু—র—র—র।

চোখ তুলে চেয়ে দেখে, ওপরের ডালে বসে মা দাঁড়কাগ নিচের ডালে বসা ছানা দাঁড়কাগকে পোকা খাওয়াচ্ছে। দুজনে প্রায় সমান বড়, কিন্তু মা দাঁড়কাগের মুখের ভেতরটা কালো কুচকুচে আর ছানা দাঁড়কাগের মুখের ভেতরটা লাল টুকটুকে।

তাই দেখে টিয়া থমকে দাঁড়ায়, সোনা তাড়া দেয়, 'ওরে, চল, চল, শেষটা মাকুকে ধরে যদি টুকরো করে থলেয় পোরে?'

আবার দৌড় দৌড়। টিয়া আবার বলে—'দুষ্টু লোকের ব্যথা লাগলেও কিচ্ছু হয় না, না দিদি?' সোনা ঢোক গিলে বলে—'ব্যথা লাগলে চলতেও পারবে না, মাকুকে ধরতেও পারবে না।' টিয়া চোখ মুছে আবার দৌড়ায়, সোনাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। দুষ্টু লোকটার জন্য বড্ড কষ্ট লাগে। ছুটতে ছুটতে ওরা ঘাসজমিতে পৌঁছে যায়, তবু মাকুর দেখা মেলে না।

ঘাসজমিতে মহা হৈচৈ, হোটেলওলার জন্মদিনের উৎসবের মহড়া চলেছে। ওরা দেখল সঙকে খুব খাটানো হচ্ছে; একটা লোক জানোয়ারদের পা ধুয়ে পালিশ লাগাচ্ছে। আর সঙ আঁতিপাঁতি ওষুধের শিশি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

টিয়া বললে—'কিসের ওষুধ? ওদের কি অসুখ করেছে?' দড়াবাজির লোকরা মহা চটে গেল, রাতে খেলা দেখানো হবে, এখন ওসব অলুক্ষুণে কথা মুখে আনা কেন? অসুখ করবে কেন? ওদের ভিটামিনের বড়ি খাওয়াতে হবে না? না তো কি অমনি অমনি খেলা দেখাবে? খেলা দেখানো অত সহজ নয়, বুঝলে?

ধমক খেয়ে সোনাটিয়ার কান্না পেল, ওদের চোখে জল দেখে, সঙই কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল। তারপর যেই না রুমাল দিয়ে চোখের জল মোছাবে বলে নিজের ঢলকো ইজেরের পকেটে হাত দিয়েছে, অমনি পকেট থেকে ছোট সবুজ কৌটো বেরিয়ে এসেছে। সঙের আনন্দ দেখে কে, 'পেয়েছি, পেয়েছি।' এক গাল হেসে টপাটপ করে একটুকরো করে গুড়ের সঙ্গে জানোয়ারদের গালে একটা করে বড়ি ফেলে দেয়, তারাও তাই খেয়ে মাথা দুলিয়ে ল্যাজ নেড়ে আহ্লাদে আটখানা! মনে হল খুব মিষ্টি খেতে।

কি ভালো দেখাচ্ছে জানোয়ারদের। সবাই আজ স্নান করেছে, গায়ে মাথায় বুরুশ ঘষেছে। গলার কলার, ঘণ্টি, আজ, সব পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ করছে। সার্কাসের লোকদের পোযাকও রোদে দেওয়া হয়েছে; দড়িতে যে কালো মেম ছাতা নিয়ে নাচে, সে একটা বড় ছুঁচ আর সুতো নিয়ে ছেঁড়া জায়গা জোড়া দিচ্ছে। নতুন কাপড় জামা ওরা কোথায় পাবে?

মেম এক গাল হেসে পরিষ্কার বাংলায় সোনাটিয়াকে বলল, 'আমি আজ সোনালি ঘুন্টি দেওয়া লাল গাউন পরব, তাতে নতুন করে জরির ফিতে লাগিয়েছি, তোমরা বার্থডে পার্টিতে কি পরে যাবে?'

সোনাটিয়া তো হাঁ! তাইতো, কি হবে তা হলে? ওদের সঙ্গে যে ঐ একটা বই দুটো ফ্রক নেই! কাল থেকে পরে আছে, কুঁকড়ে মুকড়ে একসা হয়ে আছে। দুজনে নিজেদের জামার দিকে তাকিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। সঙ ছুটে এল, 'ও কি মেম, ওদের কাঁদাচ্ছ কেন? কাঁদার কি আছে গা? হোটেলের চাকর বেহারী যে তোমাদের জন্য জামা কিনবার পয়সা দিয়েছিল তাও জানো না? এই ছাখ, কি সুন্দর জামা এনেছি, এই পরে তোমরা পার্টিতে যাবে।'

কোত্থেকে দুটো কাগজের বাক্স এনে সঙ ওদের হাতে গুঁজে দেয়। টিয়া অবাক হয়ে বলে—'বেহারী? এখানে বেহারী এসেছে নাকি? তা হলে মা মণিও—' সোনা তাকে এক ঝাঁকি দিয়ে কানে কানে বলে—'চুপ, বোকা, বেহারী হল মাকু, মনে নেই? এখানে ওর নাম করিস্ না কখনো।'

টিয়া যা কাঁদুনে, হয়তো আরেকবার ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে নিত, যদি না সঙ তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে জামা দুটো দেখাত। কি সুন্দর জামা সে বলা যায় না। একটা গোলাপি, একটা ফিকে বেগ্নি ; তলায় কুঁচি দেওয়া, গলায় ছোট্ট একটা করে রুপোলি ফুলের মতো বোতাম। দেখেই সোনাটিয়া হেসে ফেলল। মেম উঠে এল, দুজনের হাতে দু টুকরো সাদা রেশমি ফিতে দিয়ে বলল,—'এই নাও, হোটেলওয়ালার জন্মদিনে তোমাদের প্রেজেন্ট। ওবেলা চুলে বো' বেঁধো। সঙ, ওদের জুতো পালিশ করিয়ে দাও।'

ওমা, যে লোকটা ঘোড়ার খুরে পালিশ লাগাচ্ছিল, সেই তাড়াতাড়ি এসে ওদের জুতোতেও ঐ পালিশ লাগিয়ে, ন্যাকড়া ঘষে আয়নার মতো চকচকে করে দিল। হাসিমুখে সোনা বলল—'বেহারী কোথায় ?'

অমনি সবাই একটু গম্ভীর হয়ে গেল। সঙ ছাড়া ওকে এরা কেউ বোধ হয় তেমন পছন্দ করে না। দড়াবাজির ছেলেরা বলল—'চাকরের আবার অত দেমাক কিসের—বুঝি না। গটমট করে চলেফেরে, কটমট করে তাকায়, ঠোঁট ফাঁক করে সহজে দুটো কথা বলে না। কেন আমরা কি ফেলনা নাকি ? হোটেলের চাকর কিসে আমাদের চেয়ে ভালো শুনি ? মোটকথা সে অনেকক্ষণ আগে এখান থেকে চলে গেছে, আর না ফিরলে বাঁচি !

তাই শুনে টিয়া মহা রেগেমেগে আরেকটু হলেই সব কথা ফাঁস করে দিয়েছিল আর কি, ভাগ্যিস সোনা বুদ্ধি করে ঠিক সেই সময় জিগগেস করল—'আজ বিকেলে কি কি খেলা হবে বল না।'

হ্যাঁ, প্রথমেই হবে দড়াবাজি। দড়াবাজির ছোকরারা বলল—'গোড়াতেই জমিয়ে দিতে হয় কি না, নইলে লোকে শেষ অবধি বসে থাকবে কেন, বল ? দড়াবাজির মতো খেলা হয় না, একথা কে না জানে—' সঙ বাধা দিয়ে বলল, 'তারপর কুকুরদের খেলা, তারপর জাদুকরের—'

টিয়া বড় বড় চোখ করে বললে—'জাদুকর পরীদের রাণীকে নামাবে ?—' 'ওমা, তা নামাবে না, নইলে আবার কি রকম খেলা হল ! ঐ ছাখ, রাণীর পোষাক রোদে শুকুচ্ছে !' বাস্তবিকই তাই। ঘাসের ওপর এতখানি জায়গা জুড়ে পরীদের রাণীর সাদা ধবধবে পোষাক পাতা রয়েছে, তার সর্বাঙ্গে ছোট ছোট রুপোলি বুটি তোলা, পাশেই রুপোলি ডানাজোড়াও শুকুচ্ছে, তার পাশে কাগজের বাক্স খোলা পড়ে আছে, তার মধ্যে পরীদের রাণীর মাথার তারা দেওয়া মুকুট, হাতের চাঁদ বসানো রাজদণ্ড, গলার সীতাহার, হাতের তাগা, কানের ঝুমকো। দেখে দেখে সোনাটিয়া আর চোখ ফেরাতে পারে না। গয়নার সঙ্গে রুপোলি পাড় দেওয়া সাদা রেশমি রুমালও রোদে শুকুচ্ছে। কিন্তু রাণী কই ?' শুনে দড়াবাজির ছোকরাদের খুক্‌খুক্ করে সে কি হাসি !

সোনাটিয়ার চকচকে চোখ দেখে মেম বলে, 'কি বেবিরা, তোমরাও আজ রাতে নতুন জামা গায়ে দিয়ে একটু নাচো গাও না কেন ? কি বল লোকজনরা ?' তাই শুনে লোকজনেরো মহা উৎসাহ, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোনাটিয়াও নাচবে গাইবে। কি, তোমরা নাচতে গাইতে জানো ?' সোনাটিয়া খিলখিল করে হেসে ফেলল। নাচতে গাইতে জানে না আবার কি ? এই না সেদিন স্কুলের দুই ক্লাসের সব মেয়ে মিলে ফুলের মালা গলায় দিয়ে, হাত ধরাধরি করে, 'ফুলকলি, আসে অলি', গুণ্‌ গুণ্‌ গুঞ্জনে—' নাচল

গাইল, গার্জেনরা কত হাততালি দিল। তক্ষুণি সোনাটিয়া হাত ধরাধরি করে একটুখানি নেচে গেয়ে দেখিয়ে দিল। সবাই মহাখুশি।

ঠিক এমনি সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘোড়ার খেলা দেখায় যারা তারা ছুটে এল। সঙকে বলল—'এক্ষুণি এসো, ভীষণ ব্যাপার— !'

ভীষণ ব্যাপার শুনেই আবার সোনাটিয়ার মাকুর কথা মনে পড়ে গেল। ওরা এখানে দিব্যি নাচ-গান করছে, আর ওদিকে মাকু যদি বটতলার সরাইখানায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণে হয়তো স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ঘড়িওলা— ? টিয়ার হাত ধরে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে, বটতলার দিকে সোনা দৌড় দিল! মেম ডেকে বলল—'ওমা, নতুন জামা নেবে না, ফিতে নেবে না?' ফিরে এসে জামা ফিতে নিয়ে আবার ছুটল ওরা।

(ক্রমশঃ)
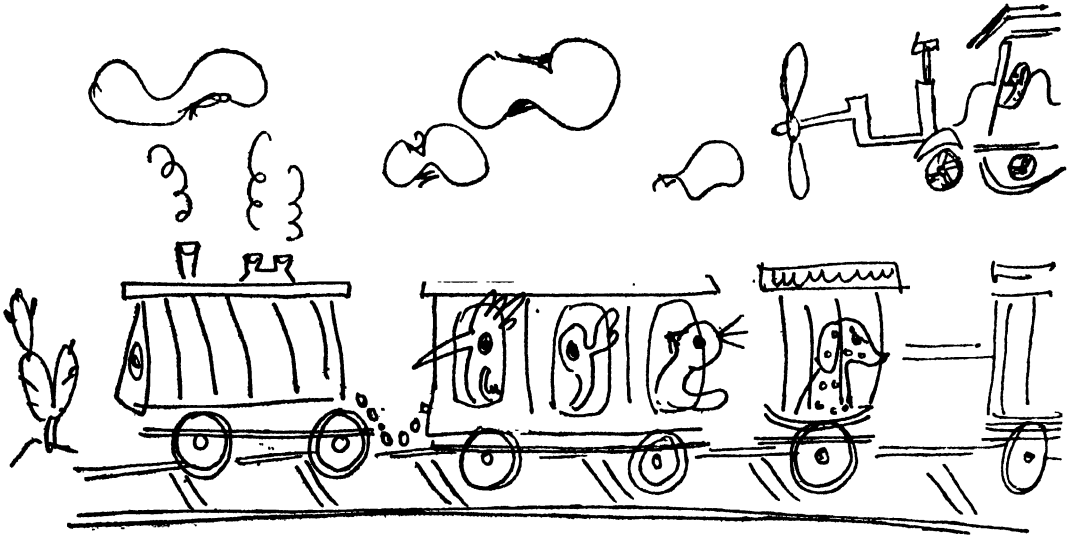
ছুটির ছড়া

অতীন মজুমদার

ছুটি এখন ! তাই কি বসে'
পড়ছো ছড়ার বই ?
মনের মতন তেমন ছড়া
বইয়েতে আর কই !

ময়ূরকণ্ঠী-নীল-আকাশের খোলা পাহাড় 'পরে
মেঘেরা যায় ছড়িয়ে ছড়া সারাটা দিন ধরে !
পদ্ম-পাতায় এক-ফোঁটা জল হাওয়াতে টল-মল,
ওর বুকেতে খুশির-ছড়া আলোতে ঝল-মল !
সকাল-বেলা সবুজ-মাঠে শিশির-ভেজা-ঘাসে
সূয্যি-মামা লক্ষ ছড়া ছড়িয়ে দিয়ে হাসে !
রঙ-বেরঙের প্রজাপতি ফুলের বুকে বুকে
ছন্দে-ভরা অনেক ছড়া কাটে মনের সুখে !
ছোট্ট নদী ময়নামতী তির্‌তিরিয়ে বয়,
ওর পাড়েতে কাশ ফুলেতে ছড়িয়ে ছড়া রয় !
একটু রোদ আর একটু ছায়া—তার সাথে ঐ বিষ্টি,
রিম্‌-ঝিম্‌ তার সুর যে ছড়া শোনায় ভারি মিষ্টি !
ছোট্ট পাখি টুনটুনিটা নাচ্‌ছে ডালিম শাখে,
শিষ্‌ দিয়েও কত ছড়াই ছড়িয়ে দিতে থাকে !

এমন ছড়া কোথায় পাবে— ?
নেই যে তেমন বই !
চাও যদি ভাই পড়তে তবে
বাইরে তাকাও ঐ !

চুম্বক

বদ্রীবাবুর বাপ-মা-মরা ভাইপো কম্বলের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার খবর পেয়ে টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল ও প্যালারাম তাকে খুঁজে দেবার প্রস্তাব আনল।

বদ্রীবাবুর ধারণা সে চাঁদে গেছে। একটা কাগজে সে লিখে রেখে গেছে—'চাঁদ, চাঁদনি চক্রধর, চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর নিরাকার মোষের দল, ছলছল খালের জল। ত্রিভুবন থরথর—চাঁদে চড়, চাঁদে চড়!'

চাঁদনির বাজারে গিয়ে চক্রধর সামন্তের মাছ ধরবার সরঞ্জামের দোকান দেখা গেল। দোকানের ছোকরার (হলধর জানা) সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানা গেল যে চক্রধরবাবুর মুখ ভীমরুলের চাকের মতন, কপালে আব আছে, রং কটকটে কালো আর ঝোল্লা গোঁফ। ছোকরার নাম চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর কিনা জিজ্ঞাসা করাতে সে রেগেমেগে দোকান বন্ধ করে দিল। তখন চারজনে লুকিয়ে থেকে দোকানের উপর নজর রাখল। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন প্যালারামের কাঁধে টোকা মেরে বলল—'ছল ছল খালের জল, তাই না? তাহলে কাল বেলা তিনটের সময়ে তেরো নম্বর শেয়ালপুকুর রোডে গেলেই তো হয়!'

পাঁচ

কলকাতায় কাঁটাপুকুর আছে, ফড়েপুকুর আছে, বেনেপুকুর, মনোহরপুকুর, পদ্মপুকুর সব আছে, কিন্তু শেয়ালপুকুর আবার কোন চুলোয়! হিসেবমতো শেয়ালদার কাছাকাছিই তার থাকা উচিত, কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া গেলনা। পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় কলকাতার রাস্তার যে লিস্টি থাকে, তাই থেকেই শেষ পর্যন্ত জানা গেল, শেয়ালপুকুর সত্যিই আছে দক্ষিণের শহরতলীতে। জায়গাটা ঠিক কোন্‌খানে, তা আর তোমাদের না-ই বললুম।

শেয়ালপুকুরের সন্ধান তো পাওয়া গেল, তেরো নম্বরও নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু প্রশ্ন হল, জায়গাটাতে আদৌ যাওয়া উচিত হবে কিনা? কাঁটাপুকুরে কোনো কাঁটা নেই—সে আমি দেখেছি; মনোহরপুকুরে আমার মাসতুতো ভাই লোটন দা থাকে—সেখানে কোনো মনোহরপুকুর আমি দেখিনি, ফড়েপুকুরেও নিশ্চয়ই ফড়েরা সাঁতরে বেড়ায় না। শেয়ালপুকুরের চারপাশেও খুব সম্ভব এখন আর শেয়ালের আস্তানা নেই—বেলা তিনটের সময় সেখানে গেলে নিশ্চয় আমাদের খ্যাঁক-খ্যাঁক করে কামড়ে দেবে না। কিন্তু—

কিন্তু চাঁদনীর সেই সন্দেহজনক আবহাওয়া? সেই ঝোল্লা গোঁফ আর কপালে আবওলা চক্রধর সামন্ত কিংবা সেই নাকেশ্বর চন্দ্রকান্ত—যাদের এখনো আমরা দেখিনি? সেই তেলেভাজা খাওয়া হলধর আর তালঢ্যাঙা সেই খলিফা-চেহারার লোকটা? এ-সবের মানে কী? ছড়াটা দেখছি ওরা সবাই-ই জানে আর এই ছড়ার ভেতরে লুকিয়ে আছে কোনো সাংকেতিক রহস্য। পটলডাঙার বিচ্ছুমার্কা কম্বল ও ছড়াটা পেলোই বা কোথায়, আর কারাই বা তাকে নিরুদ্দেশ করল?

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে ঝালমুড়ি খেতে খেতে এই সব ঘোরতর চিন্তার ভেতরে আমরা চারজন হাবুডুবু খাচ্ছিলুম। বাঙাল হাবুল সেন বেশ তরিবৎ করে একটা লাল লঙ্কা চিবুচ্ছিল, আর তাই দেখে গা শিরশির করছিল আমার। টেনিদার খাড়া নাকটাকে দু আনা দামের একটা তেলে ভাজা শিঙাড়ার মতো দেখাচ্ছিল, আর ক্যাবলার নতুন চশমাটা ইস্কুলের ভূগোল-স্যারের মতো একেবারে ঝুলে এসেছিল ওর ঠোঁটের ওপর।

টেনিদা মুড়ি চিবুতে চিবুতে বললে, 'পুঁদিচ্চেরি! মানে, ব্যাপার খুব ঘোরালো।'

আমরা তিনজনেই বললুম, 'হুঁ।'

টেনিদা বললে, 'যতই ভাবছি, আমার মনটা ততই মেফিস্টোফিলিস হয়ে যাচ্ছে।'

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বললে, 'মেফিস্টোফিলিস মানে শয়তান।'

'শাটাপ্!'—টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, 'বিদ্যে ফলাসনি। লোকগুলোকে কি রকম দেখলি?'

আমি বললুম, 'সন্দেহজনক।'

হাবুল লঙ্কা চিবিয়ে জিভে লাল টেনে 'উস-উস' করছিল। তারই ভেতরে ফোড়ন কাটল: 'হ, খুবই সন্দেহজনক। ক্যামন শিয়াল-শিয়াল মনে হইল।'

আমি বললুম, 'তাই শেয়ালপুকুরে থাকে।'

ক্যাব্‌লা বললে, 'খামোশ্‌! চুপ কর দেখি। আমি বলি কি টেনি দা, আজ দুপুরবেলা যাওয়াই যাক ওখানে।'

টেনিদা শিঙাড়ার মতো নাকটাকে খুচুর খুচুর করে একটুখানি চুলকে নিলে। তারপর বললে, 'যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ফেঁসে যাই? মানে—লোকগুলো—'

'চার-চারজন আছি, দিন-দুপুরে আমাদের কে কী করবে?'

'তা ঠিক। তবে কিনা—' টেনিদা গাঁইগুঁই করতে লাগল।

'হ, সকল দিক ভাইবা-চিন্তাই কাম করন উচিত।'—ভাবুকের মতো মাথা নাড়তে লাগল হাবুল সেন:

'আর-তোমার হইল গিয়া—কম্বলটা একটা অখাদ্য মানকচু। অরে শূয়ারেও খাইবো না। খামাকা সেইটারে খুঁজতে গিয়া বিপদে পড়ুম ক্যান?'

'হবে না! ছিঃ ছিঃ!'—এমনভাবে ধিক্কার দিয়ে কথাটা বললে ক্যাবলা, যে হাবুল একেবারে নেতিয়ে গেল, স্রেফ মানকচু সেদ্ধর মতো। চশমাটাকে আরো ঝুলিয়ে দিয়ে এবারে সে অঙ্ক-স্যারের মতো কটকটে চোখে চাইল হাবুলের দিকে।

'তুই এত স্বার্থপর! একটা ছেলে বেঘোরে মারা যাচ্ছে, তার জন্যে কিছু না করে স্বার্থপরের মতো নিজের গা বাঁচাতে চেষ্টা করছিস! শেম্‌—শেম্‌।'

হাবুল জব্দ হচ্ছে দেখে আমিও বললুম, 'শেম্‌-শেম্‌!' কিন্তু বলেই আমার মনে হল, হাবুলও কিছু অন্যায় বলে নি। কম্বলের মতো একটা বিকট বাঁদর ছেলে—যে কুকুরের কানে লাল পিঁপড়ে ঢেলে দেয়, লোকের গায়ে পটকা ফাটায় আর প্রণামের ছল করে খ্যাঁচখেঁচিয়ে পায়ে খিমচে দেয়, সে যদি আর নাই ফিরে আসে, তাতে দুনিয়ার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কিন্তু তক্ষুনি আমি ভাবলুম, কম্বলের মার কী হবে? ছেলে-হারানোর দুঃখ তিনি কেমন করে সহ্য করবেন? আর কোনো ছেলে যদি খারাপ হয়েই যায়, তা হলেই কি তাকে বাতিল করা উচিত? খারাপ ছেলের ভালো হতে ক'দিনই বা লাগে? না হলে, ক্লাইভ কী করে ভারতবর্ষ জিতে নিলেন

আমি ভাবছিলুম, ওরা কী বলছিল শুনতেই পাইনি। এবার কানে এল, টেনিদা বলছে, 'কিন্তু শেয়ালপুকুরে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ওরা যদি আমাদের আক্রমণ করে?'

'করুক না আক্রমণ। আমাদের লীডার টেনিদা থাকতে কী ভয় আমাদের?'—ক্যাবলা টেনিদাকে তাতিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার এক-একটা ঘুষি লাগবে, আর এক একজন দাঁত ছরকুটে পড়বে।'

'হে—হে, মন্দ বলিসনি।'—সঙ্গে সঙ্গে টেনিদার দারুণ উৎসাহ হল আর সে ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দেবার জন্যে হাত বাড়ালো। কিন্তু ক্যাবলা চালাক, চট করে সরে গেল সে, তার পিঠ সঙ্গে সঙ্গেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল, আর চাঁটিটা এসে চড়াৎ করে আমার পিঠেই চড়াও হল।

আমি চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠলুম, আর হাবলা দারুণ খুশি হয়ে বললে, 'সারছে—সারছে—দিছে

প্যালার পিঠখান অ্যাক্কেবারে চ্যালা কইরা ! ইচ্-চ্—পোলাপান !'

টেনিদা বললে, সাইলেন্স্—নো চ্যাচামেচি ! পোলাপান ! বেশি গণ্ডগোল করবি তো সব-গুলোকে আমি একেবারে জলপান করে ফেলব। যা—বাড়ি পালা এখন। খেয়েদেয়ে সব দেড়টার সময় হাজিরা দিবি এখানে। এখন ট্রুপ্ ডিসপার্স—কুইক্ !'

বাস থেকে নেমে একটু হাঁটতেই আমরা দেখলুম ছুটো রাস্তা বেরিয়েছে ছু দিকে। একটা ধোপাপাড়া রোড্, আর একটা শেয়ালপুকুর রোড। হাবুল আমাকে বললে, 'এই রাস্তার ধোপারা গিয়া না ওই রাস্তার শিয়ালপুকুরে কাপড় কাচে। বোঝছস্ না প্যালা ?'

আমি বললুম, 'তুই থাম, তোকে আর বোঝাতে হবে না।'

'তরে একটু ভালো কইর‍্যা বুঝান্ দরকার। তর মগজ বইল্যা তো কিছুই নাই, তাই উপকার করবার চেষ্টা কোরতে আছি। বুঝিস নাই ?

এমন বিচ্ছিরি করে বলছিল যে ইচ্ছে হল হাবুলের সঙ্গে আমি মারামারি করি। কিন্তু তার আর দরকার হলনা, বোধ হয় ভগবান কান খাড়া করে সব শুনছিলেন, একটা আমের খোসায় পা দিয়ে ছুম করে আছাড় খেলো হাবুল।

টেনিদা আর ক্যাবলা আগে আগে যাচ্ছিল। টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'আঃ, এই প্যালা আর হাবলাকে নিয়ে কোনো কাজে যাওয়ার কোনো মানে নেই, ছুটোই পয়লা-নম্বরের ভণ্ডুলরাম। এই হাব্লা—কী হচ্ছে ?'

আমি বললুম, কিছু হয়নি। হাবলার মগজে জ্ঞান একটু বেশি হয়েছে কিনা, তাই বইতে পারছে না—ধপাধপ আছাড় খাচ্ছে।

'হয়েছে, তোমায় আর ওস্তাদি করতে হবে না। শিগ্গীর আয় পা চালিয়ে।'

রাস্তার ছুধারে কয়েকটা সেকেলে বাড়ি, কাঁচা ড্রেন থেকে ছুর্গন্ধ উঠছে। গাছের ছায়া ঝুঁকে পড়েছে এখানে ওখানে। ভর ছুপুরে লোকজন কোথাও প্রায় নেই বললেই চলে। কোথায় যেন মিষ্টি গলায় দোয়েল ডাকছিল। এখানে যে কোনোরকম ভয়ের ব্যাপার আছে তা মনেই হল না।

আরে, এই তেরো নম্বর ! উঁচু পাঁচীল দেওয়া বাগানওলা একটা পুরোনো বাড়ি। গেটের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে বাংলা হরফে নম্বর লেখা। গেট খোলাই আছে, কিন্তু ঢোকবার জো নেই। গেট জুড়ে খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে পেল্লায় এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান, তার হাতির মতো পেট দেখে মনে হল, সে বাঘা কুস্তিগীর আর দারুণ জোয়ান—আমাদের চারজনকে সে এত কিলে চিঁড়ে-চ্যাপটা করে দিতে পারে।

আমরা চারজন এ-ওর মুখের দিকে তাকালুম। এই জগদ্দল লাসকে ঘাঁটানো কি ঠিক হবে ?

টেনিদা একবার নাক-টাকগুলো চুলকে নিলে। চাপা গলায় বললে, পুদিচ্চেরি !' তারপর আস্তে আস্তে ডাকল :

'এ দারোয়ানজী !'

কোনো সাড়া নেই।

ও দারোয়ান স্যার

এবারেও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।'

'পাঁড়ে মশাই !'

দারোয়ান জাগল। ঘুমের ঘোরে কী যেন বিড়বিড় করতে লাগল। আর তাই শুনেই আমরা চমকে উঠলুম।

দারোয়ান সমানে বলছিল : 'চাঁদ—চাঁদ্‌নি—চক্রধর—চাঁদ—চাঁদনি—চক্রধর—'

টেনিদা ফস করে বলে বসল : 'চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর'।

কথাটা মুখ থেকে পড়তেই পেলোনা। তক্ষুনি—যেন ম্যাজিকের মতো উঠে বসল দারোয়ান। হড় হড় করে খাটিয়া সরিয়ে নিয়ে, আমাদের লম্বা সেলাম ঠুকে বললে, যাইয়ে—অন্দর যাইয়ে—'

আমরা বোধ হয় বোকার মতো মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছিলুম। ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঠ্যাঙানি দেবে নাকি? যা রাক্ষসের মতো চেহারা, ওকে বিশ্বাস নেই।

দারোয়ান আবার মুচকে হেসে বললে, 'যাইয়ে—যাইয়ে—'

এরপরে আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। আমরা দুরু দুরু বুকে দারোয়ানের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। আর ঢুকতেই তক্ষুণি খাটিয়াটা টেনে গেট জুড়ে শুয়ে পড়ল দারোয়ান—যেন অঘোরে ঘুমে ডুবে গেল।

কিন্তু আমরা কোথায় যাই ?

সামনে একটা গাড়িবারান্দাওলা লাল রঙের মস্ত দোতলা বাড়ি। তার জানলার সবুজ খড়খড়ি-গুলো সাদাটে হয়ে কব্‌জা থেকে ঝুলে পড়ছে, তার গায়ের চুণ বালির বার্নিশ খসে যাচ্ছে, তার মাথায় বট অশথের চারা গজিয়েছে। একটা ভালো ফুলের বাগান ছিল, এখন সেখানে আগাছার জঙ্গল। একটা মরকুটে লিচু গাছের ডগায় কে যেন আবার খামোকা একটা কালো কাক-তাড়ুয়ার হাঁড়ি বেঁধে রেখেছে।

আমরা এখানে কী করব, বোঝবার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে তালঢ্যাঙা লোকটা—সেই যাকে আমরা চাঁদনির বাজারে দেখেছিলুম—মাছি মার্কা গোঁফের নিচে মুচকি হাসি নিয়ে বেরিয়ে এল।

'এই যে, এসে গেছেন! তিনটে বেজে দু সেকেণ্ড—বাঃ, ইউ আর ভেরি পাংচুয়েল।'

আমরা চারজনে গা ঘেঁষে দাঁড়ালুম। যদি বিপদ কিছু ঘটেই, এক সঙ্গেই তার মোকাবেলা করতে হবে!

টেনিদা আমাদের হয়ে জবাব দিলে, 'আমরা সর্বদাই পাংচুয়াল !'

'গুড্‌—ভেরি গুড্‌!'—লোকটা এগিয়ে চলল, তাহলে আগে চলুন মা নেংটীশ্বরীর মন্দিরে। তিনি তো এ যুগের সব চাইতে জাগ্রত দেবতা।

'নেংটীশ্বরী।'

লোকটা অবাক হয়ে ফিরে তাকালো: 'নাম শোনেন নি? মা নেংটীশ্বরীর নাম শোনেন নি? অথচ চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের খবর পেয়েছেন? এটা কি রকম হল?'

আমরা বুঝতে পারছিলুম, একটা কিছু গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। ক্যাব্‌লা সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলে। 'না-না, নাম শুনব না কেন? না হলে আর এখানে এলুম কী করে?'

'তাই বলুন।'—লোকটা যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল: 'আমার একেবারে ধোঁকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। জয় মা নেংটীশ্বরী!'

আমরাও সমস্বরে নেংটীশ্বরীর জয়ধ্বনি করলুম।

—ক্রমশঃ

পঞ্চ

তুলসী চন্দ্র মুখটী

কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস, পুষ্কর,
পঞ্চতীর্থ মানি;
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক,
পঞ্চেন্দ্রিয় জানি।
পঞ্চামৃতে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি,
মধু নাম করি,
পঞ্চ কন্যায় অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী,
তারা, মন্দোদরী।
বট, অশ্বত্থ, আমলকী, বিল্ব, অশোকেরে
পঞ্চবট কয়,
মনি, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং প্রবালে
পঞ্চরত্ন হয়।

শব্দছক-প্রতিযোগিতা

গ্রাহক-গ্রাহিকা, সাবাশ ! সাবাশ !!
বাপরে বাপ !!! বাস্ রে বাস্ !!!!
সাবাশ ! সাবাশ !!

শব্দছকের এল উত্তর—
এক—দুই—তিন—এল পর পর !
চার—পাঁচ—ছয়—আট—দশ—বিশ !!
পঁচিশ !!! সাতাশ !!!! ত্রিশ !!!!! চল্লিশ !!!!!!
আরে আরে, এ কি ?
সবই ঠিক দেখি !
পঁয়তাল্লিশ !! উনপঞ্চাশ !!!
বাস্ রে বাস্ !!!! সাবাশ, সাবাশ !!!!!
আরো উত্তর আসে পর পর,
আরে ! আরে !! আরে !!! ষাট-সত্তর !!!!
আশি-নব্বই পেরোল এবার !!!!!
আরে ! আরে !! হল একশ'ও পার !!!
সাবাশ ! সাবাশ !! বলি বারবার !!!!
বাস্ রে বাস্ !
সাবাশ !! সাবাশ !!!

কিন্তু, হল যে মুস্কিল ভারি,—
কি ভাবে প্রাইজ দিতে বল পারি ?
তিনটি-মাত্র প্রাইজ যে রাখা,
পাঁচ, দশ আর পনেরটি টাকা !
তিরিশটি টাকা আছে মোটে হাতে !
তিনটি হাজার পয়সা যে তাতে !
দুইশ' গ্রাহক যদি ঠিক লেখে,
পনের পয়সা পাবে প্রত্যেকে !!

তার চেয়ে এক কাজ করা যাক,
যারা পাবে তবু কিছু বেশি পাক,
সঠিক জবাব দিল যে পাঠিয়ে,
করব লটারি সকলকে নিয়ে।
লটারিতে যারা প্রথম ছ'জন,
পাঁচ টাকা করে পাবে সে কজন।
আর ছেপে দেব নাম সবাকার
সাবাশ ! সাবাশ !! বলব আবার !
গ্রাহক-গ্রাহিকা—বাস্ রে বাস্।
বাপরে বাপ !! সাবাশ !!! সাবাশ !!!!

সন্দেশের আরো গ্রাহক দরকার

- প্রত্যেক গ্রাহক-গ্রাহিকা এই মাস থেকেই কয়েকটি নতুন গ্রাহক কর।
- যারা কেবল পাঠক, তারা এবার গ্রাহক হয়ে যাও।
- বার্ষিক ৯৲ অথবা ষাণ্মাসিক ৪.৫০ টাকা নগদ, মনিঅর্ডার পোস্টাল অর্ডার অথবা চেকে পাঠিয়ে দাও।
- চাঁদার সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, বয়স এবং অভিভাবকের নাম লিখে জানাও।
- নিয়মাবলী ভাল করে দেখে নিতে ভুলো না কিন্তু।

* আগামী মাসের সন্দেশে তোমরা শব্দছকের উত্তর, লটারির ফলাফল, আর সঠিক-উত্তর দাতাদের নাম জানতে পারবে।

নতুন ধাঁধা

মনে রেখো ঃ পাঠাবার শেষ দিন—১৫ই নভেম্বর।

(১)

কে ?

ছোট বড় কত রূপ, কত তার কাজ,
কত কোটি কোটি আছে পৃথিবীর মাঝ।
বৈরাগী কুপিত হয় নাহি পেলে তায়,
বারো মাসে একবার নাম শোনা যায়।
কোনো কথা বলে নাকো, সব কথা বলে,
ছেলে-বুড়ো সকলের হাতে হাতে চলে।

(২)

নিঝুম কোণেতে চুপ করে কেন লুকিয়ে থাক ?
একদম আজ বাজে ভাবনা ও চিন্তা রাখ।
নেহাৎ বোকামি নীরবে লজ্জা পাওয়া হেন,
দলেতে মেশ ত, দলছাড়া হয়ে যাওয়া কেন ?
হাস খেল আর রঙ্গ নতুন শুরুই কর,
বীণাটা বাজাও, নাচো, গাও, বাঁয়া তবলা ধর।
খাও কাটলেট, গরম শিঙ্গাড়া, পাঁপড়ভাজা ;
এত মিহিদানা, অত সীতাভোগ, গজা ও খাজা।
সুগন্ধ রাজভোগ আর মিঠে লেডিক্যানিং ;
বাটিভরা সব কুলপি মালাই, আইসক্রীম্।
দিশী আম-গোলা পছন্দ নয় ? ল্যাংড়া চাই ?
না যদি থাকে ত, কী হয়েছে ? কুছ্ পরোয়া নাই !

ক্ষতি কিবা বল, আর কিছু ফল যদি না পাও,
করো নাকো ভুল, কটা পেলে ফুল, লিখে জানাও !

উপরের পদ্যটিতে কটা ফুলের নাম লুকোন আছে—খুঁজে বার কর।

(৩)

এক ভদ্রলোকের একটি সমচতুষ্কোণ জমি ছিল। তিনি তাঁর চারটি ছেলেকে ঠিক একই আকারের ও আয়তনের চার ভাগে জমিটি ভাগ করে দেবেন বলেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এক কোণ দিয়ে, সমচতুষ্কোণ আকারে, জমির এক চতুর্থাংশ তাঁকে আগেই বিক্রি করে দিতে হল। কিন্তু তিনি মারা যাবার পর দেখা গেল যে বাকি জমিটা তিনি ঠিক একই আকারের ও সমান আয়তনের চার ভাগে ভাগ করে চারটি ছেলেকে দিয়ে গেছেন।
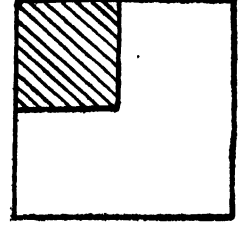
বল তো বাকি জমিটা কি ভাবে ভাগ করা হয়েছিল? (এঁকে দেখিয়ে দাও)।

(৪)

মনোমোহিনী মহাবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্তা কমলিকা কুশারি, শ্রীযুক্তা খঞ্জনা খাসনবিশ এবং সর্বশ্রী গদাধর গোস্বামী, ঘনশ্যাম ঘোষ ও চঞ্চল চ্যাটার্জি অধ্যক্ষ, সহাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, খাজাঞ্চি ও কেরাণীর কাজ করেন, তবে কে যে ঠিক কি করেন তা জানি না।

কলেজ-জীবনে অধ্যক্ষ ও খাজাঞ্চি হোস্টেলের একই ঘরে থাকতেন। অধ্যাপক মহাশয় অবিবাহিত।

শ্রীমতী কুশারির সঙ্গে চঞ্চলবাবুর কর্মক্ষেত্রের বাইরে কোন যোগাযোগ নেই।

অধ্যক্ষ তাঁর স্বামীর বেতন বৃদ্ধি করেন নি বলে গোস্বামীপত্নী মর্মাহত হয়েছেন।

কেরাণী ও খাজাঞ্চির মধ্যে সম্প্রতি বিয়ে ঠিক হয়েছে।

এ বিষয়ে তাঁদের নানা ভাবে সাহায্য করছেন ঘনশ্যামবাবু। বল তো এঁরা কে কি কাজ করেন?

চিঠিপত্র

(১) তপনকুমার মণ্ডল, পানিহাটি ক্লাব, কিশোর বিভাগ, বয়স ১৫, ক্লাবের গ্রাহক সংখ্যা দিয়ে ও নিজের বয়স দিয়ে প্রতিযোগিতা ছাড়া আর সব কিছুতে যোগ দিতে পার, লেখা পাঠাতে পার।

(২) কৃষ্ণগোপাল ঘোষ ২৫৮০ বয়স ১৪, প্রথম পর্যায়ের সন্দেশ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদাদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। এই পর্যায় দশবছরের বেশি চলেছিল।

(৩) জয়শ্রী মজুমদার, ১২৬৭, বয়স ১২, পত্রবন্ধু চাই, সখ, বইপড়া, গান, ডাকটিকিট সংগ্রহ ও বিভিন্ন দেশের আচার নিয়ম জানা। পত্রবন্ধু বিদেশী হলেই ভালো। কিন্তু মুস্কিল হল যে সন্দেশের গ্রাহকগ্রাহিকাদের মধ্যে বিদেশী কেউ নেই, তবে বিদেশবাসী থাকতে পারে।

প্রিয়ম্বদা দেবীর ধারাবাহিক উপন্যাস পঞ্চুলাল যে বিখ্যাত ইটালিয়ান গল্প পিনকিওর বাংলা সংস্করণ সে তো আমরা ছেপেই দিয়েছিলাম, পড় নি?

(৪) সুভাশিস গোস্বামী, ২৭০৪, বয়স ১২; তোমার দাদার বয়স যদি ১৬ বেশি না হয়, নিশ্চয় লিখতে পারে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না; মনোনীত হলে ছাপা হয়, কিন্তু হাতপাকাবার আসরের লেখা সম্পর্কে চিঠিপত্র লিখবার অত সময় কোথায়? কবিতাটি ভাই, ছাপা গেল না।

(৫) বন্দন হালদার, ১৭০৬, বয়স ১১; পুরোনো কার্ডেই চলবে বই কি। শুনে খুসি হবে প্রফেসর শঙ্কুর বই বেরিয়েছে।

(৬) লিপিকা মজুমদার—১৬৫২, বয়স ১৫, বেশ তো হাতপাকাবার আসরের জন্য টুকিটাকি খবর লিখে পাঠিও, খবরটি কোথায় পেলে তাও জানিও, নেহাৎ বাজে খবর যেন না হয়। অনুবাদ ছাপা যায় বই কি, একেবারে পুরোপুরি অনুবাদ না হয়ে গল্পের সারাংশও দেওয়া চলে।

(৭) সমীরকুমার দে এন্ ২৪১৯, বয়স ১৪, পত্রবন্ধুদের ঠিকানা দেবার আমাদের নিয়ম নেই, সন্দেশ কার্যালয়ে তাদের গ্রাহক সংখ্যা দিয়ে চিঠি লিখো, আমরা পাঠিয়ে দেব।

(৮) জয়ন্তী ঘোষ, এন্ ২৩৫৬, বয়স ১৫, নিয়মিত যারা ধাঁধাঁর উত্তর ও লেখা পাঠায় এবং প্রতিযোগিতায় যোগদান করে, তাদের সবাইকে পুরস্কার দিতে গেলে যে দেউলে হয়ে যাব।

(৯) করবী গুপ্তা, ২৪২৩, বয়স ১৬, না, না, সেরকম খারাপ কোথায় আমরা? পচা মাছের সুবাসটা মন্দ হয় নি, ছাপালেও ছাপা যায়।

(১০) শুক্লা মৈত্র, ১২৮, বয়স দাও নি কেন? উত্তর দেওয়া যাবে কি করে? বয়সটা দিও, কেমন?

(১১) কুণালকুমার রায়, এন্ ২৪৫৬, বয়স ১৪, শঙ্কুর গল্পও আরো পাবে, বইও বেরিয়ে গেছে। খুশি তো?

(১২) সুমিতকুমার ঘোষ, ১৫৯, নিশ্চয় লেখা পাঠিও। কপি রেখে পাঠিও।

পত্রবন্ধু চাই

(১) কাজল দত্ত—২১৬২ ; বয়স ১২ ; সখ, গান, গল্পের বই, দেশভ্রমণ।

(২) শমিতা মুখোপাধ্যায়—৪২৭ ; বয়স ১২ ; সখ, ছবিআঁকা, বই পড়া, ডাকটিকিট ও কার্ড সংগ্রহ।

(৩) কুণালকুমার রায়—এন্ ১৪৫৬ ; বয়স ১৪ ; সখ, ডাকটিকিট সংগ্রহ, বইপড়া, ম্যাজিক।

(৪) অভীককুমার ভট্টাচার্য, ২৫৮১—বয়স না দিলে পত্রবন্ধু হওয়া যায় না। নতুন করে চিঠি লিখো।

(৫) শমিতা দাস ২৩৬ ; বয়স ১২ , সখ, ডাকটিকিট সংগ্রহ বই পড়া, খেলোয়াড়দের ছবি জমানো।

(৬) সমীরকুমার দে, ২৪১৯ বয়স ১৪ ; সখ, বইপড়া, ডাকটিকিট সংগ্রহ, ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা।

(৭) কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, ২৫৮০ (১১২৫৮০ আবার কোথায় পেলে ?) বয়স ১৪, সখ, বই পড়া, ছবিআঁকা, বেড়ানো।

(৮) সৌমেন্দু সরকার ; ২১৬৫ ; বয়স ১৪ ; সখ, ডাকটিকিট, বিদেশী মুদ্রা ও হস্তলিপি সংগ্রহ।

(৯) সুমিতকুমার ঘোষ ; ১৫৯ ; বয়স ১৩ ; সখ, বইপড়া, সাঁতার, গান, খেলা ও খেলোয়াড়দের ছবি সংগ্রহ।

ক্রীড়াজগৎ

কার্তিক বোস

(বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীকার্তিক বোস সন্দেশের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে ভারতীয় ক্রিকেট সম্বন্ধে লিখতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এই সংখ্যায় তাঁর লেখার ভূমিকাটুকু ছাপা হল। সঃ সঃ)।

আই এফ্ এ শিল্ড্ ফাইন্যাল খেলা হয়ে যাবার পর এ বছরের মতন ফুটবলের মরসুম শেষ হল আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়ামোদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করল আগামী ক্রিকেটের খেলা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এবার ভারতবর্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে আসবেন এইরূপ স্থির ছিল, কিন্তু অনিশ্চিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্য তাঁদের সে পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয়েছে। ভারতীয়-ক্রীড়ারসিকরা এতে খুবই দুঃখিত হয়েছেন সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ তরুণেরা। আমি কিন্তু তাদের অধৈর্য হতে নিষেধ করি। বিগত দুই বৎসরের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে। কিন্তু, আমার মতে, ঠিক এই মুহূর্তে বিশ্ববিখ্যাত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট-দলের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা দিতে গেলে হয়তো তার ফল ভাল নাও হতে পারে, প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ খেলোয়াড়েরাও কেউ কেউ ভেঙ্গে পড়তে পারে।

ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং তার ফলে সারদেশাই, হনুমন্ত সিং, চন্দ্রশেখর, ভেঙ্কটরাঘবন্ ইত্যাদি খেলোয়াড়দের যে উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে, কিছুটা সময় পেলে যে তারা আরো আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় হবেন তাতে সন্দেহ নাই। ঠিক এই মুহূর্তে এক জবরদস্ত বিপক্ষ দলের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় নামলে হয়তো বা তাদের খেলোয়াড়ি মনোভাবের উপরও কিছু কুফল হতে পারে—প্রত্যেক টেস্ট খেলায় ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন করে পরীক্ষা দিয়ে চলা তো

আর সোজা কথা নয়! সুতরাং এই ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের খেলা বন্ধ হওয়াটাকে শাপে বর বলে মনে করতে পারি।

পূর্বোল্লিখিত খেলোয়াড় চারটি যে আশ্চর্য সাবলীলতার সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষে আরোহণ করেছেন সেটাকে অভূতপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হবে না। এদের যথাযথ পরিণতি ঘটলে এবং এই রকম আরো দু চারটি খেলোয়াড়ের উদ্ভব হলে একদিন ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের মতনই বিশ্ববিখ্যাত হবে।

অবশ্য ওদের একটা মস্ত বড় সুবিধা হল এই যে ওদের অন্ততঃ দুটি এমন বোলার আছে যারা যেমন ক্ষিপ্র তেমনিই আবার নির্ভুলভাবে বল নিক্ষেপ করতে পারে এবং চরম সংঘর্ষের মুহূর্তে তারা এমন দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে যে বিপক্ষ দলের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের আবার বোলারেরই অভাব। আমাদের যদি যথার্থ ভাল দুটি ফাস্ট্ বোলার থাকত, তাহলে এখনই হয়তো আমরা পৃথিবীর যে কোন ক্রিকেট দলের সমকক্ষ দল তৈরী করতে পারতাম। মনে মনে ভেবে দেখ দেখি—(১) পাটৌডি (ক্যাপটেন) (২) এঞ্জিনিয়ার (৩) কুন্দেরাম (৪) আর দেশাই (৫) বোরদে (৬) হনুমন্ত শিং (৭) জয় সিমা (৮) চন্দ্রশেখর (৯) ভেঙ্কটরাঘবন (১০) এবং (১১) দুইটি উঁচুদরের ফাস্ট্ বোলার!

কি? কেমন মনে হচ্ছে? সাংঘাতিক—তাই না? সন্দেশের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ভারতীয় ক্রিকেটের বিষয় ভবিষ্যতে আরো অনেক কথা বলার ইচ্ছা রইল।

এইবার টান দিলেন কাঁচ ভেঙ্গে পড়ল—আশ্চর্য দ্বীপ

পঞ্চম বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৭২ । ডিসেম্বর ১৯৬৫

ভীম সেন

—সুখরঞ্জন রায়—

পাণ্ডুর মধ্যমপুত্র নাম তার ভীম,
ত্রিভুবন কম্পমান বিক্রমে অসীম ;
পর্বতের মত উচ্চ সমুন্নত গ্রীবা ;
সমুদ্রের মত বক্ষ সুবিশাল কিবা !
দুর্মতির কালকূটে নাহি গেল প্রাণ,
নাগকুলে নাশি' বাল্যে লভিল সম্মান ;
ক্লান্ত মাতা ভ্রাতা কাঁধে দূর বনে নিয়া
রাখিল জীবন ভিক্ষা-অন্ন আহরিয়া ;
বাঁচাইল দেশ বধি ক্রুরমতি বকে,
সতীর রাখিল মান নিঃশেষি' কীচকে ;
অত্যাচারী জরাসন্ধে জয়দ্রথে নাশি'
দেখাল আশ্চর্য শক্তি—কীর্তি অবিনাশী।

গিরিসম সুবিরাট বপুটি যে ধরে,
অযুত হস্তীর বল দেহের ভিতরে ;
দেহবল হতে যার মনোবল বেশি,
ক্রোধ যার শান্ত হয় অসত্যে নিঃশেষি' ;
উদ্যত রেখেছে গদা অন্যায়ের পরে,
চলে সোজা সদা ঋজু সত্যপথ ধরে ;
ছলনা ও কূটনীতি চিতে নাহি যার,
অন্তরে বাহিরে নাহি ভিন্ন ব্যবহার ;
দুষ্টের নিকটে যেবা না নোয়ায় শির,
তারি নাম ভীমসেন, তারি নাম বীর।

কালা

(প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)

"কিনব দু'টি চীনের বাদাম, ঠাকুরদাদা, দাওনাগো দাম।"
"কি যে বলিস বুঝছিনে, ভাই ; কানে কিছু শুনতে কি পাই ?"
"ঠাকুরদাদা, চুনীর বিয়ে, খবর দেছে লোক পাঠিয়ে।
বামুন-ভোজন কালকে রেতে, তোমায় নাকি হবেই যেতে।"
"বড্ড ভালো ছোকরা চুনী ! কি লিখেছে—পড়তো শুনি।"

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক)

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে পাঁচটি অসমসাহসী ব্যক্তি অবরুদ্ধ রিচমণ্ড সহর হইতে বেলুনে করিয়া পলায়ন করিতে গিয়া প্রচণ্ড ঝটিকার প্রকোপে, একবস্ত্রে ও রিক্তহস্তে এক নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হন।

সমস্ত কাজই তাঁহাদিগকে গোড়া হইতে শুরু করিতে হইল। দারুণ পরিশ্রম করিয়া ও বুদ্ধি খাটাইয়া ক্রমে তীরধনুক, মাটির বাসন, ইঁট, লোহা, স্টিল ও নানা যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল। গ্র্যানিট পাথরের গুহায় বাসস্থান নির্মিত হইল।

কিন্তু কতগুলি বিস্ময়কর ঘটনা পরপর ঘটিতে লাগিল যাহার কোনও কিনারা করা গেল না।

যখন তাঁহারা দ্বীপটি ভালভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, সেই অবসরে কতগুলি ওরাং ওটাং আসিয়া তাঁহাদের গ্র্যানিট হাউস দখল করিয়াছিল। কোনও অজ্ঞাত কারণে ভয় পাইয়া তাহারা যখন পলাইতে শুরু করিল তখন অনায়াসে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা হইল। গুহায় ফিরিয়া আসিয়া দ্বীপবাসিগণ একটি ওরাং ওটাংকে জ্যান্ত ধরিয়া ফেলিলেন! ক্রমে সে পোষ মানিয়া গেল। তাহার নাম হইল 'জাপ'।

দুইটি ওনাগা ধরা গেল। তাহাদের সাহায্যে একটি গাড়ি চালান সম্ভব হইল।

বেলুনের আবরণটি দ্বীপেরই অন্য অংশে পড়িয়াছিল—ওনাগা-টানা-গাড়িতে করিয়া সেটি গ্র্যানিট-হাউসে লইয়া আসা হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহটা বেলুনের আবরণ দিয়া কাপড় চোপড় বানাইতেই কাটিয়া গেল। ছুঁচ, কাঁচি সেই সিন্দুকের কল্যাণে ছিলই, বেলুনের আবরণে সুতারও অভাব হইল না। স্পিলেট ও হারবার্ট খুঁটিয়া খুঁটিয়া আবরণ হইতে প্রচুর সুতা বাহির করিলেন। পেন্‌ক্রফ্‌ট সেলাই-কার্যের নিকটেও আসিল না। সাধারণতঃ নাবিকেরা সেলাই কার্যে খুব পটু হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পেন্‌ক্রফ্‌ট এ কাজটি একেবারেই পছন্দ করিত না।

বেলুনের আবরণে বার্ণিশ মাখান থাকে। সোডা ও পটাশের সাহায্যে সেই বার্ণিশ দূর হইয়া, ধপধপে মোলায়েম কাপড় হইল। সার্ট, পেন্টালুন, মোজা সমস্তই আবরণের কাপড়ে প্রস্তুত হইল,—বিছানার চাদর, রাত্রে গায়ে দিবার চাদর, কিছুই তৈরি হইতে বাকি রহিল না।

পেন্‌ক্রফ্‌টের প্রাণপণ চেষ্টায়, সিলের চামড়া দিয়া নূতন জুতাও প্রস্তুত হইল।

১৮৬৬ সালের আরম্ভ হইতেই দারুণ গরম পড়িল। এই গ্রীষ্মেও শিকার বন্ধ হইল না—স্পিলেট ও হারবার্ট য়্যাগুটি, ক্যাপিবারা প্রভৃতি শিকার করিয়া গ্র্যানিট হাউসের ভাঁড়ার পূর্ণ করিলেন।

প্লেটোর কতক জমি পরিষ্কার করিয়া চাষের উপযুক্ত করা হইয়াছে। বাকি জমি পূর্বের ন্যায় ঘাস-জঙ্গলে ঢাকাই রাখিয়া দেওয়া হইল—সেখানে ওনাগা চরিয়া বেড়াইবে।

জাকামার বন এবং আরও দূরে পশ্চিমভাগের বন হইতে বুনো শাক সব্‌জি বিস্তর আনিয়া, প্লেটোর ক্ষেতে লাগান হইল। শুকনা কাঠ ও কয়লা আনিয়া প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করা হইল। এইরূপে বারংবার যাতায়াতে পথের উন্নতি হইল অনেকখানি, আগের মত আর উবড়া খাবড়া রহিল না। খরগোশের আড্ডায় শিকারও পূর্বের মতই চলিতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ এই আড্ডাটি ছিল নদীর অপর পারে, নতুবা ইহাদিগের উৎপাতে শস্যের ক্ষেত রক্ষা করা অসম্ভব হইত। পেন্‌ক্রফ্‌ট বঁড়শি দিয়া নদীতে এবং লেকে মাছও ধরিত বিস্তর। নেব্ তেমনিই নিপুণ পাচক,—দ্বীপবাসিগণ প্রতিদিন নানা সুস্বাদু ব্যঞ্জন দিয়া, পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন। এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও দ্বীপবাসিগণ একটি জিনিসের বড়ই অভাব বোধ করিতেন—সেটি হইল পাঁউরুটি।

ম্যাণ্ডিবল্ কেপের তীরে কচ্ছপ থাকিত অসংখ্য। ইহারা সমুদ্রতীরে বালির মধ্যে রাশি রাশি ডিম পাড়িয়া রাখিত। দ্বীপবাসিগণ মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া শুধু যে ডিম আনিতেন তাহা নহে, কচ্ছপও ধরিয়া আনিতেন। কচ্ছপের সুপ অতি উত্তম খাদ্য, তাহার উপরে আবার নেব্ সুপের সঙ্গে সুগন্ধ শাক-সবজি মিশাইয়া সকলের তৃপ্তি সাধন করিত।

বুদ্ধিমান জাপ এখন টেবিল-বয়ের কাজ পাইয়াছে। সে সব সময় রান্নাঘরেই কাটায়, নেব্ যাহা করে তাহাই সে নকল করিবার চেষ্টা করে। শুধু কথা বলিতে পারে না, তাহা ভিন্ন নেবের ইঙ্গিতে সে না করিতে পারে এমন কাজ খুব কমই আছে। নেব্ আশ্চর্য ধৈর্যের সহিত জাপকে কাজ শিখায়, জাপও এমনি বুদ্ধিমান যে কোন কাজ তাহাকে একবারের বেশি দুইবার দেখাইয়া দিতে হয় না।

একদিন ব্রেকফাস্টের সময় সকলে দেখিলেন জাপ কোমরে ঝাড়ন বাঁধিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছে খাবার সময় জল দেওয়া, বাসন বদলাইয়া দেওয়া, খাদ্যের পাত্র সম্মুখে আনিয়া ধরা—এই সমস্ত কাজ সে ইঙ্গিতমাত্রে, অতি নিপুণ চাকরের ন্যায় করিয়া গেল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সকলের মনে আনন্দ আর ধরে

না! আহারের সময়, 'জাপ, একটু য়্যাগুটি রোস্ট,' 'জাপ, আর একটা প্লেট'—সকলের মুখে এই সব কথা ভিন্ন আর কিছু শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

জাপ এখন ঠিক পরিবারভুক্ত লোকের মত হইয়া গিয়াছে। সকলের সঙ্গে বনে শিকার করিতে যায়, তাহার হাতেও একটা মোটা লাঠি থাকে। গাছের উঁচু ডালে কোন ফল থাকিলে, ইসারা করিবামাত্র, সে পাড়িয়া আনে। গাড়ির চাকা মাটিতে বসিয়া গেল, জাপ চাকায় কাঁধ লাগাইয়া এমনি টান দেয়, যে চক্ষের নিমেষে চাকা উঠিয়া আসে। এই গ্র্যানিট হাউস্‌ই জাপের বাড়ি, গ্র্যানিট হাউসের লোকেরাই তাহার সর্বস্ব। পলায়নের ইচ্ছা মুহূর্তের জন্যেও তাহার মনে স্থান পায় না।

জানুয়ারির শেষভাগে দ্বীপবাসিগণ, দ্বীপের মধ্যভাগের কাজগুলি আরম্ভ করিলেন। পূর্বে স্থির করা হইয়াছিল যে রেডক্রীকের উৎপত্তি স্থানের নিকটে, ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের নিচে, ঘোড়া, গরু-জাতীয় জন্তু রাখিবার জন্য একটা কোরাল (খোঁয়াড়) প্রস্তত করিতে হইবে। মুসমনের শরীরের লোম দিয়া শীতের পোষাক তৈরি করা চাই। সুতরাং সকলের আগে খোঁয়াড়ে মুসমনের জন্য জায়গা করা দরকার। প্রতিদিন প্রাতঃকালে হার্ডিং, স্পিলেট এবং হারবার্ট, কখনো বা সকলে মিলিয়া, সেই নুতন তৈরী পথটি দিয়া নদীর উৎপত্তি স্থানে যাইতেন। সেই পথের নাম দেওয়া হইল 'কোরাল রোড'। পর্বতের দক্ষিণ ধারে পিছনের দিকে একটি স্থান ঠিক করিয়া, তাহার চারিদিকে উঁচু বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইল। বেড়ার কাঠগুলি মজবুত, ডগাগুলি চোঁখা এবং পোড়াইয়া শক্ত করা। বেড়াটি খুব উঁচু, তেমন চটপটে জন্তুও চেষ্টা করিয়া ডিঙ্গাইতে পারিবে না। খোঁয়াড় বেশ বড় করা হইল, প্রায় একশত জন্তু তাহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া সুখে বাস করিতে পারিবে।

শুধু চারিদিকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়াই কাজ শেষ হইল না—খোঁয়াড়ের মধ্যে মুসমন, ছাগল প্রভৃতি থাকিবার জন্য ঘর বানাইতে হইল। সুতরাং এই কোরাল শেষ করিতে তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। বেড়ার সম্মুখের দিকে ঠিক মধ্যখানে একটা দরজা রাখিয়া, তাহাতে মজবুত কপাট দেওয়া হইল। মুসমন হরিণের চাইতেও বলবান জন্তু, খোঁয়াড়ে আটকা পড়িলে বেড়া ভাঙ্গিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। সুতরাং হার্ডিং বেড়াটির আগাগোড়া, খানিক দূরে দূরে, খুব মজবুত কাঠের ঠেকা দিয়া দিলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারি প্রাতঃকালে, সকলে মিলিয়া, যেখানে মুসমন্‌ ছাগল প্রভৃতি দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়াইত, সেইখানে গেলেন। হার্ডিং পেন্‌ক্রফ্‌ট, নেব্‌ ও জাপকে লইয়া বনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রহরী রহিলেন। স্পিলেট ও হারবার্ট টপ্‌কে লইয়া উলটা দিক হইতে মুসমন্‌ ও ছাগলের দলকে এমনভাবে তাড়া দিতে লাগিলেন, যাহাতে তাহাদের কোরালের দিকে ভিন্ন আর যাইবার পথ রহিল না।

দলে প্রায় একশত মুসমন ছিল। তাড়া খাইয়া বেশির ভাগই পলায়ন করিল। কোরালে ঢুকিল মাত্র ত্রিশটি মুসমন ও দশটি বুনো ছাগল। দ্বীপবাসিগণের কাজের পক্ষে অবশ্য ইহাই যথেষ্ট। দেখিতে দেখিতে ইহাদের পরিবার বৃদ্ধি হইবে। তখন শুধু পশম নয়, চামড়ারও কোনও ভাবনা থাকিবে না।

বিকালে অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত হইয়া সকলে গ্র্যানিট হাউসে ফিরিলেন, পরদিন সকালে আবার কোরালে গেলেন। গিয়া দেখিলেন যে কয়েদীদল বেড়া ভাঙ্গিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই। চেষ্টায় বিফল হইয়া তাহাদিগের মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

শীত আরম্ভ হইবার পূর্বেই চাষ বাসের কাজে সকলে মন দিলেন। হারবার্ট যখনই বাহিরে যাইত, বন হইতে দরকারি কোন না কোন শাক-সবজির গাছ অথবা বীজ লইয়া বাড়ি ফিরিত। একদিন এক রকমের বীজ আনিল যেগুলি জোরে বাটিলে তেল বাহির হয়। হুবহু আলুর মত গাছ আনিল। সেই গাছ এবং আরো নানা রকমের

শাক সবজি প্লেটোর ক্ষেতে পুঁতিয়া দেওয়া হইল। এখানকার মাটি খুব উর্বর। ভবিষ্যতে চাষের ফল ভালই হইবে। গ্রীষ্মের শেষভাগে পাখির বাড়িতে দুটি বাস্টার্ড (হাঁস) জাতীয় নূতন পাখি আনা হইল। আর আসিল চমৎকার সুন্দর এবং বেশ বড় দুইটি বন মোরগ। দ্বীপবাসিগণ সকলেই বুদ্ধিমান, সাহসী এবং কার্যক্ষম। তাঁহাদের চেষ্টায় এবং ভগবানের কৃপায় এ পর্যন্ত সমস্ত কার্যেরই সুফল ফলিয়াছে।

প্রসপেক্ট্ হাইটের ধারে একটি বারান্দা তৈরী করা হইয়াছিল নেবের চেষ্টায়, লতাপাতার আবরণে, বারান্দাটিকে দেখাইত ঠিক একটি কুঞ্জের মত। দৈনিক কাজ কর্মের পর সকলে মিলিয়া সেখানে বিশ্রাম করিতেন। সেই সময় তাহাদিগের মধ্যে নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। আমেরিকার সেই যুদ্ধের কথা, নিজেদের অবস্থার কথা, লিঙ্কন দ্বীপের উন্নতির জন্য ভবিষ্যতে কি কি করিতে হইবে—ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইত। পেন্‌ক্রফ্‌ট ও হারবার্ট অর্থশূন্য ও আবোল তাবোল কত কিছু বলিত। হার্ডিং গম্ভীর ভাবে সমস্তই শুনিতেন, কিন্তু কিছু বলিতেন না। তাঁহার মনে সর্বদা এক চিন্তা ভাসিয়া বেড়াইত। দ্বীপে পর পর কতগুলি অতি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে, এপর্যন্ত কোনটারই মীমাংসা করিতে পারা যায় নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মার্চমাসের প্রথম সপ্তাহ আরম্ভ হতেই আকাশে পরিবর্তন দেখা গেল। পূবে হাওয়া, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি সমস্তই আরম্ভ হইল। দ্বীপবাসিগণ গ্র্যানিট হাউসের দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন। পেন্‌ক্রফ্‌টের মনে দারুণ ভাবনা হইল পাছে বা এই দুর্যোগে শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি হয়। বেলুনের আবরণের একটা বড় টুকরা লইয়া তখনই সে ক্ষেতে গিয়া উপস্থিত। শস্যের সবুজ ডগাগুলি সবেমাত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বেলুনের কাপড় দিয়া সেগুলিকে ঢাকিয়া দিল।

আকাশের এই দুর্যোগ এক সপ্তাহ পর্যন্ত সমানভাবে চলিল। এ সময় সকলে বাহিরের কাজ বন্ধ রাখিয়া ঘরের কাজে মন দিলেন। হাতুরি, বাটালি, রেঁদা প্রভৃতির কাজ সারাদিনই চলিত। বেলুনের কাপড়ের তৈরি জামায় বোতাম ছিল না, এঞ্জিনিয়ার হার্ডিং কাঠ কুঁদিয়া সুন্দর বোতাম বসাইলেন। গ্র্যানিট হাউসের পিছনের দিকে, গুদাম ঘরের নিকটে মাস্টার জাপের জন্য ছোট একটি ঘর করা হইল। ঘরের খাট, বিছানা, আসবাব কিছুই বাদ পড়িল না। জাপ্ কাহারও সহিত ঝগড়া করে না, তাহার ব্যবহারে বেয়াদবি নাই। পেন্‌ক্রফ্‌ট সব সময়েই বলে—'নেব, খাসা এসিস্ট্যাণ্ট হয়েছে তোমার, এমন সচরাচর দেখা যায় না।

বাস্তবিক, জাপ সকল রকমের কাজই শিখিয়াছে। সে সকলের কাপড়-চোপড় ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে। টেবিলের কাজ করে, ঘর ঝাঁট দেয়, কাঠের বোঝা বহিয়া আনে, উনান ধরায়,—আরও কত কিছু করে। প্রতিদিন সে একটি কাজ করে যাহার জন্য পেন্‌ক্রফ্‌ট মহাখুশি—রাত্রে শুইবার সময়, আগে সে পেন্‌ক্রফটের গায়ের কাপড়টি বেশ করিয়া গুঁজিয়া দিয়া তারপর নিজে শুইতে যায়।

লিঙ্কন দ্বীপে আসিয়া অবধি সকলেই বেশ সুস্থ সবল আছেন। এমন কি পোষা জন্তুগুলি পর্যন্ত বেশ হৃষ্টপুষ্ট তেজীয়ান। হারবার্ট ইতিমধ্যেই উচ্চে দুই ইঞ্চি বাড়িয়াছে। অবসর পাইলেই হারবার্ট পাঠে মন দেয়। হার্ডিংএর সঙ্গে বিজ্ঞান এবং স্পিলেটের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করে।

মার্চমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঝড়বৃষ্টি থামিল বটে, কিন্তু আকাশ তবু পরিষ্কার হইল না। কুয়াশা লাগিয়াই রহিল, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও পড়িত।

এই সময়ে ওনাগার একটি বাচ্চা হইল। কোয়ালে মুসমন পরিবার ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ছাগলেরও বাচ্চা হইয়াছে; কোয়ালের নিকট যাইবামাত্র তাহাদিগের ভ্যা ভ্যা শুনিতে পাওয়া যায়।

পিকারি থাকিবার জন্ত পাখির ঘরের কাছে একটা খোঁয়াড় তৈরি করা হইয়াছিল, সেখানে পিকারি পরিবার দিনদিন বাড়িতে লাগিল। পিকারিদের খাবার দেবার ভার ছিল মাস্টার জাপের উপর। জাপ খুব যত্নের সে কাজ করিত। মধ্যে মধ্যে সে পিকরির ছানাগুলির লেজ টানিয়া একটু আধটু তামাসা করিতে ও ছাড়িত না।—এই সময়ে একদিন পেন্‌ক্রফট্‌ সাইরাস্ হার্ডিংকে বলিলেন—ক্যাপটেন, আপনি যে বলেছিলেন একটা কল তৈরি করবেন, সিঁড়ির বদলে সেটায় চড়ে গ্র্যানিট হাউসে উঠা যায়?

হার্ডিং বলিলেন—'এটা আর তেমন মুস্কিলের কাজ কি? কিন্তু সে কলের কি এখনই দরকার পড়েছে?

'দরকার বৈ কি, ভারি বোঝা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে রীতিমত কষ্ট হয়!

'আচ্ছা, তাহলে দেখা যাবে তোমাকে খুশি করতে পারি কি না। 'কি করে করবেন? স্টিম মেশিন পাবেন কোথায়? কল ত স্টীমের বোরেও চলে আবার জলের জোরেও চালান যায়। ওয়াটার পাওয়ার দিয়ে কাজ করে নিব।

বাস্তবিক জলের শক্তিতে কল চালানর ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না। গ্র্যানিট হাউসে খাবার জলের জন্ত যে ঝরণার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেই ঝরনাটিকে বড় করিয়া কাটিয়া দিলেই জলের তোড় বাড়িবে। তখন সেই জলের সাহায্যে বেশ কল চলিবে।

ঝরনাটিকে বড় করা হইলে পর, জলের জোর অনেক বাড়িয়া গিয়া নিচে ঠিক প্রপাতের মত হইয়া পড়িতে লাগিল। অতিরিক্ত জলটা গ্র্যানিট হাউসের মেঝের কুয়াটা দিয়া সমুদ্রে চলিয়া যায়। এই প্রপাতের নিচে সাইরাস্ হার্ডিং একটা চোঙ্গার গায় কয়েকটা বৈঠা লাগাইয়া বসাইয়া দিলেন। চোঙ্গাটার সঙ্গে বাহিরের দিকে চাকায় জড়ান খুব মজপুত দড়ি লাগান হইল। সেই দড়ির অন্য মাথায় একটা বাস্কেট বাঁধা। দড়িটা খুব লম্বা একেবারে মাটি পর্যন্ত পৌঁছায়। এই উপায়ে বাস্কেট চড়িয়া গ্র্যানিট হাউসে উঠিবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। চোঙ্গার গায়ের বৈঠায় যখন প্রপাতের জল বেগে পড়িতে থাকিবে, তখন চোঙ্গাটা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিবে। তাহা হইলেই দড়িটা চোঙ্গার গায় জড়াইতে থাকিবে, এবং দড়ির ডগার বাস্কেটটিও লোকজনশুদ্ধ গ্র্যানিট হাউসের দরজায় উঠিয়া আসিবে।

১৭ই মার্চ সাইরাস্ হার্ডিএর এই লিফট তাহার কাজ প্রথম করিয়া দেখাইল। বলা বাহুল্য লিফটের কাজ দেখিয়া সকলে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তখন হইতে বড় বড় বোঝা, কাঠ, কয়লা, খাদ্য সামগ্রী এবং দ্বীপবাসিগণ সকলে সিঁড়ি ছাড়িয়া এই লিফটের সাহায্যে উপরে উঠিতেন। লিফট হওয়ার দরুণ সকলের চাইতে খুশি হইল টপ্।

এইবার সাইরাস্ হার্ডিং মন দিলেন কাঁচ তৈরি করায়। মুস্কিল কিছুই না—বালি, সোডা, সবই প্রচুর পরিমানে পাওয়া যাইবে। মাটির বাসন তৈরি করার উনানটি ত আছেই, তাহাতে দারুণ আগুন জ্বালাইলেই হল। এখন প্রায় ৫।৬ ফুট লম্বা একটা লোহার চোঙ্গা চাই—তাহার মুখে বালি সোডা প্রভৃতি গলান পদার্থগুলি একসঙ্গে লাগাইয়া ফুঁ দিতে হয়। লম্বা পাতলা এক টুকরা লোহা লইয়া পেন্‌ক্রফট সেটা দিয়া বন্দুকের নলের মত একটা চোঙ্গা বানাইল। এইরূপে হার্ডিং এর উপদেশ মত কাজ করিয়া ক্রমে শার্শি প্রস্তুত হইল। গেলাস বোতলগুলি বানাইতে ও বেশি বেগ পাইতে হইল না। অবশ্য এ গুলির চেহারা ভাল হইল না, তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও হইল না। নাই বা হইল? কাজ চলিয়া যাইবে ভাবিয়াই সকলের মহা আনন্দ। গ্র্যানিট হাউসের

প্রতি জানালায় যখন শার্শি বসান হইল, তখন দ্বীপবাসিগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

ইহার পর একদিন সাইরাস্ হার্ডিং হারবার্টকে লইয়া মার্সি নদীর বাঁ ধারে পশ্চিম ভাগের বনে শিকারে বাহির হইয়াছেন। হারবার্ট নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া হার্ডিংকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন সময় কতকগুলি ক্যাঙ্গারু, ক্যাপিবারা আর য়্যাগুটি হারবার্টের সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া পলাইল, সে সেগুলিকে গুলি করিবার অবসর পাইল না। বেলা অনেক হইয়াছে, আজ বুঝি বিনা শিকারেই ফিরিতে হয়।

এমন সময় হারবার্ট চেঁচাইয়া উঠিল 'ঐ গাছটা কি দেখতে পাচ্ছেন?' যেটাকে দেখাইয়া হারবার্ট একথা বলিল, সেটাকে ঠিক গাছ বলা যায় না, কতকটা পাম-জাতীয় ঝোপড়া গাছ।

হারবার্ট বলিল—'এটার নাম হচ্ছে সাইকাস্, এটার বোঁটার মধ্যে ঠিক ময়দার মত একরকম চুর্ণ পদার্থ থাকে।'

হার্ডিং বলিলেন—'এটা কি তাহলে ব্রেড্ ট্রি?'

'হাঁ, ব্রেড্ ট্রিই বটে।'

এই বলিয়া হারবার্ট একটা সাইকাসের বোঁটা ভাঙ্গিয়া সেই গুঁড়া হার্ডিংকে দেখাইল। এই গাছের গুঁড়া খুব বলকারক। হার্ডিং এই স্থানটির একটি চিহ্ন রাখিলেন, এবং গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিয়া সকলকে এই আবিষ্কারের সংবাদটি দিলেন।

পরদিন সকলে মিলিয়া সেইস্থানে গিয়া একরাশ সাইকাসের বোঁটা লইয়া গ্র্যানিট হাউসে আসিলেন। এই সকল বোঁটা হইতে অনেকখানি ময়দা বাহির হইল—সেগুলি খাঁটি ময়দা না হইলেও হুবহু ময়দারই মতন। নিপুণ পাচক নেব সে ময়দা দিয়া কেক্ ও পুডিং বানাইল।

ওনাগা, ছাগল ও ভেড়া প্রচুর পরিমাণে দুধ দিত। দ্বীপবাসিগণের দৈনিক ব্যবহারের দুধের কোন অভাব হইত না। ওনাগা-টানা গাড়িতে পেনক্রফট জাপের হাতে চাবুক দিয়া তাহাকে সহিসের কাজে বসাইত। চতুর জাপ বেশ সুন্দর গাড়ি চালাইত।

১লা এপ্রিল রবিবার, সে দিনটা ছিল ইস্টার ডে। হার্ডিং সকলের সহিত ভগবানের নাম করিয়া এবং বিশ্রাম করিয়া সে দিনটা কাটাইলেন। রাত্রে আহারের পর সকলে প্রস্পেক্ট হাইটের বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতে ছিলেন। সম্মুখে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর, এই সাগরের একটি দ্বীপে তাঁহারা বাস করিতেছেন ভাবিয়া সকলের মনে কত কি ভাব আসিল!

স্পিলেট বলিলেন—'হার্ডিং, সেক্স্‌ট্যাণ্ট (স্থান নির্ণয় করিবার যন্ত্র) দিয়ে একবার ভাল করে দেখলে হয় না লিঙ্কন দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরের কোন জায়গায়?'

পেন্‌ক্রফট্ বলিল—'তা জেনে দরকার কি? যেখানে খুশি হোক, আমরা ত বেশ সুখে আছি!'

'তাহলেও আমাদের দ্বীপের কাছে অন্য কোন দেশ কিম্বা দ্বীপ আছে কিনা সেটা দেখা ভাল।'

হার্ডিং বলিলেন—'আমি কালই এ বিষয়ের মীমাংসা করে দিব।'

পরদিন হারবার্ট ম্যাপ আনিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্র বাহির করিল। হার্ডিং যন্ত্রের সাহায্যে লিঙ্কন দ্বীপের অবস্থিতির স্থানটি বাহির করিলেন। অবশ্য ম্যাপে সেস্থানে লিঙ্কন দ্বীপের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু দেখা গেল যে লিঙ্কন দ্বীপের অবস্থান হইতে দেড়শত মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে, ম্যাপে আর একটি দ্বীপের ছবি আছে। সেটার নাম ট্যাবর দ্বীপ।

পেন্‌ক্রফট বলিল—'এই দ্বীপটি দেখতেই হবে। একটু বড় সাইজের এবং ডেক-ওয়ালা নৌকা বানিয়ে আমরা ট্যাবর দ্বীপে যাব। দেড়শ মাইল বৈ ত নয়! ভাল হাওয়া পেলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছান যাবে।

তখন স্থির হইল যে অক্টোবর মাসে ভাল সময় আরম্ভ হইলে যাতে ট্যাবর দ্বীপে যাওয়া যায় সেইভাবে নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে।

ক্রমশঃ

টুটনের সাইকেল

প্রবীর দাশ

টুটনের সাইকেল,
বাগানের চারদিকে
ঘোরে ফেরে এঁকেবেঁকে
অকারণে দেয় বেল।

টুটনের সাইকেল
কাদা জলে মাখা হলে
ভাল জলে ধুয়ে ফেলে
নিজ হাতে দেয় তেল।

টুটনের সাইকেল
ব্রেক্ কষে দম নিয়ে
চলে ফের জোর দিয়ে
কি সকাল, কি বিকেল॥

শৃগাল চরিত

গৌরী চৌধুরী

চুম্বক।

(করটক আর দমনক নামে দুটি চতুর শেয়ালের সহায়তায় পশুরাজ পিঙ্গলকের সঙ্গে বলদ সঞ্জীবকের গভীর বন্ধুত্ব হল। পুরস্কার স্বরূপ পিঙ্গলক তাদের মন্ত্রীর পদে বহাল করলেন। সিংহে আর ষাঁড়ে গলায় গলায় ভাব হল, শেষে সঞ্জীবকের মুখে ধর্মকথা শুনে শুনে পিঙ্গলক শিকার করা ছেড়ে দিল, প্রজারা না খেতে পেয়ে মরতে বসল। দমনক বলল—দাঁড়াও না, ঐ ষাঁড়টার সঙ্গে মহারাজের ঝগড়া বাধাতে হবে। করটক বলল—ষাঁড়টা মোটেও বোকা নয় আর তার গায়ের জোর তোমার আমার পঞ্চাশ গুণ !)

দমনক বলল—বুদ্ধি থাকলে সবই হয়। কুয়োর জলে ছায়া দেখিয়ে খরগোস মেরেছিল সিংহকে, সে গল্পও তো তুমি জান। আর আমি শেয়ালকুলের রত্ন, কৌশলের কৌটিল্য দমনক পারব না একটা ষাঁড়কে জব্দ করতে, আর একটা সিংহকে বোকা বানাতে ?

করটক বললে—বেশ তো, চেষ্টা করে দেখ।

খানিকক্ষণের জন্যে পিঙ্গলককে একা রেখে যমুনায় চান করতে গিয়েছিল সঞ্জীবক। পিঙ্গলক বসে বসে আপনমনে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়টা আওড়াচ্ছিল, এমন সময় দমনক গিয়ে উপস্থিত হল। পিঙ্গলক বললে—এই যে, এস এস। আর তো এদিকে আসা-টাসা ছেড়েই দিয়েছ।

দমনক বললে—আপনিই যখন চান্ না, তখন এসে লাভ ? আজ যে এসেছি, সে একরকম বাধ্য হয়ে। আপনার সর্বনাশ দেখেও চুপচাপ বসে থাকব, সে ধাতুতে তো তৈরি হইনি। তাই—

পিঙ্গলক বললে—কি বলতে চাও, বলেই ফেল না। আজ আবার আমাদের উপোস, রাত্তিরে পুজো-টুজো আছে।

দমনক বললে—মহারাজ, কি আর বলব, বলতে কথা আটকে যাচ্ছে, অপরাধ নেবেন না মহারাজ, কাল দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আপনি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আপনার বন্ধু আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—তোমাদের ঐ পিঙ্গলে-বুড়োর নাড়ীনক্ষত্র সব বুঝে নিয়েছি। এখন ওটাকে মেরে ফেলে আমিই বনের রাজা হব। তুমি হবে আমার মন্ত্রী—কেমন, রাজী তো? শুনে তো আমি একেবারে—একি, অমন করছেন কেন মহারাজ, কি হল আপনার—

আর কি হল, পিঙ্গলক গোঁ গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। দমনক তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলে পিঙ্গলক একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসে কোনরকমে বললে—সঞ্জীবককে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। সে হাজার অন্যায় করলেও আমি তাকে ভালোবাসব।

দমনক বললে—মহারাজ,

নখ নেই দাঁত নেই, ঘাস খায় শুধু,

কাজের বেলা অষ্টরম্ভা গুণের বেলা টুঁটুঁ—ঐ নদগদে গোবরগণেশটাকে ভালোবেসে আপনার লাভ কি? কি পাবেন ওর কাছে? কি পেয়েছেন? নিজের ভালো চান্ তো আজই ওকে মেরে শেষ করে দিন।

পিঙ্গলক বললে—না। নিজের মুখে অভয় দিয়েছি ওকে। তাছাড়া ও আমার বন্ধু। ওর ওপর আমার কোন রাগ নেই। ও যদি আমাকে মারতে চায় তো মারুক। ওর হাতে মরেও আমার সুখ।

দমনক বললে—মহারাজ, আরো একবার ভেবে দেখুন, সঞ্জীবককে ভালোবেসে আপনি সব খোয়াতে বসেছেন—রাজ্যপাট, মান সম্মান, এমন কি জীবন পর্যন্ত।

পিঙ্গলক বললে—সব ভেবে দেখেছি। আমি ওকে কিছুতেই ছাড়তে পারব না, মারা তো দূরের কথা।

দমনক হতাশ হয়ে হাত উল্টে বললে—মহারাজ, শেষে আপনিও? একটা অজ্ঞাতকুলশীল ঘাসখেকো ষাঁড়কে আশ্রয় দিয়ে শেষে কিনা তার মায়ায় পড়ে গেলেন? জানেন, উকুনের কি হয়েছিল?

সিংহ অন্যদিকে তাকিয়ে বললে—না, জানি না, জানতে চাইও না।

শেয়াল বললে—একটু শুনেই দেখুন না মহারাজ। গল্প বলতে আমরাও কিছু কিছু পারি। ভালো না লাগলে তখন থামিয়ে দেবেন—

এক ছিলেন রাজা। যেমন ভোজনবিলাসী, তেমন শয্যাবিলাসী আর তেমনি সৌখিন। রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আতর-মেশানো, ফুলের-পাপড়ি ছড়ানো, কি শীত কি গ্রীষ্ম কনকনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে খাবার ঘরে গিয়ে কচি ঘাসের মত সবুজ নরম মখমলের আসনে বসে সোণার থালায় ছানা-মাখন-মেওয়া খেতে খেতে বলে দিতেন, সেদিন তাঁর কি কি খেতে ইচ্ছে। তারপর উত্তরীয়টি গায়ে দিয়ে মুকুটটি পরে নিয়ে রাজসভায় চলে যেতেন। আর ধোয়ামোছা তক্তকে রান্নাবাড়িতে ফরসা কাপড় পরা রাঁধনদারেরা গনগনে আগুনে ঝকঝকে বাসনে একে একে রান্না করত মল্লিকাফুলের মত ভাত,

গাওয়া ঘিয়ে গোল গোল উচ্ছে ভাজা, ধনেপাতা দিয়ে সোণামুগের ডাল, তুলোর মত নরম বড়া ভাজা, বড় বড় এঁচোড়ের কালিয়া, সোণার মত রঙের মাছ ঝাল, শুকনো-শুকনো মাংস, টক-মিষ্টি-ঝাল চাটনি, অন্নগন্ধার পাতা দেওয়া পায়েস, ক্ষীরের মালপো, পুলিপিঠে, ছানার পোলাও।

ঠিক বারোটার সময় অন্তঃপুরে এসে রাজামশাই সেই সব খেতেন। বড় রাণী হাওয়া করতেন, মেজরাণী পরিবেশন করতেন, আর ছোটরাণী চিত্রলেখা একটু দূরে বসে হাওয়ার মত পাতলা আর আকাশের মত নীল একটি সিল্কের চাদরে সাদা রেশম দিয়ে একটি একটি করে উড়ন্ত বক সেলাই করতেন।

সেদিন রাজামশায়ের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, চিত্রলেখা নীল চাদরে শেষ বকের শেষ পালকের শেষ ফোঁড়টি তুলছেন, এমন সময় পায়েসের বাটি মুখে ঠেকিয়ে রাজামশাই গম্ভীরভাবে বললেন—'ধরে গেছে।' চমকে উঠে বড়রাণীর হাত থেকে পাখা পড়ে গেল, মেজরাণীর হাত থেকে পানের বাটা, ছোটরাণীর হাত থেকে ছুঁচ। পায়েস না খেয়ে রাজা চলে গেলেন। বড়রাণী নিথর হয়ে বসে রইলেন, মেজরাণী পান দিতে ভুলে গেলেন, ছোটরাণীর শেষ পালকের সেলাই আলগা হয়ে গেল। হায়, আজ তিন রাণীতে মিলে সখ করে পায়েসটা রেঁধেছিলেন!

ঠিক সেই সময়ে থালা তুলতে এসে নতুন দাসী ছোটরাণীর কোলের দিকে চেয়ে বলে উঠল—ও মা, কি চমৎকার, দেখি দেখি। ছোটরাণী বিরসমুখে চাদরটা এগিয়ে দিয়ে না-খাওয়া পায়েসের বাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন, চোখ ছলছল করতে লাগল, নতুন দাসী ঝুঁকে পড়ে দেখতে দেখতে তার মাথা থেকে একটি উকুন টুপ করে চাদরের ওপর পড়েই শেষ পালকের আলগা সেলাইয়ের ভেতর ঢুকে গেল। খানিকক্ষণ পরে রাজার খাস চাকরকে ডেকে তার হাতে চাদরটি দিয়ে ছোটরাণী বললেন—পুরোনটা বদলে এইটে পেতে দিয়ে আয়।

পঙ্খের কাজ করা প্রকাণ্ড মেঝের ওপর ময়ূরপঙ্খী নৌকোর মত পালঙ্ক। তাতে আধমানুষ উঁচু পালকের গদি। তার ওপর ফুলের মত নরম তোষক। সেই তোষকের ওপর রাজার খাস চাকর ছোটরাণীর সেলাই করা চাদরটি গিয়ে পেতে দিলে। রাজা শুতে এসে ভারী খুশি হলেন। আঃ বলে চোক বুজিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর শোয়ামাত্রই ঘুম।

রাত্তির দুটোর সময় চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে যেতে ঘুম ভেঙে উঠে বসল বকের পাখার তলায় লুকিয়ে-থাকা উকুন মন্দবিসর্পিনী। আস্তে আস্তে বিছানার চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখল, রাজামশাই শুয়ে আছেন, তাঁরই সর্বাঙ্গ দিয়ে ঐ মিষ্টি রক্তের গন্ধ বেরোচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে শুঁকে শুঁকে শেষ পর্যন্ত সাহস করে বাঁ হাতের কনুয়ের কাছে কুটুস করে কামড়ে দিল মন্দবিসর্পিনী রাজামশাই ঘুমের ঘোরে একবার হাতটা নাড়লেন। মন্দবিসর্পিনী তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল মধুর মত মিষ্টি সেই একফোঁটা রক্ত। এমনটি আর কখনো খায় নি সে।

তারপর থেকে রোজ রাত্তিরে রাজামশাই যখন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যান, সেই সময় মন্দ-বিসর্পিনী বেরিয়ে এসে কোনদিন গলার, কোনদিন পিঠের, কোনদিন বা পায়ের একফোঁটা দুফোঁটা

রক্ত চুষে চুষে খায়, তারপর ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাজামশাই জানতেও পারেন না। আর চাদরটা তাঁর এত পছন্দ যে সেটা বদলাতেও দেন না।

একদিন রাজামশায়ের ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জ্বর ভাব হল। ঐ বিছানাতেই তিনি শুয়ে রইলেন। লাঠি ঠক ঠক করতে করতে এলেন বুড়ো কবিরাশমশাই। গম্ভীরভাবে চোখ বুজিয়ে রাজার নাড়ী দেখতে দেখতে কবিরাজমশায়ের তুহাত লম্বা দাড়ির ভেতর থেকে একটি ছারপোকা বেরিয়ে এসে বিছানার মধ্যে ঢুকে গেল।

নিজের জায়গাটিতে গালে হাত দিয়ে বসেছিল মন্দবিসর্পিনী। এমন ভালো এমন চমৎকার রাজামশায়ের আবার অসুখ করল? এমন সময় দেখল—তরতর করে এগিয়ে আসছে একটি ছারপোকা।

দাসীর বাড়িতে থাকবার সময়ই ছারপোকাদের স্বভাব ভালো করে জানা হয়ে গিয়েছিল তার। তাদেরই একটাকে রাজার বিছানায় দেখে জ্বলে উঠলো সে, হাতমুখ নেড়ে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—এখানে তুমি আবার কি করতে হে? তক্তপোষে থাকেন, গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, উনি এসেছেন রাজার খাটে নোংরা গায় নোংরা পায়—বলি, মতলবখানা কি?

ছারপোকার নাম অগ্নিমুখ। অগ্নিমুখ চাদরের সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে পেন্নাম করে বললে—দিদি, চট কেন? ভরত্নপুরে অতিথ এলে এমন করে তাড়িয়ে দিতে আছে? কবরেজবুড়োর জোলো রক্ত, কবরেজগিন্নীর পাঁচন-খাওয়া তেতো রক্ত, আর তাদের ছেলের ঝালরক্ত খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। এখন তুমি যদি দয়া কর, তাহলে একবারও অন্ততঃ রাজার গায়ের আঠার মত ঘন আর মধুর মত মিষ্টি একফোঁটা-তুফোঁটা রক্ত খেয়ে জীবন সার্থক করি।

মন্দবিসর্পিনী একটু নরম হয়ে বললে—থাক তাহলে তুদিন আমার কাছে। রাজার অসুখটা সারুক, তারপর একদিন ধীরে সুস্থে খেয়ো। অত হড়বড় করলে চলবে না বাপু, তা বলে দিচ্ছি।

অগ্নিমুখ বললে—আচ্ছা, দিদি, আচ্ছা।

নাড়ী-টাড়ী দেখে ওষুধ-পথ্যির ব্যবস্থা করে কবিরাজমশাই চলে গেলেন। ওষুধটি খেয়ে খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে রাজামশায়ের একটু তন্দ্রামতন এল। বালিশের ওপর হাতটি রেখে চোখ বুজলেন। অগ্নিমুখ এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে দৌড়ে এসে বসিয়ে দিলে হাতের ওপর এক কামড়। মন্দবিসর্পিনী থ! রাজামশাই ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে বললেন—দেখ তো, দেখ তো, বিছানায় পিঁপড়ে না ছারপোকা না কি। আমায় কুট্ করে কামড়াল। উঃ, জ্বালিয়ে দিয়েছে।

সকলে মিলে তখুনি ছুটে এসে চাদর উল্টে ফেলল। অগ্নিমুখ কামড় দিয়েই পালং-এর খাঁজে গিয়ে লুকিয়েছিল। তাকে কেউ দেখতে পেলে না। ধরা পড়ল মন্দবিসর্পিনী। রাজার খাস-চাকর তাকে তুই আঙুলের মাঝখানে টিপে মারতে মারতে বলল—মহারাজ, ছারপোকাও নয়, পিঁপড়েও নয়, উকুন! কোত্থেকে যে সব আসে।

পিঙ্গলক বললে—হুঁ, গল্প হিসেবে ভালোই, তবে কি জানো, সঞ্জীবকে আর ঐ চিড়বিড়ে

ছারপোকাতে অনেক তফাৎ, কোন তুলনাই হয় না আচ্ছা, তুমি এবার এস, আমি একটু এগিয়ে দেখি, ওর আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন, এমন তো কখনো হয় না।

দমনক বললে—মহারাজের যত দরদ ঐ পরস্য পর ঘাসবুনোটার জন্যে। আমরা কেউ না। পরকে আপন আর আপনজনেদের পর করলে কি হয় জানেন? সেই নীল শেয়ালের দশা হয়। আহা, আমার বন্ধুর নিজের পিসেমশায়ের মাসতুতো ভাইঝির দেওর ছিল বেচারা। শুনবেন?

পিঙ্গলক কোন উত্তর না দিয়ে উঠে পড়ে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করল। দমনক পেছন পেছন চলতে চলতে বলতে লাগল— ক্রমশঃ

(রুশ দেশীয় উপকথা)

এক চাষী। এক সদর রাস্তার ধারেই তার ক্ষেত। সে ক্ষেতে আপন মনেই সে বীজ বপন করে চলেছে। বর্ষা শেষ হয়ে গেছে, এখন আশ্বিনে নতুন ফসলের বীজ লাগাবার মরসুম। এর পরে অতিরিক্ত শীতে আর বীজ অঙ্কুরিত হবে না। চাষী তাই খুব ব্যস্ত।

ঠিক সে সময়েই ঘোড়ার পিঠে সদর পথে চলেছেন সেই দেশের-ই রাজা, চাষীকে ব্যস্ত দেখে রাজা কি ভাব্লেন কে জানে। কাছে গিয়ে চাষীকে শুভেচ্ছা জানালেন। বললেন,—'চাষী ভাই, ভগবান তোমার সহায় হোন্।"

চাষী মুখ তুলে তাকাতেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে দেশের রাজা। হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কৃষক নতমুখে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমার এ ক্ষেতে গড়ে মাসিক আমদানী কত হয়?"

চাষী প্রত্যুত্তরে জানাল,—'হুজুর, তা' খুব বেশি না হলেও মন্দ নয়। এই প্রায় ২০ রুবল।

রাজা বললেন,'আচ্ছা! মন্দ নয় ত? তা' সেই ২০ রুবল দিয়ে তুমি কি কর?'

চাষী বললে,—'হুজুর, ৫ রুবল কর দিতে হয়, ৫ রুবল দিই ধারে, আর ৫ রুবলে ধার শোধ করি, এবং অবশিষ্ট ৫ রুবল জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দি।'

চাষীর এই হেঁয়ালী ভরা কথা রাজা বুঝতে পারলেন না। না পেরে বললেন,—'কী বললে, ঠিক বুঝলাম না ত, বুঝিয়ে বল।'

তখন চাষী বললে,—'হুজুর, এমন কি আর শক্ত কথা বলছি? ৫ রুবলে কর দিই, অর্থাৎ আমার ও আমার স্ত্রীর ভরণ পোষণ করি। কর দিই বললাম এই জন্যে যে আমরা যে শরীরে বাস করি তাকে খাইয়ে পরিয়ে না রাখলে, শরীর ত আমাদের থাকতে দেবে না। রুগ্ন হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই তাকে ত কর দেওয়াই হ'ল। তারপর বললাম, ৫ রুবল দিই ধারে। ধারে দিই, অর্থাৎ ছেলেদের লালন-পালন করি। এখন ত আমি তাদের খাওয়াচ্ছি। প্রতিদানে কিছু পাচ্ছি না। কিন্তু পরে আমি

বুড়ো হ'লে, ওরা-ওত আমাকে খাওয়াবে, অর্থাৎ এ ধার শোধ করবে। আর ৫ রুবল দিয়ে ধার শোধ করি, অর্থাৎ পিতামাতাকে খাওয়াই। শৈশবে তাঁরা আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছেন, সে ধারই ত এই ভাবে শোধ করছি। আর অবশিষ্ট ৫ রুবল জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দি। তার মানে, মেয়েকে খাওয়া-ই মেয়ের দ্বারা ত আমার কোন উপকারই হবে না, বা প্রতিদানে তার কাছ থেকে কিছু পাবও না। বিয়ে দিলেই শ্বশুর বাড়ি হবে তার ঘর। সুতরাং তার কাছে কোন প্রত্যাশা-ই আমি কয়তে পারি না। এ কি রুবল ফেলে দেওয়া-ই হ'ল না!'

চাষীর কথা শুনে রাজা খুব-ই আনন্দ পেলেন। আর আশ্চর্য হলেন তার বুদ্ধিমত্তা দেখে। রাজা তাকে বললেন,—'তোমার কথাগুলো সত্যি-ই ঠিক। কিন্তু এখন একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমাকে। বল, প্রতিজ্ঞা করবে?'

চাষী সম্মতি জানালে রাজা বললেন,—'প্রতিজ্ঞাটা এই যে যতদিন তুমি আমার মুখ আবার না দেখবে, ততদিন এ কথা আর কাউকে বলবে না। বল?'

—'তাই হবে হুজুর। এ প্রতিজ্ঞাই করলাম।'—করজোড়ে বলল চাষী।

সেই দিন-ই রাজা তাঁর সভায় ফিরে গিয়ে সভাসদ্‌দের ডেকে পাঠালেন। সবাই উপস্থিত হ'লে রাজা বললেন,—'তোমাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। তোমরা তার জবাব দাও। আজ রাস্তায় আমার দেখা এক চাষীর সঙ্গে। সে মাসে ২০ রুবল উপার্জন করে; আর তা ব্যয় করে এই ভাবে: ৫ রুবল কর দেয়, ৫ রুবল দেয় ধারে, আর ৫ রুবলে ধার শোধ করে এবং অবশিষ্ট ৫ রুবল বাইরে ফেলে দেয়। এখন তোমরা আমাকে এর অর্থ বুঝিয়ে দাও। আর এও বলছি, এর অর্থ যে বলতে পারবে, আমি প্রচুর পুরস্কার দেব।'

রাজার প্রশ্ন শুনে সভাসদগণ অনেক ভাবলেন। কিন্তু এ হেঁয়ালির অর্থ তাঁরা খুঁজে পেলেন না।

পরদিন সভাসদদের মধ্যে একজন সংবাদ নিয়ে জানলো কে সেই চাষী যার সঙ্গে রাজার পথে দেখা হয়েছিল সে তখন সেই চাষীর কাছে গিয়ে ১০০ রুবল চাষীর হাতে দিল। দিয়ে বলল,—'চাষী ভাই, আমাদের রাজাকে কাল যে হেঁয়ালির কথা বলেছ, আমাকে তার অর্থ বলে দাও।'

চাষী ১০০ রুবল হাতে পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারল না। তার হেঁয়ালির সমস্ত অর্থ-ই তাকে খুলে বলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই সভাসদ্‌টীও ফিরে এল রাজসভায়। তারপর যথাসময়ে রাজাকে শুনিয়ে দিল তাঁর হেঁয়ালির ঠিক ঠিক অর্থ।

রাজা কিন্তু অর্থ শুনে-ই বুঝতে পারলেন, সভাসদ্‌টী নিশ্চয়-ই চাষীর কাছ থেকে এ অর্থ জেনে এসেছে। নিশ্চয়-ই চাষী তার প্রতিজ্ঞা পালন করে নি।

রাজার আদেশে চাষীকে ধরে আনা হ'ল সেই সভায়। চাষী আসৃতে-ই রাজা রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি হে কাল তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, ভুলে গেছ? আমার সঙ্গে দেখা হবার

পূর্বে-ই যে সে হেঁয়ালির অর্থ বলে দিয়েছ ? কি ব্যাপার ! জানো, এর জন্যে এখন তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করব। রাজ-আদেশের অবহেলা !!'

চাষী রাজার কথা শুনে হাত জোড় করে ধীরে ধীরে বললে—'হুজুর, আমি ত আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নি। আমায় কেন মৃত্যু দণ্ড দেবেন ? এই দেখুন আমার কাছে এখনও কয়েকটা রুবল রয়েছে, আর এই দেখুন তার ওপর আপনার-ই মুখের ছবি। আমার হেঁয়ালির অর্থ বলার পূর্বে আমি ত এ মুখ দেখে নিয়েছিলাম। এখন আপনি-ই ভেবে দেখুন, হুজুর, আমি কি প্রতিজ্ঞা লংঘন করেছি ?'
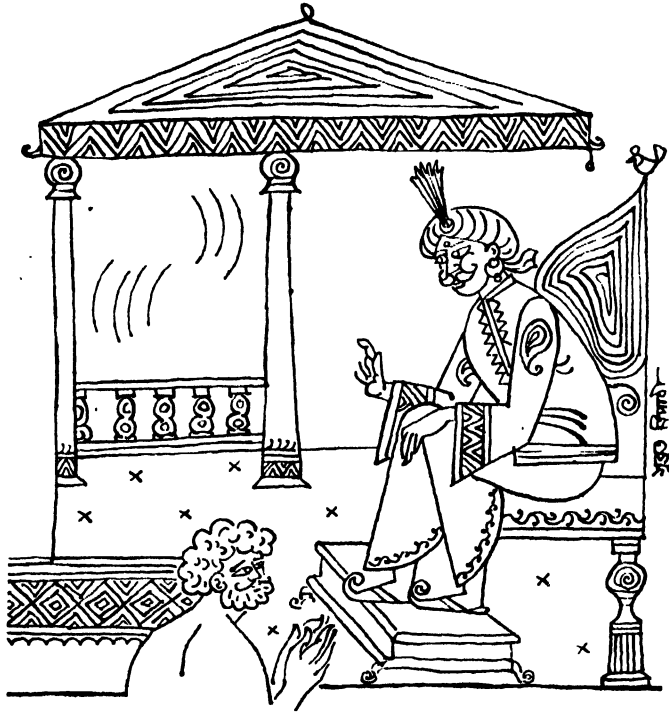
আমি তো আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি

উত্তর শুনে রাজা ভেবে দেখলেন, সত্যই ত। চাষী ত ঠিক কথা-ই বলেছে। তার প্রতিজ্ঞা ত সে লংঘন করে নি।

এই ভেবে রাজা তার প্রতি খুব-ই খুশি হলেন, মুগ্ধ হলেন তার উপস্থিত বুদ্ধি ও চতুরতা দেখে, আর এ জন্যে তাকে অনেক, অ-নে-ক পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন।

মারামারি

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

'যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দৈ।'
গানেতে তাল মারবো আমি, তবলাখানা কৈ?
পকেটমারে মারলো পকেট, চলতে গিয়ে ট্রামে।
গুল মারতে গিয়ে গণেশ, একেবারে ঘামে।
হাতে মেরে হচ্ছেনা কাজ, বললো দাদু রাতে,—
নাতিটাকে কালকে থেকে, মারতে হবে ভাতে।
চাল মারা তো তোমার স্বভাব, তা আমি বেশ জানি
ডবলিউ, টি, মেরে জগা গিয়েছে জার্মানি।
পরের টাকা মেরে দাদা বেশ বড়লোক হ'লে।
কিক মেরে ঐ ফুটবলটা ঢুকিয়ে দিলুম গোলে।
পাখিটাকে গুলি মেরে করবো শিকার আমি।
সিটি মেরে চলছিলো ট্রেন, হঠাৎ গেল থামি।
গরু মেরে জুতো দান করতে এলে নাকি?
সকাল থেকে দেখছি তুমি, মারছো কেবল ফাঁকি।
গুণ্ডাটাকে রাগিয়োনাকো মেরেই দেবে জানে।
ঝাঁপ মেরেছো নদীর জলে, পড়বে স্রোতের টানে।
তালা মেরে দিলাম ঘরে, বিদেশ যাবো কালই।
গান গাইলাম ফ্যাংশনেতে মারলোনা কেউ তালি।
মিষ্টি খেয়ে মুখ মেরেছে, পান আছে ভাই কাছে?
গুঁড়ি মেরে ছোকরাগুলো উঠলো কাঁঠাল গাছে।
কেউটে সাপে মারলো ছোবল? ওঝা আনো ডেকে।
কেন তুমি মারছো গালি, সেই সকাল থেকে?
চাবুক মেরে চামড়া পিঠের ছাড়িয়ে নেব খোকা।
মারলে গ্যাঁড়া টাকাগুলো, ভাবছো আমি বোকা?
ওস্তাদজী মার দেখালেন সেই যে শেষের রাতে।
মারের খেলা দেখিয়ে দেবো, ব্যাট ধরেছি হাতে।

সুয্যি ঠাকুর উকি মারেন ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে।
ঝোপে-ঝাড়ে ঘাপটি মেরে হাজ'র শেয়াল ডাকে।
ডুব মেরে লোক মুক্তো তোলে সমুদ্দুরের থেকে।
হাঁক মেরে ঐ ফেরিওলা যাচ্ছে ডেকে, ডেকে।
হোটেলেতে খাচ্ছো তুমি! জাত যে যাবে মারা।
তারাই বোকা নিজের পায়ে কুড়ুল মারে যারা।
শক্ত কথার মারপ্যাঁচে খুব ঘাবড়ে দিলে ভায়া।
গুলি মারো ভুতোর কথায়, ছোকরাটা বেহায়া।
পেটের মাঝে হাজার ছুঁচোয় ডন-বৈঠক মারে।
আড্ডা মেরে বেড়াও কেন, সিনেমাটার ধারে?
মালকোচা সব মেরে ওরা ঘুঁশোঘুঁশি করে।
একপাশে কাৎ মেরে দেখি, নৌকোখানা পড়ে।
'বিজ্ঞাপন মারিও না' যে দেওয়ালে লেখা
সেখানেতেই বিজ্ঞাপনের পাহাড় যাবে দেখা।
তালি-মারা জামা পরে রেসের মাঠে চলি।
বাজীটা আজ মেরেই দেবো, এই রাখলাম বলি।
মারামারি হলো পাড়ায় এলো পুলিশ গাড়ি।
পুলিশ দেখে ভয়ে আমি চোঁ-চা দৌড় মারি।
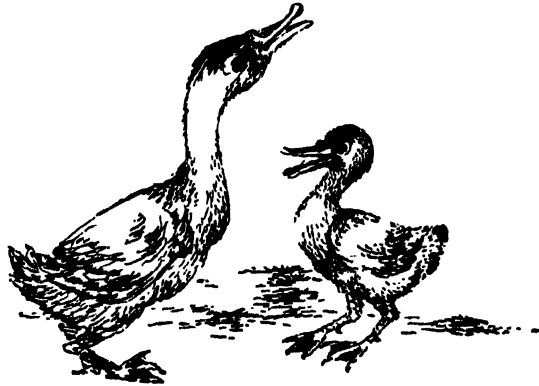
গল্প-সল্প

আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার মাঝামাঝি পথে, অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের বুকে ছোট একটা দ্বীপ আছে, তার নাম ট্রিস্টান। কথায় কথায় আমরা যে বলে থাকি মানুষের জীবনে অনেক রকম অদলবদল হয়, কিন্তু মা বসুন্ধরা অচলা অপরিবর্তনীয়া, এ যে কত ভুল ঐ ছোট ট্রিস্টান দ্বীপের ইতিহাসই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

শোনা যায় ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ট্রিস্টান ডা কুন্হা নামের একজন পর্তুগীজ অ্যাডমিরেল দ্বীপটিকে আবিষ্কার করেন, তাঁর নামেই এর নাম। লম্বাচওড়ায় ৩৭ বর্গমাইল, কাছাকাছি আরো ছোট ছোট চারটি দ্বীপ, কোথাও কোনো জনমানুষ বা জন্তুজানোয়ারের বাস নেই, শুধু হাজার হাজার পাখি এখানে বাসা বাঁধত। গড়ন দেখে আর মাটির রকম দেখে বোঝা যায় যে হাজার হাজার বছর আগে, সমুদ্রের নিচে অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই এই জায়গাগুলো জলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

আবিষ্কার হবার পরেও অনেককাল কেউ এখানে বসবাস করেনি। ১৮১০ সালে ল্যাম্বার্ট্ বলে একজন অ্যামেরিকানের সখ হয়েছিল এখানে উপনিবেশ গড়ে, নিজে হবে রাজা। দুঃখের বিষয় সুখ-স্বপ্নটাকে আর কাজে পরিণত করা যায় নি।

আরো পাঁচ বছর বাদে ব্রিটিশরা এসে দ্বীপটাকে দখল করে বছরখানেকের জন্য সৈন্যদের ঘাঁটি তৈরি করেছিল। তারপর তারা যখন তল্পী-তল্পা গুটিয়ে চলে গেল, উইলিয়ম গ্লাস্ বলে একজন সৈনিক সপরিবারে ওখানে থেকে গেল। আস্তে আস্তে দুচারজন করে ট্রিস্টানের লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল। মাঝে মাঝে হয়তো নৌকাডুবি হল আর কয়েকজন নাবিক এসে দ্বীপে উঠল। একবার সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ থেকে—যেখানে নেপোলিয়নকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল—পাঁচজন মহিলা এসে ট্রিস্টানে বসবাস করতে লাগলেন। এইভাবে লোক বেড়ে বেড়ে ১৯৬১ সালে ২৬০ জনে এসে দাঁড়াল।

মাত্র সাতটি পরিবারের বংশধর এরা সবাই, দ্বীপের লোকদের মধ্যে ঐ সাতটির বেশি পদবী ছিল না। সাদাসিধা জীবনযাত্রা ওদের, গত দেড়শো বছরে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি, ফ্যাসানের ধার ধারত না কেউ, উদয়াস্ত কাজকর্ম নিয়ে থাকত। বিলাসিতা কাকে বলে জানত না, বড় জোর মোটরগাড়ি বা টেলিভিসনের নাম শুনেছিল, পত্রিকাতে ছবিও দেখে থাকবে, চোখে দেখে নি কখনো। কথাবার্তা বলত সেকেলে এবং একটু বিকৃত ইংরিজিতে।

ট্রিস্টানের পাথুরে মাটিতে বড় বড় গাছপালা বেশি হয় না, বাড়িঘর করতে পাথর দিয়েই যতটা সম্ভব চালিয়ে দিত ওরা। ঘরবাড়ির চেহারা দেখে স্কটল্যাণ্ডের অজ পাড়াগাঁর কথা মনে হত।

খুব খাটত সবাই ; আলুর চাষই বেশি করত, গাঁ থেকে কিছু দূরে বড় বড় আলুর ক্ষেত ছিল। শনের চাষও করত, সুতো কাটত, পশম বুনত, কাপড় বুনত, যতটা সম্ভব নিজেদের সব দরকারি জিনিস তৈরি করে নিত। গোরু ভেড়া পালত, মাছের ব্যবসা করত।

ট্রিস্টান ডা কুনহা ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানি দ্বীপে একটিমাত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল, তাদের দুটো জাহাজ ছিল, নিয়মিত কেপ টাউনে যাওয়া-আসা করত। বহির্জগতের সঙ্গে বলতে গেলে ঐ ছিল ওদের একমাত্র যোগসূত্র।

জাহাজ দুটোর সাহায্যে ওদের চিংড়িমাছের ব্যবসা ভালো চলত, ঘরে টাকা আসত। ষোল মাইল দূরের নাইটিপেল দ্বীপ থেকে পাখির ডিম আর আলুর খেতে সার দেবার জন্য গুয়ানো বলে একরকম জিনিস আনা হত। গুয়ানো বহু বছর ধরে জমে থাকা লক্ষ লক্ষ পাখির ময়লা ছাড়া কিছু নয়। নাইটিপেলে দু এক রাত থাকবার জন্য অনেকগুলো ছাউনি তৈরি করা হয়েছিল, বিপদের সময় সেগুলো বড় কাজে লেগেছিল।

আরাম বা বিলাসিতার কোনো সুযোগ না থাকলেও ট্রিস্টানবাসীরা তাদের দ্বীপটিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। ভারি ধর্মপরায়ণ ছিল তারা ; পাথর কেটে নিজেরাই গির্জা তৈরি করে নিয়েছিল ; সেখানে নিয়মিত উপাসনায় সকলে যোগ দিত। তাছাড়া একটা সাদাসিধা সভাঘরও ছিল, সন্ধ্যাবেলায় পুরুষরা সেখানে আড্ডা জমাতেন। মাঝে মাঝে মহিলারাও আসতেন, নাচগান হত।

দ্বীপের বেশির ভাগ জায়গাই বাসের অযোগ্য। সমুদ্রের ধারে আধ মাইল চওড়া তিন মাইল লম্বা মালভূমিতেই সব বাড়িঘর তৈরি করতে হয়েছিল, নিচু বালির পাড় ছিল খানিকটা, সেখানে নৌকো করে জাহাজে মাল বোঝাই করা হত। দুমাইল দূরে আলু ক্ষেত ; পাথরের বেড়া দিয়ে যে যার জমির সীমানা নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। চুরি ডাকাতির কথা কেউ শোনে নি, না ছিল আদালত, না ছিল জেলখানা। এই আলুই কিছুদিন আগেও ছিল ওদের একমাত্র সম্পদ ; এমন কি পয়সাকড়ির অভাবে অনেক সময় ওরা আলু দিয়ে বেচাকেনা সারত।

তবে কিছুদিন থেকে ওদের অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। কোম্পানির ব্যবসা খুবই ভালো চলছিল, বেশ লাভ হচ্ছিল, ফলে দ্বীপবাসীদের সুখসুবিধার একটু সুরাহা হয়েছিল। জলের কল হয়েছিল, বাড়িতে বাড়িতে ড্রেনের ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সুদূর সমুদ্রের মাঝখানের এই ছোট দ্বীপটি স্বাবলম্বী হয়ে

কিন্তু মানুষের সব দিন সমান যায় না ; ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ট্রিস্টান দ্বীপের দুঃসময় শুরু হল। কিছুদিন ধরে মাটির তলা থেকে গুড়গুড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল, একটু একটু মাটি কাঁপছিল, তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় গির্জায় সবাই উপাসনায় রত, এমন সময় দারুণ ভূমিকম্প হল।

সেই যে শুরু হল তারপর আর শান্তি নেই ; থেকে থেকেই ভূমিকম্প, কখনো আস্তে, কখনো জোরে। সকলের ভয় হতে লাগল মাটির তলায় সাংঘাতিক একটা কিছু পাকাচ্ছে ! সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই সময়, পাঁচমাস বাদে কেপ্‌টাউন থেকে ওদের কোম্পানির জাহাজ ট্রিস্টানিয়া এসে উপস্থিত, দরকার হলে এই জাহাজে করেই বারে বারে যাত্রী পারাপার করা যেতে পারবে।

মাত্র ১৬ মাইল দূরে নাইটিপেল দ্বীপ। জাহাজ নিয়ে সেইখানে লোক গেল, কি হচ্ছে দেখে আসতে। তারপরের পাঁচদিনে ৮৯বার ভূমিকম্প হল, অথচ নাইটিপেল থেকে ওরা ফিরে এসে বলল

সেখানে কিছুই টের পায় নি। বোঝা গেল বিপদ যা, তা এই ট্রিস্টান দ্বীপেই। খানিকটা নিশ্চিন্তও হওয়া গেল, তেমন তেমন হলে নাইটিপেলে আশ্রয় নেওয়া যাবে।

যত গণ্ডগোল সমুদ্রতীরে যেখানে লোকের বসতি ; দ্বীপের মাঝখানে হাজার হাজার বছর আগে নিবে যাওয়া উঁচু আগ্নেয় পাহাড়, তার উপরে লোক চড়ে দেখল, সেখানেও কিছু হয় না। দ্বীপবাসীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, এত ঘন ঘন ভূমিকম্প কেউ তো কখনো শোনে নি, শেষটা বাড়িঘর সুদ্ধ মালভূমিটুকু ভেঙ্গে সমুদ্রে ধ্বসে পড়বে নাকি!

এদিকে সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে আসছে, এমন সময় গ্রামের পেছনেই যে খাড়া পাহাড়, সেখান থেকে পাথর ফাটার শব্দ। বড় বড় পাথরের চাঁই গড়িয়ে পড়তে লাগল, গোরু ভেড়া জখম হল, জলের পাইপ নষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গে জোরে জোরে ভূমিকম্প, পায়ের নিচের মাটি উঁচুনিচু হয়ে উঠতে লাগল ; কোথাও কোথাও বাড়ির দরজা জানলা এঁটে বন্ধ হয়ে গেল, খোলা যায় না ; কোথাও আবার বন্ধ হয় না! তারপর দেখা গেল বাড়ির দেয়ালে ফাটল, মাটিতে ফাটল। রাতের দিকে একদিন এতই বাড়াবাড়ি হতে লাগল, বিশেষ করে গ্রামের পুব দিকে, যে সেখানকার গৃহস্থরা ছেলেপুলে ও সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে পশ্চিম দিকে হেঁটে এসে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে আশ্রয় নিল।

ভোরে যারা সাহস করে বাড়ি ফিরল, তারা দেখল কয়েকটা ফাটল বুজে গেছে, আবার নতুন কয়েকটা হয়েওছে। বিকেলের দিকে পুবদিকের শেষ বাড়িটা থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে একটা মস্ত ফাটল দেখা দিল। মাটিটা সেখানে দুভাগ হয়ে, এক দিকটা চোখের সামনে ১০ ফুট উচু হয়ে ফুলে উঠল।

একটা ধার খাড়া দেয়ালের মতো, তার মাথার উপর বিরাট এক পাথরের চাঁই নড়বড় করছে। যে যেদিকে পারল পালাল।

আর দেরি করা নয়। পুরোনো জাহাজের কামানের গোলা দিয়ে তৈরী ঢাক পিটে সভা ডাকা হল, স্থির হল ট্রিস্টানিয়া জাহাজ সবাইকে নাইটিপেল দ্বীপে পার করে দেবে। মেয়েদের বলা হল গরম জামা-কাপড়, কম্বল আর যেটুকু না হলেই নয়, গুছিয়ে নিতে।

জাহাজের রেডিও কেপ টাউনে খবর দিল, তাঁরাও জানালেন খাবার দাবার ওষুধপত্র নিয়ে লেপার্ড জাহাজ রওনা হয়ে গেছে। সবার মনে ভয়। জাহাজ এসে পৌঁছবার আগেই যদি দ্বীপটা সেকালের ক্রাকাতোয়া দ্বীপের মতো ফেটে যায়। ট্রিস্টানিয়া ছোট জাহাজ কজনকেই বা ধরে।

এদিকে পুবদিকের সেই উচু জায়গাটা ঘণ্টায় পাঁচ ফুট করে উঠছে। ভয় পেয়ে ছেলেপুলে নিয়ে সবাই দু মাইল দূরে আলু ক্ষেতে আশ্রয় নিল। এ সময়ে সেখানে হাড় কাঁপানো শীত, আলু রাখার ছাউনির তলায় কোনো মতে ছেলেপিলেদের জায়গা করা হল। তীরের কাছে দেখা গেল ট্রিস্টানিয়া ছাড়াও আরেকটা জাহাজ—কোম্পানির অন্য জাহাজটি, তার নাম ফ্রান্সেস রেপেটা।

খবর পাওয়া গেল মাটির সেই উঁচু ঢিবিটার মাথা ফেটে পাথরের চাঁই, গরম ছাই আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ভোর বেলায় হতাশ হয়ে সবাই দেখল সেখানে একটা নতুন আগ্নেয়গিরি তৈরী হয়েছে!

এবার যাবার সময় হয়েছে। আলুক্ষেতের কাছে সমুদ্রের পাড় বড় উঁচু, বড় পাথুরে। যে যা সামান্য জিনিস বাঁচাতে পারল, তাই নিয়ে আবার পুব দিকের নিচু তীরে নেমে এসে, নৌকোয় করে জাহাজ দুটিতে উঠল। ১০ই অক্টোবর বেলা একটায় জাহাজ দুটি নাইটিপেল দ্বীপের অভিমুখে চলল। দুঃখে আচ্ছন্ন দ্বীপবাসীরা চেয়ে দেখল শেষ বাড়িটার পেছনে জলাভূমিতে আরেকটা জায়গা ফুলে উঠেছে, হয় তো সেখানে আরেকটা মুখ হবে। বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার দুঃখের চেয়েও, সপরিবারে প্রাণে বাঁচার কৃতজ্ঞতাটাই বেশি হল।

সুখের বিষয় একদিন বাদেই খবর পেয়ে একটা বড় ডাচ্ যাত্রীজাহাজ নাইটিপেল থেকে সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। পরে রেপেটার নাবিকরা অনেক জিনিসপত্র উদ্ধার করে, যার যেটা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

ট্রিস্টান দ্বীপবাসীদের অধিকাংশই ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় পেয়েছিল। আজকালকার বিলাসী সভ্যতার মধ্যে পড়ে তাদের কি হাল হয়েছিল? তারপর কি ভাবে দেড় বছর পরে তাদের মধ্যে অনেকেই আবার দ্বীপে ফিরে কত পরিবর্তন দেখল, সে আরেক বিরাট কাহিনী।

কার্টুন—অমল
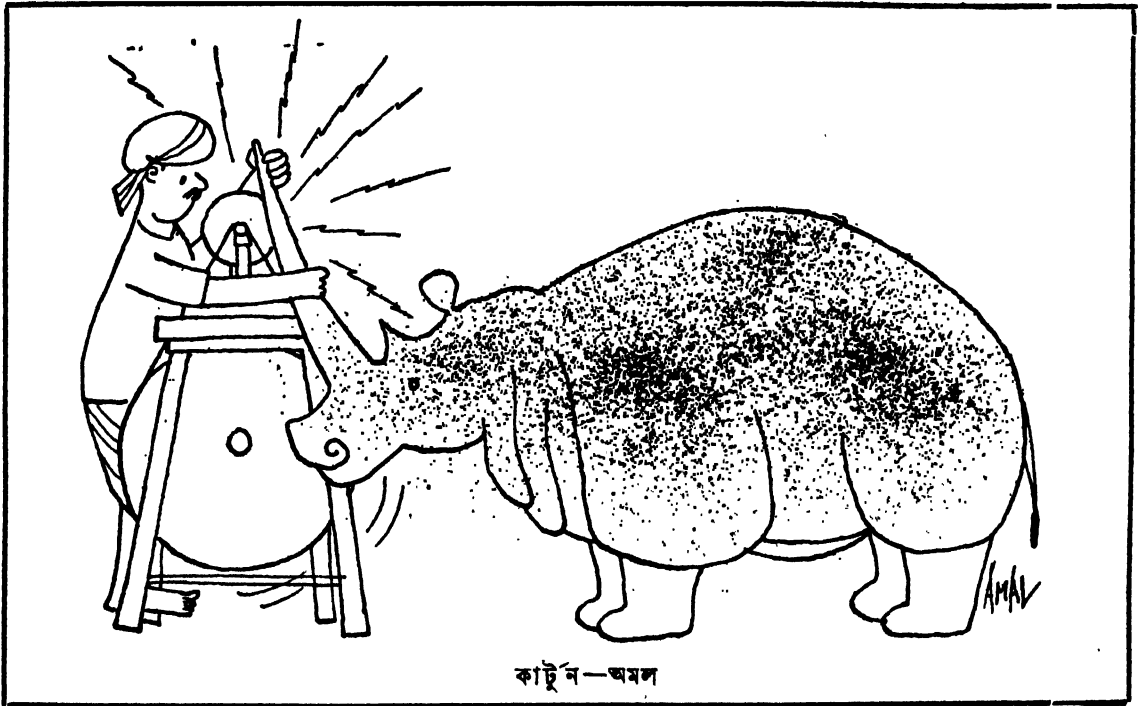
মানুষের খাদ্য—কীট-পতঙ্গ

মিহির কুমার ভট্টাচার্য

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখেই তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো অবাক হয়ে ভাবছো—এ কী করে সম্ভব! মানুষ আবার পোকা-মাকড় খায় নাকি! কিন্তু কথাটা শুনতে যতই অদ্ভুত লাগুক না কেন; আসলে মানুষও কীট-পতঙ্গ খায়। তবে এদের অধিকাংশই বিভিন্ন দেশের আদিবাসী, পার্বত্য উপজাতি প্রভৃতি। সখের ভোজনের কথা বাদ দিলে—শিক্ষায়, চাল-চলনে অগ্রসর অর্থাৎ যাদের আমরা সভ্য বলি—তাদের মধ্যে এখনও কিন্তু ব্যাপকভাবে কীট-পতঙ্গ ভোজনের অভ্যাস চালু হয় নি। অনেক বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর বর্তমান খাদ্যাভাব দূর করতে একদিন হয়তো সভ্য মানুষকে ব্যাপকভাবে কীট-পতঙ্গ উদরসাৎ করতে হবে।

তোমরা অনেকেই সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে দেখে থাকবে—ক্যানাডার ইনস্টিটিউট অব ফুড টেকনোলজীর রসায়ন-বিজ্ঞানী মিঃ বেন বারক বলেছেন—মানুষের আরও বেশি করে কীট-পতঙ্গ খাওয়া উচিৎ। বিজ্ঞানীদের ধারণা—একটি গরুর মাংসে যতটা প্রোটিন পাওয়া যায়—তার চেয়ে বেশী প্রোটিন পাওয়া যায় এক একর জমির কীট-পতঙ্গ থেকে। তিনি আরও বলেছেন—নর্থ আমেরিকানদের এশিয়া ও আফ্রিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিৎ। এই দুই দেশের লোকেরা গুটিপোকা, শোঁয়াপোকা, ফড়িং, পঙ্গপাল, উইপোকা, গুবরেপোকা প্রভৃতি আহার করে।

বৃটিশ জৈবরসায়নবিদ ডক্টর এন, ডব্লু, পিরি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত (৬ই এপ্রিল, ১৯৬২) এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে বলেছিলেন—পৃথিবীর জনসংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায়, ভবিষ্যতে একদিন হয়তো মানুষকে ব্যাপকভাবে কীট-পতঙ্গ খেতে হবে।

এখন তোমাদের মানুষের খাদ্য কয়েকটি কীট-পতঙ্গের কথা বলছি। অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিলেও আমাদের দেশে কোন কোন অঞ্চলে আদিবাসী ও পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে কীট-পতঙ্গ খাদ্য হিসাবে বহুদিন থেকেই চালু আছে। সম্প্রতি ভারতের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা অনুসন্ধান করে দেখেছেন মধ্যপ্রদেশের মুরিয়ারা পিঁপড়ে, মৌমাছির লার্ভা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ আহার করে থাকে। মুণ্ডারা নালশে পিঁপড়ে, উইপোকা প্রভৃতি মুখরোচক খাদ্য হিসাবে গণ্য করে।

কীট-পতঙ্গদের মধ্যে খাদ্য হিসাবে উইপোকার স্থান খুব উল্লেখযোগ্য। বাড়ী-ঘরে উইপোকার আবির্ভাবে আমাদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। এদের অভিযান বড় মারাত্মক। এরা মানুষের ঘ্যা

ক্ষতি করে, তা অবর্ণনীয়। ১৯৬২ সালের জুন মাসে দক্ষিণ মিশরের বাহোরিয়া প্রদেশে বিরাট একদল উইপোকার অভিযানে চারটি শিশু মারা যায় এবং কতকগুলি গৃহ বিধ্বস্ত হয়। পাঁচটি গ্রামের পাঁচহাজার অধিবাসীর মধ্যে উইপোকার অভিযান দারুণ ভয়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু উইপোকার আবির্ভাবে উইপোকাভোজীদের মধ্যে আনন্দের সীমা থাকে না। আফ্রিকার উইপোকাভোজী উপজাতিরা এদের ঢিবির (বাসস্থান) সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। ঢিবির খোঁজ পেলে—ছেলেমেয়ে সবাই ঢিবির কাছে ছুটে যায় এবং জ্যান্ত উইপোকা ধরে টপাটপ গিলতে থাকে। গর্ভবতী, রানী উইপোকাই এদের লোভনীয় খাদ্য। অবশ্য কর্মী ও পুরুষ উইপোকাও বাদ যায় না। রানী উইপোকার ডিম পাড়া সম্বন্ধে এরা যথেষ্ট খোঁজ-খবর রাখে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে প্রতি ১০০ গ্র্যাম উইপোকা থেকে ৫৬১ ক্যালরি উত্তাপ পাওয়া সম্ভব।

পঙ্গপালের কথা তোমরা অনেকেই জান। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি পঙ্গপাল ঝাঁকে ঝাঁকে অভিযান শুরু করে। এদের অভিযানে পৃথিবীর নানা দেশে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এদের গতিবিধি-সম্বন্ধে সতর্ক নজর রাখা হয়। কোন দেশে এরা যাতে না নামে তার জন্যে চেষ্টা চলে এদের তাড়াবার আর নামলেও পঙ্গপাল ও তার ডিম ও বাচ্চা ধ্বংস করবার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে যায়। এরা গাছপালা, ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে। কোন কোন অঞ্চল এদের আক্রমণে মরুভূমিতে পরিণত হয়। বছর তিন আগে কোলকাতায়ও বিরাট পঙ্গপালের ঝাঁক দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পঙ্গপালের ঝাঁক দেখামাত্র পঙ্গপালভোজী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আত্মহারা হয়ে যায়।

আফ্রিকা, মিশর, আরব, চীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে পঙ্গপাল খাওয়া হয়,। আফ্রিকার পঙ্গপাল-ভোজী উপজাতিরা জ্যান্ত পঙ্গপালের ডানা আর পিছনের ঠ্যাং দুটি ছিঁড়ে ফেলে কাঁচাই খেতে আরম্ভ করে দেয়। কে কত বেশি পঙ্গপাল খেতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়, অন্য দিকে আর লক্ষ্য থাকে না তখন। যারা একটু মুখরোচক করে খেতে চায়—তারা পঙ্গপাল ভেজে নেয় বা আগুনে ঝলসায়।

গ্রীসের কীট-পতঙ্গ ভোজীদের কাছে উইচিংড়ি অতি উপাদেয় খাদ্য। তবে বাচ্চা আর গর্ভবতী উইচিংড়ি এরা খেতে বেশি ভালবাসে। চীনের কীট-পতঙ্গভোজীদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে পঙ্গপাল, গঙ্গাফড়িং, বিছা, আরশোলা, গুটিপোকা, মৌমাছির এবং বোল্‌তার লার্ভা। এই সব কীট-পতঙ্গ দিয়ে তারা অনেক রকম সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে। নানা জাতের কীট-পতঙ্গ অস্ট্রেলিয়ার 'ব্যুসম্যান' নামক আদিবাসীদের প্রধান খাদ্য।

কীট-পতঙ্গভোজীদের কাছে পিঁপড়ে অতি লোভনীয় খাদ্য। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডের আদি-বাসীরা উইভার অ্যান্ট নামক পিঁপড়ে বেটে একরকম পানীয় তৈরি করে। এটা তাদের খুব প্রিয় পানীয়। বাড়িতে অতিথি আসলে—এই পানীয় তৈরি করে অতিথিকে আপ্যায়িত করে। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের উপাদেয় খাদ্য হচ্ছে—কারপেন্টার অ্যান্ট নামক পিঁপড়ে। মধু-পিঁপড়ের পেটে এক প্রকার মিষ্টি রস জমা হয়। রসের ভারে পিঁপড়ের পেটটা বেশ ফুলে ওঠে। এই মিষ্টি রস রেড ইণ্ডিয়ানদের খুব প্রিয় খাদ্য এবং এই রস দিয়ে তারা সরবৎও তৈরি করে। বোর্নিওর কোন কোন আদিবাসী মালাশে

পিঁপড়ে বেটে—তা ভাতে মেখে খায়।

দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন শহরে পিঁপড়ের টোস্ট প্যাকেটে বিক্রয় হয়, জাপান থেকে ভাজা পিঁপড়ে অন্য দেশে রপ্তানী করা হয়। প্রজাপতির লার্ভা গরম ভাজা খেতে নাকি অতি উপাদেয়। প্রজাপতির লার্ভা দিয়ে মেক্সিকোয় এক রকম মিষ্টি পানীয় তৈরি করা হয়। এসব ছাড়াও গুবরে পোকা, কাঁচ পোকা, ঝিঁঝি পোকা, স্টিংবাগ, স্ক্যাভেঞ্জার বিটল, ওয়াটার বিটল্ প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ পৃথিবীর নানা দেশে খাদ্য হিসাবে চালু আছে।

কীট-পতঙ্গ খাদ্য হিসাবে শুধু মুখরোচক—তাই নয়; বিজ্ঞানীদের মতে—আমাদের দেহের পুষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান; যেমন—প্রোটিন, ফ্যাট ভিটামিন প্রভৃতি কম বা বেশি পরিমাণে আমরা কীট-পতঙ্গ থেকে পেতে পারি।

চুম্বক

পিসিমা খোকা নিয়ে বেড়াতে আসছেন, তাই নিয়েই সবাই মশগুল, তাই ছ-বছরের সোনা আর পাঁচবছরের টিয়া রেগেমেগে বাড়ি ছেড়ে কালিয়ার বনে পালিয়ে গেল। পথে ঘড়িওলার সঙ্গে দেখা, সে বললে তাঁর কলের মানুষ মাকুকে খুঁজে দিতে। মাকু রাজকন্যা বিয়ে করতে চায়—তাকে হাসার কাঁদার কল দিতে হবে—নইলে বিয়ে করা হবে না। বনের মধ্যে মাকুর সঙ্গে দেখা। তারপর সার্কাসের সঙ্ আর জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে তারা বটতলার হোটেলে গেল আর বাসন ধোয়া আর পরিবেষনের চাকরি নিল। মাকুকে পাছে কেউ চিনে ফেলে তাই তার নাম দিল বেহারী।

সার্কাস পার্টির লোকেরা বটতলায় খেলা অভ্যাস করে। যাদুকর শূন্যে ফাঁস দিয়ে পরীদের রাণীকে নামাল।

রাত্রে হোটেলওলার জন্মদিনের ভোজ হবে, রান্নাবান্না হচ্ছে। সঙ্ ছুটে খবর দিল, বনে পেয়াদা সেঁদিয়েছে! সবাই গা-ঢাকা দিল।

এমন সময়ে ঘড়িওলা এসে হাজির, সে নাকি এই হোটেলওলার ভাই। মাকুকে ধরতে পারলে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে খুলে টুকরো টুকরো করে তাকে বেচে দেবে। সোনাটিয়া মাকুকে সাবধান করে দিতে চলল।

হঠাৎ পেয়াদার সঙ্গে দেখা আর অমনি দৌড়, দৌড়! পিছনে তারা হুড়মুড় শব্দ শুনল, পেয়াদা বাঘ ধরবার গর্তের মধ্যে আটকা পড়েছে!

ওদিকে ঘাসজমিতে মহা হৈ চৈ, হোটেলওলার জন্মদিনের উৎসবে জানোয়াররা ফিটফাট হয়েছে,

সকলের ভাল জামা কাপড় বেরিয়েছে। সোনাটিয়ার জন্যও নতুন জামা এসেছে। তারাও সন্ধ্যাবেলা সবাইকে নেচে গেয়ে দেখাবে।

হঠাৎ মাকুর কথা মনে পড়ে গেল—যদি মাকুকে ঘড়িওলা ধরে ফেলে? অমনি সোনাটিয়া আবার দৌড় দিল।

(সাত)

দৌড়য় আর হাঁপায় টিয়া, সোনা হাঁপায় না। টিয়া বলে-'তুই মাকুকে কাঁদার কল দিবি, না দিদি? তা হলে মাকু আর পালাবে না। কোথায় পাবি কাঁদার কল? ঘড়িওলা বানিয়ে দেবে?'

টিয়ার বুদ্ধি দেখে সোনার রাগ ধরে। 'ঘড়িওলা কোত্থেকে দেবে, টিয়া? শুনলে না মাকুকে তৈরি করতেই ওর সব বিদ্যে ফুরিয়ে গেছে? তুমি কি বোকা!'

তাই শুনে কাঁদবার জন্য হাঁ করেই টিয়া আবার মুখ বন্ধ করে বলল, 'তুই কি দিয়ে তৈরি করবি, বোকা বোকা বোকা?'

টিয়ার পিঠে গুম করে একটা কীল বসিয়ে, সোনা বলল, 'আমার কাছে জিনিসপত্র আছে, আমি বানিয়ে দেব। চল।' কাঁদতে ভুলে গিয়ে টিয়া আবার দৌড়তে শুরু করে। এমনি সময় সামনে দিয়ে একেবারে ওদের নাক ঘেঁষে প্রকাণ্ড বড় রঙ্গিন প্রজাপতি উড়ে যায়। এত বড় প্রজাপতি ওরা কখনো দেখেনি। সোনার দুটো হাতের তেলো পাশাপাশি জুড়লে যত বড় হয়, তার চেয়েও বড়। আর কি রঙের বাহার, গায় নীল, সবুজ, সাদা, কালো বর্ডার দেওয়া, লাল স্ফুতি আঁকা, রামধনু রঙের চোখ বসানো।

আর কথা নেই, হাঁটা পথ ছেড়ে ওরা প্রজাপতির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে থাকে। প্রজাপতি গাছের গোড়ায় ভুঁইচাঁপা ফুলের মধু খায়, ওরা হাঁ করে চেয়ে দেখে; কাছে গেলেই উড়ে পালায়।

প্রজাপতি মগডালে বুনো বাতাবি লেবুর ফুলে বসে, ওরা ডাল ধরে নাড়া দিলেই উড়ে পালায়। গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে এই রোদে এই ছায়ায় প্রজাপতি ওড়ে, নিচে নেমে ঘাস ফুলের পাতায় বসে, ঘাসের বোঁটা নুইয়ে পড়ে মাটি ছোঁয়। ঘাসের উপর ওদের ছায়া দেখলেই প্রজাপতি উড়ে পালায়। কখনো উঁচুতে কখনো নিচে ওড়ে, রোদে বসে ডানা কাঁপায়, ওদের সাড়া পেলেই উড়ে পালায়।

দৌড়ে দৌড়ে দৌড়ে সোনাটিয়া আর পারে না, পা ব্যথা করে। এমনি সময় দুটো বেঁটে করমচা গাছের ডালের মধ্যে ঝোলানো বড় মাকড়সার মোটা জালে প্রজাপতির পা জড়িয়ে যায়, সোনাটিয়ার প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে!

করমচার ডালের আড়ালে বসে বড় মাকড়সা সব দেখেছে, যেই না সুতো বেয়ে প্রজাপতি ধরবে, সোনা হাত বাড়িয়ে জাল ছিঁড়ে দেয়, প্রজাপতি আবার উড়ে পালায়।

টিয়া বললে—'দিদি, ধরলি না যে?

সোনা বললে—'আম্মা বলেছে প্রজাপতিদের ডানার রঙের গুঁড়ো হাতে লেগে গেলে আর প্রজাপতিরা উড়তে পারে না, মাটিতে পড়ে যায়।'

'তারপর কি হয়?'

'কাগরা ওদের ঠোকরায়, মাকড়সারা চুষে খেয়ে ফেলে, প্রজাপতিরা মরে যায়।'

টিয়া ভ্যাঁ করে কেঁদে বলে—'না, মরে যায় না। তুই ওদের জাল থেকে খুলে দিস্, ওরা উড়ে বাড়ি চলে যায়, ওদের মার কাছে! আমি মামণির কাছে যাব।'

সোনা ঢোক গিলে টিয়ার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বললে—'কাঁদছিস্ যে, মাকুকে খুঁজে বের করতে হবে না?—ও কিসের শব্দ?'

বলতে বলতে কখন ওরা আবার বাঘের ফাঁদের কাছে এসে পড়েছে, ঝোপেঝাড়ে আগাছায় আড়াল করা গর্তের মুখ, তারি ভিতর থেকে সে কি চ্যাঁচামেচি। সোনা ফিসফিস করে বললে—'দুষ্টু লোকটা মরে যায়নি, ঐ শোন্ চ্যাঁচামেচি করছে!'

আর সেখানে নয়, একদৌড়ে সোনা টিয়া আবার বটতলার হোটেলে এসে হাজির!

হোটেলে মহা ভিড়, সবাই ব্যস্ত। সর্বনাশ হয়ে গেছে। সঙ জানোয়ারদের ভিটামিনের বদলে ভুল করে কড়া জোলাপ খাইয়ে দিয়েছে। এখন আর মাত্র পাঁচ ঘণ্টা বাদে, হোটেলওলার জন্মদিনের পার্টি! মহড়াই বা হবে কখন, সাজবেই বা কখন, খেলা দেখাবেই বা কি করে? জানোয়াররা কাৎ হয়ে পড়েছে, সঙ মনের দুঃখে বুক চাপড়াচ্ছে। সব বুঝি পণ্ড হয়।

টিয়া বলল, 'পণ্ড হবে কেন? আমরা যে নাচব, গাইব। দড়াবাজির লোকরা দড়িতে চড়বে। জাদুকর পরীদের রাণীকে নামাবে—কিন্তু জোড়া ঘোড়া কোথায় পাবে?—ও সঙ, ঘোড়াদের কেন জোলাপ খাওয়াতে গেলে?'

ভাবনার চোটে কালো চাদর খুলে ফেলে দিয়ে ঘড়িওলাও সকলের সামনে বেরিয়ে পড়েছে। সে বললে—'আ সব্বনাশ! এমন দিনে এমন কাজ করতে আছে? তাও যদি আমার মাকু কাজে থাকতো গো; সে একাই বাজি মাৎ করে দিত। আহা, ফাষ্ট ক্লাসের বাবুরা তার কি প্রশংসাই না করেছিল, তাও তো সব দেখে নি। মাকু আমার কলের মানুষ হলে কি হবে, ওর ক্ল্যারিনেট বাজানো যে একবার শুনেছে, সে কি আর ভুলতে পেরেছে—কোথায় রোজ খেলা দেখিয়ে আমাকে বড়লোক করে দেবে, তা নয়, পরীদের রাণীকে বে করার বায়না!

এই অবধি শুনেই টিয়া মহা রেগে গেল, 'তবে যে বলেছিলে মাকুর কলকব্জা খুলে থলেয় পুরবে, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবে, তাইতো আমরা মাকুকে—'

সোনা টিয়ার গালে ঠাস করে এক চড় লাগাল, টিয়া কথা ছেড়ে ভ্যাঁ আর ঘড়িওলা ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। তার পেছনে যে হুলিয়া লেগেছে, দুঃখের চোটে সে কথা ভুলে, সবার সামনে মাকুর কথা বলে ফেলে এখন নিজের মাথাটা কি সর্বনাশ ডেকে আনল কে জানে?

কিছুক্ষণ সবাই থুম্ হয়ে রইল। ঘড়িওলা ভয়ে দুঃখে চিৎকার করে বলল—

'দাও না এবার সবাই মিলে ঠ্যাং ধরে টেনে আমাকে গারদে ঠুসে! হ্যাঁ আমি ঘড়ির দোকানের গুদোম থেকে কলকব্জা চুরি করে, সতেরো বছর খেটে মাকুকে বানিয়েছি! তাই আমার পেছনে পেয়াদা

লেগেছে! এক মাস যদি মাকুর খেলা দেখাতে পারতাম, সব ধার শুধে, কলকব্জার দাম চুকিয়ে, কোঁচড় ভরা টাকা নিয়ে, মার কাছে ফিরে যেতে পারতাম। ওমা, মা রে, কোথায় গেলি রে, কদ্দিন মোচার ঘণ্ট খাই নি!'

ঘড়িওলা ডুকরে কাঁদতে থাকে, সোনা টিয়াও সঙ্গ ধরে, হোটেলের মালিক ঘড়িওলার বড় ভাই, তারো মায়ের জন্য মন কেমন করে, সে গলা খাঁকরে, নাক টেনে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলে,—'এই বড্ড গোলমাল হচ্ছে, কে কোথায় শুনতে পাবে, প্যায়দা এসে বনে সেঁদিয়েছে, সে কথা ভুললে চলবে কেন?'

প্যায়দার কথা শুনে সোনাটিয়ার হাসি পায়, কান্না থেমে যায়। প্যায়দা আসবে কি করে, সে তো এখন বাঘের ফাঁদে পড়ে চেলাচ্ছে! কিন্তু সে কথা কাউকে বলা যায় না, যদি কেউ প্যায়দাকে তুলে আনে, প্যায়দা যদি ঘড়িওলাকে ধরে ফেলে, ঘড়িওলা ধরা পড়ে যদি মাকুর কথা প্যায়দাকে বলে। তাই সোনাটিয়া দু হাত দিয়ে এ ওর মুখ চেপে চুপ করে রইল।

জাদুকর প্রথম কথা বলল। ঘড়িওলাকে বলল,—'কোথায় তোমার মাকু? তাকে পেলে জানোয়ারদের বাদ দিয়েই খেলা দেখানো যায়। নইলে তিন গাঁ লোক আগাম টিকিট কেটে এসে, খেলা দেখতে না পেলে, আমাদের মেরে মাটিতে বিছিয়ে দেবে যে?'

ঘড়িওলা ফোঁৎ ফোঁৎ করে কাঁদতে লাগল। হোটেলের মালিক বলল—'সে পালিয়ে গেছে।' জাদুকর জানতে চাইলে, 'কেন, পালাল কেন?'

'ঘড়িওলাকে খুঁজতে গেছে। তার কাঁদার কল চাই।'

'তুমিই হলে নষ্টের গোড়া, তোমার পরীদের রাণীর খেল দেখে মাকু বলে, 'আমার সঙ্গে ওর বিয়ে দাও!' সবাই বললে—তুমি কলের পুতুল, হাসতে জানো না, কাঁদতে জানো না, তোমার সঙ্গে আবার বিয়ে কি! সেই ইস্তক দিনরাত ঘড়িওলার কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যান্ হাসতে একটু একটু পারি, কিন্তু কাঁদার কলটা দিতেই হবে! এদিকে ঘড়িওলার বিদ্যে ফুরিয়ে গেছে, কাঁদার কল দেয় কি করে? তা মাকু এমনি নাছোড়বান্দা যে শেষ পর্যন্ত না পালিয়ে ও বেচারা করে কি? তাছাড়া ঘড়ির দোকানের মালিক ওর নামে নালিশ করেছে, ধরা পড়লে জেলে পুরবে!'

এই বলে হোটেলওলা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

জাদুকর বললে,—'কি জ্বালা, এই সামান্য কারণে মাকু পালাল। আরে আমাকে বললে তো একদিন কেন, রোজ আমি পরীদের রাণীর সঙ্গে ওর বিয়ে দিতাম। কলের মানুষের সঙ্গে মহাধুমধাম করে রোজ পরীদের রাণীর বিয়ে হত, কাতারে কাতারে লোক দেখতে আসত, ঝম্‌ঝম্ করে টাকার রাশি ঝরে পড়ত, শুধু ঘড়িওলার কেন, আমাদের সার্কাস পার্টিরো সব ধার, শোধ হয়ে যেত, তাহলে আমাদের মালিকেরো—যাক্ গে, এখন মাকুকে খুঁজে বের করা হক তা'হলে।'

ঘড়িওলা বলল, 'আমার ভয় করে, আমার ভয় করে, আবার ছেঁকে ধরবে, কাঁদার কল্ দাও শিগ্‌গির!

জাদুকর বললে—'কি জ্বালা, বলছি, ওকে কাঁদতে হবে না, এমনি বিয়ে দেব।'

টিয়া বললে—'তা ছাড়া দিদি ওর কাঁদার কল বানিয়ে দেবে বলেছে।'

ঘড়িওলা বিশ্বাস করতে চায় না। 'সত্যি দেবে সোনা, কি করে দেবে, কি-ই বা জানো তুমি?'

সোনা বুক ফুলিয়ে বলল, 'কেন, আমি যোগ-বিয়োগ জানি, ছোট নদী দিনরাত জানি। তাছাড়া কাঁদার কলের জিনিসপত্র সবই আমার সঙ্গে আছে।'

অমনি যে যার উঠে পড়ল, চল, চল, মাকুকে খুঁজে আনা যাক।

জানোয়াররা জোলাপ খেয়ে শুয়ে থাকুক, মাকু খেলা দেখিয়ে বাজি মাৎ করে দেবে। হুড়মুড় করে বটতলা থেকে সবাই বেরিয়ে পড়ল, খালি হোটেলওলা এখানে ওখানে আঁতিপাঁতি লটারির টিকিটের আধখানা খুঁজে বেড়াতে লাগল।

টিয়া তাই দেখে বলল—'তুমি কেঁদোনা, হোটেলওলা, মাকুকে খুঁজে এনে, আমি তোমার আধখানা টিকিটও খুঁজে দেব।'

রান্নাবান্নার জোগাড়ও গাছতলায় পড়ে রইল, হোটেলওলা সুদ্ধ মাকুর খোঁজে চলল। সোনা টিয়ার হাত ধরে অন্য পথ ধরল।

ক্রমশঃ

দমকল ও গরু

নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়—বয়স ৯ বছর—গ্রাহক নং ১০১২

আমরা তখন চুঁচড়োয় ছিলাম। বাড়ির পাশে একটা গলি ছিল। সেটা আমাদের বাড়িরই অংশ ছিল, কিন্তু বাড়ি থেকে সরাসরি সেখানে যাবার পথ ছিল না। সেটা আঁস্তাকুড় মতো ছিল। তার একটা মুখ ছিল বন্ধ, আর এক মুখ রাস্তার ওপর। গলিটার মধ্যে একটা বাঁক ছিল। একদিন একটা গরু সেই গলিতে ঢুকে পড়েছে, আর বাঁক পেরিয়ে একেবারে এ মুখে এসে পড়েছে। তারপর আর বেরুতে পারছে না। এ মুখ তো বন্ধ, আর পিছু হটে বাঁক পেরুতেও পারছে না। বাঁকের এদিকটা আবার বড্ড সরু, তাই ঘুরে দাঁড়াতেও পারছে না। কখন ঢুকেছে জানিনা, আমরা বিকেলের দিকে যখন দেখলাম তখন রোদ্দুরে ও একেবারে হাঁপিয়ে গেছে। আমরা কতকগুলো তরকারীর খোসা আর এক বালতি জল ওকে জানলা দিয়ে দিলাম, ও সব খেয়ে নিল। খুব খিদে আর তেষ্টা পেয়ে ছিল নিশ্চয়। তারপর আমরা প্ল্যান করতে লাগলাম কি করে ওকে বের করা যায়। কার গরু কিছুতেই জানা গেল না। কেউ কেউ বলল, গলির পাঁচিলে উঠে ওকে দড়ি বেঁধে টেনে তোলা হোক। দিদি বলল, তোমাদের কর্ম নয়, দমকল ডাক।

অগত্যা দমকলে খবর দেওয়া হ'ল। দমকলের লোকে এসে ব্যাপার দেখে তো অবাক। তখন দুজন পাঁচিলে উঠে গরুটাকে পেরিয়ে গলির এ মুখে ঢুকে ওর শিং ধরে ঠেলতে লাগল, আর এদিক থেকে একজন ল্যাজ ধরে টানতে লাগলেন। যিনি ল্যাজ টানছিলেন তিনি নিশ্চয় অফিসার ছিলেন, কারণ শিংএর লোকেরা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে অনুযোগ করছিল—'সার, গুঁতোচ্ছে।' তারপর টানতে টানতে আর ঠেলতে ঠেলতে ওকে বাঁক পার করে দিতেই ও এদিকে এসে চওড়া জায়গা পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তা লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। ল্যাজের অফিসারও ওর সামনে পড়ে গিয়ে

ছুটে পালাতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে তাঁর টুপি পড়ে গেল। এরা চ্যাঁচাতে লাগল—'সার, আপনার টুপি পড়ে গেল'। রাস্তায় পড়েই গরুটা ছুটে পালাতে লাগল। ওকে ধরতে পারলে গরু ছেড়ে রাখার অপরাধে ওর মালিককে পুলিশে দেওয়া যাবে, তাই দমকলের লোকরাও দড়ি নিয়ে ওর পেছনে ছুটতে লাগল। অনেকটা রাস্তা মানুষে গরুতে দৌড় হ'ল, তারপর দৌড়ে হেরে দমকলের লোকরা ফিরে এল। তখন দমকলের গাড়িটা আবার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে গেল। দমকল দেখে বাড়ির সামনে অনেক লোক জমে গিয়েছিল, ব্যাপার দেখে তারাও হাসতে হাসতে চলে গেল। আমিও ঘটনাটা সন্দেশের জন্যে লিখে ফেললাম।

নির্দোষ

উজ্জ্বল চৌধুরী

বয়স ১০ গ্রাহক নং ২২৫৯

অনেক ছোট থেকে ঠিক কবে জানি না, আমার মা বাবা একটি হাতির গল্প বলতেন। সেই করুণ কাহিনী আজও আমার মনে দোলা দেয়। ঘটনাটা এই রকম।

উড়িষ্যার জমিদারের একটা হাতি ছিল। সেই হাতির মাহুত রোজ হাতির খাবার থেকে খানিকটা করে চুরি করে নিত। হাতিটা ব্যাপার বুঝতে পেরে একদিন মাহুতটাকে তাড়া করল। আর মাহুতটাও পালাতে লাগল। তিনদিন তারা দৌড়াল। শেষকালে উড়িষ্যার সীমা পেরিয়ে মেদিনীপুরের হিজলীতে ঢুকে পড়ল। বাবা তখন আই. আই. টিতে কাজ করতেন। আমার বয়স ১ বছর, দাদামণির ৮, ক্লাশ থ্রীতে পড়ে। রাস্তার লোকেরা দেখল একটা হাতি একটা লোককে তাড়া করে ছুটে আসছে। রাস্তার লোকেরা তখন 'পাগলা হাতি' বলে সরে দাঁড়াল। তখন দাদামণিদের স্কুলের বাস যাচ্ছিল। মাহুতটা বাসের পিছনে গিয়ে লুকাল। আর হাতি তাকে ধরতে গেল। মাহুত অমনি ওকে কাটিয়ে নিয়ে বাসের অন্য দিকে লুকাল। লুকোচুরি খেলা শুরু হ'ল। এই খেলায় হেরে গিয়ে হাতিটা চটে গিয়ে বাসটাকে নাড়া দিল। তখন সবাই ভয় পেয়ে হাতির মাহুতকে তাড়িয়ে দিল। তখন ওরা আবার দৌড়াতে লাগল। পুলিশ ততক্ষণে ব্যাপার জেনে গেছে। তাই থানার সামনে আসতেই মাহুত গ্রেপ্তার হল। তাই হাতিও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু পুলিশ হাতিটাকে পাগলা হাতি বলে সন্দেহ করেছিল। তাই মিলিটারীতে খবর দিয়ে ওকে গুলি করে মারল। হাতির চোখ দুটো মরার সময় যেন বলছিল, 'আমি নির্দোষ।'

অদ্ভুত রাজপুত্র

কাঞ্চন সেনগুপ্ত—গ্রাহক নম্বর…২৩৪৫ বয়স ১০

ভাত খেয়ে উঠে সন্দেশের আশায় Letter-Boxএ গিয়ে দেখলাম বিলকুল ফাঁকা, একটা চিঠি অবধি আসেনি, মন খারাপ করে বিছানায় শুয়ে রইলাম। হঠাৎ দেখলাম আমার সামনে কেমন

ূর্তির আবির্ভাব হলো, বাঁ হাতে মস্ত কালো ঢাল, ডান হাতে সাদা তলোয়ার, কী সুন্দর রাজপুত্রর যতো চেহারা।

ডানহাতের হাতায় লাল কালো বর্ডার মাঝখানে সাদা কাপড়ের উপর কালো বুটি দেওয়া, বুকের জামাটার ওপর আদ্ধেক কালো আদ্ধেক লাল রঙ্গিন লালের উপর কালো, কালোর উপর লাল বুটি দেওয়া, মাথায় কালোর ওপর সাদা পদ্মপাপড়ি করা টুপী তার ওপর লাল বুটি, সৌখিন গোঁফও রাখা হয়েছে হালকা নীল রঙের বেল্টও বাগানো হয়েছে। তার ওপর নানারঙের বুটি, পায়ে লাল কালো ডোরাকাটা চোস্ত। লাল কালো নাগরাইটা মন্দ হয়নি, কোমর থেকে রঙ বেরঙের ঝুটি ঝুলে পড়েছে। বাঁ-পা মাটীতে, ডান পা শূন্যে রেখে যেন নাচছে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো, দেখলাম বালিশের পাশে কখন মা নববর্ষের সন্দেশটা রেখে গেছেন আমি অবাক হয়ে গেলাম।

খুকুর ছলনা

দীপক ঘোষ

গ্রাহক নং ৮৯১ বয়স—১১

খুকুমণি কাঁদ কেন কি হয়েছে বল,
ক্ষণে ক্ষণে ওঠ কেঁদে, কি ব্যাপার হ'ল ?
লেখা নেই, পড়া নেই, শুধু বসে খেলা,
পুতুলের বিয়েতেই খেল লোক মেলা।
সাড়ি চাই, স্নো চাই, কোথা হতে পাও ?
দিদি যদি নাই দিল চুরি করে নাও।
একটু বকুনি দিলে চোখে আসে জল,
দিদিদের ফাঁকি দিতে এই তব ছল !

গ্রাহকদের কাছে প্রশ্ন

মুকুর দাশগুপ্ত—গ্রাহক নং ২১১৫ বয়স ১২ বছর

(১) পৃথিবীর সব চেয়ে পুরোনো বাড়ি কোনটা যাতে এখনো লোকে স্বাভাবিক ভাবে বাস করছে ?

(২) পৃথিবীর সব চেয়ে মোটা বই কোন্‌টা ?

(৩) অতীত ও বর্তমানে কোন টেস্ট্‌ ক্রিকেটার সব চেয়ে বেশি ডাবল্‌ সেঞ্চুরি করেছে ?

(৪) এই ক্রিকেটারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অল্‌ রাউণ্ডার কোন জন ? ডেক্সটার, ব্যারিংটন, সিম্প্‌সন, ফিলিপট, রীড, হোয়াইট, ও'নিল রেডপাথ, টেলর, মর্গ্যান, বার্লো, বোরদে, নসীম্‌-উল-ঘনী।

(৫) এখন পৃথিবীর সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য টেস্ট্‌ ব্যাট্‌স্‌ ম্যান কে ?

পচা মাছের সুবাস

করবী গুপ্ত—গ্রাহক নং ২৪২৩ বয়স ১৬

বাব্বা, মামা বাড়ি যাবার শখ আমার মিটে গেছে, আর কখনো মামা বাড়ি যাবো বলে বায়না ধরব না। তোমরা নিশ্চয় সুধাবে কেন আমার এই পরিবর্তন? আচ্ছা, বলতো যা দেখে এলাম আর যা শুনে এলাম এতে পরিবর্তন না হয়ে পারে? কি সেটাই জানতে চাইছো? তবে বলি।

পরীক্ষা হয়ে গেছে, হাতে কোন কাজ নেই তাই এলাম মামা বাড়ি কলকাতা বেড়াতে। বেশ আদর যত্ন করেই মেজমামা প্লেন-অফিস থেকে নিয়ে গেল বাড়িতে। পথে আসতে আসতে অনেক কথাই হল মেজমামার সঙ্গে। প্রায় চার বছর পর কলকাতা এলাম। বেশ মজা লাগছিল। কিন্তু হায়! তখন কি জানতে পেরেছিলাম যে বাড়িতে ঢুকে ঐ দেখবো? তবে নিশ্চয় এতটা খুশি হতেম না। বাড়িতে ঢুকেই দেখি ড্রয়িংরুমে হ্যাংগারে ঝুলোনো একটা শার্ট রয়েছে। বেশ সুন্দর সোফাটোফা দিয়ে ঘরটা সাজানো, এর মাঝে ঐ শার্টটা টাঙ্গিয়ে রাখার মানে পেলাম না। এটা মেজমামার বাজে রুচির কাজ তা বুঝতে পেরে খুব রাগ হচ্ছিল। শার্টটার পাস কাটিয়ে যেতেই এমন ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল, আমি বিরক্ত হয়ে মেজমামার দিকে তাকালাম। হাসি হাসি মুখে আমার কাছে এসে বলল, কিরে একটা খুব সুইট গন্ধ পাচ্ছিস্, তাই না? হ্যাঁ, তাতো পাবিই, বলে মেজমামা শার্টটার গায়ে নাক ঠেকিয়ে খুব আরামে চোখ বুজে বার কয়েক গন্ধ শুঁকে নিয়ে বলল, জানিস্ এটার মস্ত হিস্‌ট্রি আছে। আচ্ছা খেয়ে দেয়ে নে পরে তোকে কাহিনীটা বলছি। দেখবি তখন যতদিন তুই এখানে থাকবি ততদিন রোজ অন্ততঃ ছবার ভাত খাবার সময় এটার গায়ের গন্ধ শুঁকবি। মামার কথা শুনে আমার ভারী কৌতূহল হল। কি হিস্‌ট্রি কে জানে। ওর তো সবটাতেই বাড়াবাড়ি।

দুপুরবেলা খাওয়া হতেই মেজমামাকে কথাটা মনে করিয়ে দিলাম। মামা আরম্ভ করল।

ঃ সেদিনটা ছিল ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাস আমি তখন ১৫ দিনের ছুটী পাই কিন্তু দাদার সেই সময়টাতেই খুব কাজের চাপ পড়ে। দাদা টুরে গেছেন ওদিকে চাকরটাও আবার সেদিন এবসেণ্ট হয়ে বসে আছে। বাজার যাবার লোক নেই। বৌদি আমাকে বার বার বলতে লাগল বাজার যাবার জন্য। প্রথমটায় অমত করেছিলাম পরে বৌদি রান্না করতে পারব না ভয় দেখাতেই ভাবলাম, কোন দিন তো যাই নি আচ্ছা আজ না হয় একবার দেখে আসি। বাজার সম্বন্ধে তো কতজনার মুখে কত কথাই শুনি, আজ একবার প্রত্যক্ষ করে নি।

ও বাব্বা! বাজারে ঢুকে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। বাজার দেখে মুখ বেজার হয়ে গেল। মাছের তো মাকেও দেখতে পাচ্ছি না কেবল একরাশ মাথা—তাও মাথাগুলো আবার মানুষের, মাছের হলেও চলত। সর্বত্র একটা ধাক্কাধাক্কি আর হৈচৈ? এরি নাম বাজার। হঠাৎ দেখি বাজার ফাঁকা করে সব লোক একটা জায়গার দিকে ছুটছে আমি তো অবাক হয়ে থলিটা নিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়েই আছি। একটা লোককে কারণটাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম মাছ এসেছে। অ্যাঁ, মাছ? বৌদির খিচুনি শুনতে হবে ভাবছিলাম এমন সময় এক ধাক্কা খেয়ে আমি সব্বার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে

একেবারে মাছওয়ালার মাথার ঝুড়িটার ওপর পড়লাম। তুই নিশ্চয় ভাবছিস ঝাঁকা ভরতি সব বড় বড় মাছ। ঘোড়ার ডিম, সেখানে আছে গোটাকতক পচা ছোট ছোট খয়রা মাছ।

ঃ আমি তা থেকে কয়েকটা তুলে নিয়ে সোজা শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে ভাবছি নামি কি করে? এমনি সময় মাছওয়ালাটা মাথাটা ঝাঁকুনি দিতেই আমি ওর ঝুড়ি থেকে পড়ে গেলাম। সেই নয় নম্বর বাসটায় গিয়ে পড়লাম—যেটা সার্দান এ্যাভিনিউ দিয়ে যায় এমনি ভগবানের দয়া, কত মানুষ চেষ্টা করেও ভেতরে ঠাঁই পাচ্ছে না আর আমি সুড়ুৎ করে জানালা দিয়ে সোজা ভেতরে?' এইটুকু বোলে মামা একটু থেমে আবার শুরু করলেন।

ঃ উঃ তখন কি জানতাম অজয় ঐ বাসেই অফিস যায় আর ওটা অফিস টাইমের বাস? যাক্‌গে, যা বোলছিলাম,—যা গেছে তা নিয়ে আর দুঃখ করে হবেটা কি যা আছে তা নিয়েই সুখে থাকি, মাছ আনতে পেরেছি বোলে বৌদির কাছে ক্রেডিট পাব এই আনন্দে ভিড়ের মাঝে অতি কষ্টে রড ধরে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কখন আমাদের স্টপেজটা আসবে। এমনি সময় তাকিয়ে দেখি অজয় আমার পাশে দাঁড়িয়ে। ভাবলাম ওকে নেমতন্ন করি না আজ ভবানীপুরে যাবার জন্য। বড়দিও এখানে নেই, বেচারা একা একা কি খায় কে জানে? তবুও বৌদির হাতে মাছের ঝোল খেতে পাবে। যেই ওকে বলতে যাবো অমনি দেখি ও আমার দিকে তাকিয়ে 'চলি' বোলে প্রায় চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়ল। ওর জন্য কষ্ট হল আহা বেচারা হোটেলে মেসে খায়—আচ্ছা বাড়ি গিয়ে অফিসে একটা ফোন করে দেব ওকে। পচা মাছের গন্ধে বাসটা তখন ভরপুর আর সবাই যে আমার দিকে তাকাচ্ছে এই ভেবে বেশ গর্বও হল আমার। বাসটা থামতেই নেমে গেলাম পকেটে হাত দিয়ে দেখি 'মাছ নেই', চোখ ছানা বড়া! 'মাছ নেই, কে নিলো তবে' জিজ্ঞেস করতেই মেজমামা চোখ লাল করে বললেন "নিয়েছে তোমার ঐ গুণধর দাদা—ছিঃ ছিঃ বড়দির ছেলে আমার পকেট মেরে মাছ নিতে পারে? আবার কিনা রাত্রিবেলা নিমন্ত্রণ করে আমার মাছ দিয়ে আমাকেই খাইয়ে দিলে! বলে কিনা—মামা, বহু দিন পরে বহু কষ্টে মাছ যোগাড় করেছি তাই তোমায়—অসভ্য ছেলে'। আমার কিন্তু বিশ্বেস করতে ইচ্ছে হল না অজয়দা মামার পকেট মেরেছে। তবুও বললাম 'সেই থেকে বুঝি শার্টটা ঝুলিয়ে রেখেছো?'

'হ্যাঁরে বাড়িতে এসে বৌদিকে বলবার পর বৌদি বলল এক কাজ কর শার্টটায় মাছ মাছ গন্ধ হয়ে আছে এটাকে ড্রয়িং রুমে রাখলে হয় না? বেশ সুইট গন্ধ বেরোবে। যারা ড্রয়িংরুমে বসবে তারাও তৃপ্তি পাবে। বৌদির কথায় শার্টটা রাখলাম। বড়দির ছেলে বলেই অজয়কে ছেড়ে দিলাম নৈলে দেখে নিতুম একবার—',

কাহিনী শুনে অবাক হয়ে রইলাম তবে স্বীকার করতে বাধা নাই যতদিন কলকাতায় ছিলাম প্রতিদিন নিরামিষ ভাত খাবার সময়ে মেজমামা, বড় মামা আর মামিমার সংগে শার্টটির গায়ে নাক ঠেকিয়ে সুবাস নিতাম—

গ্রাহকদের পাঠান ধাঁধার উত্তর

অভিজিৎ দে—গ্রাঃ নং ১৬১৩ (১) মুদ্রারাক্ষস। (২) মহীরাবণ।

পার্থ কুণ্ড—গ্রাঃ নং ২৯৯০—নিড়ানি।

অঞ্জনপ্রকাশ সেনগুপ্ত—গ্রাঃ নং ২৭০২ (১) চাই বাসা (২) ঝাড়গ্রাম (৩) ছোটনাগপু (৪) আসাম (৫) সুন্দরবন (৬) গ্রীনল্যাণ্ড (৭) শ্যামবাজার (৮) ভুবনেশ্বর।

গ্রাহকেরা যদি ধাঁধা পাঠাও, পছন্দ হলে, আমরা নিশ্চয় ছাপবো। ধাঁধার সঙ্গে উত্তর পাঠাতে ভুলোনা, পরের মাসে উত্তরগুলি ছাপা হবে। কেউ যদি ধাঁধার উত্তর পাঠাতে চাও তাহলে সেই গ্রাহকের নামে সন্দেশের ঠিকানায় পাঠালে আমরা তার কাছে পাঠিয়ে দেব।

মুকুর দাশগুপ্তের মতন অন্যরাও গ্রাহকদের নানা প্রশ্ন করতে পার। সঙ্গে উত্তর দিতে ভুলোনা ; পরের মাসে উত্তরগুলি ছাপানো হবে। গ্রাহকের নামে উত্তর পাঠালে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবে সন্দেশের পাতায় উত্তর-দাতাদের নাম ছাপানো সম্ভব হবে না।

ক'লকাতা।

রাজেনবাবুকে রোজ বিকেলে ম্যাল্-এ আসতে দেখি। মাথার চুল সব পাকা, গায়ের রং ফরসা, মুখের ভাব হাসিখুশি। পুরোনো নেপালি আর তিব্বতী জিনিসটিনিসের যে দোকানটা আছে ,সেটায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাইরে এসে বেঞ্চিতে আধঘণ্টার মত বসে সন্ধে হব হব হলে জালাপাহাড়ে বাড়ি ফিরে যান। আমি আবার একদিন ওঁর পেছন পেছন গিয়ে ওঁর বাড়িটাও দেখে এসেছি। গেটের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, 'কেহে তুমি, পেছু নিয়েছ?' আমি বললাম, 'আমার নাম তপেশরঞ্জন দত্ত।' 'তবে এই নাও লজঞ্চুস' বলে পকেট থেকে সত্যিই একটা লেমনড্রপ বার করে আমায় দিলেন, আর দিয়ে বললেন, 'একদিন সকালে এসোনা আমার বাড়িতে—অনেক মুখোশ আছে, দেখাবো।'

সেই রাজেন বাবুর যে এমন বিপদ ঘটতে পারে তা কেউ বিশ্বাস করবে?

ফেলুদাকে কথাটা বলতেই সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল।

'পাকামো করিসনে। কার কী করে বিপদ ঘটবে না-ঘটবে সেটা কি মানুষকে দেখলে বোঝা যায়?'

আমি দস্তুরমত রেগে গেলাম।

'বারে, রাজেনবাবু যে ভালো লোক সেটা বুঝি দেখলে বোঝা যায় না? তুমিত তাকে দেখোইনি। দার্জিলিং-এ এসে অবধিত তুমি বাড়ি থেকে বেরোওইনি। রাজেনবাবু নেপালি বস্তীতে গিয়ে গরীবদের কত সেবা করেছেন জান?'

'আচ্ছা বেশ বেশ, এখন বিপদটা কী তাই শুনি। আর তুই কচি খোকা, সে বিপদের কথা তুই জানলি কী করে?'

কচি খোকা অবিশ্যি আমি মোটেই না, কারণ আমার বয়স সাড়ে তেরো বছর। ফেলুদার বয়স আমার ঠিক ডবল।

সত্যি বলতে কি—ব্যাপারটা আমার জানার কথা নয়। ম্যাল্‌-এ বেঞ্চিতে বসেছিলাম—আজ রবিবার, ব্যাণ্ড বাজাবে, তাই শুনব বলে। আমার পাশে বসেছিলেন তিনকড়িবাবু, যিনি রাজেনবাবুর বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে দার্জিলিং-এ গরমের ছুটি কাটাতে এসেছেন। তিনকড়িবাবু আনন্দবাজার পড়ছিলেন, আর আমি কোনরকমে উঁকিঝুঁকি মেরে ফুটবলের খবরটা দেখার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্যাকাশে মুখ করে রাজেনবাবু এসে ধপ্‌ করে তিনকড়ি বাবুর পাশে বসে গায়ের চাদরটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন।

তিনকড়িবাবু কাগজ বন্ধ করে বললেন, 'কী হল, চড়াই উঠে এলেন নাকি?'

রাজেনবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'আরে না মশাই। এক ইন্‌ক্রেডিব্‌ল ব্যাপার!'

ইন্‌ক্রেডিব্‌ল কথাটা আমার জানা ছিল। ফেলুদা ওটা প্রায়ই ব্যবহার করে। ওর মানে 'অবিশ্বাস্য'।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'এই দেখুন না।'

রাজেনবাবু পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা নীল কাগজ বার করে তিনকড়ি বাবুর হাতে দিলেন। বুঝতে পারলাম সেটা একটা চিঠি।

আমি অবিশ্যি চিঠিটা পড়িনি, বা পড়ার চেষ্টাও করিনি; বরঞ্চ আমি উল্‌টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে গুণগুণ করে গান গেয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন বুড়োদের ব্যাপারে আমার কোন ইণ্টারেস্টই নেই' কিন্তু চিঠিটা না পড়লেও, তিনকড়িবাবুর কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

'সত্যিই ইন্‌ক্রেডিব্‌ল। আপনার ওপর কার এমন আক্রোশ থাকতে পারে যে আপনাকে এ ভাবে শাসিয়ে চিঠি লিখবে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'তাইত ভাবছি। সত্যি বলতে কি, কোনদিন কারুর অনিষ্ট করেছি বলে ত মনে পড়ে না।'

তিনকড়িবাবু এবার রাজেনবাবুর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'হাটের মাঝখানে এসব ডিসকাস না করাই ভালো। বাড়ি চলুন।'

দুই বুড়ো উঠে পড়লেন।

ফেলুদা ঘটনাটা শুনে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে গুম্ হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, 'তুই তাহলে বলছিস যে একবার তলিয়ে দেখা চলতে পারে?'

'বা রে—তুমিই ত রসস্যজনক ঘটনা খুঁজছিলে। বললে অনেক ডিটেক্‌টিভ বই পড়ে তোমারও ডিটেক্‌টিভ বুদ্ধিটা খুব ধারালো হয়ে উঠেছে।'

'তাত বটেই। এই ধর—আমিত আজ ম্যালে যাইনি, তবু বলে দিতে পারি তুই কোনদিকের বেঞ্চে বসেছিলি।'

'কোন দিক?'

'রাধা রেস্টুরাণ্টের ডান পাশের বেঞ্চগুলোর একটাতে।'

'আরেব্বাস! কী করে বুঝলে?'

'আজ বিকেলে রোদ ছিল। তোর বাঁ গালটা রোদে ঝল্‌সেছে, ডানটা ঝলসায়নি। একমাত্র ওই বেঞ্চগুলির একটাতে বসলেই পশ্চিমের রোদটা বাঁ গালে পড়ে।'

'ইন্‌ক্রেডিব্‌ল!'

'যাক্ গে। এখন কথা হচ্ছে—রাজেন মজুমদারের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার।

* * * *

'আর সাতাত্তর পা।'

'আর যদি না হয়?'

'হবেই, ফেলুদা। আমি সেবার গুনেছিলাম।'

'না হলে গাঁট্টা ত?'

'হ্যাঁ—কিন্তু বেশি জোরে না। জোরে মারলে মাথার ঘিলু এদিক ওদিক হয়ে যায়।'

কী আশ্চর্য—সাতাত্তরে রাজেনবাবুর বাড়ি পৌঁছলাম না। আরো তেইশ পা গিয়ে তবে ওর বাড়ির গেটের সামনে পড়লাম।

ফেলুদা ছোট্ট করে একটা গাঁট্টা মেরে বলল, 'আগের বার ফেরার সময় গুনেছিলি, না আসার সময়?'

'ফেরার সময়।'

'ইডিয়ট! ফেরার সময় ত ঢালু নামতে হয়। তুই নিশ্চয়ই ধাঁই ধাঁই করে ইয়া বড়া বড়া স্টেপস ফেলেছিলি!'

'তা হবে।'

'নিশ্চয়ই তাই। আর তাই স্টেপস সেবার কম হয়েছিল, এবার বেশি হয়েছে। জোয়ান বয়সে ঢালু নামতে মানুষে বড় বড় পা ফেলে প্রায় দৌড়নর মত। আর বুড়ো হলে ঢালুর বেলা ব্রেক ক'ষে ক'ষে ছোট ছোট পা ফেলতে হয়—তা নাহলে মুখ থুবড়ে পড়ে।'

কাছাকাছি কোন্ বাড়ি থেকে রেডিওতে গান শোনা যাচ্ছে। ফেলুদা এগিয়ে কলিং বেল টিপল।

'কী বলবে সেটা ঠিক করেছ ফেলুদা ?'

'যা খুশি তাই বলব। তুই কিন্তু স্পীক-টি-নট। যতক্ষণ থাকবি এ বাড়িতে, একটি কথা বলবিনে।'

'কিছু জিগ্যেস করলেও না ?'

'শাটাপ্ !'

একটা নেপালি চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

'অন্দর আঈয়ে।'

বৈঠকখানায় ঢুকলাম। বেশ সুন্দর পুরোনো প্যাটার্নের কাঠের বাড়ি। শুনেছি রাজেনবাবু দশ বছর হল রিটায়ার করে দার্জিলিং-এ আছেন। কলকাতায় বেশ নাম করা উকিল ছিলেন।

চেয়ার টেবিল যা আছে ঘরে সব বেতের। যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে চারিদিকে দেয়ালে টাঙানো সব অদ্ভুত দাঁত খিঁচোনো চোখ রাঙানো মুখোশের সারি। আর আছে পুরোনো ঢাল, তলোয়ার, ভোজালি, থালা, ফুলদানি এইসব। কাপড়ের উপর কাজ করা বুদ্ধের ছবিও আছে—কত পুরোনো কে জানে ? কিন্তু তাতে যে সোনালি রংটা আছে সেটা এখনও ঝলমল করছে।

আমরা দুজনে দুটো বেতের চেয়ারে বসলাম।

ফেলুদা দেয়ালের এদিক ওদিক দেখে বলল, 'পেরেকগুলো সব নতুন, মর্চে ধরেনি। ভদ্রলোকের প্রাচীন জিনিসের শখটা বোধহয় বেশি প্রাচীন নয়।'

রাজেনবাবু ঘরে ঢুকলেন।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুদা উঠে গিয়ে টিপ্ করে এক পেন্নাম ঠুকে বলল, 'চিনতে পারছেন ? আমি জয়কৃষ্ণ দত্তর ছেলে ফেলু।'

রাজেনবাবু প্রথমে চোখ কপালে তুললেন, তারপর চোখের দুপাশ কুঁচকিয়ে এক গাল হেসে বললেন, 'বা-বা ! কত বড় হয়েছো তুমি, অ্যাঁ ? কবে এলে এখানে ? বাড়ির সব ভালো ? বাবা এসেছেন ?'

ফেলুদা জবাব দিচ্ছে, আর আমি মনে মনে বলছি—কী অন্যায়, এত কথা হল, আর ফেলুদা একবারও বললনা সে রাজেনবাবুকে চেনে ?

এবার ফেলুদা আমার পরিচয়টাও দিয়ে দিল। রাজেনবাবুর মুখ দেখে মনেই হল না যে এই সাতদিন আগে আমাকে লজঞ্চুস দেবার কথাটা ওঁর মনে আছে।

ফেলুদা এবার বলল, 'আপনার খুব প্রাচীন জিনিসের শখ দেখছি।'

রাজেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এখন ত প্রায় নেশায় দাঁড়িয়েছে।'

'কদ্দিনের ব্যাপার ?'

'এইত—মাস ছ'এক হবে। কিন্তু এর মধ্যেই অনেক কিছু সংগ্রহ করে ফেলেছি।'

ফেলুদা এবার একটা গলা খাক্‌রানি দিয়ে, আমার কাছ থেকে শোনা ঘটনাটা বলে বলল, 'আপনি আমার বাবার মামলার ব্যাপারে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, তার প্রতিদানে আপনার এই বিপদে যদি কিছু করতে পারি…'

রাজেনবাবুর ভাব দেখে মনে হল তিনি সাহায্য পেলে খুশিই হবেন, কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই তিনকড়িবাবু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাঁপানোর বহর দেখে মনে হল বোধহয় বেড়িয়ে ফিরলেন। রাজেনবাবু আমাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার বিশেষ বন্ধু জ্ঞানেশ সেন, অ্যাডভোকেট্ হচ্ছেন তিনকড়িবাবুর প্রতিবেশী। আমি ঘরভাড়া দেবো শুনে জ্ঞানেশই তিনকড়িকে সাজেস্ট করে আমার এখানে আসতে। গোড়ায় উনি হোটেলের কথা ভেবেছিলেন।'

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, 'আমার ভয় ছিল আমার এই চুরুটের বাতিকটা নিয়ে। এমনও হতে পারত যে রাজেনবাবু হয়ত চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। তাই সেটা আমি আমার প্রথম চিঠিতেই লিখে জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কি বায়ুপরিবর্তনের জন্য এসেছেন?'

'তা বটে। তবে বায়ুর অভাবটাই যেন লক্ষ্য করছি বেশি। পাহাড়ে ঠাণ্ডাটা আরেকটু বেশি এক্সপেক্ট করে লোকে।'

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'আপনার বোধহয় গানবাজনার শখ?'

তিনকড়িবাবু অবাক হাসি হেসে বললেন, 'সেটা জানলে কী করে হে?'

'আপনি যখন কথা বলছেন তখন লক্ষ্য করছি যে লাঠির উপর রাখা আপনার ডান হাতের তর্জনীটা রেডিওর গানটার সঙ্গে তাল রেখে যাচ্ছে।'

রাজেনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'মোক্ষম ধরেছ। উনি ভালো শ্যামা সঙ্গীত গাইতে পারেন।'

ফেলুদা এবার বলল, 'চিঠিটা হাতের কাছে আছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'হাতের কাছে কেন, একেবারে বুকের কাছে।'

রাজেনবাবু কোটের বুকপকেট থেকে চিঠিটা বার করে ফেলুদাকে দিলেন। এইবার সেটা দেখার সুযোগ পেলাম।

হাতে লেখা চিঠি নয়। নানান জায়গা থেকে ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে তবে চিঠিটা লেখা হয়েছে। যা লেখা হয়েছে, তা হল এই—'তোমার অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করিতে প্রস্তুত হও।'

ফেলুদা বলল, 'এ চিঠি কি ডাকে এসেছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। লোক্যাল ডাক—বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় খামটা ফেলে দিয়েছি। দার্জিলিং-এরই পোস্টমার্ক ছিল। ঠিকানাটাও ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে লেখা।'

'আপনার নিজের কাউকে সন্দেহ হয়?'

'কী আর বলব বলো! কোনদিন কারুর প্রতি কোন অন্যায় বা অবিচার করেছি বলে ত মনে পড়েনা।'

'আপনার বাড়িতে যাতায়াত করেন এমন কয়েকজনের নাম করতে পারেন ?'

'খুব সহজ। আমি লোকজনের সঙ্গে মিশি কমই। ডাক্তার ফণী মিত্তির আসেন অসুখ বিসুখ হলে…'

'কেমন লোক বলে মনে হয় ?'

'ডাক্তার হিসেবে বোধহয় সাধারণ স্তরের। তবে তাতে আমার এসে যায়না, কারণ আমার ব্যারামও সাধারণ—সর্দি জ্বর ছাড়া আর কিছুই হয়নি দার্জিলিং এসে অবধি। তাই ভালো ডাক্তারের প্রয়োজন হয়না।'

'চিকিৎসা করে পয়সা নেন ?'

'তা নেন বইকি। আর আমারও ত পয়সার অভাব নেই। মিথ্যে অবলিগেশনে যাই কেন ?'

'আর কে আসেন ?'

'সম্প্রতি মিস্টার ঘোষাল বলে একটি ভদ্রলোক যাতায়াত…এই ছাখো!'

দরজার দিকে ফিরে দেখি একটি ফরসা, মাঝারি হাইটের, সুট পরা ভদ্রলোক হাসিমুখে ঘরে ঢুকছেন।

'আমার নাম শুনলুম বলে মনে হল যে!'

রাজেনবাবু বললেন, 'এই মাত্র আপনার নাম করা হয়েছে। আপনার ও আমার মত পুরোনো জিনিসের শখ সেটাই এই ছেলেটিকে বলতে যাচ্ছিলুম। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—

নমস্কার টমস্কারের পর মিস্টার ঘোষাল—পুরো নাম অবনীমোহন ঘোষাল—রাজেনবাবুকে বললেন, 'আপনাকে আজ দোকানে দেখলুম না, তাই একবার ভাবলুম খোঁজ নিয়ে যাই।'

রাজেনবাবু বললেন, 'নাঃ—আজ শরীরটা ভালো ছিল না।'

বুঝলাম রাজেনবাবু চিঠিটার কথা মিস্টার ঘোষালকে বলতে চাননা। ফেলুদাও মিস্টার ঘোষাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা হাতের তেলোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে।

ঘোষাল বললেন, 'আপনি ব্যস্ত থাকলে আজ বরং…আসলে আপনার ওই তিব্বতী ঘণ্টাটা একবার দেখার ইচ্ছা ছিল।'

রাজেনবাবু বললেন, 'সেতো খুব সহজ ব্যাপার। হাতের কাছেই আছে।'

রাজেনবাবু ঘণ্টা আনতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা ঘোষালকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এখানেই থাকেন ?'

ভদ্রলোক দেয়াল থেকে একটা ভোজালি নামিয়ে সেটা দেখতে দেখতে বললেন, 'আমি কোন এক জায়গায় বেশি দিন থাকিনা। আমার ব্যবসার জন্য প্রচুর ঘুরতে হয়। আমি কিউরিও সংগ্রহ করি।'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদাকে জিগ্যেস করে জেনেছিলাম 'কিওরিও' মানে দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন জিনিস।

রাজেনবাবু ঘণ্টাটা নিয়ে এলেন। দারুণ দেখতে জিনিসটা। বললেন, নিচের অংশটা রূপোর তৈরি, হাতলটা তামা আর পেতল মেশানো, আর তার উপরে লাল নীল সব পাথর বসানো।

অবনীবাবু চোখ টোখ কুঁচকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টাটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

রাজেনবাবু বললেন ; 'কী মনে হয় ?'

'সত্যিই দাঁও মেরেছেন। একেবারে খাঁটি পুরোনো জিনিস।'

'আপনি বল্লে আমার আর কোনই সন্দেহ থাকেনা। দোকানদার বলে এটা নাকি একেবারে খাদ লামার প্রাসাদের জিনিস।'

'কিছুই আশ্চর্য না।...আপনি বোধহয় এটা হাতছাড়া করতে রাজি নন ? মানে, ভালো দাম পেলেও ?'

রাজেনবাবু মিষ্টি করে হেসে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন ? শখের জিনিস—ভালোবেসে কিনেছি। সেটাকে বেচে লাভ করব, বা এমন কি কেনা দরেও বেচব—এ ইচ্ছে আমার নেই।'

অবনীবাবু ঘণ্টাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আসি। কাল আশাকরি বেরোতে পারবেন একবার।'

রাজেনবাবু বললেন, 'ইচ্ছে ত আছে।'

অবনীবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর ফেলুদা রাজেনবাবুকে বলল, 'কটা দিন একটু না বেরিয়ে টেরিয়ে সাবধানে থাকা উচিত নয় কি ?'

'সেটাই বোধ হয় ঠিক। কিন্তু মুশকিল কী জান ? সেই চিঠির ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে এটাকে ঠিক যেন সিরিয়াসলি নিতেই পারছি না। মনে হচ্ছে এটা যেন একটা ঠাট্টা—যাকে বলে প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক।'

'যদ্দিন না সেটা সম্বন্ধে ডেফিনিট হওয়া যাচ্ছে, তদ্দিন বাড়িতেই থাকুন না। আপনার নেপালি চাকরটা কদ্দিনের ?'

'একেবারে গোড়া থেকেই আছে। কম্‌প্লীটলি রিলায়েব্‌ল।'

ফেলুদা এবার তিনকড়িবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি কি বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন ?'

'সকাল বিকেল ঘণ্টাখানেক একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসি আর কি। কিন্তু বিপদ যদি ঘটেই, আমি বুড়ো মানুষ খুব বেশি কিছু করতে পারি কি ? আমার বয়স হল চৌষট্টি, রাজেন বাবুর চেয়ে এক বছর কম।'

রাজেনবাবু বললেন, 'তিনি চেঞ্জে এসেছেন, ওঁকে আর বাড়িতে বন্দি করে রাখার ফন্দি করছ কেন তোমরা ? আমি থাকব, আমার চাকর থাকবে, এই যথেষ্ট। তোমরা চাও ত দুবেলা খোঁজ খবর নিয়ে যেও এখন।'

'বেশ তাই হবে।'

ফেলুদার দেখাদেখি আমিও উঠে পড়লাম।

আমরা যেখানে বসেছিলাম তার উল্টোদিকেই একটা ফায়ারপ্লেস। ফায়ারপ্লেসের উপরেই একটা তাক, আর সেই তাকের উপর তিনটে ফ্রেমে বাঁধান ছবি। ফেলুদা ছবিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথম ছবিটা দেখিয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'ইনি আমার স্ত্রী। বিয়ের চার বছর পরেই মারা গিয়েছিলেন।'

দ্বিতীয় ছবি, একজন আমার বয়সী ছেলের, গায়ে ভেলভেটের কোট।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'এটি কে?'

রাজেনবাবু হো হো করে হেসে বললেন! সময়ের প্রভাবে মানুষের চেহারার কী বিচিত্র পরিবর্তন ঘটতে পারে সেইটে বোঝানোর জন্য এই ছবি। উনি হচ্ছেন আমারই বাল্য সংস্করণ। বাঁকুড়া মিশনরি স্কুলে পড়তাম তখন। আমার বাবা ছিলেন বাঁকুড়ায় ম্যাজিস্ট্রেট।'

সত্যি, ভারী ফুটফুটে চেহারা ছিল রাজেনবাবুর ছেলে বয়সে।

'অবিশ্যি, ছবি দেখে ভুলো না দুরন্ত বলে ভারী বদনাম ছিল আমার। শুধু যে মাস্টারদের জ্বালিয়েছি তা নয়, ছাত্রদেরও। একবার স্পোর্টসের দিন হাণ্ড্রেড ইয়ার্ডস্-এ আমাদের বেস্ট্ রানারকে কাত করে দিয়েছিলাম ল্যাং মেরে।'

তৃতীয় ছবিটা একজন ফেলুদার বয়সী ছেলের। রাজেনবাবু বললেন সেটা তাঁর একমাত্র ছেলে প্রবীরের।

'উনি এখন কোথায়?'

রাজেনবাবু গলা খাঁক্‌রিয়ে বললেন, 'জানিনা ঠিক। বহুকাল দেশ ছাড়া। প্রায় সিক্সটীন ইয়ার্স্।'

'আপনার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি নেই?'

'নাঃ।'

ফেলুদা দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'ভারি ইণ্টারেস্টিং কেস।'

আমি মনে মনে বললাম, ফেলুদা একেবারে বই-এর ডিটেকটিভের মত কথা বলছে।

বাইরেটা ছম্‌ছমে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জলাপাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলোতে বাতি জ্বলে উঠেছে। পাহাড়ের নিচের দিকে দেখে মনে হল রংগীত উপত্যকা থেকে কুয়াশা ওপর দিকে উঠছে।

রাজেনবাবু আর তিনকড়িবাবু আমাদের সঙ্গে গেট অবধি এলেন। রাজেনবাবু গলা নামিয়ে ফেলুদাকে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তাও তোমাকে বলছি—একটু যে নারভাস বোধ করছি না তা নয়। এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ-চিঠি যেন বিনামেঘে বজ্রপাত।'

ফেলুদা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না। আমি এর সমাধান করবই। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

রাজেনবাবু 'গুডনাইট অ্যাণ্ড থ্যাঙ্ক ইউ' বলে চলে গেলেন।

এবার তিনকড়িবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'তোমার—তোমাকে তুমি বলেই বলছি—তোমার অবজার ভেসনের ক্ষমতা দেখে আমি সত্যিই ইম্‌প্রেসড হইচি। ডিটেক্‌টিভ গল্প আমিও অনেক পড়িচি। এই

চিঠিটার ব্যাপারে আমি হয়ত তোমাকে কিছুটা সাহায্যও করতে পারি।'

'তাই নাকি?'

'এই যে টুক্‌রো টুক্‌রো ছাপা কথা কেটে চিঠিটা লেখা হয়েছে। এর থেকে কী বুঝলে বলত?'

ফেলুদা কয়েক সেকেণ্ড ভেবে বলল 'এক নম্বর—কথাগুলো কাটা হয়েচে খুব সম্ভব ব্লেড দিয়ে—কাঁচি দিয়ে নয়।'

'ভেরি গুড।'

'দুই নম্বর—কথাগুলো নানারকম বই থেকে নেওয়া হয়েছে—কারণ হরফ ও কাগজে তফাৎ রয়েছে।'

'ভেরি গুড। সেই সব বই সম্বন্ধে কোন আইডিয়া করেচ?'

'চিঠির দুটো শব্দ 'শাস্তি' আর 'প্রস্তুত'—মনে হচ্ছে খবরের কাগজ থেকে কাটা।'

'আনন্দ বাজার।'

'তাই বুঝি!'

'ইয়েস। ওই টাইপটা আনন্দ বাজারেই ব্যবহার হয়—অন্য বাংলা কাগজে নয়। আর অন্য কথাগুলোও কোনটাই পুরোন বই থেকে নেওয়া হয়নি, কারণ যে হরফে ওগুলো ছাপা, সেটা হয়েছে মাত্র পনর বিশ বছর হল।...আর যে আঠা দিয়ে আঁটকানো হয়েছে সেটা সম্বন্ধে কোন ধারণা করেছ?'

'গন্ধটা গ্রিপেক্স আঠার মত।'

'চমৎকার ধরেছ।'

'কিন্তু আপনিও ত ধরার ব্যাপারে কম যান না দেখছি।'

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, 'কিন্তু তোমার বয়সে আমি ডিটেক্‌টিভ কথাটার মানে জানতুম কিনা সন্দেহ!'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদা বলল, 'রাজেনবাবুর মিস্ট্রি সল্‌ভ করতে পারব কিনা জানি না—কিন্তু এই সূত্রে তিনকড়িবাবুর সঙ্গে আলাপটা বেশ ফাউ পাওয়া গেলো।'

আমি বললাম, 'তাহলে উনিই ব্যাপারটা তদন্ত করুন না। তুমি আর মিথ্যে মাথা ঘামাচ্ছে কেন?'

'আচ্ছা—বাংলা হরফের ব্যাপারটা জানা আছে বলে কি সবই জানবেন নাকি?'

ফেলুদার কথাটা শুনে ভালোই লাগল। ফেলুদার মত বুদ্ধি আশা করি তিনকড়িবাবুর নেই। মাঝে মাঝে ফোড়ন দিলে আপত্তি নেই, কিন্তু আসল কাজটা যেন ফেলুদাই করে।

'কাকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে ফেলুদা?'

'অপরা—'

কথাটার মাঝখানেই ফেলুদা থেমে গেল। তার দৃষ্টি দেখলাম একজন লোককে ফলো করে পিছন দিকে ঘুরছে।

'লোকটাকে দেখলি?'

'কই, না ত। মুখ দেখিনি ত।'

'ল্যাম্পের আলোটা পড়ল, আর ঠিক মনে হল—'ফেলুদা আবার থেমে গেল। 'কি মনে হল ফেলুদা ?'

'নাঃ বোধহয় চোখের ভুল। চ—পা চালিয়ে চ—ক্ষিদে পেয়েছে।'

ক্রমশঃ

বাঘের রাগ

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাটির ঘোড়ার চারটে ঠ্যাং
ঠ্যাংয়ের মধ্যে কোলা ব্যাং—
ব্যাংয়ের চোখে হীরে চুণি
লুকিয়ে বেড়ায় আসল খুনী ;
খুন করেছে কাকে
বনবিবির মাকে—
মায়ের চ্যালা কেঁদো বাঘ
তা'র কিনা আজ হচ্ছে রাগ,
হঠাৎ বলে 'হুম্ হুম্'
পেটের মধ্যে খুনী গুম !

চুম্বক

কম্বল নিরুদ্দেশ হয়েছে—লিখে রেখে গেছে : চাঁদা চাঁদনি চক্রধর চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর, নিরাকার মোষের দল, ছলছল খালের জল। ত্রিভুবন থরথর—চাঁদে চড়—চাঁদে চড়!

চাঁদনির বাজারের চক্রধর সামন্তের দোকান ঘুরে টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল ও প্যালারাম তার খোঁজে তেরো নম্বর শেয়ালপুকুর রোডে এসেছে।

চাঁদনির বাজারে দেখা সেই তালঢ্যাঙা লোকটা মাছি মার্কা গোঁফের নিচে মুচকে হেসে এসে বলল—আগে চলুন মা নেংটীশ্বরীর মন্দিরে, জয় মা নেংটীশ্বরী!

ছয়

আমরা যেই বলেছি, 'জয় মা নেংটীশ্বরীর জয়', সঙ্গে সঙ্গেই যেন চিচিংচন্দ্র ফাঁক হয়ে গেলেন। মানে, তক্ষুণি সেই সরু গুঁফো তালঢ্যাঙা চেহারার রোগা লোকটা হুড়মুড় করে একটা নকসা কাটা কালো দরজা টেনে খুলে ফেললে। আর সেই দরজা দিয়ে তাকিয়েই আমরা চারজনে একেবারে থ।

মা কালী, মা দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-সরস্বতী-বিশ্বকর্মা-শীতলা-শিব, মায় ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুর পর্যন্ত অনেক দেবতাই তো আমরা দেখেছি—মানে দেবতা আর কী করে দেখব, তাঁদের মূর্তিটুর্তি তো সব সময়েই দেখে

থাকি। পাটনার সেই কংগ্রেস ময়দানে দেখেছি, বাঁশ, কাগজ আর সেই সঙ্গে আরো কিসব দিয়ে তৈরি রাবণ-কুম্ভকর্ণ-ইন্দ্রজিতের আকাশ ছোঁয়া মূর্তি—দশহরার দিন যাদের আগুনের তীর মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দরজা খুলতে আজ যা দেখতে পেলুম—এমন ঠাকুর এর আগে কোথাও কেউ দেখেছে বলে মনে হলনা।

টেনিদা বিড় বিড় করে বললে, ডি লা গ্র্যাণ্ডি!

আমি বললুম, মেফিস্টোফিলিস!

হাবুল যেন বললে, খাইছে!

আর ক্যাবলা কিছুই বললে না, হাঁ করে চেয়ে রইল কেবল। তার চশমাটা নাকের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়ল নিচের দিকে।

কী দেখলুম, সে আর কী বলব তোমাদের। ছোট্ট ঘরটা এই দিনে-দুপুরেই অন্ধকার, তার ভেতরে মালার মতো করে লাল নীল অনেকগুলো ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌ব ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্‌বগুলো মিটমিটে হলেও অনেক ক'টা এক সঙ্গে জ্বলছে বলে একটা অদ্ভুত রঙিন আলো থমথম করছে ঘরময়। সেই আলোয় চিকচিক করছে মস্ত একটা সিংহাসন—রুপো-টুপো তাতে লাগানো আছে বোধ হয়। সিংহাসনের মাথায় একটা সাদা ছাতা, আর সেই ছাতার তলায় ভেলভেটের গদীতে বসে—

স্বয়ং মা নেংটীশ্বরী। অর্থাৎ কিনা—ইয়া জাঁদরেল একটা নেংটি ইঁদুর।

নেংটী ইঁদুরটার মূর্তি একটা ধুম্‌শো হুলো বেড়ালের চাইতেও তিনগুণ বড়ো। সামনের পা দুটো জড়ো করে, কান খাড়া করে, ল্যাজটাকে পিঠের ওপর দিয়ে বাঁকিয়ে এমন কায়দায় বসে আছে যে আচমকা দেখলে জ্যান্তো বলে মনে হয়। চোখ দুটো বোধ করি কালো কাচ কিংবা পুঁতি দিয়ে তৈরি—লাল-নীল আলোতে সে দুটো যেন শয়তানীতে চিকচিক করছে। তার সামনে একটা মস্ত বারকোষে ছোলা-কলা-বাতাসা-চাল-ডাল এই সব সাজানো রয়েছে, দেবী নেংটীশ্বরীর ভোগ নিশ্চয়।

তাকিয়ে তাকিয়ে প্রাণ চমকে উঠল। রাত-বিরেতে ও-রকম একখানা পেল্লায় ইঁদুর যদি কারুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, তা হলে আর দেখতে হবে না। কামড়ে-ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে একেবারে।

লোকটা ধমক দিয়ে বললে, কিহে—হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছ যে বড়ো? বোম্বাচাক লেগে গেল নাকি তোমাদের? মা-কে পেন্নাম করলে না?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা চারজনে একেবারে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লুম।

লোকটা বলে চলল, হেঁ—হেঁ, ভারী দুর্লভ মূর্তি! দুনিয়ার কোথাও দেখতে পাবে না। এঁর প্রিতিষ্ঠে করেছেন কে জানো? বাবা বিট্‌কেলানন্দ। তাঁর নাম শুনেছ তো?

আমরা এ ওর মুখের দিকে চাইলুম। বিট্‌কেলানন্দ! স্বামী ঘুট্‌ঘুটানন্দের সঙ্গে একবার রায়গড়ের জঙ্গলে আমাদের দারুণ রকমের একটা মোলাকাৎ হয়েছিল—তাকে মুলো কাৎ-ও বলা যায়, কারণ তিনি আমাদের চার জনকে প্রায় কাৎ করে ফেলেছিলেন। বিট্‌কেলানন্দ তাঁরই মাসতুতো ভাই কি না, কে জানে!

ক্যাবলা ঘাড়-টাড় চুলকে বললে, আজ্ঞে, তা—তা শুনেছি বইকি। বাবা বিট্‌কেলানন্দের নাম কেই বা না জানে!

লোকটা ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল: সে কথা আর বোলো না। তোমরা বুদ্ধিমান বোলে তাঁর খবর রাখো, তাই চাঁদনিতে গিয়ে খালের জলের কবিতা আউড়ে এখানে আসতে পেরেছ। কিন্তু অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে ছাখো, ঠোঁট উলটে অম্‌নি বলে বসবে—'অ্যাঁ, বিট্‌কেলানন্দ! সে আবার কে!'—লোকটার মুখ মনের দুঃখে যেন লম্বা হয়ে গেল: ছ্যাঃ, এইজন্যেই দেশটার কিছু হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে টেনিদাও কেমন বাজখাঁই গলায় বলে বসল, আজ্ঞে যা বলেছেন—এই জন্যেই দেশের কিছু হয় না। কি রকম বাঘাটে গলায় টেনিদা বলে ফেলল কথাটা, ঘর গম্‌গম করে উঠল, লোকটাও যেন চমকে গেল। তারপর বললে, অথচ ছাখো—বাবা বিট্‌কেলানন্দ স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। চালাকি নয়!

—খাইছে!—হাবুল আর থাকতে পারল না।

—খাইছে?—লোকটা আবার চম্‌কে গেল: তার মানে? কী খেয়েছে? কোথায় খেয়েছে? কেনই বা খেলো? ক্যাবলা বললে, যেতে দিন—যেতে দিন, ও মধ্যে মধ্যে ওই রকম বলে। কেউ কিচ্ছু খায়নি। এখন আপনি যা বলছিলেন বলুন।

—আমি বলছিলুম, স্বপ্নাদেশ।—লোকটা একবার গলা-খাঁকারি দিলে: বাবা বিট্‌কেলানন্দ ছেলেবেলা থেকেই ভাবুক। ইস্কুলে মাস্টার পড়া জিজ্ঞেস করলে মৌনী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন—পাষণ্ড মাস্টারগুলো ভাবত—বাবার মাথায় কিছু নেই, তাই তাঁকে গোরুর মতো ঠ্যাঙাতো। তারা তো জানত না—বাবা তখন ধ্যান করছেন। কিছু না বুঝেই মহাপাপী মাষ্টারেরা পিটিয়ে তাঁর ধুদ্ধুড়ি উড়িয়ে দিত—ক্লাসে প্রোমোশন দিত না!

আমি বললুম, আহা!

কাবলা বললে, আহা-হা!

হাবুলও যেন কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ঘাড়ে একটা থাবড়া বসিয়ে টেনিদা তাকে থামিয়ে দিলে। লোকটার গলার স্বর ভাবে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল, সে বললে, অহো-হো! যাক, তারপরে শোনো। ঠ্যাঙানি খেতে খেতে বাবা বিট্‌কেলানন্দের মতো মহাপুরুষেরও ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি ভেবে দেখলেন, মাষ্টারের গাঁট্টাতেই যদি তাঁকে মহাপ্রস্থানে যেতে হয়, তা হলে তিনি ধ্যান-জপ করবেন কী করে—আবার জীবেরই বা গতি হবে কী! তারপর একদিন তিনি বাড়ী ছেড়ে সটকালেন।

ক্যাবলা বললে, বুদ্ধের গৃহত্যাগ আর কি।

লোকটা মাথা নাড়ল: যা বলেছ, ব্যাপার প্রায় সেই রকম। কিন্তু কী জানো, বুদ্ধের কাল তো এটা না, মহাপুরুষকে এখন আর চেনে কে! তাই বাবা আর বোধিবৃক্ষের তলায় বসলেন না, তার বদলে গিয়ে চাকরী নিলেন বড়োবাজারের পেটমোটা এক শেঠজীর গদীতে। সেখানে অনেক দেখলেন, অনেক শিখলেন, চালে কাঁকর মেশানো, আটায় ভুষি মেশানো, ওষুধে ভেজাল দেওয়া—সব জানলেন। জেনে শুনে বাবার মগজ সাফ হয়ে গেল—তখন তিনি স্বপ্ন দেখলেন।

—কী স্বপ্ন ?—টেনিদা জিজ্ঞেস করলেন।

—দেখলেন, স্বর্গে পালে পালে নেংটি ইঁদুর হানা দিয়েছে—সেখানকার চাল-ডাল-মধু-সুজী-ফল-পাকড় সব খেয়ে ফেলেছে, দেবতাদের ঝাঁকে ঝাঁকে তাড়া করেছে, ইন্দ্র-চন্দ্র-কার্তিক-টার্তিক সবাই 'বাপরে মা-রে' বলে ছুটে পালাচ্ছে। আর ইন্দ্রের ফাঁকা-সিংহাসনে বসে গোঁফ ফুলিয়ে দেবী নেংটীশ্বরী বলছেন—'দেখছিস কি, এখন থেকে স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে আমারই রাজত্ব শুরু হল। আমার হুকুমমতোই সব চলবে। আজ থেকে তোদের কাজ হল নেংটি ইঁদুরের মতো চুরি করা—গর্ত কেটে, যেখানে যা পাওয়া যায়—সব লোপাট করা। বাঁচতে হলে এখন থেকে এই রাস্তাই তোদের ধরতে হবে।' দেবী এই পর্যন্ত বলতে বলতেই দুটো হুলো বেড়ালের ঝগড়ার আওয়াজে বাবা বিট্‌কেলানন্দের ঘুম ভেঙে গেল, হুলোর ভয়েই দেবী উধাও হলেন কিনা কে জানে! আর বাবা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, পেয়েছি—পেয়েছি।' তারপরেই দেবী নেংটীশ্বরীর এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা।

ক্যাবলা বললে, উঃ, কী রোমাঞ্চকর!

টেনিদা ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ, পয়লা নম্বরের মেফিস্টোফিলিস।

—মেফিস্টোফিলিস ?—লোকটা চোখ পিট্‌পিট্ করে বললে, তার মানে ?

আমি বললাম তার মানে—ইয়াক ইয়াক !

—ইয়াক ইয়াক ? সে আবার কী ?—লোকটা খাবি খেলো : তোমরা কোন দেশের লোক হে ? তোমাদের যে ভাষাই বোঝা যায় না।

ক্যাবলা তাড়াতাড়ি বললে, ছেড়ে দিন, ওদের ছেলেমানুষি ছেড়ে দিন। মানে খুশি হলে ওরা অনেক সময় ও-সব বলে, ওগুলোর কোন মানে নেই। এখন আপনি যা বলছিলেন, বলুন।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বললে, বলতেই তো চাচ্ছি, কিন্তু তোমরা কিসব বিচ্ছিরি ভাষা আউড়ে সব গোলমাল ক'রে দিচ্ছ।

আমি বললুম, বাবা বিট্‌কেলানন্দ এখানে আছেন ?

লোকটা আরো ব্যাজার হল : থাকতেই তো চেয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাও ম্যাও।

—ম্যাও ম্যাও ?

—আবার কী ?—ওরা কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল, বলে কিনা, বাবা চোর, বাবা কালো-বাজারী! সইবে না—সইবে না!—ভীষণ চটে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল : বাবা যোগবলে জেলের গরাদে ভেঙে বেরিয়ে আসবেন। আর যে হাকিম তাঁকে জেলে দিয়েছে—

টেনিদা বললে, তাঁর কী হবে ?

—কী হবে ?—দাঁত কিড়মিড় করে লোকটা বলতে লাগল : রাত্তিরে যখন সে ঘুমুবে, তখন মা নেংটীশ্বরীর ইঁদুরেরা দল বেঁধে গিয়ে তার ভুঁড়ি ফুটো করে দেবে। নির্ঘাৎ দেখে নিয়ো।

বলতে বলতেই—

হঠাৎ কোত্থেকে বিকট গলায় যেন বিশটা হুলো বিড়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠল : ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও—

আর দারুণ চমকে উঠল লোকটা।

—লুকোও—লুকোও—লুকোও। বাঁচতে চাও তো এখুনি লুকোও। না হলে—

ক্রমশঃ

শব্দছকের ফলাফল

১ক	র	২তা	৩ল	■	৪স	৫ম	বে	৬দ	৭না
লে	■	৮জ	ব	৯র	দ	স্ত	■	১০র	গ
১১জ	১২খ	ম	■	১৩দ	র	■	১৪স	বা	র
■	১৫ব	হ	র	■	১৬দা	মো	দ	র	■
১৭স	র	ল	■	১৮শ	লা	■	ল	■	১৯কো
২০দা	দা	■	২১হি	■	২২ন	২৩বা	ব	২৪জা	দা
২৫গ	র	২৬হা	জি	২৭র	■	২৮ট	ল	ম	ল
র	■	২৯না	বি	ক	■	না	■	বা	■
■	■	৩০বা	জি	মা	৩১ত	■	৩২ব	টি	৩৩কা
৩৪পা	প	ড়ি	■	৩৫রি	হা	র্সে	ল	■	লা

ছয়টি গ্রাহক লটারিতে জিতেছে তাই এরা প্রত্যেকে পাঁচটাকা করে পুরস্কার পাবে। কিন্তু অনেক, অনে···ক গ্রাহক সঠিক উত্তর দিয়েছিল। তাদের নাম নিচে ছাপা হল। তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এছাড়াও অনেকে সঠিক উত্তর দিয়েছিল কিন্তু তবু তাদের নাম ছাপা গেল না, কারণ কেউ কেউ গ্রাহক নয়, আবার কেউ কেউ ঠিক সময়ে দ্বিতীয় ছয়মাসের চাঁদা পাঠায় নি। নতুন গ্রাহকদের গ্রাহক সংখ্যা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে লক্ষ্য করে দেখো।

পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রাহকদের নাম ঃ—

১। গ্রাঃ নং ৩৯৯—যশোধরা মিত্র, ২। গ্রাঃ নং ১৮২৬—শিবানী বসাক, ৩। গ্রাঃ নং ২৭১৬—মধুরা ভট্টাচার্য, ৪। গ্রাঃ নং ২৭৮৩—সুদক্ষিণা দত্ত, ৫। গ্রাঃ নং ২৮৫০—শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, ৬। গ্রাঃ নং ২৮৬৭—পূর্ণিমা ভট্টাচার্য।

সঠিক উত্তর দাতাদের নাম ঃ—

৭ সুচিত্রা ঘোষ, ১৫ বনশ্রী দাশ, ৩২ মধুছন্দা ফৌজদার, ৪১ দীপালি চক্রবর্তী, ৪৩ দীপঙ্কর বিশ্বাস, ৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ৬৩ অনিরুদ্ধ রক্ষিত, ১৩৬ শ্রীকুমার রক্ষিত, ১৩৭ মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, ১৪৫ রাকা ভট্টাচার্য, ১৪৯ কুনাল সেনগুপ্ত, ১৫৮ রীনা ও রীতা গুপ্ত, ১৭০ সোমনাথ ঘোষ, ১৭৫ শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ, ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১৮৭ সত্যব্রত দত্ত, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ১৯৩ সত্যজিৎ নিয়োগী, ১৯৮ সুপ্রিয় কুমার রায়, ২০০ পাপিয়া চক্রবর্তী, ২০৭ রঞ্জন কর, ২১০ অঞ্জন কুমার মজুমদার, ২১২ মধুশ্রী চৌধুরী, ২১৪ সুমনা সরকার, ২২৮ মলয়শ্রী রায়, ২৩১ অতীশ কুমার রায়, ২৩৫ সুপ্রতীক বসু, ২৪০ প্রবীর কুমার বিশ্বাস, ২৪৭ জ্যোৎস্নাময় রায়, ২৬৫ কুনাল নাগ, ২৮২ অর্চনা দত্ত, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ২৯৫ শম্পা দত্ত, ৩২১ কবিতা ঘোষ, ৩২৩ অমিতাভ সেন, ৩৩৮ স্বপ্নাশ্রী দাশ, ৩৪৮ সমীর কুমার ভট্টাচার্য, ৩৫০ নন্দিতা ঘোড়াই, ৩৫৪ নন্দিনী সেন, ৩৬৩ জ্যোতিরিন্দ্র মোহন রায়, ৩৭৫ প্রজ্ঞাপারমিতা বসু, ৩৭৭ অরুণ কুমার চক্রবর্তী, ৩৮৫ দেবকুমার মিত্র, ৩৮৭ কৃষ্ণা, স্বপন ও শেখর রায়, ৩৯০ কুমকুম চৌধুরী, ৩৯১ অমিতাভ ও কাজল নিয়োগী, ৩৯৩ নন্দিতা বরাট, ৪০২ সুপ্রিয়া বসু, ৪০৩ বুদ্ধদেব নিয়োগী, ৪২৩ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪২৭ শমিতা মুখোপাধ্যায়, ৪৪২ অশোক মোহন চট্টোপাধ্যায়, ৪৯১ অলকা চন্দ্র, ৫১১ প্রদীপ কুণ্ডু, ৫১৩ দেবজ্যোতি রায়চৌধুরী, ৫২৭ অভিজিৎ বিশ্বাস, ৫৪৪ মল্লিকা ও সুবীর চক্রবর্তী, ৭২৭ প্রবীর কুমার মিত্র, ৭৬৪ শান্তনু দে, ৭৯৩ সুগত রায়, ৭৯৮ উজ্জ্বল ও দুর্গা সিদ্ধান্ত, ৮০৯ অমিতাভ গোস্বামী, ৮৪৫ সংঘমিত্রা চৌধুরী, ৮৫৩ তপন কুমার দত্ত, ৮৫৭ সুদীপ্ত পাল, ৮৫৮ দেবকুমার লাহিড়ী, ৮৫৯ বল্লরী গুপ্ত, ৮৬৩ অরুন্ধতী ও অগ্নিমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ৮৬৯ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ৮৮৪ মঞ্জুশ্রী দাস, ৯০৭ সুস্মিতা রায়, ৯২২ বাণী ও বিপ্লব ভড়, ৯২৪ সুমিতা চট্টোপাধ্যায়, ৯৬১ অরুণাভ লাহিড়ী, ৯৭২ নীলাঞ্জনা মুখোপাধ্যায়, ৯৭৯ গায়ত্রী মিত্র, ৯৮৩ জ্যোতির্ময় মজুমদার, ১০২৪ সৌম্যজিৎ সিংহ, ১০৬৩ রণজিৎ ভট্টাচার্য, ১০৯৭ ঝুমকা সেন, ১১৪৩ অর্চনা রায়-চৌধুরী, ১১৬৮ মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী, ১২১৫ সুরঞ্জন সিংহ, ১২৩০ দেবাশীষ মিত্র, ১২৯২ সুজাতা ঘোষ, ১৩১৭ ভাস্কর মিত্র, ১৩২০ বিজলী ঘোষ, ১৩২১ কুমকুম ও অনিতা সেন, ১৩৩৬ স্বাগতা ও শ্রীলতা চৌধুরী, ১৩২৯ স্বপ্না সোম, ১৩৭৪ কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৭৬ জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, ১৩৯২ শঙ্কর গুপ্ত, ১৪৫৩ জগদীশ ভট্টাচার্য, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৪৭৯ কিশোর কুমার লাহিড়ী, ১৪৯৭ শুভ্রা কুণ্ডু, ১৫০৭ ব্রততী গুহ, ১৫১৭ কিশলয় নন্দী, ১৫২৮ শিবাজী রাহা, ১৫৫৮ ভবানী পাল, ১৫৭০ মন্দাক্রান্তা মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য, ১৫৭২ শঙ্খ রায় চৌধুরী, ১৬১৯ অভিজিৎ ও ভারতী দে, ১৬১৯ অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬৪৭ প্রসেনজিৎ বর্ধন, ১৬৫২ লিপিকা মজুমদার, ১৬৬৫ রত্নাবলী চক্রবর্তী, ১৬৮৮ স্বপ্না ও অলোক দে, ১৬৯৩ শ্যামলকুমার পাইন, ১৭০৫ কৃষ্ণকলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭০৬ বন্দন কুমার হালদার, ১৭১৫ দীপান্বিতা ভট্টাচার্য, ১৭১৮ অনুকণা পাল, ১৭২৪ অনির্বিৎ রক্ষিত, ১৭৩৪ তাপস মল্লিক, ১৭৪৮ অশোকা ভট্টাচার্য, ১৭৫৩ উদয়ন, মীনাক্ষী, শংকর ও অনিরুদ্ধ সেন, ১৭৫৯ শমীন্দ্র কৃষ্ণ দেব, ১৭৬০ সুখেন্দু কুমার বাউর, ১৬৮৫ ঋতু ভট্টাচার্য, ১৭৮৮ পলাশ বরণ পাল, ১৭৯২ মলয়া পাল, ১৮২১ জয়ন্তিকা সেন, ১৮২৭ অনুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৮৩৮ ভাস্কর গুপ্ত, ১৮৯২ দেবেশ ঘোষ, ১৯২৪ পূর্ণা মজুমদার, ১৯৩২ শান্তনু বসু, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২১০২ সায়ন চট্টোপাধ্যায়, ২১৬৮ বুলতান রায়, ২১৭১ সন্দীপকুমার ঘোষ, ২১৮৩ জয়ন্ত দাশগুপ্ত, ২১৯৫ মুকুর দাশগুপ্ত, ২২৩৫ পারমিতা সেন, ২২৬০ অদিতি ও অরুন্ধতী ভট্টাচার্য ২২৭১ ব্রততী দে, ২২৮৮ দেবপ্রসাদ গুপ্ত, ২৩০১ তপতী ভট্টাচার্য, ২৩১৩ দীপক সান্যাল, ২৩৩৫ গৌতম ঘোষ, ২৩৫৬ জয়তী ঘোষ, ২৩৫৮ সংযুক্তা ও অনিন্দ্যশেখর বসু, ২৩৭৭ সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪১০ ঋত্বিক সান্যাল;

২৪১৯ সমীর কুমার দে, ২৪২৭ ধ্রুবজ্যোতি দাশ, ২৪৫৬ কুণালকুমার রায়, ২৪৬৯ অভিজিৎ গুহ, ২৪৮১ রাজশ্রী দত্ত, ২৪৮২ তাপসকুমার সেন, ২৫০২ ভাস্কর মিত্র, ২৫১১ সাত্যকি রায়, ২৫১৯ জুলু সেন, ২৫৪২ তন্ময় সেনগুপ্ত, ২৫৪৪ ভারতী, মণিকা ও সান্ত্বনা রায়চৌধুরী, ২৫৪৭ মৈত্রেয়ী ও প্রসেনজিৎ বসু, ২৫৫৫ সুজাতা মুখোপাধ্যায়, ২৫৬০ কেতকী চৌধুরী, ২৫৭৪ অপরাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫৮৯ স্বাগতা নান, ২৬০০ মঞ্জু স্যান্যাল, ২৬০৫ পুতুল, ২৬১২ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, ২৬৪৩ তাপসকুমার বসু, ২৬৫৮ রুবী পাল, ২৬৭৬ শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, ২৬৮৩ অঞ্জন চৌধুরী, ২৬৮৯ উজ্জ্বলেন্দু গুপ্ত, ২৬৯০ জয়শ্রী সরকার, ২৬৯১ সুমিত্রা মুখার্জি, ২৭০৪ শুভাশিষ গোস্বামী, ২৭০৬ শুভঙ্কর ও বিশাখা ঘোষ, ২৭২৮ লেখনী ও তন্ত্রী মুখোপাধ্যায়, ২৭৪১ সোনালী করগুপ্ত, ২৭৬১ শ্বেতা, মিতা ও ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত, ২৭৬৩ ভাস্কর ও সব্যসাচী বসু, ২৭৬৫ সুমিত্র কুমার বিশ্বাস ২৭৭৩ মৌসুমী ও মৌটুসী সেন, ২৭৭৫ গোপা পাল, ২৭৭৬ অভিজিৎ সেনগুপ্ত, ২৭৯২ মায়া দাস, ২৭৯৬ শর্মিলা সেনগুপ্ত, ২৮০৯ আনন্দশঙ্কর গুপ্ত, ২৮৬৭ পূর্ণিমা ভট্টাচার্য, ২৮৬৮ সোহম্ দাশগুপ্ত।

নতুন ধাঁধা

(উত্তর পাঠাবার শেষ দিন **১৫ই ডিসেম্বর**)

(১)

আছে এক জানোয়ার,—চেহারার কি বাহার ! একটার ল্যাজ কেটে দেখি সে হয়েছে চার !

(২)

'বাঃ, কি সুন্দর লাল গোলাপ !' খুশি হয়ে বলল মিনু। দাদু তাকে একটা পাঁচটাকার নোট হাতে দিয়ে বললেন 'যাও, তোমার যত বয়স, ঠিক ততগুলি গোলাপ কিনে নিয়ে এসো।'

মিনু হাসতে হাসতে ফুল কিনে এনে দাদুকে ১'৩৯ ফেরত দিল।

বলতো—(ক) মিনুর বয়স কত ?

(খ) এক একটি গোলাপের দাম কত ?

(৩)

অজয়, বিজয়, সুজয়, দুর্জয়, রণজয় আর অভিজয় ছয়জনে ভাগ করে ২৪টা রসগোল্লা খেয়েছিল। কোনও দুইজন সমান সংখ্যায় খায়নি, আবার কেউই চারটে খায়নি। অজয় খেয়েছিল বিজয়ের দ্বিগুণ। সুজয় আর দুর্জয় দুইজনে য'টা খেয়েছিল, একাই রণজয় ততগুলো সাবাড় করেছিল। বল দেখি তারা কে কয়টা রসগোল্লা খেয়েছিল ?

(৪)

সত্যসহায় সেন গোয়েন্দাগিরিতে নাম কিনেছেন। বহু মক্কেল রোজ তাঁর কাছে আসে। কিন্তু কেউ যদি কোন মিথ্যা কথা বলে তাহলে সত্যবাবু সেই তদন্তের ভার নেন না। একদিন বিখ্যাত ব্যবসায়ী গুলবাজ সিং এসে নালিশ জানালেন যে পার্টনার মূলচাঁদ সিংএর মৃত্যুতে মিছিমিছি পুলিশ তাঁকে সন্দেহ করছে।

মুলচাঁদের হৃদযন্ত্র অবশ্য কিছু দুর্বল ছিল, ডাক্তার বলেছিলেন যে আচমকা ভয় বা উত্তেজনার কারণ ঘটলে বিপদ হতে পারে।

রাত্রে মুলচাঁদকে নেমন্তন্ন করেছিলেন গুলবাজ। খাবার পরে কারবারের বিষয়ে নতুন একটা পরিকল্পনার কথা আলোচনা করতে করতে একই ঘরে দুই পার্টনার শুয়েছিলেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, বাড়ির সেই দিকটায় আর কেউ ছিল না।

রাত্রে গুলবাজ স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁদের নতুন পরিকল্পনার ফলে ব্যবসার ভারি উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মুলচাঁদ স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁদের পরিকল্পনা বিফল হয়েছে। কোম্পানী ডুবে গেছে আর পার্টনারদের হাতে দড়ি পড়েছে। নিদারুণ আতঙ্কে ঘুমের ঘোরেই তিনি হার্টফেল করে মারা গেলেন। অথচ, স্বভাবের দিক থেকে সাধারণতঃ মুলচাঁদই আশাবাদী আর গুলবাজই সাবধানী !

এখন তোমরা বল দেখি—(ক) সত্যসহায় বাবু কি এই তদন্তের ভার নেবেন ? (খ) নিলে, কেন নেবেন আর না নিলেই বা নেবেন না কেন ?

ধাঁধার উত্তর

(১) বই (অথবা বৈ)

(৩) ঝুমকো, কদম, জবা, কামিনী, বেল, শতদল, রঙ্গন, করবী, টগর, অতসী, গন্ধরাজ, বকুল, গোলাপ, কেতকী।

(এত সহজ ধাঁধাটার তোমরা প্রায় কেউই নির্ভুল উত্তর দিতে পারনি কেন বল তো ?)

(৩) ভদ্রলোক ওঁর জমিটা এইভাবে চার ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। (কেউ কেউ অন্যভাবে ভাগ করেছ, কিন্তু, একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে তোমাদের ভাগগুলো আয়তনে এবং আকারে সম্পূর্ণ সমান হয় নি। একমাত্র ১৩৫০ কল্পনা পালের উত্তরটাকেও মোটামুটি ঠিক ধরা যেতে পারে। কিন্তু, এত সহজে যখন ভাগ করা যায়, তখন অত হাঙ্গামা করবে কেন বল তো কল্পনা ?)
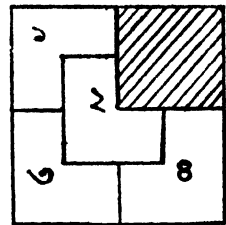
(৪) কমলিকা কুশারি——অধ্যক্ষ। খঞ্জনা খাসনবিশ——খাজাঞ্চি। গদাধর গোস্বামী——সহাধ্যক্ষ। ঘনশ্যাম ঘোষ——অধ্যাপক। চঞ্চল চ্যাটার্জি——কেরানী।

উত্তর দাতাদের নাম ঃ

সব কয়টি ঠিক—১২৬ ব্রততী মুখোপাধ্যায়, ৭৬৫ সুনন্দা বন্দোপাধ্যায়, ১৩০৬ শ্রীলতা চৌধুরী, ১৫৬৮ কৌশিক চৌধুরী, ১৮৩৮ ভাস্কর গুপ্ত, ২৪১০ ঋত্বিক সান্যাল, ২৬০৩ রাধারাণী বরারি, ২৬২১ শুভা বিশ্বাস, ২৬৯৭ প্রতাপ চক্রবর্তী, ২৮৫০ শ্যামলী চক্রবর্তী।

তিনটি উত্তর ঠিক—১৯৩ সত্যজিৎ নিয়োগী, ১৯৫ নিমাই, খুকু ও টাটা, ২২৮ মলয়শ্রী রায়, ২৩৫ সুপ্রতীক বসু,৩২০ অমিত ও হারক দাশগুপ্ত, ৩৪৮ সমীর কুমার ভট্টাচার্য, ৬৮৩ চৈতালী সেন, ৮০৯ অমিতাভ, শম্পা, স্বাতী ও সোমা গোস্বামী, ৮৫৩ তপন দত্ত, ৮৬৯ উদয়ন মুখার্জি, ৯৬১ অরুণাভ লাহিড়ী, ১০১২ সুস্মিতা, নির্মাল্য ও জয়মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫০ কল্পনা পাল, ১৪৩৮ শীলা রায়, ১৪০৯ পাপড়ি চৌধুরী, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৫১৭ কিশলয় নন্দী, ১৫৭০ মন্দাক্রান্তা মৈত্রেয়ী, ১৭০৫ কৃষ্ণকলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮২১ জয়ন্তিকা সেন, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২৩০৫ অরূপ দত্ত, ২৪১৯ সমীর কুমার দে, ২৪৫৬ কুণাল কুমার রায়, ২৪৯৩ নচিকেতা, অনিরুদ্ধ ও বাণী সাধু, ২৫০৭ দেবব্রত মণ্ডল, ২৫৪২ তন্ময় সেনগুপ্ত, ২৬০০ মঞ্জু সান্যাল, ২৭৭৩ মৌসুমী ও মৌটুসী সেন, ২৭৭৬ অভিজিৎ সেনগুপ্ত।

দুটো উত্তর ঠিক—১৭৫ অর্চনা ঘোষ, ২০০ পাপিয়া চক্রবর্তী, ২৪০ প্রবীর বিশ্বাস, ৩২১ কবিতা ও অজন্তা ঘোষ, ৩৪০ পূরবী চক্রবর্তী, ৯৩১ কৃষ্ণা রায়, ৯৮৪ প্রবীরকুমার চক্রবর্তী, ১৩১৭ ভাস্কর মিত্র, ১৩২০ বিজলী ঘোষ, ১৭২৪ অনির্বিৎ রক্ষিত, ২২৩৬ শ্যামলেন্দু তরফদার, ১৩৫২ উর্মিলা দাশগুপ্ত, ২৩৫৮ সংযুক্তা ও অনিন্দ্য বসু, ২৩৮৭ নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য, ২৫৪৪ ভারতী, মণিকা ও সান্ত্বনা রায়চৌধুরী, ২৫৫০ কেতকী চৌধুরী, ২৬১৬ অপর্ণা মল্লিক, ২৬৩৮ সৌমিত্র ভট্টাচার্য, ২৭০৯ শঙ্কর ঘোষ, ২৭৫৩ কেয়া দাশগুপ্ত, ২৮৬৮ সোহম্ দাশগুপ্ত।

মজার খেলা

নলিনী দাশ

কানু, ভানু, চিনু, মিনু, অনু, মনু—ঝগড়াঝাঁটি লাগিয়েছে কেন? কিছু করবার নেই? এসো তোমাদের একটা নতুন খেলা শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের কাছে নতুন হলেও আসলে এটা একটা খুব পুরোন খেলা, ইংরাজিতে বলে Categories, আমরা ছোটবেলায় বলতাম 'ফল-ফুল' খেলা।

তোমাদের প্রত্যেকের এক টুকরো কাগজ আর একটা করে পেনসিল দরকার হবে। এনেছ তো সব? এবার কতগুলি বিভিন্ন ধরণের জিনিসের নামের তালিকা কর—যেমন ফুল, ফল, নদী, শহর ইত্যাদি। প্রত্যেকে নিজের কাগজে নামগুলি লেখ আর তলায় একটা করে খোপ কাট।

ফল	ফুল	খাবার	নদী	শহর	পাখি

বুঝেছ তো? যতগুলি জিনিসের নাম ঠিক করা হয়েছে, প্রত্যেক দানে তত মিনিট সময় পাবে, আর যতজন খেলোয়াড় আছে, প্রত্যেক বিষয়ে তার চেয়ে এক নম্বর কম থাকবে। তার মানে তোমরা প্রত্যেকদানে ছয় মিনিট করে সময় পাবে, আর নম্বর থাকবে ফলে ৫, ফুলে ৫, এইভাবে মোট ৩০। এবারে একটা অক্ষর ঠিক করতে হবে। ফস করে একটা বই খুলে, না দেখে যে অক্ষরটির উপর হাত দেবে, সেই অক্ষরটা নেবে। অবশ্য সেটা যদি যুক্ত অক্ষর হয়, কিম্বা ণ, ঞ, ং জাতীয় কিছু হয়, তাহলে আবার চেষ্টা করতে হবে। সবাই প্রস্তুত? আচ্ছা—এবার খেলা শুরু করা যাক। কি অক্ষর বেরুল? 'ম'? বেশ, বেশ! এবারে প্রত্যেকে ছয় মিনিটের মধ্যে তোমাদের তালিকার প্রত্যেক জিনিসের একটা 'ম' দিয়ে উদাহরণ লিখে ফেল দেখি। মনে রেখো, যে যত নতুন ধরণের নাম লিখতে পারবে, সে তত বেশি নম্বর পাবে।

লিখে ফেল—লিখে ফেল—আমি ঘড়ি দেখছি। ছয় মিনিট হয়ে গেছে—বাস্—এইবার লেখা কাগজগুলি সামনে রাখ আর কে কি লিখেছ একে একে পড়। তারপর নম্বর দেওয়া হবে।

নম্বর দেবার নিয়মটাও বেশ মজার। কোনও নাম যদি সকলেই লেখ, তাহলে ০ পাবে।

যে নাম পাঁচজন লিখবে তাতে প্রত্যেকে পাবে ১, চারজন লিখলে ২, তিনজনে ৩, তুইজনে ৪ আর কেউ একলা একটা নাম লিখলে পুরো নম্বর পাবে—তার মানে ৫।

দেখি তো কে কি লিখেছ।

ফল—কানু লিখেছ মৌসাম্বি, বেশ। ভানু—ম্যাঙ্গো? সাধারণ ফুলফলের ইংরাজি নাম লিখলে

নম্বর দেবে কি ? দেবে ? আচ্ছা বেশ। মিনু—মোচা ? নাঃ এটা চলবে না, মোচা তো আর ফল নয়, বরঞ্চ ফুলের কাছাকাছি। চিনু আবার মৌসাম্বি। অনু কিছু লেখনি কেন ? মনু আবার ম্যাঙ্গো ? তাহলে ফলের ঘরে কানু, ভানু, চিনু, মনু সবাই ৪ পাবে, কিন্তু মিনু আর অনু কিছুই পাবে না।

অন্যান্য ঘরে কে কি লিখেছ দেখি ?

	ফল	ফুল	খাবার	নদী	শহর	পাখি	মোট নম্বর
কানু	মৌসাম্বি ৪	মালতী ৩	মিহিদানা ২	মেঘনা ৪	মালদহ ৪	ময়না ০	১৭
ভানু	ম্যাঙ্গো ৪	মল্লিকা ৫	মিহিদানা ২	মহানন্দা ৪	ম্যাড্রিড ৫	ময়না ০	২০
মিনু	মোচা ×	মাধবী ৪	মোহনভোগ ৫	মহানন্দা ৪	মেদিনীপুর ৫	ময়না ০	১৮
চিনু	মৌসাম্বি ৪	মালতী ৩	মনোহরা ৫	মহানদী ৪	মধুপুর ৫	ময়না ০	২১
অনু	×	মাধবী ৪	মিহিদানা ২	মেঘনা ৪	মাদ্রাজ ৫	ময়না ০	১৫
মনু	ম্যাঙ্গো ৪	মালতী ৩	মিহিদানা ২	মহানদী ৪	মালদহ ৪	ময়না ০	১৭

তাহলে প্রথম দানে মোট নম্বর হল কানু ১৭, ভানু ২০, মিনু ১৮, চিনু ২১, অনু ১৫ আর মনু ১৭।

এবার আর একটা অক্ষর নিয়ে শুরু কর দ্বিতীয় দান। এই ভাবে যতক্ষণ ভাল লাগে খেলে যাও, খেলা শেষ হলে মোট নম্বর যেমন হবে সেই হিসাবে হারজিত ঠিক করা হবে।

ইচ্ছা করলে অন্য জিনিসের ন'ম দিয়েও এই খেলা খেলতে পার, যথা মাছ, জন্তু, ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম, খেলোয়াড়ের নাম, লেখকের নাম, বইএর নাম ইত্যাদি। আবার কে কত নতুন নাম লিখতে পার সেই চেষ্টা না করে কে কটা নাম ঐ সময়ের মধ্যে লিখতে পার তার প্রতিযোগিতা করে দেখা যায়।

বাবুশ্‌কার গল্প

(সোভিয়েট রাশিয়ার রূপকথা)

রুচিরা রায়

উনিশ শ' বছরেরও বেশি হবে রাশিয়ার এক ছোট্ট গ্রামে বাবুশ্‌কা বলে একটি মেয়ে বাস করত। সারা গাঁয়ে সে ছিল সবার সেরা ঘরন্তী। তার ছোট্ট কুঁড়েটি সর্বদা ঝক্ ঝক্ তকতক করত। ঘরের মেঝেটা ছিল নতুন টাকার মতন পালিশ করা। ঘরের আসবাবপত্র আয়নার মতন চক্‌চকে, দেওয়ালে সুন্দর রং। শীতের সময়ে সকলের বাগান যখন বরফ দিয়ে ঢাকা, বাবুশ্‌কার বাগানে তখনও সুন্দর ফুল ফুটে থাকত। ভোর থেকে শুরু করে গভীর নিশুতি রাত পর্যন্ত বাবুশকা তার বাড়ি ঝাড়পোঁছ করত।

সেদিনও বাবুশ্‌কা তার ঘরদোর যথারীতি শেষবার ঝাঁট দিয়ে তার ছোট্ট বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। বাইরে রূপোলী বরফ জমে আছে সারা বাগানে তার উপর চাঁদের আলো পড়ে ঝল্‌মল্ করছে চারদিক। উত্তুরে হাওয়া ছুটে চলেছে শন্ শন্ করে। ছুরির মতো গায়ে বেঁধে এতো ঠাণ্ডা।

হঠাৎ বাতাসে খুব সুন্দর গন্ধ ভেসে এল কোথা থেকে। 'এতো রাত্তিরে কোথা থেকে এমন সুন্দর গন্ধ এল ?' ভাবতে লাগল বাবুশকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে। তারপর দেখে কি রাস্তা ধরে কারা যেন সব আসছে। সকলের সামনে মস্ত লম্বা উটের পিঠে, খোলা তলোয়ার হাতে এক প্রহরী, পরণে তার লাল পোশাক। তার পিছনে সারি বাঁধা ঘোড়-সওয়ারের দল, ঝলমলে সুন্দর তাদের সাজ। তাদের পিছনে গাড়ি ভর্তি কতো দেশের কতো রকমের লোক, কতো তাদের সাজের বাহার, রূপের জৌলুষ আর ধনৈশ্বর্যের চমক।

সবার শেষে বাবুশকা দেখে চলেছেন তিনটি লোক। প্রথম লোকটি ছোটখাট, তাঁর সাদা দাড়ি, সাদা চুল, উজ্জ্বল সরল চোখের দৃষ্টি ; সকালবেলার সোনার রোদ্দুরের মতন সোনালী তাঁর পোশাক। দ্বিতীয় জন মাঝবয়সী, তাঁর সাজ বেগনী রঙের, সকলের শেষে দীর্ঘদেহ ঋজু সুন্দর চেহারার এক যুবক ; দুপুরবেলার সূর্যের রঙের মত তার পোশাক হলুদ আর কমলা। প্রথম লোকটির হাতে সুন্দর পাত্রে রাখা সোনা, অন্যদের হাতে পাত্রে ধূপ, ধুনো সুগন্ধি। সমস্ত রাতের আকাশ সেই গন্ধে আমোদিত, স্নিগ্ধ হয়ে আছে।

তাঁদের সোনার মুকুটে চাঁদের আলো পড়েছে, আকাশের কোণে প্রকাণ্ড শুভ্র তারাটির দিকে অচঞ্চল দৃষ্টি রেখে তাঁরা হেঁটে চলেছেন। প্রথম রাজা বাবুশকাকে দেখে সকলকে দাঁড়াতে বল্লেন। দ্বিতীয় রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিও কি আমাদের মতন নতুন তারাটিকে দেখতে পেয়েছ।

প্রথম জন বল্লেন, ওই তারার আলোর পথ অনুসরণ করে আমরা সব চলেছি রাজার যিনি রাজা তাঁকে দর্শন করতে।

তৃতীয় রাজা বল্লেন, 'চল তুমি আমাদের সঙ্গে।'

বাবুশকার চোখে পড়ল সিঁড়ির ধারে পড়ে থাকা তাঁর ঝাঁটার উপর। না আমি তো বাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না, রাজা। এই বাড়ি পরিস্কার রাখতে সারাদিন চলে যায় আমার।
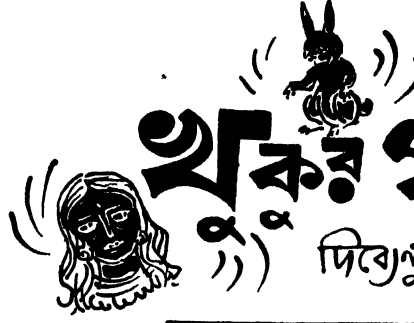
তারপর বরফে সাদা রাস্তা ধরে চলে গেল সকলে।

সকালে ঘুম ভেঙে বাবুশকার মনে হল সবই স্বপ্ন। কিন্তু উঠোনে তাঁর ঝাঁটাখানা পড়ে থাকতে দেখে সব কথা তার মনে পড়ে গেল। অনুশোচনায় ভরে গেল তার মন। তার পোশাকে তখনও রাত্রের সেই সুগন্ধ লেগে আছে। তার কোটের হাতায় তৃতীয় রাজাটি সুগন্ধি আতরের কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিয়েছিলেন।

বাবুশকা তার ঝাঁটা দূর করে ছুঁড়ে ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। তার ইচ্ছে এগিয়ে গিয়ে সেই দলের সঙ্গ নেবে আর সেও দর্শন করতে যাবে সবার যিনি রাজা তাঁর সঙ্গে।

খুঁজতে খুঁজতে বহু বছর কেটে গেল, তার কালো চুলে পাক ধরল, তবু সে দেখা পেল না। একদিন তার সঙ্গে দেখা হল এক বুড়োর। সে খবর দিলে যে সেই তিন রাজা তাদের রাজার কাছে শেষ অবধি পৌঁছেছিলেন। সেই রাজেশ্বর জন্মেছিলেন মায়ের কোলে ছোট্ট শিশু হয়ে, গরুঘোড়ার আস্তাবলে জাবনা রাখার সামান্য পাত্রে। বাবুশকা চলেছে তো চলেছে। তার সেই চলা, সেই খোঁজা আজও শেষ হয়নি। ছোট ছেলে দেখতে পেলে তাকে নিরীখ করে দেখে, সেই কি তবে সেই রাজেশ্বর। ছেলে ভোলানোর জন্য তার যা কিছু পুঁজি সে খেলনা আর মিষ্টি কিনে খরচ করে। ঘরেদোরে, রাস্তার ঘাটে-মাঠে ক্ষেত খামারে সরাইখানায়, আস্তাবলে গোয়ালে কি ধনীর প্রাসাদে কি গরিবের ঘরে সর্বত্র এই বুড়ীর আনাগোনা। যেসব শিশুদের সঙ্গে তার দেখা হয়, তারা অবাক হয় বাবুশকার গায়ের সুগন্ধে। তার হাত থেকে পাওয়া খেলনা তাদের খুব আদরের জিনিস। দিনের পর দিন বাবুশকার এই খোঁজার পালা চলেছে। তার শেষ এখনও হয়নি। সমস্ত রুশদেশে বড়োদিনের সময়ে ঘরে ঘরে ছোট ছেলেমেয়েরা যে খেলনা পায় তারা ভাবে সে সমস্তই বাবুশকার কাছ থেকে পাওয়া। তাদের হাতে সুন্দর খেলনা তুলে দিয়ে বাবুশকা খুঁজে দেখে এই কি তার সেই কোনও দিন দেখা না পাওয়া খৃষ্ট-শিশু ?
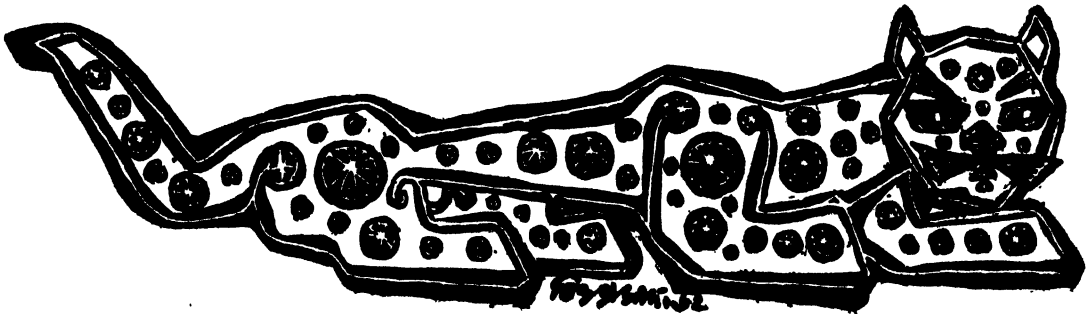
কিছুতেই আজ ঘুম আসেনা খুকুর।

সারাটা দুপুর ওই কুলগাছটাকে ছেড়ে, নান্তু, বুড়ী, সন্তু, অনুকে ছেড়ে রোজ রোজ শুধু ঘুম আর ঘুম। মা'র যে কি জেদ যতক্ষণ খুকু না ঘুমুবে, ততক্ষণ আর বকাঝকার শেষ নেই!

খুকু জানে ঘুমিয়ে পড়লেই দুপুরটা হঠাৎ গড়িয়ে কোথায় চলে যায়! তারপর চোখ খুললেই দেখে আকাশটা কালো হয়ে গেছে! তখন আর কুলগাছটার কাছে যাওয়া হয় না; নান্তু, বুড়ীরাও যার যার বাড়ি চলে যায়! তাই খুকুরও আজ রোখ চেপেছে, সে কিছুতেই ঘুমুবে না। কিছুতেই না।

কত ক'রে মা বোঝাচ্ছেন, 'লক্ষ্মী সোনা, যাদু আমার, মাণিক আমার। ঘুমোও, খুকু খুব ভাল মেয়ে! আয় ঘুম আয়, খুকুর চোখে আয়। আয় ঘুম আয়……'

মায়ের গলার এই সুরটুকু খুকুর বড় ভাল লাগে! বড় ভাল লাগে, বড় মিষ্টি লাগে তখন মাকে। গলাটা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে! কিন্তু না, হঠাৎ খুকুর মনে পড়ে মায়ের এই গান শুনতে শুনতেই কাল সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই কাল আর কুলগাছের কাছে যাওয়া হয়নি। নান্তু বুড়ী সন্তু ওরা গাছের সব কুল পেড়ে নিয়েছে! খুকু সকালবেলাই জোগাড় করেছে একটা লাঠি! লাঠিটা সে রান্নাঘরের পাশেই রেখে দিয়েছে। শুধু হাতে করে নিয়ে গিয়ে কুলগাছটার গায়ে বসিয়ে দিলেই হবে! টপ টপ ক'রে কত্ত কুল পড়বে মাটিতে!

'না, না, না—আমি গান শুনব না।' খুকু জেদ ধরে।

'খুকু, ভয়ঙ্কর মার খাবে কিন্তু! শিগগির ঘুমোও বলছি!' মাও কড়া সুরেই এবার ধমক দিয়ে ওঠেন।

খুকুর ঠোঁট ফোলে, চোখটাও ছলছলিয়ে ওঠে! কি যে মা-টা কিছুতেই বুঝবে না! কিছুতেই যেতে দেবে না! ওদিকে নান্তু তারা বোধ হয় সব কুল নিয়েই গেল! খুকু আর পারে না। গলা দিয়ে শব্দ ওঠে—ভ্যাঁ-ভ্যাঁ-ভ্যাঁ!

'আচ্ছা থাক, ঘুমুতে হবে না! গল্প শোন!' মা গল্পের কথা তোলেন।

'গল্প ? না না গল্প নয় !'

'খুব ভাল গল্প ! ভীষণ মজার ! খরগোশের গল্প !'

'খর-গো-শ ?' খুকু এবার বড় বড় চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকায়।

'হাঁ, একটা ছোট্ট খরগোশের গল্প !

'ছোট্ট তো ?'

'হাঁ, ছোট্ট গল্প !'

'আচ্ছা বল !' খুকুর সুরে আনন্দের রেশ পাওয়া যায় এবার। খরগোশ সে দেখেছে চিড়িয়াখানায়। বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন সেবারে। বেশ সুন্দর দেখতে ! ছোট ছোট সাদা সাদা ! চোখ পিট পিট করে ! খুকুতো প্রথমটায় বেড়ালই ভেবেছিল ! সেই খরগোশ ?

'বল, খরগোশের গল্প কিন্তু !'

মা গল্প শুরু করেন।

'অনেকদিন আগে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ছোট্ট এক ঘন জঙ্গল, সেই জঙ্গলে থাকত একটা খরগোশ আর তার এক ছোট্ট মেয়ে, মানে তোমার মত একটা বাচ্চা খরগোশ !'

'আমার মত ?' খুকু জিজ্ঞেস করে।

মা বলেন,—হাঁ, ঠিক তোমার মত ! খুব দুষ্টু, আর ভীষণ চঞ্চল, মায়ের কথা শোনে না, দুপুরে ঘুমোয় না ! কেবল রোদে রোদে ঘুরে বেড়ায় ! এখন, রোদে ঘুরলে, দুপুরে না ঘুমুলে যে শরীর খারাপ করবে, জ্বর হবে এতো আর বাচ্চা খরগোশটা বুঝতে পারত না, তাই রোজ রোজ দুপুরে সেও ঠিক তোমার মত ঘুমুতো না, শুধু ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদত !

'তাই বুঝি ? তারপর ?'

মা বলেন, 'আগে তুমি চোখ বোজ। চোখ বুজে শোন তাহলে গল্প বলব।'

গল্পের লোভে খুকু চোখ বোজে ! বলে—'বল তারপর কি হোল ?'

'তারপর একদিন, সেদিন বাচ্চা খরগোশটার শরীরটাও তেমন ভাল নয়, মা তাকে তাই কত করে বোঝাচ্ছে—'বাচ্চা তুমি ঘুমোও, ঘুমোও।' কিন্তু খুকু খরগোশটা কিছুতেই মা'র কথা শোনে না ! কিছুতেই ঘুমোয় না ! ঠিক তোমার মত ! তখন মা-খরগোশটা ভীষণ রেগে গেল। চিৎকার করে বলল—'তবে রে দুষ্টু মেয়ে তুমি ঘুমুবে না, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা ! আজ তোমাকে ঠিক বাঘের কাছে পাঠিয়ে দেব ! বাঘ তোমাকে খেয়ে ফেলুক তখন মজা বুঝবে !'

খুকুর চোখ বড় বড় হোল, বলল, 'তারপর ?'

'তারপর মা-খরগোশটা ডাকল, 'ঘোড়া ! ওরে পক্ষীরাজ ঘোড়া, আয়তোরে ! খুকুকে নিয়ে যা, শিগ্‌গির আয় !'

'ঘোড়া এল ?' খুকুর প্রশ্ন।

মা বললেন, 'আসবে না ? সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া এসে হাজির। পক্ষীরাজ ঘোড়া ! বললে, মাসিমা

আমায় ডেকেছেন?'

খুকু অবাক চোখে জিজ্ঞেস করে 'ঘোড়ার বুঝি মাসিমা হয় খরগোশের মা?'

'হাঁ, ঘোড়ার মাসিমা হচ্ছে খরগোশের মা। তারপর কি হোল শোন। চোখ বোজ, চোখ বুজে শোন।'

খুকু আবার চোখ বুজে গল্প শোনে।

মা বলেন 'ঘোড়া আসতেই খরগোশের মা বলল, ঘোড়া-বাবা আমি আর খুকুটাকে নিয়ে পারি না, তুমি এক্ষুণি তোমার পিঠে তুলে নিয়ে ওকে বাঘের কাছে দিয়ে এসো তো।'

মা-খরগোশটা ও-কথা বলল? খুকুর অবাক প্রশ্ন।

মা বলেন, হাঁ বলল। না বলেই বা কি করবে, বাচ্চা খরগোশটা ঘুমোয় না কেন?

তারপর!

তারপর একলাফে এগিয়ে এসে পক্ষীরাজ ঘোড়া বাচ্চা-খরগোশকে পিঠে তুলে নিয়েই উধাও!

খুকু জিজ্ঞেস করে, খরগোশের মা কাঁদল না?

মা বললেন, মোটেই না! কাঁদবে কেন? খরগোশ ঘুমোয় না তো মা কি করবে?

তারপর?

তারপর ঘোড়া ছুটছে ছুটছে সমানে ছুটছে। ওদিকে বাচ্চা খরগোশটা ভয়ে একেবারে জড়সড়ো! ঘোড়ার পিঠে মাথা ঠুকছে আর বলছে,—না আমি যাব না! কিছুতেই যাব না! ও ঘোড়াদা আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চল! আমি যাব না! কিছুতেই যাব না!

'যাবে না?' ঘোড়া জিজ্ঞেস করে।

'না না না'।

'তবে ঘুমুবে তো?'

'হাঁ ঘুমুবো ঠিক ঘুমুবো।'

'হাঁ, ঠিক ঠিক ঠিক!'

'বেশ তবে চল! তোমাকে মায়ের কাছেই রেখে আসি।'

একথা বলেই পক্ষীরাজ ঘোড়া আবার খরগোশ-খুকুকে নিয়ে বাসায় ফিরে এল।

খরগোশের মা বললে—'কি হোল ফিরে এলে যে?'

ঘোড়া বললে—'খুকু বলছে ঘুমুবে!'

খরগোশের মা এবার খুশি হল। বললে—

'আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে দাও নামিয়ে। ফের যদি না ঘুমোয় তোমাকে ডাকব! তুমি তৈরি থেকো কিন্তু!'

হঠাৎ খুকু গল্প শুনতে শুনতে বলে—

'খরগোশের মা'টা মোটেই ভাল না, তাই না মা মণি ?'

মা বলেন—'মোটেই না ! খুব ভাল !'

খুকু বলে—'তাহলে বাচ্চা-খরগোশকে বাঘের কাছে পাঠাল কেন ?'

মা বলেন—'দুষ্টু খরগোশটা ঘুমোয় না কেন ? তুমিও খুব দুষ্টু ! চোখ বোজ বলছি !'

খুকু চোখ বোজে। বলে-'বল, তারপর কি হোল, খুকু-খরগোশ ঘুমোল ?'

মা-দেখছেন খুকুর চোখে তখনও ঘুমের কোন ছায়াই নেই !

'ও ঘোড়া দা—আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চল—'

তাই তাঁর গল্পও বেড়েই চলে। বললেন—

'না, বাচ্চা-খরগোশটা কি রকম দুষ্টু ! কিছুতেই সে ঘুমুবে না। কি-ছু-তেই না ! মা-খরগোশ কত ক'রে বোঝালেন 'খুকু ঘুমোও, খুকু ঘুমোও। কিন্তু কে কার কথা শোনে ! খুকু-খরগোশটার চোখের সামনে তখন খালি তোমার মত এক কুল গাছ !'

'কুল গাছ? খরগোশ কুল খায় বুঝি?' খুকু জিজ্ঞেস করে।

মা বলেন—'কুল অবশ্য খরগোশের বাচ্চা খায় না! তবে কুলগাছের নিচেই যে সবুজ ঘাসটুকু আছে—ওটার দিকেই খুকু-খরগোশটার ভীষণ লোভ!'

'তা, ওর মা ওকে যেতে দিচ্ছে না কেন?' হঠাৎ খুকুর সরাসরি প্রশ্ন!

'ওরে দুষ্টু মেয়ে যেতে দিচ্ছেনা কেন! যেতে দিলে, দুপুরে রোদে ঘুরলে যে বাচ্চা-খরগোশের অসুখ করবে? তখন কি হবে?'

'বেশ! তারপর কি হোল বল। তারপর?'

মা বললেন—'তারপর আর কি? খুকু খরগোশটা যখন কিছুতেই ঘুমোয় না, কিছুতেই না, তখন খরগোশের মা ভীষণ রেগে গেল! ঘোড়াকে আবার ডাকল। 'পক্ষীরাজ ঘোড়া আয়তোরে'?

'তারপর?'

মা এবার ধমক দিয়ে উঠলেন।

'তারপর আর নেই! তুমি ঘুমোও!

খুকু বলে—'না না, তুমি বল না, তারপর কি হোল? ঘোড়া এল?'

মা বললেন—'হাঁ, পক্ষীরাজ ঘোড়া দুলাফে এগিয়ে এল! মা-খরগোশ বলল—'না খুকু ঘুমোল না, তুমি এবার সত্যি সত্যি ওকে বাঘের কাছে নিয়ে যাও। জানতো বাঘ কোথায় থাকে? সেই যে সোঁদর বন, সেখানে! যাও, ওকে নিয়েই যাও!'

'তারপর নিয়ে গেল?'

হাঁ, নিয়ে গেল। পক্ষীরাজ ঘোড়া জোর করে খুকু-খরগোশকে পিঠে তুলে নিল! তারপর এক লাফে মাটিতে নেমেই ছুটে চলল সোঁদরবনের দিকে!

খুকু জিজ্ঞেস করে—'বাচ্চা-খরগোশটা কাঁদল না?'

'হাঁ কাঁদুক! তখন কাঁদলে কি হবে!'

খুকুর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে! বললে—'ওর মা কাঁদল না?'

'একটুও না!' জবাব দিতে গিয়ে মা'র চোখও ছলছলিয়ে ওঠে! বলেন—'খুকু না ঘুমোলে তার মা কি করবে! তুমিওতো ঘুমুচ্ছোনা! তোমাকেও যদি বাঘে নিয়ে যেত—'

'না না মা মণি তুমি তো ভাল, খরগোশের মা-টা খারাপ কিনা তাই!' খুকু মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। বলে, 'বলনা তারপর? কি হোল? তারপর?'

মা বলেন—'তারপর আর কি হবে? ঘোড়া খরগোশের বাচ্চাকে পিঠে নিয়ে-যেতে যেতে যেতে—শেষ পর্যন্ত এসে সোঁদর বনে পৌঁছোল,—যেখানে থাকে সেই ডোরা-কাটা বাঘটা! ঘোড়া খরগোশের-বাচ্চাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করলে—'কি ঘুমুবে? এখনও বল!'

খুকু-খরগোশটা কেঁদে ফেলল বললে-'না'!

ঘোড়া অবাক হয়ে বলে—'না? তোমার তো সাহস কম নয়?'

খুকু খরগোশ কেঁদে বলে—'হাঁ, সাহসইতো, চলনা নিয়ে! বাঘ আমায় খেয়ে ফেলবে? ফেলুক। মা যখন কাঁদবে, তখনই মজা বুঝবে!'

অবাক হয়ে খুকু জিজ্ঞেস করে—'খুকু খরগোশটা ও-কথা বললে?'

'হাঁ, বললে।'

'তারপর কি হোল? বল শিগ্‌গির বল না!'

মা বললেন—'তখন ঘোড়া বললে—'বেশ তাই হবে! চল তাহলে বাঘের কাছেই চল!' বলেই টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটল। ঘোড়া ছুটল লতা মাড়িয়ে, গাছ-জঙ্গল পার হয়ে। ঘোড়া ছুটল বাঘের বাসায়। তারপর খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে—

হঠাৎ গল্প শুনতে শুনতে মায়ের মুখটা চেপে ধরল খুকু! বললে—'বলনা গো মামণি ঘোড়া অনেক অনেক খুঁজল, কিন্তু বাঘের বাসা আর কিছুতেই খুঁজে পেল না!!'

খুকুর চোখে চুমু খেয়ে আদর করে মা বললেন—'হাঁরে ঠিক তাই হয়েছিল! ঘোড়া সেদিন অনেক-অনেক-অনেক খুঁজেছিল কিন্তু বাঘের বাসা আর খুঁজে পায় নি!'

আনন্দে খুকু মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। সেদিনের মত তার আর ঘুম হোল না। মায়ের গল্প বলাও শেষ হোল।

সকলে মিলিয়া মিল তৈরির কাজে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন—

আশ্চর্য দ্বীপ

পঞ্চম বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা

চৈত্র ১৩৭২—এপ্রিল—১৯৬৬

বর্ষশেষ

শোন রে আজব কথা, শোন বলি ভাই রে—
বছরের আয়ু দেখ আর বেশি নাইরে !
ফেলে দিয়ে পুরাতন জীর্ণ এ খোলসে
নূতন বরষ আসে কোথা হতে বল সে !
কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে !
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস ঋতু—এ কেমন কারবার ।
কোথা আসে কোথা যায় নাহি কোন উদ্দেশ,
হেসে খেলে ভেসে যায় কত দূর দূর দেশ ।
রবি যায়, শশী যায়, গ্রহতারা সব যায়,
বিনা কাঁটা কম্পাসে বিনা কল-কব্জায় ।
ঘুরপাকে ঘুরে চলে, চলে কত ছন্দে
তালে তালে হেলে দুলে চলেরে আনন্দে ।

চুম্বক

'চাঁদ-চাঁদনি চক্রধর, চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর ইত্যাদি ছড়া লিখে রেখে কম্বল নিরুদ্দেশ হয়েছে। তারই সন্ধানে চাঁদনির বাজারের চক্রধরের দোকান ঘুরে টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল ও প্যালারাম শেয়াল-পুকুর রোডে এসে বিটকেলানন্দের কাহিনী শুনেছে। পাটকেলানন্দ ওরফে চক্রধর সামন্তের সঙ্গে কথা বলে তারা সেই তালঢ্যাঙা বিন্দেবনের সঙ্গে রবিবার ভোরবেলা মহিষাদল যাবার ব্যবস্থা করেছে। কি ব্যাপার অবশ্য তারা বুঝে উঠতে পারেনি কিন্তু ক্যাবলা চোখ টিপে দেওয়াতে তারা রাজি হয়ে গিয়েছে।

॥ নয় ।

সে তো হল। রবিবার না হয় মহিষাদলেই আমরা গেলুম। কিন্তু তারপর ?

সবটাই কি রকম গোলমেলে ঠেকছে। হতচ্ছাড়া কম্বলের আগাগোড়াই বিটকেল ব্যাপার। যখন নিরুদ্দেশ হয়নি, তখন পাড়াশুদ্ধ লোকের হাড় ভাজা-ভাজা করে ফেলছিল; যখন উধাও হল, তখনও মাথার ভেতরে বনবনিয়ে কুমোরের চাক ঘুরিয়ে দিলে।

আচ্ছা—তোমরাই বলো, লোকে কি আর নিরুদ্দেশ হয় না? পরীক্ষায় ফেল-টেল করে ঠ্যাঙানি খাওয়ার ভয়ে কিংবা হয়তো ঠাকুর্দার কাছ থেকে একটা গীটার আদায় করবার আশায়, কেউ হয়তো বন্ধুর বাড়ীতে চম্পট দেয়—আবার কেউ বা মাসি-পিসির বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। তারপর যেই বিজ্ঞাপন বেরুল: 'প্রিয় ট্যাপা, শীঘ্র ফিরিয়া আইস, মা মৃত্যুশয্যায়, তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না', কিংবা 'স্নেহের হ্যাদা, তোমার ঠিকানা দাও—সকলেই কাঁদিতেছে—' তখন গর্তের থেকে পিঁপড়ের মতো সব সুড়সুড় করে একে একে বেরিয়ে এল। তারপর বরাত বুঝে কারুর অদৃষ্টে চাঁটানি, কারুর বা হাওয়াইয়ান গীটার!

কিন্তু এই সব ভালো ছেলেদের মতো বুঝে-সুঝে 'নিরুদ্দেশ' হবে, কম্বলচন্দর কি সে জাতের নাকি? তার কাকা বলে বসল—সে চাঁদে গেছে, তার নাকি ছেলেবেলা থেকেই চাঁদে যাওয়ার 'ন্যাক' আছে একটা! এ-সব বাজে কথা কে কবে শুনেছে? তারপরে ল্যাঠার পর ল্যাঠা! কোত্থেকে কান ঘেঁসে এক আমের আঁঠি, একটা যাচ্ছেতাই ছড়া—চাঁদনির বাজার, শেয়ালপুকুর পাট্‌কেলানন্দ, মা নেংটীশ্বরী, ঝোল্লা-গোঁফ চক্রধর সামন্ত—বাদুড়ের নাম অবকাশরঞ্জিনী—ধুত্তোর, কোনো মানে হয় এ-সবের?

এতেও শেষ নয়। এখন আবার ঘাড়ে চড়াও হয়েছে এক তালঢ্যাঙা বিন্দেবন। আবার তার সঙ্গে রবিবারে মহিষাদলে যেতে হবে। মহিষাদল নামটাই যেন কি রকম—শুনলেই মনে হয় একদল বুনো মোষ শিং বাগিয়ে তাড়া করে আসছে। কপালে কী আছে, কে জানে! চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর আমাদের কোন্ চাঁদে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে—তাই বা কে বলতে পারে।

তারপর আবার কী সব রসিদ-ফসিদের কথাও বলছিল চক্রধর। তার মানে, অনেক গণ্ডগোল আছে ভেতরে। ক্যাবলা সমানে তো টিক্ টিক্ করছে, কিন্তু মহিষাদলের মোষদের পাল্লায় পড়ে—

আমি আর হাবুল সেন এসব নিয়ে অনেক গবেষণা করলুম।

হাবুল ভেবে-চিন্তে বললে, সত্য কইছিস্ প্যালা। আমরা ফ্যাচাঙে পড়ুম।

আমি বললুম, তা ছাড়া পেছনে আবার পুলিশ আছে ওদের। কী করছে লোকগুলো কে জানে। শেষকালে আমাদের শুদ্ধু ধরে নিয়ে যাবে।

হাবুল, তা লইয়া যাইবো। লইয়া গিয়া রাম-পিটানি দিবো।

আমি বললুম, আর বাড়িতে?

—কান ধইর‍্যা ছিঁড়্যা দিবো। পুলিশের পিটানির থিক্যাও সেটা খারাপ।

আমি বললুম, অনেক খারাপ। তোর হয়তো একটা কান ছিঁড়ে দেবে, কিন্তু মেজদার বরাবর নজর আমার কানের দিকেই। ওর ডাক্তারী কাঁচি দিয়ে কচাকচ করে কেটে নেবে।

হাবুল কিছুক্ষণ ভাবুকের মতো আমার কানের দিকে চেয়ে রইল। শেষে মাথা নেড়ে বললে, তা কাইট্যা নিলে তোরে নেহাৎ মন্দ দ্যাখাইবো না। তোর খাড়া খাড়া কান দুইখান—

আমি বললুম, শাট আপ! বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে হাব্‌লা!

হাবুল ফের বললে, আইচ্ছা, মনে যদি কষ্ট পাস, তা'হলে ওই সব কথা থাকুক। তোর আদরের কান দুইখ্যান লইয়া তুই ঘাস-ফাস চাবা। তা অখন কী করন যায়, তাই ক'।

আমার ইচ্ছে করছিল হাবলাকে একটা চড় বসিয়ে দিই, কিন্তু ভেবে দেখলুম এখন গৃহযুদ্ধের সময় নয়। এই সব ঝামেলা মিটে যাক, তারপর হাব্‌লার সঙ্গে একটা ফয়সালা করা যাবে।

রাগ-টাগ সামলে নিয়ে বললুম, তা হলে চল, ক্যাবলার কাছে যাই। তাকে গিয়ে বলি—যা হয়েছে বেশ হয়েছে। আর দরকার নেই, চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের চাঁদ বদন না দেখলেও আমাদের চলবে।

হাবুল বললে, হ। ছাখনের তো কত কী-ই আছে। ইচ্ছা হইলেই তো চিড়িয়াখানায় গিয়া আমরা জলহস্তীর বদনখান দেইখ্যা আসতে পারি। আর কম্বলরে দিয়াই বা আমাগো কী হইবো? পোলা তো না—য্যান্ একখান চামচিকা। চক্রধরের অবকাশরঞ্জিনীর থিক্যাও খারাপ।

আমি সায় দিয়ে বললুম, বিক্রমসিংহের চাইতেও খারাপ। সে তো শুধু ছারপোকা, ও একটা কাঁকড়াবিছে।

এই সব ভালো ভালো আলোচনা করে আমরা ক্যাবলার কাছে গেলুম। কিন্তু তাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। তার মা—মানে মাসিমা ছানার মুড়কি তৈরী করছিলেন, আমাদের বসিয়ে তাই খেতে দিলেন। আমরা ক্যাবলার ওপর রাগ করে এত বেশি খেয়ে নিলুম যে ক্যাবলার জন্যে কিছু রইল বলে মনে হল না।

পেট ঠাণ্ডা হলে মন খুশি হয়, আমরা দুজনে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাইতে গাইতে যেই টেনিদার বাড়ির কাছে পৌঁছেছি, অমনি কোত্থেকে হাঁ-হাঁ করে বেরিয়ে এল টেনিদা।

—বেলা দশটার সময় অমন গাঁক-গাঁক করে চ্যাঁচাচ্ছিস যে দুজনে? ব্যাপার কী?

হাবুল বললে, আমরা সঙ্গীত-চর্চা করতে আছিলাম।

—সঙ্গীত-চর্চা? ওকে চচ্চড়ি বলে। তোদের গানের চোটে পাড়ায় আর কুকুর থাকবে না মনে হচ্ছে। তা এত আনন্দ কেন? কী হয়েছে?

—আমরা ক্যাবলার বাড়িতে গিয়ে ছানার মুড়কি খেয়ে এসেছি।—আমি জানালুম।

—অ, তাই এত ফুর্তি হয়েছে। তা আমাকে ডেকে দিলি না কেন? ক্যাবলাও এমন বিশ্বাস-ঘাতক?

—ক্যাবলাকে বাড়িতে পাই নি। আর তোমার কথা আমাদের মনে ছিল না।

—মনে ছিল না?—টেনিদা চটে গেল। মুখটাকে বেগুন ভাজার মত করে বললে, ভালো কাজের সময় মনে থাকবে কেন?—যা বেরো এখান থেকে, গেট আউট।

আমি বললুম, আউট আবার কোথায় হবো? বেরুবার আর জায়গা কোথায়? আমরা তো কর্পোরেশনের রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছি।

টেনিদার মুখটা এবারে ধোকার ডালনার মতো হয়ে গেল। আরো ব্যাজার হয়ে বললে, ইচ্ছে

করছে তুই চড়ে তোদের দাঁতগুলোকে দাঁতনে পাঠিয়ে দিই। তা হলে মর্‌গে যা—রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে কুকুর তাড়া গে।

হাবুল বললে, না, কুকুর তাড়ামু না। তোমার কাছে আসছি।

—আমাকে তাড়াতে চাস?

—বালাই, ষাইট্‌, তোমারে তাড়াইবো কেডা? তুমি হইলা আমাগো লীডার—যারে কয় ছত্রপতি। তোমার কাছে এ্যাক্‌টা নিবেদন আছিলো।

—ইস্‌—ছানার মুড়কি খেয়ে খুব যে ভালো ভালো কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে! টেনিদা একটা ভেংচি কাটল: তা নিবেদন কী?

—আমরা মহিষাদলে যামু না। মইষে গুঁতাইয়া মারবো।

—যাসনে।—বাঘাটে গলায় টেনিদা বললে, লোকের বাড়ি বাড়ি চেয়ে-চিন্তে খেয়ে বেড়া। কাপুরুষ কোথাকার। কাওয়ার্ডস্‌ মেনি ডেথ্‌ ডাইজ—ইয়ে—টাইম—মানে বিফোর—

আমি বললুম, উঁহু, ভুল হল। কাওয়ার্ডস্‌ ডাই মেনি ডেথ্‌স্‌—

ছানার মুড়কির রাগ টেনিদা ভুলতে পারছিল না, চিৎকার করে বললে, শাটাপ্‌! তোকে আর আমার ইংরিজি শুদ্ধ্‌ করতে হবে না—নিজে তো একত্রিশের ওপরে নম্বর পাস্‌ না! মরুক্‌ গে, কোথাও যেতে হবে না তোদের। আমি আর ক্যাব্‌লা যাব, একটা দারুণ চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করব কম্বলকে, বীরচক্র পুরস্কার পাব আর তোরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবি। কম্বলের কাকা যখন খ্যাঁট দেবে, তখন পোলাওয়ের গন্ধে দরজায় তোরা ঘুর-ঘুর করবি, ঢুকতে দেবে না, পিটিয়ে তাড়িয়ে দেবে।

এই বলে টেনিদা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল, তারপর ধড়াস করে বন্ধ করে দিল দোরটা।

তখন আমি আর হাবুল সেন এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। আমি বললুম, বুঝলি হাবুল, ব্যাপারটা রীতিমতো সঙ্গীন।

হাবুল বললে, হ। টেনিদা যারে পুঁদিচ্চেরি কয়, তাই। কি রকম য্যান্‌ মেফিস্টোফিলিস-মেফিস্টোফিলিস মনে হইত্যাছে।

আমি বললুম, তা হলে তো ওদের সঙ্গে যেতেই হয়, কী বলিস?

হইবোই তো। বীরচক্র আমরাই বা পামু না ক্যান্‌? আর কম্বলের কাকার যখন অরগো মাংস-পোলাউ খাওয়াইবো—

আ।ম ওকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, আর বলিস্‌ নি, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দেখিস, আমরাও খাব, নিশ্চয় খাব।

যা থাকে কপালে—পটলডাঙা জিন্দাবাদ! আমরা চারজন—সেই কথা মতো—চক্রধরের দোকানের সামনে থেকে—বিল্বেবনের সঙ্গে মহিষাদলে বেরিয়ে পড়েছি। বাড়িতে বলে এসেছি, রবিবারে এক বন্ধুর ওখানে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি, সন্ধ্যেবেলায় ফিরে আসব।

আসবার আগে মেজদা বলে দিয়েছে, পরের বাড়িতে গিয়ে মওকা পেয়ে যা-তা খাসনে। ওই

তোর পিলে-পটকা শরীর, শেষকালে একটা কেলেঙ্কারী বাধাবি।

কী খাওয়া যে কপালে আছে—সে শুধু আমিই বুঝতে পারছি। কিন্তু বেঁচে থাকতে কাওয়ার্ড হওয়া যায় না—না হয় মোষের গুঁতোতেই প্রাণ দেব। আমি কেবল বললুম, আচ্ছা—আচ্ছা।

—আচ্ছা-আচ্ছা কী? যদি পেটের গোলমাল হয়, তা হলে তোকে ধরে আটটা ইন্‌জেক্‌শন দেব—সে-কথা খেয়াল থাকে যেন।

বাড়ির ছোট ছেলে হওয়ার সব চাইতে অসুবিধে এই, যে কোথাও কোনো সিম্‌প্যাথি পাওয়া যায় না। এমনি ভালোমানুষ ছোট্‌দি পর্যন্ত খ্যা-খ্যা করে হাসছিল। আমি চটে-মটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। এই সব অপমান সহ্য করার চাইতে মৃত্যুও ভালো।

পাঁশকুড়া লোক্যালে চেপে আমরা রওনা হয়েছি হাওড়া থেকে। বিন্দেবন বললে, আমাদের নামতে হবে মেচেদায়, সেখান থেকে বাসে করে তমলুক হয়ে মহিষাদল। শুনে যত দূর মনে হচ্ছে তা নয়—যেতে বেশি সময় লাগবে না।

কিন্তু মেচেদা নাম শুনেই আমার কী একটা ভীষণভাবে মনে পড়েছিল। একবার মামার সঙ্গে মেদিনীপুরে যাওয়ার সময়—এই মেচেদাতে—ঠিক ঠিক!

আমি বলে ফেললুম, মেচেদায় খুব ভালো সিঙ্গাড়া পাওয়া যায় কিন্তু।

টেনিদার চোখ চকচক করে উঠল। কিন্তু বিন্দেবনের সামনে প্রেস্টিজ্‌ রাখবার জন্যেই বোধ হয়, দাঁত খিঁচিয়ে আমাকে ধমক দিলে একটা: এটা একটা রাক্ষস। রাতদিন কেবল খাই-খাই।

বিন্দেবনকে যতটা খারাপ লোক ভেবেছিলুম, দেখলুম সে তা নয়। মিটমিট করে হেসে বললে, তা ছেলেমানুষ, খিদে তো পেতেই পারে। খাওয়াব—খাওয়াব খোকাবাবু—মেচেদার সিঙ্গাড়া খাওয়াব, কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। তারপর কলেজের ছেলে হয়েও তোমরা যখন আমাদের দলে এয়েচ, তখন তো মাথার মণি করে রাখব তোমাদের।

'দলে এয়েচ!' এই কথাটাই আমার কেমন ভালো লাগল না। মনে পড়ল মা নেংটীশ্বরীর সেই মূর্তি—যেন দাঁত বের করে কামড়াতে আসছে। মনে পড়ল, হঠাৎ সেই 'ম্যাও-ম্যাও' এসে হাজির—চারদিকে কি রকম সামাল্ সামাল্ রব। এদের পাল্লায় পড়ে কোথায় চলেছি আমরা? কী আছে আমাদের কপালে?

টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম। হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে রয়েছে। বীরচক্র পাবার জন্যে তখন খুব লাফালাফি করেছিল বটে, কিন্তু এখন যেন কেমন ভেবড়ে গেছে বলে মনে হল। হাবুলকে বোধ হয় গাড়ীর বেঞ্চিতে ছারপোকায় কামড়াচ্ছিল—সেই বিক্রমসিংহই কিনা কে জানে—সে কিছুক্ষণ পা-টা চুলকে হঠাৎ বিচ্ছিরি গলায় গান ধরল:

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—

সকল দেশের রাণী'—ইয়ে—একবার খুব জোরে গা চুলকে প্রায় লাফিয়ে

: ইস্—কী কামড়াচ্ছে রে! 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি—'

তার গান আর গা চুলকোনোতে প্রায় ক্ষেপে গেল টেনিদা। চেঁচিয়ে বললে, জন্মভূমি না তোর মুণ্ডু! চুপ কর বলছি হাবুলা, নইলে জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেব তোকে।

বিন্দেবন বললে, আহা দাদাবাবু তো ভালোই গাইছেন! থামিয়ে দিচ্ছেন কেন?

তা হলে হাবুলের গানও কারুর ভালো লাগে! হাবুল এত আশ্চর্য হল যে গা চুলকোতে পর্যন্ত ভুলে গেল। ক্যাবলা একটা ওয়াইড ওয়ার্লড্ ম্যাগাজিন পড়ছিল, সেটা খসে পড়ল তার হাত থেকে। টেনিদা বললে, কী ভয়ানক!

বিন্দেবন জানলার বাহিরে মুখ বাড়িয়ে বললে, এই যে—কোলাঘাট এসে গিয়েচে। এর পরেই আমরা পৌঁছে যাব মেচেদায়। —ক্রমশঃ

পদ্মাবতীর চিন্তা

সুপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়

মনে করো কেউ যদি দুটো মই লাগিয়ে
আকাশের 'পরে উঠে দুই হাতে বাগিয়ে
চাঁদটাকে পকেটেতে ভরে নেয়!
—তাহলে?

অথবা কখনো যদি আকাশের উপরে
উঠে গিয়ে শীতকালে দুপুরে
সূর্যকে দেয় যদি জল ঢেলে নিবিয়ে!
—তাহলে?

চুম্বক

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় পাঁচটি অসম-সাহসী ব্যক্তি অবরুদ্ধ রিচমণ্ড্ শহর হইতে বেলুনে চড়িয়া পলায়ন করিতে গিয়া একবস্ত্রে ও রিক্তহস্তে এক নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হন। দারুণ পরিশ্রম করিয়া ও বুদ্ধি খাটাইয়া ইঁহারা তীরধনুক, বাসন ইঁট লোহা, স্টিল ইত্যাদি প্রস্তুত করিলেন।

একটি ভাসমান বোতলের মধ্যে তাঁহারা সন্ধান পাইলেন যে ১৫০ মাইল দূরে ট্যাবর দ্বীপে একটি 'হতভাগ্য পরিত্যক্ত ব্যক্তি' আছে। নৌকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা যখন তাহাকে আনিতে গেলেন তখন দেখা গেল যে সে একেবারে পশুর ন্যায় হিংস্র ও বন্য হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন বন্দী রাখিয়া, ক্রমে তাহার বন্যভাব কিছুটা কমিলে পর তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইল, সে পালাইতে গিয়াও পালাইল না, তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দ্বীপবাসিগণ ক্ষণকাল আগন্তুককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া দূরে সরিয়া গেলেন, কিন্তু তাহার পলায়নের ইচ্ছা দেখা গেল না। তখন সকলে গ্র্যানিট হাউসে ফিরিয়া আসিলেন।

মনে হইল যেন আগন্তুক দৈনিক কাজে যোগ দিতে চায়। সকলের কথা মন দিয়া শুনে, বুঝিতে পারে, কিন্তু নিজে কিছু বলে না। একদিন পেন্‌ক্রফ্‌ট্ শুনিতে পাইলেন যে সে নিজের মনে বলিতেছে—'না! এখানে—আমি! কখনই না!'

হার্ডিং বলিলেন—'লোকটির মনে কোনও দুঃখপূর্ণ রহস্য আছে।

ক্রমে আগন্তুক যন্ত্রপাতি লইয়া একা বাগানে কাজ করিতে শুরু করিল। কেহ তাহাকে বিরক্ত করিত না। তবে কি সে অতীতের কোন গুরুতর দুষ্কর্মের জন্য অনুতাপ করিতেছে? এরূপ অবস্থায় অপেক্ষা করিয়া থাকাই সকলে কর্তব্য বোধ করিলেন।

কয়েকদিন পরে—৩রা নভেম্বর—আগন্তুক কাজ করিতে করিতে কোদাল ফেলিয়া দাঁড়াইল। হার্ডিং দেখিলেন তাহার চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতেছে। তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল, তিনি নিকটে গিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন—'বন্ধু! আমার দিকে তাকাও!'

আগন্তুককে হার্ডিংএর দৃষ্টি যেন বশ করিয়া ফেলিল, পলায়নের ইচ্ছা দূর হইল, মুখে পরিবর্তন দেখা দিল। চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইল, ধীরে ভাঙ্গা গলায় সে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনারা কে?'

হার্ডিং আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন 'আমরা তোমার মত পরিত্যক্ত ব্যক্তি। তুমি ট্যাবর দ্বীপে একা ছিলে তাই তোমাকে সঙ্গী বন্ধুর মধ্যে আনা হয়েছে।'

'আমার সঙ্গী!! পৃথিবীতে আমার বন্ধু কেউ নাই! আপনি আমার কাছ থেকে চলে যান্!!'—এই বলিয়া সে প্লেটোর কিনারায় ছুটিয়া গিয়া একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শুনিয়া স্পিলেট বলিলেন—'এই ব্যক্তির জীবনে গূঢ় রহস্য আছে।'

হার্ডিং বলিলেন—'তা জানবার জন্য তাড়াহুড়ো করব না। যদি সে পাপও করে থাকে, তার জন্য যথেষ্ট সাজা হয়েছে, এখন সে নির্দোষ।'

প্রায় দুইঘণ্টা আগন্তুক গভীর চিন্তায় ডুবিয়া রহিল। ইহার পর কর্তব্য স্থির করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপাতে লাল। মাথা নিচু করিয়া সে হার্ডিংকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনারা কি ইংরেজ?'

হার্ডিং বলিলেন—'না আমরা আমেরিকাবাসী'—'যা হোক—তবু ভাল।'

হার্ডিং জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কোন জাতি?'

সে উত্তর দিল—'আমি ইংরেজ।'

আবার সে সমুদ্রতীরে চলিয়া গিয়া অস্থির হইয়া পায়চারি করিতে লাগিল।

একবার হারবার্টের নিকটে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—'এটা কোন মাস?'

হারবার্ট বলিল—'নভেম্বর মাস।'

'কোন সন?'—'১৮৬৬ সন।'

'বার বছর! বার বছর!' এইকথা বলিয়াই সে হঠাৎ হারবার্টের নিকট হইতে চলিয়া গেল।

শুনিয়া সকলে বুঝিলেন যে লোকটি বার-বছর যাবৎ ট্যাবর দ্বীপে রহিয়াছে। বার বছর নির্জনবাসে যে তাহার জ্ঞান লোপ পাইবে তা আর বিচিত্র কি?

পেন্‌ক্রফ্‌ট্ বলিল—'আমার মনে হচ্ছে যে কোন গুরুতর অপরাধের দরুণ ওকে ট্যাবর-দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল।'

স্পিলেট বলিলেন—'তাই মনে হয়। হয় ত যারা ওকে ফেলে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে আসতেও পারে।'

হার্ডিং বলিলেন—'ভাল করে না জানা পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনায় লাভ নেই। আমার বিশ্বাস বেচারি যথেষ্ট কষ্টভোগ করেছে, ইচ্ছা থাকলেও সে কাহিনী বলতে পারছে না। ক্রমে সে নিজেই বলবে, তখন কর্তব্য বিচার করা যাবে। কিন্তু ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ আছে।'

স্পিলেট বলিলেন—'সন্দেহ কেন করছ হার্ডিং ?'

'কারণ, নির্দিষ্ট দিনে উদ্ধার পাবার আশা যদি সে করত, তাহলে সেই দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা না করে বোতলে চিঠি ভরে সমুদ্রে ভাসাতে যাবে কেন ?'

স্পিলেট—'ওর এরকম বুনো অবস্থা নিশ্চয় বহুদিন হয়েছে—তাহলে চিঠি লিখে বোতলও ভাসিয়েছিল বহুপূর্বে।'

পেন্‌ক্রফ্‌ট্ বলিল—তাহলে 'বোতলের চিঠিটাও স্যাঁতসেঁতে, ভিজা হত। কিন্তু—সেটা ছিল শুকনো, খটখটে—না ক্যাপটেন ?'

হার্ডিং বেশ বুঝিতে পারিলেন যে এই ব্যাপারটিও আর একটা গুরুতর রহস্যপূর্ণ ঘটনা!

ইহার পর কিছুদিন আগন্তুক একটা কথাও বলিল না। প্লেটোতেই থাকে, নীরবে কাজকর্ম করে, শাক সবজি খায়, অনুরোধ করিলেও গ্র্যানিট হাউসে আসে না। সে যেন আবার ট্যাবর দ্বীপের বুনো জীবন যাপন করিতেছে। সকলে ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দশই নভেম্বর রাত্রি আটটার সময়ে সকলে বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ আগন্তুক সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার চক্ষু জ্বলিতেছে, চেহারা পূর্বের মতন ভীষণ!

অসংলগ্ন ভাবে সে বলিতে লাগিল—'কেন আমাকে ধরে এনেছেন ? কি অধিকার আপনাদের ? জানেন আমি কে ? আমাকে ইচ্ছা করে ফেলে যায় নি—আমি যে চোর বা খুনী নই—তাই বা কে বললে ? আপনারা কি জানেন ?'

হার্ডিং তাহাকে শান্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেই সে সরিয়া গিয়া বলিল—'না! না! একটা কথা শুধু জানতে চাই—আমি কি স্বাধীন ?'

হার্ডিং বলিলেন—'হাঁ, তুমি নিশ্চয়ই স্বাধীন।'

'তবে আমি চললাম'—বলিয়াই সে উন্মত্তের মত বনের দিকে ছুটিয়া পলাইল! তাহার পিছনে পিছনে পেন্‌ক্রফ্‌ট, হারবার্ট ও নেব ছুটিল, কিন্তু খানিক পরেই শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিল।

হার্ডিং বলিলেন—'ও যাক, ওকে ঘাঁটিও না।'

পেন্‌ক্রফট বলিল—'ও আর ফিরে আসবে না।'

হার্ডিং বলিলেন—'দেখো, নিশ্চয় ফিরে আসবে।'

অনেকদিন আগন্তুকের কোন উদ্দেশ নাই। তবু হার্ডিংএর মন বলিতেছে যে তাহাকে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। এ পলায়ন শুধু অনুতাপের জন্য।

সকলে নিয়মিত কাজ শুরু করিলেন। হারবার্টের আনা বীজগুলি পুঁতিয়া দেওয়া হইল। শস্য এখন যথেষ্ট আছে। হার্ডিং স্থির করিলেন যে প্রস্‌পেক্ট হাইটের উপর একটা উইণ্ড মিল প্রস্তুত করিবেন। যথেষ্ট হাওয়া লাগিবে, মিলটি অনবরত চলিবে।

পেন্‌ক্রফট বলিল—'বাঃ, তাহলে শুধু যে ময়দা হবে তাই নয়, মিলের দরুণ লিঙ্কন দ্বীপের চেহারাও অনেকটা খুলে যাবে।'

হার্ডিং ছোট একটি নমুনা বানাইলেন। পাখির বাড়ির দক্ষিণে সকলে মিলিয়া মিল তৈরির কাজে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। প্রথম যেদিন খাবার টেবিলে রুটি পাওয়া গেল, সেদিন সকলের কি আনন্দ!

আগন্তুকের কোন উদ্দেশ নাই। বনের মধ্যে স্পিলেট কত সন্ধান করিলেন, তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া

গেল না। হার্ডিং তবু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—'ও ফিরে আসবেই আর তখন থেকে আমাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।'

হার্ডিংএর কথাই ঠিক হইল। ৩রা ডিসেম্বর হারবার্ট লেকের তীরে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। অন্য সকলে কাজে ব্যস্ত, এমন সময় হঠাৎ একটা চিৎকার শুনিতে পাওয়া গেল—'বাঁচাও, গেলাম, গেলাম!'

হার্ডিং ও স্পিলেট দূরে ছিলেন। পেন্‌ক্রফট ও নেব চিৎকার শুনিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে লেকের দিকে ছুটিল।

তাহারা পৌঁছিবার পূর্বেই আগন্তুক ছুটিয়া আসিয়াছে।

হারবার্ট একটা ভীষণ জাগুয়ারের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় হারবার্ট একটা গাছের পিছনে দাঁড়াইয়াছে। জাগুয়ারটা তাহার উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য একেবারে প্রস্তুত!

আগন্তুক আসিয়াই শুধু একটা ছুরি হাতে লইয়া জাগুয়ারের উপর লাফাইয়া পড়িল। জাগুয়ারটাও তখন হারবার্টকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিল। আগন্তুকের শরীরে অসাধারণ বল—এক হাতে জাগুয়ারের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া, অন্য হাতে তাহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। মুহূর্তমধ্যে জাগুয়ার মাটিতে পড়িয়া গেল, আগন্তুক মৃত জাগুয়ারকে পদাঘাত করিয়া সবে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে সকলে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

হারবার্ট আগন্তুককে টানিয়া ধরিয়া বলিল—'নানা কিছুতেই তোমাকে যেতে দিব না।'

জাগুয়ারের নখের আঘাতে আগন্তুকের কাঁধ হইতে রক্তের ধারা বহিয়া তাহার শার্ট লাল হইয়া গিয়াছে কিন্তু তবু তাহার গ্রাহ্য নাই।

হার্ডিং তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, 'বন্ধু, তুমি আমাদিগকে কৃতজ্ঞতার ঋণে বেঁধেছ। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আমাদের ছেলেটিকে বাঁচিয়েছ।'

আগন্তুক বলিল—'আমার প্রাণ! তার আবার মূল্য কি?'

'তোমার যে গুরুতর আঘাত লেগেছে দেখছি!'

'ও আঘাতে কিছু এসে যায় না।'

হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধু, তোমার হাতখানা আমাকে দিবে?'

হাতদুটি গুটাইয়া লইয়া, গম্ভীর হইয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল—'কে আপনারা? আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক আপনাদের?'

হার্ডিং সংক্ষেপে নিজেদের পরিচয় এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন—'তোমাকে নিয়ে এসে আমাদের যে আনন্দ হয়েছিল, তেমন আনন্দ জীবনে কখনও পাইনি!'

আগন্তুকের মুখ লাল হইল, মনে এক ভীষণ তোলপাড় হইতেছে বোঝা গেল।

হার্ডিং আবার বলিলেন—'এখন তোমার হাতখানি দিবে?'

'না! না! আপনারা সাধু, সৎলোক। আর আমি—'

বোঝা গেল যে দ্বীপবাসিগণের সন্দেহ সত্য, এখন সে অনুতাপের আগুনে জ্বলিতেছে। সাধু ব্যক্তি করমর্দন করিবার জন্য তাহার হাত চাহিতেছেন, পাপী হইয়া সে কিরূপে হাত বাড়াইয়া দিবে? যাই হোক, সেইদিন হইতে সে গ্র্যানিট হাউসের সীমানার মধ্যেই থাকিত। দ্বীপবাসিগণ এরূপ ব্যবহার করিতেন যেন তাঁহারা কোন সন্দেহই করেন নাই।

কাজকর্ম পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। হার্ডিং ও স্পিলেট্ রাসায়নিকের কাজ করেন। কেবল হারবার্ট শিকারে

বাহির হইলে স্পিলেট্ ও সঙ্গে যান। নেব্ ও পেন্‌ক্রফট্ আস্তাবলে, পাখির বাড়িতে বা কোরালে কাজে ব্যস্ত থাকে। আগন্তুক একাকী প্লেটোতে কাজ করে, আহারের সময়ও গ্র্যানিট হাউসে আসে না, উদ্ধারকর্তাদের সঙ্গ যেন অসহ্য!

পেন্‌ক্রফট্ বলিল—'একা থাকাটাই যদি তার মতলব ছিল, তবে বোতল ভাসিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করেছিল কেন?'

হার্ডিং বলিলে—'হয় ত শীগগিরই সে সেকথা বলবে।'

বাস্তবিকই, এক সপ্তাহ পরে, গ্র্যানিট হাউসে আসিয়া অবনত মস্তকে শান্তভাবে সে হার্ডিংকে বলিল—'মহাশয়! একটি অনুরোধ আছে!'

হার্ডিং বলিলেন—'কি অনুরোধ! আমরা তোমার বন্ধু এই কথাটি মনে রেখে যা বলবার বল।'

আগন্তুক চক্ষু ঢাকিল, তাহার শরীর কাঁপিতেছে।

অবশেষে সে বলিল—'মহাশয়, একটি অনুগ্রহ চাই!'

'কি অনুগ্রহ বল।'

'চার পাঁচ মাইল দূরে, কোরালে যে জন্তুগুলি আছে তাহাদিগের যত্নের আবশ্যক। আমি সেইখানে থেকে তাহাদিগকে দেখব শুনব, অনুমতি দিন।'

হার্ডিং দুঃখপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—'বন্ধু, কোরালে তো মানুষের উপযুক্ত ঘর নাই।'

'আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট!'

হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধু, তাহলে তুমি কোরালেই থাক। কিন্তু মনে রেখো, গ্র্যানিট হাউসের দরজা তোমার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত! কোরালেই তোমার ব্যবস্থা করে দেব।'

'কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন? ব্যবস্থা আমি করে নিব।'

হার্ডিং বলিলেন—'সেটি হবে না, আমাদের কথা অনুসারেই ব্যবস্থা হবে।'

সাইরাস হার্ডিংকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া আগন্তুক চলিয়া গেল। স্থির হইল কোরালে একটি কাঠের ঘর বানাইতে হইবে। সেইদিনই সকলে যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সুন্দর একটি ঘর প্রস্তুত হইল। ঘরটিতে বিছানা আসবাব, তাক সবই হইল। বন্দুক, গুলি এবং কিছু যন্ত্রপাতিও সেখানে রাখা হইল। তখন প্রায় আশীটি জন্তু কোরালে ছিল। ঘরটি হইতে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা যাইবে।

আগন্তুক এই ব্যবস্থার কিছুই জানে না, সে প্লেটোতে সমস্ত জমি কোপাইয়া ফেলিয়াছে।'

হার্ডিং ২০শে ডিসেম্বর আগন্তুককে বলিলেন যে সমস্ত ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর দ্বীপবাসিগণ গ্র্যানিট হাউসের ডাইনিং রুমে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে আগন্তুক প্রবেশ করিয়া বলিল—'কোরালে চলে যাবার আগে আমার সব কথা বলে যেতে চাই।'

হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধু, তুমি ইচ্ছা করলে কিছু না বললেও পার। আমরা কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি।'

'কিন্তু আমার কর্তব্য হচ্ছে বলা।'

'তবে বল, বসে সব কথা বল।'

'না বসব না, আমি দাঁড়িয়ে থেকেই বলব।'

ঘরের কোণে একটু কম আলোতে দাঁড়াইয়া আগন্তুক নিম্ন লিখিত কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল:—

'১৮৫৪ সালে, ২০শে ডিসেম্বর, অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে, বার্নুলি অন্তরীপের কাছে একটা ছোট্ট

জাহাজ এসে লঙ্গর ফেলল। স্কটল্যাণ্ডের একটি ধনী লর্ড গ্লেনারভন, ছিলেন সেই জাহাজের মালিক। জাহাজে আরোহী ছিলেন লর্ড গ্লেনারভন নিজে, তাঁর স্ত্রী, একটি ইংরাজ মেজর একটি ফরাসী ভুগোল-বিত্তাবিৎ, আর দুটি ছোট ছেলেমেয়ে। মেয়েটি আর ছেলেটি ছিল ক্যাপটেন গ্রাণ্টের—যাঁর জাহাজ ব্রিটানিয়া একবছর আগে সমুদ্রে নিরুদ্দেশ হয়েছিল।

লর্ড গ্লেনারভনের জাহাজটির নাম ছিল ডাঙ্কান, তার ক্যাপটেন ছিলেন জন ম্যাঙ্গলস্, তা ছাড়া জাহাজে পনের জন খালাসী ও কর্মচারী ছিল।

লর্ড গ্লেনারভনের জাহাজ যে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে এসে লঙ্গর ফেলেছিল, তার কারণ—ছয়মাস পূর্বে, আইরিস সমুদ্রে, ডাঙ্কান জাহাজ একটা বোতল কুড়িয়ে পায়। সেই বোতলে ইংরেজি ফরাসী এবং জার্মান এই তিন ভাষায় লেখা একখণ্ড কাগজ ছিল, সেটা পড়ে জানা যায় যে নিরুদ্দেশ ব্রিটানিয়া জাহাজের ক্যাপটেন এবং আরো দুটি লোক নাকি জীবিত আছেন এবং তাঁরা একটা দ্বীপে আশ্রয় পেয়েছেন। দ্বীপের ল্যাটিটিউড দেওয়া ছিল, কিন্তু লঙ্গিটিউড পড়া গেল না—সমুদ্রের জলে ধুয়ে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ল্যাটিটিউড দেওয়া ছিল ৩৭°১১´ সাউথ, সুতরাং এই ল্যাটিটিউড ধরে সমুদ্রের উপর দিয়ে গেলে ক্যাপটেন গ্রাণ্টদের আশ্রয় সেই দ্বীপটিতে পৌঁছান যাবে। ইংলণ্ডের নৌবিভাগকে ইতস্ততঃ করতে দেখে ক্যাপটেন গ্লেনারভন স্থির করলেন যে তিনি নিজেই ক্যাপটেন গ্রাণ্টের সন্ধানে যাবেন। গ্রাণ্টের ছেলে রবার্ট ও মেয়ে মেরি গ্রাণ্টকে চিঠি লিখলে তারাও তাঁর কাছে এল। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে লর্ড গ্লেনারভন তাঁর পরিবার এবং ক্যাপটেন গ্রাণ্টের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্লাসগো ছেড়ে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে চললেন।

জাহাজ ম্যাগেলান প্রণালী পার হয়ে, প্যাটাগোনিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হল। বোতলের চিঠির মতে কাছেই কোন স্থানে ইণ্ডিয়ানেরা গ্রাণ্টকে কয়েদ করে রেখেছিলেন। ডাঙ্কান ৩৭°১১´ ল্যাটিটিউড ধরে প্যাটাগোনিয়া ঘুরে পূর্ব উপকূলে গিয়ে উপস্থিত হল। পথে ক্যাপটেন গ্রাণ্টের কোন সন্ধান না পাওয়ায় ১৩ই নভেম্বর ডাঙ্কান আবার চলল সমুদ্র পথে। যেতে যেতে পথে কোন দ্বীপেই ক্যাপটেন গ্রাণ্টের সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে ডাঙ্কান এসে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে লঙ্গর ফেলল, সে আগেই বলেছি। লর্ড গ্লেনারভনের ইচ্ছা যে অস্ট্রেলিয়ার চারদিকে ও ঘুরে দেখবেন। সমুদ্রতীর থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে এক আইরিস ভদ্রলোকের একটা কারখানা ছিল, তিনি গ্লেনারভনের দলকে সযত্নে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। গ্লেনারভন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে দুই বছর আগে ব্রিটানিয়া নামে কোন জাহাজের নিরুদ্দেশ হবার খবর তিনি জানেন কি না।

ভদ্রলোকটি বললেন যে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর একটি চাকর এগিয়ে এসে বলল—'হুজুর, জগদীশ্বরের কৃপায় ক্যাপটেন গ্রাণ্ট যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে তিনি এখানেই কোথাও আছেন।

লর্ড গ্লেনারভন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে?'

—লোকটি বলিল—'আমি একজন স্কটলণ্ডবাসী, ক্যাপটেন গ্রাণ্টের কর্মচারী ছিলাম, আমি ব্রিটানিয়া জাহাজের জলমগ্ন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।'

এই লোকটির নাম আয়ারটন। তার কাগজপত্র পড়ে দেখা গেল যে সে সত্যিই ব্রিটানিয়া জাহাজের একজন কর্মচারী ছিল। আয়ারটন তখন বলল যে ব্রিটানিয়া জাহাজ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে ডুবেছিল। তার বিশ্বাস যে ক্যাপটেন গ্রাণ্ট এখনও বেঁচে থাকলে দ্বীপবাসী বুনো লোকদের মধ্যে কয়েদ হয়ে আছেন, তাঁকে পূর্ব উপকূলে সন্ধান করতে হবে।

লোকটিকে সন্দেহ করবার কোন কারণ হয়নি। ভদ্রলোকটির কাছে সে দুই বছর কাজ করছিল তিনি

তাকে বিশ্বাসী বলে জানেন। তার উপদেশ মত লর্ড গ্লেনারভন, তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে দুটি, সেই মেজর, ফরাসী ভদ্রলোকটি, ক্যাপটেন ম্যাঙ্গল্‌স ও জনকয়েক নাবিক ৩৭° ল্যাটিটিউড ধরে অস্ট্রেলিয়ার মধ্য দিয়ে পার হবার জন্য প্রস্তুত হল। আয়ারটন হল সেই দলের কর্তা ও পথ-প্রদর্শক। ১৮৫৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর এই দল যাত্রা করল। এদিকে 'ডাঙ্কান' দ্বিতীয় কর্মচারী টম অস্টিনের অধীনে মেলবোর্ণ যাত্রা করল, সেখানে গিয়ে লর্ড গ্লেনারভনের জন্য অপেক্ষা করবে।

এখানে বলা দরকার যে এই আয়ারটন লোকটা ছিল দারুণ বিশ্বাসঘাতক। সে যে ব্রিটানিয়া জাহাজের কর্মচারী ছিল সে কথা ঠিক। কিন্তু সে দল পাকিয়ে বিদ্রোহ করে জাহাজটি দখল করবার চেষ্টা করেছিল। সেজন্য ক্যাপটেন গ্রাণ্ট ১৮৫২ সালের ৮ই এপ্রিল তাকে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। ব্রিটানিয়া জাহাজ ডুবে যাবার খবর সে আগে জানতোই না। সে বেন্‌ জয়েস্‌ নাম নিয়ে, কতগুলি পলাতক কয়েদীকে জুটিয়ে একটা দল পাকিয়ে তার সর্দার হয়েছিল। সে চেয়েছিল কোনরকমে লর্ড গ্লেনারভনকে সরিয়ে, ডাঙ্কান জাহাজ দখল করে, প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে ডাকাতি করে বেড়াবে।'

এই পর্যন্ত বলিয়া আয়ারটন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল,—তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'ছোট দলটি অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে। কয়েদী দল গোপনে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, ডাঙ্কান মেলবোর্ণে চলে গিয়েছে।

আয়ারটন যাত্রীদলকে তীর থেকে খানিকটা ভিতরে গভীর বনের মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে জল, খাবার জিনিস, কিছুই পাওয়া যায় না। এখানে সে ডাঙ্কানের কর্মচারীর নামে লর্ড গ্লেনারভনের কাছ থেকে আদায় করে নিল যে ডাঙ্কান যেন চিঠি পাওয়া মাত্র পূর্বতীরে 'টু-ফোল্ড' উপসাগরে চলে যায়। (সেখানে কয়েদীদল আয়ারটনের সঙ্গে মিলবে)। লর্ড গ্লেনারভনের চিঠি নিয়ে সে দুদিন পরেই মেলবোর্ণে গিয়ে উপস্থিত হল।

আয়ারটনের ষড়যন্ত্র এ পর্যন্ত বেশ চলে এসেছে। টু-ফোল্ড উপসাগরে সে ডাঙ্কানকে পাকড়াও করে, লোকজনদের খুন করে জাহাজের মালিক হবে! কিন্তু এইবার এই সাংঘাতিক কার্যে বাধা উপস্থিত হল। মেলবোর্ণে পৌঁছে সে জাহাজের কর্তা টম্‌ অস্টিনকে চিঠি দিল। অস্টিন চিঠিখানা পড়েই জাহাজ ছেড়ে দিলেন—টু-ফোল্ড উপসাগরের দিকে নয়, নিউজিল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলের দিকে। এই ব্যাপার দেখে আয়ারটন রেগে আগুন হল, তার সব মতলব পণ্ড হয়ে যায়! সে ডাঙ্কানকে থামাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু অস্টিন তাকে লর্ড গ্লেনারভনের চিঠি দেখালেন। সত্যসত্যই চিঠিতে নিউজিল্যাণ্ড যাবারই আদেশ রয়েছে! ভদ্রলোক ভুলক্রমে তাই লিখেছেন!! সব ষড়যন্ত্র পণ্ড হয়ে যাওয়াতে আয়ারটন রেগে অস্টিনকেই গালাগাল দিতে লাগল। অস্টিন বাধ্য হয়ে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন। আয়ারটন আর কারো কোন খবর পেল না।

ক্রমে নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছে ডাঙ্কান জাহাজ ৩রা মার্চ পর্যন্ত সেই উপকূলেই ঘুরে বেড়াল। সেইদিন আয়ারটন ডাঙ্কানের কামানের আওয়াজ শুনতে পেল। এই আওয়াজ শুনে লর্ড গ্লেনারভনের দল এসে জাহাজে চড়লেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার! এঁরা এখানে কি করে এলেন?

আয়ারটন চলে গেলে পর লর্ড গ্লেনারভনের দল বহু কষ্ট পেয়ে, শতশত বাধা বিপত্তি পার হয়ে, অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে টু-ফোল্ড উপসাগরের কাছে গিয়ে দেখলেন সেখানে ডাঙ্কান নাই। তিনি মেলবোর্ণে টেলিগ্রাম করলেন, খবর এল যে ডাঙ্কান রওয়ানা হয়ে গেছে কিন্তু কোথায় গেছে জানা নেই!

ডাঙ্কান কোথায় গেল? তখন লর্ড গ্লেনারভন সন্দেহ করলেন যে নিশ্চয় আয়ারটন বিশ্বাসঘাতক—ফাঁকি দিয়ে ডাঙ্কান দখল করে নিয়ে পালিয়েছে। তিনি ছিলেন খুব সাহসী! তিনি একটা বাণিজ্য জাহাজে ভাড়া করে'

তাতে চড়ে আবার রওনা হলেন। ৩৭° ল্যাটিটিউড ধরে যেতে যেতে ক্রমে তাঁরা নিউজিল্যাণ্ডের পূর্ব তীরে উপস্থিত হলেন! পথে ক্যাপটেন গ্রাণ্টের কোন খবর পেলেন না বটে, কিন্তু ঘুরে পূর্ব তীরে গিয়ে দেখতে পেলেন সেখানে ডাঙ্কান রয়েছে। টম্ অস্টিন তাঁর জন্ম অপেক্ষা করছেন।

লর্ড গ্লেনারভন জাহাজে চড়লেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ আয়ারটনকে তাঁর সামনে আনা হল। তিনি নানা রকমে তার কাছ থেকে ক্যাপটেন গ্রাণ্টের খবর জানতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে চুপ করে রইল।

তখন গ্লেনারভন তাকে ভয় দেখালেন যে প্রথম বন্দরে পৌঁছেই তাকে শাসনকর্তার হাতে সমর্পণ করবেন। তবু আয়ারটন নীরব রইল।

ডাঙ্কান আবার চলল, গ্লেনারভন চেষ্টা করতে লাগলেন আয়ারটনের জেদ ভাঙতে পারেন কিনা।

অবশেষে অনেক সাধ্য-সাধনার পর আয়ারটন রাজি হল যে তাকে যদি ইংরাজ শাসনকর্তার হাতে না দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে নামিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে যা জানে সব কথা বলবে। লর্ড গ্লেনারভন এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। কিন্তু আয়ারটন সব কথা খুলে বললে পর দেখা গেল যে ক্যাপটেন গ্রাণ্ট যেদিন তাকে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে নামিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে কোন ঘটনা সে জানে না!

যা হোক, লর্ড গ্লেনারভন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। ডাঙ্কান ৩৭.° ল্যাটিটিউড ধরে সমুদ্রপথে চলতে চলতে ট্যাবর দ্বীপে এসে পৌঁছাল। এইখানে আয়ারটনকে নির্বাসন দেওয়া হবে। ভগবানের কি অদ্ভুত লীলা! এই দ্বীপে এসেই তাঁরা ক্যাপটেন গ্রাণ্ট এবং তাঁর সঙ্গী দুজনের দেখা পেলেন। ট্যাবর দ্বীপেই তাঁরা এতকাল ছিলেন!!

ট্যাবর-দ্বীপে ক্যাপটেন গ্রাণ্টের বদলে এখন আয়ারটন বাস করতে লাগল। জাহাজ থেকে নামবার সময় লর্ড গ্লেনারভন তাকে বললেন—'আয়ারটন! এই দ্বীপে জনমানবের দৃষ্টি থেকে বহুদূরে তুমি বাস করবে। কারো সঙ্গে খবরাখবরের সম্ভাবনা নাই। একাকী ভগবানের দৃষ্টির মধ্যে তুমি থাকবে! কিন্তু তুমি একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেনা। কারণ তুমি কোথায় থাকবে, সে কথা আমি জানি। স্মরণ করে রাখবার উপযুক্ত লোক তুমি নও, কিন্তু তবু তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

এরপরে ডাঙ্কান জাহাজ পাল তুলে চলে গেল।

আয়ারটন ট্যাবর দ্বীপে একা পড়ে রইল। ক্যাপটেন গ্রাণ্ট যে কুটিরখানি বানিয়েছিলেন, সেইখানে তার বাস হল। তার গুলি-বারুদ অস্ত্র-শস্ত্রের কোন অভাব ছিলনা। তার কাজ হল নির্জনে বাস করে তার নিজের অতীত জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা।

'ভদ্রমহোদয়গণ! আয়ারটন বাস্তবিক অনুতপ্ত হয়েছিল, নিজের পাপের কথা মনে করে সে লজ্জায় মরে যেত। মনের দুঃখে সে ছটফট করে বেড়িয়েছে। মনে মনে ভাবত, কেউ যদি কোনদিন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, তখন সে যেন তাদের সঙ্গে যাবার উপযুক্ত হতে পারে! সে উৎসুক হয়ে থাকত হঠাৎ যদি কোন জাহাজ এসে উপস্থিত হয়! নির্জনবাসের যন্ত্রণা ক্রমে তার কাছে আরো ভীষণ হয়ে উঠল।

এতেও তার শাস্তির মাত্রা পূর্ণ হল না। সে বুঝতে পারল যে ক্রমে তার স্বভাব বুনো এবং হিংস্র হয়ে যাচ্ছে সে পশুত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে! দুতিন বছর পরে সে সত্যিই বন্যজন্তুর মত হয়ে দাঁড়াল। সেই অবস্থাতেই আপনারা তাকে ট্যাবর-দ্বীপে এসে পেয়েছিলেন।

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আয়ারটন এবং আমি একই লোক!

আগন্তুকের এই অদ্ভুত কাহিনী শেষ হইলে দ্বীপবাসিগণ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের চিত্ত

কতখানি বিচলিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায়না।

হার্ডিং বলিলেন—'বন্ধু! তুমি পাপ গুরুতর করেছিলে কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তও যথেষ্ট হয়েছে। ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তুমি স্বজাতির মধ্যে আসতে পেরেছ এখন তুমি আমাদের সঙ্গী হলে।

এই বলিয়া তিনি তাঁহার হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন; আবেগপূর্ণ মনে আয়ারটন তাহা গ্রহণ করিল, তাহার চক্ষে জলধারা বহিতেছে!

হার্ডিং বলিলেন—'এখন তবে তুমি গ্র্যানিট হাউসে থাক।' আয়ারটন বলিলে—'আর কিছুদিন কোরালে থাকতে দিন; 'আচ্ছা তাহলে তাই হবে।'

আয়ারটন কোরালে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করতেছে এমন সময়ে হার্ডিং জিজ্ঞাসা করিলেন—'আয়ারটন তোমার যদি একাকী নির্জন বাস করিবারই ইচ্ছা ছিল, তবে চিঠি লিখে বোতল ভাসিয়েছিলে কেন? সেই কাগজটুকু পেয়েই ত আমরা ট্যাবর দ্বীপে গিয়েছিলাম।'

আয়ারটন বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল—'চিঠি লিখে বোতল ভাসিয়েছিলাম?'

হার্ডিং বলিলেন—'হাঁ, বোতলের মধ্যে আমরা একটুকরো কাগজ পেয়েছিলাম, তাতে তোমার কথা এবং ট্যাবর দ্বীপের অবস্থানের কথা লেখা ছিল।'

আয়ারটন কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—'কৈ, আমি ত কখনও, কোনদিন, কোন চিরকুট লিখে সমুদ্রে ভাসাই নি!'

পেনক্রফ্‌ট্ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কখনই ভাসাও নি?'

দৃঢ়ভাবে আয়ারটন জবাব দিল—'না, কখনই না!'

এই বলিয়া আয়ারটন সকলের নিকট বিদায় লইয়া আবার কোরালে ফিরিয়া গেল। ক্রমশঃ

অদ্ভুত ঘটনা

প্রসাদ সেনগুপ্ত

অদ্ভুত একটি কাহিনী মনে পড়ল।

স্থান: গঙ্গার ঘাট। সকালবেলা। নদীতে স্নান করছিলেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং নিকটেই দুই ইংরেজ ভদ্রলোক ঝগড়া করছিলেন পরস্পরের সঙ্গে। ইংরেজরা মুখের চাইতে হাতে কলমে কাজ করে ভালো। সুতরাং অবিলম্বে বাক্‌যুদ্ধ পরিণত হল মুষ্টিযুদ্ধে। দু'জনেই জখম হলেন এবং রণে ক্ষান্ত দিয়ে আদালতের শরণ নিলেন। এ অবস্থায় সাক্ষী না থাকলে মামলা ডিস্‌মিস্ হয়ে যায়; কিন্তু সে সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ ছাড়া কাছাকাছি আর কেউ ছিলেন না। অতএব ভদ্রলোক দু'জন অনেক অনুরোধ করে তাঁকেই সাক্ষী হিসেবে নিয়ে গেলেন।

—"যা যা হয়েছে সবটা আপনি জানেন?" প্রশ্ন করলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

—"আজ্ঞে না; ইংরেজী আমি বুঝিই না।"

—"তবে সাক্ষী দেবেন কি ভাবে?"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি তখন চোস্ত ইংরিজীতে ঐ দুই ভদ্রলোকের মুখের কথা হুবহু বলে দিলেন।

সত্যিই তিনি ইংরেজী একেবারে জানতেন না, তবে তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ এবং বলার ভঙ্গি সবই তাঁর হুবহু মনে ছিল।

ইনি হলেন সেকালের বিশিষ্ট শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত তর্কপঞ্চানন।

ইন্দ্র হওয়ার সুখ

উপেন্দ্রকিশোর রায়

দেবতাদের যিনি রাজা, তাঁহাকে বলে ইন্দ্র। তাঁহার কথা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। তাঁহার এক হাজার চক্ষু আর সবুজ রঙের দাড়ি ছিল। তাঁহার আসল নাম শক্র, পিতার নাম কশ্যপ, রাণীর নাম শচী, পুত্রের নাম জয়ন্ত, হাতির নাম ঐরাবত, ঘোড়ার নাম উচ্চৈঃশ্রবা, সারথীর নাম মাতলি, সভার নাম সুধর্ম্ম, বাগানের নাম নন্দন আর অস্ত্রের নাম বজ্র। তাঁহার সভায় গন্ধর্ব্বেরা গান গাইত, অপ্সরারা নাচিত।

লোকে ভাবিত, ইন্দ্র বড়ই সুখে থাকেন, আর অনেক সময়ই যে তিনি খুব জাঁক-জমকের ভিতর দিন কাটাইতেন, একথা সত্যও বটে। কিন্তু সময় সময় তাঁহাকে বেগও কম পাইতে হইত না। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক শত্রুতা ছিল, আর সেই সূত্রে অসুরেরা মাঝে মাঝে ইন্দ্রকে বড়ই নাকাল করিত। দেবতা আর অসুরের যুদ্ধে একবার বৃত্র নামে একটা অসুর ইন্দ্রকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল। দেবতারা তখন অনেক বুদ্ধি করিয়া সেই অসুরটাকে 'জৃম্ভিকা' অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারেন, তাই ইন্দ্র রক্ষা পান, নচেৎ যে যাত্রা আর তাঁহার বিপদের সীমাই ছিল না। জৃম্ভিকা অস্ত্রের গুণ অতি আশ্চর্য। সে অস্ত্র গায় লাগিবা মাত্র অসুরটা ভয়ানক হাই, তুলিল, আর ইন্দ্র সেই ফাঁকে তাহার পেটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এই যুদ্ধ ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতেই আবার ইন্দ্রের এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। পূর্বে কোন কারণে তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। বৃত্রের মৃত্যুর পরে সেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। বেচারা ভয়ে অস্থির হইয়া যেখানেই পলাইতে যান, ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয়। শেষে আর উপায় না দেখিয়া, তিনি একটা প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যে, পদ্মের মৃণালের ভিতর গিয়া সূতা হইয়া লুকাইয়া রহিলেন। তখন কাজেই ব্রহ্মহত্যা ঠকিয়া গেল। কিন্তু, তথাপি সে তাঁহাকে সহজে ছাড়ে নাই, সে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বৎসর সেইখানে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল!

সাড়ে তিন লক্ষ বছর ত আর একদিন দু'দিনের কথা নহে, দেবতার হিসাবেও তাহা এক হাজার বৎসর। কাজেই দেবতারা তাঁকে এত দিন দেখিতে না পাইয়া ব্যস্তভাবে তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। শেষে ব্রহ্মার কথায় যদিও তাঁহার সন্ধান পাইলেন তথাপি তাঁহাকে ঘরে আনিতে সাহস পান নাই, কারণ ব্রহ্মহত্যা তখনও তাঁহার জন্য সেখানে বসিয়া আছে, সে তাঁহাকে সহজে ছাড়িবে কেন? তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কোন পবিত্র নদীতে স্নান করাইয়া ইন্দ্রের শরীরের পাপ ধুইয়া ফেলিবেন, তাহা হইলেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। এই বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকে গৌতমী নদীতে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। গৌতম যার পর নাই রাগিয়া

তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'সে হইবে না, এই পাপীকে এখানে স্নান করাইলে আমি তোমাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিব ! তোমরা শীঘ্র এখান হইতে যাও "

এ কথায় দেবতারা নর্মদার জলে ইন্দ্রকে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মাণ্ডব্য মুনির আশ্রম ছিল। মাণ্ডব্য মুনি বিষম ভ্রূকুটির সহিত তাঁহাদিগকে বলিলেন—'এখানে যদি ইঁহাকে স্নান করাও, তবে এখনি তোমাদের শাপ দিয়া ভস্ম করিব।'

যাহা হউক, শেষে দেবতারা অনেক স্তুতি মিনতি করায় মাণ্ডব্য ইন্দ্রকে সেখানে স্নান করাইতে দিলেন। তারপর তাঁহাকে গৌতমীতে নিয়াও স্নান করান হইল। ইহার পর আবার ব্রহ্মা তাঁহার কমণ্ডলুর জল দিয়া ইন্দ্রকে ধুইলেন, তবে সে যাত্রার মত তিনি একটু নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাস্তবিক, ইন্দ্র হওয়া আগাগোড়াই সুখের কথা ছিল না। কিন্তু, লোকে ভাবিত ইন্দ্র বড় সুখী। তাই অনেকে ইন্দ্র হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিত। সেজন্য কাহাকেও খুব তপস্যা করিতে দেখিলেই ইন্দ্র ভাবিতেন—'সর্বনাশ ! এইবার বুঝি বা আমার কাজটি যায় !' তখন তিনি সেই লোকটির তপস্যা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এক এক জন লোক ইন্দ্র হইয়া যাইত !

নহুষ নামে এক রাজা একবার ইন্দ্র হইয়া কি হুলস্থূলই বাধাইয়া ছিলেন! উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতে তাঁহার মন উঠিলনা, তিনি বলিলেন, 'আমি বড় বড় মুনিদের ঘাড়ে চড়িয়া বেড়াইব !'

মুনিরা হইলেন তাহার বেহারা·········

অমনি এক আশ্চর্য পাল্কী প্রস্তুত হইল, মুনিরা হইলেন তাহার বেহারা। সে বেচারাদের গায়

জোর কম। ফলমূল খাইয়া থাকেন, পাল্কী বহার অভ্যাস কাহারও নাই, তাঁহাদের কাজে নহুষের মন উঠিবে কেন? নহুষ তখন বেজায় চটিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মাথায় ধাঁই শব্দে এক প্রচণ্ড লাথি লাগাইয়া দিলেন। তাহার ফলও পাইলেন হাতে-হাতেই, কেননা, তাহার পরমুহূর্তেই মুনির শাপে তাঁহার সেই সুখের ইন্দ্রগিরি ঘুচিয়া গেল, আর তিনি এক প্রকাণ্ড সাপ হইয়া হিমালয়ের নিকটে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন!

আর একবার অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে, কিন্তু কেহই জয়লাভ করিতে পারিতেছেন না। সেই সময়ে পৃথিবীতে রজি নামে একজন অতিশয় ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। দুই দলই ভাবিলেন,—'এই রজিকে আনিয়া আমাদের সঙ্গে জুটাইতে পারিলে আমরা নিশ্চয় জিতিব।'

এই ভাবিয়া দেবতারা রজিকে আসিয়া বলিলেন,—'হে রাজন, তুমি আমাদের সঙ্গে মিলিয়া অসুর বধ কর, নহিলে আমরা কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না!' রজি বলিলেন, 'আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিতে পারি।'

দেবতারা বলিলেন, 'অবশ্য তোমাকে আমরা ইন্দ্র করিব, তুমি শীঘ্র আইস!'

এই বলিয়া দেবতারা সবে চলিয়া গিয়াছেন, অমনি অসুরেরা আসিয়া রজিকে বলি, 'মহারাজ, আপনি আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন।'

রজি দেবতাদিগকে যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি অসুরদিগকেও বলিলেন, 'আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের কথায় রাজি আছি!'

কিন্তু, অসুরেরা সে কথায় অতিশয় ঘৃণার সহিত বলিল, 'এমন সাহায্যের আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ। আর কোন ইন্দ্র আমরা চাই না। আপনি না হয় আমাদের পক্ষে নাই আসিলেন।'

তখন রজি দেবতাদের সঙ্গে জুটিয়া ভয়ানক রাগের সহিত অসুর মারিতে আরম্ভ করিলেন, আর তাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেবতাদের জয়লাভ হইল। ইন্দ্র দেখিলেন, এখন ত বড়ই বিপদ উপস্থিত, রজিকে এখন সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাই তিনি কিছু বলিবার আগেই তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ! লোকে বলে, যে রক্ষা করে, সে পিতা। আপনি আমাকে ভয় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কাজেই আপনি আমার পিতা হইলেন। আর তাহাতেই আপনি ইন্দ্রও হইলেন, কেন না ইন্দ্রের পিতা হইলে আর ইন্দ্র হওয়ার চেয়ে বেশি বই কম কি হইল?'

রজিও ইন্দ্রের সেই ফাঁকিতে ভুলিয়া আহ্লাদের সহিত দেশে ফিরিয়া আসিলেন, স্বর্গে রাজা হওয়ার কথা আর মুখে আনিলেন না।

এই রজির পাঁচশত মহাবীর পুত্র ছিল। রজির মৃত্যুর পরে এই পাঁচশত বীর মিলিয়া যুক্তি করিল যে 'দেবতারা ফাঁাক দিয়া আমাদের পিতাকে ইন্দ্রপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, আইস, আমরা তাহার শোধ লইব!'

এই বলিয়া তাহারা দেবতাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, আর দেখিতে দেখিতে দলবল সহিত ইন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গ আর পৃথিবী দুইই দখল করিয়া বসিল।

এই পাঁচশত ভাই যেমন বীর, তেমনি যদি বুদ্ধিমান হইত তবে আর ইন্দ্রের নিজরাজ্য ফিরিয়া পাইবার কোন উপায়ই থাকিত না। কিন্তু ইহারা বুদ্ধিমানের মতন ধর্মপথে থাকিয়া রাজ্যপালন করার বদলে, নানারূপে অসৎ কার্যে নিজেদের বিষয় ও বল নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার ফলে, অল্প দিনের ভিতরেই ইন্দ্র তাহাদিগকে তাড়াইয়া আবার আসিয়া স্বর্গের রাজা হইলেন।

কাঠের গুঁড়ি*

নির্মল চন্দ্র দাশগুপ্ত

কাঠের গুঁড়ি! কাঠের গুঁড়ি! শুকনো কেন ভাই?
ফোটে না ফুল, ধরে না ফল—কাঁদছ বসে তাই।
একদিন তো ছিল যখন বিলিয়েছিলে কত,
রঙ্গীন রঙ্গীন ফুলের রাশি ফল যে শত শত।
কত বাসর সাজত তোমার গন্ধ রঙ্গীন ফুলে,
উৎসবেরই আনন্দেতে তোমায় যেত ভুলে।
জন্মদিনের উপহার আর ঘর সাজানোর কাজে,
আবার তোমার ডাক পড়ত বৃহৎ সভা-মাঝে।
যৌবন তেজে যখন ছিল নিটোল তোমার দেহ,
রূপের সাথে মিশে ছিল অপার তোমার স্নেহ।
ফুল-ফল, নিবিড় ছায়া করতে তুমি দান
নিজের পানে না তাকিয়ে বিলিয়ে দিতে প্রাণ।
যখন তুমি বৃদ্ধ হলে, বিধির বিধান মেনে,
ফুল ফোটে না ফল ধরে না (কেউ) নেয় না কোলে টেনে।
কিন্তু তবু সেতো তোমার সব পরিচয় নয়
প্রাণহীন সেই শুষ্ক দেহ ছড়াও বিশ্বময়।
কেউ বা নে যায় টুকরো কেটে রান্না করার তরে
কেউ বা সাজায় নানান ভাবে তাহার শোবার ঘরে।
দরজা-জানালা, টুল, টেবিল আলমারী আর খাট,
হরেক রকম কাজের জিনিস দা-কুড়ুলের বাঁট।
মরণ পরেও তোমার দেহ লাগায় নানা কাজে
তুমি আছ তাই না তাদের গর্ব করা সাজে।
বৃদ্ধ বলেই ব্যর্থ বোঝা নয় সে জগৎ মাঝে,
অসীম জ্ঞানের বহ্নিশিখা তাহার মাঝে রাজে।
ভীষ্ম সেতো বৃদ্ধ ছিল সবার সেরা গুরু,
প্রণম্য সে সবার কাছে, পাণ্ডব আর কুরু।
বৃদ্ধ বলে আমরা সবাই ফেলবো নাকো ঠেলে,
মোদের মাঝে রাখবো ধরে প্রেমের পাখা মেলে।

*শারদীয় সন্দেশে শ্রীনরেন্দ্র দেব রচিত কাঠের গুঁড়ি কবিতা দ্রষ্টব্য। সঃ সঃ

(শৃগাল-চরিত)

গৌরী চৌধুরী

চুম্বক

(করটক ও দমনক নামে দুই চতুর শেয়ালের সহায়তায় বনের রাজা পিঙ্গলক সিংহের সঙ্গে আগন্তুক ষাঁড় সঞ্জীবকের গভীর বন্ধুত্ব হল। ধর্মকথা শুনে সিংহ শিকার করা ছেড়ে দিল, প্রজারা না খেতে পেয়ে মরতে বসল। তখন ষাঁড়ের সঙ্গে সিংহের বিবাদ বাধাবার জন্য করটক ও দমনক সঞ্জীবককে মিথ্যা সংবাদ দিল যে পিঙ্গলক তাকে হত্যা করতে চায়। কেমন ভাবে পশুরাজ মদোৎকট আশ্রিত উটকে হত্যা করেছিল সেই গল্প তারা তাকে শোনাল। অবশ্য যে শেয়ালও চিতার পরামর্শে সিংহ একাজ করেছিল, তারাও শাস্তি পেয়েছিল।)

সঞ্জীবক বলল—সে তুমি যাই বল, উটের প্রাণ তো আর তাতে করে ফিরে এল না? এখন আমি কি করি, একটা পরামর্শ দাও তো। আমার তো মাথায় কিছুই আসছে না।

দমনক বললে—এই দণ্ডে দেশত্যাগ। এ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না।

সঞ্জীবক মাটিতে পা ঠুকে বলল—না। আমি কাপুরুষ নই। আমি পালাব না। আমি যুদ্ধ করব।

দমনক মনে মনে বলল—এই রে। শিঙের যা ধার দেখছি, সিংহটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারে অনায়াসে। তাহলেই তো হয়েছে। আমার একুল-ওকুল দুকুল যাবে।

গলা ঝেড়ে নিয়ে দমনক বলল—শত্রুর বল ভালো করে না জেনেশুনেই যুদ্ধ করবে? সমুদ্র টিট্টিভের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে কেমন জব্দ হয়েছিল, সে গল্প জানো না বুঝি? বলছি, শোন—

নতুন বিয়ে করে বৌ নিয়ে সমুদ্রের ধারে বালির মধ্যে সংসার পেতেছিল এক টিট্টিভ। সমুদ্রের তীরে সারাদিন ঘুরে ঘুরে এটা ওটা খেত, বৌকে খাওয়াত, মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবদের নেমন্তন্ন করত, এখান সেখান বেড়াতে যেত। নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কেটে যাচ্ছিল।

একদিন ভোরবেলা সূর্য উঠব উঠব করছে, রঙে রঙে ছেয়ে গেছে আকাশ আর সমুদ্র, এমন সময় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ঠিক টিট্টিভের গর্তের সামনেই এসে পড়ল খড়কুটো দিয়ে বোনা আধখানা এক পাখির বাসা।

সেইদিকে তাকিয়ে টিট্টিভ-বৌ বললে—আমাদেরও এবার ঐরকম একটা বাসা বাঁধতে হবে।

টিট্টিভ বললে—কেন? গর্তে থাকতে আর ভালো লাগছে না বুঝি?

বৌ কোন উত্তর না দিয়ে নিচু হয়ে পায়ের নখ দিয়ে বালি আঁচড়াতে লাগল।

টিট্টিভ বললে—বুঝেছি। ডিম পাড়বার জন্যে বাসা চাই। তা এখানে পাড়তে ক্ষতিটা কি?

বৌ মুখ তুলে বললে—বললেই হল? তারপর সমুদ্র এসে যদি ভাসিয়ে নিয়ে যায়?

—ঐ তোমাদের কেমন শুধু-শুধু ভয়। এ্যাদ্দিন তো রয়েছি এখানে। একদিনও ধারে কাছে আসতে দেখেছ সমুদ্রকে?

—কি জানি বাপু। সমুদ্রকে বিশ্বাস কি? পূর্ণিমার রাত্তিরে যা ঢেউ দেয়, দেখেই তো আমার বুক দুর দুর করে। কাজ কি ঝক্কিতে? চল না, গাছের ওপর খড়কুটোর বাসায় দিনকতক গিয়ে থাকি? কেমন নতুন নতুন হবে?

টিট্টিভ মাথা নেড়ে বলল—না, তা হয় না। এই সমুদ্রের ধারে খোলামেলার ভেতর থেকে গাছের ঘিঞ্জি বাসায় তোমারও দুদিন পরে আর ভালো লাগবে না। দিনরাত পালাই পালাই করবে। তখন লটবহর সামলাবে কে? তাছাড়া জীবনে ভয় কাকে বলে জানি না। আজ সমুদ্রের ভয়ে নিজের বাসা ছেড়ে চোরের মতন পালিয়ে যাব? তুমি নিশ্চিন্দি থাক। আমি তোমার ডিমের ভার নিলুম। দেখি, সমুদ্রের কত বড় বুকের পাটা। উঃ, আমার ডিমে হাত দেবেন, মজা দেখিয়ে দোব না?

—বলে সমুদ্রের দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে বালির ভেতর পোকামাকড় খুঁজতে লাগল টিট্টিভ।

ঢেউয়ের মাথায় ফেনার পাড় তৈরি করতে করতে টিট্টিভের কথাটা কানে গেল সমুদ্রের। ঠিক সেই সময় সূর্য উঠে পড়ল। সমস্ত জল ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠল। হাজার ঝিনুকের শরীরে মুক্তো তৈরীর মশলা পুরে দিতে দিতে সমুদ্র ভাবল—একরত্তি পাখাটার খুব আস্পদ্দা তো! ক্ষুদেটা ভেবেছে কি? দাঁড়াও, ওকে দেখাচ্ছি।

এর ঠিক তিনদিন পরে টিট্টিভ-বৌ ডিম পাড়ল—ছিটছিট সবুজ-আভা বালি রঙের ছোট ছোট চারটি ডিম। টিট্টিভের খুশি আর ধরে না। যখন-তখন ডানা ঝাঁকায়, ঘাড় বাঁকায়, শঙ্খ শামুক ফেনা তুলে তুলে এনে বাসা সাজায়, আর মনে মনে দিন গোণে, ডিম ফোটবার আর দেরী কত। আর টিট্টিভ-বৌ নড়েও না, চড়েও না; সারাদিন ঠায় বসে ডিমে তা দেয়, কথা কইলে উত্তর দেয় না, পাঁচ-বারের বেশি ছবার খাওয়াতে গেলে বিরক্ত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এইভাবে এককুড়ি একদিন কেটে যাবার পর একদিন টিট্টিভ বৌকে বললে—আর দেরী নেই।

দু-একদিনের মধ্যেই ডিম ফুটবে। চল, আজ একটু বেড়িয়ে আসি সেই মিষ্টি জলের হ্রদের ধারে। একঘেয়ে খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে। আর বাচ্চাদের জন্যে হালকা ধরণের হজমি পোকামাকড় এখন থেকেই দেখে রাখতে হবে তো?

বৌ বলল—তুমি যাও। এখন ডিম ছেড়ে আমি কোথাও নড়ছি না।

টিট্টিভ বলল—কি মুস্কিল। দিনরাত এইভাবে বসে থাকলে বাতে ধরে যাবে যে। তখন পা-ও নাড়তে পারবে না, ডানা-ও না। ছেলেমেয়েদের উড়তে শেখাবে কি করে?

অগত্যা বৌ বলল—বেশ চল, কিন্তু দেরী করতে পারবে না। এক্ষুণি ফিরে আসতে হবে।

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে—বলে যত্ন করে বালি দিয়ে ডিমগুলি বেশ করে ঢেকেঢুকে রেখে টিট্টিভ বৌ-কে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঝাউগাছের সারির ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে টিট্টিভ-বৌ কি ভেবে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে, অনেকদূরে একটা প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মাথা জ্বলজ্বল করছে। তার মনে হল, ওটা যেন সমুদ্রের চোখ—একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার কেমন ভয় ভয় করে উঠল, টিট্টিভকে বলতে গেল—'শুনছ? ফিরে চল, কিন্তু বলতে পারল না, মনের খুশিতে দুই ডানা মেলে দিয়ে গান গাইতে গাইতে তখন বাতাসে ভেসে চলেছে টিট্টিভ।

হ্রদের ধারে ঝোপে ঝাড়ে ডাঙায় জলে পাতায় ডালে টিট্টিভের দশ কুড়ি পঞ্চাশ একশো হাজার বন্ধু—আতিহাঁস পাতিহাঁস বালিহাঁস রাজহাঁস, পানকৌড়িরা সাত ভাই, তাদের গিন্নীবান্নী ছানাপোনা, হাঁড়িচাঁচা কাদাখোঁচার জ্ঞাত-গুষ্টি একশো ঘর, সখীসখী চখাচখী, মাছরাঙারা চোদ্দ বোন, দোকলাডাঙ্গার মাণিকজোড়, কাঁকড়াখালির বকবকীরা, বাস্তুঘুঘু, আস্তঘুঘু, সারসটিয়া, কাকাতুয়া, শুঁটকে পুঁটকে দেড়ে হেঁড়ে পিসে মেসো কুটুম কাটুম আর বুদ্ধিপোতার বুদ্ধু ভুতুম।

অনেকদিন বাদে দেখা। কাউকে চোখে-হাসি, কাউকে ঠোঁটে-হাসি, পাড়াপড়শীর হালচাল, ছানাপোনার ভূত-ভবিষ্যৎ, পোকামাকড়ের বাজার—এই সব নিয়ে এর সঙ্গে তার সঙ্গে একটা দুটো কথা, স্বাস্থ্যের খবরাখবর নেওয়া—এই করতে করতেই বেলা গেল গড়িয়ে। টিট্টিভ-বৌ অনেকক্ষণ থেকেই ছটফট করছিল। কিন্তু যতবারই বলতে গেছে ফেরার কথা, ততবারই হয় বুলবুলিদির ফড়িঙের ফরফরি খেতে খেতে আরামে টিট্টিভের চোখ বুজে এসেছে, কিংবা হাঁসমেসোর বাড়িতে পদ্মফুলের মুড়ি খেয়ে ভাবছে আর একটু চাইলে কেমন হয়, নয়ত ফিঙে-ভাগ্নীর নতুন পাতার বাসা দেখতে গিয়ে গল্পে মত্ত।

শেষকালে সূয্যি যখন পাটে বসল আর পানকৌড়িদের বড়-বৌ বিকেলের গা ধোয়া সেরে ডানা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল—আজ শ্যাওলা-দেওয়া গুগলি পোলাও রাঁধছি, সঙ্গে থাকবে কচিমাছের কচকচি আর দুধপোকার পায়েস। আজকের রাতটা থেকে যাও।—তখন টিট্টিভ আড়চোখে বৌয়ের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে বাধ্য হল—নূনাঃ, চলি।

সারাপথ দুজনের মধ্যে একটিও কথা হলনা। বাসার কাছ বরাবর আসতেই যেন কেমন কেমন মনে হল। তাড়াতাড়ি ডানা-চালিয়ে গিয়ে দেখল—

ভিজে বালির ওপর সমুদ্রের ফেনার দাগ—ডিম নেই!

ক্রমশঃ

অন্তু রায়
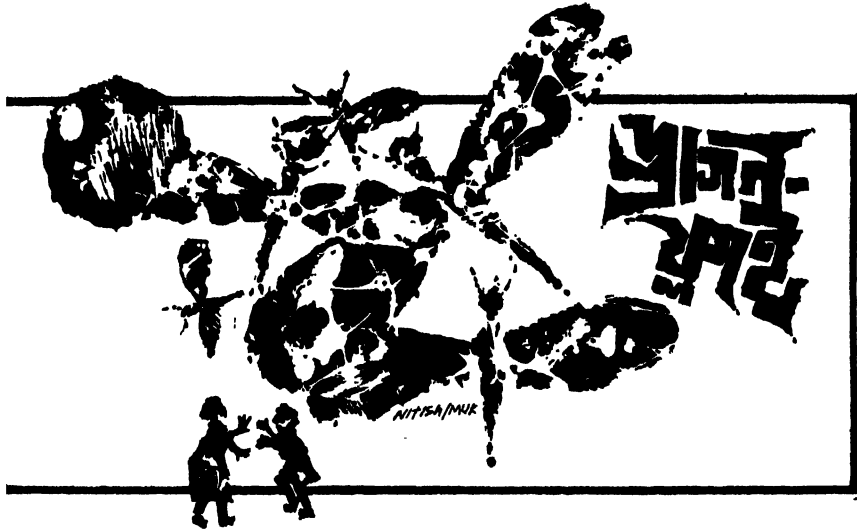
সকালবেলা দৈনিক প্রভাতী সংবাদপত্রটা নিয়ে সবে মাত্র বসেছি এমন সময় ফোন বেজে উঠল। সুনন্দ ফোন করছে—ওরা মাত্র গতকালই নাকি কলকাতায় ফিরেছে। আমার প্রতি আদেশ হোল যে সেদিনই বিকেলে ওর বাড়িতে হাজির হতে হবে—আড্ডা মারতে। অনেকদিন সে আড্ডা মারতে পারে নি।

সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম।

আমি জানতাম সুনন্দরা অর্থাৎ সুনন্দ এবং তার মামা নবগোপালবাবু দক্ষিণ আমেরিকার কোথায় জানি গিয়েছেন। সুনন্দ আমার স্কুলের বন্ধু। ও প্রাণিবিদ্যায় M.Sc. পাশ করে প্রোফেসর নবগোপালবাবুর অধীনে গবেষণা করছে। নবগোপালবাবু একজন বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী। অবশ্য আরও নানান বিষয়েও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। চিরকুমার নবগোপালবাবুর সংসারে ঐ একমাত্র ভাগনে সুনন্দ ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। বালিগঞ্জে নবগোপালবাবুর নিজের বাড়িতে মামা ভাগনের বাস।

বিকেলে সুনন্দের বাড়ি হাজির হলাম। আমায় দেখেই পরম উল্লসিত সুনন্দ দুর্বোধ্য ভাষায় হড়বড় করে কিসব বকে যেতে লাগল। গালমন্দ করাতে আপত্তি জানালে সুনন্দ বলল, সে নাকি রেড-ইণ্ডিয়ান ভাষায় আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

গম্ভীর হয়ে জানাই যে ইণ্ডিয়ান হলেও আমি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কাজেই বাংলাতেই কথাবার্তা হোক।

ড্রইংরুমে ঢুকে জুৎ করে বসলাম আড্ডা জমাতে। একটুক্ষণ পরে হঠাৎ দেয়ালের গায়ে ঝোলানো একটা শো-কেসের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হোল। শো-কেসের মধ্যে পিচ-বোর্ডের ওপর

নীলচে পাখাওয়ালা ইঞ্চিতিনেক লম্বা মস্ত একটা ফড়িং পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে। এটা আবার কোত্থেকে এল—আগেতো দেখিনি!

সুনন্দকে জিজ্ঞেস করি—'কি ব্যাপার। রেড ইণ্ডিয়ান কায়দায় ঘর সাজানো হয়েছে বুঝি?'

সুনন্দ বেশ চটে গেল। বলল, 'আজ্ঞে না। এটা একটি স্মৃতিচিহ্ন। জেনে রাখ এদের কৃপাতেই সেদিন প্যাম্পাসের তৃণভূমিতে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা পেয়েছিল। আর এদের কল্যাণে কিছু অর্থ প্রাপ্তিও ঘটে গেছে।'

—'তার মানে?' আমি এবার অথৈ জলে। 'দয়া করে খুলে বল।'

সুনন্দ ফড়িংটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওটা কি বলতো?'

—'ফড়িং।'

—'হুঁ। ড্রাগন-ফ্লাই'।

—'আরে ব্বাপ। সে আবার কি?' আমার তো পিলে চমকানোর জোগাড়।

সুনন্দ আশ্বাস দেয়, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই বন্ধু। নামটা রাক্ষুসে হলেও এগুলো একজাতের বড় ধরনের ফড়িং-ই। নেহাতই নিরীহ। ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর আরও অনেক জায়গাতেই এদের পাওয়া যায়। বোধহয় লক্ষ্য করে থাকবি এই বাংলাদেশে বৃষ্টির ঠিক আগে বা পরে এই রকম ফড়িং ঘাসবনে ফরফর করে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। অবশ্য আমাদের দেশে এতবড় 'ড্রাগন-ফ্লাই' সাধারণতঃ দেখা যায় না। দু-জোড়া পাতলা ঝিল্লিযুক্ত পাখাওয়ালা এই জাতীয় ফড়িংকে ইংরেজীতে 'ড্রাগন-ফ্লাই' বলে।'

অধৈর্য হয়ে ওকে থামিয়ে দিই—'বুঝেছি, আপাতত: ফড়িংএর ওপর লেকচার বন্ধ রেখে ঐ, প্রাণরক্ষা আর অর্থপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কি যেন বলছিলি, সেটা খোলসা কর।'

সুনন্দ বলে 'ঠিক আছে, ঠিক আছে তাই বলছি। তা তোরা হলি শহরের ছেলে। জীবজন্তু সম্বন্ধে ধারণা কম। তাই 'ড্রাগনফ্লাই' সম্পর্কে একটু প্রাথমিক জ্ঞান বিতরণ করলাম। নে চা খা, আরম্ভ করছি।'

ইতিমধ্যে দুজনের সামনে ধুমায়িত চা পরিবেশন করা হয়েছিল। চা-য়ে এক চুমুক মেরে সুনন্দ তার কাহিনী আরম্ভ করল।

বোধ হয় জানিস আমরা দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টাইনায় গিয়েছিলাম। আর্জেণ্টাইনার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত সুবিস্তীর্ণ তৃণভূমির জীব-জন্তু নিয়ে গবেষণা করাই ছিল মামাবাবুর উদ্দেশ্য। ঐ তৃণভূমির নাম 'প্যাম্পাস'। পূর্বে 'প্যারানা' নদীর কিছু পর হতে আরম্ভ করে পশ্চিমে 'আণ্ডিস' পর্বতমালার প্রায় পাদদেশ পর্যন্ত এবং উত্তরে ৩০ ডিগ্রী অক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে'কলোরড' নদি অবধি প্রায় দশ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এই প্রেয়ী জাতীয় তৃণভূমি অঞ্চলে নানান বিচিত্র পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গের বাস। কিছুদিন আগে মামাবাবু একবার এই অঞ্চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সময়ের অভাবে সেবার নাকি ভাল করে অনুসন্ধান করতে পারেন নি।

আমরা জাহাজে চড়ে আর্জেনটাইনার রাজধানী বুয়েনস্ এয়ার্সে এসে হাজির হলাম। এখানে দিন তিনেক কাটালাম একটা হোটেলে। মামাবাবুর এখানে পরিচিতের সংখ্যা বড় কম নয়। বিশেষতঃ তাঁর পুরোন বন্ধু খনিজ ব্যবসায়ী মিঃ এণ্ডারসন-তো রয়েছেনই।

এখান থেকে একটা বড় স্টেশন-ওয়াগন ভাড়া করে তাতে নানা রকম জিনিসপত্র বোঝাই করে আমরা প্যাম্পাসের দিকে যাত্রা করলাম। তৃণভূমিতে ঢোকবার ঠিক মুখে একটা ছোট গ্রামে এসে থামলাম। এখানে একটা সরাইখানায় আমাদের কিছু মালপত্র জমা রেখে, তাঁবু, খাবারদাবার, জীবজন্তু ধরার জাল ও গবেষণার দরকারী কাগজপত্র ও যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে সেই মোটরে করেই আমরা প্যাম্পাসের অভ্যন্তরে যাত্রা করলাম।

এছাড়াও আমাদের সঙ্গে ছিল মামাবাবুর নিত্যসঙ্গী রাসায়নিক গবেষণার প্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র ভরা একটি ছোট বাক্স।

আমরা তিনজন—আমি, মামাবাবু আর টমাস। টমাস মামাবাবুর পূর্বপরিচিত ঐ অঞ্চলের আদিবাসী, গুয়াচো সম্প্রদায়ভুক্ত রেডইণ্ডিয়ান। অতি বিশ্বস্ত ও সাহসী সহচর। ওই ছিল আমাদের ড্রাইভার। আর তার ওপরে যা রান্নার হাত কি বলব!

প্যাম্পাসের ভিতরে প্রায় পঞ্চাশ মাইল ঢুকে গিয়ে পথচারীদের জন্য খোঁড়া একটা কূপের পাশে আমাদের তাঁবু পড়ল। গ্রীষ্মকাল, প্রায় সমস্ত তৃণভূমি ৭।৮ ফুট লম্বা শুষ্ক শ্বেততৃণদ্বারা আচ্ছাদিত। মাঝে মাঝে বাবলা জাতীয় একপ্রকার কাঁটা ঝোপ।

জনহীন সুবিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চল। মাঝে মধ্যে কেবল আদিবাসী রেডইণ্ডিয়ান জাতীয় 'গুয়াচো'রা ঘোড়ায় চড়ে প্যাম্পাসের মধ্যে শিকার করতে আসে। তবে রক্ষে যে একমাত্র পুমা ছাড়া হিংস্র জন্তু নেই বলে এই নির্জনে থাকতে আমাদের বিশেষ ভাবনা হচ্ছিল না।

সারাদিন দুর্লভ জীবজন্তু কীট-পতঙ্গের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকতাম। কোনো কোনো দিন আমি আর মামাবাবু একসঙ্গে বেরোতাম। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই আমরা আলাদা আলাদা বেরিয়ে পড়তাম।

পিঠে একটা থলিতে নিতাম খাবার আর জল। হাতে পাখি বা কীটপতঙ্গ ধরবার জাল। গলায় ঝোলাতাম বায়নকুলারটা আর কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে এক এক দিন এক এক দিকে বেরিয়ে পড়তাম। অবশ্য কম্পাস আর দু-একটা গবেষণার দরকারী জিনিসও সঙ্গে থাকত।

সারাদিন ঘুরতাম। কোনো একটা ঝোপের মধ্যে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিতাম। তারপর তাঁবুতে ফিরতাম বিকেলে, সূর্য ডোবার ঠিক আগে। মামাবাবুও ঐ সময়ে ফিরতেন। দুজনে সারা-দিনের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রহ নিয়ে খানিক আলোচনা করতাম, আর তখন নিজের তাঁবুর সামনে টমাস আগুন জেলে রাতের খাবার তৈরি করত।

এরপর খাওয়া ও শোওয়া। আমি খেয়েই শুয়ে পড়তাম, কিন্তু মামাবাবু মাঝে মাঝে রাত জেগে কি সব আঁকা-জোঁকা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। ঐ সময়ে বুঝতাম তিনি একা থাকতে চাইছেন। কারো সঙ্গ তখন তিনি পছন্দ করতেন না।

এক এক দিন অনেক রাত অবধি চোখে ঘুম আসত না। আমাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা পাশাপাশি তিনটি তাঁবু। নিজের তাঁবুতে নিদ্রাহীন চোখে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম। সুদূর বাংলাদেশ—বন্ধু বান্ধব, পরিচিতদের কথা মনে হত। কোথায় সেই কলকাতার আড্ডা হৈ চৈ ছেড়ে এই তেপান্তরের মাঠের মাঝে পড়ে আছি। সবটাই কিরকম অবিশ্বাস্য অবাস্তব মনে হত! তাঁবুর দরজা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতাম।

তখন শুক্লপক্ষ চলছে জ্যোৎস্নাস্নাত শ্বেতশুভ্র দিগন্ত বিস্তৃত সীমাহীন তৃণভূমি। মৃদু মৃদু বাতাসে ঘাসবনের স্বল্প আন্দোলন—রহস্যের কুহক রাতের মায়ায় মগ্ন হয়ে যেতাম। মনে হত কোন রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছি।

মামাবাবুর তাঁবু থেকে মাঝে মাঝে নস্যি নেওয়ার আওয়াজ ও সজোর হাঁচির শব্দ পাওয়া যেত।

ক্রমে চোখে ঘুম নেমে আসত।

এইভাবে দিনসাতেক কেটে গেছে। সেদিন সন্ধ্যার সময় দৈনিক পরিভ্রমণ সেরে এসে আমরা তাঁবুর বাইরে বসে আছি। বেশ গরম আর গুমোট। ক্লান্ত দেহে কথাবার্তা বলছি আর মাঝে মাঝে মাংসের হাঁড়ি নিয়ে ব্যস্ত, টমাসের কাছ থেকে ভেসে আসা অপূর্ব সুগন্ধের আঘ্রাণ নিচ্ছি……এমন সময় হঠাৎ খুব কাছে দুটো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। ভাবলাম হয়ত দুজন ইণ্ডিয়ান শিকারী তৃষ্ণা উপশমের উদ্দেশ্যে আমাদের তাঁবুতে আসছে।

দ্রুত দুজন অশ্বারোহী তাঁবুর কাছে এসে থামল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ে তারা রান্নার আগুনের পাশটাতে এসে দাঁড়াল। তাদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম—এরা আবার কারা! স্থানীয় লোক তো নয়।

দুজনেরই গুণ্ডা প্রকৃতির চেহারা। একজন বেজায় ঢ্যাঙা। ছোট ছোট ধূর্ত চোখ আর মাঝখানে খাঁড়ার মত নাকটা। সঙ্গিটা মোটা ও বেঁটে। গোল গোল রসগোল্লার মতন চোখ দুটোতে বোকা বোকা ভাব। দুজনেরই চুল কদমফুলের মত ছোট করে ছাঁটা! আর দুজনেরই কোমরে মোটা বেল্ট এবং হাতে উদ্যত রিভলবার! আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ঢ্যাঙা লোকটা স্প্যানিশ ইংরেজীর খিচুড়ি ভাষায় কর্কশ গলায় হুঙ্কার ছাড়ল, 'খবরদার কেউ নড়বে না। বেয়াদপি দেখলেই মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। শয়তানের শপথ।'

টমাসকে বলল, 'তুই এখানে এসে দাঁড়া।' বলে আমাদের পাশটা দেখিয়ে দিল।

টমাস আধসিদ্ধ মাংসটা ছেড়ে আসতে একটু ইতস্ততঃ করায় বিষম এক তাড়া লাগাল। টমাস নিরুপায় হয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। লোক দুটোকে কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি বলে মনে হল।

ঢ্যাঙা মোটাকে হুকুম করল, 'এদের সঙ্গে কোন পিস্তল টিস্তল আছে কিনা দেখে নে।'

মোটা লোকটা তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করল। আমাদের সঙ্গে অবশ্য তখন কোন অস্ত্র-টস্ত্র ছিল না।

ঢ্যাঙা ফের মোটাকে আদেশ দিল—'তুই চটপট তাঁবুগুলোর ভিতরটা খুঁজে আয়।'

মোটা তাড়াতাড়ি তাঁবুর দিকে চলে গেল, আর ঢ্যাঙাটা রিভলবার বাগিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

মামাবাবু এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, এইবার কথা বললেন—'কি ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ঢ্যাঙা খেঁকিয়ে উঠল, 'আমরা ম্যাপটা চাই। বুঝলে হে। ভালয় ভালয় বের করে দাও, নইলে······।'

'ম্যাপ কিসের?' মামাবাবু আকাশ থেকে পড়ল।

'সোনার খনির ম্যাপ। প্যাম্‌পাসের মধ্যে যে সোনার খনি আছে তার।' উত্তেজনায় ঢ্যাঙা বাঁ হাত দিয়ে শূন্যে একটা ম্যাপ আঁকার চেষ্টা করে।

মামাবাবু আরও অবাক হলেন 'প্যামপাসে সোনা। আশ্চর্য! দেখুন আপনারা ভুল করছেন। আমরা সোনার খবর রাখি না। জীব-জন্তু নিয়ে গবেষণা করতে এসেছি।'

ঢ্যাঙা খিঁচিয়ে উঠল, 'বটে বটে শুধু জীব-জন্তু। আমাদের বোকা ঠাউরেছিস, গিরগিটি ধরবার জন্যে এই মাঠের মাঝে পড়ে রয়েছিস? আমরা সব খবর রাখি। প্যাম্‌পাসের মধ্যে তোরা সোনার খনির খোঁজ পেয়েছিস।'

এমন সময় মোটা লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বলল—'কোথাও পেলাম না। অনেক খুঁজলাম।' শুনে ঢ্যাঙার মুখ চোখ ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল।

সে মোটাকে বলল, 'তুই দাঁড়া, এবার আমি দেখছি।'

মোটা গুণ্ডাটা রিভলবার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর ঢ্যাঙা আমাদের জামা-প্যান্টের সব পকেট-গুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। এমনকি জুতোর মধ্যে দেখতেও ছাড়ল না। কিন্তু ম্যাপ-ট্যাপ কিছু মিলল না।

ঢ্যাঙা এবার ক্রোধে আগুন হয়ে চীৎকার করতে লাগল—'ভাল চাসতো ম্যাপ বের করে দে, হতভাগা ভারতীয় জোচ্চর। আর আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। ম্যাপ না মিললে প্যাম্‌পাসের জন্য তিনটে মৃতদেহ উপহার দেব, আর তারপর সমস্ত তৃণভূমি খুঁড়ে ফেলব, দেখি সোনা পাই কিনা।'

হঠাৎ মনে পড়ল লোকদুটোকে বুয়েনস্‌-এয়ার্সে আমাদের হোটেলের কাছে দু-একবার দেখে-ছিলাম বটে। একবার নাকি আমার হোটেলের রুম-বয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে—আমরা কোথায় যাচ্ছি, কি করতে যাচ্ছি এই সব খবর জিজ্ঞেস করেছিল। আমি অবশ্য জানতে পেরেও ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব দিইনি।

মামাবাবু নির্বিকার হয়ে আগুনের দিকে চেয়ে আছেন। এক একটা মুহূর্ত অতিক্রান্ত হচ্ছে আর দু দুটো উদ্যত রিভলবারের দিকে চেয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। কি ম্যাপ! সোনাই বা কোত্থেকে এল, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। নিস্পন্দ 'প্যাম্‌পাস'। মৃদু চাঁদের আলোয় স্বল্পালোকিত তৃণভূমিতে

মৃত্যুশীতল নীরবতা। মামাবাবুর ওপর বেজায় রাগ হচ্ছিল। সত্যি যদি সোনার ম্যাপ থাকে তো দিয়ে দিন না। শেষে কি টাকার লোভে প্রাণটা খোয়াবেন।

ঢ্যাঙা গুণ্ডাটা আবার হুঙ্কার ছাড়ল, 'আর পনোর মিনিট।'

সহসা কেমন একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ ভেসে এল পিছনে তাঁবুগুলোর দিক থেকে। তারপরেই আকাশ ছেয়ে বিরাট এক ফড়িংএর ঝাঁক উড়ে এল মাথার ওপর দিয়ে। ভীষণ বেগে ফড়িংগুলো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উড়ে চলে গেল। কিন্তু বেশ কিছু ফড়িং আমাদের জামা কাপড়ে এসে অবতীর্ণ হোল। মনে হোল মস্ত একটা কাল মেঘ ভেসে গেল মাথার ওপর দিয়ে আর তার থেকে যেন আচমকা এক পশলা ফড়িং বৃষ্টি হয়ে গেল আমাদের ওপর। মস্ত বড় বড় এক জাতের ড্রাগন-ফ্লাই। ওগুলোরই একটা ঐ শো-কেসে সাজানো রয়েছে।

আমরা এবং গুণ্ডা দুজন প্রাণপণে জামা কাপড় থেকে ফড়িংগুলো ছাড়াতে লাগলাম। সহজে কি আর ফড়িং-মুক্ত হওয়া যায়। দারুণ ভাবে ওগুলো লম্বা লম্বা ঠ্যাং দিয়ে আমাদের জামা কাপড় আঁকড়ে ধরেছিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় গুণ্ডা দুটোর মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল। এক হাতে ফড়িং ছাড়াতে ছাড়াতে মোটা ষাঁড়ের মত হাঁকতে লাগল—'ইস্, জঘন্য জায়গা। এই হতভাগারা আর দশ মিনিট, তারপর এই পাপের ফল ভোগাচ্ছি।'

মামাবাবু হঠাৎ একটা ফড়িং তুলে ধরলেন। তারপর গুণ্ডা দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন—'এগুলো কি ফড়িং বলতে পারেন? বেশ বড় বড়তো? আর এমন দল বেঁধে উড়ে যাওয়ার মানেই বা কি? ভারি আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু!'

তাই শুনে দুজনে রাগে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। ঢ্যাঙা মুখ বিকৃত করে বলে ওঠে, 'বটে রসিকতার আর সময় পেলি না—কি ফড়িং। খুব মজার খেল্। প্রাণে বহুৎ রস আছে তো।'

মামাবাবু কিন্তু নিরীহ স্বরে আবার প্রশ্ন করেন, 'আমি জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করি কিনা তাই। তা আপনারা ফড়িংএর ঝড়ের কথা কিছু জানেন না। সত্যি?'

টমাস এই সময় মৃদুস্বরে কি জানি বলতে গেল। মামাবাবু তাকে এক ধমক দিলেন—'চুপ।' টমাস তৎক্ষণাৎ ভাবলেশহীন মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঢ্যাঙা এদিকে তেড়েফুড়ে উঠল, 'আলবাৎ জানি না। আর সাত মিনিট। তারপর প্রাণভরে গবেষণা করিস। অনন্তকাল ধরে সময় পাবি।'

মামাবাবু আনমনে কি জানি একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'দেখুন, যদি এক টিপ নস্যি নিইতো আপত্তি আছে? যা বিপদে পড়েছি, মগজটা সাফ করা একান্ত দরকার।' এই বলেই বুক পকেট থেকে তাঁর নস্যির ডিবাটা বের করলেন। হরিণের সিঙের বেশ বড় নস্যির কৌটা।

মোটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, 'খবরদার, কোন চালাকির চেষ্টা যদি করেছিস তো আর আস্ত রাখবনা বলছি।'

মামাবাবু শশব্যস্ত হল—'না না, কোনো চালাকি নেই, কেবল এক টিপ নস্যি···।' এই বলে নস্যির কৌটাটা খুলে ফেললেন ; তারপর বললেন, 'যাঃ, নস্যিটা দেখছি একদম জমে গেছে।' এই বলে বাঁ হাতের তালুতে সমস্ত নস্যি ঢেলে ফেললেন। অনেকখানি নস্যি প্রায় একমুঠো হবে। তারপর তিনি ডানহাতের দু-আঙুলে এক টিপ নস্যি নিয়ে নাকে গুঁজে দিলেন। দু'টো প্রচণ্ড হাঁচলেন, অতঃপর গুণ্ডা দুজনের দিকে ফিরে বললেন—'তা হলে সত্যিই আপনারা ম্যাপ না নিয়ে ছাড়বেন না ?'

দুজনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মোটা ঘোঁৎ করে উঠল, 'এবার বাবা পথে এস। তোর নস্যির গুণ আছে দেখছি।'

মামাবাবু করুণ মুখ করে বললেন, 'কিন্তু আমিতো ম্যাপ এখনো তৈরি করি নি, করব ভাবছিলাম।'

মনে মনে মামাবাবুর ওপর খুব রাগ হোল। উঃ, সত্যি তাহলে সোনার খবর জানেন। আর এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। ভাগ্যিস এখন সুবুদ্ধি হয়েছে।

ঢ্যাঙা বললে, 'কুছ পরোয়া নেই। জায়গাটার হদিস দিয়ে দাও খুঁজে নেব। তবে হ্যাঁ, চালাকি যদি করেছো তো···।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে মামাবাবু বললেন, 'আমরা ছাড়া পাব তো ?'

'হ্যাঁ জরুর, বলে দিলেই পাবে।' ঢ্যাঙা আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না।

মামাবাবু চকিতে একবার পিছন ফিরে তাঁবুর দিকে তাকিয়ে নিলেন। মনে হোল কান পেতে কি জানি শোনবার চেষ্টা করলেন। তারপরেই ডানহাত দিয়ে জামার বুক-পকেট থেকে একটা ছোট পাথুরে ঢেলা বের করলেন। হাত বাড়িয়ে গুণ্ডা দুটোর দিকে ঢেলাটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'দেখুন এটা চিনতে পারেন। আকরিক সোনা।'

ঢ্যাঙা আর মোটা পরম আগ্রহে হাত বাড়াল।

ওরা কিন্তু ভারি হুঁসিয়ার। ঢ্যাঙা প্রথমে ঢেলাটা পরীক্ষা করল, মোটা আমাদের দিকে রিভলবার বাগিয়ে ধরে থাকল। তারপর মোটা পরীক্ষা করল আর ঢ্যাঙা তাক করে রইল। দুজনেই মাথা নেড়ে সায় দিল—হ্যাঁ, সোনার আকরই বটে।

ছোট্ট একটা আগ্নেয়শিলার টুকরো। চকচক করছে। সোনা আছে বেশ বোঝা যায়।

লক্ষ্য করছিলাম মামাবাবু এই সময় একমনে কি জানি শোনবার চেষ্টা করছিলেন। আমারও হঠাৎ মনে হোল বহুদূরে আমাদের পিছন দিক থেকে কেমন একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ ভেসে আসছে। ঘাস বনে জোরে হাওয়া দিলে যেমন হয়।······

মামাবাবু চকিতে আবার যেন সজাগ হয়ে উঠলেন। তাঁর কথাবার্তা কাণ্ডকারখানা কি রকম আমার অদ্ভুত ঠেকছিল। সহসা তিনি বুক পকেট থেকে তাঁর ঝর্ণা কলমটা খুলে নিলেন। তারপর কি এক কায়দায় কলমটার ওপরের দিকে চাপ দিতেই মাথার দিকটা গেল খুলে। মাটির ওপর খোলা দিকটা উপুড় করে ধরলেন আর অমনি ভিতর থেকে কতকগুলো ছোট্ট ছোট্ট ধাতুর টুকরো ঝরে পড়ল মাটিতে।

তখন তিনি একটি টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ডানহাতের দু-আঙুলে তুলে ধরে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন—'ভাল করে দেখুন একটি সোনার টুকরো। আর এই সোনা আমি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বের করেছি ঐ আকর থেকে। এখন এই আবিষ্কারের জন্য কিছু ভাগ আশা করা কি আমার অন্যায় হবে? বলুন আপনারা?'

আগুনের আভায় হলদে সোনার টুকরোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গুণ্ডা দুজনের চোখও লোভে উঠল জ্বলে। দুজনেই কাছে এগিয়ে এল।

মামাবাবু আবার কণ্ঠস্বরকে আরও কয়েকপর্দা উঁচুতে তুলে চীৎকার করে উঠলেন। এত জোরে কথা বলাটা আমার কাছে একটু অস্বাভাবিক ঠেকল।

—'ভাল করে দেখুন খাঁটি সোনা। আমার অনেক কষ্টের ফল।'

দু জোড়া চোখ আরও কাছে এগিয়ে এল।

আবার কানে এল সেই সাঁ সাঁ আওয়াজটা। মনে হোল খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ দেখলাম মামাবাবুর নস্যিভর্তি বাঁ-হাতের মুঠোটা একটু একটু করে ওপরে উঠছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঠাণ্ডা ঝোড়ো দমকা বাতাস প্রবল বেগে, চারদিক লণ্ডভণ্ড করে আমাদের ওপর এসে পড়ল। ঝড়টা এগিয়ে এল আমাদের পিছন দিক থেকে অর্থাৎ গুণ্ডা দুটোর সামনা সামনি। মুহূর্তে মামাবাবুর বাঁ-হাতের মুঠোটা আততায়ী দুজনের মুখের সামনে খুলে গেল আর অমনি হাতে ধরা সমস্ত নস্যিটা বাতাসের বেগে লোক দুটোর চোখ-মুখের ওপর উড়ে গিয়ে পড়ল।

বিকট চীৎকার করে দু-হাতে মুখ ঢেকে দুজনেই মাটিতে বসে পড়ল আর আমরাও তৎক্ষণাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ঝড়ের বেগ মিনিট দশেক পরে কমে গেল। লোক দুটো তখন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে সমানে চেঁচাচ্ছে, চোখ রগড়াচ্ছে এবং গালাগালি দিয়ে আমাদের চতুর্দশ পুরুষকে উদ্ধার করছে। মামাবাবু ইতিমধ্যে একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর পা তুলে জুৎ করে বসেছিলেন। তিনি তাদের সম্বোধন করে বললেন—'মহাশয়রা খুব সম্ভব স্থানীয় অধিবাসী নন?'

'না। তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে?' ঢ্যাঙার তেজ তখনও কমেনি।

'তা ক্ষতি একটু হয়েছে বৈকি। আচ্ছা আপনাদের ভাষা ও উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে মহাশয়রা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিবাসী? কেমন ঠিক বলিনি?'

'হুম্ জ্যামাইকান।' মোটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

'তা বেশ। যাহোক, প্যাম্পাসে ড্রাগন ফ্লাইএর ঝড়ের রহস্য না জানার জন্য আপনাদের আর এ যাত্রায় সোনার ম্যাপ মিলল না বলে, দুঃখিত।'

উনি এবার আমার দিকে ফিরলেন—'কি, ঝড়ের বৃত্তান্ত জান না কি?'

মাথা নাড়লাম—'না।'

'বেশ তবে শোন।' এই বলে মামাবাবু আমাদের তিনজনের দিকে উৎসাহিত দৃষ্টিতে তাকালেন

(টমাস ততক্ষণে আবার মাংসের হাঁড়ি নিয়ে ব্যস্ত)। অতঃপর একটিপ নস্যি নিয়ে সজোরে গোটা দুই হাঁচলেন। ইতিমধ্যে তাঁর বন্দী শ্রোতা দুজন স্প্যানীশ ইংরেজীর খিচুড়ি ভাষার তোড় ছুটিয়ে দিল—তাদের আপাততঃ এই অসম্মানজনক বন্ধনদশার প্রতিবাদে।

শ্রোতাদের অমনোযোগিতায় অসন্তুষ্ট মামাবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হোল। ডান হাতের তর্জনী উত্তোলন করে ধমক লাগালেন—'আঃ, চুপ। আমায় বলতে দিন।'

এই কড়া মাস্টারের মেজাজে ভীত হয়ে অথবা ফড়িং ঝড়ের রহস্য জানবার আগ্রহে, যে কারণেই হোক না কেন তারা এবার মুখ ছোটান ক্ষান্ত দিয়ে চুপচাপ মামাবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। যেন ক্লাশে লেকচার দিচ্ছেন এমনি ভঙ্গিতে মামাবাবু বলতে আরম্ভ করলেন—

'প্যাম্‌পাসে মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা উত্তর পশ্চিম বায়ুর স্বল্পস্থায়ী ঝড় ওঠে। এর নাম এদেশে 'প্যাম্‌পেরো'। ঝড়ের পূর্বে আকাশে মেঘের সঞ্চার হয় না তাই ঝটিকার আগমন হয় নিঃশব্দে প্রচণ্ড বেগে। নীলচে রঙের এই জাতীয় ফড়িং বা 'ড্রাগন-ফ্লাই'এর ঝাঁক হোল এইরকম ঝড়ের অগ্রদূত। ঝড়ের আগে আগে এরা ধেয়ে চলে বোধহয় পশ্চাদ্ধাবমান ঝড়ের কবল থেকে বাঁচবার আশায়। ফড়িংএর ঝড়ের মিনিট দশেকের মধ্যেই আসল ঝড়ের আবির্ভাব হয়। এটা হচ্ছে প্যাম্‌পাসের আবহাওয়ার সম্পূর্ণ নিজস্ব এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট। আমি আগের বার এই অঞ্চলে এসে এই 'প্যাম্‌পেরো' সম্বন্ধে অবহিত হই, আর তাই ফড়িংএর ঝাঁকের আগমন দেখেই পশ্চাদ্ধাবনকারী ঝড়ের সম্ভাবনায় মুঠো ভরা নস্যি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। যতক্ষণ না ঝড়টা এসে পড়ে ততক্ষণ এই অতিথি দুজনকে আমার সোনা আবিষ্কারের খবরাখবর দিয়ে কালক্ষেপ করছিলাম আর উন্মুখ কান পেতে ছিলাম ত্রাণকর্তা পবনদেবের আবির্ভাব শোনার আশায়।'

মামাবাবু এইবার টমাসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমিতো বাপু আর একটু হলে বলেই ফেলেছিলে আর কি।' টমাস লজ্জিত ভাবে একটু হাসল।

পরদিন সকালেই আমরা তাঁবু গুটোলাম। বন্দী দুজনকে সঙ্গে নিয়ে তৃণভূমির নিকটে যে গ্রামে আমাদের জিনিসপত্র রেখে এসেছিলাম সেখানে উপস্থিত হলাম।

মামাবাবুর সঙ্গে স্থানীয় পুলিস ইনস্পেকটরের কি জানি কথাবার্তা হোল। সেদিন দুপুরে ইনস্পেকটর সাহেব আমাদের কাছে নেমন্তন্ন খেলেন। প্রচুর চর্ব্য চোষ্য গলাধঃকরণ করে তিনি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। এর ওপর আবার মামাবাবুর প্রদত্ত গোটা কয়েক দামী উপহারও পকেটস্থ করলেন। মোটকথা মামাবাবুর সঙ্গে তার বেজায় খাতির জমে গেল। তারপর বন্দীদের ইনস্পেক্টরের জিম্মায় রেখে দিয়ে জিনিষপত্র সব সঙ্গে নিয়ে আমাদের মোটর পরদিন সকালে বুয়েনস্ এয়ার্সে যাত্রা করল।

পথে কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে মামাবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম 'আচ্ছা মামাবাবু সোনার ব্যাপারটা কি সত্যি ?'

মামাবাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান—'তা সত্যি বটে। আগের বার যখন এখানে আসি তখন

একজন স্থানীয় 'গুয়াচোর' কাছে কয়েকটা আকরিক সোনার পাথুরে ঢেলা দেখতে পাই। লোকটা বলে প্যাম্পাসের মধ্যে এক জায়গায় সে এই চকচকে পাথরগুলো কুড়িয়ে পেয়েছে। দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এইগুলি প্রচুর পরিমাণ সোনা মিশ্রিত একপ্রকার আগ্নেয় শিলা। তা সেবার হাতে সময় না থাকায় অনুসন্ধান করতে পারিনি। কেবল মোটামুটিভাবে যেখান থেকে পাথরগুলো কুড়িয়ে পেয়েছে সেই জায়গাটার একটা আন্দাজ নিয়ে ফিরে যাই। এবার ভেবে রেখেছিলাম জায়গাটা খুঁজে বার করব। পরীক্ষা করেছি, জায়গাটাতে সত্যিই একটা সোনার খনি রয়েছে।'

'কিন্তু গুণ্ডা ছুটো জানল কি করে?'

'আরে বুয়েনস্‌-এয়ার্সে একটা রেস্তোরায় বসে এণ্ডারসনকে ব্যাপারটা বলছিলাম, তখন পাশের টেবিলে ওরা বসে ছিল। মাতাল ভেবে খেয়াল করিনি, ব্যাটারা কিন্তু সব শুনেছিল। আর তারপর থেকে সমানে পিছনে লেগেছিল। ডুবিয়ে দিয়েছিল আর কি, ভাগ্গিস সময়মত ফড়িংএর ঝড়টা এল। বাঁচার উপায়টাও তখন চট করে মাথায় খেলে গেল, নইলে ভেবে কোন কূল কিনারা করতে পারছিলাম না?'

'কিন্তু ম্যাপ?'

'হয়ে গেছে। এই কলারের মধ্যে আছে।' মামাবাবু তাঁর জামার কলারে ছুবার টোকা মারলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'লোক ছুটোর কি করলেন?'

'ওঃ, থানায় জমা দিয়ে দিলাম, গুণ্ডামীর অপরাধে। ইন্‌স্পেক্টর বলেছেন তিনি ওদের উত্তম শিক্ষা দিয়ে দেবেন। তাঁর এলাকায় গুণ্ডামী করে এত বড় সাহস! আর এই শিক্ষা দান করতে অন্ততঃ তিনদিন সময় লাগা উচিত বলে তিনি মনে করেন। অবশ্য ঐ তিনদিন সময়টা আমারই সাজেস্‌সন। কারণ আমাদের কার্যোদ্ধারের জন্য তিনদিন সময়ই যথেষ্ট।

সেইদিন সন্ধ্যায় বুয়েনস্‌-এয়ার্সে পৌঁছলাম পরদিম মামাবাবু সমস্তদিন ব্যস্ত থাকলেন। খুব ঘোরাঘুরি করলেন। আর সেইদিন রাত্রিতে আমরা ছুজন কলিকাতা গামী প্লেনে চড়লাম।

প্লেন যখন আকাশে উঠেছে মামাবাবু আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন—'মাত্র পাঁচ-হাজার ডলারে ম্যাপটা এণ্ডারসনকেই বিক্রী করে দিলাম, বুঝলে। হাজার হোক বন্ধু লোক। কি বল? আর এতক্ষণে ওর ম্যাপে নির্দিষ্ট জায়গাটা ইজারা নেবার সব বন্দোবস্তও আশা করি কম্‌প্লিট হয়ে গেছে।'

দেখলাম মামাবাবু জামার বুক পকেট থেকে অতি সন্তর্পণে একটি মৃত 'ড্রাগন-ফ্লাই' বের করলেন। অর্ধনিমীলিত চক্ষে ফড়িংটির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন—'সবই এঁদের কৃপায়, বুঝলে সুনন্দ। সবই…… ।'

সুনন্দের বিবরণী শেষ হল।

আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সুনন্দের ডাকে আমার চমক ভাঙে, 'কিরে চা খেলি না, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।'

জবাব না দিয়ে শো-কেসটার দিকে তাকিয়ে থাকি।

পাঁচের পাঁচালি

অক্রূর চন্দ্র ধর

এক, দুই, তিন, চার, শ' হাজার লক্ষ,
মনে মনে গণে গণে কর প্রত্যক্ষ—
পাঁচ সংখ্যার মত কা'রো নাই শক্তি,
তাই তার প্রতি এত মানুষের ভক্তি!
জীবনের ধ্রুব, শুভ, যত কিছু আছে রে—
সবে চায় সবটায় ডেকে নিতে পাঁচেরে।
'পাঁচ রঙা' পাতা দিয়ে সাজাইয়ে মণ্ডপ,
'পঞ্চ বটীতে' করে 'পঞ্চাননের' স্তব।
'পঞ্চপ্রদীপ', ধুপ, ফলফুল সম্ভার
'পঞ্চোপচারে' পূজা ক'রে জগদম্বার।
নাম রাখে 'পাঁচ কড়ি' 'পাঁচ কাজ' সমাধান
ক'রে ও 'হাতের পাঁচ' রাখে হ'য়ে সাবধান।
'পাঁচ গাঁ' কলোনী থেকে এসে রোজ 'পাঁচু রায়'
হাওড়া আফিস ক'রে বাড়ি ফিরে 'পাঁচটায়'।
'পাঁচ প্রাণ' তাজা রেখে বাঁচায়ে সে 'পাঁচ ভুত'
রোগ শোক 'পাঁচটায়' ফাঁকি দেয় অদ্ভুত!
দেহে 'পাঁচ ইন্দ্রিয়' পাঁচ দিকে ধেয়ে যায়,
হাতে পায়ে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলী শোভা পায়।
মেয়েরা গলায় পরে 'পাঁচনরি' তারা হার
পাঁচের প্রভাব মুখে বলে শেষ করা ভার।
'পাঁচ ফোড়নের' গুণে রান্নাটা ভালো হয়,
তা' না হ'লে তেল, নুন, লঙ্কা সে কিছু নয়।
'পাঁচ বছরিয়া' পরিকল্পনা রাষ্ট্রের,
ভালো করে গড়ে দেশ করে ভাল কাজ ঢের!
পাঁচ বছরেতে হয় হাতে খড়ি শিশুদের
পাঁচ মাসে মুখে ভাত কি সুখের কি সুখের!

পাঁচ মিশেলী বনজ গাছ গাছড়ার রস
নিঙড়ে 'পাঁচন' খেলে হয় বহু রোগ বশ।
'পাঁচ-নদী' গড়ে দেয় পাঞ্জাব দেশটায়।
পাঁচ খানা গ্রাম চেয়ে, না পাইয়ে শেষটায়—
ধনমান গৌরব না করিয়া দান সব
মহারণে জয়ী হয় পাঁচ ভাই 'পাণ্ডব'!
'পাঁচ মহাদেশ' আজ পাঁচ মহা পারাবার
করে তোলে মনোহর যত কিছু ধরাটার
সংখ্যার মাঝে শুভ পাঁচের মত যে নাই
চল সবে 'পঞ্চমে' পাঁচের পাঁচালি গাই!

চুম্বক
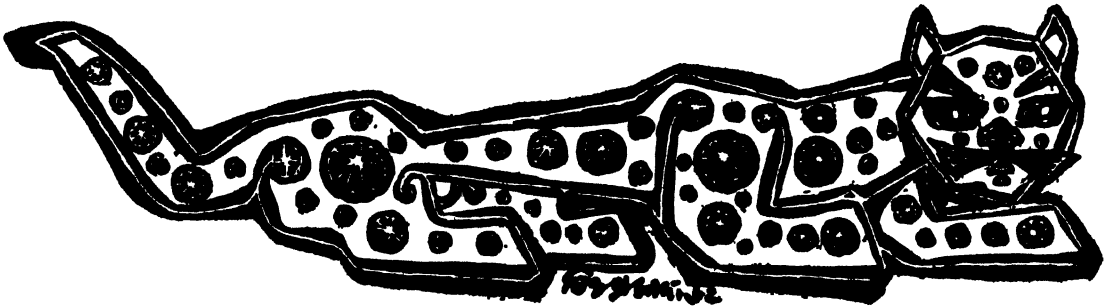
পিসিমা খোকা নিয়ে বেড়াতে আসছেন, সবাই তাই নিয়ে মশগুল, তাই ছ বছরের সোনা আর পাঁচ বছরের টিয়া রেগে মেগে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। পথে ঘড়িওলার সঙ্গে দেখা, সে তার কলের মাকুকে খুঁজে দিতে বলল। বনের মধ্যে মাকুকে খুঁজে পেয়ে সোনা ও টিয়া বটতলার হোটেলে এল। সার্কাস পার্টির সকলেই সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। রাত্রে হোটেল-ওলার জন্মদিনের ভোজ, রান্না-বান্না হচ্ছে। এদিকে মাকুকে পাওয়া যাচ্ছে না, ওদিকে সাত গাঁয়ের লোক খেলা দেখবে বলে টিকিট কিনে এসেছে। শেষে মাকুকে পাওয়া গেল, চাবি ফুরিয়ে সে নেতিয়ে পড়ে আছে! টিয়া পুঁটলি খুলে একটা গোলাপী কাঠি বের করে মাকুর মাথার ছ্যাঁদায় ঢুকিয়ে পাক দিয়ে দিল। বোতাম টিপে দিতেই মাকু উঠে বসল। কিন্তু সোনা-টিয়াকে সে আর চিনতে পারল না। ঘাস জমিতে কাতারে কাতারে লোক বসেছে। মাকু কত খেলা দেখাল। যাদুকর পরীদের রাণীকে নামিয়ে ঘটা করে মাকুর সঙ্গে তার বিয়ে দিল। গাঁয়ের লোক সাধুবাদ করে চলে গেল।

সবাই তখন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল।

(এগারো)

কারো মুখে কথা নেই, বসে আছে তো বসেই আছে, টিয়া একটু একটু পা নাচাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে ঘড়িওলা উঠে আবার বড় আলোটাকে জ্বেলে দিয়ে, সোনাকে বলল,

'তাহলে এবার তোমার কথা রাখো। মাকুকে কাঁদার কল দাও। রোজ ওর বিয়ে দেওয়া হবে, কাঁদার কল নইলে চলবে কেন।'

মাকুর মুখটা অমনি একটু খুসি খুসি মনে হল।

সোনা তার কাছে এসে ঘড়িওলাকে বলল,

'চাঁদি খোল।'

ঘড়িওলা মাকুর নাকের কল টিপে দিল। অমনি মস্ত একটা হাই তুলে মাকু ঘুমিয়ে কাদা। ঘড়িওলা মহাখুসি হয়ে ওর দু'কান ধরে কষে প্যাঁচাল। অমনি সুন্দর লালচে কোঁকড়া চুল সুদ্ধ মাথার খুলি কট করে, বাক্সের ঢাকনির মতো খুলে গেল। সবাই দেখল ভিতরের কলকব্জার মাঝে মাঝে ফাঁকা রয়েছে।

সোনা বললে, 'জল আনো।'

ততক্ষণে যে যার জায়গা ছেড়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, টিয়া ঠেলেঠুলে একেবারে ঘড়িওলার কোলে চেপেছে।

হোটেলওলা নিজের জলের গেলাস দিল।

সোনা পুঁটলি খুলে ফুটো জ্যামের টিন, কেরোসিন তেল ঢালবার ফোঁদল আর বাপির কাজের ঘর থেকে আনা রবারের নল বের করল।

তারপর কলকব্জার ফাঁকে সব চেয়ে উপরে জ্যামের টিন বসিয়ে, তার তলায় ফোঁদল দিয়ে, তার মুখে রবারের নল লাগিয়ে, নলের অন্য দিকটাকে মাকুর মুণ্ডুর ভিতরে দুই চোখের মাঝখানে গুঁজে দিল। তারপর গেলাসের জলটুকু টিনে ঢেলে, পট করে খুলির ঢাকনি বন্ধ করেই, মাকুর নাকের টিপকল টিপে দিল।

অমনি ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে মাকুও কেঁদে ভাসিয়ে দিল। দু'চোখ দিয়ে টপ টপ করে করে জল পড়ছে তো পড়ছেই; গালের নতুন লাগানো লাল রঙ ধুয়ে গড়াচ্ছে; সার্টের বুক, কোটের কলার ভিজে সপসপ করছে। যতক্ষণ না জ্যামের টিনের তলার ফুটো দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে সব জল বেরিয়ে টিন খালি হয়ে গেল, ততক্ষণ মাকুর কান্না আর থামে না। একসঙ্গে এত বেশি কাঁদতে কাউকে বড় একটা দেখা যায় না, সকলে সোনাকে 'সাধু সাধু' বলতে লাগল। এত কাঁদতে পেরে মাকুও আনন্দের চোটে হেসে ফেলল। ফুর্তির চোটে মালিকের দাড়ি খামচে এক লাফে যেই মাকু উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে মালিকের দাড়িগোঁপও হ্যাঁচকা টানে খুলে গিয়ে, মাকুর হাতে ঝুলে থাকল।

একেবারে থ' হয়ে এক সেকেণ্ড উপস্থিত সকলে মালিকের চাঁচাছোলা ন্যাড়া মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর,

'ঐ ঐ ঐ আমাদের পালানো নোটো মাস্টার। হোটেলের মালিক সেজে এতকাল আমাদের মাঝখানেই লুকিয়ে ছিল গো! ও মাস্টার, বলি আমরা তোমার জন্যই হেদিয়ে মরছিলাম আর তুমি কি না ভোল বদলে এইখানেই ছিলে গো!'

সবাই মিলে এক সঙ্গে মালিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউ তার হাত ধরে নাড়ে, কেউ পায়ের ধুলো মাথায় নেয় আর মেম তার দুই গালে দুটো চুমু খেল। যারা যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের সবার চোখে জল এসে গেল।

দাড়ি গোঁপ হ্যাঁচকা-টানে খুলে গিয়ে………।

মালিক একসঙ্গে হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'ওরে, সত্যিই আমি তোদের সেই পালানো নোটো অধিকারীরে। জিনিস কিনে দাম না দিয়ে, তোদের সবাইকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিলাম আর তোদের পেছনেই পেয়াদা লাগল। তাই ভেবে দুঃখ রাখবার জায়গা পাইনা। তবে সুখের বিষয়, আর কোনো ভয় নেই রে। পুলিসের ভয়ে ছদ্মবেশ ধরে, এতদিন হোটেল চালিয়ে যে টাকা জমিয়েছি আর আজ যা পেলাম, তাই দিয়ে সব ধার শোধ করে, জিনিস ছাড়িয়ে, নতুন তাঁবুর তলায় আবার নতুন করে সার্কাস খুলব রে।' সবাই বললে 'সাধু! সাধু!'

ঘড়িওলা ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'তবে আরো পাঁচ হাজার টাকা হলেই হয়। তাহলে ঘড়ির কারখানায় গিয়ে, মাকুর যন্ত্রপাতির দাম চুকিয়ে ফেলি ; আমায়ো আর পেয়াদার ভয় থাকে না, রোজ খেলা দেখিয়ে টাকার গাদা জমাই। তারপর একদিন ছুটি নিয়ে দুই ভাই মায়ের কাছে একবার গিয়ে, পেট ভরে চাপড়ঘণ্ট, মোচা-চিংড়ি আর দুধপুলি খেয়ে আসি!'

এই বলে দুই ভাই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

সঙ বললে—'কেঁদো না তোমরা, লটারি জিতলে, আমি টাকা দেব।'

ঠিক সেই সময়ে আধময়লা বড় খাম হাতে গর্তে-পড়া সেই পেয়াদা এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে মাকুর হাত ধরে চাটাইয়ের পেছনে ঘড়িওলা অদৃশ্য। বাকিরা তেড়িয়া হয়ে লোকটাকে ঘেরাও করল, 'কাকে ধরতে এসেছ? মালিক কালই সব টাকা শোধ করে জিনিস ছাড়াবে। যাও এখান থেকে।' লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'সে কথা তো আমি কিছু জানি না। পোস্ট্‌মাস্টারমশাই বললেন,—বনের মধ্যে যা ফেলারাম, সঙবাবুর চিঠি এসেছে ; আমি পড়ে দেখেছি উনি লটারি জিতেছেন। টিকিটটা আপিশে জমা দিলেই পাঁচ হাজার টাকা পাবেন। এই নিন্‌ চিঠি।'

এ কথা শোনবামাত্র সঙ অজ্ঞান হয়ে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল আর মালিক বুক চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল—'হায় হায়, আমি যে আধখানা টিকিট হারিয়ে ফেলেছি! ঐ দেখ, সঙের পকেটে শুধু আধখানা আছে! ওরে টিয়া, এত বললাম, তবু খুঁজে দিলি না তো!'

সঙের পকেট থেকে আধখানা গোলাপি টিকিটের দিকে তাকিয়েই সোনা চমকে উঠল। টিয়ার হাত থেকে পুঁটলি কেড়ে, তার মধ্যে থেকে গোলাপি চাবিকাঠি বের করে, তার বাইরের গোলাপি মোড়ক খুলে ফেলল। ভিতর থেকে মামণির সিঁদুর পরবার রূপোর কাঠি বেরিয়ে পড়ল।

গোলাপি মোড়ক মালিকের হাতে দিয়ে সোনা বলল, 'এই নাও বাকি আধখানা। টিয়া, তুমি ভয়ানক দুষ্টু! খুঁজে পেয়ে টিকিট লুকিয়েছ! আর মামণির সিঁদুরের কাঠি না বলে নিয়েছ! ও—ও!'

বকুনি খেয়ে টিয়া ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, 'ওমা, ওটা কেন টিকিট হবে? টিকিটের ধারে আঁকড়া-বাঁকড়া থাকে। তাই ওটাকে বটতলা থেকে তুলে মাকুর জন্য চাবিকাঠি বানিয়েছি।'

ফিক্ করে সোনা হেসে ফেলল; ফিক্ করে ঘড়িওলা, জাদুকর, অধিকারী হেসে ফেলল; সঙও মুচ্ছো ভেঙে ফিক্ করে হাসল; তাই দেখে টিয়া ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল আর উপস্থিত সকলে পেটে হাত দিয়ে হো—হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

হাসতে হাসতে যখন আর হাসা যায় না, তখন টিয়া ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, 'আমাদের খাবার সময় হয়ে গেছে, বড্ড খিদে পেয়েছে, মামণি বাপি ঠামু আম্মাকে চাই!'

সোনাও ম্যাও ধরল—'আমারো বড্ড খিদে পেয়েছে, আমিও ওদের চাই!'

এ কি সর্বনাশ! সবারি যে খিদে পেয়েছে, অথচ বটতলায় রান্নাবান্না আধখ্যাঁচড়া হয়ে পড়ে আছে, উনুনটুনুন নিবে একাকার! তখুনি সবাই উঠে দৌড় দৌড়, মালিকের কোলে টিয়া, জাদুকরের কোলে সোনা আর সবার আগে ঘড়িওলার হাত ধরে মাকু অন্ধকার বনবাদাড় ভেঙে পাঁই পাই ছুটতে লাগল!

বনের মধ্যে তারার আলোয় সবাই মিলে ছুটতে ছুটতে যখন বটতলার কাছাকাছি পৌঁছেছে, অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, কোথায় অন্ধকার, বটতলা আলোয় আলো। কত লোক জমেছে, ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে, গনগন করে তিনটে উনুন জ্বলছে আর চারদিকে যে সুগন্ধ ভুরভুর করছে, তার একটুখানি নাকে ঢুকেছে কি অমনি সব দুঃখ ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে!

টিয়া হঠাৎ খচমচ করে মালিকের কোল থেকে নেমে পড়ে, দু হাত তুলে 'মা-মা-মা-মা' বলে এলোপাথাড়ি দৌড়তে লাগল। সোনাও দু হাতে ঠোঁট চেপে জাদুকরের কোল থেকে নেমে, অন্ধের মতো এগাছে ওগাছে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটল। কি? হল কি? এমন সময় বটতলার ভিড়ের মধ্যে গোলাপি শাড়িপরা একজন সুন্দর মানুষ খুন্তি নামিয়ে, দৌড়ে এসে দু হাত বাড়িয়ে, দুজনাকে বুকে চেপে ধরল। মামণি, মামণি, মামণি। এক গোছা মাটির থালা মাটিতে নামিয়ে মোটাসোটা লম্বা যে লোকটি হাসি হাসি মুখ করে কাছে এল, সেই যে বাপি তা আর কাউকে বলে দিতে হল না।

তখন কি আদর, কি হাসি, কি গল্প, সে আর মুখে বলা যায় না। তারি মধ্যে ঝুপ করে পানের চুপড়ি নামিয়ে হাঁউমাউ করে ছুটে আম্মা এসে হাজির, ওদের দেখে তার পায়ের গুপো একেবারে সেরে গেছে! সবাই মিলে জড়াজড়ি করে তখন সে কি হট্টগোল, বাড়ি থেকে পালানোর জন্যে সোনাটিয়াকে কেউ বকল না। খালি ঠামু হঠাৎ গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে বসেই সরু গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'ওরে আমাকে কেউ নামিয়ে দিচ্ছে না কেন রে, দুষ্টু মেয়েদুটোকে আমি কি আদর করতে পাব না!'

সোনা টিয়া খালি বলে—'ও মামণি, ও বাপি, কি করে জানলে আমরা এখানে পালিয়ে এসেছি?' আম্মা চ্যাঁচাতে লাগল, 'তা আর জানবে না? তোদের পিসে কি মিছিমিছি পুলিশ সায়েব হয়েছে? তোমরা পালাবার পরেই তো তার লোকেরা খবর দিল। বলিহারি তোমাদের সাহস বাপু! যে বনে সার্কাস পার্টির দুষ্টু অধিকারী দলবল নিয়ে গা ঢাকা দেয়, সেই বনে খালি হাতে ঢুকতে সাহস কর? ভাগ্যিস পিসে দেখতে পেয়েছিল, নইলে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে যেত, সে কথা কি একবার ভাবলে?'

টিয়া চোখ মুছে শুধু বললে, 'মোটেই খালি হাতে নয়, পুঁটলিতে, জিনিস ছিল।' এতক্ষণে সোনা টিয়ার খেয়াল হল বটতলায় অনেক পুলিশ পেয়াদা। তারা অবিশ্যি ভজহরি আর বেহারীকে রান্নাবান্না আর খাবার জায়গা করতে সাহায্য করছে, তবু তাদের দেখে সার্কাসের লোকরা ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে খাকি পোষাক পরা একজন লোক বেরিয়ে এল। তার দু হাতে ও দুটো কি? ঐ না দুটো বড় বড় প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল!!

সোনাটিয়া হঠাৎ 'ও মাকু, ও মাকু—' বলে তার গায়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। এই তো তাদের আসল মাকু, আগের মাকু, আদরের মাকু, নিজেদের মাকু, সে যে সত্যি করে ওদের জন্য প্যাঁ-প্যাঁ পুতুল এনেছে। 'মাকু মাকু' বলে তখন তাকে কি আদর। মামণি তো অবাক্। —'মাকু কিরে? উনিই তো তোদের পিসেমশাই। উনিই তোদের খুঁজে দিয়েছেন, বাপির সঙ্গে গাছতলায় পিকনিকের ব্যবস্থা করেছেন।'

সোনাটিয়া অবাক্, ওমা, মামণি কি বলে, এটা না মালিকের জন্মদিনের ভোজ, পিকনিক আবার কোথায়?

মামণি বললেন—'ঐ একই কথা, ভোজ না আরো কিছু! এসে দেখি খাবার জিনিস মাটিতে গড়াগড়ি, কে বা রাঁধে, কে বা খায়। তখন সবাই মিলে লেগে গেলাম। আজ বুঝি মালিকের জন্মদিন? কোথায় সে?'

পিসেমশাই বললেন—'হ্যাঁ, তাই তো! ও মালিক তুমি কোথায় গেলে?'

হাত জোড় করে, ভয়ে ভয়ে মালিক এসে পিসেমশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। পিসেমশাই বললেম।

'কি, এত ভয় কিসের? শুনছি ধার দেনা সব শোধ করে দেবে, তা হলে আবার ভাবনা কিসের? আমার পুলিসরা তা হলে খেয়ে দেয়েই বাড়ি যাক, কি বল? তোমরা কাল থানায় গিয়ে টাকা জমা দিয়ে, ব্যবস্থা করে এসো, কেমন? আর সোনাটিয়া, বোম্বাকে আদর করবে না?'

আরে, ঐ যে পিসির কোলে বোম্বা। পিসি বললেন, 'বোম্বা, ঐ ছাখ্ দিদিরা'। বোম্বা বলল, 'জিজিয়া।' বলে, খুসি হয়ে এক হাতের পর কটা আঙ্গুল একসঙ্গে মুখে পুরে দিল।

পিসেমশাই বললেন, 'উঃ, বড্ড খিদে পেয়েছে এসো, আমরা খাই।'

বোম্বা আরো খুসি হয়ে বলল, 'কাঁই।'

তখন আর তাকে আদর না করে সোনা টিয়া করে কি? এদিকে সার্কাসের লোকরা আহ্লাদে আটখানা, ভোজবাজির মতো তাদের সব ভাবনাচিন্তা দূর হয়ে গেছে। ঘড়িওলাকে পায় কে, মাকুকে যে কেউ কাঁদাতে পারবে এ তার আশার বাইরে ছিল। এখন যখন খুসি মাকুর চাঁদি খুলে জ্যামের টিনে জল ঢাললেই, হাপুস নয়নে কান্না! এত আনন্দ ভাবা যায় না। সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করে বসে খেতে লাগল। মামণি বললেন, 'সারাদিন ওরা খেটে খুটেছে, ওরা খেতে বসুক, আমরা পরিবেষণ করি।' বাজনাদাররা মিছিমিছি দেরী করে ফেলাতে, প্রথম দলে জায়গা পেল না। তাই তারা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে পিঁ-ই-ই ভোঁপর ভোঁপর ভোঁ ধরল। খাবারগুলো দ্বিগুণ মিষ্টি হয়ে উঠল।

বাপি স্বর্গের সুরুয়া খেয়ে মুগ্ধ। 'আহা এমনটি তো জন্মে খাই নি। কে রাঁধল?'

মালিক লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল, কে রেঁধেছে কারো আর বুঝতে বাকি রইল না। মামণি আর পিসি বললেন,

'ও মালিক, শিখিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও।'

টিয়া তো অবাক্—'ও তোমরা পারবে না, দাড়ি গোঁফ দিয়ে করতে হয়।'

সার্কাস পার্টির লোকদের কান খাড়া হয়ে উঠল। 'দাড়ি গোঁপ দিয়ে করতে হয় আবার কি? ও মালিক ব্যাপার কি?'

সোনা তখন টিয়ার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, 'না, না, কিছু না, আজ সকালে মালিকের দাড়ি গোঁপ হাঁড়িতে পড়ে গেছিল কি না—' সার্কাসের লোকরা খুসি হয়ে বলল, 'তা দাড়ি গোঁপই হক আর পরচুলাই হক, স্বর্গের সুরুয়ার মতো কেউ রাঁধুক দেখি! অবিশ্যি নোটোমাষ্টারকে আর রাঁধতে দেওয়া হবে না; ও বলে দেবে, আমরা রাঁধব।'

মালিক তখন পিসেমশাইয়ের কাছে এসে বলল, 'আমার শত অপরাধ মাপ করবেন, স্যার, চাকর ভেবে না জেনে কত মন্দ কথা বলেছি।' 'আরে ছো ছো, পুলিসের লোকদের অমন মন্দ কথা সবাই বলে। তাছাড়া আমাকে তো বল নি বেহারীকে বলেছ।'

বেহারী তাই শুনে বলল, 'আজ্ঞে।'

টিয়া এতক্ষণে সুবিধে পেয়ে পিসেমশাইকে কানে কানে বলল—'তবে কি তুমি মাকু নও? ঐ লোকটা মাকু?' সোনা বলল, 'তুমি কি আমাদের খুঁজতে বনে এসেছিলে?'

পিসেমশাই হেসে ফেললেন। আসলে আমি নোটোমাষ্টারকে আর ঘড়িওলাকে ধরতে এসেছিলাম। বনের মধ্যে ওরা গা ঢাকা দিয়েছে, সে খবর আগেই পেয়েছিলাম। তোমাদের বাড়ি পৌঁছেই শুনি তোমরা বনে পালিয়েছ। তখন বাপি আর আমিও বনে গিয়ে দেখি তোমরা নদীর

ধারে ঘুমোচ্ছ। বাপিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের কাছে রইলাম। প্রথমে তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না, আমাকে কেন মাকু মাকু বলছ।'

'সোনা বলল, 'তুমি মাকু নও তো তোমার লালচে কোঁকড়া চুল আর নাকের ওপর তিল কেন?'

পিসেমশাই বললেন, 'ভাগ্যিস আমার ঐসব ছিল, তাই তো মাকু ভেবে আমার কত যত্ন করলে তোমরা।'

পোষ্টাপিসের পিওন বললে, 'তা তোমায় যত্ন-আত্তি করে থাকতে পারে পুলিস-সায়েব, আমাকে কিন্তু ফন্দী এঁটে বাঘের গর্তে ফেলেছিল।'

সোনা বললে, 'আমরা যে তোমাকেই পেয়াদা ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি উঠলে কি করে?'

'ওমা, তাও জান না? ধপাস্ করে পড়লাম গিয়ে তিনটে সত্যিকার পেয়াদার উপরে, বাপরে কি তাদের চেল্লানি! ভাগ্যিস ঐখানে ওরা লুকোনো ঘাঁটি করেছিল, তাই রক্ষে। আমাকে অনেক জেরা করে, শেষটা ওরাই ঠেলেঠুলে তুলে দিল। তবেই না সঙের লটারি জেতার খবর পৌঁছে দিতে পারলাম।'

টিয়া বললে, 'তুমি তো বড় ভালো।'

টিয়ার পাশে জাদুকর; পায়েসের বাটির তলা চেটে সে বললে, 'ঐ যাঃ! তোমাদের খরগোসছানা নিয়ে যাবে না?' এই বলে পিসেমশাইয়ের বুক পকেট থেকে গলায় রেশমি ফিতে বাঁধা খরগোসছটোকে বের করে সোনা টিয়ার হাতে দিল। মামণি, পিসি, ঠামু আর আম্মা এমনি চমকে গেল যে ঠামু ডাল থেকে পড়েই গেলেন।

অনেক রাত হয়েছে, বোম্বা ঘুমিয়েই পড়েছে, সোনাটিয়ার চোখও ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। পিসেমশাই বললেন 'আমার জিপে করে এবার তাহলে ঠামু, আম্মা, বোম্বা আর সোনাটিয়া বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক।'

অমনি সোনাটিয়া ঢুলু ঢুলু চোখে মহা আপত্তি করতে লাগল—'না, না, না, আমরা পরীদের রাণীকে দেখব।'

মালিক বললে—'দেখবে বৈকি, রোজ সার্কাস হবে, রোজ মাকুর সঙ্গে পরীদের রাণীর বিয়ে হবে, রোজ তোমাদের বাড়ির সকলকে পাস দেওয়া হবে। এখন বাড়ি যাও, কেমন?'

সোনা বলল, 'পরীদের রাণীকে তোমার জন্মদিনের ভোজে নেমন্তন্ন করনি কেন?'

দড়াবাজির সব থেকে ছোট ছোকরা বললে—

'বাঃ, তোমাদের যা বুদ্ধি! পরীরা আবার মধু ছাড়া কিছু খায় নাকি যে ভুনি খিচুড়ি আর হরিণের মাংস খেতে বলা হবে? তাছাড়া—' এই বলে ছোকরা ফিক্ করে হাসল।

ততক্ষণে জিপ এসে গেছে, ঠামুরা উঠেছেন, সোনাটিয়াকেও এক রকম জোরজার করে তুলে দেওয়া হল।

টিয়া কিছুতেই ছাড়ে না, 'না, না, বল সে কোথায় গেল ? তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?'

ছোকরা বলল, 'দূর বোকা, তাকে দেখতে পাচ্ছ বৈকি। আরে আমিই যে পরীদের রাণী সাজি, তাও জানো না ?'

সোনাটিয়া আম্মার গায়ে ঠেস দিয়ে হাইতুলে বলল 'প্যাঁ-প্যাঁদের আমাদের কোলে দাও, বাড়ি চল, ঘুম পেয়েছে।'

—শেষ—

‘শঙ্করের কাণ্ড’

সুরজিৎ সিংহ—গ্রাহক নং ১০৩৩—বয়স ৮½

শঙ্কর স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সে মাসে দুদিন যায়। প্রথমদিন গেল দেখল যে কটার সময় হয়। তারপরদিন থেকে ও সারাদিন বাইরে বেড়িয়ে যে সময় ছুটি হয় ও দেখেছিল ঠিক সেই সময় ও বাড়ি ফেরে। বাড়ি এসে ও মাকে বলে, আজকে মাষ্টারমশাই বলেছেন যে তুমি আজকে ভাল পড়েছ। এ রকম করে প্রত্যেকদিন মাকে মিথ্যা কথা বলত। একদিন ওর মা বললেন তাহলে তুমি এবার থেকে ঘুড়ি ওড়াতে পারবে কিন্তু মাসে কুড়িটার বেশী ওড়াতে পারবে না। তক্ষুনি ওর মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে লাটাই আর ঘুড়ি কিনে নিয়ে ওড়াল। এরকম করে প্রত্যেক দিন মিথ্যা কথা বলত। একদিন ওর বাবা আর মা কথা বলছিলেন এমন সময় ওর বাবা বললেন কালকে আমি ওর টেষ্ট নেব। দেখব যে কতখানি ও পড়েছে। পরদিন ওর বাবা ওকে ডেকে খাতা পেন্সিল আনতে বললেন। ও খাতা পেন্সিল নিয়ে এল। ওর বাবা একটা খুব সহজ বানান লিখতে দিলেন। খানিকক্ষণ পরে ওর বাবা বললেন হয়েছে? ও বল্ল না। তখন ওর বাবা ওর মাকে বললেন যে ও দেখছি ত কিছুই পড়াশুনো করেনি। তারপর ওর বাবা ওকে খুব মার দিলেন। আর বললেন তুমি এবার থেকে পড়বে ত? ও বলল হ্যাঁ। তারপর থেকে ও ভাল ছেলে হয়ে গেল।

যদি

সোহম দাশগুপ্ত বয়স ১০, গ্রাহক নং ২৮৬৮

আমি যদি পাখি হতাম কি মজাই না হত,
যেখানে খুশি সেখানে যেতাম নিজের ইচ্ছামত।
দেশ বিদেশে যেতাম উড়ে,
গান গাইতাম নানান সুরে,

করত না কেউ মানা
সে কথা মোর আগেই আছে জানা।
আমি যখন উড়ে উড়ে,
যেতাম চলে অনেক দূরে
তখন ডাকত আয় আয় বলে
মা আমার, ছোট্ট ঘরের কোলে।

পপির কাণ্ড

সুদীপ মৌলিক, গ্রাহক নং ২৩৭৯—বয়স ১১,

আমাদের ছোট্ট কুকুরটার নাম পপি। জাতে সে নেপালী। সেই ছোট পপির ছোট্ট একটা গল্প আমি বলব।

আমাদের যে বাড়িওয়ালা তাঁর মেজাজ খুব কড়া তার চেয়েও কড়া তাঁর নজর। বাড়ির সামনেই আমগাছ অথচ একটি আম নেবার উপায় নেই। একদিন ঝড় হচ্ছে আমও পড়ছে বেশ।

বাড়িওলার ছেলে কমল খুব আম কুড়োচ্ছে। হঠাৎ শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হল। কমল শিলাবৃষ্টিকে দারুণ ভয় করে। সে দৌড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। এই ফাঁকে আমরা সবাই আম কুড়োতে লাগলাম কিছুক্ষণ পরে এমন বৃষ্টি আরম্ভ হল যে, আমরাও দরজা বন্ধ করলাম। এমন সময় বাইরের দরজায় দেখি খচর খচর শব্দ। ব্যাপার কি। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে দাড়িয়ে আমাদের পপি, মুখে ছোট একটি আম!

শিক্ষিত ব্যাঙ্

ঋত্বিক সান্যাল, গ্রাহক নং ১২৪০, বয়স ১২½

ফুটফুটে জোৎস্নায় ফটফটি চ'ড়ে,
চলেছে ফটিকবাবু ফট্‌ফট্ করে।
পুকুরের ধারে থেমে নেমে চট্‌পট্,
গোটা আট শাপলা ভাঙ্গে মট্‌মট।
সেই জলে ছিল এক ব্যাঙ কটকটে,
কট্‌মট্ চেয়ে শেষে বলে চটেমটে;
"ক্যানুরে ব্যাটা ইস্টুপিড?
ঠেঙিয়ে তোরে করব ঢিট!"

'সন্দেশকে,

অভীক কুমার ভট্টাচার্য্য গ্রাহক নং ২৫৮১, বয়স ১৩,

নাঃ, সন্দেশ,

তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকবাক্সে আসতে পার না ? যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হল তোমার উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে !

দেখনা, গত মাসের প্রথম সপ্তাহে যেই তুমি আমার ডাকবাক্সের ভেতর ঢুকলে, অমনি ও ঘরের খুকু তোমার সুন্দর রঙীন মলাটটা ছিড়ে নিয়ে নৌকো বানিয়ে জলে ভাসিয়ে দিলে। যাওবা, ওঘরের খুকুর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তোমাকে সুন্দর কাগজ দিয়ে মলাট দিয়ে নিয়ে ২।১ লাইন পড়ছিলাম, এমন সময় কোথা থেকে দাদা হাজির হ'ল। আমার হাত থেকে তোমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিজের ঘরে খিল দিয়ে পড়তে লাগল। দাদা এখন নাওয়া ও খাওয়া ভুলে গেছে। এমনকি দাদা একদিন তোমাকে দাদাদের ক্লাশে নিয়ে গিয়েছিল। তার ঠেলা এখন আমি বুঝছি ! বিকেল হলেই ৩০।৪০ জন জন ছেলে আমার পড়ার ঘরের সামনে ভিড় করে আর সবাইই তোমাকে চায় ! এমনকি আমার ছোট পুষিও ! বেচারি পুষিও তার মিষ্টি ছুটো থাবা দিয়ে তোমার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। বেচারী পুষিও লোভ সামলাতে পারেনি ! এখন বাবা এলে আমি কি জবাব দেব ?

সন্ধ্যা

লেখনী মুখোপাধ্যায়

গ্রাহক নং—এম্ ২৭২৮ বয়স—১৪ বৎসর

ধীরে ধীরে অন্ধকার নামে আকাশে,
পাখীরা সব একে একে ফেরে আবাসে,
ধীরে ধীরে আকাশে নিভে আসে আলো,
প্রকৃতির মাঝে এবার আঁধার ঘনালো।
সূর্য্যদেব হয়েছে শান্ত দখিণা বাতাস বয়,
সন্ধ্যাবেলা শান্তি আসে সারা ভুবন-ময়।
গৃহস্থের ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে বাতি,
সেই বাতি আলো করে অন্ধকার রাতি।

"আশুতোষ"

ফাল্গুনি রায়

গ্রাহক নং—১৬১১ বয়স—১৪

বাংলা মায়ের মাথার মুকুট
উঠল ভোরে ঝলমলিয়ে
কর্মবীর এক জন্ম নিলেন
বিধির আশীষ
মাথায় নিয়ে।
নামটি যে তাঁর স্যার আশুতোষ,
এক ডাকেতে সবাই চেনে
হাঁক ডাকে আর হুঙ্কারেতে
দুর্বৃর্ত্তেরা প্রমাদ গণে ॥
বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ
উগ্র পুরুষকার
আমরা সবাই তাঁরে জানাই
চির নমস্কার ॥

চিঁড়িয়াখানায়

সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাহক নং—৭৬৫ বয়স—১২

গত জানুয়ারী মাসে আমরা বড়মামার বিয়ে উপলক্ষে কলকাতায় গিয়েছিলুম। খুব মজা করে দিন কাটল। চলে আসবার আগে নতুন মাসিমার সঙ্গে চিঁড়িয়াখানা দেখতে গেলুম। বায়না জুড়েছিল ছোট ভাই। বয়স তার বছর ছয়েক। চিঁড়িয়াখানায় কত জন্তু জানোয়ার পশুপাখি। ময়ুর কেমন পেখম মেলে দাঁড়াল, হাতি দিল শুঁড় এগিয়ে। সাদা বাঘ, গায়ে তার ডোরা কাটা। শিম্পাজির ঘরের দিকেও যাওয়া হল। ওরা ঠিক মানুষের মত। হাবে, ভাবে কত মিল। এইসব নিয়ে আমরা কথা বলছি এমন সময় ভাই জিগেস করে বসল: আচ্ছা মাসিমা, এখানে ভূত রাখে না? শুনে আমাদের কি হাসি!

হেতমপুর

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়—গ্রাহক নং ২৮২৩ বয়স ১৫

[নিবেদন ॥ বীরভূমের এক অখ্যাত গ্রাম এই হেতমপুর। অখ্যাত না হলেও অন্ততঃ খ্যাত, তা বলবার সাহস নেই। তবে একদিন ইতিহাসও এখানে খেলে গেছে। তার স্মৃতি বহন করে হাতেম খাঁর বাঁধ, রাজবাটি,—সর্বোপরি এখানকার আকাশ বাতাস মাটি। সেই সব নিয়েই এই কবিতা বা ছড়া, যাই বলা যাক, তার রসদ। পাঠক পাঠিকারা কবিতাটি থেকে আনন্দের আস্বাদ পেলেও পেতে পারে। দুঃসাহস ভরে তাই এটা পাঠাচ্ছি। ইন্দিরা]।

হেতমপুর, হেতমপুর,
আকাশ মাটি তালপুকুর,
সবার মতো নয় হুজুর :
হেতেমপুর।
হেতমপুর, হেতমপুর,
হেতমপুরে তালপুকুর,
তালপুকুরে শান্তজল,
নদীতে জল ছলাৎছল,
ছলাৎছল নদীর জল,
ধানের ভূমি সোনার ফল,
সোনার ফলে জীবন সুর—
সহজ হেথা, হেতমপুর।
হেতমপুরে শালের বন,
শালের বনে ভয়-কূজন।
আমের বনে মিঠ-সকালে,
বাজায় বাঁশি সব রাখালে ;
থিতিয়ে পড়া তাদের সুর—
হেতমপুরের চুপ-দুপুর।
হেতমপুর, হেতমপুর,
রাঙামাটির বাউল সুর।
সুরের রঙে আকাশ নীল।
মাটির পরে নীলচে বিল।
বিলের চোখে নীল দুপুর।
ছবির মত হেতমপুর।
হেতমপুরে পূবের ধার—
গল্প ভাসে হাতেম খাঁর।

অশথ ছায়ে, মাঠের গায়ে,
কে রয়েছে ঘোর ঘুমায়ে,
সে যে হাফেজ আর বিবি—
বেবান্ কাল রয় জীবি
তাদের কথায় চুর দুকুর।
'হেতম'পুর 'হেতম'পুর।
হেতমপুরে রাজার বাড়ি।
রাজার বাড়ি হাজার দ্বারী।
হাজার দ্বারী রং বেরং।
নকল করা আসল ঢং।
জমাট বাঁধা-কাঁদন-পুর।
রাজার বাড়ি হেতমপুর।
হেতমপুর, হেতমপুর,
ঠিকানাতেও নেই কসুর,
হাওড়া থেকে অণ্ডালে—
দু'রাজপুরে যেই এলে,
অমনি নেমো দরাদ্দার—
অভিযানের সেই পাহাড়—
দেখে টেকে তিনচাকা,
রিক্স নিও, একটাকা—
ওখান থেকে নয়কো দূর—
ছবির মতো হেতমপুর।
হেতমপুর হেতমপুর,
ছবির মতো বেশ মধুর।
লাগবে ভালো এই হেথা—
ইতি হেতমপুর-কথা ॥

গল্পসল্প

পুরাণে লেখা আছে যে পৃথিবীর প্রথম মুক্তোটিকে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের বুক থেকে তুলেছিলেন তাঁর নিজের মেয়ের বিয়ের সাজের জন্য। সেই থেকেই মুক্তোর আদর। সারা পৃথিবীতে মেয়েরা মুক্তোর গয়না পরে; অতি প্রাচীনকালেও যে চীনদেশে, ভারতবর্ষে, মিসরে মুক্তোর গয়নার ব্যবহার ছিল, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। গ্রীক নাম 'মার্গারেট', তার মানে হল মুক্তো। অথচ মুক্তো সংগ্রহ করা বড় সহজ কাজ নয়।

তোমরা নিশ্চয় জান যে হীরে চুণি পান্না সোনা রূপো যেমন মাটি কেটে খনি থেকে বের করতে হয়, মুক্তোর বেলায় তা নয়। সমুদ্রের নিচে থেকে ডুবুরিরা ঝিনুক তুলে আনে, তাকে বলে শুক্তি, তার মধ্যে মুক্তো পাওয়া যায়। হয়তো এক হাজার ঝিনুক খুললে একটির মধ্যে মুক্তো থাকে, তাই তার এত দাম। তোলার সময় কিছু বোঝা যায় না, ঝিনুকের দুটি অর্ধেক একসঙ্গে এঁটে বন্ধ করা থাকে। ডাঙ্গায় তুলে খুলে দেখতে হয়, পাশে খোলা ঝিনুকের পাহাড় জমে যায়, তারপর হয়তো একটি থেকে মুক্তো বেরুল।

যে মুক্তোটি পরিপূর্ণ নিটোল গড়ন নিয়েই বেরোয়, তার গা থেকে আপনি আপনি রামধনুর রঙের ছটা বেরোয়। অন্যান্য মণিমাণিক্যের মতো তাকে কেটেকুটে পালিশ করতে হয় না, যেমন বড় যেমন আকারের বেরোয়, তাকে আর বদলানো যায় না। সহজেই তাকে ভেঙ্গে ফেলা যায়, পোড়ানো যায়, অযত্ন অনাদরে তার রঙ ও জৌলস নষ্ট হয়ে যায়। সব মাণিকের মধ্যে একমাত্র মুক্তোই জীবন্ত প্রাণীর দেহ থেকে জন্মায়।

নানান মাপের নানান আকারের মুক্তো হয়; অবিকল একরকম রূপ রঙের মুক্তো পাওয়া বড় শক্ত, তাই জোড়া মুক্তোর বড় দাম আর মাপ ও বাহার মিলিয়ে মুক্তোর মালার কথা ছেড়েই দিলাম।

আজকাল গয়নাগাঁটিতে সোনার ব্যবহার কমে যাচ্ছে, সেইরকম আইনও তৈরী হয়েছে। কেন জান তো? বিদেশ থেকে দরকারী জিনিসপত্র আনাতে হলে সোনা দিয়ে তার দাম চুকোতে হয়; অন্য দেশের কাছে দেনা থাকলে, তাও সোনা দিয়ে মেটাতে হয়; দেশের তহবিলে কিছু সোনা সর্বদা মজুত থাকাও দরকার; সোনা দিয়ে গয়না গড়িয়ে ফেললে, এসব হবে কি করে?

তাই বলে মেয়েরা কি আর গয়না পরবে না? তারা রূপো পরবে, অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশিয়ে একটু সোনাও পরবে, তাতে হীরে পান্না চুণি-নীলা বসিয়ে নেবে আর সব চেয়ে বেশি পরবে মুক্তোর গয়না।

কি করে অত দাম দিয়ে তারা মুক্তো কিনবে? কেন মুক্তোর চাষ করা হবে; আপনা থেকে যে মুক্তো হয়, এক হাজার ঝিনুকের মধ্যে একটাতে তাকে পাওয়া যায়; কিন্তু যত্ন করে চাষ করলে, প্রত্যেকটি ঝিনুকের মধ্যে একটি বা আরো বেশি মুক্তো ফলানো যায়, তা হলে তার দামও অনেক কম হয়ে যায়। সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে আজকাল; এইরকম চাষ করা মুক্তোকে ইংরিজিতে বলে 'কালচার্ড পার্ল', এর দাম অনেক কম, অথচ এগুলি সত্যিকার মুক্তো, নকল নয়।

ঝিনুকের মধ্যে কি করে মুক্তো হয়, সে এক মজার ব্যাপার। শক্ত করে আঁটা দুটি ঝিনুকের খোলার মধ্যে ঝিনুক পোকা বাস করে, তার গা বড় নরম, শক্ত অসমান কিছু সে সইতে পারে না। এমন কি ঝিনুকের ভিতরকার দেয়ালটিকেও সে নিজের গা থেকে একরকম সাদা রস বের করে, তাই মোলায়েম করে নেয়। তাই ঝিনুকের গা এত সুন্দর।

ঝিনুক পোকা তো আর উপোস করে থাকে না, ঢাকনি ফাঁক করে তাকে সামুদ্রিক গাছপালা ইত্যাদি থেকে খাবার সংগ্রহ করতে হয়। দৈবাৎ হয়তো এককণা বালি বা আর কিছুর অতি খুদে টুকরো, সেইসময় ঝিনুকের মধ্যে ঢুকে যায়। অমনি পোকার গা এমনি কুটকুট করতে থাকে যে সে গা থেকে সেই সাদা রস বের করে দানাটাকে মুড়ে ফেলে। এইভাবে মুক্তোর জন্ম হয়।

যতই দিন যায়, দানার উপর রসের আরো প্রলেপ পড়তে থাকে, মুক্তোটিও বড় হতে থাকে। তারপর একদিন ডুবুরি হয়তো ঝিনুকটিকে তুলে আনে, কত দামে সেই মুক্তো বিক্রী হয়, মেয়েরা কত আদর করে পরে! যত বড় মুক্তোটি, যত তার জেল্লস, তত তার দাম। কত বড় বড় মুক্তো ডুবুরির চোখ এড়িয়ে সমুদ্রের তলায় ছড়িয়ে আছে, তাই বা কে জানে।

সাধারণ লোকে এসব মুক্তো কিনতে পারে না, তাই মুক্তোর চাষীরা ঠিক ঐ একই নিয়মে ইচ্ছামতো মুক্তো ফলায়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কোকিচি মিকিমোটো নামে একজন জাপানী প্রথম এইভাবে মুক্তো ফলান।

মুক্তোর চাষীরা প্রথমেই সমুদ্রের নিচে কচি ঝিনুক চাষের জায়গা বেছে নেন; খুব গভীর জলে নয়, যেখানে অন্য উপদ্রব কম, এমন জায়গা। তারপর কচি কচি শুক্তি বা ঝিনুক সুদ্ধ ঝিনুক পোকা এনে ওখানে রেখে, তাদের যত্ন করা হয়।

বছর তিনেক বাদে ঝিনুক পোকারা মুক্তো তৈরীর জন্য যখন প্রস্তুত হয়, তখন তাদের সেখান থেকে তুলে, বিশেষ জায়গায় নিয়ে গিয়ে, শিক্ষিত কর্মীরা যন্ত্র দিয়ে ঝিনুকের মুখ একটু ফাঁক করে, তার মধ্যে শক্ত ও খুদে একটি করে দানা পুরে দেন। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তো তৈরী শুরু হয়ে যায়; পোকা দানার গায়ে সাদা রস, ইংরিজিতে তাকে NACRE বলে, মাখাতে থাকে। যত দিন যায়, মুক্তো ততই বড় হয়; কোনো কোনো মুক্তো ছয় সাত বছর বাদে তোলা হয়।

এখানেই মুক্তোর চাষীর কাজের শেষ নয়। মুক্তোর রঙ, আকার, মাপ অনুসারে, তাদের বেছে তুলতে হয়। চাষের মুক্তোও নানান্ রকমের হয়, দানার মাপও আকারের উপর সেটা অনেকখানি নির্ভর করে। একরকম দানার মুক্তো একই সময়ে অনেকটা একই রকম দেখতে হয়। ইচ্ছামতো চাষীরা মুক্তোগুলিকে ছোট বড় গোল লম্বাটে করতে পারেন।

এইখানেই স্বাভাবিক মুক্তোর সঙ্গে চাষের মুক্তোর সবচেয়ে বড় তফাৎ। চাষের মুক্তো বড় বেশি সমান ও মোলায়েম হয়, তাই তাদের দেখলেই সাধারণতঃ চেনা যায়। ভিতরের দানাটিও হয় তো একটু বড় হয়, নইলে গঠনে কোনো প্রভেদ থাকে না। অথচ দামে আকাশপাতাল তফাৎ, স্বাভাবিক মুক্তোর দাম চাষের মুক্তোর চার পাঁচ গুণ। অবিশ্যি বেশি ত্যাড়াবাঁকা অসমান স্বাভাবিক মুক্তোর দাম বেশি নয়।

সব মুক্তোর যত্ন করতে হয়; ঘাম লেগে মুক্তোর রঙ কালো হবার কথা শোনা যায়, মাঝে মাঝে মুক্তো শুকিয়ে যায়। বেশি গরমে বা ভিজা অবস্থায় মুক্তো রাখা ঠিক নয়। তুলে রাখার আগে নরম কাপড় বা তুলো দিয়ে মুছে রাখতে হয়, কারণ মুক্তোয় ক্যাল্‌সিয়ম কার্বোনেট থাকে, ঘামের অম্লরসে সেটা গলে যেতে পারে। মাঝে মাঝে মুক্তোর মালা পরিষ্কার করিয়ে, নতুন করে গাঁথিয়ে নিতে হয়।
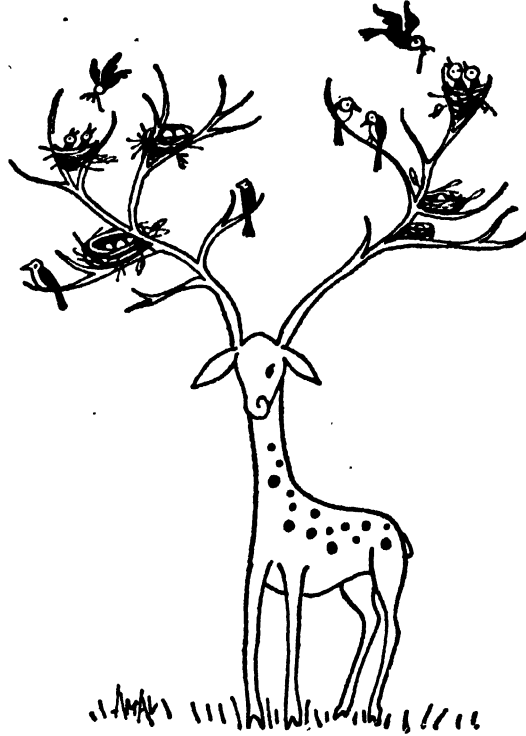
প্রবাদে প্রমাদ

শ্যামলী বসু

ব্যাঙের হল সর্দি বেজায়, পুকুর জলে ঠাণ্ডা লেগে,
'হায় কি হল !' এই না ভেবে রইল সে সাত রাত্রি জেগে।
বন তুলসীর মস্ত ঘন বনে ঢাকা পুকুরধার,
সেই বনেতে বাঘ যে ছিল অনেক দিনের বন্ধু তার ;
ব্যাঙকে ডেকে বললে, হেসে, 'ওষুধ অনেক জানি, তা ভাই—
তোমার আছে এক আধুলি, আমার সেটি দর্শনী চাই'।
সেই পুকুরের আর এক কোণে শ্যাওলা সবুজ বুনো ঘাস,
বংশ পরম্পরায় সেথা মেছো কুমীর করত বাস,
কুমীর ভায়ার বুক ভেসে যায়, অশ্রু তাহার বাগ না মানে,—
ব্যাঙের হল সাদ বেজায়, শুনল যখন নিজের কানে ;
বলল তাকে, 'চিকিৎসা তো করতে পারি ভালোবেসে,
তবে কিনা, আধুলিটি দর্শনী চাই কাজের শেষে।'
'তাই যদি হয়, আমার কথা শুনতে পার,' বল্‌লে হেঁকে—
তপস্বী এক বিড়াল ছিল পুকুর পাড়ের দখিন থেকে ;
টোট্‌কা ওষুধ দিতে পারি—আনব সাপের পাঁচটি পা,
চার গণ্ডা ঘোড়ার ডিম, আঁশ যদি দেয় মাছের মা।
এমন ওষুধ আর পাবে না—মনে মনে এইটি জেনো,
দর্শনী আর কিইবা দেবে, আধুলিটি সঙ্গে এনো।'
শুনে শুনে ফন্দী এঁটে—ফুটফুটে গা সরু ঠ্যাঙ—
বধ ধার্মিক এগিয়ে আসে—'শুনছ নাকি, ও ভাই ব্যাঙ,
ঠাঁই বদলে সর্দিসারে, এইটি শোন আমার কাছে,
যাও যদি তো পাঠিয়ে দেব, সেরা জায়গা জানাও আছে ;
দর্শনী ভাই চাইনে কিছু লোকটি আমি উপকারী,
তোমার তরে করলে কিছু প্রাণটা হবে শান্ত ভারী !'
আর দেরী নয়—চট্‌পট নাও—এই বলে সে করল হাঁ—
বকের পেটে চিরতরে ঠাই বদলায় ব্যাঙের ছা।

নিরুদ্দেশ

জীবন সর্দার

এইখানটাতে, আমি যেখানে বসে আছি, এখানে এক বছর আগে রোদও থাকত, ছায়াও থাকত। নারকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়তো এখানে। বিকেল হলে ঝাঁক ঝাঁক টিয়া আসতো। নারকেল গাছের মাথায় মাথায় দিন শেষে মহা সোরগোল তুলতো।

একদিন সকালে, কুয়াসা না কাটতেই, কাঠুরিয়ারা এসে গাছ সব কেটে দিয়ে গেল। টিয়ার দল ডেকে ডেকে ফিরে গেল সেই বিকেলে। তারপরদিন থেকে টিয়ারা নিরুদ্দেশ। দুপুরে কয়েকটা কাঠঠোকরা আসতো, তারাও নিরুদ্দেশ হলো।

গাছ কাটা শেষ হলে, পুকুর-ডোবা ভরাট হলো। ভরাট করার আগে পুকুরের বড় মাছ গুলো ধরা পড়ল জালে। ছোট মাছেরা, মাটির তলায় নিরুদ্দেশ হলো। শুধুই কি মাছ? ব্যাং এর ডাক শোনা গেলনা পরের বর্ষায়, ঢোঁড়া সাপ বের হল না আর কোনদিন। জল-মাকড়সা, আর জলফড়িং, চিৎ-সাঁতারু আর ডুবুরি-পোকা তারাও নিরুদ্দেশ।

সেখানে নতুন পথ হয়েছে। পথের পাশে নতুন নতুন বাড়ি। পশুপাখি সেখান থেকে সব নিরুদ্দেশ। সহরের পাশ থেকে, গ্রামের পাশ থেকেও। গ্রামগুলো সহর হয়ে উঠ্‌ছে, সহর বেড়ে চলেছে চারপাশে।

কলকাতার পুব-সীমানায় দাঁড়িয়ে দেখলে দেখবে যতদূর চোখ যায় ততদুর শুধু জলা। লোকে বলে 'নোনা জলের হ্রদ'। বাঁধ চলে গেছে এদিকে সেদিকে। ওরই নাম ভেড়ি। ভেড়ির মাঝে বর্ষায় জল গিয়ে জমে। মাছের চাষ করে জেলেরা। বর্ষায় জলের পোকা-মাকড়ের সংখ্যা বেড়ে যায়। শরতের সাথে সাথেই যাযাবর হাঁসের ঝাঁক এসে পড়ে সেই জলায়। শুধু কি হাঁস? সারা বছর ধরেই দেখবে, মেছো বক, মেঠো-বক, সেনাপতি-বক, সারস, চিল, শঙ্খচিল, গাংচিল, বড় মাছরাঙা, পুঁটি মাছরাঙা, সাদাকালো মাছরাঙা, খঞ্জন, শামুকখোর, গাংশালিখ, ফিঙ্গে, চাতক,—কত যে পাখি।

কলকাতায় আর জায়গা নেই, নতুন বাড়ির জন্য নতুন জমি চাই। তাই একদিন ভেড়ি ভেঙ্গে দেয়া হলো। নলদিয়ে কাদামাটি ঢেলে বুজিয়ে দেয়া হলো জলা। জলা যখন রইল না, জলের প্রাণী থাকে কি করে? সবাই তারা নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে।

জলা ভরাট করে, 'বন কেটে, বসত' বসাচ্ছি আমরা। পশুপাখি, গাছপালা পোকামাকড়ের কথা ভেবেও দেখছি না।

তাছাড়া আনন্দ : গাছপালা, পশুপাখি এসব দেখে, নদী নালায় চলে, মাঠে প্রান্তরে বনে ঘুরে যে আনন্দ, সে কি আর কিছুতে আছে ! চল, কোথায় তারা গেল খুঁজি। কি তাদের স্বভাব দেখি, আমাদের কোন প্রয়োজনে তারা লাগে বুঝি। প্রকৃতি পড়ুয়ারা প্রকৃতিকে জানার দায়িত্ব না নিলে কে নেবে !

প্রকৃতি পড়ুয়াদের রোজনামচা থেকে

সফরেঃ অশোক চক্রবর্তী

[ষোল বছর বয়স বা ইস্কুলের গণ্ডি পেরলে, প্রকৃতি-পড়ুয়ারা, অভিভাবকের মত নিয়ে 'সফরে' যাবে এমন একটা নিয়ম চালু করতে চাইছিলাম। 'সফরে' মানে – সমুদ্রতীরে, নদীনালায়, পাহাড়ে জংগলে বা মরুভূমিতে প্রাকৃতিক অভিযানে বেরনো। প্রথম 'সফরে'র প্রথম বিবরণ অশোক চক্রবর্তীর লেখায় পড়। জীঃ সঃ]

জানুয়ারি মাসের প্রঃ পঃ পাঠশালায় বসে ঠিক হলো আমরা সে মাসেই প্রথম 'সফরে' যাব। জায়গা মুড়াদি—আদ্রা আর আসানসোল দুয়ের মাঝামাঝি একটা পাহাড় ঘেরা জায়গা। উদ্দেশ্য—ওখানে কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড় আছে। তাদের যে কোন একটাতে চ'ড়ব। পথে যেতে এক নজরে দেখব প্রকৃতিকে।

চারজনের ছোট্ট দলটি খুব ভোরে মুড়াদিতে নাবলাম। ভীষণ শীত। ছ'টার মত বাজে। চারদিকে কুয়াশায় ঢাকা। দূরে দূরে পাহাড়ের চূড়োগুলো শুধু দেখা যাচ্ছে। তলাটা কুয়াশা—একেবারে সাদা।

একটা চায়ের দোকানে বসে সকালের খাবারটা সেরে পাহাড় চড়ার জন্যে তৈরী হলাম। একটি মেঠোপথ চলে গেছে মুড়াদি গ্রামের মধ্য দিয়ে একেবারে 'মুড়াদি' পাহাড়ের দিকে। পথের দুপাশে ঘাসের গায়ে মেঠো মাকড়সা জাল পেতে রেখেছে। সারারাত শিশির পড়ে জালগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পোকা ধরা পড়েনি একটাতেও। হলুদ-পাখির ডাক শুনলাম একবার। পথের পাশের ঝিলের তীরে কাদাখোঁচা চরছে। ডাহুক ও আছে তাতে। পাহাড়টার গোড়ায় যে ঝিলটা তাতে দেখলাম কয়েকটা 'ডুবি' হাঁস। এতক্ষণ একটাও কাক দেখলাম না।

পাহাড়ের তলায় কয়েকটা ছবি নিলাম। তারপর সুরু হল পাহাড় চড়া। পাহাড়টা উঁচু হাজার ফুটের বেশি। পুরো পাহাড়টা একমানুষ সমান বুনো ঘাসে ঢাকা। তাছাড়া রয়েছে নানাধরনের কাঁটা গাছ, লতানে গাছ, ছোট ছোট পেয়ারা, কুল আর বেল গাছ। পাহাড়টার নাম দিলাম কচ্ছপ পাহাড়। কচ্ছপের মত দেখতে বলে।

খুব সাবধানে আমাদের উঠতে হয়েছে। একদম খাড়াই পথ। একটু অন্যমনস্ক হলে বা ঠিকমত পা' না ফেললেই নীচের দিকে গড়াতে আরম্ভ করব। বেশ কিছুটা ওঠার পর মনে হলো হাত-পা' যেন ভীষণ জ্বলছে। জ্বালা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। ঝোপঝাড়ে যে 'আলকুসি' গাছ ছিল খেয়াল করিনি। তাছাড়া ঘাসের গায়ের শুঁয়ো, তীরের ফলার মত তাদের বীজ গায়ে গেঁথে যাচ্ছে জামা কাপড় ফুঁড়ে।

পাহাড়টাতে ওঠার কোন রাস্তা নেই। ডালপালা সরিয়ে পথ করে নিতে হয়েছে। কাঁটা লেগে হাত ছ'ড়ে যাচ্ছে। কাঁটা গুলো কোনটা তীরের মতন, কোনটা ত্রিভুজের মতন, কোনটা মাছধরার বঁড়শির মতন। লতানে গাছে পা, 'পিঠের-ব্যাগ' আটকে যাচ্ছে। পেছন থেকে কেউ না ছাড়িয়ে দিলে নড়তে পারছি না। কখনও বসে বসে, হাঁটু গেড়ে, কখনও বা বুকে হেঁটে এগোতে হচ্ছে। সে এক ভীষণ আনন্দের আর রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

এক জায়গায় দেখলাম একটি বড়ো হাড় পড়ে রয়েছে। কিসের হাড়, কে আনলো এখানে? গ্রামের লোকেরা বলেছে এসব পাহাড়ে চিতাবাঘ আসে। উঠতে উঠতে দু'একটা গুহা দেখেছি। উঁকি দিয়েছিলাম, কিছু বোঝা যায়নি। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে পাহাড়ের চূড়ায় এসে গেছি। বেশ গরম লাগছে। একটা বড় পাথরে সবাই মিলে বসলাম। অত উঁচু থেকে তলার জমিটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। গাছ, মানুষ, গরু সব ছোট ছোট পুতুলের মত দেখাচ্ছে। ধানের জমি গুলোকে দেখাচ্ছে ছক কাটা কাগজের মতন। দূরে একটা খাল রূপোলী সুতোর মত ঝক্ ঝক্ করছে। বড় বড় পুকুর গুলোকে মনে হচ্ছে আয়না। দূরে দূরে আর সব পাহাড়ের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। সমস্ত দৃশ্যটা অদ্ভুত সুন্দর।

নাবার সময় আমরা একটা ভাল পথ পেয়ে গেলাম। পথটা 'পাহাড়ের গা' বেয়ে জল নামার পথ। কাঠুরিয়ারাও ও-পথে আসাযাওয়া করে। নামতে গিয়ে পা' হড়কে যাচ্ছে আলতো পাথরে পা ফেললে। প্রায় বসে বসে সর সর করে নেবে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম সমতল জায়গায়। নেমেই দাঁত মুখ খিচিঁয়ে যে যার পা' চুলকোতে সুরু করে দিলাম। মনে পড়ে যেন চিড়িয়াখানার বিশেষ খাঁচার ভেতরের দৃশ্য।

এই সফরের শিক্ষা: পাখির ডাক আর ওড়া দেখেও পাখি চিনতে পারা উচিৎ। বুনো ফুল, ফল ও পাতার মাঝে আরও পরিচয় দরকার। বার বার সফরে বেরিয়ে সাহস বাড়ানো দরকার।

এই সফেরর অভিযাত্রী: সুদীপ চক্রবর্তী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অশোক চক্রবর্তী এবং জীবন সর্দার।

নতুন পাঠশালা

হায়দরাবাদে, জুলু সেন সপ্তম প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালা গড়েছে। ওরা ওদের এলাকার পশুপাখি গাছপালার সব খবর নিয়ে আর সব পড়ুয়াদের জানাবে—দপ্তর মারফৎ।

নতুন পড়ুয়া

হায়দরাবাদ:—বাপুন সেন (১২৪)। চৈতি মুখার্জী (১২৫)। সোনালী চ্যাটার্জী (১২৬)। মিতা সেনগুপ্ত (১২৭)।

পাটনা:—প্রদীপ দত্ত (১২৮)। চিত্তরঞ্জন:—কিশলয় নন্দী (১২৯)

ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

ক্রিকেট

লণ্ডন স্কুলদল যেমন এবার শীতের মরশুমে ভারতে খেলতে এসেছিল, তেমনি অস্ট্রেলিয়া স্কুলদল গিয়েছিল পূর্ব আফ্রিকায় সফরে। ফিরতি পথে বোম্বাই ও মাদ্রাজে একদিন ক'রে তারা দুটো ম্যাচ খেলে।

বোম্বাই স্কুলদল : ২২৫ (৬ উইকেটে ডিক্লে:)— মলিন্দ রেগে, ৫৯, আব্বাস কাজিম ৫৯ ; লেন অলিভার ৭৪ রানে ৫ উইকেট। অস্ট্রেলীয় স্কুলদল : ১৯৫ (৭ উইকেটে)— জন হিউম্যান ৮৯, রেকস্ ওয়ার্ড ৬৭ ; মলিন্দ রেগে ৫৪ রানে ৩, একনাথ সোলকার ৩৮ রানে ২ উইকেট। খেলা ড্র হয়।

মাদ্রাজ স্কুলদল : ২০১ (৭ উইকেটে ডিক্লে:)— বিজয়কুমার ৬০ নট আউট, লালচাঁদ ৪১, এ কে সুব্রামনিয়ম ২৮ নট আউট ; এম পেলি ৫০ রানে ৪, লেন অলিভার ৩৩ রানে ২ উইকেট। অস্ট্রেলীয় স্কুলদল : ৯৬— পি হেগেন ২১, আর ওয়ার্ড ১৯ ; জার্নেল সিং ৪৯ রানে ৬, রফি আমেদ ১৭ রানে ৩ উইকেট। ১০৫ রানে মাদ্রাজ বিজয়ী। এই মাদ্রাজ স্কুলদল কিছুদিন আগে লণ্ডন স্কুলদলের কাছে এক ইনিংসে হেরেছিল। সেই হারার শোধটা অস্ট্রেলিয়ার উপর খুব ভালোই তুলেছে। জার্নেলের স্পিন বলে অস্ট্রেলিয়ার ছেলেরা একদম খেলতে পারে নি। তার বলের গড় ১১.৫ ওভার ২ মেডেন ৪৯ রান ৬ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া স্কুলদলের ম্যানেজার ভূতপূর্ব বিখ্যাত টেস্ট উইকেটকিপার ডব্লু এ ওল্ডফিল্ড ভারতের ছেলেদের খেলার মানের খুব সুখ্যাতি করেন।

কলকাতায় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সি এ বি) পরিচালিত প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগের এ বি সি ডি ৪টি গ্রুপের খেলা শেষ হয়েছে। যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বি এন আর (২৬ পয়েন্ট) এরিয়ান্স (২২ প.) মোহনবাগান (২২ প.), এলবার্ট স্পোর্টিং (২৪ প.)। রানার্স হয়েছে যথাক্রমে ইস্টবেঙ্গল, পোর্ট কমিশনার্স, তালতলা, টালী অগ্রগামী।

জয়পুরে রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলায় বোম্বাই রাজস্থানকে ৮ উইকেটে হারিয়ে পর পর ৮ বার জয়ী হল। বিজয় মঞ্জরেকার অসুস্থতায় জন্যে ফাইনালে খেলতে না পারার জন্যে রাজস্থানের দলগত শক্তির জোর কমে গিয়েছিল। সেমিফাইনালে বাংলা বোম্বাই-এর কাছে হারলেও সুব্রত গুহর সুইং বল বোম্বাই-এর বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের বিস্ময়ের খোরাক যোগায়।

অস্ট্রেলিয়াতে ইংলণ্ডের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচে এবারও অস্ট্রেলিয়া 'অ্যাসেজ' রাখার সম্মান লাভ করে। ৫টি টেস্ট খেলায় ১টি ইংলণ্ড ও ১টি অস্ট্রেলিয়া জেতে, বাকি ৩টি ড্র হয়। অস্ট্রেলিয়ার নতুন খেলোয়াড় ২০ বছর বয়সের কেভিন ডগলাস ওয়ালটার্স ক্রিকেট জগতের নতুন বিস্ময়। কেউ বলছেন ব্যাডম্যানের নব সংস্করণ, কেউ বলছেন তা নয়। নানা গবেষণা চলছে। আমরা বলব আরো খেলুক, ধোপে টিঁকুক, তখন বুঝব সে কী। অস্ট্রেলিয়ার বব কাউপারের মেলবোর্ন মাঠে ৩০৭ রান ৩টি টেস্ট রেকর্ড ভাঙে। ইংলণ্ডের কেন ব্যারিংটন এবার সবচেয়ে ভালো খেলেছেন।

স্পোর্টস্

খ্যাতনামা ক্রীড়া পরিসংখ্যানকার কুয়ারসেতানির তালিকায় ভারতের গুরবচন সিংকে ১৯৬৫ সালে কমনওয়েলথ ১১ মিটার হার্ডলসে (১৪·১ সেকেণ্ড) শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর বলে ঘোষণা করেছেন।

ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে পাঞ্জাব ২১টি স্বর্ণপদক পেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়। বাংলা মোট ১৬টি পদক পায়। তার মধ্যে স্বর্ণ ২ (বালিকাবিভাগে : লং জাম্পে রুবী নন্দী ; পুরুষবিভাগে : লংজাম্পে প্রণব ব্যাণার্জি), রৌপ্য ৩ (বালকবিভাগে : পোল ভল্টে মধুসূদন গাঙ্গুলী ; বালিকাবিভাগে : ১০০ মিটারে রুবী নন্দী ; পুরুষবিভাগে : ২০ কিলো ভ্রমণে সন্তোক সিং), ব্রোঞ্জ ১১ (বালকবিভাগে : হাইজাম্পে নবীন বিশ্বাস, লংজাম্প ও ট্রিপল জাম্পে স্বপন গাঙ্গুলী ; মহিলাবিভাগে : ৮০ মিটার হার্ডলসে নমিতা ঘোষ ; পুরুষবিভাগে : সটপুটে ভোলা মাহাতো, জাভেলিনে মহেন্দ্র সিং, ১০ হাজার মিটার দৌড়ে শীতল সিং, ৪ × ১০০ মিটার রীলেতে পশ্চিমবাংলা, লংজাম্পে শিশুতোষ মুখার্জি, ২০০ মিটার দৌড়ে এ ডি এস প্রসাদ এবং ৩ হাজার মিটার স্টিপলচেজে অজিত সিং)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে পশ্চিমবাংলার স্কুল স্পোর্টসে বালকবিভাগে বর্ধমান ৩৪ পয়েন্ট ও বালিকাবিভাগে ২৪ পরগণা ৩৫ পয়েন্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। নতুন রাজ্য স্কুল রেকর্ড করেছে—মুর্শিদাবাদের সোফিয়া খাতুন ১০০ মিটার ১৩·১ সেকেণ্ড ও ২০০ মিটার ২৭·৩ সেকেণ্ডে দৌড়ে, হাইজাম্পে বর্ধমানের নন্দিতা পাল ১·৩৩ মিটার উচ্চতায়, লংজাম্পে ২৪ পরগণার রুবী নন্দী ১৬ ফিট ৩½ ইঞ্চি দূরত্বে, ২৬·১০ মিটার জাভেলিন বা বর্শা ছোঁড়ায় ইন্দ্রানী মুখার্জি এবং ৬৫ ফিট ৯'

ইঞ্চি ডিসকাস ছোঁড়ায় বর্ধমানের নমিতা ভৌমিক। বালকবিভাগে বর্ধমানের স্বপন গাঙ্গুলী ৬'৫১ মিটার লাফিয়ে সর্বভারতীয় স্কুল রেকর্ড করে।

শিলং-এ জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ অ্যাথলীট হয় বালকবিভাগে রাজেন্দ্র সিং (ইউ পি)—৫ পয়েন্ট ও বালিকাবিভাগে গুরবনস্ কাউর (মহারাষ্ট্র)—১৫ পয়েন্ট লাভ করে। দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে বালকবিভাগে ইউ পি (৪৫ পয়েন্ট), ২য় পশ্চিমবাংলা (৩৭ পয়েন্ট); বালিকাবিভাগে পশ্চিম বাংলা (৩৬ পয়েন্ট); ২য় মহারাষ্ট্র (২৪ পয়েন্ট)। পশ্চিম বাংলার সোফিয়া খাতুন তার পুরাতন রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড করে ১০০ মিটার ১২'৭ সেকেণ্ডে ও ২০০ মিটার ২৬'৫ সেকেণ্ডে দৌড়ে।

বাস্কেট বল

কোয়েম্বাটুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় ফাইনালে পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস দল ৫১-৪৮ পয়েন্টে রেলওয়ে দলকে হারায়। মহিলাবিভাগে বাংলা ৩৬-২২ পয়েন্টে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে। বাংলার কুমারী টি গুপ্ত খুব ভালো খেলে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ করে। বালকবিভাগে মহীশূর ৬৭-৫৪ পয়েন্টে অন্ধ্রপ্রদেশকে হারায়।

শিলং-এ জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানে বালকবিভাগে ১ম মহারাষ্ট্র, ২য় উড়িষ্যা এবং ৩য় হয় পশ্চিম বাংলা। বালিকাবিভাগে ১ম মহারাষ্ট্র, দ্বিতীয় মধ্যপ্রদেশ।

টেবিলটেনিস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য টেবিল-টেনিস প্রতিযোপিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পুরুষদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে দিলীপ মুখার্জি ২১-৯, ২১-১৫, পয়েন্টে সরোজ ঘোষকে হারিয়ে, মহিলাদের সিঙ্গলসে কুমারী রূপা মুখার্জি ২১-১৪, ২১ ১৬, ২১-১৭ পয়েন্টে কুমারী রবিনা রয়কে হারিয়ে, আর জুনিয়র সিঙ্গলসে অমৃত খোসলা ২১-১৯, ২২-২০, ২১-১৮ পয়েন্টে এন মুখার্জিকে পরাজিত ক'রে।

শিলং এ জাতীয় স্কুল প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকাবিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পশ্চিম বাংলা, রানার্স-আপ হয়েছে এই দুই বিভাগে মহারাষ্ট্র।

জলন্ধরে ২৭তম জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র পুরুষ, মহিলা ও জুনিয়র বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। ১৯৫৮ সালেও মহারাষ্ট্র এই ভাবে তিন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। একমাত্র বালিকাবিভাগে বাংলার রূপা মুখার্জি মাদ্রাজের সুমা জর্জকে ১৮-২১, ২১-১৭, ২১-১৩, ২১-১১, পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ ক'রে বাংলার মানইজ্জত রেখেছে। সেমিফাইনালে রূপা হারিয়েছিল কেরলার সার্দা ডাভিকে ২১-১৩, ২১-১৩, ২১-১৯ পয়েন্টে।

ভেবেছিলাম অমৃত খোসলা বালকবিভাগে চ্যাম্পিয়ন হবে। হাতের মার বড়ো সুন্দর ওর। অনেক বড়োদের হাতেও সে মার নেই। কিন্তু ফাইনালে অমৃতকে হারতে হল ১৫ বছরের মারাঠি ছেলে উদয় গুরজারের কাছে ২১-১০, ২১-১৬, ২২-২৪, ২১-১৮ পয়েন্টে।

হকি

কলিকাতায় এখন হকির মরসুম। লীগখেলা পুরোদমেই চলছে। হকিতে বাংলা পিছিয়ে থাকলে চলবে না। স্কুল কলেজের ছেলেদের এদিকে নজর দিতে হবে। কারণ, এ খেলায় যে ভারত বিশ্বশ্রেষ্ঠ।

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতের হকিদলের অধিনায়ক ও সুনিপুণ রাইট আউট কিষেণলাল রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ করেছেন। কিষেণলালকে নিয়ে এ পর্যন্ত ৫ জন (ধ্যানচাঁদ, বাবু, বলবীর, চরঞ্জিৎ) হকি খেলোয়াড় রাষ্ট্রীর সম্মানের অধিকারী হলেন। কিষেনলালের সঙ্গে আজ আর একজন হকি খেলোয়াড়ের কথা মনে পড়ছে, তিনি অবশ্য ভারতকে জয়ের সম্মান এনে দিতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর ক্রীড়াকীর্তি, সংগ্রামী শক্তি এবং খেলোয়াড়সুচক মনোভাব ভারতের যে কোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি। সেই ভাগ্যহত খেলোয়াড় হলেন রোম অলিম্পিকের অধিনায়ক এবং অপর ৪টি অলিম্পিকের খেলোয়াড় লেসলি ক্লডিয়াস। হকির সঙ্গে পরিচয় যাঁদের আছে আজ তাঁদের প্রত্যেকেরই ক্লডিয়াসের কথা মনে পড়বে।

১৩টি রেল সংস্থা নিয়ে আন্তঃ রেল হকি প্রতিযোগিতায় নদার্ণ রেল ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিকে (আই সি এফ) ৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। গতবার ১৯৬৫তে নদার্ণ ও সাদার্ন রেল যুগ্ম বিজয়ী হয়। নর্দান রেলের লেফট-ব্যাক মুকবেন সিংকে অনেকেই আগামী দিনের অলিম্পিক খেলোয়াড় বলে মনে করছেন।

ফুটবল

শিলং-এ জাতীয় স্কুল স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতায় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পশ্চিম বাংলা, রানার্স-আপ মধ্যপ্রদেশ।

কুইলনে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নামে নতুন তৈরি স্টেডিয়ামে ২১তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফির দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশ ১-০ গোলে বাংলাকে হারায়। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি ১-১ গোলে ড্র হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ বা আগেকার হায়দরাবাদ মোট ৬ বার ফাইনাল খেলেছে। শেষ ট্রফি পায় ১৯৫৭ সালে বোম্বাইকে ৩-০ গোলে হারিয়ে। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালের ফাইনালে বাংলার কাছে অন্ধ্রপ্রদেশ দুবার হেরেছিল। এবার তার কিছুটা প্রতিশোধ নিল। বাংলা ১৭ বার ফাইনালে খেলে ১১ বার সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে আর ৬ বার রানার্স-আপ।

ব্যাডমিণ্টন

ইডেনের ইনডোর স্টেডিয়ামে পূর্ব-ভারত ব্যাডমিনটন প্রতিযোগিতায় ফাইনালে দীনেশ খান্না ১২-১৫, ১৫-১১, ১৫-৬ গেমে দীপু ঘোষকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন। জাতীয় ব্যাডমিনটন চ্যাম্পিয়নশিপে দীপুর কাছে সেমিফাইনালে ১৫-২, ১৭-১৫ গেমে হারার প্রতিশোধ নিলেন। রঞ্জন ঘোষ ১৫-৪, ১৭-১৪ গেমে কাজল সাহাকে বালকদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে হারিয়েছে। মহিলাদের সিঙ্গলসে বিজয়ী হলেন সরোজিনী আপ্তে ১৪-৪, ১১-৭ গেমে সুনীলা আপ্তেকে হারিয়ে।
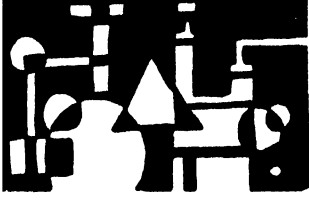
হেড অফিসের বড় বাবু

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

আমাদের শরীরটা একটা বিরাট শিল্প-নগরী। কত বড় বড় কলকারখানা রয়েছে এখানে। দিনরাত্তির কাজ হচ্ছে। এই কলকারখানাগুলো চালাচ্ছে বড় বড় অফিস। যাবতীয় কাজ কর্মের নির্দেশ দিচ্ছে তারা। আবার এই অফিসগুলোর উপর রয়েছে সবচেয়ে বড় অফিস, যার নাম হেড-অফিস। সেই অফিসের যিনি বড়কর্তা তাঁর নাম মিঃ ব্রেন।

ব্রেন (Brain) এর বাংলা নাম দিয়েছি আমরা, মস্তিষ্ক। মাথার খুলির ভেতর (ইংরেজীতে তাকে বলে স্কাল—Skull) তার চেম্বার। গায়ের রঙ দু'রকম। বাইরেটা ধূসর (Grey) আর ভেতরটা সাদা (White)। বাইরেটা স্নায়ুকোষ (Nerve cell—নার্ভ সেল) আর ভেতরটা স্নায়ু-সূতিকা (Nerve fibre-নার্ভফাইবার) দিয়ে তৈরী। মস্তিষ্কের উপর তিনটে ঝিল্লী বা পর্দার আবরণ থাকে। এই পর্দাগুলোর একত্রে নাম মেনিঞ্জেস (Meninges) তারপর থাকে শক্ত মাথার খুলি। খুব দরকারী, বিজ্ঞানের ভাষায় ভাইটাল (Vital) অঙ্গ কিনা, তাই অনেক যত্নে মজবুত দুর্গের মধ্যে রাখা আছে যাতে চট করে কোন আঘাত না লাগে। তা ছাড়া হাজার হাজার শিরা-ধমনী (Vein and Artery) মস্তিষ্ককে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে প্রচুর পরিমাণ রক্ত সরবরাহ করে তার যথাযথ পুষ্টির ব্যবস্থা করেছে। মস্তিষ্কের ওজন, কমবেশি প্রায় তিন পাউণ্ডের মত।
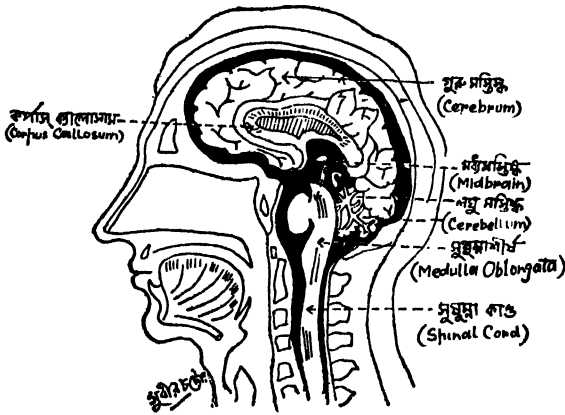
মস্তিষ্ককে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সমুখ মস্তিষ্ক বা ফোর-ব্রেন (Fore-brain), মধ্য মস্তিষ্ক বা মিড ব্রেন (Mid brain) এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বা হাইণ্ড ব্রেন (Hind brain)।

সমুখ মস্তিষ্কের প্রধান অংশের নাম সেরিব্রাম (cerebrum) যার বাংলা করা হয়েছে গুরু-মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের বৃহত্তম অংশই হ'ল এই গুরু মস্তিষ্ক। গুরুমস্তিষ্কের আবার দু'ভাগ, ডান ও বাম।

এই দুই অংশের মাঝখানে থাকে গভীর খাদ। এই খাদটার নাম হল লংগিচুডিনাল ফিসার (Longitudinal fissure) ঘাবড়াবার কিছু নেই ওটা সাংঘাতিক কোন কথা নয়, ওর বাংলা, লম্বালম্বি-খাদ। গুরু মস্তিষ্কের বাম ও ডান ভাগ জোড়া দিচ্ছে যে স্নায়ুরজ্জু তার নাম কর্পাস ক্যালোসাম (Corpus callosum) গুরু মস্তিষ্কের উপর রয়েছে অসংখ্য ভাঁজ। এই ভাঁজগুলিকে প্রাণীজগতের উন্নতির মাপকাঠি বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ যে প্রাণীর গুরু মস্তিষ্কের ভাঁজের সংখ্যা যত বেশি সে তত উন্নত।

আমরা যা কাজকর্ম করি তার প্রায় সব কিছুর নির্দেশ আসে গুরু মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। সহজ করে বলি। ধরো কোন অনুষ্ঠানে সভাপতি মশাইকে অনুরোধ করা হ'ল কিছু বলবার জন্য। তৎক্ষণাৎ সে খবর কানের মধ্যের পর্দায় (Tympanic membrane—টিমপ্যানিক মেমব্রেন) কম্পন জাগাল, ওই কম্পন কানের স্নায়ুমণ্ডলী মারফৎ গুরু মস্তিষ্কের বিশেষ এক কেন্দ্রে পৌঁছে গেল। এবং খবর পৌঁছান মাত্র, সভাপতি মশাই-এর গুরু মস্তিষ্কে আর একটি বিশেষ কেন্দ্র (Centre-সেণ্টার) নির্দেশ দিল, মশাই আপনি এই এই কথাগুলো বলুন। এই যে কেন্দ্র, যেখান থেকে কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার নাম বাক্-কেন্দ্র ইংরেজীতে বলে স্পীচ সেণ্টার (Speech centre) মজার ব্যাপার এই যে, গুরুমস্তিষ্কে অন্যান্য যে সকল কেন্দ্র আছে যেমন, দর্শন, শ্রবণ, গন্ধ, তারা থাকে দু'টো করে। একটা গুরুমস্তিষ্কের ডান ভাগে অপরটি বাম ভাগে। কিন্তু বাক্ কেন্দ্র থাকে মাত্র একটা। আরও মজার ব্যাপার, যারা ডান হাতে কাজকর্ম করে তাদের এই কেন্দ্রটি থাকে গুরু মস্তিষ্কের বাম ভাগে। কিন্তু যারা বাঁ হাতের বশ, সাদা বাংলায় ন্যাটা, তাদের এ কেন্দ্রটি থাকে কিছু ডান দিকে। উপরিউক্ত কেন্দ্রগুলি ছাড়াও, স্বাদ (Taste), বেদনা (Pain), ঠাণ্ডা-গরম (Heat-Cold) ইত্যাদির কেন্দ্রও গুরুমস্তিষ্কে থাকে। ঐ কেন্দ্রগুলো যদি ধর্মঘট করে কাজ বন্ধ করে দেয় তো আমাদের অবস্থা কাহিল। নাকের সামনে সেণ্টের শিশি উল্টে দিলেও একফোঁটা গন্ধ পাবো না। আবার কেউ যদি দুমদাম করে পিটিয়ে দেয় তাও টের পাবো না। কিন্তু সে তো আর স্বাভাবিক অবস্থা নয়, এটা একটা রোগ। [দ্রঃ বিজ্ঞানের আসর, প্রশ্নের উত্তর, কার্ত্তিক ১৩৭২] আরো মজার কথা বলি, যদি গুরু মস্তিষ্কের বাঁ দিকের কেন্দ্রগুলো কাজকর্ম বন্ধ করে দেয় যত গণ্ডগোল সুরু হবে ডান দিকে। তখন ডান হাত তোলা যাবে না, ডান পা চলবে না, ডান কানে শোনা যাবে না। ঠিক উল্টো কাণ্ড হবে ডান দিকের বেলায় তখন গণ্ডগোল হবে বাঁ দিকে।

এবার মধ্য-মস্তিষ্ক বা মিড ব্রেন। একটি মস্তিষ্কের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দুই সেন্টিমিটার। থাকে গুরু মস্তিষ্ক (Cerebrum) আর লঘু মস্তিষ্কের (Cerebellum) মাঝখানে। এর সামনে আছে একটা কেন্দ্র যার নাম থ্যালেমাস (Thalamus) এবং পিছনে থাকে আর একটি কেন্দ্র যার নাম হাইপোথ্যালেমাস (Hypothalamus)।

এরা দুজন সমুখ-মস্তিষ্কের (Fore-brain) অংশ; বহু স্নায়ু-কোষ (Nerve cell) দিয়ে তৈরী হয়েছে থ্যালেমাস। মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুতন্ত্র (Nervous systems) সারা শরীরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার

করেছে টেলিগ্রাফের তারের মতো। এই সব তার মারফৎ দেহের বিভিন্ন স্থানের খবরা খবর আসে মস্তিষ্কে। কিন্তু গুরু মস্তিষ্কে আসার আগে এই থ্যালেমাসে তাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সুতরাং এটি একটি অপেক্ষা-কেন্দ্র বা রিলে-সেণ্টার (Relay centre)।

"ঘুম", নামটা আমাদের খুব প্রিয়, কিন্তু মুশকিল এই যে, পড়তে বসলেই ঘুম পায় আর তার জন্য বকুনি মার ইত্যাদি অখাদ্য বস্তু ভাগ্যে জোটে। এর জন্য দায়ী ঐ হাইপোথ্যালেমাস, আবার ওকে রাগিয়ে দিলেও চলবে না কারণ সে আমাদের দেহের ঠাণ্ডা-গরম নিয়ন্ত্রণ করে সুতরাং ক্ষেপে গিয়ে কাজ বন্ধ করে দিলেই ঝামেলা। শুধু তাই নয় আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারও সে পরিচালনা করছে। কথায় বলে "দুষ্টু খিদে", হাজার খেয়েও পেট ভরছে না কিংবা তার উল্টো সারাটা দিন কিছু না খেয়েও খিদে পাচ্ছে না, এই সবই ঐ হাইপোথ্যালেমাসের কারসাজি।

লঘু মস্তিষ্ক বা সেরিবেলাম (cerebellum) হ'ল পশ্চাৎ-মস্তিষ্ক বা হাইণ্ড-ব্রেন (Hind brain) এর অংশ। এ থাকে গুরু মস্তিষ্কের পিছনে ও নিচে। এরও দুটো অংশ বাম এবং ডান। এই দুটো অংশ জোড়া দিচ্ছে যে স্নায়ুতন্তু তার নাম পন্‌স (Pons)। লঘু মস্তিষ্ক আমাদের চলাফেরা, হাত পা নাড়ানো ইত্যাদিতে গুরু মস্তিষ্কের সহায়তা করে। পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সব শেষে রয়েছে সুষুম্নাশীর্ষ বা মেডুলা অবলঙ্গাটা (Medulla oblongata), এই স্থান থেকেই নেমে এসেছে স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)। ছড়িয়ে গিয়েছে দেহের প্রতিটি অংশে।

"হেড অফিসের বড় বাবুর" কাহিনী লিখতে লিখতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি হঠাৎ রেডিওতে একটা চেনা গানের সুর বেজে উঠলো। আমি নিজেকেই বললাম "আরে এটা যে রবিঠাকুরের মায়ার খেলার গান।" এবার তোমরা মনে মনে চিন্তা করো তো, গানের সুর কোথা দিয়ে কোথায় গেল আর কে আমাকে নির্দেশ দিল ঐ কথা বলতে !

বিঃ দ্রঃ—এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে জানিও, সন্দেশের ঠিকানায়, উত্তর দেব—সু চ

নতুন ধাঁধা

উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ১৬ই এপ্রিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উত্তর-দাতারা ১৬ই এপ্রিলের মধ্যে নতুন বছরের চাঁদা পাঠাতে ভুলো না

(১)

কভু থাকি ঘাড়ে-পিঠে কভু থাকি পাতা।
সকালেতে কত লোকে খায় মোর মাথা।
মুড়ো-কাটা ধড় জেনো বাজারেতে গিয়ে।
গণ্ডা পুরাতে পার ল্যাজা-মুড়ো নিয়ে।

(২)

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার দিদির আর তাঁর ছেলেমেয়ের বয়স কত ?

গণিতানন্দ গাঙ্গুলি হেঁয়ালি করে, জবাব দিলেন—'এখন তো তাদের তিনজনের বয়সের যোগফল ৪৯। কয়েক বছর পরে দিদির বয়স হবে তাঁর ছেলের বয়সের দ্বিগুণ, আর ছেলের বয়স হবে মেয়ের বয়সের দ্বিগুণ।'

তোমরা বল দেখি এখন এঁদের তিনজনের মধ্যে কার বয়স কত ?

(৩)

গত মাসে তোমরা কি-ভাবে সাবানকে মলম করেছিলে মনে আছে তো ? ঠিক সেই রকম ভাবে (ক) চসমা-কে কলম কর (খ) কামানকে ননদ কর।

(৪)

মহাড়ম্বর বাবুর যা খ্যাতি ! স্তাবকেরা বলে যে এমন দানধ্যান নবাবরা করত, আজকাল দেখা যায় না। আবার কেউ বলে যে সে মূর্খ, আকাট—জুড়ি নেই তার বোকামির। তবে তার অন্তরটা মহান, দীন দুঃখীর প্রতি দয়া মায়া আছে। অপোগণ্ড কতগুলি বোকা, রোগা ছেলেপুলেকে সে মানুষ করছে। লোকটি কিন্তু ভারি খামখেয়ালি, রাগলে দেয় অর্ধচন্দ্র, ভাগাবার জন্য গাল দেয়। আবার খুশি হলে দরাজ হাতে দান করে হয় আটশো, নশো টাকা। বড় দুঃখে পড়েছিল অতুল আর অরূপ। নারায়ণ ভরসা করে তারা মহাড়ম্বর বাবুর কাছে গিয়েছিল। মহাসমাদরে তিনি তাদের বসালেন, খেতে দিলেন রূপোর গেলাসে ক্যাওড়া দেওয়া বরফ জল, ঢাকা দেওয়া রূপোর রেকাবে রীতিমতন তবক লাগানো পান। তারপরে তাদের হাতে দিলেন একটা চারকোনা রঙ্গীন খামের মধ্যে দুখানা একশ টাকার নোট !

(উপরের গল্পটির মধ্যে কটা ভারতীয় নদীর নাম লুকোন আছে বার কর তো দেখি।)

ধাঁধার উত্তর

(১)

পেনসিল ও রবার।

(২)

সাবান—বানর—নরক—রকম—কমল—মলম।

(৩)

অমলা — কমলা

বিমল অমল

কমল — বিমলা

(৪)

আ 8 চুরির বি 8।

৫৲ বসে চুপি চুপি খাচ্ছে আ 8
৮কিয়ে ছিটকিনি বড় দরজার।
খাসা অ৩য় ঝাল আমতেল খেয়ে
ফেলে ছুঁড়ে আঁটি আর খো ৭ লা দিয়ে।
১ থা যদু ও ৩৲ পেয়ে গেছে টের।
এ ১২ চালাকি তারা করে দেবে বের।
৭০ ওঠে তারা জানালার তাকে
দেখে পেতে দু ৯ ন কপাটের ফাঁকে।
য ২ বুদ্ধি এঁটে গেল মার ঘরে
২০ য়ে আমের আঁটি নিল সাথে করে।
'ওমা, আ 8 এর ১০১ দেখ এসে তব
বা ২২, একা ৫৲ খেয়ে নিল সব!
'বালাই বালাই ৬০ মা বলেন হাসি
সবাই কে খেতে দেব হাত ধুয়ে ৮০!

প্রথম লাইনে পাঁচুর বদলে তিনু কি চারু কিম্বা সাতু নাম দিলে ক্ষতি নেই। পঞ্চম লাইনেও তেমনি তিনু না দিয়ে পাঁচু, বিশু চারু, সাতু ইত্যাদি নাম দেওয়া যেতে পারে। কেউ কেউ পদ্যটির নাম দিয়েছে—আ ১২ চুরির বি 8। —এটাও ঠিক ধরা যেতে পারে। —তবে প্রথমটাই বেশি ভাল নয় কি? দু' একজন সপ্তম লাইনে সত্তর এবং সত্তর দুটো শব্দের বানানের পার্থক্য নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু সংখ্যাগুলি যদি অক্ষরে না লিখে রাশি বসিয়ে লেখ, তাহলে আর এই সমস্যা উপস্থিত হয় না।

সপ্তম লাইনে ১২,১২, দ্বাদশ লাইনে ১০০ ইত্যাদি ঠিক ধরেছি। কিন্তু যে সংখ্যা বসালে ছন্দ কেটে যায় সেটা ঠিক ধরা হয় নি।

উত্তর-দাতাদের নাম :—

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক হয়েছে—

১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৮৪ নুপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ২৯৫ শম্পা ও শর্মিলা গুপ্ত. ১০৯৭ ঝুমকা সেন, ১৫৭২ সৌম্য, শাক্য ও শঙ্খ রায় চৌধুরী, ১৬১৯ অঞ্জন ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২৭০১ মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৩৬ ভাস্কর ও সব্যসাচী বসু, ২৭৭৩ মৌসুমী ও মৌটুসী সেন।

তিনটি ঠিক ও একটি প্রায় ঠিক—

৬৬৫ অরুণ মুখোপাধ্যায়, ১৩১৭ ভাস্কর মিত্র, ১৪৩১ গণপতি চৌধুরী, ১৫১৭ কিশলয় [illegible], ১৭০৬ [illegible] হালদার, ১৮৪০ অনুরাধা ঘোষ, ২৭৫৩ কেয়া দাশগুপ্ত।

যাদের তিনটি উত্তর ঠিক হয়েছে—

১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ২৪০ প্রবীর কুমার বিশ্বাস, ৩৮৭ কৃষ্ণা, স্বপন ও শেখর [illegible] ৫০০ স্বপ্না, রত্না ও গীতা বসু, ৬১৬ ভারতী মিত্র, ৮০৮ অমিতাভ ঘোষ, ৮৫৯ বাসবী ও বল্লরী গুপ্ত, ৮ অরিজিৎ ও শম্পা চক্রবর্তী, ১০৯৬ প্রণতি দত্ত, ১৩২০ বিজলী ঘোষ, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৫০০ ভারতী [illegible] ১৬৮৮ স্বপ্না ও অলোক দে, ১৭৫২ বাঁশরী রায়, ২১৮৪ সোনালী সরকার, ২২৩১ মানস কুমার ও অ[illegible] হালদার, ২২৪৮ মিহির কুমার ও দেব কুমার গুহ, ২৩০৫ অরূপ দত্তগুপ্ত, ২৩৪২ কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩ নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য, ২৪৬৯ অভিজিৎ আলপনা ও চন্দন গুহ, ২৫৪৪ মণিকা ও সাধনা রায় চৌধুরী, ২৬ সিদ্ধার্থ শঙ্কর পাল, ২৬৭৬ শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, ২৭২৮ লেখনী ও তন্ত্রী মুখোপাধ্যায়, ২৭৬১ ঋতা, মিতা ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত।

দুইটি ঠিক ও একটি প্রায় ঠিক—

৭ সুচিত্রা ঘোষ, ১৭৫ অর্চনা ঘোষ, ২১৩ অনুরাধা দত্ত, ৩৪০ পূরবী চক্রবর্তী, ৩৪৮ কাজল ও সমীর ভট্টাচা[illegible] ৩৮৭ বিজয়া মিত্র, ৪৪৩ সুতপা চক্রবর্তী, ৮২৯ এলা মুখোপাধ্যায়, ৮৮২ স্বাধীন দাশ, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ৯[illegible] জ্যোতির্ময় মজুমদার, ১৪১৭ শাশ্বতী সেনগুপ্ত, ১৫৮৯ আরতি মহাপাত্র, ১৭৫৯ শমীন্দ্র দেব, ১৮২৭ আশুতোষ অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩২ শান্তনু বসু, ২২২৮ কৃষ্ণা রায়, ২২৫২ স্মরণ ও শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৩ ভাস্কর প্রসাদ সেন, ২৪৮২ তাপস কুমার সেন, ২৬৯৯ সুব্রত ভট্টাচার্য, ২৮১৬ শ্রীলেখা ও তপতী দাশগুপ্ত।

দুইটি উত্তর ঠিক—

৪৯ শর্মিষ্ঠা সেন, ৬৪৫ গৌতম ও পার্থসারথী বসু, ৬৫৭ অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, ১৬১৩ অভিজিৎ ভারতী দে, ১৭০৫ কৃষ্ণকলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭২৪ অনির্বাণ রক্ষিত, ১৮২৪ স্মৃতিলেখা গুহ, ২১৫৩ মালবী মধুরিমা, মীনাক্ষি ও অভিজিৎ দত্ত, ২২১১ নীলাঞ্জনা ধর, ২২৩৬ শ্যামলেন্দু তরফদার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আরো কয়েকটি সঠিক উত্তর পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু নাম ও গ্রাহক সংখ্যা ঠিকমত দেওয়া ছিল না।